শ্রম সংস্কার কমিশন

শ্রমজগতের রূপান্তর-রূপরেখা

শ্রমিক-অধিকার, সু-সমন্বিত শিল্প-সম্পর্ক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

কমিশন প্রতিবেদন

এপ্রিল ২০২৫



কমিশন সদস্যবৃন্দ



মো. রাজেকুজ্জামান (রতন)
সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট।



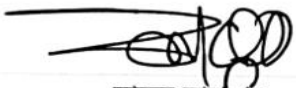
আনোয়ার হোসাইন
যুগ্ম সমন্বয়কারী, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, ও
সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল।



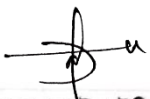
আরিফুল ইসলাম
গণমাধ্যমকর্মী



ড. অনন্য রায়হান
অর্থনীতিবিদ, ও
চেয়ারপার্সন, আইসোশ্যাল।



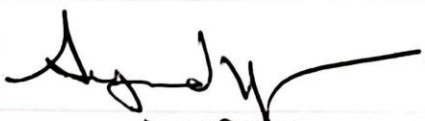
ফারুক আহাম্মাদ
মহাসচিব ও সিইও, বিইএফ



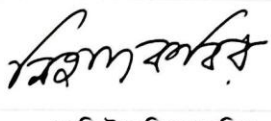
এ এন এম সাইফ উদ্দিন
সদস্য, সহায়ক কমিটি বিজিএমইএ



ফজলে শামীম এহসান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
ফতুল্লা এ্যাপারেলস লিমিটেড, ও
কমিটি সদস্য, বিইএফ



সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর
ব্যবস্থাপনা পরিচালক,
এপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড, ও
প্রাক্তন কমিটি সদস্য বিইএফ



ব্যারিস্টার নিহাদ কবির
সিনিয়র পার্টনার, সৈয়দ ইশতিয়াক আহমেদ
এ্যান্ড এ্যাসোসিয়েটস, ও
প্রাক্তন কমিটি সদস্য বিইএফ



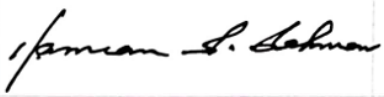
মোস্তফা আল হোসাইন আকিল
শিক্ষার্থী সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন।



তাসলিমা আখতার
সভাপ্রধান, বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি;
ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন
ফেডারেশন, এবং আলোকচিত্রী



মো. সাকিল আখতার চৌধুরী
সাধারন সম্পাদক, বাংলাদেশ লেবার
ফেডারেশন – বিএলএফ



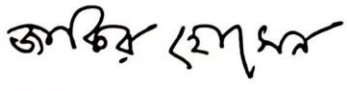
কামরান তানভিরুর রহমান
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স
ফেডারেশন



এ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ লেবার কোর্ট বার
এসোসিয়েশন, ও
কান্ট্রি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
সলিডারিটি সেন্টার - বাংলাদেশ।



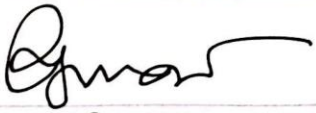
তপন দত্ত
সভাপতি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিটি বাংলাদেশ
ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র - টিইউসি



ড. জাকির হোসেন
অধ্যাপক, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়



ড. মাহফুজুল হক
সাবেক সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান, এবং
পরিবেশ মন্ত্রণালয়



কমিশন প্রধান
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ
নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ

সুচী

কৃতজ্ঞতা 9
শব্দ সংক্ষেপ 13
প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ 15
১) প্রস্তাবনার সামগ্রিক প্রতিফলন 15
২) প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ 19

১. ভূমিকা 65
১.১ প্রেক্ষাপট 65
১.২ উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি 71
১.৩ কর্মপদ্ধতি, টেকনিকাল কমিটি পরিচিতি ও অংশীজন পরিচিতি 73
১.৪ রিপোর্টের বিভিন্ন ভাগ পরিচিতি 74

২ শ্রমে।পনঅধ্যায়ে মানবাধিকারন কর 75
২.১ সংস্কার কাঠামোর ভিত্তি 75
২.২ সংস্কার নীতি 77
২.৩ সুপারিশ প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয় 78
২.৪ সংস্কার প্রস্তাবনার বিষয়ভিত্তিক কাঠামো 80
২.৫ প্রস্তাবনার মূল কাঠামো 81

৩. বিষয়ভিত্তিক মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবনা 83
৩.১ কাজ ও পেশার স্বীকৃতি, কাজের অধিকার, সুযোগ, দক্ষতা, স্থায়িত্ব এবং নিশ্চয়তা 83
৩.২ মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা 107
৩.৩. নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা 124
৩.৪ সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ 148
৩.৫ সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও যৌথ দরকষাকষি 160
৩.৬ শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ন্যায় বিচার 170
৩.৭ সমতা, বৈষম্যহীনতা এবং অন্তর্ভুক্তি 184
৩.৮ শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম 193

৪. শ্রমখাত সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রস্তাবনা 203
৪.১ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় 203
৪.১.১ শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর 204
৪.১.২ শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর 204
৪.১.৩ দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন অধিদপ্তর 204
৪.১.৪ শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তর 205
বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন 207
কেন্দ্রীয় তহবিল 207
৪.১.৫ অনুবিভাগ 207
গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ: 208
শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই) 208
জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI) 208
অভিবাসী শ্রমিক অনুবিভাগ 209

৪.১.৬ বিশেষ সুপারিশ 209
৪.১.৭ জবাবদিহিতা, অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা 209
জাতীয় শ্রম সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি 209
জাতীয় স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন 210
৪.১.৮ ত্রিপক্ষীয় কার্যক্রম ও কাঠামোসমূহ জোরদার 210
৪.১.৯ জাতীয় নিম্নতম মজুরি কমিশন 210
নিম্নতম মজুরি বোর্ড 211
স্থায়ী জাতীয় মজুরি কমিশন 211

৫. বিশেষ ইস্যুভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা 212
৫.১ ব্যবসা ও মানবাধিকার প্রেক্ষিতে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ 212
৫.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও ন্যায্য রূপান্তর 216
৫.৩ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সরকারি ক্রয় ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি 221

৬। বিশেষ শ্রম-জনগোষ্ঠীদের অধিকার ও কল্যাণে সংস্কার প্রস্তাবনা 223
৬.১ লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রান্তিক শ্রমগোষ্ঠী 223
৬.১.১ নারী শ্রমিক 223
৬.১.২ তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া জনগোষ্ঠী 228
৬.১.৩ যুব শ্রম জনগোষ্ঠী 228
৬.১.৪ প্রবীণ শ্রম জনগোষ্ঠী 230
৬.১.৫ আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী 231
৬.১.৬ প্রতিবন্ধী শ্রম জনগোষ্ঠী 232
৬.১.৭ অভিবাসী শ্রমিক 233
৬.১.৮ পরিচ্ছন্নতাকর্মী/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শ্রমিক/দলিত জনগোষ্ঠী 242
৬.১.৯ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক 243
৬.২ কৃষিভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী 243
৬.২.১ কৃষি শ্রমিক 243
৬.২.২ চাতাল/রাইস মিল শ্রমিক 245
৬.২.৩ চা শ্রমিক 245
৬.৩ রপ্তানিমুখি শিল্প ও এলাকাভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী 247
৬.৩.১ গার্মেন্টস (তৈরি পোশাক) খাতের শ্রমিক 247
৬.৩.২ চিংড়ি শিল্প শ্রমিক 249
৬.৩.৩ ট্যানারি শ্রমিক 250
৬.৩.৪ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শ্রমিক 251
৬.৩.৫ ডক/বন্দর শ্রমিক 252
৬.৪ শিল্পভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী 253
৬.৪.১ রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ কারখানা 253
৬.৪.২ জাহাজ ভাঙা শিল্প 255
৬.৪.৩ ক্ষুদ্র পাদুকা শিল্প শ্রমিক 257
৬.৪.৫ ফার্নিচার শ্রমিক 258
৬.৪.৬ পাথরভাঙা শ্রমিক 259
৬.৫ সেবাখাতভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী 260
৬.৫.১ রেলওয়ে শ্রমিক 260
৬.৫.২ নৌযান শ্রমিক 261

৬.৫.৩ পরিবহণ 261
৬.৫.৪ রিকসা/ব্যাটারি রিকসা-ইজিবাইক/ভ্যান চালক 262
৬.৫.৫ নির্মাণ শিল্প শ্রমিক 263
৬.৫.৬ বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত 265
৬.৫.৭ হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক 266
৬.৫.৮ গৃহ শ্রমিক 267
৬.৫.৯ পরিচর্যা কর্মী (কেয়ার ওয়াকার্স) 268
৬.৫.১০ বিউটি পার্লার কর্মী 270
৬.৫.১১ কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স শ্রমিক 271
৬.৫.১২ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কর্মী 272
৬.৬ পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী 272
৬.৬.১ সাংবাদিক/গণমাধ্যম কর্মী 272
৬.৬.২ মৎস্যজীবী ও জেলে শ্রম জনগোষ্ঠী 274
৬.৬.৩ হকার্স/শহর অঞ্চলে স্বনিয়োজিত শ্রম জনগোষ্ঠী 275
৬.৬.৪ মার্কেট/দোকান কর্মচারী 276
৬.৬.৫ দপ্তরি/প্রহরী 277
৬.৬.৭ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ/সেলস ও মার্কেটিং কর্মী 278
৬.৭ বিশেষ নিয়োগের ধরনের ভিত্তিতে শ্রমিক 279
৬.৭.১ আউটসোর্সিং শ্রমিক 279
৬.৭.২ রাইড শেয়ারিং/গিগ/প্লাটফর্ম ইকনোমির শ্রমিক 280
৬.৭.৩ গৃহভিত্তিক শ্রমিক 281

৭ বিশেষ প্রস্তাবনা 283
৭.১ শ্রম শক্তি জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা 283
৭.২ বাজেট বরাদ্দ 283
৭.৩ শ্বেতপত্র প্রস্তুত 283

সংযুক্তি 291
সংযুক্তি ১.৩.৩: দাবিনামা ও লিখিত মতামত প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা 291
সংযুক্তি ৪.৩: শ্রমিক, মালিক, পেশাজীবী, শ্রম ও মানবাধিকার সংগঠন ও শ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত শ্রমসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনা 294
সংযুক্তি ৪.৩: শ্রমিক, মালিক, পেশাজীবী, শ্রম ও মানবাধিকার সংগঠন ও শ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভার অংশগ্রহণকারীর তালিকা 394

কৃতজ্ঞতা

শ্রমিকের অধিকার এবং জীবনমান উন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন এবং এই কমিশনের দায়িত্ব প্রদানের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে কমিশন সদস্যগণের সার্বিক তত্বাবধান, গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী টিম, বিষয়ভিত্তিক টেকনিক্যাল টিম ও বিভিন্ন সংগঠন, ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সর্বোচ্চ অবদান এবং পরিশ্রমের ফসল এই প্রতিবেদন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা সেই সকল অংশীজনদের প্রতি, যারা তাদের মূল্যবান সময়, পরামর্শ, মতামত এবং সহায়তা দিয়ে প্রতিবেদন তৈরী সহ কমিশনের কাজকে সমৃদ্ধ করেছেন। শ্রমিক কর্মচারী ঐব্য পরিষদ সহ বিভিন্ন জাতীয়, সেক্টর ও প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠন, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন ও এর সদস্য সংগঠন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী, মানবাধিকার সংগঠন, গবেষক, শিক্ষক, আইনজীবী, পেশাজীবী এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সর্বাত্মক সহযোগিতায় আজ আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছি। প্রত্যেকের অবদান আমাদের কার্যক্রমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

এই প্রতিবেদন একটি দলগত এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফল। কমিশনটি গঠন থেকে শুরু করে মতবিনিময় সভা, অনুসন্ধান, গবেষণা এবং তথ্য সংগ্রহ সবগুলো পর্যায়ে অংশীদারদের মেধা, শ্রম এবং সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত হয়েছে। আমরা তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ, যাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা এবং পরামর্শে আজকের এই প্রতিবেদন পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে।

বিভিন্ন অংশীজনের সাথে অনুষ্ঠিত সভাগুলোর অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের গঠনমূলক আলোচনা এবং উপস্থিতি এই প্রতিবেদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কমিশনের সাথে বিভিন্ন অংশীজনের মোট ৬৫ টি মতবিনিময় সভা আয়োজিত হয়েছে। এর মধ্যে শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে ২১টি, বিভিন্ন মালিক সংগঠনসমূহের সাথে জেলা পর্যায়ে ৯টি, শ্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে ১০টি, পেশাজীবী জনগোষ্ঠীর সাথে কমিশন ঢাকা ও ঢাকার বাইরে মোট ২২টি এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী ও ব্রান্ড-বায়ারদের সাথে ৩টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কমিশন পরিচ্ছন্নতাকর্মী এবং গৃহকর্মীদের সাথে মতবিনিময়ের মাধ্যমে তার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করে। পেশাজীবী সংগঠনসমূহের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে কমিশন শ্রমিকদের সুবিধা এবং অধিকারের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিকনির্দেশনা পেয়েছে। কিছু উল্লেখযোগ্য পেশাজীবী সংগঠন, যারা কমিশনের সাথে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, হকার্স ফেডারেশন, বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ, ঢাকা রাইড-শেয়ারিং ড্রাইভার্স ইউনিয়ন, গৃহকর্মী, দপ্তরী কাম প্রহরী, বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত (পাদুকা, হালকা যানবাহন) শ্রমিক, রিক্সা ভ্যান চালক ইউনিয়ন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি, ইয়াং ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট ইউনিটি, টিভি ক্যামেরা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন, লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরাম, বিউট পার্লার শ্রমিক ইউনিয়ন প্রভৃতি। এই পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সহায়তায় কমিশন শ্রম আইন ও নীতিগত প্রস্তাবনা তৈরিতে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পেতে সক্ষম হয়েছে।

শ্রমিকদের সমস্যা, দাবি এবং সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে আলোচনার মাধ্যমে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির লক্ষ্যে কমিশন শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় সভা আয়োজন করেছে। এই সভাগুলোর মাধ্যমে সংগঠনগুলোর মূল্যবান মতামত এবং দাবি সংগ্রহ করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন, যারা এই সভাগুলোর মাধ্যমে কমিশনের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ) অন্তর্ভুক্ত এবং স্কপ বহির্ভুত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সমূহ, আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন- বাংলাদেশ কাউন্সিল (ITUC- BC), ন্যাশনাল কোওর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন (NCCWE), ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন- বাংলাদেশ কমিটি (WFTU- BC), বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, চা শ্রমিক ফেডারেশন, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট,বাংলাদেশ ব্যাংকস এমপ্লয়িজ ফেডারেশন, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার ফেডারেশন, গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি ও নৌ পরিবহণ শ্রমিক কেন্দ্র, জাতীয় সোয়েটার্স গার্মেন্টস ওয়ার্কারস ফেডারেশন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন, বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলন, পাহাড়ি শ্রমিক কল্যান ফোরাম, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন প্রভৃতি সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ। সংগঠনগুলো শ্রমিকদের সমস্যাগুলি তুলে ধরার মাধ্যমে আমাদের প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কমিশন বিভিন্ন মালিক সংগঠনসমূহের সাথে মতবিনিময় সভাও আয়োজন করেছে, যাতে মালিকদের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের অধিকার এবং মজুরি নিয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট হয়। জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে মালিক সংগঠনসমূহের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন- বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বাংলাদেশীয় চা সংসদ, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (FBCCI), চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স, বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এন্ড রিসাইকেলার্স এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফ্রি-ল্যান্সার ডেভলপমেন্ট সোস্যাইটি, প্রভৃতি সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ। মালিক সংগঠনগুলো শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার পাশাপাশি, দক্ষতা, উৎপাদনশীলতা, মজুরি এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে মতামত প্রদান করেছে, যা কমিশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়েছে।

কমিশন বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের সাথে মতবিনিময় করেছে, যারা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করেছে। কিছু উল্লেখযোগ্য মানবাধিকার সংগঠন, যারা কমিশনকে মূল্যবান মতামত প্রদান করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছে: ডোমেস্টিক ওয়ার্কার রাইটস নেটওয়ার্ক, কর্মজীবী নারী, নারী পক্ষ, অক্সফ্যাম, বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ, বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র, প্র্যাক্টিকাল একশন, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন, আফওয়া জোট, এডুকো, বাংলাদেশ বিজনেস এন্ড ডিজেবিলিটি নেটওয়ার্ক, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, খিয়াং আদিবাসী সাংস্কৃতিক সংগঠন, দিনের আলো হিজড়া সংঘ, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস ট্রাস্ট, বিলস প্রভৃতি। এই সংগঠনগুলোর সহায়তায় কমিশন শ্রমিকদের অধিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছে এবং শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

শ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ, বিভিন্ন জেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মতবিনিময় সভায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং কমিশনকে তার কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করতে সহযোগিতা করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- শ্রম অধিদপ্তর, হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট এন্ড ট্রেনিং (রংপুর), বিসিক জেলা কার্যালয় (রংপুর), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন, এবং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জনশক্তি ও কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ব্যুরো প্রভৃতি।

আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের মধ্যে ছিল ILO (International Labour Organization), FNV, 3F, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ActionAid Bangladesh, BRAC, ETI (Ethical Trading Initiative), USAID, RISE, US Embassy, Danish Embassy, Netherlands Embassy, Fair Wear Foundation, Care Bangladesh, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), International Trade Union Confederation, Water and Sanitation for the Urban Poor (WSUP), The Welfare Association for the Rights of Bangladeshi Emigrants (WARBE), লেদার ডেভলপমেন্ট ফোরাম, OSHE Foundation রিফিউজি এন্ড মাইগ্রেটারি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (RMMRU) সংযুক্ত সংগঠনসমূথ, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস (BAIRA) প্রভৃতি। এই সংস্থাগুলোর সাথে মতবিনিময় সভাগুলো কমিশনের কার্যক্রমকে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহযোগিতার মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করেছে।

এছাড়াও, বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং ব্যক্তিবর্গের সাথে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় কমিটির সদস্যগণ, স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশনের সদস্যগণ, নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশনের সদস্যগণ, লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশন-এর প্রতিনিধিগণ।

ডেনমার্কের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব পল নিরুপ রাসমুসেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত মান্যবর ক্রিস্টিয়ান ব্রিকস মোলার, অধ্যাপক আনু মোহাম্মদ, অধ্যাপক এম এম আকাশ, অধ্যাপক রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর, ড. রুশিদান ইসলাম রহমান, ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম, ড. ইয়ানাতুল ইসলাম, ড. হামিদা হোসেন, ড. মো: রিজওয়ানুল ইসলাম, শাহীন আনাম, ড. মোশাহিদা সুলতানা, এবং ড. দীনা সিদ্দিকী। তাদের উপস্থিতি, বিশেষজ্ঞ মতামত এবং সহযোগিতা কমিশনের কাজের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে, যারা শ্রম সংস্কার কমিশনের এই প্রতিবেদনের জন্য লিখিত সুপারিশ ও মতামত প্রদান করেছেন। তাদের মতামত ও পরামর্শ আমাদের সুপারিশসমূহ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মোট ১৬০টি সংগঠন কমিশনের নিকট তাদের দাবিনামা পেশ করেছে। যে সকল পেশাজীবী সংগঠন, শ্রমিক

সংগঠন, মালিক সংগঠন, মানবাধিকার সংগঠন, সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের মতামত ও সুপারিশ কমিশনের নিকট পেশ করেছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

বিভিন্ন সময়ে তথ্য, পরামর্শ, গবেষণা প্রদান করে কমিশনের কাযে সহায়তা করেছে Danish Trade Union Development Agency, The Netherlands trade Union Development Agency (FNV), Clean Cloth Campaign, Workers' Rights Consortium সহ প্রভৃতি সংগঠন।

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন সভার আয়োজনসহ সার্বিক সহায়তার জন্য বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, মৌলভীবাজার সার্কিট হাউজ, ডিসি অফিস সম্মেলন কক্ষ, নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও নিরাপত্তাকর্মীসহ- সকলকে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এবং সলিডারিটি সেন্টার কে, বিভিন্ন সময়ে সভার আয়োজনসহ বিভিন্ন সহযোগিতা প্রদানের জন্য। কমিশনকে তথ্য, উপাত্তসহ সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস ট্রাস্ট, অক্সফ্যাম, বিএনএসকে, ডোমেস্টিক ওয়ার্কার রাইটস নেটওয়ার্ক, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, IndustriAll, ETI Bangaladesh, WARBE, WSUP, ক্লিন ক্লথ ক্যাম্পেইন, ওয়ার্কারস রিসোর্স সেন্টারকে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি। সকলের সার্বিক সহযোগিতা ও বিভিন্ন সময়ে সভা আয়োজনে সহযোগিতার মাধ্যমে সভাগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে সহায়তা করেছেন।

প্রতিবেদন প্রস্তুতির জন্য আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই ড. জাকির হোসেন এর নেতৃত্বে গঠিত গবেষণা ও প্রতিবেদন কমিটির সদস্য- মোস্তাফিজ আহমেদ (জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়), ড. আফরোজা আখতার (গবেষক), মো: আওরঙ্গজেব আকন্দ (মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়), ড. মো. ছায়েম আলী খান, এবং ড. আয়েশা ইয়াসমিন - এর প্রতি, যাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলে এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়াও, প্রতিবেদনটি প্রস্তুতির জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই বিভিন্ন টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য- এডভোকেট বরকত আলী (ব্লাস্ট), এডভোকেট নজরুল ইসলাম (সলিডারিটি সেন্টার), রেজুওয়ানুল হক আজম (সলিডারিটি সেন্টার), সিকান্দার আলী মিনা (সেফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি), ইমতিয়াজ আহমেদ সজল, এডভোকেট তৌফিক ইমতিয়াজ (বিলস), আহসান হাবিব বুলবুল (সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট), খন্দকার শাফিন হাবিব শান (সলিডারিটি সেন্টার), ফাহমিনা মিশু কাশেম (জাতীয় শ্রমিক জোট), মো: সায়েদুজ্জামান মিঠু (বিলস), মেহেদী ইমাম, ড. ওয়াসেল বিন শাদাত (আইসোশ্যাল), সাদিক মাহমুদ (আইসোশ্যাল), সজীব দে (বিলস), প্রফেসর ড. হাসানাত ম আলমগীর (সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি), এ কে এম মাছুম উল আলম (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস), ড. মোহাম্মদ হায়াতুন নবী (নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি), খন্দকার আব্দুস সালাম (বিলস), মো: মোসফিকুর রহমান (গবেষক), মো: ওমর ফারুক (আলদি সি আর সার্পোট এশিয়া), সৈয়দ জেরিফ উদ্দিন আহমেদ (ইকো টপিয়া কনসালটেন্সি এন্ড সল্যুশনস), সিফাত চৌধুরী (বিলস), আফজাল কবির খান (এডুকো), কোহিনূর মাহমুদ (বিলস), সানজিদা সুলতানা (কর্মজীবী নারী) ,আদিবা আফরোজ (বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি), মৌসুমি নিশাত শিমুল (বিলস), তাকিয়া চৌধুরী (বিলস), তৃষিয়া নাশতারান (ফেমিনিস্ট অ্যালায়েন্স অফ বাংলাদেশ), আসিফ আইয়ুব (বিইএফ), মাজহারুল ইসলাম (আইএলও), সানজিদা খোশনূরসহ অন্যান্য সদস্যদের প্রতি, যারা গবেষণা, তথ্য বিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে নিরলসভাবে কাজ করেছেন। তাদের দায়িত্বশীলতা এবং পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই প্রতিবেদনটি একটি কার্যকরী দলিল হিসেবে রূপ নিয়েছে।

কমিশন সদস্যদের বাইরে বিভিন্ন সময়ে গবেষণা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের রেখেছেন ড. হাসান আশরাফ (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়), মহসিন আব্বাস (সিনিয়র সাংবাদিক), শামীম আহমেদ (বিলস), রেহনুমা সালাম খান (আইএলও), শরিফুল ইসলাম হাসান (ব্রাক), মো. মাসুদুর রহমান (বিইএফ), ড. নাজনিন নাহার (গবেষক), ড. মো আরিফুর রহমান (গবেষক), ড. মনসুর আহমেদ (গবেষক), মাইশা জামান (আইস্যোশাল), শ্রাবণী নাহার (ইন্ডাস্ট্রিঅল), রাইসুল ইসলাম খান (ইন্ডাস্ট্রিঅল), তাপস বড়ুয়া (ইটিআই বাংলাদেশ), আরিফা এস আলম (এফ ই এস), মো শাহিনুর রহমান (এফ এন ভি), এ কে এম আশরাফ উদ্দিন (বিএলএফ), মো বাবলুর রহমান (ফেয়ার ওয়্যার), প্রফেসর নাসির উদ্দিন (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়), শতাব্দী চৌধুরী (শিক্ষার্থী), জেসমিন জুই, রাজু আহমেদ, মুহাম্মাদ হাবিবুর রহমান (বিইএফ), মো. রফিকুল ইসলাম (বিজিএমইএ), মো. শরীফ হোসেন (বিকেএমইএ), মো. মাহাবুর রহমান (বিইএফ), মো. মাসুদার রহমান (বিইএফ), প্রণয় কুমার চক্রবর্তী (বিইএফ), মো. মোশাররেফ হোসেন (বিইএফ), আইস্যোশালের গবেষক সহযোগী দলের মিশু হাসান, মাহদিয়া মাহমুদ তাইমা, মুনযেলীন সারওয়ার, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শাহিনা খানম ও রাবেয়া খানম, প্রফেসর এম এইচ ফারুকি (বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ এন্ড সায়েন্সেস), বিলস এর ইন্টার্ন রওশন আরা তৃষা, তানজিনা আক্তার,

জান্নাতুল মাওয়া শশী, রাফিয়া ইসলাম, তান্নি সিকদার, ইমরান জিম, জুহি দেওয়ান, নাদিয়া সুলতানা, মো: ইমরান হোসেন, মো: আরমান হোসেন, তাসনিম আক্তার প্রমি, কানিজ ফাতেমা মেঘনা, ফাতেমা আরশি, ইন্সটিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো গবেষকবৃন্দ এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরাসহ অন্যান্যরা। এছাড়াও কমিশনের অনলাইন ও সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করেছেন আইসোশ্যাল এবং মো: শওকত হোসেন (জিরোওয়ান) এবং মাসুদ আহমেদ (কিউবিটটেক)। সকলের মূল্যবান সহায়তার জন্য কমিশন বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

আইএলও বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর টুমো পোটিআইনেন, লেবার এডিমিনিস্ট্রেশন এন্ড ওয়ার্কিং কন্ডিশন ক্লাস্টার এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার নিরান রামজুথান এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি কমিশনের বিভিন্ন টেকনিক্যাল টিমে প্রতিনিধি মনোনয়নসহ কমিশনকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য। আইএলও কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন টেকনিক্যাল টিমের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন- ছায়ানিচ থামপারিপত্র, খাদিজা খন্দকার, নাদা আরিধি, মো. জামিল আনসার, চৌধুরী আলবাব কাদির, বোরহান উদ্দিন, মারুফ কামাল, সৈয়দ সাদ হুসাইন জিলানি, নওশিন শাহ, তানজিলুত তাসনুবা, ফারজানা রেজা, মোহাম্মদ নাজমুল আভি হোসেন, সাইফ ইসলাম, মো. সাতিল মুনজূর আল মাহমুদ, মো. কামরুল হাসান, রুকশানা ইয়াসমিন আরজু, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, মীরা লোউমা, সৈয়দা মুনিরা সুলতানা এবং মো. সাইদুল ইসলাম।

এই দীর্ঘ অভিযাত্রায় গণমাধ্যম আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। তারা একদিকে শ্রমজীবী মানুষের কণ্ঠস্বর কমিশনের কাছে তুলে ধরেছেন, অপরদিকে কমিশনের কার্যক্রম সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করার জন্য মো: মোজাম্মেল হক (যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়), শফিকুল ইসলাম (সহকারী পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর), মাছুম বিল্লাহ (আইন কর্মকর্তা, কলকারখানা এবং প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর) কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের সার্বিক সহযোগিতা কমিশনের কাজকে সুসংগঠিত ও ফলপ্রসূ করতে সহায়তা করেছে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নূর জাহান আমিনা মুন কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি মতবিনিময় সভাগুলোর সমন্বয়, যোগাযোগ এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য। তার দায়িত্বশীলতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টা কমিশনের কার্যক্রম কে সুসংগঠিত ও কার্যকর করেছে।

বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই বিলস-এর সহায়তা কর্মী গণি মিয়া ও সাথী বেগম, ড্রাইভার মো: হালিম ফকির সায়েম এবং মো: টিপু শিকদার, শ্রম অধিদপ্তর এর অফিস-সহায়ক আব্দুর রহমান, নুরুন্নবী এবং ইমাম হাসান, বিইএফ এর অফিস সহায়ক গিয়াস উদ্দিন কে, যারা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এর মাধ্যমে কমিশন সকল প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিশ্চিত করেছেন। তাদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে আরও সফল করেছে।

মন্ত্রনালয় কর্তৃক প্রদত্ত সাচিবিক সহায়তার পাশাপাশি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (বিলস) কমিশনের সাচিবিক কার্যক্রম ও গবেষণা কার্যক্রমে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছে । দীর্ঘ পাঁচ মাস বিলস এর সকল কর্মী নিরলসভাবে কমিশনের কার্যক্রমকে সহায়তা করেছে। কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিতে টেকনিক্যাল টিম গঠন, দুইজন সার্বক্ষণিক কর্মী নিয়োগ, টেকনিক্যাল টিমকে সাপোর্ট প্রদানসহ সহকর্মীদের সর্বাত্মক সহযোগিতার জন্য বিলস এর পরিচালক কোহিনূর মাহমুদ এবং নাজমা ইয়াসমিনসহ সকল সহকর্মীকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই। তাদের এই অবদান কমিশনের কার্যক্রমকে কার্যকর ও গতিশীল করেছে।

এই বিশাল কর্মযজ্ঞে সবার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকলের নাম উল্লেখ করা সম্ভব না হলেও সকলের অবদান অমূল্য। কমিশনের কাজ বাস্তবায়নে যাদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা পেয়েছি, তাদের সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা। আমরা আশা করি, এই প্রতিবেদনটি বাস্তবায়ন হলে, দেশের শ্রমিক সমাজের কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমতাভিত্তিক শ্রম পরিবেশ গড়ে উঠবে। এবং সুষম শিল্প-সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে মানুষের জীবনমান ও জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

শব্দ সংক্ষেপ

ADR	অল্টারনেটিভ ডিসপিউট রেজোলিউশন
AI	আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স
BAIRA	বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস
BANBEIS	বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস
BBS	বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস
BEF	বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
BEPZA	বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি
BIDA	বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
BILS	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ
BLA	বাংলাদেশ লেবার অ্যাক্ট
BLR	বাংলাদেশ লেবার রুলস
BMET	ব্যুরো অব ম্যানপাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং
BNQF	বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক
BNSK	বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
BOESL	বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
BTEB	বাংলাদেশ টেকনিক্যাল এডুকেশন বোর্ড
CBA	কলেক্টিভ বার্গেইনিং অ্যাগ্রিমেন্ট/ এজেন্ট
CBLM	কমপিটেন্সি বেইজড লার্নিং মেটেরিয়ালস
CEDAW	কনভেনশন অন দ্য এলিমিনেশন অব অল ফর্মস অব ডিসক্রিমিনেশন অ্যাগেইনস্ট ওমেন
CRC	কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব দ্য চাইল্ড
CRPD	কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিজএবিলিটিজ
CSDDD	কর্পোরেট সাসটেইনাবিলিটি ডিউ ডিলিজেন্স ডিরেকটিভস
DEMO	ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড ম্যানপাওয়ার অফিস
DIFE	ডিপার্টমেন্ট অব ইনস্পেকশন ফর ফ্যাক্টরিজ অ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্টস
DoL	ডিপার্টমেন্ট অব লেবার
DWCP	ডিসেন্ট ওয়ার্ক কান্ট্রি প্রোগ্রামস
EIS	এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম
EOBI	এমপ্লয়িজ ওল্ড-এজ বেনিফিটস ইনস্টিটিউশন
EPZ	এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন
ESDO	ইকো-সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন
ESRM	এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড সোশ্যাল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট
ETI	এথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ
EU	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
FAO	ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন
GBVH	জেন্ডার-বেইজড ভায়োলেন্স অ্যান্ড হ্যারাসমেন্ট
GIZ	জার্মান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি
GoB	গভর্নমেন্ট অব বাংলাদেশ
GRM	গ্রিভেন্স রিড্রেসাল মেকানিজম
GRS	গ্রিভেন্স রিড্রেসাল সিস্টেম
GSI	গ্লোবাল স্লেভারি ইনডেক্স
GSP+	জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স প্লাস
HRDD	হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স
IBC	ইন্ডাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল
ICCPR	ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিকাল রাইটস
ICESCR	ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন ইকোনমিক, সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল রাইটস
ICLS	ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অব লেবার স্ট্যাটিস্টিশিয়ানস
ICT	ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি

ILO	ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন
IMT	ইন্সটিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি
IRI	ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইনস্টিটিউট
ISU	ইন্ডাস্ট্রিয়ল সেইফটি ইউনিট
ITPs	ইন্ডিজেনাস অ্যান্ড ট্রাইবাল পিপলস
LDC	লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রি
LEED	লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ডিজাইন
LFS	লেবার ফোর্স সার্ভে
LIMA	লেবার ইনস্পেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন
LIMS	লেবার ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
MoLE	মিনিস্ট্রি অব লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট
NAP	ন্যাশনাল অ্যাকশন প্ল্যান
NEET	নট ইন এমপ্লয়মেন্ট, এডুকেশন, অর ট্রেনিং
NEP	ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট পলিসি
NID	ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড
NIPSOM	ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব প্রিভেনটিভ অ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন
NOSHTRI	ন্যাশনাল অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট
NSDA	ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
NSDP	ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট পলিসি
OECD	অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
OMS	ওপেন মার্কেট সেল
OSH	অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ
OSHA	অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
PPE	পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইকুইপমেন্ট
PPP	পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ
QWRS	কোয়ার্টারলি ওয়েজ রেট সার্ভে
RBC	রেসপন্সিবল বিজনেস কনডাক্ট
RMG	রেডিমেড গার্মেন্টস
SCDDA	সাপ্লাই চেইন ডিউ ডিলিজেন্স অ্যাক্ট
SDGs	সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস
SEZ	স্পেশাল ইকোনমিক জোন
SOP	স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর
STEM	সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, অ্যান্ড ম্যাথেমেটিকস
TCC	ট্রাইপার্টাইট কনসালটেটিভ কাউন্সিল
TTC	টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার
TVET	টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং
UDHR	ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অব হিউম্যান রাইটস
UNCRPD	ইউনাইটেড নেশন্স কনভেনশন অন দ্য রাইটস অব পারসন্স উইথ ডিজএবিলিটিজ
UNGC	ইউনাইটেড নেশনস গ্লোবাল কমপ্যাক্ট
UNGPs	ইউনাইটেড নেশন্স গাইডিং প্রিন্সিপলস অন বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস
WARBE	ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য রাইটস অব বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্টস
WEF	ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম
WHO	ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন
WRI	ওয়েজ রেট ইনডেক্স
WSUP	ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশন ফর দ্য আরবান পুওর
WWA	ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন
WWF	ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার ফান্ড

প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ

সংবিধান নির্দেশিত বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি মেহনতী শ্রমজীবী মানুষের সকল প্রকার শোষণ মুক্তি। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার সুনিশ্চিত হবে। আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, ২৪ এর জুলাইয়ের রক্ত ঝড়া ছাত্র শ্রমিক জনতার গনআভুত্থানের মূল আকাংখা হচ্ছে একটি বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি মর্যাদাকর স্থানে প্রতিষ্ঠা করা। এই জনআকাংখাকে ধারণ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার শ্রমিক অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ গঠন করেন 'শ্রম সংস্কার কমিশন'। স্বাধীনতার ৫৪ বছরে ইতিহাসে প্রথম গঠিত এই কমিশন মনে করে, বাংলাদেশের শ্রম জগতে বিরাজমান বৈষম্য মোকাবেলায় শ্রম, শ্রমিক ও তাঁর অধিকার ভিত্তিক কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বিবেচনায় না রেখে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব না।

শ্রমজীবীর নাগরিক অধিকার, জীবন-জীবিকার মর্যাদা, সমঅধিকার, প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন ও বৈষম্য বিরোধী সুযোগ নিশ্চিতের লক্ষ্যে শতাধিক অংশীজনের সাথে মত বিনিময়ে সমন্বতি হয়েছে এই সুপারিশ। কমিশন মনে করে, বাংলাদেশে শ্রমিকের অধিকার ও মঙ্গল নিশ্চিতকরণে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে কর্মসংস্থান, শিল্পের উতপাদনশীলতা-বিকাশ এবং গণতান্ত্রিক রূপান্তরের সাথে। তাই এটি শুধু শ্রমিকের নয় সমগ্র দেশ ও দশের স্বার্থেই জরুরি। শ্রমিকের অধিকার বাংলাদেশের সাংবিধানিক অধিকারের অংশ। তেমনি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থায় সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে শ্রমমানের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এদেশের অঙ্গীকারের অংশ। এর জন্য রাষ্ট্রের নীতি-আইন প্রণয়ণ, পরিকল্পনা গ্রহণ-বাস্তবায়ন, সর্বজনীনতা ও অন্তর্ভূক্তিমূলক নীতির অনুসরণ অন্যতম প্রয়োজনীয় কাজ। লক্ষ্যভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিকের অধিকার, শিল্প বিকাশ ও উন্নয়নের সুফলে শ্রমিকের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতের মাধ্যমেই বৈষম্যহীন-মর্যাদাকর বাংলাদেশ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে কমিশন অভিমত প্রকাশ করছে।

সমন্বিত মতের ভিত্তিতে তৈরি সুপারিশের আলোকে বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের অধিকারসমূহ আইন দ্বারা সুরক্ষিত ও বাস্তবায়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় ভূমিকা নিতে কমিশন সুপারিশ করছে। একইসাথে সুপারিশ করছে কার্যকর বাস্তবায়নে আইনানুগ স্বীকৃতি, কাঠামোগত উন্নয়ন ও লঙ্ঘন প্রতিকারে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রকে ভূমিকা নিতে। এ লক্ষ্যে, কমিশনের সামগ্রিক সুপারিশের মূল দিকগুলো নিচে তুলে ধরা হলো। মূলদিকগুলোর পরে উপস্থাপিত হয়েছে কমিশনের প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ এবং সামগ্রিক প্রতিবেদন।

১) প্রস্তাবনার সামগ্রিক প্রতিফলন

১.১ **সকল শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা ও স্বীকৃতি:** প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, গৃহ ভিত্তিক, অভিবাসী, স্বনিয়োজিত শ্রমিক সহ সকল শ্রমিকের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক শ্রম আইনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

এই লক্ষ্যে, কাজের স্বীকৃতি ও পরিচয়পত্র নিরবচ্ছিন্ন কাজ এবং আয়ের নিশ্চয়তা, মর্যাদাকর-শোভন কর্ম পরিবেশ, চাকরির অপ্রাতিষ্ঠানিকরণ, অস্থায়ী ও এজেন্সি নির্ভর নিয়োগের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

ক) নিজের ও পরিবারের মর্যাদাকর জীবনযাপন উপযোগী ন্যায্য মজুরি (লিভিং ওয়েজ), উন্নয়নে ন্যায্য অংশীদারিত্ব ও হিস্যা প্রাপ্তির অধিকার;

খ) প্রত্যেকের জন্য নিরাপদ কাজ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, দুর্ঘটনায় যথাযথ ক্ষতিপূরণ এবং নিজের ও পরিবারের সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার;

গ) প্রত্যেকেরই অবসর, কর্মঅক্ষমতা, অসুস্থতা, মাতৃত্বকালীন সময় বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থায় সামাজিক নিরাপত্তা প্রাপ্তি এবং কোনও না কোনও সামাজিক নিরাপত্তা স্কিমে অন্তর্ভুক্তি;

ঘ) প্রত্যেকের অধিকার সুরক্ষা ও ন্যায্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সংগঠিত হওয়া, সমষ্টিগতভাবে প্রতিনিধিত্ব করার ও অধিকার লংঘণে অভিযোগ জানানো, প্রতিকার ও ন্যায়বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা;

এই অধিকারসমূহ নিশ্চিতকরণে, সরকার কর্তৃক দেশের সংবিধান, আইএলও কনভেনশন ও কর্মক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা ও অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা, শোভন কাজের মানদন্ড এবং মানবাধিকার ও ব্যবসার সাথে

সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতার আলোকে, যথাযথ ত্রিপক্ষীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে বর্তমান শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় এবং মৌলিক সংস্কার অথবা একাধিক আইন প্রণয়ন করা, এবং কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.২ **মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় এবং খাতভিত্তিক মজুরি নিশ্চিতকরণ:** শ্রমিক ও তার পরিবারের মর্যাদাকর জীবনযাপন উপযোগী মজুরির অধিকার নিশ্চিতে জাতীয় ন্যুনতম মজুরি নির্ধারণ মানদণ্ড স্থির করা এবং জাতীয় ন্যুনতম মজুরি ঘোষণা করা হবে। একইসাথে মজুরি নির্ধারণ পদ্ধতি উন্নয়ন, বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কাঠামোগত সংস্কারে স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করা। জাতীয় ও খাত ভিত্তিক মজুরি ৩ বছর পর পর মূল্যায়নের মাধ্যমে বৃদ্ধি এবং মর্যাদাপূর্ণ মানদন্ড নির্ধারণ।

১.৩ **নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করণ:** শ্রমিকের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার আইনি অধিকার নিশ্চিত করবে। খাত ও পেশাভিত্তিক সুনির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা তৈরী করবে। দুর্ঘটনায় বা অবহেলাজনিত নিহত-আহত ও ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণ মানদন্ড পূণর্মূল্যায়ন করা। একইসাথে মর্যাদাপূর্ণ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতে মানদণ্ড ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করা।

১.৪ **শ্রমিক সহ শ্রমশক্তি নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্যভান্ডার গঠন:** অপ্রাতিষ্ঠানিকখাত, স্বনিয়োজিতসহ সকল শ্রমিকদের পেশাগত ও আইনি সুরক্ষা ও সামাজিক নিশ্চিতে রাষ্ট্র শ্রমিকের স্বীকৃতি, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেয়া। এ লক্ষ্যে সরকার জরুরি ভিত্তিতে 'জাতীয় শ্রমশক্তি নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্য ভান্ডার' গড়ে তোলা।

১.৫ **সংগঠন, দরকষাকষি অধিকার:** সংগঠিত হবার অধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্র কর্তৃক মত প্রকাশের স্বাধীনতার সাংবিধানিক অঙ্গীকারকে কার্যকর করা। ট্রেড ইউনিয়ন শর্ত শিথিল করে সংগঠন করার অধিকার বিস্তৃত করা। দরকষাকষির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছ ও জবাদিহিমূলক কাঠামো নিশ্চিত করা।

১.৬ **জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করণ :** শ্রম মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা-সমন্বয় জোরদারে সরকারি (শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রম শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়াতন আইআরআই, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ ইত্যাকার সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠানসহ সর্বত্র জবাবদিহিতা, গণতান্ত্রিক চর্চা, স্বচ্ছতা ও তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় সংস্কার করা।

১.৭ **স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন :** জবাবদিহিমূলক শ্রম প্রশাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতের লক্ষ্যে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন প্রয়োজন। স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠনের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে অবিলম্বে শ্রম মন্ত্রালয়ের উদ্যোগে একটি 'জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম' গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ।

১.৮ **কর্মসংস্থান ও দক্ষতাবৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ:** দেশে বিরাজমান বেকারত্ব রোধ, দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের প্রসারে কার্যকরী উদ্যোগ রাষ্ট্র গ্রহণ করবে। একইসাথে অ্যাটোমেশন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এবং উদ্ভূত সুযোগ কাজে লাগাতে দক্ষ জনগোষ্ঠি তৈরীর স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পথনকশা তৈরী করার উদ্যোগ নিবে, এক্ষেত্রে শ্রমের যথাযথ ব্যবহার, উৎপাদনশীল যুব শ্রমশক্তি ও উদ্যোক্তা তৈরীতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া।

১.৯ **সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা:** সকল শ্রমিকের সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার প্রাপ্তির (কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, মৃত্যু, কর্মঅক্ষমতা, অসুস্থতা-অবসর,মাতৃত্বকালীন সুবিধা বা যেকোনো প্রতিকূল অবস্থা) সুযোগ নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ। শ্রমিকদের সমস্যার ভিন্নতা ভিত্তিতে কোনও না কোনও নিরাপত্তা স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করা

এবং এক্ষেত্রে আইএলও এর জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির প্রবর্তন, সামাজিক বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১.১০ **সম-অধিকার নিশ্চিত ও সহিংসতা ও বৈষম্য দুরীকরণ**: নারী-পুরুষ, অন্যান্য লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী ভেদে মজুরি, ট্রেড ইউনিয়ন, সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াসহ শ্রমখাতের সর্বত্র বৈষম্য নয় সম–অধিকার নিশ্চিতে কার্যক্রম গ্রহণ করবে রাষ্ট্র। আর, পাহাড়ে-সমতলে আদিবাসী ও বহুজাতির জনগোষ্ঠীর শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হবে।

১.১১ **যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা প্রতিরোধ:** যৌন হয়রানিসহ সকল ধরনের হয়রানি ও সহিংসতা থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিতে রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২০০৯ হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সকল কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতা বিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। একইসাথে অভিযোগ সেল ও নিস্পত্তি কমিটি গঠন করা জরুরি। আইএলও ১৯০ কনভেনশন অনুসমর্থন করা।

১.১২ **সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা :** সকল নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন ছুটি সবেতনে ৬ মাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে রাষ্ট্র। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারের সহায়তা প্রদান ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ স্কীম প্রণয়ন করা।

১.১৩ **শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধ ও নিরাপত্তা:** শিশু-কিশোর ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বন্ধে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আগাম দাদন দেয়াসহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে জবরদস্তিমূলক সকল পথ বন্ধ করায় কার্যকর ব্যবস্তা নেয়া।

১.১৪ **সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক ও সামাজিক সংলাপ চর্চা**: সুসমন্বিত-সৌহার্দ্যপূর্ণ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে শ্রমিক-নিয়োগকারী সহ সকল পক্ষের দায়িত্বশীল আচরণ এবং কার্যকর সংলাপের কাঠামো ও প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

১.১৫ **সুষ্ঠু শ্রম আদালত, ন্যায় বিচার ও বিকল্প বিরোধ নিস্পতির ব্যবস্থা :** শ্রমিকের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির জন্য শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, মামলা দ্রুত নিস্পত্তি ও অযথা হয়রানি বন্ধে সরকারের উদ্যোগ নেয়া। আইনের অধিকার লঙ্ঘন প্রতিকারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও কাঠামো নিশ্চিত করা। বিরোধ নিস্পত্তি ও আইনানুগ প্রাপ্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত কোন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ ও বলপ্রয়োগ বন্ধ করা। বিভিন্ন সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে যে সকল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী ও শ্রমিকের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা হয়েছে তা দ্রুত পর্যালোচনা সাপেক্ষে বাতিল করা।

১.১৬ **মর্যাদাপূর্ণ-হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ ও আদালতে বাংলাভাষার প্রচলন করা:** মর্যাদাপূর্ণ শ্রমপরিবেশের সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শ্রেণী, লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি ভেদে অবমানাকর ও অমর্যাদাকার ক্ষমতা কেন্দ্রিক ভাষার ব্যবহার রোধ করা। শ্রম আইনে 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে নারী ব্যবহার করা। কর্মপরিবেশে শ্রেণীক্ষমতায় তুই-তুমি সম্বোধন চর্চা বন্ধ করা। শ্রম আদালতের শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল থেকে হাইকোর্ট ও অ্যাপিলেট ডিভিশন পর্যন্ত সর্বত্র বাংলা ভাষার প্রচলন করা।

১.১৭ **সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রতিনিধিত্বে নারী-পুরুষ শ্রমিকের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ:** শ্রমসংশ্লিষ্ট নীতি, বাৎসরিক বাজেট এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০ অর্জনসহ ও বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ-বাস্তবায়নে নারী-পুরুষ উভয় শ্রমিক ও তার প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; এবং জাতীয় সংসদসহ সকল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে/ ফোরামে সংঘবদ্ধ শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতে সরকারের নীতি প্রণয়ন।

১.১৮ **আপদকালীন তহবিল গড়ে তোলা ও বিদ্যমান তহবিলের স্বচ্ছতা:** দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী, ব্যবসায় আকস্মিক সংকটের কারণে শ্রমিকের মজুরি ও অন্যান্য প্রাপ্তি লাভ ও উৎপাদন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সরকার জরুরি ও আপদকালীন তহবিল গঠন করা। এছাড়া শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয় তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

১.১৯ **শ্রমিক ইতিহাস-ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা ও স্মৃতিসৌধ গঠন:** শ্রমিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা, স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর গঠনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ। পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা কোর্স ও মিডিয়ায় শ্রমের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও শ্রমিকের জীবন গাঁথা মর্যাদাপূর্ণভাবে উত্থাপন।

১.২০ **শহীদ স্বীকৃতি, পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও ন্যায় বিচার:** চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও শ্রমিক আন্দোলনে নিহত সকল শ্রমিককে রাষ্ট্র কর্তৃক শহীদের স্বীকৃতি প্রদান। এছাড়া শ্রমখাতে দুর্ঘটনা বা অবহেলাজনিত নিহতদের ক্ষতিপূরণ ও আহতদের পুর্নবাসন, চিকিৎসার জন্য রাষ্ট্রীয় যথাযথ নীতি গ্রহণ। একইসাথে রানাপ্লাজা, তাজরিন গার্মেন্টস, এবং হাসেম ফুডসহ উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে দায়ীদের দ্রুত বিচার ও শাস্তির আওতায় আনা।

১.২১ **টেকসই শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন:** জাতীয় শিল্পের বিকাশ, শিল্পায়ন ও টেকসই ও শ্রমঘণ শিল্প প্রতিষ্ঠা, উদ্যোক্তা গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক ও পরিকল্পিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সামাজিক ব্যবসার প্রতিষ্ঠাকে উৎসাহিত করবে রাষ্ট্র। এ লক্ষ্য আন্তমন্ত্রনালয় টাস্ক ফোর্স গঠন, এবং শিল্প , দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত সমন্বয় কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

১.২২ **শিল্পাঞ্চল ও শ্রমঘন এলাকায় নাগরিক সুবিধা নিশ্চত করা:** শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য শিল্পাঞ্চলে নাগরিক সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করা। বিশেষ করে এই সুবিধা (শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যবীমা, সেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, গ্যাস বিদ্যুৎ-পানির যথাযথ সরবরাহ ও অন্যান্য) যাতে শ্রমজীবী মানুষের জন্য পরিচালিত হয় তার উদ্যোগ গ্রহণ, যা সার্বিকভাবে একটি কল্যাণ রাষ্ট্র ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

১.২৩ **জলবায়ু ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিবেচনায় কর্মপরিবেশ গঠন:** জলবায়ু ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিবেচনায় শ্রম পরিবেশ গড়ে তোলায় সরকার ভূমিকা নেবে। এ সংক্রান্ত দেশীয় পরিবেশ বাস্তবতা এবং আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা পরিপালনে মনোযোগী হওয়া।

১.২৪ **অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা:** সকল অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত ও অভিবাসন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে অভিবাসী শ্রমিকের স্বীকৃতি, সংগঠিত হওয়া এবং প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিশ্চিত করা। একইসাথে দেশীয়-আন্তর্জাতিক সম্পর্ক জোরদার করা।

১.২৫ **শ্রম বিষয়ক গবেষণা ও জরিপ:** শ্রম শক্তি জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার কর্তৃক আলাদা বিভাগ গঠন করা।

২) প্রস্তাবনার সারসংক্ষেপ

২.১ কাজ ও পেশার স্বীকৃতি, কাজের অধিকার, সুযোগ, দক্ষতা, স্থায়িত্ব এবং নিশ্চয়তা

শ্রম আইনের সর্বজনীন প্রযোজ্যতা ও শ্রমিকের স্বীকৃতি

ক) বাংলাদেশের সকল শ্রমিক—যে কোনো শিল্প, খাত, বিশেষায়িত শ্রম অঞ্চল, , কাজের ধরন নির্বিশেষে, প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত—সমানভাবে শ্রম আইনের সুরক্ষার আওতায় আসবে। এই লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যমান শ্রম আইনের ব্যাপক সংস্কার অথবা নতুন ও সমন্বিত এক বা একাধিক শ্রম আইন প্রণয়ন করা।

গ) শ্রম আইনের সর্বাত্মক সংস্কারের ক্ষেত্রে "মালিক" শব্দের পরিবর্তে "নিয়োগকারী" শব্দ ব্যবহার করা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পদবি নির্ধারণের স্বাধীনতা থাকবে, তবে পদবির পার্থক্যের কারণে কেউ শ্রমিকের সুরক্ষার বাইরে থাকবে না।

ঘ) "শ্রমিক" শব্দের সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত করা এবং "নিয়োগকারী" শব্দের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা। "নিয়োগকারী" বলতে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হবে, যিনি কর্মী নিয়োগ, চাকরিচ্যুতি এবং চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণে চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখেন। এই সংজ্ঞার বাইরে থাকা সকল প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা সকল ব্যক্তি কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন। নিয়োগকারী ব্যতিত সকলের ক্ষেত্রেই শ্রম আইন প্রযোজ্য হবে, এবং শ্রম আইনের অধীনে প্রযোজ্য আইনগত অধিকার ও সুরক্ষার আওতায় আসবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বনিয়োজিত ব্যক্তিরাও "শ্রমিক" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঘ) শ্রম আইনের সর্বজনীন প্রযোজ্যতা ও শ্রমিকের স্বীকৃতি বিশেষ অঞ্চল ভিত্তিক (ইপিজেড, এসইজেড) শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত করা।

ঙ) সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বিধান রাখা যেন 'শ্রমিক' এর সংজ্ঞা সম্প্রসারণের কারণে নতুন ভাবে আওতাভুক্ত ব্যক্তিগণের আর্থিক প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক বিধান করা যায়।

শ্রমিকের চাকরির আইনগত সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা

ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সব ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র অথবা কাজে নিয়োজিত করার প্রমাণপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করা হবে। যদি লে-অফ ১৫ দিনের বেশি হয় তাহলে লে-অফ চলাকালে শ্রমিকদের প্রতিদিন কর্মস্থলে হাজির হওয়ার বাধ্যবাধকতার শর্ত বাতিল করা এবং লে-অফ চলাকালে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

খ) প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিধান সংশোধন করে নিশ্চিত করা যে, অবৈধ ধর্মঘটে জড়িত না থাকা শ্রমিকরা মজুরি বা লে-অফ ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হবে না। শ্রমিকরা যদি মজুরি না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়, তবে সেটাকে অবৈধ ধর্মঘট হিসেবে গণ্য না করা। আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যে, নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি না পাওয়ার কারণে কাজ বন্ধ রাখা কোনোভাবেই আইনবহির্ভূত নয়, এবং অনুরুপ কারণে তাদের কোনো সুবিধা কাটছাঁট না করা।

গ) অসুস্থতার ছুটি গ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা দূর করা এবং অসুস্থতা ছুটি ০২ দিনের বেশি না হলে চিকিৎসা সনদ দাখিলের প্রয়োজন হবে না মর্মে শ্রম আইনে বিধান যুক্ত করা।

ঘ) অসদাচরণ সংক্রান্ত তদন্তের বিদ্যমান ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছেনা বিধায় এ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক ও নিয়োগকারী উভয়ই যেন প্রয়োজনে তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করতে পারে সে জন্য শ্রম আইনের পর্যলোচনা করে একটি কার্করর ব্যবস্থার বিধান রাখা।

ঙ) অসুস্থতা বা স্বাস্থ্যগত কারণে ডিসচার্জের ক্ষেত্রে চাকরি অবসানের ন্যায় (termination) শ্রমিকদের চার মাসের মজুরি প্রদান করা এবং প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী বন্ধের কারণে চাকরির অবসানের ক্ষেত্রে চার মাসের নোটিশ/নোটিস পে প্রদান করা।

চ) যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (সিবিএ ইউনিয়ন) এর কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষেকে শ্রম আইনের ২৬ ধারায় টার্মিনেট করা যাবে না মর্মে আইন সংশোধন করা।

জাতীয় শ্রমশক্তি নিবন্ধন সিস্টেম ও জাতীয় শ্রম তথ্য ভাণ্ডার

ক) শ্রমের স্বীকৃতি: বাংলাদেশের সকল শ্রমিকের স্বীকৃতি, ও তাদের পেশা, দক্ষতা ও কাজের পরিচিতি নিশ্চিতকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের কর্মী/শ্রমিক, শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারী ও বেকার সকলের নিবন্ধনপূর্বক একটি সর্বজনীন জাতীয় ডিজিটাল শ্রম নিবন্ধন সিস্টেম ও তথ্য ভাণ্ডার চালু করা হবে।

খ) তথ্যভাণ্ডারের সর্বজনীনতা: তথ্য ভান্ডারে আলাদাভাবে যাঁদের চিহ্নিত করা যাবে: ক) প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক (নিবন্ধিত কর্মী, বেতনভুক্ত পেশাজীবী); খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক (দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক, গৃহকর্মী, গিগ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক); গ) অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং স্বনির্ভর শ্রমিক; ঘ) প্রবাসী শ্রমিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত শ্রমিক; ঙ) প্রতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের কর্মী/শ্রমিক; চ) শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারী নাগরিক; এবং ছ) বেকার।

গ) অন্যান্য তথ্যভাণ্ডারের সাথে সংযুক্তিকরণ (Interoperability): জাতীয় শ্রম তথ্যভান্ডারের সঙ্গে জাতীয় পরিচয় পত্র তথ্য ভান্ডার, জাতীয় দক্ষতা তথ্যভাণ্ডার সহ অন্যান্য পরিপূরক তথ্য ভান্ডারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন (interoperability) করা, যেন যেকোন কর্মী/ নাগরিক দেশের যেকোন স্থান থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারেন।

ঘ) ডিজিটাল ও বিকেন্দ্রীভূত প্রবেশাধিকার: প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের শ্রমিকদের জন্য একটি জাতীয় ডিজিটাল শ্রম নিবন্ধন, ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও তথ্য ভাণ্ডার স্থাপন করা হবে, যা অনলাইনসহ বহুমাধ্যমিক নিবন্ধন, তথ্য হালনাগাদ, কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তার তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং গবেষণার জন্য উপযুক্ত হবে।

ঙ) স্থায়ী শ্রম কমিশনের সিদ্ধান্ত ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে, প্রস্তাবিত 'সামাজিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক কল্যাণ অধিদপ্তর'-এর তত্ত্বাবধানে একটি দক্ষ টিম গঠন এবং নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে জাতীয় শ্রম নিবন্ধন ও তথ্যভাণ্ডার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে আলোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধন করা হবে।

চ) নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক নিবন্ধন: বাধ্যতামূলক নিবন্ধন ও ডিজিটাল শ্রম ব্যবস্থাপনা চালু করা হবে, যেখানে নিয়োগকর্তাদের শ্রমিক নিবন্ধন, অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য মোবাইল কেন্দ্রের মাধ্যমে স্ব-নিবন্ধন এবং শ্রম পরিদর্শকদের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

আউটসোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

ক) সরকারি দপ্তর এবং সংস্থাগুলিতে স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং ভিত্তিক নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা। যারা ইতোমধ্যে স্থায়ী ধরনের কাজে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিযুক্ত আছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে নিয়োগের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

খ) স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ না করার বিদ্যমান আইনি বিধান কার্যকর করা।

গ) এটি নিশ্চিত করা হবে যে আউটসোর্সিং বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ যেন কখনও শ্রমিকদের আইনি অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার উপায় হিসেবে ব্যবহার না করা হয়; এবং তাদের মজুরি, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য অধিকার স্থায়ী শ্রমিকদের সমমানের হয়।

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কাজের অধিকার ও শোভন কাজের নিশ্চয়তা

ক) কর্মসংস্থান সৃষ্টির অগ্রাধিকার ও কর্ম পরিকল্পনাঃ শোভন, মর্যাদাপূর্ণ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে সরকার অগ্রাধিকার বিবেচনা করবে। এ লক্ষ্যে কর্মসংস্থান দশক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, সম্ভাবনাময় খাত চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

খ) কর্মসংস্থান সংক্রান্ত নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ সক্রিয় শ্রম বাজার নীতি (Active labour market policy) অনুসরণ করার লক্ষ্যে এবং বর্তমান শ্রম বাজার ও ভবিষ্যতের শ্রম জগতের পরিবর্তন, সম্ভাবনা, চাহিদা ও প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি, ২০২২ ব্যাপক সংশোধন ও নিয়মিত হালনাগাদ করা হবে।

গ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় "কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তর" স্থাপন করা হবে। বেকার ও শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারীবৃন্দের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ, মজুরী শ্রম ও স্বকর্মসংস্থানকে সমান গুরুত্ব দেয়া,

কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নির্ধারিত উইং স্থাপন করা এবং একটি শক্তিশালী আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা।

ঘ) কর্ম সৃজন প্রণোদনাঃ শ্রম ঘন উদ্যোগ কে উৎসাহিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান করা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কর্মসংস্থান কে সরকারি পর্যায়ে উদ্বুদ্ধ করতে নীতি সহায়তা প্রদান ইত্যাদিকে গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য পরিকল্পনায় দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য যথাযথ প্রণোদনা রোডম্যাপ প্রণয়ন করে কাঙ্ক্ষিত মাত্রার কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আহরণ নিশ্চিত করা।

ঙ) স্বকর্মসংস্থান: স্বকর্মসংস্থানের জন্য উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কার্যকর ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র চালু, মেন্টরশিপ এবং কমন ফ্যাসিলিটি চালু করা। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি খাতকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করা হবে, যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, নারী ও বেকার যুবসম্প্রদায়সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা হবে। সার্বিক বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হবে।

চ) বেকারত্বকালীন সুরক্ষা ও প্রশিক্ষণঃ সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে শ্রম বাজারে প্রবেশের ছয় মাসের মধ্যে চাকরি না পেলে কাজের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষানবীশ ভাতা চালু করা। বেকার শ্রমিক নতুন চাকরি না পাওয়া অবধি রি-স্কিলিং (পুনর্দক্ষতা) ও আপ-স্কিলিং (উচ্চতর দক্ষতা) এর উদ্যোগ গ্রহণ করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেকার ভাতা চালু করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবে।

ছ) সকল শিল্প, খাত, বিশেষায়িত শ্রম অঞ্চল, কর্মসংস্থানের ধরন, প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে আইন অনুযায়ী ৮ ঘণ্টা কাজের সময় কার্যকর করা।

জ) পুনর্বাসন পরিকল্পনার আওতায় বিকল্প কর্মসংস্থান নিশ্চিত না করে আইন প্রয়োগের প্রয়োজনে জীবিকার উপকরণ যেমন মাছ ধরার জাল, ব্যাটারি চালিত রিক্সা, ফুটপাতের দোকান, ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বিনষ্ট না করার বিধান চালু করা।

দক্ষতা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা ও টেকসই ব্যবসা

ক) কর্ম পরিকল্পনা ও সমন্বিত উদ্যোগঃ দেশের জনশক্তিকে দক্ষ ও উৎপাদনশীল কর্মী বাহিনীতে রূপান্তরিত করতে সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়া হবে, নিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার সম্প্রসারণের জন্য (Mutual Recognition Agreement) এমআরএ চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে, এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা পূরণের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করে বৈষম্য কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

খ) নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারঃ শ্রম বাজারের গতি প্রবণতা (dynamics) অনুযায়ী চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে একটি ছাতার নীচে নিয়ে আসা হবে এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এপেক্স বডির সাথে যৌথভাবে কারিকুলামসহ অবকাঠামো, দক্ষ প্রশিক্ষক সৃষ্টি করা হবে। সরকার প্রত্যন্ত প্রশাসনিক জেলাগুলিতে "কর্মসংস্থান কেন্দ্র" (ইসি) স্থাপন করবে যেখানে কেন্দ্রগুলি নিয়োগকর্তা এবং সম্ভাব্য কর্মচারীদের মধ্যে একটি সেতু হিসেবে কাজ করবে। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান নীতি নির্ধারণী ও বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানগুলির ম্যান্ডেট ও কাজের মধ্যে সমন্বয় আনার জন্য বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা।

গ) শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবীশ এবং বেকারত্বের সুরক্ষাঃ শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশকারী তরুণদের জন্য বিদ্যমান নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিকল্পিত শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবীশ কর্মসূচী চালু করা, এ লক্ষ্যে একটি জাতীয় তহবিল গঠন করা হবে। সম্ভাবনাময় নতুন পেশা চিহ্নিত করে বিশেষায়িত দক্ষতা সৃষ্টিকারী খাতগুলো চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত নীতি সহায়তা প্রদান এবং এই খাতগুলোর জন্য দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা।

ঘ) আর্থিক বরাদ্দঃ জাতীয় বাজেটে শিক্ষা বাজেটের অধীনে উপখাত হিসেবে অথবা আলাদা খাত হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনা ও সাফল্যের পথে উত্তরণ

ক) আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট খাতে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

খ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য, প্রধান প্রযুক্তিসমূহ যেমন- AI, রোবোটিকস, এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি, ক্লাউড কম্পিউটিং, থ্রিডি প্রিন্টিং, বায়ো টেকনোলজি খাতের শ্রমিকদেরকে প্রস্তুত করতে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করা এবং এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক শ্রমবাজার ও উদীয়মান শিল্পের চাহিদার সঙ্গে বেসরকারি খাতের সমন্বয় সাধন।

গ) বিদ্যমান শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল (Indsutry Skills Council) গুলিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি অগ্রাধিকার শিল্পগুলিতে (স্বাস্থ্য, জৈবপ্রযুক্তি, শক্তির বিকল্প উৎস, রোবোটিক্স এবং অটোমেশন সহ) নতুন শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা।

ঘ) শ্রম অসন্তোষ মোকাবিলায় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিয়ানের পরিকল্পনার আলোকে সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যৌথভাবে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের জন্য সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন, সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত খাতের শ্রমিকদের পুনর্বাসন ইত্যাদিসহ নিয়োগ পরিকল্পনা নিরূপণ করা।

ঙ) প্রযুক্তি নির্ভর স্টার্টআপ ও উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা ভিত্তিক ও বিশ্ববিদ্যালয়য় কেন্দ্রিক ১০০ টি ইনোভেশন এবং উদ্যোগ হাব (Innovation and Entrepreneurship Hub) তৈরি করা যা শোভন কর্মসংস্থানে ভূমিকা রাখবে।

আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং সুষম নগরায়ন

ক) পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোতে টেকসই এবং শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট নীতির ভিত্তিতে শ্রমঘন শিল্প ও বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া।

খ) শ্রমের বিকেন্দ্রীকরণ ও অভ্যন্তরীণ অভিবাসী সমস্যার সমাধানে পরিকল্পিত শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ ও নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা।

কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান

ক) কৃষিতে মজুরি বা অন্য কোনভাবে যারা অন্যের জমিতে শ্রম দেয়, তাদেরকে কৃষিশ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করা।

খ) কৃষি শ্রমিকদের শ্রম আইনে বিদ্যমান কোনো ধরনের শর্ত ব্যতীত শ্রম আইনের সুরক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) কৃষিশ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকারঃ ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও জাতীয়ভিত্তিক ইউনিয়ন ও ফেডারেশন করার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান সন্নিবেশ করা

ঘ) কমিশনের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ইউনিয়ন করার সুপারিশ বিবেচনায়, প্রতি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ১০০জন কৃষিশ্রমিক একত্রিত হয়ে সংগঠন করা এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও দরকষাকষি করার অধিকার নিশ্চিত করা।

ঙ) মজুরি, প্রাপ্য এসব বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালত যাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে তার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ব্যর্থ হলে কৃষিশ্রমিকদের শ্রম আইন ১২৪ক অনুযায়ী শ্রম পরিদর্শকের কাছে যাওয়ার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

চ) কৃষিশ্রমিকদের পেশাগত, বিশেষ করে রাসায়নিক ও কিটনাশক ব্যবহারের কারণে অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

ছ) কৃষিশ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কৃষিশ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত, বিশেষ করে সামাজিক বীমায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

জ) বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ, উৎপাদনশীলতার ঘাটতির প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিম্নমুখী প্রবনতার বাস্তবতায় শ্রমঘন শিল্পসমূহকে চিহ্নিত করে শিল্পে কর্মসংস্থান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

ঝ) শিল্পে এবং পণ্যে বৈচিত্র্য এনে এবং নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার জাতীয় পরিকল্পনায় কর্ম সংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া । রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্প, বিশেষ উন্নয়নমুলক শিল্পে, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পসমুহের তালিকা পুনর্মুল্যায়ন করে নতুন তালিকা প্রনয়ণ করা।

ঞ) পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী পরিবার ভিত্তিক, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞার সংস্কার করে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণের মাধ্যমে নানামূখী প্রতিবন্ধকতা দূর করা।

ট) টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তির আহরণ, বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং তদানুযায়ী শ্রমিকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ানো।

অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ভিত্তিক কর্মসংস্থান

ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণঃ একক নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করে অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী, স্পষ্ট এবং পূর্বানুমেয় কর কাঠামো প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক একটি দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যেখানে সিএমএসএমই-র সংখ্যা কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা, জিডিপিতে সিএমএসএমই-র অংশীদারিত্বের অনুপাত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হবে এবং উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক বরাদ্দ দেয়া।

গ) স্থানীয় পণ্যের ক্লাস্টার ভিত্তিক উদ্যোগে নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়া।

ঘ) অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্যের ডিজাইন, প্যাকেজিং, মার্কেটিং, পণ্যের বাজার অনুসন্ধান, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ, ব্রান্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের সাথে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঙ) গৃহভিত্তিক ও পারিবারিক শিল্পকে সুরক্ষার জন্য বিশেষ প্রকল্প হাতে নেয়া এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে রক্ষার জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করা।

চ) অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দের ঋণ প্রবাহ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃ অর্থায়নের পাশাপাশি ব্যাংকের ঋণ প্রক্রিয়া খরচে ভর্তুকি দেয়ার উদ্যোগ নেয়া।

শিক্ষাধীনতা

ক) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষাধীনতা কর্মসূচি চালু করা হবে। শিক্ষাগত কারিকুলাম শিল্পের বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রস্তুত করে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এবং নিয়মিত ফিডব্যাকের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) অনানুষ্ঠানিক খাতের শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবীশের অতীত সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে এন এস ডি এ-র অধীনে অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য পৃথক কর্মসূচী চালু করা।

গ) শিক্ষাধীনতা কর্মসূচি চালুকারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লেভী সুযোগ প্রদান করা হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলিকে (এস. এম. ই) এই শিক্ষাধীনতা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে আর্থিক প্রণোদনা চালু করা।

ঘ) শ্রম বাজারে প্রবেশের আগে এবং পরে শ্রমশক্তির জন্য ব্যপক ক্যারিয়ার সহয়তা কর্মসূচী চালু করা, যার আওতায় ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় সহায়তার পাশাপাশি শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবীশ কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা।

২.২ মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা

সার্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি এবং খাত, অঞ্চল ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি

ক) সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি

বাংলাদেশের সকল শ্রমিকের জন্য একটি জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা, যা প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক, সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানে নিয়জিত এবং ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণের ন্যূনতম মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে। সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি জীবনী মজুরি/বেতনের (living wage) ধারণাকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা নিয়ে প্রতি তিন বছর পরপর মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার মান বিবেচনায় মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণ করা। মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ বিশেষভাবে বিবেচ্য হবে।

খ) সেক্টর/খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি

জাতীয় ন্যূনতম মজুরিকে ভিত্তি ধরে কাজের প্রকৃতি, খাতভিত্তিক চাহিদা, ঝুঁকি এবং অঞ্চলভেদে বিশেষ খাত ও পেশার জন্য পৃথক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা, যা কোনোভাবেই জাতীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হবে না; বরং তা সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হবে। বিশেষ খাত ও পেশার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি যদি জাতীয় ন্যূনতম মজুরির নিচে হয়, তবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় ন্যূনতম মজুরির পর্যায়ে উন্নীত হবে।

গ) যৌথ দরকষাকষি

যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে বিশেষ খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আইনগত যৌথ দরকষাকষির অধিকার বহাল রাখা। যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি জাতীয় বা খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হতে পারবে না।

ঘ) মজুরি নির্ধারণে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

শ্রম, শ্রম অর্থনীতি ও মজুরি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠন করা, যার আওতায় সরকারি পে কমিশন, মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন এবং সংবাদপত্র ওয়েজ বোর্ড অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যাতে একক কমিশনের মাধ্যমে দেশে সকল মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। আবার খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে স্থায়ী কমিশনের অধীনে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করা হবে। কমিশনের কাঠামো, কার্যপরিধি ও বিধানাবলি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজনীয় আইন সংস্কার করা ও এ সংক্রান্ত সংস্করণ হালনাগাদ করতে অংশীজনদের সঙ্গে নিয়মিত সংলাপ আয়োজন করা।

ঙ) মজুরি বৈষম্য নিরসন

মজুরি কাঠামোয় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে পার্থক্য দূর করে ভারসাম্য নিশ্চিত করার পাশাপাশি সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে মজুরি বৈষম্য কমানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। মজুরি পরিশোধে লিঙ্গ বৈষম্য, শারিরিক প্রতিবন্ধকতা ও জাতিগত বিভাজন পরিহার আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা। বৈষম্য নিরোসনে জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে শ্রমিকের সঙ্গতিপূর্ণ সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড ও মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি

ক) মজুরি কাঠামো মানদণ্ড

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে পরিবারে একক উপার্জনকারীকে বিবেচনায় নিয়ে এমন পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে, যাতে শ্রমিক তার পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারেন। মোট মজুরিতে মূল বেতনসহ বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ও যোগাযোগ ভাতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে এবং খাদ্য, পরিবহণ, শিক্ষা ভাতা ও রেশন সুবিধা কাঠামোর বাইরে রাখা হবে।

খ) মানদণ্ডভিত্তিক জাতীয় মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি ও উপাত্ত

সর্বজনীন জীবনধারণ উপযোগী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে শ্রমিক পরিবারের মাসিক খাদ্য ব্যয়, খাদ্যবহির্ভূত ব্যয় (যেমন বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক ও বিনোদন) এবং ন্যূনতম মাসিক সঞ্চয় বিবেচনায় নেয়া।

প্রোডাকশন লক্ষ্যমাত্রা যৌক্তিকীকরণ ও পিসরেট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও পিস প্রতি মজুরি নির্ধারণ

প্রযোজ্য শিল্পে কারখানা/প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে নিয়োগকারী ও শ্রমিক পক্ষ এবং টাইম-স্টাডি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় শ্রমিকের জন্য 'সর্বোচ্চ অথবা সর্বনিম্ন দৈনিক পিস তৈরির লক্ষ্যমাত্রা' এবং মজুরি নির্ধারণ করা।

মজুরি বৃদ্ধির হার ও মজুরি পরিশোধ প্রক্রিয়া

বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে গড় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। মজুরি বৃদ্ধির হার নির্ধারণের জন্য আইএলও'র গৃহীত দলিল "Meeting of experts on wage policies, including living wages" অনুসরণ করা যেতে পারে।. সকল মজুরি ও ভাতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক করা।

শ্রমিকদের অর্জিত প্রাপ্য

মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য দুই বছরের চাকরির শর্ত বাতিল করে একবছর করা। বরখাস্তের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার বিধান বাতিল করে শ্রমিকদের পূর্ববর্তী চাকরির ভিত্তিতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বা গ্রাচ্যুইটি ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা। শ্রমিকদের চাকরি যেভাবেই শেষ হোক না কেন, সবার জন্য গ্র্যাচুইটি বা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আইনি নিশ্চয়তা রাখা।

বাধ্যতামূলক তহবিল ও আপদকালীন মজুরি বিমা

ক) মজুরি নিয়মিত রাখতে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় ক্যাশ ফ্লো ঠিক রাখার জন্য ব্যবস্থাসমূহ, যেমন—ব্যাংক ওভারড্রাফট, বাধ্যতামূলক আপদকালীন তহবিল (তিন মাসের মোট বেতন/মজুরির সমপরিমাণ) এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একই সাথে দেউলিয়া আইনে সংশোধন করে শ্রমিকদের পাওনা প্রথমে পরিশোধের বিধান নিশ্চিত করা।

খ) রপ্তানিমুখি শিল্পের সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার একটি আপদকালীন তহবিল গঠন করবে, যেখানে নিয়োগকারী কারখানা/প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ২ মাসের মজুরি/বেতনের সমপরিমাণ টাকা উক্ত তহবিলে জমা রাখবে। এই তহবিল প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকারী, সরকার ও উক্ত শিল্পের মালিকদের এসোসিয়েশন (যদি থাকে) এর যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। তবে কোনো কারণে নিয়োগকারীর অবর্তমানে সরকার জরুরি পরিস্থিতিতে নিজস্বভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

গ) জাতীয় মজুরি নিশ্চয়তা বীমা স্কীম চালু করা, যাতে করে কোন প্রতিষ্ঠান মজুরী প্রদানে ব্যর্থ হলে, কোন শ্রমিক ছাঁটাই হলে, পুনরায় কম বেতনে নিযুক্ত হলে, এই বীমার আওতায় তা পরিশোধ করা যায়।

জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা

মজুরি পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে অনলাইনে জমা বাধ্যতামূলক করা এবং মজুরি সংক্রান্ত শ্রম আইন বাস্তবায়নে স্থানীয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা নিশ্চিত করা। মজুরি প্রদান বকেয়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে যৌক্তিক সময়কাল পূর্বেই তা শ্রমিক ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে লিখিতভাবে জানাতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখের সাতদিন আগে বিলম্বের বিষয়ে শ্রমিককে অবহিত করতে হবে। ডাইফি এর মধ্যস্থতায় শ্রমিক ও নিয়োগকারীদের প্রতিনিধির মতামতের ভিত্তিতে মজুরি প্রদানের তারিখ নির্ধারিত হবে এবং পুনর্নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মজুরি প্রদান করা না হলে উক্ত তারিখের পর হতে নির্দিষ্ট ০.৫% হারে ক্ষতিপূরণ (সর্বোচ্চ ৩০ দিনের জন্য) দিতে হবে।

সম্পদবৈষম্য ও ন্যায্য হিস্যা

শ্রমিকদের (উপকারভোগী) মুনাফা ভাগের বিদ্যমান বিধান বহাল রাখা এবং তা সকল শ্রেণির শ্রমিকের—যারা বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত এবং যেগুলি লাভজনকভাবে পরিচালিত হয়—মধ্যে সম্প্রসারিত করা, এবং এক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত প্রাপ্য নিশ্চিত করা। সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান করা।

শিল্পায়ন ও ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ

জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং টেকসই এন্টারপ্রাইজ বিকাশের কাঠামোগত বাধা চিহ্নিত করে নীতিগত পরিবেশের মূল্যায়ন, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে রূপান্তর ও সামাজিক সংলাপ শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে অর্থনীতির ডিজিটাল ও সবুজ রূপান্তর ঘটানোর উদ্যোগ নেয়া। খাতভিত্তিক পর্যায়ে ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, নীতিমালা প্রণয়ন ও সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা। প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ব্যবস্থাপনার উন্নতি, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন, টেকসই উৎপাদন, কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের আনুষ্ঠানিকীকরণ এবং শ্রমিকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। শিল্পায়ন ও ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে উচ্চ উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কর কাঠামোর সংস্কার করা, ব্যবসা নিবন্ধন এবং পরিচালনায় জটিল ও বহুমাত্রিক অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা, সাপ্লাই চেইনের অদক্ষতা দূর করতে ডিজিটাল পদ্ধতি চালু করা, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে মালিক ও শ্রমিক উভয় পক্ষের প্রতি ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণ করা, এবং নিয়োগকারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা।

২.৩ নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা

সবার জন্য নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি করার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাঠামো ও নীতিমালা সার্বজনীন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং হালনাগাদ করা

বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধন করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংজ্ঞা ও বিধান আধুনিকায়ন, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করে সুরক্ষা ও ঝুঁকি ভাতা নিশ্চিত, সেইফটি কমিটি গঠন ও প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা। কৃষিশ্রমিকদের আইনি কাঠামোয় অন্তর্ভুক্তি, আধুনিক চ্যালেঞ্জ (AI, ডিজিটাল, অতিমারী, জলবায়ু পরিবর্তন) মোকাবেলায় নীতিমালা হালনাগাদ, জাতীয় শিল্প-স্বাস্থ্য-সেইফটি কাউন্সিল কার্যকরকরণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক পৃথক আইন ও কর্তৃপক্ষ গঠন করা। ILO কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষরের মাধ্যমে শ্রমিকদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

শ্রম আইন ও শ্রম পরিদর্শন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা

শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে, টাস্ক ফোর্স গঠন, সমন্বিত পরিদর্শন কাঠামো চালু, সেক্টরভিত্তিক চেকলিস্ট প্রণয়ন ও হালনাগাদ, এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রধান বয়লার পরিদর্শককে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে এনে যৌথ পরিদর্শন কার্যক্রম চালু করা। একই সঙ্গে রোগ-ব্যাধি ও দুর্ঘটনার প্রতিবেদন নিয়মিত প্রকাশ, কলকারখানা অধিদপ্তরসহ মালিক ও ট্রেড ইউনিয়নে OSH ইউনিট গঠন এবং সেইফটি কমিটির কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ওপর জোর দেওয়া। এছাড়া শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর সংশোধিত বিধি ৭৫ কার্যকর করতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রেখে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারির করা।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, আপদ চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশগত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একক ও সেক্টরভিত্তিক জাতীয় মানদণ্ড প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য সরকার, মালিক, শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা। প্রতিটি কারখানায় সেইফটি ব্যবস্থাপনা নীতি ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম চালুর পাশাপাশি নিয়মিত মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রদানের ওপর গুরুত্ব দেয়া। রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত ঝুঁকি, এবং বিপজ্জনক কাজের হালনাগাদ তালিকা চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শনের জন্য সরকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নির্ধারণ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় একটি গাইডলাইন তৈরি করা। পাশাপাশি, সেক্টরভিত্তিক মানদণ্ড বাস্তবায়নে SOP তৈরি করা।

পেশাগত রোগ ও ব্যাধি নির্ণয়, রিপোর্ট করার প্রক্রিয়া ও ক্ষতিপূরণ

শ্রম আইনে পেশাগত রোগ-ব্যাধির তালিকা আধুনিক প্রযুক্তি ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রেক্ষাপটে হালনাগাদ করে কোভিডসহ নতুন সংক্রামক রোগ অন্তর্ভুক্ত করা। মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, অতিরিক্ত শ্রমঘণ্টাজনিত রোগ এবং নারী শ্রমিকদের কাউন্সেলিং সুবিধা আইনে সংযোজন করা। রোগ শনাক্ত ও প্রতিবেদন প্রক্রিয়া সহজতর করা। পাশাপাশি, চিকিৎসকদের কারিকুলামে পেশাগত স্বাস্থ্য সংযুক্ত, নিপসম ও শিল্পাঞ্চলভিত্তিক বিশেষায়িত ল্যাব ও ক্লিনিক স্থাপন, তথ্যভাণ্ডার গঠন, শ্রমঘন এলাকাগুলোতে হেলথ ক্যাম্প চালু, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র আধুনিকীকরণ ও মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে আইনি কাঠামোতে যুক্ত করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের জন্য এলাকা ভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৫০০০-এর কম শ্রমিক কর্মরত আছে এমন কারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে শিল্প এলাকায় ক্লাস্টারভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। ৫০০০ ও তদূর্ধ্ব শ্রমিক কর্মরত আছে এমন কারখানায় শ্রম আইনের বিদ্যমান বিধান কার্যকর হবে।

দুর্ঘটনা এবং অভিযোগ করার প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন:

ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি ও মানদণ্ড নির্ধারণসহ শ্রম আইনে সংশ্লিষ্ট ধারা হালনাগাদ করে পঙ্গুত্ববরণকারী ও অক্ষম শ্রমিকদের পুনর্বাসন ও সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা। বর্তমান ক্ষতিপূরনের পরিমাণ বৃদ্ধি করে একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা, এবং একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আইএলও কনভেনশন ১২১ ও হাইকোর্ট এর নির্দেশনা

অনুযায়ী ক্ষতিপূরনের মানদন্ড নির্ধারণ করা। ক্ষতিপূরনের মামলা দায়ের উৎসাহিত করতে কোর্ট ফি রদ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। দুর্ঘটনায় নিহত ও আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসা, হেলথ কার্ড এবং বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা, ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা ও একটি কেন্দ্রীভূত তথ্যভাণ্ডার গঠন করে তা হালনাগাদ ও প্রকাশের ব্যবস্থা করা। এছাড়া নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন, বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ, বিস্ফোরক ও বয়লার পরিদর্শনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, জাহাজভাঙা শিল্পে সমন্বিত পরিদর্শন এবং জেলে, নির্মাণ শ্রমিক ও ব্রজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের শ্রম আইনের আওতায় এনে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকরণ এবং কর্মস্থলে যাতায়াতকালে দুর্ঘটনার বিষয়টি আইনে অন্তর্ভুক্ত করে ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার গ্রহণ করা ও বিমার আওতায় ক্ষতিপূরণের বিধান শ্রম আইনে অন্তর্ভূক্ত করা।

শ্রমিকের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকবান্ধব হাসপাতাল বা স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসা সুবিধা ও ন্যায্য মূল্যে ওষুধ সরবরাহ, শ্রমিকদের ইন্সুরেন্সের আওতায় আনা ও কার্ড প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত করা। শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে পরিবর্তন এনে ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে কর্মরত সকল শ্রমিকদের জন্য বছরে একবার এবং অন্যান্য শিল্পের জন্য ২/৩ বছরে অন্তত: একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধান যুক্ত করা। বিপজ্জনক কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য ঝুঁকি নিরূপণ, আপদ চিহ্নিতকরণ এবং পিপিই ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, তথ্য সংরক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার গঠন করার পাশাপাশি মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে পাঠ্যক্রমে এই বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি কারিকুলাম চূড়ান্তকরণ কমিটি গঠন করা। শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনে যুগোপযোগী পাঠ্যক্রম ও পৃথক প্রশিক্ষণ চালু, সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তকরণ, NOSHTRI-এর অধীনে নিয়মিত গবেষণা, উচ্চতর শিক্ষা (মাস্টার্স, ডিপ্লোমা), শিল্প-কারখানার মধ্যম সারির ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ, টিটিসির কারিকুলামে বিষয়টি যুক্তকরণ এবং শিক্ষা কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও হালনাগাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলি বিশেষ পেশা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের জন্য প্রযোজ্য এবং বাস্তবায়নে প্রকল্প

"ঝুঁকিপূর্ণ" ও "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গোষ্ঠী"সহ আউটসোর্সিং, সেলুন, বিউটি পার্লার, ক্ষুদ্র পাদুকা শিল্প, পেশাদার গাড়িচালক, বেসরকারি গণপরিবহনের চালক, ব্যক্তিগত গাড়িচালক, অটোচালক, সিএনজি চালক, ভ্যান ও রিক্সাচালক, বর্জ্য সংগ্রহকারী ও ইলেক্ট্রনিক্স বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তিসহ কার্যকর নির্দেশনা ও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা। এছাড়া, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ, দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রকল্প গ্রহণ করা। অভিবাসি শ্রমিকদের বিদেশগমনের পূর্বে গন্তব্য দেশের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা আইনসম্বলিত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা। পেশাদার ও বেসরকারি পরিবহন চালকসহ অটো, সিএনজি, রিক্সা চালকদের জন্য হাসপাতাল, হেলথ কার্ড, টার্মিনাল ক্লিনিক ও দুর্ঘটনা মোকাবিলায় তহবিল গঠনের পাশাপাশি সরকার, মালিক, শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নের সমন্বয়ে একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২.৪ সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

সকল শ্রমিকের জন্য 'জীবন-চক্র ভিত্তিক' সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা

ক) নীতি কাঠামো: শ্রমিকদের কর্মজীবন, অবসরকাল ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করতে 'অধিকার ও জীবন-চক্র ভিত্তিক' সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এ লক্ষ্যে সকল শ্রমিকের (প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত, কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত) জন্য একটি সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা ও একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল গঠন করা, যেখানে নিয়োগকারী, সরকার ও শ্রমিকরা যৌথভাবে অবদান রাখবে।

খ) সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ কর্মসূচির আওতা: এই আইনের কাঠামোর আওতায় সর্বজনীন জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক বিমা/সুরক্ষা কর্মসূচি, সার্বজনীন মাতৃত্ব সুরক্ষা ও কল্যাণ, আকস্মিক কর্মহীনতা সুরক্ষা এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা

সুবিধা প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত, কৃষি, প্রবাসী, ফ্রিল্যান্সারসহ গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীসহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের জন্য নিশ্চিত করা।

গ) প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য সুবিধা: এই নীতিমালায় শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা এবং সুবিধাগুলি নিশ্চিত করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাধ্যতামূলক করা যেখানে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ঐচ্ছিক থাকবে। কর্মস্থল পরিবর্তন হলে শ্রমিকরা তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড স্থানান্তর করতে পারবেন। জাতীয় পেনশন স্কিমের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে শ্রমিক-বান্ধব স্কীম চালু করা, এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/কারখানারকে সরকার কর্তৃক বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা। কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে এবং আকস্মিক কর্মহীনতার জন্য কিছু সময় পর্যন্ত ভাতা প্রদান করা হবে। এছাড়া সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করা হবে, যার আওতায় ন্যূনতম ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও পূর্ণ বেতন, ডে কেয়ার সুবিধা এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে বৈষম্যমুক্ত কর্মস্থল নিশ্চিত করা হবে।

ঘ) অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্প শ্রমিকদের জন্য সুবিধা: অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প শ্রমিকদের জন্য বিশেষ পেনশন স্কিম চালু করা, যা বিমা সুবিধার আওতায় থাকবে এবং শ্রমিকের আয় অনুসারে কন্ট্রিবিউটরি, নন-কন্ট্রিবিউটরি বা ভলান্টারি হতে পারে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রান্তিক শ্রমিকদের পেনশনের চাঁদা সরকার ও নিয়োগকারী যৌথভাবে বহন করবে। এ সকল শ্রমিকের জন্য পৃথক বিমা কর্মসূচি প্রণয়ন করা, যেখানে কর্মক্ষমতা হারালে আর্থিক সহায়তা, চিকিৎসা সেবা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। শ্রমিকদেরকে আকস্মিক কর্মহীনতার জন্য একটি সময়সীমা পর্যন্ত ভাতা প্রদান করা এবং ন্যূনতম ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও পূর্ণ বেতন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা, যা সরকারি সহায়তা ও নিয়োগকারীর যৌথ তহবিলের মাধ্যমে ব্যবস্থা করা যাবে।

ঙ) ফ্রিল্যান্সারসহ গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সুরক্ষা: ফ্রিল্যান্সারসহ গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সুরক্ষার জন্য গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের শ্রম আইন ও বিধিবিধানের আওতায় আনা, যাতে তারা সামাজিক সুরক্ষা, মজুরি সুরক্ষা ও শ্রম অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারেন।

চ) অভিবাসী শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা: বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে পেনশন, বিমা ও পুনর্বাসন সুবিধা।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ও সুরক্ষা

ক) বর্তমান ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপ্রতুল বিধায়, ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা, এবং একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আইএলও কনভেনশন ১২১ ও হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

খ) দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার পর শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা ও দীর্ঘমেয়াদি ভাতা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী ও দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের জন্য আজীবন চিকিৎসা, ভরণপোষণ এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা প্রদান।

গ) সকল খাত এবং সকল শ্রমিকের জন্য দুর্ঘটনা বিমা/এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম বাধ্যতামূলক করা এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করা।

ঘ) দুর্ঘটনায় মৃত অথবা আহত হয়ে কর্মক্ষমতা হারানো শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যতদিন না তারা উপার্জনক্ষম হয়। এ সকল শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের জন্য চাকরি প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি প্রণয়ন।

ঙ) শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিলের জন্য ডিজিটাল আবেদন পদ্ধতি চালু করা এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য ত্রিপক্ষীয় নিরীক্ষা ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা। কল্যাণ সুবিধার আওতা বৃদ্ধি করে সব খাতের শ্রমিককে (প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত, গিগ/অ্যাপবেজড কর্মী) অন্তর্ভুক্ত করা এবং শ্রমিকদের পরিবারের জন্য সহায়তার পরিধি বৃদ্ধি করে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন সংশোধন করা।

বেকারত্ব ও আকস্মিক কর্মহীনতা থেকে সুরক্ষা

ক) ১০০ দিনের কর্মসূচির মতো উদ্যোগ গ্রহণ, যা মৌসুমি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময়েও কাজের সুযোগ ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, যাতে মৌসুমি শ্রমিকদের

জন্য টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যায়। আধুনিক তথ্যব্যবস্থা (কমিশন প্রস্তাবিত তথ্য ভাণ্ডার) ব্যবহার করে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজ ও কার্যকর করা।

খ) শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যরেখে মৌসুমি শ্রমিকদের কর্মমুখি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনঃকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দেয়া এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনকে অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করা। দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং দক্ষ শ্রমিকদের জন্য কাজের সুযোগ বৃদ্ধি ও বেকারদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যালোচনা করতে বিশেষ নজরদারি ও মূল্যায়ন সেল গঠন।

গ) জাতীয় বাজেটে মৌসুমি ও বেকার শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে মৌসুমি শ্রমিকদের তালিকা প্রস্তুত ও নিয়মিত হালনাগাদ করা। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও এনজিওদের একত্রিত করে কর্মসংস্থান উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা।

ঘ) প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে বিশেষ তহবিল গঠন।

ঙ) কমিশন প্রস্তাবিত সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করে বেকারত্ব ভাতা/'আন-এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট স্কিম' চালু করা এবং এ লক্ষ্যে একটি তহবিল গঠন করা, যার মাধ্যমে বেকারত্বের সময় শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। তহবিল গঠনে নিয়োগকারী, শ্রমিক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নের ব্যবস্থা এবং বাজেটে বরাদ্দ রাখা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তর' বেকারত্ব ভাতা পরিচালনা করবে।

মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও কল্যাণ

ক) যে কোন শ্রমিকের ন্যূনতম ৬ মাসের মজুরিসহ সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, ও স্ব-নিয়োজিত শ্রমিকের জন্য নিয়োগকারীর পাশাপাশি, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয় তহবিল এবং অন্যান্য সামাজিক সহায়তার মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার একটি কাঠামো তৈরি করা।

খ) পিতৃত্বকালীন ছুটির জন্য আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ছুটির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

গ) নারী শ্রমিকের গর্ভকালীন সময় ও সন্তান জন্মদান পরবর্তী সময়ের জন্য নমনীয় কাজের পরিবেশ ও সহায়তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে মাতৃত্বকালীন ছুটির অতিরিক্ত ঐচ্ছিক দুই বছরের ছুটি (বিনা বেতনে), অতিরিক্ত কাজ থেকে অব্যাহতি, নমনীয় কাজের সময়সূচি এবং কাজের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্রামের সুযোগ প্রবর্তন করা।

অবসরকালীন ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষা

ক) ন্যাশনাল পেনশন স্কীমের আওতায় সরকার কর্তৃক চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিক বান্ধব পেনশন স্কীম চালুকরা। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট ন্যূনতম পেনশন সুবিধা নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য সরকারি সহায়তা প্রদান করা।

খ) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড বাধ্যতামূলক রেখে শ্রমিকের জন্য এই ফান্ডে অবদান ঐচ্ছিক হিসেবে বিধান করা। ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ও কেন্দ্রীভূত পেনশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শ্রমিকদের সহজেই অন্তর্ভুক্তি এবং পেনশন দাবি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা।

গ) পেনশন ব্যবস্থাপনা ও আবেদন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে শ্রমিকদের তথ্য আপডেট, পেনশনের চাঁদা জমা এবং দাবি করার প্রক্রিয়া সহজ করা। পেনশন তহবিল ব্যবস্থাপনা ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা মনিটর করার জন্য একটি মনিটরিং ইউনিট গঠন করা এবং অনিয়ম রোধে ত্রিপক্ষীয় নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঘ) শ্রমিকদের অবসরকালীন বিনোদন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রণয়ন করা এবং সরকারি সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে/শিল্পাঞ্চলে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা।

শ্রমিকের পরিবার ও সন্তানের সুরক্ষা

ক) শিল্পাঞ্চল এবং গ্রামীণ এলাকায় ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পর্যায়ে 'রেশন শপ' সুবিধা চালু করা। শ্রমিকদের জন্য 'কার্ডভিত্তিক রেশনিং' ব্যবস্থা চালু করা, যাতে তারা ন্যায্য মূল্যে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পেতে পারেন। এছাড়া মজুরির সঙ্গে ভর্তুকি ভিত্তিক খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা।

খ) রেশনিং ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত কারখানা ও শিল্পঘন এলাকাভিত্তিক 'ওএমএস'-এর মাধ্যমে পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

গ) নিম্ন আয়ের শ্রমিক পরিবারের সন্তানের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির নীতি প্রণয়ন ও বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিত করা। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শ্রমিক পরিবারের সন্তানের জন্য বৃত্তির সুবিধা বাড়ানো ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীকে সাধারণ শ্রমিক পরিবার থেকে নেওয়া এবং তাদের শিক্ষার ব্যয় সরকার ও স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা।

ঘ) শ্রমিকের সন্তানদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করা, যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।

ডে কেয়ার সুবিধা

ক) সকল কর্মস্থলে/অঞ্চলভিত্তিক ডে-কেয়ার ব্যবস্থা চালুর বিধান নিশ্চিত করা এবং এ লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা। কারখানা/প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ডে-কেয়ারের পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল ও শ্রমিকের বসবাসের এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি-ভিত্তিক ডে-কেয়ার কেন্দ্র স্থাপন।

খ) ডে-কেয়ার সমূহের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয়, এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করা।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

ক) শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করা এবং তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা, সঠিক পরামর্শ এবং সেবা নিশ্চিত করা। শ্রমিকের প্রয়োজন বিবেচনায় হাসপাতালসমূহে বিনামূল্যে সান্ধ্যকালীন সেবা চালু করা।

খ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য 'শ্রমিক স্বাস্থ্য কার্ড' চালু করা, যা তাদের স্বাস্থ্য তথ্য ও প্রাপ্য সুবিধাদি গ্রহণে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, ২৪ ঘণ্টা 'টোল ফ্রি' টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা, যাতে শ্রমিকেরা যে কোনো সময় স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতে পারেন, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে।

গ) শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা। এই সেবার মধ্যে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

ঘ) শ্রমিকদের জন্য "স্বাস্থ্য সঞ্চয় প্রকল্প" চালু করা, যাতে তারা তাদের ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সঞ্চয় করতে পারেন। এছাড়া সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যবিমা চালু করা, যার মাধ্যমে শ্রমিকরা কম খরচে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা লাভ করতে পারবেন।

প্রতিবন্ধী শ্রমিক সুরক্ষা

ক) শ্রম আইনে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা। যেমন, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান সংযোজন; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চেকলিস্টে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ মানদণ্ড সংযোজন; দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতার ক্ষেত্রে আজীবন চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা দিতে সামাজিক সুরক্ষা আইনে বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা; শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা; দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতার ক্ষেত্রে আজীবন চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করা।

খ) নিয়োগকারী, শ্রমিক সংগঠন ও সরকারের মধ্যে সামাজিক সংলাপ জোরদার করে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা। দুর্ঘটনায় অক্ষম হয়ে পড়া শ্রমিকদের পুনর্বাসনে সরকার ও নিয়োগকর্তার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

শ্রমিকের আবাসন

ক) একটি "শ্রমিক আবাসন নীতি" প্রণয়ন করে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্প ও শ্রমঘন এলাকায় সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালায় প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যাতে করে প্রতিটি জেলায় বয়স্ক, অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

গ) সকল শ্রমিকের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসন নিশ্চিতে 'শ্রমিক আবাসন তহবিল' গঠন এবং শ্রমিকদের জন্য স্বল্পসুদে গৃহঋণ, আবাসন ভর্তুকি এবং আবাসন তহবিল গঠনের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে স্বল্পসুদে গৃহঋণ সুবিধা চালু। এছাড়া শ্রমিকদের আবাসন নিশ্চিতে শিল্প মালিককে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান এবং এ লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রস্তুত করা।

প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণ

ক) প্রবাসে নিহত শ্রমিকদের পরিবারের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং প্রতারিত ও আহত শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা, মানসিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিশ্চিতকরণ।

খ) প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক জীবনবিমা চালু, যাতে দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবার ক্ষতিপূরণ পায়। ফিরে আসা শ্রমিকদের (সক্ষম অথবা আহত) দেশের অর্থনীতিতে পুনরায় অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তরে একটি ইউনিট/সেল থাকবে যার দায়িত্ব হবে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকারী ও শ্রমিকের মাঝে সচেতনা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি।

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তরে একটি ইউনিট/সেল থাকবে যার দায়িত্ব হবে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকারী ও শ্রমিকের মাঝে সচেতনা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি।

২.৫ সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও যৌথ দরকষাকষি

সর্বজনীন সংগঠন ও অন্তর্ভুক্তির অধিকার

ক। বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক খাতের সকল শ্রমিকের জন্য সমানভাবে শ্রম আইনের আওতায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, ইউনিয়নে যোগদান, প্রতিনিধিত্ব এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা।

খ। সকল শ্রমিকের নিজ এবং সমষ্টিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়োগকারীর, সরকার, স্থানীয় সরকার কতৃপক্ষ ও সংস্থার সাথে দরকষাকষি, প্রতিনিধিত্ব, অ্যাডভোকেসি ও সংলাপে অংশগ্রহণের অধিকার আইন দ্বারা নিশ্চিত করা, এবং দরকষাকষির অধিকার সুরক্ষায় শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও বাধা দূর করা।

সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো গঠন করা, যা সকল শ্রমিকের যৌথ স্বার্থ রক্ষা, দরকষাকষির অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে। একক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক, চুক্তিভিত্তিক ও আউটসোর্স শ্রমিক, বিক্রয় প্রতিনিধি, গৃহকর্মী, দৈনিক মজুর, হকার, পরিবহণ শ্রমিক, কৃষি ও স্বনিযুক্ত কর্মী (গিগ কর্মী, ফ্রিল্যান্সার, কারিগর এবং স্বাধীন ঠিকাদার) এবং পেশাজীবীদের জন্য আইনি স্বীকৃতিসহ সংগঠনের অধিকার প্রদান করা। এসব ইউনিয়নের জাতীয় ও খাতভিত্তিক ফেডারেশন গঠনের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন ও সামাজিক সুরক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য আলোচনা করার সুযোগ নিশ্চিত করা।

সংগঠিতকরণকালীন ইউনিয়নের সুরক্ষা

শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে, শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন এবং ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সব ধরনের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাতে তারা অযৌক্তিক বিধিনিষেধ, চাকরিচ্যুতি বা প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ এর সম্মুখীন না হয়। এ লক্ষ্যে ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কিত আইনের নির্দিষ্ট বিধানগুলিকে সীমিত না করে শ্রম অধিদপ্তরের আইনগত ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করে বিদ্যমান এসওপি সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করা, যেন এরূপ কর্মকান্ড প্রতিরোধে শ্রম অধিদপ্তর সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া

ক) সদস্যসংখ্যার সীমার শর্ত সহজীকরণ:

- প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সদস্যসংখ্যার সীমার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিকের অনুপাতের শর্তের পরিবর্তে নূন্যতম শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনা করা। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অভিজ্ঞতা ও অনুসরনীয় মডেল বিবেচনা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকের প্রয়োজনীয় নূন্যতম সংখ্যা নির্ধারণ ও তৎপ্রেক্ষিতে দরকষাকষির প্রতিনিধি নির্ধারণসহ অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করা।
- প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে ৩০% সদস্যতার প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাহার করে ন্যূনতম ৫০ জনে নামিয়ে আনা, এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ইউনিয়নের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য সদস্যসংখ্যা ন্যূনতম ৫০ জন এবং জাতীয়ভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য ন্যূনতম ৪০০ জন নির্ধারণ করা।
- এই কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রমিকের তথ্যভান্ডার তৈরী করার পূর্ব পর্যন্ত নিয়োগকর্তা বা ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র বা পেশা উল্লেখিত নাগরিক সনদপত্র অথবা সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বা জাতীয় নিবন্ধিত ফেডারেশনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্রকে শ্রমিকের পরিচয় শনাক্তের প্রমাণক হিসাবে বিবেচনা করা।

খ) স্বচ্ছ এবং ন্যায্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা:

- শ্রম অধিদপ্তরকে (DoL) ৫৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সময়মতো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য DoL-কে জবাবদিহি করতে হবে। কোনো ঘাটতি থাকলে ১২ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানাতে হবে।

গ) শ্রম অধিদপ্তরের ক্ষমতার যৌক্তিক প্রয়োগ:

- আইনে, শ্রম অধিদপ্তরকে কোনো ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের জন্য লিখিত, আইনগতভাবে ন্যায্য কারণ দর্শানোর বিধান রাখা। নথিপত্রে ত্রুটির কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাখ্যান না করা, বরং ইউনিয়নগুলিকে ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ দেয়া

ঘ) শ্রমিকদের সুরক্ষা:

- ইউনিয়ন সংগঠকদের বরখাস্ত বা হয়রানি করার জন্য শ্রম আইনে শাস্তি বৃদ্ধি করা। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করার অধিকার রাখা এবং মামলাগুলি ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা।
- নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান থাকা অবস্থায় কোনো কর্মকর্তা ও সদস্যকে নিয়োগকারী কর্তৃক যে কোনোভাবে চাকরির অবসান করার বিধান রহিত করা।

ঙ) সাধারণ সভার বিকল্প:

- ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রয়োগের বৈষম্যমূলক পদ্ধতি অবসানের জন্য, ইউনিয়ন গঠনের সময় একটি প্রাতিষ্ঠানিক সভা আয়োজনের বাধ্যবাধকতা বাদ দেওয়া এবং ইউনিয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিকল্প পদ্ধতি চালু করা।

চ) ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য ও সংগঠকদের সুরক্ষা বৃদ্ধি:

- শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১৯৫ ও ১৯৬ (ক) সংশোধন করে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য এবং সংগঠকদের সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যা অসৎ শ্রম অনুশীলন, যেমন—হয়রানি, হুমকি এবং ইউনিয়ন সংগঠক, সদস্য, কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুতি, অবসান বা বরখাস্তের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করবে।
- অন্যায্য শ্রম অনুশীলন সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালত এবং শ্রম অধিদপ্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা এবং যদি শ্রম অধিদপ্তর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তাদের জন্য একটি কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রাখা।

ছ) ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিলের বিধান:

- ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হারের চাইতে হ্রাস পাওয়ার কারণে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করার বিধান রহিত করা এবং কোনো ইউনিয়ন কর্মকর্তা দ্বারা অসৎ শ্রম আচরণ সংঘটিত হলে অসৎ শ্রম আচরণের অভিযোগে ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল না করার বিধান সন্নিবেশিত করা।

ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন

প্রচলিত বিধান অনুযায়ী, কোনো ফেডারেশন তার অধিভুক্ত ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদন পেলে শ্রমিকদের পক্ষে শর্তসাপেক্ষে যৌথ দরকষাকষি করতে পারে।"কোনো ফেডারেশনকে এ ধরনের অনুমোদন প্রদান গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত না থাকলে অনুমোদনযোগ্য হবে না" — এই শর্তটি বাতিল করা এবং যদি কোনো ইউনিয়ন ফেডারেশনের এর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নির্বাহী কমিটি অনুমোদন করে উক্ত ফেডারেশনকে তাদের পক্ষে যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা।

কমিটি, কমিশন এবং প্রতিনিধিদলে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব

জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটি (TCC), শ্রম আদালতের সদস্য মনোনয়নসহ সরকার গঠিত যেকোনো কমিটি, কমিশন ও প্রতিনিধিদলে শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব মনোনয়ন বা নির্বাচনের জন্য একটি স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের চাঁদাদানকারী সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ করা।

শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের নীতিমালা

শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের নীতিমালার লক্ষ্যে সরকার ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আইনের বিধিতে প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশিত করতে পারবে।

২.৬ শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ন্যায় বিচার

অধিকার লঙ্ঘনে প্রতিকার ও ন্যায়বিচার

শ্রমিকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার লঙ্ঘন ও প্রাপ্য না পাওয়ার বিপরীতে অভিযোগ দায়েরের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রাখা এবং প্রতিকার পাওয়ার সময়সীমা নির্দিষ্ট করা। কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক ও মালিকের প্রতিনিধিত্বে আলোচনার আনুষ্ঠানিক কাঠামো, কার্যকর যৌথ দরকষাকষি চর্চা, সালিসি ও মধ্যস্থতা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত শ্রম আদালত ও ন্যায়বিচারে আদালতের সক্ষমতা নিশ্চিত করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক ও স্বনিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য বিশেষ অভিযোগ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা। মজুরি নির্ধারণে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কার্যকারিতা ও সময়মতো মজুরি পরিশোধ নিশ্চিত করা জরুরি।

বিরোধ নিষ্পত্তি

প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিরোধ নিষ্পত্তি:

বেশিরভাগ বিরোধ কারখানা পর্যায়ে সৃষ্টি হওয়ায় ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে সেখানে বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর আইনি প্রক্রিয়া বলবৎ ও শক্তিশালী করা এবং সমাধান না হলে DIFE/DoL এ অভিযোগ জানানোর কার্যকর ব্যবস্থা রাখা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রম পরিদর্শক/ পরিচালক বা সরকার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তির আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। তবে সমাধান না হলে শ্রম আদালতে দ্রুত প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা এবং প্রয়োজনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা। শ্রমিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা বা চাকরি অবসানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ রাখা; পাশাপাশি শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থায় শ্রমিক প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা ও পরিদর্শন প্রতিবেদনে তাদের বা শ্রমিকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক করা।

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি:

প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ন্যায়বিচার না পেলে হটলাইন, ইমেইল বা অন্যান্য মাধ্যমে সরাসরি অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা রাখা। শপ স্টুয়ার্ড মডেলের আলোকে ফ্লোর/বিভাগ বা শ্রমিক সংখ্যার ভিত্তিতে শ্রমিক কর্তৃক নির্বাচন ও তাদের প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা নেয়া এবং নারী শ্রমিকের আধিক্য থাকলে নারী প্রতিনিধি নিযুক্ত করা। বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠান, সেক্টর বা আঞ্চলিক পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি' গঠনের ব্যবস্থা রাখা।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত:

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বিভিন্ন পেশা ও খাত অনুযায়ী সংগঠিত হওয়া, প্রতিনিধিত্ব করা এবং নিয়োগকারী, তাদের অ্যাসোসিয়েশন এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা ও চুক্তি স্বাক্ষর করার আইনগত বিধান তৈরি করা। তাদের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সকল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলাদা অফিস বা ডেস্ক স্থাপন করা।

জাতীয় পর্যায়:

ত্রিপক্ষীয় কমিটিসমূহের গঠন ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। শ্রম অসন্তোষ নিরসনের লক্ষ্যে জাতীয় শ্রম সংলাপ ফোরাম গঠন করা। জাতীয় ও শিল্প পর্যায়ে সম্পাদিত দরকষাকষি চুক্তিকে আইনানুগ স্বীকৃতি দিয়ে বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং প্রতি বছর জাতীয় ত্রিপক্ষীয় শ্রম সম্মেলনের আয়োজন করা, যেখানে শ্রমিক অধিকার, শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, নীতি প্রণয়নে শ্রমিকের অংশগ্রহণ বিষয়ে পরিকল্পনা গৃহীত হবে।

মধ্যস্থতা (conciliation), সালিস (arbitration) ও সমঝোতার (mediation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি:

মধ্যস্থতা, সালিস ও সমঝোতার বর্তমান প্রক্রিয়াকে অধিকতর শ্রমবান্ধব, কার্যকর ও যুগোপযোগী করে ব্যক্তিবিরোধ, সমষ্টিগত বিরোধ বা শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতে যাওয়ার পূর্বে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আসতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

শ্রমিকের ধর্মঘটের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা:

নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ দাবি/বিরোধ উত্থাপন ও প্রয়োজনে ধর্মঘট করার অধিকার প্রয়োগ করা। ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান প্রক্রিয়া নিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার মধ্যে বিদ্যমান অসঙ্গতি দূর করা। প্রক্রিয়াগত ধাপগুলো স্পষ্ট করে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার প্রয়োগে যে বাধা সৃষ্টি হয়, তা দূর করা। সরকার কর্তৃক ৩০ দিনের পর ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতার সঙ্গে শ্রমিকদের জন্য মজুরি ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার আইনি বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR):

শিল্প অসন্তোষ নিরসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধান হিসেবে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে সক্রিয় ও গতিশীল করা। শ্রম আদালতের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে ও বিরোধের দ্রুত সমাধানে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে বাংলাদেশের শ্রম আইন নির্দেশিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলিকে বাধ্যতামূলক করা। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকে কার্যকর করার জন্য শ্রমিক ও নিয়োগদাতার সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

শ্রম ও শিল্প বিরোধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য আইন ও নীতিমালার সংস্কার

শ্রম আইন সংশোধন করে দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বাধ্যতামূলক সময়সীমা নির্ধারণ, রায় প্রদানের কার্যকর বিধান এবং প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। শ্রমিকদের জন্য স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (GRM) গঠন করা, যাতে অনলাইন পোর্টাল, হটলাইন ও সরাসরি অভিযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে গোপনীয়ভাবে সমস্যা উত্থাপন ও সমাধান সম্ভব হয়। আদালতের ওপর চাপ কমাতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) পদ্ধতি যেমন মধ্যস্থতা, সমঝোতা ও সালিস বাধ্যতামূলক করা। শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনি সংস্থার মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের জন্য আইনি কাঠামো গড়ে তুলা এবং শ্রম ও শিল্প অসন্তোষ প্রতিরোধে নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় আলোচনা ও তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানে আইনগত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অসন্তোষ প্রতিরোধের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি ব্যবস্থা

শ্রমিক অসন্তোষের সম্ভাব্য কারণ চিহ্নিত করে প্রতিটি শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইউনিয়ন বা অংশগ্রহণ কমিটি ও মালিক পক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা ইউনিট গঠন করা, যা প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রমিকদের অভিযোগ শুনে সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ নেবে। মালিক-শ্রমিক সংলাপ ও আলোচনার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে ত্রিপক্ষীয় ও দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বেতন, কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম ও নিরাপত্তা ইস্যুতে নিয়মিত আলোচনা করা। কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, পরিদর্শকদের দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানো জরুরি। পাশাপাশি, একটি শক্তিশালী ও ব্যাপকভিত্তিক বিরোধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া চালুর মাধ্যমে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

শ্রম আদালত ও শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে শ্রম আদালতের সংখ্যা মামলা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়িয়ে উপযুক্ত এলাকায় সার্কিট কোর্ট স্থাপন করা, শ্রম আইনের ২১৬ ও ২১৮ ধারা সংশোধন করে নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ, বিলম্ব রোধে জরিমানা আরোপ, আদালতের সদস্যদের উপস্থিতি ও সময়মতো রায় নিশ্চিত করা এবং শ্রম বিচার ব্যবস্থায় অটোমেশনসহ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম চালুর উদ্যোগ নেয়া। মামলা প্রক্রিয়া সহজ করতে সাক্ষ্য ও জেরা সীমিতকরণ, নির্ধারিত সময়সীমা বজায় রাখা এবং রায়সমূহ বাংলা ভাষায় প্রদান জরুরি করা। অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার অপব্যবহার রোধে নজরদারির ব্যবস্থা গ্রহণ, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের বিচারকসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রয়োজনে সার্কিট কার্যক্রম পরিচালনা এবং চেয়ারম্যানের প্রশাসনিক ক্ষমতা নিশ্চিত করা। শ্রম আদালতের জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন, বিচারকদের জেলা জজের সমপর্যায়ের সুবিধা এবং প্রাক-মামলা আপোষ আলোচনার বাধ্যতামূলক সময়সীমাসহ ADR পদ্ধতির ব্যবহার ও কার্যকর GRM আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা।

শ্রমিকদের অপরাধী হিসেবে দেখার প্রবণতা রোধে আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের প্রবণতা দূর করে শিল্পাঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাকে অগ্রাধিকার দেয়া। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক মূল্যায়নের জন্য মালিক, শ্রমিক, শ্রম বিভাগ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করে নিরপেক্ষ তদন্ত ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পাশাপাশি, শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন উদ্দেশ্যমূলক মামলা দ্রুত প্রত্যাহার এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পেশাদার ও গঠনমূলক ভূমিকা নিশ্চিত করা।

শ্রমিকদের মজুরি সময়মতো পরিশোধ নিশ্চিত করা

শ্রমিকদের মজুরি সময় মতো পরিশোধ নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিলম্বে মজুরি পরিশোধের জন্য জরিমানার ব্যবস্থা করা; মজুরি সংক্রান্ত বিরোধগুলির সমাধানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে মামলাগুলিকে শুনানির তারিখ নির্ধারণ এবং রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া; এবং মজুরি ও আইন অনুযায়ী পাওনা সময় মতো না পেয়ে শ্রমিকরা যদি কাজ বন্ধ করে প্রতিবাদ করে, তখন তাকে অবৈধ ধর্মঘট না বলা এবং সে কারণে মজুরি কর্তন না করা।

শ্রমিকের আন্দোলনের সাথে সংহতিসূচক কার্যক্রমকে আইনি সুরক্ষা:

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি ও শ্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ইউনিয়ন, ফেডারেশন, শ্রমিক ও মানবাধিকার সংগঠন, শ্রমিক স্বার্থে কর্মরত সংগঠন, এনজিও, পেশাজীবী সংগঠনের সংহতিমূলক কর্মসূচি ও কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আইনি সুরক্ষা দিয়ে বিধান অন্তর্ভুক্ত করা।

ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব

অংশগ্রহণ কমিটির নাম পরিবর্তন করে ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি রাখা। প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন থাকুক বা না থাকুক, ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা এবং এর সদস্যগণ সিবিএ ও ইউনিয়ন দ্বারা মনোনীত করা। ট্রেড ইউনিয়ন ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিরাই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পালন করা এবং কমিটির শ্রমিক সদস্যদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট বিধান করা।

শ্রমিক, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা

শ্রম ও শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইন শৃংঙ্খলা বাহিনী, থানা, শিল্প পুলিশের ভূমিকা সুস্পষ্ট করা ও সুস্পষ্ট বিধানাবলী প্রণয়ন করা। শিল্প সম্পর্ক ও শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সম্ভাবনা থাকলে পুলিশের দায়িত্ব হবে DoL ও DIFE-এর কার্যক্রমে সহযোগিতা করা। যদি কোন কর্মকাণ্ডে শ্রম পরিস্থিতি ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে বিষয়টি শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের পাশাপাশি আইনশৃংঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করার বিধান প্রণয়ন করা এবং শ্রম ইস্যু এবং অসন্তোষের পাশাপাশি শিল্প অঞ্চলে শ্রমিকের হয়রানি নিরসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে স্থানীয় থানা ও আইন শৃংঙ্খলাবাহিনী ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি করা।

২.৭ সমতা, বৈষম্যহীনতা এবং অন্তর্ভুক্তি

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ

আইএলও কনভেনশন নং ১৯০ অনুমোদন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা ও ফৌজদারি আইনে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিষয়ে সংস্কার করা। ২০০৯ সালের হাইকোর্টের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নির্দেশিকার কার্যকর বাস্তবায়ন জোরদার করা। সরকারি-বেসরকারি সব কর্মস্থলে বৈষম্যবিরোধী নীতি বাধ্যতামূলক করা, শ্রম পরিদর্শকদের নারী-পুরুষ বৈষম্যবিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং নারী পরিদর্শক নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা। নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণে বৈষম্যমূলক আচরণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা প্রচারণা জোরদার করা; এবং যৌনকর্মীদের সংজ্ঞায়ন নির্ধারণসহ তাদের আইনি সুবিধা নিশ্চিত করা।

সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক সব খাতে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি নির্ধারণ এবং স্বনিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য বিশেষ স্কিম বা ইনস্যুরেন্স চালুর নীতিগত পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। সকল শ্রমজীবী নারীর মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ এবং নীতি, আইন ও কল্যাণমূলক সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে, যাতে তাদের কর্মসংস্থানে নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। পাশাপাশি আইএলও কনভেনশন নং ১১১ এবং ১৮৩ বিবেচনায় নেয়া এবং গর্ভকালীন সময়ে নারী শ্রমিকদের চাকরিচ্যুতি প্রতিরোধে স্পষ্ট আইনি বিধান সংযোজন করা।

বেতন-ভাতার বৈষম্যের অবসান

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য সমমানের কাজে সমমজুরি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া। মজুরি বৈষম্য রোধে বিদ্যমান শ্রম আইন পর্যালোচনা করে কার্যকর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা, পাশাপাশি মজুরি বৈষম্য দূর করতে প্রস্তাবিত জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি, নারী সদস্য নিয়োগ এবং বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ

প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি কর্মস্থলে জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পরিদর্শকদের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণ ও নারী কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান, এবং নারীদের বেতনহীন সেবা কাজকে 'কাজ' হিসেবে স্বীকৃতি ও লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন দূর করা। শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত করা বৈষম্যমূলক আচরণ পরিবর্তনে সচেতনতা প্রচারণা, কর্মস্থলে সম্মানজনক ভাষা ও আচরণ নিশ্চিত করা, শ্রমজীবী আন্দোলনে নারীর ভূমিকা ইতিহাসে ও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তি এবং মিডিয়ায় যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য নীতি গ্রহণ করা, এবং শ্রম আইন ও বিধিমালার জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যমূলক ধারা সংশোধন করতে আইএলও কনভেনশন ১০০, ১১১ ও ১৯০ অনুসরণসহ প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা।

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি দূরীকরণ

শ্রম আইনে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুসারে যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পৃথক সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্তি, অভিযোগ কমিটি গঠন, এবং ফৌজদারি আইন সংস্কার; নারীর প্রতি আচরণ সম্পর্কিত বিষয়ে কমিটিতে বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্তি; আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুসমর্থন; সহিংসতার সম্ভাবনাপূর্ণ সেক্টরে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ; কর্মক্ষেত্র ও গণপরিবহণে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধি; ট্রেড ইউনিয়নে নারী নেতৃত্বসহ হয়রানি বিরোধী কমিটি গঠন; পাবলিক প্লেস ও শিল্পাঞ্চলে নিরাপত্তা নিশ্চিতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন করা; নারীবান্ধব বিচারব্যবস্থা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত; পুরুষ ও ছেলেদের সম্পৃক্ত করে জেন্ডারভিত্তিক স্টেরিওটিপিজম পরিবর্তন; এবং বিদেশে কর্মরত নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণসহ প্রয়োজনীয় নীতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করা।

পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ

কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতিতে লিঙ্গসহ যেকোনো ধরনের বৈষম্য রোধে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সময়মতো সবার যোগ্যতার ভিত্তিতে পদোন্নতি নিশ্চিত করার বিধান রাখা। পাশাপাশি, ব্যবস্থাপনা ও তদারকি পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়াতে উপযুক্ত কোটাভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা। এছাড়া, কর্মক্ষেত্রে নারীদের সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণকারী নিয়োগকর্তাদের প্রকাশ্যে স্বীকৃতি প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করা।

২.৮ শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম

কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ

বাংলাদেশের শিশুশ্রম নিরসনে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার, এলডিসি গ্রাজুয়েশন ও এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মে নিয়োজিত হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স ১৬ বছরে উন্নীত করা আবশ্যক, এবং ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী কিশোরদের শুধুমাত্র এমন কাজে নিয়োগের সুযোগ থাকা উচিত যা তাদের দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বিকাশে সহায়ক—যার মানদণ্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত হবে। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নে শ্রম মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সমন্বিতভাবে কাজ করা।

মানসম্মত শিক্ষার অধিকার ও কারিগরি দক্ষতার সুযোগ

জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুযায়ী ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমজীবী ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তকসহ সকল শিক্ষা উপকরণ বিনামূল্যে সরবরাহ করে মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা। বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় দ্রুত স্কুল স্থাপন করে শিক্ষা অধিকার নিশ্চিত করে শিক্ষাকাল শেষে অনুমোদিত শ্রম বা কারিগরি শিক্ষার পথ উন্মুক্ত রাখা। সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়কে শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচিতে যুক্ত করে 'শ্রম থেকে শিক্ষা জীবনে পুনর্বাসনে'র জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক পুনর্বাসনের দায়িত্ব দেওয়া। কিশোর শ্রমগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষা কারিকুলাম বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শ্রম বাজারের দক্ষতা ও চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত ও নিয়মিত আপডেট করা এবং তা বিনামূল্যে প্রদান করা। একই সঙ্গে শিশুদের শিক্ষার অধিকার হরণ বা বাধাগ্রস্তকারী যেকোনো বৈষম্যমূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

শ্রম মানদণ্ড মনিটরিং ও পরিদর্শন

প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম নিরসন ও কিশোর শ্রমিকদের সুরক্ষায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে একটি বিশেষ শিশুশ্রম পরিদর্শন ইউনিট গঠন করে তাদেরকে সারাদেশে যেকোনো সময় পরিদর্শনের ক্ষমতা প্রদান করা। স্থানীয় সমাজকল্যাণ অফিসের প্রবেশন কর্মকর্তাদের শিশুশ্রম মনিটরিংয়ের দায়িত্বে সম্পৃক্ত করা। জাতীয় শিশু শ্রম কল্যাণ পরিষদ ও জেলা পর্যায়ে গঠিত শিশু অধিকার মনিটরিং ফোরামসমূহের কার্যক্রম জনসাধারনের জন্য উন্মুক্ত করা এবং সুনির্দিষ্ট দায়িত্বশীলদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা। প্রতিটি স্তরে গ্রহণকৃত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও প্রতিবেদন প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় রক্ষা এবং প্রয়োজনে সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে সংশোধন করে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা।

শিশুশ্রম নিরসন ও পুনর্বাসনে শ্রম, সমাজকল্যাণ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নিয়ে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠনের সুপারিশ করা।

দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও শাস্তি

শিশুশ্রম আইন ও মানদণ্ড লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতির ভিত্তিতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত কিংবা নিবন্ধন বাতিলের বিধান রাখা। শিশুকে কাজে নিয়োগের প্রক্রিয়ায় সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি জবাবদিহিতামূলক পদ্ধতি প্রণয়ন করা, যাতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোনো অভিভাবক বা নিয়োগকারী শিশুকে কাজে নিয়োগ করতে না পারেন। শিশু নিয়োগে অভিভাবকের সম্মতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ব পরামর্শ বাধ্যতামূলক করা, এবং উভয় পক্ষের আইন লঙ্ঘন করলে শাস্তির আওতায় আনার বিধানসহ শিশুশ্রম সংক্রান্ত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের জন্য শাস্তি বৃদ্ধি করা আবশ্যক।

দরিদ্র পরিবারের সুরক্ষা

চলমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিশুশ্রম প্রতিরোধে কার্যকর শর্তসাপেক্ষ কর্মসূচি গ্রহণ এবং নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত উপকারভোগী নির্বাচনের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা। সামাজিক সুরক্ষার পরিমাণ ও পরিধি এমনভাবে নির্ধারণ, যাতে শিশুর উপর আর্থিক নির্ভরতা হ্রাস পায় এবং "ফুড ফর এডুকেশন" কার্যক্রমের মাধ্যমে অসচ্ছল পরিবারের শিশুদের শিক্ষায় আগ্রহী করা যায়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল গঠন ও সমাজের বিত্তবানদের শিক্ষায় অবদান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শ্রমঘন এলাকা ও শিল্পাঞ্চলে কমিউনিটি ভিত্তিক ডে কেয়ার সেন্টার, কারিগরি বিদ্যালয়, দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ ও মেডিকেল সেন্টার স্থাপন, এবং কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে, কর রেয়াত সুবিধা প্রদানসহ এই ধরনের সিএসআর কার্যক্রমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অন্তর্ভুক্ত করা।

কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতে বিবেচ্য ও পূর্বের কার্যক্রম মূল্যায়ন

জাতীয় পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণে মাঠ পর্যায়ের শিশুশ্রমের বিস্তৃতি, ধরন ও প্রকৃতির বাস্তবতা ও তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম দূরীকরণ ও কিশোর শ্রমিকদের অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া। পূর্ববর্তী সরকারি উদ্যোগ ও কর্মসূচির মূল্যায়নের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণ এবং ত্রিপাক্ষিক সামাজিক সংলাপসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে অংশগ্রহণমূলক ও দায়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা

শিশুর বিকাশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা হালনাগাদ করা এবং নারী কিশোর শ্রমিকদের ঝুঁকি ও সমস্যাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া। কেউ আইন ভঙ্গ করে শিশুকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দিলে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা এবং সরকার অনুমোদিত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা শ্রম আইনের তফসিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ

রপ্তানিমুখি সকল শিল্পকে নিজেদের কারখানার পাশাপাশি সাপ্লাই চেইনে যুক্ত (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) পণ্য ও সেবা সরবরাহকারীদের কারখানাও শিশুশ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম মুক্ত রাখা। প্রতিটি কারখানার নিয়মিতভাবে নিজেদের ও ব্যবসা সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলোকে এ বিষয়ে ঘোষণা দিয়ে পরিদর্শন ও প্রতিবেদন পেশ করা এবং সরকার অনুমোদিত কর্তৃপক্ষকে যেকোনো সময় পরিদর্শনের সুযোগ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতে সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করা।

জবরদস্তিমূলক শ্রম, বাধ্যতামূলক শ্রম ও আধুনিক দাসত্ব নিরসন

বাংলাদেশ শ্রম আইনে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার বিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়ন এবং উপযুক্ত শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম খাত যেখানে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার অস্তিত্ব বা আশংকা রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে কার্যকর ও মেয়াদ নির্ধারিত জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা। রপ্তানিমুখি শিল্প ও এর সাপ্লাই চেইনে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার

বিলুপ্তি নিশ্চিতকরণ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন চেকলিস্ট হালনাগাদ করা, শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ঝুঁকি নিরূপণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রত্যাশী শ্রমিকদের সুরক্ষায় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

৩। শ্রমখাত সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রস্তাবনা

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কাঠামোগত সংস্কার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর সমূহের মধ্যে কাজের ভারসাম্য আনয়নে শ্রম সংস্কার কমিশন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে বিদ্যমান ২টি অধিদপ্তরের (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধদপ্তর) নাম পরিবর্তন এবং নতুন ২টি অধিদপ্তর সৃষ্টি করে মোট ৪টি অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে পুণর্বিন্যাস করার সুপারিশ করছে;

ক) শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর

- 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর' এর নাম পরিবর্তন করে 'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর' নামকরণ করা এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই অধিদপ্তরের দপ্তর/সাচিবিক ডেস্ক স্থাপন করা।
- শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যপরিধিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের শ্রম আইন ও বিধামালার আওতায় রেখে তাদের অধিকার ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের দপ্তর স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত, অথবা যেখানে অভিযোগ গ্রহণ করার কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে জেলা প্রশাসন বা উপজেলা প্রশাসন বা শ্রম অধিদপ্তর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন শ্রমখাতে মৌলিক শ্রম অধিকার (নিয়োগপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত কাজ, ক্ষতিপূরণ, সহিংসতা বা হয়রানী, সংগঠিত হওয়া) নিশ্চিত করতে কাজ করবে।
- পরিদর্শন এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য কেন্দ্রীয় একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এবং বাস্তব সময়ে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য উন্নত সরঞ্জাম প্রয়োগ করা।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডাইফের পরিদর্শন ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা এবং শিল্পভেদে স্ট্যান্ডার্ড চেকলিস্ট ও পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করা।
- জনবল সংকট, শূন্য পদ পূরণ এবং কর্মরত পরিদর্শকদের পদোন্নতি জটিলতা নিরসন করে দপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনা। একইসাথে শ্রম পরিদর্শকদের আইনানুগ ক্ষমতায়ন এবং নির্মাণখাতসহ অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান।

খ) শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর

- 'শ্রম অধিদপ্তর' এর নাম পরিবর্তন করে 'শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর' নামকরণ করা, যার মূল কাজ হবে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, বিরোধ নিস্পত্তি এবং সামাজিক সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বজায় রাখা।
- শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ এবং নিশ্চিতকল্পে শ্রম ও শিল্পঘন এলাকা/অঞ্চল বিবেচনায় প্রশাসনিক বিভাগসমূহে বিভাগীয় শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা এবং একই সাথে বিভাগীয় শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক দপ্তরসমূহের অধীনে নতুন আঞ্চলিক দপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আঞ্চলিক শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করা।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন, শিপ্প বিরোধ নিস্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারি ও কর্তৃপক্ষ/ কমিনিউটি, অভিযোগ নিস্পত্তি ও এ খাতের শ্রমিকের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সংলাপ/আলোচনা/ প্রতিনিধিত্ব ও দর কষাকষি নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখা।
- শ্রম অসন্তোষ প্রতিরোধে নিয়মিত আলোচনার আয়োজন এবং সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়ার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি ব্যবস্থা চালু করার নিমিত্তে নীতিমালা প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ করা। আরবিট্রেশন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আরবিট্রেটরের তালিকা প্রতি দুই বছর নাগাদ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ করা।

- আইটি-ভিত্তিক শ্রম তথ্য ব্যবস্থাপনা চালু করে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া এবং অভিযোগ নিষ্পত্তি আরও সহজ করা।
- শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো যৌক্তিকরণ, পদোন্নতির জটিলতা দূরীকরণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ) দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন অধিদপ্তর

এই অধিদপ্তররের কাজসমূহ হবে:

- বাংলাদেশে বর্তমান কর্মসংস্থান পরিস্থিতি, শ্রম বাজার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান, এবং ভবিষ্যৎ কর্মজগতের চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে কর্মের জন্য জনশক্তিকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা।
- শ্রমজীবী মানুষদের দক্ষতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, কারিগরি জ্ঞান অর্জন এবং প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
- একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্মশক্তি গড়ে তোলা এবং শিক্ষার সাথে শ্রমবাজারের চাহিদার সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে পেশাগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনরায় দক্ষতা অর্জনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যা শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এবং মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে সমন্বয় করে পরিচালিত হবে।
- শিক্ষাধীনতা সংক্রান্ত বিধি ও নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং কর্মজীবন পরামর্শ প্রদান(career guidance services) এবং আজীবন শিক্ষার উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মশক্তিকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী করে তোলা।
- বিএমইটি এর দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ/কার্যক্রমকে এই অধিদপ্তরের আওতায় নিয়ে আসা, যার ফলে প্রবাস কেন্দ্রিক দক্ষতার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়। প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন।
- প্রস্তাবিত দক্ষতা ও কর্মসংস্থান অধিদপ্তরের আওতায় আরও নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে:
    - দেশে ও বিদেশে কর্মজগতের চাহিদা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান এর ম্যাপিং করা;
    - শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত লিয়াজো ও যোগাযোগ রাখা, এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যকর সমন্বয় সাধন করা;
    - শিল্পভিত্তিক মালিক ও শ্রমিক সংগঠন, সরকারি ও বেসরকারি দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়ী সমিতি ইত্যাদির সাথে সমন্বয় করা;
    - উদ্যোক্তা তৈরীর জন্য ব্যপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
    - প্রশিক্ষণ/পুণ:প্রশিক্ষণ এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা, ভবিষ্যৎ কাজের উপযোগী আধুনিক কর্মদক্ষতা তৈরী করা, কর্মের মানোন্নয়ন ও সার্টিফিকেশন এর উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা; এবং
    - দেশে বিদেশে চাকরীর সুযোগ সম্পর্কিত তথ্য ভান্ডার তৈরীতে নিয়মিত গবেষনা পরিচালনা করা।

ঘ) শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তর

এই অধিদপ্তরের দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত হবে:

- শ্রমিকের জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু ও শ্রমিক বিশেষায়িত হাসপাতাল পরিচালনা;
- প্রস্তাবিত (সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ অংশে বর্ণিত) সামাজিক ও স্বাস্থ্য বীমা, শ্রমিক প্রভিডেন্ড ফান্ড, সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা, সর্বজনীন পেনশন স্কীমে শ্রমিকের অন্তর্ভূক্তি ও সমন্বয় ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা;
- অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহে যেসব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম চলমান আছে, সেসবের মধ্যে শ্রমিক সংশ্লিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়। এসংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ হতে হবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর অনুকুলে।

উল্লেখ্য, দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তরের আলাদা অফিস বা ডেস্ক স্থাপন।

শ্রম তথ্য ভান্ডার

এই কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রম তথ্যভাণ্ডার (সেকশন ৩.১-এ বর্ণিত) শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত সকলের জন্য তথ্য ও পরিচয়পত্র নিশ্চিতে কাজ করবে এই অধিদপ্তর।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র

স্বল্পমেয়াদী সুপারিশ:

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এর মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যান্য হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অধিকতর চিকিৎসা পেতে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সুপারিশ/রেফারাল যেনো সরকারি নথি হিসেবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক ভেদে সকল ধরনের শ্রমিক যেনো শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য সেবা পায় তা নিশ্চিত করা।
- বিদ্যমান শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের ব্যপক উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকের স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া অধিকার মূলে সেবা, চিকিৎসক ও স্টাফদের সংখ্যা বাড়ানো, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি (প্রতিটি জেলায় ১টি ও শিল্পাঞ্চলে একাধিক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার হতে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রসমূহে ডাক্তার নিয়োগ দেয়া। বর্তমানে কর্মরত ডাক্তারদের ক্যাডার সার্ভিসের মর্যাদা দেয়া ও ডাক্তারদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান যাতে ক্যারিয়ারের উন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা অপসারণ হয়। বর্তমানে যে সকল ডাক্তার কর্মতর রয়েছে তাদের জন্যেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উচ্চতর পর্যায়ের প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়া। এ ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাঝে যোগাযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা।
- শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে শ্রমিক ও পরিবারবর্গকে প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি জরুরী বিভাগ, পূর্ণাঙ্গ প্যাথলজি বিভাগ, উন্নত ডায়াগনস্টিক টুলসের সংস্থান এবং বিশেষায়িত বহির্বিভাগ (যেমন-চক্ষু, শিশু, গাইনী, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি) স্থাপন করা।
- শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাপ্য ঔষধের প্রকার এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- সকল শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে এম্বুলেন্সের ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের জন্য শয্যার ব্যবস্থা করা।
- শ্রমিকদের জন্য সান্ধ্যকালীন সেবাগ্রহণের সুবিধা নিশ্চিত করা।

দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ:

- শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের নাম পরিবির্তন করে 'শ্রমকল্যাণ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র' করা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কৌশল নির্ধারণ করা।
- শ্রম কল্যান কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আলাদা করা, এবং স্বাস্থ্য বিভাগের তত্বাবধায়নে শিল্পাঞ্চল/শিল্পঘন এলাকায় শ্রম বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করা।
- শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের জনবল বৃদ্ধি ও তাদের পদ মর্যাদার (গ্রেড) উন্নতি।
- দেশের শ্রমঘন অঞ্চলে নতুন নতুন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।
- বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
- সিএসআর প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠানদের সাথে সেবার কাজ উন্নয়নের জন্য সহযোগীতা নেয়ার ব্যবস্থা চালু করা।
- প্রতিটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র মালিক, শ্রমিক, কমিউনিটি মেম্বার, স্থানীয়ভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সমন্বয়ে কমিটি গঠণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

- কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, আবেদন গ্রহণ, নিস্পত্তি, বিবরণ সবকিছু ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- সহায়তার যোগ্যতা বিবেচনায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সুপারিশ/রেফারেন্স গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা।
- ব্যক্তিপর্যায়ের সুবিধা প্রদান বন্ধ করার লক্ষ্যে ক্রমানুসারে আবেদন নিস্পত্তি নিশ্চিত করা।
- শিক্ষা ও দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মিডিয়া প্রতিবেদনকে প্রমান হিসেবে গ্রহণ করা।
- ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও বেশী সংখ্যক প্রতিষ্ঠান এর অন্তর্ভূক্ত করতে আইনী বাধ্যবাধকতা শিথীল করা।
- শ্রমিকগণ যেন দপ্তরে আসা যাওয়া ব্যতীত অনলাইনে আবেদন করতে পারে এবং অনলাইনে আর্থিক অনুদান পেতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- আবেদন এবং সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখা, যেন কোন শ্রমিক সুবিধা হতে বঞ্চিত না হয় বা বৈষম্যের শিকার না হয়।
- আবেদন ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে নিস্পত্তি করা।
- শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অফিস আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধিকরণ এভং বিভাগীয় ও আঞ্চলিক বাছাই কমিটি গঠনের মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যক্রমকে ত্বরান্বিতকরণ।

কেন্দ্রীয় তহবিল

- কেন্দ্রীয় তহবিলে শ্রমিকবান্ধব সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। আবেদন প্রক্রিয়া সরলীকরণ করা, শ্রমিক যেন তার পরিচয় পত্র দিয়েই আবেদন করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- তহবিলের পুরো কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করার মাধ্যমে আবেদন, যাচাই এবং সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়ার দ্রুততা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।
- প্রতিটি কারখানায় এবং শিল্পাঞ্চলে সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করে শ্রমিকদের আবেদন করতে সহায়তা প্রদান করা।
- ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনের নিস্পত্তি সম্পন্ন করা হবে।
- তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কার আনা, এই তহবিল হতে শ্রমিকের বকেয়া বেতন দেয়ার ব্যবস্থা বাতিল করা।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ ২টি অনুবিভাগ থাকবে:

গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ:

এ অনুবিভাগ তার কাজের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রনালয়, বিভাগ ও দপ্তরের সাথে সরাসরি কাজ করবে ও তথ্য আদানপ্রদান করবে। এ অনুবিভাগের অধীনে থাকবে 'শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন' ও 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট'।

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই)

আইআরআই সমূহের আধুনিকায়ন এবং একই সাথে এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে তার লক্ষ্য অর্জনের সামর্থ্য উন্নয়নে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করেছে:

ক) সকল প্রশাসনিক বিভাগে চাহিদার ভিত্তিতে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন স্থাপন করা এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

খ) নারী ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীর জন্য পৃথক হোস্টেল, ডে-কেয়ার সুবিধা, এবং প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনসমূহ বিবেচনায় রেখে আইআরআই সমূহের অবকাঠামোর আধুনিকায়ন করা।

গ) প্রশিক্ষণ কারিকুলামসমূহ আধুনিক ও যুগোপযুগি করা। জেন্ডার, টেকসই ও অন্তর্ভূক্তিমূলক শ্রম, সাপ্লাই চেইন, শোভন কাজ, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, জাস্ট ট্রানজিশন, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভূক্ত করা।

ঘ) সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন শিল্প খাতের চাহিদার ভিন্নতার বিষয় বিবেচনাপুর্বক নির্দিষ্ট শিল্প, সেক্টরভিত্তিক, এবং চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।

ঙ) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহে চাহিদা ভিত্তিক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা, এবং সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ এবং ই-লার্নিং-এর সুযোগ তৈরি।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI)

ক) শ্রমিকদের জন্য সহজবোধ্য প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করে এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন করে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার বা বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে প্রণোদনা (Incentive) দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ) দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করা ।

ঘ) শ্রমিক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শ্রমঘন এলাকায় (ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট এর অফিস স্থাপনা ও পরিচালনা করা। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সহযোগীতাভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঙ) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষনা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট-অধীনে একটি "লিগ্যাল রিসার্চ সেল" স্থাপন করা যেতে পারে এবং নোস্ট্রির প্রধান কার্যালয়ে একটি সমন্বয় অফিস সহ কিছু আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে যার ফলে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের নস্ট্রির অবদান অংশীজনের কাছে দৃশ্যমান বলে প্রতীয়মান হয়।

অভিবাসী শ্রমিক অনুবিভাগ:

শ্রমিক হিসেবে অভিবাসী কর্মীদের স্বীকৃতি ও অধিকার নিশ্চিতে কাজ করবে এই অনুবিভাগ। প্রবাসী মন্ত্রনালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষার করার পাশাপাশি আইএলও সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয় সাধন করবে এই অনুবিভাগ।

বিশেষ সুপারিশ

ক) প্রস্তাবিত ৪টি অধিদপ্তরের প্রতিটিতেই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বিভাগ রাখা, যার মাধ্যমে সকল ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সেবাপ্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বিসিএস (শ্রম) ক্যাডার তৈরি।

গ)প্রস্তাবিত 'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর' ও 'শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর' এর কর্মকর্তাদের মধ্য হতে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে পদোন্নতির সুযোগ রাখা।

ঘ) রানা প্লাজা পরবর্তী সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রচেষ্টায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো শ্রমিকের অধিকার ও অবস্থার উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কিভাবে অবদান রেখেছে তার যথাযথ মূল্যায়ন করা।

জবাবদিহিতা, অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা

জাতীয় শ্রম সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি

ক) শ্রমিক, মালিক ও শ্রমখাতে অভিজ্ঞ/বিশেষজ্ঞ এর সমন্বয়ে একটি পরামর্শ, পর্যালোচনা ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা। শ্রমখাতের দুটি প্রধান অংশীদার, শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষ এর মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান, যোগাযোগ ও সমন্বয়, পর্যালোচনা, দিক নির্দেশনা, কল্যাণমূলক কার্যক্রম মনিটরিং, সেবা প্রদানকারী অধিদপ্তর সম্পৃক্ত কোন অভিযোগ পর্যলোচনাপূর্বক মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে এই কমিটি। কমিটি শ্রম পরিস্থিতি বিষয়ে সময়বদ্ধ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে, এবং শ্রমিকদের মৌলিক সেবাগ্রহণের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে।

খ) এই কমিটির আরেকটি প্রধান কাজ হবে জাতীয় শ্রমনীতি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নীতিমালা, কর্মসংস্থান নীতি, গার্হস্থ্য নীতি ইত্যাদি নীতিমালা আইনে প্রতিফলনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই কমিটি শ্রমইস্যুতে জাতীয় ক্রাইসিস মোকাবেলায় সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করে সমাধানের উদ্যোগ নিবে।

গ) 'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর' এবং 'শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর' কর্তৃক তাদের প্রতিবেদন এই কমিটির কাছে পাঠানো বাধ্যতামূলক করা। কমিটি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরামর্শ প্রদান করবে এবং তার বাস্তবায়ন মনিটর করবে।

ঘ) এই কমিটি বাৎসরিক শ্রম কনভেনশন ও সামাজিক সংলাপ আয়োজন করবে।

ঙ) কমিটির প্রস্তাবিত কাঠামোতে থাকবে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ থেকে ২জন শ্রমিক প্রতিনিধি ও ২জন মালিক প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ২জন ও মালিক সংগঠন থেকে ২জন, শ্রম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি থেকে চেয়ারম্যান মনোনীত ২জন (১জন সরকার পক্ষের ও ১জন প্রধান বিরোধী পক্ষের), এবং ২জন বিশেষজ্ঞ (আইনজীবী/মানবাধিকার কর্মী/গবেষক/নারী অধিকার/পরিবেশবাদী/শ্রম বিশেষজ্ঞ/অর্থনীতিবিদ)।

চ) এই পরামর্শ কমিটিতে মূল সদস্যদের বাইরে পর্যবেক্ষক হিসেবে আইএলও ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী এবং শিল্প পুলিশসহ দেশের কোন আগ্রহী শ্রম অধিকার সংগঠনের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

জাতীয় স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন

ক) সময়বদ্ধ আইনী প্রক্রিয়া অনুসরনীয় হওয়ায় একটি জাতীয় শ্রম কমিশন গঠনকে ২য় পর্যায়ের সুপারিশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে কমিশন। কমিশনের প্রস্তাবিত কাঠামোতে থাকতে পারে ১ জন চেয়ারম্যান (জাতীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য বিশিষ্ট শ্রম বিশেষজ্ঞ), এবং সদস্য হিসেবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি থেকে মাননীয় স্পিকার মনোনিত ২ জন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১জন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তা, মালিকপক্ষের ১জন, শ্রমিকপক্ষের ১জন, শ্রম আইন, অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে ১জন বিশেষজ্ঞ, ও শ্রম বিষয়ক ১জন গবেষক।

খ) কমিশনের মূল কার্যক্রম হবে শ্রম সংস্কার কমিশন-২০২৪ এর প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন তদারকি করা, শ্রম আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/দপ্তরসমূহের কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান করা, এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা। সুপারিশকৃত এই কমিশনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করবে।

গ) শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি ও জাতীয় পর্যায়ের ক্রাইসিস মোকাবেলার আইনগত ক্ষমতা থাকবে এই কমিশনের। মন্ত্রনালয় বা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা নিস্পত্তির দায়িত্ব থাকবে এই কমিশনের। এছাড়াও শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় স্থায়ী কমিশন।

ত্রিপক্ষীয় কার্যক্রম ও কাঠামোসমূহ জোরদার

জাতীয় পরামর্শ কমিটি ও ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ সহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধায়নে যতগুলো কমিটি আছে, তা কার্যকরকরণ ও নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে একজন যুগ্ম সচিবের দায়িত্বে মন্ত্রণালয়ের আলাদা সাচিবিক ডেস্ক স্থাপন করা। এই ডেস্ক এর কাজ হবে পক্ষসমূহের মধ্যে সামাজিক সংলাপ আয়োজন, সৌহার্দপূর্ণ অবস্থান শক্তিশালীকরণ, কাঠামোসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা ও নথিপত্র সংরক্ষণে রাখা। মন্ত্রণালয়ের একজন পরিচালক পদমর্যাদার অধীনে এসকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত ও সমন্বয় সাধন করা নিশ্চিত করা।

নিম্নতম মজুরি বোর্ড

ক) নিম্নতম মজুরি বোর্ড এর আইনগত কার্যপরিধি ও সক্ষমতা বাড়ানো, যাতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষনা করতে পারে।

খ) মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও নিরপেক্ষ সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মজুরি, উৎপাদনশীলতা ও শ্রম অর্থনীতি বিষয়ক অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া।

গ) মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ডের নিজস্ব গবেষণা সম্পন্ন করা ও এর ভিত্তিতে মজুরি সুপারিশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বোর্ডের নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানো।

ঘ) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি সেক্টরের মজুরি সুপারিশ করার সময়ে মজুরির পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তিসমূহ, মজুরির হিসাব পদ্ধতি এবং মজুরির পরিমাণ নিরূপণে ব্যবহৃত তথ্য/উপাত্তসমূহ প্রকাশ করা।

ঙ) মূল্যস্ফিতি ও অন্যান্য মানদন্ড বিবেচনা করে প্রতি বছর শিল্পসেক্টরের মজুরি মূল্যায়ন করে মর্যাদাকর জীবনধারনের জন্য মজুরি নির্ধারণের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

চ) বর্তমানে ৪২টি শিল্পসেক্টরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত আছে, এটি হালনাগাদ করতে হবে ও শিল্পসেক্টরের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

জাতীয় নিম্নতম মজুরি কমিশন

বিভিন্ন পেশার ও ধরনের মজুরি নির্ধারণের প্রক্রিয়া (পে কমিশন, ওয়েজ এন্ড প্রোডাকটিভিটি কমিশন, নিম্নমত মজুরি বোর্ড ইত্যাদি) সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের সংস্কার করে জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করা যার ৩টি ভাগ থাকবে;

- জাতীয় নিম্নতম মজুরি
- শিল্পসেক্টর ভিত্তিক নিম্নতম মজুরি
- বিশেষ পেশাজীবীদের জন্য নিম্নতম মজুরি।

স্থায়ী জাতীয় মজুরি কমিশন

ক) জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য শ্রম, শ্রম অর্থনীতি ও মজুরি বিষয়ে অভিজ্ঞ/দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ এবং শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি স্থায়ী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠন করা। এই কমিশনের আওতায় সরকারি পে কমিশন এবং মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, সংবাদ পত্র ওয়েজ বোর্ড অন্তর্ভুক্ত হবে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন প্রতি বছর মর্যাদাপূর্ণ জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরি হালনাগাদ করে ঘোষণা করবে।

খ) সেক্টর/খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য স্থায়ী জাতীয় মজুরি কমিশনের অধীনে এক বা একাধিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ কমিটি গঠন করা।

গ) জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশনের কাঠামো ও কার্যপরিধিসহ অনান্য সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি শ্রম আইনে অন্তর্ভূক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনী সংস্কার/সংশোধন করা।

ঘ) মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে যৌথ ভাবে নিয়মিত সংলাপের আয়োজনের বিধান রাখা এবং ন্যায্য মজুরির সুফল বিষয়ে গবেষণা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা।

৪। বিশেষ ইস্যুভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা

৪.১ ব্যবসা ও মানবাধিকার প্রেক্ষিতে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ

ক) দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রণয়ন

দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ক একটি বিস্তৃত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) তৈরি করা যা একটি কৌশলগত কাঠামো হিসেবে মানবাধিকার ও পরিবেশগত লঙ্ঘন চিহ্নিত, প্রতিরোধ, প্রশমন এবং প্রতিকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ প্রণয়ন করতে পারে, বিশেষ করে বাংলাদেশের শিল্পখাতে মানবাধিকার সুরক্ষা ও আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের শিল্পের ভাবমূর্তি উন্নত করতে এটি প্রণয়ন করা জরুরি। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রস্তুত ও বাস্তবায়নে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা।

খ) শ্রম আইনে মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা

- শ্রম আইনে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে শিল্পের জন্য হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়া অনুসরণে বাধ্যবাধকতা তৈরি করা।
- আন্তর্জাতিক নীতি ও আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স বিষয়ক একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করা যা শিল্পের আকার ও পরিসর অনুযায়ী ধাপে ধাপে প্রযোজ্য হবে এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার সংক্রান্ত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

গ) জাতীয় শ্রমিক অধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং নির্দিষ্ট HRDD তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করা. প্রস্তাবিত স্থায়ী জাতীয় শ্রম কমিশন (National Labour Commission) এর আওতায় ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) মনিটরিং ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করা।

ঘ) রপ্তানিখাতসহ বৃহৎ শিল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিক মানবাধিকার ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণে স্থায়ী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা

- রপ্তানি খাতসহ বৃহৎ শিল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিক একটি স্বাধীন ও বিস্তৃত মূল্যায়ন (Independent and Comprehensive Assessment) পরিচালনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যা রপ্তানি খাতসহ অন্যান্য বৃহৎ শিল্পে পর্যায়ক্রমে মানবাধিকার ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণ করবে।

- একটি জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণের তথ্য, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কিত তথ্য, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ এবং যোগাযোগ ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ থাকলে এটি একাধিক অডিটের প্রয়োজনীয়তা কমাবে এবং সরকার, ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াবে।

ঙ) দেশের সকল রপ্তানিমুখি ও বৃহৎ শিল্পের সরবরাহ (Supply Chain) চেইনের সুনির্দিষ্ট কাঠামো, ব্যাপ্তি ও প্রবাহ নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষদের (Stakeholders) সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে একটি বিস্তৃত জাতীয় তথ্যভাণ্ডার (Comprehensive Database) তৈরি করা। এতে দেশের রপ্তানিমুখি কারখানা, শ্রমিক, সরবরাহকারী ও অন্যান্য অংশীদারদের চিহ্নিত করা সহজ হবে এবং মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ সহজতর হবে।

চ) বাণিজ্য চুক্তিতে মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) অনুসরণের বাধ্যতামূলক সামাজিক শর্ত/ধারা সংযোজন যেখানে মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) মানদণ্ড অনুসরণের স্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে।

ছ) সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি

- ব্যবসা এবং মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেমন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। এছাড়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজের সংগঠন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা।

৪.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও ন্যায্য রূপান্তর

ক) একটি শ্রম বান্ধব জাতীয় জলবায়ু ন্যায্যতা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা, যা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য জলবায়ু ক্ষতিপূরণে ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে।

খ) জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন

- সরকার, মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক ও সামাজিক অংশীজনদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে একটি জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন করা যা শ্রমিক এবং শিল্প উভয়ের জন্য একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক, যৌক্তিক এবং সুরক্ষামূলক রূপান্তরের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে।
- জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামোতে বিশেষ খাতভিত্তিক পরিকল্পনা বা রূপরেখা বা নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) ন্যায্য রূপান্তর পরামর্শক পরিষদ গঠন

ত্রিপক্ষীয় নীতি অনুসরণ করে জাতীয় পর্যায়ে একটি ন্যায্য রূপান্তর পরামর্শক পরিষদ গঠন করা যার কাজ হবে শিল্পে সবুজায়নের মূল অন্তরায়সমূহ এবং অবিচারসমূহ চিহ্নিত করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করা।

ঘ) জাতীয় জলবায়ু ও ন্যায্য রূপান্তর তহবিল

জলবায়ু পরিবর্তন ও সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরজনিত ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবিলা ও সামজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকারি ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে তহবিল গঠন; *এর* অধীনে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় সামজিক সুরক্ষার আওতা বৃদ্ধি।

ঙ) জলবায়ু পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি: কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সক্ষম ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যাতে তারা গ্রিন ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে সহজেই নতুন নতুন ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারে এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান মনিটরিং করতে পারে।

চ) অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জলবায়ু বিষয়ক নীতিসমূহ হালনাগাদ ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

ছ) পুনর্বাসন, দক্ষতা বৃদ্ধি, আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং নিশ্চিত করা: সবুজ রূপান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসন, আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং নিশ্চিত করা প্রয়োজন। পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে গবেষণা পরিচালনা করে ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি বিস্তৃত এবং সহজলভ্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করা আবশ্যক।

জ) নারীদের প্রতি সংবেদনশীল ন্যায্য রূপান্তর নীতি: নারীদের প্রতি সংবেদনশীল ন্যায্য রূপান্তর নীতি নিশ্চিত করতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নারী শ্রমিকদের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রয়োজনের বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঝ) আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডসমূহ এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব:

- ব্র্যান্ডসমূহ, প্রধান রপ্তানি গন্তব্যের দেশসমূহ ও অঞ্চলসমূহ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি যারা রপ্তানিমুখি শিল্পে টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়া উৎসাহিত করে তাদেরকে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের অংশ হিসেবে রূপান্তরকালীন সময়ের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প প্রণয়নে কারিগরি ও আর্থিকভাবে ভূমিকার বিষয়টি নিশ্চিত করা।

ঞ) সবুজ রূপান্তর নির্দেশিকা

বাংলাদেশের যে কোনো খাতে পরিবেশ বান্ধব শিল্প বা সবুজ রূপান্তর বা অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের মতো যে কোনো পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় তা প্রযুক্তিগত অভিযোজন হোক বা ডিজিটালাইজেশন হোক বা অটোমেশন হোক বা রোবটের ব্যবহার বিষয়ে হোক — তা যাতে ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়, এজন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তর কাঠামো তৈরি এবং ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি মেনে ন্যায় বিচারকে অবশ্যই জলবায়ু সংকট মোকাবেলার যে কোনো উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে নির্দেশনা প্রণয়ন।

৪.৩ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সরকারি ক্রয় ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি

ক) আইএলও কোর কনভেনশন অনুসারে মৌলিক শ্রমিক অধিকারের পাশাপাশি, সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ন্যায্য মজুরি ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার এবং বিশেষ করে পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক ন্যায্য রূপান্তরের নীতিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড প্রণয়ন করা।

খ) সকল ধরনের সরকারি প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে (Public Procurement) ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড বাধ্যতামূলক মেনে চলার নীতি বা শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা যাতে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘন না হয়।

ঘ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়িক ঋণ প্রদান করার আগে ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড বাধ্যতামূলক মেনে চলার শর্ত আরোপ করতে পারে। এর ফলে এক দিকে যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি মানবাধিকার, শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষায় সচেষ্ট থাকবে একই সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করবে।

ঙ) সরকারের ব্যবসার নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সামাজিক শর্ত মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা যাতে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিগুলি শ্রমিক অধিকার, মানবাধিকার ও টেকসই পরিবেশের বিধানগুলি মেনে চলে।

চ) বাংলাদেশ সরকারের কর ছাড় নীতিমালায় বিদ্যমান শর্তের পাশাপাশি সামাজিক শর্তসমূহ আরোপ করা, যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালুকরণের পাশাপাশি শিল্পে বা ব্যবসায় সামাজিক শর্ত মানদণ্ড মেনে চলতে হবে।

ছ) সরকারি প্রণোদনা (Government Incentives) লাভে সামাজিক শর্ত আরোপ করার মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণ, পরিবেশ সুরক্ষা ও ন্যায়সঙ্গত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

৫। বিশেষ শ্রম-জনগোষ্ঠীদের অধিকার ও কল্যাণে সংস্কার প্রস্তাবনা

৫.১ লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রান্তিক শ্রমগোষ্ঠী

নারী শ্রমিক

প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী

ক) কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে সামাজিক সংলাপ, যৌথ দরকষাকষি বা শিল্প সম্পর্কিত যে কোনো শ্রমিক প্রতিনিধিত্বমূলক কাঠামোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ন্যায্যতার ভিত্তিতে নারীর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

খ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের সকল পর্যায়ের কমিটিতে আনুপাতিক হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা।

গ) যৌথ দরকষাকষি ও দাবিনামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নারী নেতৃবৃন্দের মতামত ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেয়া।

ঘ) ফেডারেশনগুলির মধ্যে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নারী নেতৃত্বসহ কার্যকর হয়রানি-বিরোধী কমিটি গঠন করা।

ঙ) নারী নেতৃত্বের বিকাশে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। সরকারের শিল্প সম্পর্ক ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রমে নারী নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা।

চ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর জন্য গৃহীত সরকারি বিভিন্ন স্কিম ও প্রণোদনা বণ্টন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

নারীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণ

ক) সকল কর্মক্ষেত্রে ব্রেস্টফিডিং কর্নারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

খ) কর্মঘন এলাকায় কমিউনিটি-ভিত্তিক, স্বল্পমূল্যে ও ভর্তুকির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাবারের ক্যান্টিন এবং লন্ড্রি ও কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ) শ্রমঘন এলাকায় এবং কর্মক্ষেত্রে কার্যকর ও বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু/কিশোরদের জন্য নিরাপদ অবস্থান ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই সুবিধাগুলির ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও কর্মক্ষেত্রভিত্তিক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিবাযত্ন কেন্দ্র ও শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে 'ডিআইএফই'র পরিদর্শকদের সম্পৃক্ত করা।

ঙ) কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সংখ্যানুপাতে পৃথক ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা। প্রতিটি শৌচাগারে ঢাকনাযুক্ত আবর্জনার ঝুড়ি ও ধৌতকরণের পৃথক জায়গা রাখা।

চ) কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের মাসিককালীন জরুরি প্রয়োজন মেটাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা।

ছ) কর্মক্ষেত্রে স্থাপিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নারী ডাক্তার ও নার্সের পাশাপাশি নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জ) নারী শ্রমিকদের জন্য নারীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিরাপত্তা কমিটির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি, এই কমিটিতে নারীদের সমানুপাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঝ) রাত্রিকালীন কাজে নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের লিখিত সম্মতি গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং, নারীদের রাতে নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্য কর্মস্থল থেকে পরিবহন সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঞ) দেশের জেলা শহরসমূহে সরকারিভাবে কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে নিম্ন আয়ের নারী শ্রমিকের জন্য আবাসিক কলোনি স্থাপন করা।

ট) নারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকার কর্মজীবী নারীদের ভিন্ন চাহিদা বিবেচনায় রেখে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি নারীবান্ধব নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে নারী-বান্ধব পরিবহন, পর্যাপ্ত আলোযুক্ত স্টপেজ স্থাপন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর করা

নারী শ্রমিকদের কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা

ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য বিরতি ব্যতীত সর্বোচ্চ আট ঘণ্টার কর্মদিবস এবং সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের (DIFE) মাধ্যমে তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা। মাতৃত্বকালীন ছুটির পর পুনরায় কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের জন্য ছয় মাসের নমনীয় কর্মঘণ্টা প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা।

খ) প্রাতিষ্ঠনিক শ্রমিকদের জন্য প্রতিষ্ঠান-কারখানায় ডে কেয়ার ও কর্মঘন এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক ডেকেয়ার, স্বল্পমূল্যে ও ভর্তুকির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাবারের ক্যান্টিন এবং লন্ড্রি ও কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ) কর্মঘন এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক সান্ধ্যকালীন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এছাড়া আইএলও কনভেনশন ১৫৬ (C156 - Workers with Family Responsibilities Convention, 1981) অনুযায়ী শ্রম আইনে সংশোধনী আনার বিষয়ে নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

ঘ) শ্রমিক এলাকায় শিশুদের সরকারি স্কুল , বিনোদনের স্থান এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষা স্কুল গঠনে সরকারের ভূমিকা নেয়া।

নারী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন

ক) প্রস্তাবিত তথ্য ভান্ডারে বাংলাদেশের সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা এবং এই তথ্যভাণ্ডার সম্পর্কে নারী শ্রমিকদের অবহিত করার জন্য কার্যকর প্রচারণা চালানো।

খ) নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কার্যকর যোগাযোগ, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, নেতৃত্ব ও পরিচালনার মতো সামাজিক দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) বিকল্প কর্মসংস্থান যেমন কেয়ার সেক্টর, গিগ ইকোনোমি, প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা খাত ও ফ্রিলান্সিংয়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেন্টারগুলিতে নারীদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ হোস্টেল সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঙ) বিদেশে কর্মসংস্থানের চাহিদাসম্পন্ন সেক্টর (যেমন কেয়ারগিভার, নার্সিং) এর উপর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রযুক্তি, প্রকৌশল, ড্রাইভিং ও ব্যবস্থাপনার মতো পুরুষ-প্রধান দক্ষতাভিত্তিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। পাশাপাশি, চাকরির সুযোগ তৈরির জন্য নিয়োগ অভিযান, চাকরি মেলা আয়োজন এবং নারীদের অংশগ্রহণ কম এমন খাতগুলিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঝ) STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) বিষয়ে নারীদের উৎসাহিত করতে জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় প্রোগ্রাম, বিশেষ স্কলারশিপ, পেশাদারি প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষানবিস সুযোগ প্রদান করা। স্কুলে ছাত্রীদের STEM-এ উৎসাহিত করতে, বর্তমানে সফল STEM-এ নিয়োজিত নারীদের ইতিবাচক উদাহরণ তুলে ধরা এবং মেন্টরশিপের ব্যবস্থা করা।

ঞ) চলমান জাতীয় চাকরি বাতায়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি নারীদের এটি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া, এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।

তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া জনগোষ্ঠী

ক) দেশের তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে কোনও উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে তাঁদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা ও পরিচয়পত্র প্রদান করা।

খ) যথাযথ দক্ষতা উন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীকে মূলধারার কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্তি ও জীবনমান উন্নয়নে সঠিক উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তাদের মতামত এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) হিজড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে তাদের জন্য সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিসর বৃদ্ধি করা।

ঘ) তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা, যেখানে তাঁদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা বিনোদনের সুব্যবস্থা থাকবে।

যুব শ্রম জনগোষ্ঠী

ক) সরকারি বিভিন্ন দলিলে (যেমন শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২, জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ এবং জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২) যুবকদের সংজ্ঞায় বয়সের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভিন্নতা দূর করে যুবকদের একটি একক সংজ্ঞা (নির্ধারিত বয়স) প্রদান করা।

খ) শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে না থাকা তরুণদের জন্য (NEET) একটি লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষানবিস ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা। এই কর্মসূচি শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হবে, যাতে তরুণরা উচ্চ-বৃদ্ধি খাতগুলিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারে।

গ) যুবকদের STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় প্রোগ্রাম চালুকরণ, যার মধ্যে স্কলারশিপ, পেশাদারি প্রশিক্ষণ এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিল্পখাতের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে STEM স্নাতকদের জন্য কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলি বর্তমান বাজারের চাহিদার সাথে মিলিয়ে নির্ধারণ করা।

ঘ) কর্মের গুরুত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন পাঠ্যক্রমে কর্মনৈতিক (work ethics) নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা, বিভিন্ন আয়ের শ্রেণির পেশাজীবীদের দিয়ে অতিথি বক্তৃতার আয়োজন, পিতামাতাদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা শিশুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার্থীদের পেশাজীবীদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করে যুবদের গঠনমূলক কাজে যুক্ত করা।

ঙ) শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষানবিশ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা, যাতে তরুণরা উচ্চ-বৃদ্ধি খাতগুলিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারে।

প্রবীণ শ্রম জনগোষ্ঠী

ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক, অস্থায়ী এবং স্বনিয়োজিত কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর অবসরের বয়স নির্ধারণ করে তাঁদের অবসরকালীন ভাতা বা সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা। এক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণে 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩' বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। এ নীতিমালা অনুযায়ী, ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

খ) কাজে নিয়োজিত নন এমন দরিদ্র প্রবীণ শ্রম জনগোষ্ঠীকে বয়স্ক ভাতার আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের দৈনন্দিন চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং অন্যান্য চাহিদা) বিবেচনায় বয়স্ক ভাতার পরিমাণ যৌক্তিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা। এছাড়া, বয়স্ক ভাতায় অন্তর্ভুক্তির ন্যূনতম বয়স জাতীয় প্রবীণ নীতিমালায় উল্লিখিত প্রবীণদের বয়স বিবেচনায় ৬০ বছর নির্ধারণ করা।

গ) অবসর পূর্ব মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে অবসর পরবর্তী কালে তাদের সামাজিক সম্পৃক্ততা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে অবসর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত সামর্থ্য ও বয়স বিবেচনা করে স্ব-স্ব গ্রাম ও শহর এলাকায় তাঁদের এমন কাজে যুক্ত করা যাতে তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নতুন প্রজন্মের সাথে বিনিময় ও স্থানান্তর করতে পারে। এ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম উৎসাহিত ও জোরদার করা। আগ্রহী প্রবীণ ব্যক্তির স্বকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে সুদমুক্ত বা স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য বিমা প্রণয়ন করা বা সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বিনামূল্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা চালু করা। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রবীণ ব্যক্তিগণ যাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত চিকিৎসা পেতে পারেন এজন্য পৃথক কাউন্টার ও ওয়ার্ড স্থাপন করা এবং তাঁদের চিকিৎসার সুবিধার্থে 'হেলথ সার্ভিস কার্ড' চালু করা।

আদিবাসী/ বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী

ক) আদিবাসী বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুসমর্থন করা এবং আইন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন বৈষম্য বিলোপ আইন চূড়ান্ত করে এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

খ) আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমিকসহ সকল সম্প্রদায়ের শ্রমিক যাতে তাদের বৃহৎ উৎসবের সময় ছুটি ভোগ করতে পারেন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা শ্রম আইন ও বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

গ) তাদের ভোগকৃত ভূমি দখল বন্ধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারি উদ্যোগে তাদেরকে উপযুক্ত পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। বিশেষ করে স্থানীয় চাহিদা বিবেচনা করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আদিবাসী/ বিভিন্ন জাতিসত্তার যুবকদের ট্যুরিজম শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ঘ) আদিবাসী/ বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীকে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে সকল সরকারি চাকরিতে তাদের জন্য কোটা যৌক্তিকীকরণ করে সংরক্ষণ করা।

ঙ) আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর বংশ পরম্পরায় চলে আসা কুটির শিল্প টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারিভাবে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসের মাধ্যমে আদিবাসীদের কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। একই সাথে উদ্যোক্তা হিসাবে নানা প্রণোদনা প্রদান, সুদমুক্ত ঋণ সহায়তা এবং প্রয়োজনে তাদের জন্য পৃথক ব্যাংক ঋণ নীতিমালা গ্রহণ করা।

চ) আদিবাসী/ বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে বাজার ব্যবস্থাপনায় তদারকি বৃদ্ধিসহ মধ্যস্বত্বভোগী ও সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রতিবন্ধী শ্রম জনগোষ্ঠী

ক) প্রতিবন্ধী শ্রমিকের সংজ্ঞা শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিবন্ধী শ্রমিকের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও সুরক্ষা, নারী প্রতিবন্ধীদের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত বিধান সম্বলিত একটি অধ্যায় শ্রম আইনে সংযুক্ত করা। এক্ষেত্রে, 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেমন- প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার রাখেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের সাথে কোনো ধরনের কোনও বৈষম্য করা যাবেনা, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ করে নারী প্রতিবন্ধীদের বিষয় বিবেচনা করে সবার জন্য সঠিক সুযোগ-সুবিধা ও সমতা নিশ্চিত করা, তাঁদের 'প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা' প্রাপ্তির অধিকার, দক্ষতা প্রশিক্ষণ — এ সমস্ত বিধান শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লিঙ্গভিত্তিক ডাটাবেইজ তৈরি করা যাতে সেই ডাটাবেইজ অনুসরণ করে লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতার ধরন বিবেচনায় তাঁদের কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ তৈরি করা যায়। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রসারিত করা। বিশ্ববাজারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের চাহিদা জরিপ করে সে অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ প্রতিবন্ধী বান্ধব করা।

গ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা।

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করতে প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তাদের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিতে পারে যেমন; সুদমুক্ত বা স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান। বেসরকারি সংস্থাসমূহকে এ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করা।

ঙ) প্রতিটি কর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধার্থে সব ধরনের গণপরিবহন যেমন মেট্রোরেল, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার প্রতিবন্ধী বান্ধব করা। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য কারখানা বা ভবন নির্মাণে Building Construction Act, 1952 এবং তার অধীন বিধি অনুসরণ করা যেমন লিফট, র‍্যাম্প সুবিধা থাকা। গণপরিবহণে প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন অনুযায়ী মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকর করা।

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে কোন প্রতিষ্ঠানের মোট জনবলের ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী হলে বার্ষিক করের ৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং এ বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধি করা।

অভিবাসী শ্রমিক

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়া

ক) রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা-২০২৫ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা-২০২০ বাস্তবায়ন করা, এবং এই শ্রেণিবিভাগ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, যাতে বিদেশগমন প্রত্যাশী অভিবাসী শ্রমিকেরা সঠিক তথ্য পেতে পারেন।

খ) 'ডিজিটাল কমপ্লেইন সিস্টেম' প্রবর্তন করা যাতে অভিযোগকারীরা 'ট্র্যাকিং' এর মাধ্যমে অভিযোগের অবস্থা জানতে পারে।

গ) ভিসা-বাণিজ্য ও অবৈধ এজেন্সিগুলির কার্যক্রম বন্ধ করতে আইনি উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং মধ্যসত্ত্বভোগী বা সাব-এজেন্টদেরকে জবাবদিহিমূলক কাঠামোর মধ্যে আনা। বিদেশগমন কালে প্রত্যেক কর্মীর বিএমইটি রেজিস্ট্রেশন ফি,

রিক্রুটিং এজেন্সির এককালীন জামানত এবং করিডোর স্প্যাসিফিক (নির্দিষ্ট দেশ, যেমন, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব ইত্যাদি) জামানত যৌক্তিক হারে কমানো।

ঘ) সরকার কর্তৃক গৃহীত রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিদের শ্রেণিবিন্যাস বিধি অনুযায়ী এজেন্সিগুলির সম্ভাব্য গন্তব্যদেশে মার্কেটিং ও প্রোমোশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ পন্থায় বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের ব্যবস্থা রাখা, যাতে করে এজেন্সিগুলির মধ্যে নিয়মিত নিয়োগের প্রতিযোগিতা তৈরি হয় এবং যে কোনো ধরনের বিদ্যমান অবৈধ অর্থ প্রেরণের প্রবণতা হ্রাস পায়।

ঙ) শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত চুক্তিতে সমঝোতা চুক্তির পরিবর্তে 'দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি' স্বাক্ষরের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং সকল স্টেকহোল্ডার ও রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলির সাথে পরামর্শক্রমে চুক্তির বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা এবং চুক্তিসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

চ) অভিবাসন প্রক্রিয়া ও ভিসা-সংক্রান্ত সকল তথ্য সহজলভ্য করা। মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বোয়েসেল ও বায়রা'র ওয়েবসাইটে অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ (যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকার-নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া) সহজভাবে পরিবেশন করা।

ছ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ ও সংশোধনী-২০২৩, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী অধ্যাদেশ-২০২৪ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন-২০১৮ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৭ যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা।

জ) সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক অনুসমর্থনকৃত সনদ The UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families-1990 এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

ঝ) অভিবাসন ইচ্ছুক শ্রমিকের জন্য বিদ্যমান ডাটাবেজকে শ্রমিকের দক্ষতা ও সার্টিফিকেশনসহ প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে নিয়মিত আপডেট করার মাধ্যমে একটি কার্যকরী ডাটাবেজে উন্নীত করা, যাতে করে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলি ডাটাবেজ ব্যবহার করে কর্মী নির্বাচন করতে পারে।

ঞ) শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইএলও'র আর্ন্তজাতিক সনদের অনুসমর্থন করা।

অভিবাসী শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি

ক) বিএমইটি'র অধীনে ইন্সটিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)-সমূহের দক্ষতা ও কার্যকারীতাসমূহ মূল্যায়ন করা।

খ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে 'জব প্লেসমেন্ট' বাধ্যতামূলক করা ও তার প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং তদানুযায়ী সরকারের টিটিসিসমূহের বাজেট বরাদ্দ করা; 'শিক্ষানবিশ (এপ্রেন্টনশিপ)' নিয়োগের জন্য ব্যক্তিখাতের মালিকপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যেমে স্থানীয় বাজারেও কাজের সুযোগ তৈরি করা।

গ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে ভাষা ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ কোর্স প্রণয়ন করা এবং মান যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন করা।

ঘ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে 'আরপিএল', 'আপ-স্কিলিং' ও 'রি-স্কিলিং' প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের সঠিক কাজে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা

ক) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সকল সংস্থাসমূহের 'অ্যালোকেশন অব বিজনেস' অতি দ্রুত পরিমার্জন, সংশোধন ও সমন্বয় করা; যাতে করে সকলের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত থাকে ও দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হয়। প্রবাসী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা।

খ) প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য মানসম্মত 'প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ' প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

গ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ঋণ (বিশেষ করে প্রত্যাগত অভিবাসীদের জন্য) আবেদনের 'ডক্যুমেন্টেশন' ও 'প্রসেসিং' এ দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা ও অভিবাসন প্রত্যাশীদের অহেতুক হয়রানি বন্ধ করে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা এবং Key Performance Indicator 'কেপিআই' প্রবর্তন করা।

ঘ) লেবার এট্যাশেদেরকে সে দেশের বিদ্যমান 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি বা এমওইউ' মোতাবেক 'জয়েন্ট কমিটি' সভার আয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কোনো চুক্তি না থাকলে সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা, যা তাঁদের বছর ভিত্তিক 'পারফরম্যান্স'-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঙ) দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ শাখার বছরওয়ারি প্রতিবেদন প্রকাশ করা। প্রত্যেক লেবার এট্যাশেকে বিদেশে মিশনের পোস্টিং শেষে দেশে ফিরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতে কমপক্ষে ৩ বছর কাজ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

চ) দূতাবাস ও কনস্যুলার অফিসগুলিতে (লেবার উইংসহ) সেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দ দিয়ে সর্বস্তরে সেবা নিশ্চিত করা। এই কাজের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রম অভিবাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে প্রাধান্য দেওয়া; প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিকে 'চুক্তিভিত্তিক' নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

ছ) জেলা পর্যায়ে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, টিটিসি ও ওয়েলফেয়ার অফিসসমূহের কাজের সমন্বয় বৃদ্ধি; এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারকে সহজে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অফিসসমূহ একই স্থানে/ভবনে স্থাপন করা।

জ) অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ, সমস্যাবলি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা; তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রদান করা।

অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা

ক) ২০১৯ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিপত্র 'বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বীমা ব্যবস্থার' নিয়মিত মূল্যায়ন করা, যাতে করে প্রয়োজনবোধে বিমার কভারেজ, ব্যাপ্তি এবং উপকারভোগী বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

খ) 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড' ত্রিপক্ষীয় ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদের কাঠামো সংশোধন করা এবং বোর্ডে অভিবাসী কর্মীর প্রতিনিধিত্ব নিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত করা।

গ) প্রত্যাগত অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য 'রি-ইন্টিগ্রেশন' কর্মসূচি বোর্ডের 'অ্যালোকেশন অব বিজনেস'-এ নিয়মিত দায়িত্ব হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এজন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ করা।

ঘ) মন্ত্রণালয় হতে গন্তব্যদেশের সাথে 'দ্বি-পাক্ষিক সামাজিক সুরক্ষা চুক্তি'র ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

নারী অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্ভোগ

ক) নারী অভিবাসী শ্রমিকদের প্রেরণকারী ও গন্তব্য - দুই দেশেই ২৪/৭ হেল্পলাইন পরিষেবা কার্যকরভাবে চালু করা এবং লেবার এট্যাশেদের কাজে নারী অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ কাজ বাধ্যতামূলক করা।

খ) 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড' আইন, ২০১৮-তে নারী অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা, চিকিৎসা সুবিধা, দেশে-বিদেশে সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা এবং বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।

গ) নারী অভিবাসী শ্রমিকদের, বিশেষ করে প্রবাসী নারী গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিতে লেবার এট্যাশে, রিক্রুটিং এজেন্সি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ; এমনকি ট্রেড ইউনিয়নগুলোর কার্যকরী ভূমিকা পালন করা; বিশেষ করে অ্যাম্বাসিগুলিতে তাদের জন্য বিশেষ সেবা দিবস আয়োজন করা।

ঘ) ভিন্ন দেশে নারীদের গৃহকর্ম পেশা ছাড়াও অন্য পেশায় অন্তর্ভুক্তির জন্য গবেষণা ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো।

ঙ) অভিবাসী ও প্রত্যাগত অভিবাসী নারী শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান অভিবাসন আইন, বিধি ও নীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা; অথবা তাদের জন্য পৃথক আইন, বিধি ও নীতিমালা গ্রহণ করা; যাতে করে তাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা, সম্মান ও কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।

চ) নারীদের গৃহকর্মী ও গার্মেন্টস কর্মীর প্রশিক্ষণ ছাড়াও নতুন পেশার প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে প্রেরণ করা।

ছ) প্রত্যাগত অভিবাসী নারী শ্রমিকের জন্য বিশেষ কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করা; বিশেষ করে দুঃস্থ প্রত্যাগত নারী শ্রমিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা।

রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনা

রেমিট্যান্স প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রচলিত ডিজিটাল মাধ্যম এবং ব্যাংকিং প্রক্রিয়াগুলি সহজ ও দ্রুত করার পাশাপাশি লেনদেন ফি কমানো। স্বল্প খরচে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ ডিজিটাল ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে অভিবাসীদের উৎসাহিত করা।

অভিবাসী শ্রমিকদের পুনঃএকত্রীকরণ

ক) প্রত্যাগত শ্রমিকদের জন্য দ্রুত 'রি-ইন্টিগ্রেশন পলিসি' বাস্তবায়ন, বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, এবং সকল দুস্থ ও অসুস্থ শ্রমিকদের জন্য মাসিক ভিত্তিতে 'সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি' চালুসহ নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

খ) "ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডে'র তহবিল থেকে কোনো সরকারি ক্যাডার কর্মকর্তার বেতন ও ভাতাদি গ্রহণ বাতিল করা, এবং 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড'কে জেন্ডারভিত্তিক প্রত্যাগতদের তথ্য ও উপাত্ত নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করাসহ প্রত্যাগত নারী শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ট্রেড ইউনিয়নে অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ:

ক) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডে' প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

খ) অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় উৎস ও গন্তব্য দেশের সরকারের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি করা।

গ) প্রত্যাশী এবং প্রত্যাগত শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকার প্রদান করা।

অভিবাসী শ্রমিকদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ

ক) অভিবাসী শ্রমিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা এবং অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য স্ব স্ব কর্মস্থলের নিকটবর্তী দূতাবাস বা কনস্যুলার অফিসে গিয়ে অনলাইনে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করা।

পরিচ্ছন্নতাকর্মী/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শ্রমিক/দলিত জনগোষ্ঠী

ক) পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ নিশ্চিত করা।

খ) সুনির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো প্রস্তুত, দক্ষতাভিত্তিক পদোন্নতি এবং শ্রম আইন অনুযায়ী উৎসব বোনাস প্রদান করা।

গ) পেনশন, ভবিষ্যৎ তহবিল, স্বাস্থ্যসেবা এবং সন্তানদের শিক্ষার অধিকারসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা, এবং আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করতে "পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবাসিক এলাকা" স্থাপন করা।

গ) পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে আধুনিক উপকরণ সরবরাহ এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা। নির্দিষ্ট বিরতিতে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা এবং সবার জন্য হেলথ কার্ড সরবরাহ করা। তাদের জন্য ঝুঁকি ভাতা নির্ধারণ করা এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

ঘ) শিল্পভিত্তিক পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের নিরাপদ স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ওয়াশ কমিটি গঠন এবং সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা।

ঙ) নারী কর্মীদের জন্য ভারসাম্যপূর্ণ কাজের পরিবেশ, রুটিন এবং বিশেষ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতি গ্রহণ করা।

চ) দলিত/হরিজন জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন এবং তাদের প্রতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য শাস্তিযোগ্য করা।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক

ক) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তার জন্য বিশেষ নীতি গ্রহণপূর্বক আর্থিক সহায়তার জন্য বিশেষ/জরুরি তহবিল প্রতিষ্ঠা করা।

খ) জলবায়ু দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সবুজ অর্থনীতির বিকাশমান খাতগুলিতে তাদের পুনঃপ্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গ) পরিবেশবান্ধব শিল্পকে প্রণোদনা দেওয়ার পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ প্রণোদনা চালু করা।

৫.২ কৃষিভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

কৃষি শ্রমিক

ক) কৃষিকাজে নিয়োজিত সকল শ্রমিকদের কাজের ধরন, সময় ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সার্বক্ষণিক কৃষি শ্রমিক, খন্ডকালীন কৃষি শ্রমিক, ঋতুভিত্তিক বা অস্থায়ী কৃষি শ্রমিকদের সংজ্ঞায়িত করে শ্রমআইনে অন্তর্ভুক্ত করা। এ ক্ষেত্রে কি কি কাজ কৃষি কাজ হিসাবে গন্য হবে সে বিষয়ে শ্রম আইনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা।

খ) কৃষি শ্রমিকদের তার এলাকার স্থানীয় সরকার বা প্রশাসন কর্তৃক তার কাজের ধরন এবং প্রকৃতি অনুযায়ী সার্বক্ষনিক, খন্ডকালীন, ঋতুভিত্তিক শ্রমিক, বা অস্থানীয় শ্রমিক ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধিকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান করা।

গ) বিশেষ মৌসুমে কর্মহীনতা মোকাবিলায় ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষি শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থান বা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঘ) উপজেলা পর্যায়ে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণে নারীসহ সকল কৃষি শ্রমিককে দক্ষ শ্রমশক্তিতে পরিনত করা।

চাতাল/রাইস মিল শ্রমিক

ক) কর্মহীন চাতাল শ্রমিক, বিশেষত নারী শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, এবং ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা।

খ) চাতাল শ্রমিকদের ঋণ চক্র থেকে মুক্ত করতে সহজ শর্তে সরকারিভাবে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা।

চা শ্রমিক

চা শিল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যা গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে। চা শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যাসমূহ তথা ভূমি অধিকার, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, কারিগরি শিক্ষা, সন্তানদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কাজের সুযোগ, স্থায়ীকরণ, তাদের নিজের ও পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, ইউনিয়নের নিয়মিত নির্বাচন নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে কমিশন সুপারিশ হলো-- চা শিল্প ও শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলোর স্থায়ী ও কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক শ্রমিক ও নিয়োগকারী প্রতিনিধি, সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে আগামী ৬ মাসের মধ্যে একটি পৃথক কমিটি গঠন করা। এই কমিটি সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা, মতবিনিময় সভা হতে প্রাপ্ত মতামত, সুপারিশ ও দাবীসমূহ বিবেচনায় নিয়ে এবং অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত সুপারিশমালা তৈরি করবে যাতে করে চা খাতের বিদ্যমান সকল সমস্যা সমাধানে একটি সামগ্রিক পথনির্দেশনা পাওয়া যায়।

৫.৩ রপ্তানিমুখি শিল্প ও এলাকা ভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

গার্মেন্টস (তৈরি পোশাক) খাতের শ্রমিক

ক) পোশাক খাতে শ্রমিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা করার সুযোগ ও প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিতে সরকার ট্রেড ইউনিয়ন শর্ত শিথীল যোগ করা।

খ) সকল শ্রমিকের কাজের শর্ত উল্লেখ করে নিয়োগ পত্র নিশ্চিতের ব্যবস্থা তদারকি জোরদার করা।

গ) গার্মেন্টস শিল্পে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও পরিবর্তিত চাহিদার সাথে শ্রমিকদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য মালিক ও সরকারের উদ্যোগে শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণের নতুন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাদের দক্ষতার সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ঘ) কারখানায় ও এলাকায় প্রয়োজনীয় যথাযথ মানসম্পন্ন ডে কেয়ার, বাসস্থান ও কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ) যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে হাইকোর্ট নির্দেশ ২০০৯ ও আইএলও ১৯০ নীতিমালা ও অভিযোগসেল গঠন করা।

চ) কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের প্রমোশন এবং আপগ্রেডেশনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রমোশন ও আপগ্রেডেশনের নীতি তৈরি করা, যাতে তাদের ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ নিশ্চিত হয় এবং কারখানার ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়।

ছ) শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কারখানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় স্কিম বা প্রোগ্রাম চালু করা। এছাড়া প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে পেশাদার কাউন্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

জ) কারখানাগুলি যেন তাদের অটোমেশন/প্রযুক্তিগত পরিবর্তন পরিকল্পনা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং দক্ষতার চাহিদা আগে থেকেই প্রকাশ করে সে জন্য কৌশল নির্ধারণ করা।

ঝ) কোনো শ্রমিককে সম্মতি ব্যতিরেকে কর্ম দিবসে অতিরিক্ত কাজ না করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা । সর্বদাই এ শিল্পে কাজের চাপ এবং অতিরিক্ত শ্রম/শ্রমিকের চাহিদা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে, শ্রমিককে অমানবিক কর্মঘণ্টার চাপ হতে মুক্ত করতে বিভিন্ন কারখানায় 'শিফট ভিত্তিক' কাজ চালু করা। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, উতসব ছুটিসহ সকল ছুটি যথাযথ ভাবে কার্যকর আছে কিনা তদারকি করা।

ঞ) বিজিএমইএ/বিকেএমইএ'র ডাটাবেস হতে কারখানাগুলির মধ্যে শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিকর তথ্য শেয়ারিং বন্ধ করা, যাতে তা তাদের ক্ষতির কারণ না হয়, ভবিষ্যৎ কাজের সুযোগের জন্য কোনো প্রতিবন্ধতকা সৃষ্টি না করে।

ট) রানা প্লাজা ও তাজরীন শ্রমিক প্রাণহানীর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত সমপন্ন করা। দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরনের জন্য মানদন্ড পূর্ণ মূল্যায়ন করা।

ঠ) পোশাক শ্রমিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা, স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর গঠনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা কোর্স ও মিডিয়ায় শ্রমিকের জীবন গাঁথা মর্যাদাপূর্ণভাবে উত্থাপন ও ইতিহাস সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) শ্রমিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হয়ারানীমূলক সকল মামলা প্রত্যাহারে ব্যবস্থা নেয়া। শ্রমিকের আইনি সুরক্ষায় সরকারের উদ্যোগী ভূমিকা রাখা।

ঢ) রাত্রিকালীন কাজের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর পক্ষ হতে পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ণ) বাংলাদেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী রপ্তানিমুখী তৈরী পোশাক শিল্পের জন্য একটি "জাতীয় কর্মস্থল নিরাপত্তা নীতিমালা" প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে দেশি বিদেশি সকলেই একটি একক মানদণ্ড মেনে চলতে পারে।

ত) সকল রপ্তানিমুখী শিল্পের সুরক্ষা তদারকি ও নিশ্চিত করার লক্ষে একটি সেফটি ইউনিট গঠন প্রয়োজন, তা একটি। ত্রি-পক্ষীয় উচ্চ পর্যায়ের কমিটির কাছে যার জবাবদিহিতা থাকবে।

থ) পোশাক শিল্পে কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি মধ্যম মেয়াদী রোডম্যাপ প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

দ) কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশীয় সামর্থ্য উন্নয়ন এবং দেশীয় বিশেষজ্ঞসহ বিশেষ ব্যবস্থা সরকারি ব্যবস্থাপনা তৈরি করা। এই ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

ধ) জাতীয়ভাবে সরকার, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়িনের যৌথ অংশীদারিত্বে গার্মেন্টস শিল্পের জন্য ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন এবং ন্যায্য রূপান্তরের বিষয়সমূহ মনিটরিংয়ের জন্য মনিটরিং ইউনিট গঠন।

চিংড়ি শিল্প শ্রমিক

ক) চিংড়ি শিল্পে শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ ও ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা।

খ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি নির্ণয়ে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা ও হেলথ কার্ড প্রদান করা।

গ) নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক বিশ্রাম স্থান, মাতৃদুগ্ধ কর্নার, সুপেয় পানি ও শৌচাগারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঘ) চিংড়ি শিল্পে নারী-পুরুষের সমমানের কাজে সমমজুরি নিশ্চিত করা।

ট্যানারি শ্রমিক

ক) ট্যানারি শিল্পে অস্থায়ী ও মধ্যস্বত্বভোগী কনট্রাক্টরের মাধ্যমে নিয়োগ বন্ধ করে শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ এবং শ্রম আইন অনুযায়ী চাকরির শর্ত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

খ) ট্যানারি শিল্পে ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়ন এবং পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে মজুরি মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করা।

গ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও রাসায়নিক ঝুঁকি বিবেচনায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ এবং কর্মপরিবেশজনিত ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঘ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় আলাদা স্বাস্থ্য ঝুঁকি নীতিমালা প্রণয়ন এবং ট্যানারিতে OSH অফিসার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা।

ঙ) চামড়া শিল্প নগরীতে শ্রমিকদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা, শ্রমিক আবাসন স্থাপন এবং শ্রমিক পরিবারের সন্তানের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শ্রমিক

ক) ইপিজেড ও ইপিজেড-বহির্ভূত শ্রমিকদের জন্য সমান শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে একটি সুসংহত ও একক শ্রম আইন প্রণয়ন করা।

খ) ইপিজেড শ্রমিকদের শ্রম আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ এবং শ্রমিক কল্যাণ সমিতিসমূহের সঙ্গে বেসরকারি সংস্থার সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ নিশ্চিত করা।

গ) ইপিজেডের কার্যক্রম বিবেচনায় পৃথক শ্রম আইন প্রণয়ন করলে তা দেশের সাধারণ শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখা এবং অন্যান্য শ্রমিকদের ন্যায় ইপিজেড শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকার এবং আইনি সহায়তার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা।

ডক/ বন্দর শ্রমিক

ক) বন্দর ও ডক শ্রমিকদের আইএলও কনভেনশন ৮৭, ৯৮ এবং শ্রম আইন ২০০৬ এর ভিত্তিতে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণকারী শ্রম আইনের ১৮৫(ক) ধারা বাতিল করা।

খ) দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত শ্রমিক কর্মচারীদের সকল সুযোগ সুবিধা বহাল রাখা। ২৫ অক্টোবর ২০১০ সালে আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে গৃহীত সমঝোতা স্মারক (MOU) এর চুক্তি মোতাবেক ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের বাই রোটেশন বুকিং এর ব্যবস্থা করা।

গ) বার্থ অপারেটরের মাধ্যমে নিয়োজিত সকল শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়মিত করা ও বন্দরের শ্রম শাখার অন্তর্ভূক্ত করে নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র প্রদান এবং বেতন বৈষম্য দূরীকরণে রোটেশনের কাজ দেয়া।

ঘ) বন্দরের শ্রমিকদের ঝুঁকি ভাতা, উৎসব ভাতা, ও পেনশন প্রদান করা।

ঙ) যে সকল প্রাইভেট কোম্পানির সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হওয়ার পথে তাদের সাথে নতুন করে কোনো চুক্তি না করা এবং বন্দরকে বেসরকারিকরণের সকল প্রক্রিয়া বন্ধ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বন্দরের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।

চ) বন্দরে নতুন করে আউটসোসিং ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা।

ছ) কর্মরত ও বন্দরে শ্রম শাখায় যাচাই-বাছাইকৃত সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের বন্দরের পরিচয়পত্র প্রদান করা।

জ) কর্মরত সকল শ্রমিকদের দুর্ঘটনার ঝুকিঁ মুক্ত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.৩ শিল্পভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

পাটকল/ বন্ধ কারখানা

ক) সকল বন্ধ সরকারি পাটকল পুনরায় রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চালুর ব্যবস্থা করা।

খ) দেশের পাটশিল্প ও পাটচাষ টেকসই করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ পর্যালোচনা করে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

গ) পাটকলের অপূরণীয় ক্ষতির বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত ও পর্যালোচনা করা।

ঘ) পাটকল এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনা করা।

ঙ) পাটখাতকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

চ) শ্রমিকদের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণসহ তাদের পাওনা পরিশোধ করে জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করা।

ছ) বন্ধ কারখানাগুলোকে বহুমুখী শ্রমঘন শিল্পে রূপান্তরের মাধ্যমে কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

জ) পাটকল শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

জাহাজ ভাঙা শিল্প

ক) দুই জাহাজ ভাঙার মধ্যবর্তী কর্মহীন সময়ে শ্রমিকদের ভাতা প্রদান ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করা।

খ) আধুনিক প্রযুক্তি, উন্নত ডিজাইন ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করে শিপব্রেকিং শিল্পকে নিরাপদ ও দক্ষ করা।

গ) বিপজ্জনক পদার্থের সংস্পর্শে আসা শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ গোসলের ব্যবস্থা ও সুরক্ষিত পোশাক সরবরাহ করা।

ঘ) ঝুঁকি চিহ্নিতকরণে রঙ ব্যবহারে নিয়ম মানা ও শ্রমিকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা।

ঙ) ইয়ার্ড ভিত্তিক এবং প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ ভিত্তিক উভয় পদ্ধতিতেই ইউনিয়ন রেজিস্টেশনের সুযোগ থাকা এবং এ শিল্প একমাত্র চট্টগ্রামে হওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করতে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের ক্ষমতা চট্টগ্রাম শ্রম দপ্তরে স্থানান্তর করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের ক্ষেত্রে একাধিক বিভাগীয় ট্রেড ইউনিয়ন অন্তর্ভূক্তির শর্ত বাতিল করা।

চ) ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনায় ভয়ভীতি প্রদর্শন ও চাকরিচ্যুতি বন্ধে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছ) শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, কাজের ধারাবাহিকতা ও চাকরির অবসানে প্রাপ্য নিশ্চিত করা।

জ) আহত ও অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা করা।

ঝ) অতীত দুর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশ ও দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করা।

ঞ) ইয়ার্ড ভিত্তিক সেফটি কমিটি ও এলাকাভিত্তিক নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা।

ট) স্থানীয় কৃষি জমি ও জলাশয়ের ক্ষতি রোধে গবেষণা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

ঠ) হংকং কনভেনশন বাস্তবায়ন ও প্রযুক্তি উন্নয়নে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ক্ষুদ্র পাদুকা শিল্প শ্রমিক

ক) শ্রম আইন অনুসারে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করা।

খ) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পৃথক শিল্প এলাকা গড়ে তুলে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা, কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কহার কমানো ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পাদুকা শিল্পের উন্নয়ন করা।

গ) প্রতিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার, বাসস্ট্যান্ড এবং অফিস-আদালত চত্বরে পাদুকা শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ছোট ছোট কর্ম চত্বর বরাদ্দ করা। শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও স্বাস্থ্যমান বৃদ্ধি করতে কর্মচত্বরগুলিতে বিদ্যুৎ, পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা।

ফার্নিচার শ্রমিক

ক) ফার্নিচার শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি, ছুটি, সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশসহ শ্রম আইনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, এবং চুক্তিভিত্তিক মজুরির পরিবর্তে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা।

গ) শ্রমিকদের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, এবং পেশাগত ব্যাধি নিরূপণে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করা।

ঙ) শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং নতুন কারিগরি স্কুল স্থাপনে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা।

চ) ফার্নিচার সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও নারী উদ্যোক্তা তৈরির জন্য বিশেষ সুবিধামূলক নীতি প্রণয়ন এবং সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা।

পাথরভাঙ্গা শ্রমিক

ক) পাথর ভাঙা শ্রমিকদের চাকরিতে যোগদানের পূর্বে এবং চাকরিতে যোগ দেয়ার পর প্রতিমাসে নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মালিক কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) স্থানীয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বমন্বিতভাবে শ্রমিকদের সিলিকোসিস রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত একবার শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য ক্যাম্প এর আয়োজন করা।

গ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে পাথর ভাঙার সাইটগুলি নিয়মিত তদারকি জোরদার করা।

সেবা খাতভিত্তিক জনগোষ্ঠী

রেলওয়ে শ্রমিক

ক) শ্রমিকদের তথা ইউনিয়নের মতামত গ্রহণ এবং দ্বি-পাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ক জোরদার করা।

খ) নিয়োগবিধি ২০২০ সংশোধনপূর্বক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর শূন্য পদে নিজস্ব কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ ও পদোন্নতি সহজ করা।

গ) রেলের ক্ষেত্রে 'আউটসোর্সিং' বন্ধ করে টিএলআর/অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তির প্রবাহ বজায় রাখা।

নৌযান শ্রমিক

ক) বর্তমান দ্রব্যমূল্য বিবেচনায় নৌযান শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরি বৃদ্ধির লক্ষ্যে দ্রুত মজুরি বোর্ড গঠন ও মজুরি নির্ধারণ।

খ) নৌযান শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নাবিক কল্যাণ তহবিল ও প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন এবং মালিক সমিতিগুলোকে এক প্ল্যাটফর্মে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ) শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ বিষয়ে সরকারি তদারকি জোরদার করা।

ঘ) নৌযান শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি বন্দর ও নৌপথে নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

পরিবহন

ক) সড়ক পরিবহন নীতিমালা ২০২২ সংস্কার এবং সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এর অসংগতিপূর্ণ ধারাগুলি সংশোধন করা।

খ) পরিবহন শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, বিশ্রামের ব্যবস্থা এবং মহাসড়কে বিশ্রামাগার নির্মাণ করা।

গ) দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসা ও তহবিল নিশ্চিত করা এবং 'দুর্ঘটনা বিমা' চালু করা।

ঘ) হাইওয়ে ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে রোড সেইফটি অডিট এবং রোড সেইফটি ম্যানেজমেন্ট কার্যকর করা।

রিকসা/ব্যটারি রিকসা-ইজিবাইক/ভ্যান চালক

ক) ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য সার্ভিস রোড/বাই লেন নির্মাণ ও নির্দিষ্ট স্থানে পার্কিং এরিয়া স্থাপন করা।

খ) ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নকশা আধুনিকায়ন, গতি নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মাতাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

গ) "থ্রী-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২৪" দ্রুত গেজেট প্রকাশ ও বাস্তবায়ন করা।

ঘ) যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান সহজতর করা এবং চালকদের প্রশিক্ষণ ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা।

ঙ) বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় রোধে চার্জিং স্টেশন স্থাপন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

চ) শ্রমিকের জীবিকার উপকরণ ধ্বংস না করা এবং অভিযুক্তদের দায়বদ্ধতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

নির্মাণ শিল্প শ্রমিক

ক) নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, নারীদের কাজের সুযোগ বৃদ্ধি ও মজুরি বৈষম্য দূর করা।

খ) নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ) শ্রমিকদের জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করতে কলোনী স্থাপন, সুলভ মূল্যে দীর্ঘমেয়াদী লিজ প্রদান এবং কলোনীতে স্কুল ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন।

ঘ) দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণের বিধান অন্তর্ভুক্ত এবং নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য একক বিমা চালু করা।

ঙ) দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ক্ষেত্রে স্থাপনার মূল মালিক ও ডেভেলপারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা।
চ) অভিবাসন প্রত্যাশী শ্রমিকদের জন্য পাসপোর্ট ও ভিসা প্রসেসিং সহজতর করা, পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, এবং চাকরির তথ্য ও চাকরির শর্তাবলি যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

ক) শ্রম আইন অনুযায়ী বেসরকারি স্বাস্থ্য শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সরকারি তত্ত্বাবধান জোরদার করা।
খ) বর্তমান বাজারদর বিবেচনায় নিম্নতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণে মজুরিবোর্ড গঠন করা।
গ) মাতৃত্বকালীন ছুটি, সামাজিক নিরাপত্তা ও বিমার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং প্রতিষ্ঠানের মুনাফায় শ্রমিক-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যালেন্স শিট প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক

ক) হোটেল-রেস্টুরেন্ট খাতের শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র প্রদান, সাপ্তাহিক ছুটি, উৎসব ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে সরকারি তদারকি জোরদার করা।
খ) রমজান মাসে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে উদ্যোগ গ্রহণ এবং ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চালু করা।
গ) হোটেল-রেস্টুরেন্টে শিশুশ্রম রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ এবং তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

গৃহ শ্রমিক

ক) গৃহশ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেয়া এবং তাদেরকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত 'গৃহকর্মীর কল্যাণ ও সুরক্ষা নীতিমালা' ২০১৫ এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
খ) গৃহশ্রমিকদের (আবাসিক, অনাবাসিক, খন্ডকালীন, স্থায়ী) জন্য কর্মঘন্টা, বেতন, ছুটি, থাকা- খাওয়ার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুবিধা উল্লেখপূর্বক একটি স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান চুক্তি প্রণয়ন করা। নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে শ্রমিকের কোনো অভিযোগ থাকলে তা কার বরাবর, কোনো স্থানে, কীভাবে করবেন এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনাসহ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
গ) গৃহশ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
ঘ) গৃহকর্মে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ বন্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন করা।
ঙ) গৃহকর্মীদের সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করা।

পরিচর্যা কর্মী (কেয়ার ওয়ার্কার্স)

ক) সরকারি বেসরকারি সকল শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের তালিকা করে তাদের একটি নীতি কাঠামোর মধ্যে পরিচালনা করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সরকার কতৃর্ক পরিচালিত শিশু যত্ন কেন্দ্রে আউটসোসিং এর পরিবর্তে স্থায়ী ভাবে নিয়োগ প্রদান করা।
খ) এইখাতের কর্মীদের সময়পোযোগী দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাহিরে দক্ষ পরিচর্যা কর্মী হিসেবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা।
গ) কেয়ার অর্থনীতি আরও প্রসার ঘটাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তিগত/ উদ্যোগে গড়ে উঠা সেন্টারসমূহকে বিশেষ প্রণাদনা প্রদান এবং একটি নির্দিষ্ট মডেল অনুসরণ করে সেন্টারসমূহকে পরিচালিত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
ঘ) পারিবারিক দায়িত্বে থাকা শ্রমিকদের কাজ ও পারিবারিক জীবনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নমনীয় কাজের (কর্মসংস্থানের ধরন ও চুক্তি, কর্ম ঘন্টা, ছুটির ব্যবস্থা) জন্য জাতীয় পর্যায়ে আইনি ও নীতি কাঠামো কাঠামো তৈরি করা; এবং প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি করা এবং তা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন করা।
ঙ) পরিচর্যা কর্মীদের সাথে সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৫৬ ও ১৮৩ অনুসমর্থন করা এবং তার বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কার্যকর কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

বিউটি পার্লার কর্মী

ক) সকল বিউটি পার্লার শ্রমিকদের পেশাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সুরক্ষার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি, অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

খ) এ খাতের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ন্যুনতম মজুরি বোর্ড গঠন করে কাজের মান ও ঝুঁকি বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট মজুরী কাঠামো নির্ধারণ করা ও তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পদোন্নতি কাঠামো তৈরি করা।

গ) কর্মীদের স্বাস্থ্যসসুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করাসহ সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা।

ঘ) কর্মক্ষেত্রে ও রাত্রিকালীন বাড়ি ফেরার সময় হয়রানি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে কমিউনিটি ভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা এবং সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স শ্রমিক

ক) কমিউনিটি সেন্টার শ্রমিকদের জন্য শোভন ও মর্যাদাকর জীবনধারণ উপযোগী ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি এবং অতিরিক্ত শ্রমের জন্য অতিরিক্ত মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা।

খ) রমজান মাসে কর্মহীন সময়ে অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বা রেশনিং প্রবর্তন এবং দুই ঈদে বোনাস প্রদান নিশ্চিত করা।

ঘ) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার জন্য সুচিকিৎসা, ক্ষতিপূরণ ও সবেতন ছুটি প্রদান নিশ্চিত করা।

ঙ) শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা।

চ) শ্রমিকদের জরিমানা করার অমানবিক প্রথা বন্ধ করা এবং জবরদস্তিমূলক কর্মকাণ্ড রোধে আইন প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কর্মী

ক) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের চুক্তিভিত্তিক জবরদস্তিমূলক শ্রম বাতিল করে রাজস্বখাতে সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মঘণ্টা, মজুরি, ছুটি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

গ) তথ্য ও যোগাযোগ দক্ষতা বাড়াতে মানদণ্ড নির্ধারণ, সুযোগ-সুবিধা প্রদান এবং ডাটা এন্ট্রি অপারেটর নিয়োগের নিয়ম অনুসরণ করা।

৫.৪ পেশা ভিত্তিক জনগোষ্ঠী

সাংবাদিক/গণমাধ্যম কর্মী

ক) সব ধরনের সংবাদমাধ্যমের (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট) সাংবাদিক ও কর্মীদের জন্য 'দ্য নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) অ্যাক্ট ১৯৭৪'- এর আদলে পৃথক আইন প্রনয়ন বা বিদ্যমান শ্রম আইনে পৃথক অধ্যায় সংযোজন করা।

খ) বিদ্যমান শ্রম আইনে 'সংবাদপত্র শ্রমিক' এর সংজ্ঞা সম্পসারণ করে 'গণমাধ্যম শ্রমিক/কর্মী' করা এবং অনলাইন এবং ব্রডকাস্ট অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশনসহ সকল ধরনের গণমাধ্যম কর্মীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সকল সাংবাদিকের জন্য নিয়োগপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

ঘ) সাংবাদিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মঘন্টা এবং ছুটির বিধানসমূহ কার্যকর করা এবং নারী সাংবাদিকের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর করা।

ঙ) ক্যামেরার পিছনে যারা কর্মরত আছেন তাদের সকলকে চিত্র সিংবাদিক হিসেবে অবহিত করা।

চ) সাংবাদিকদের বেতন নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি মিডিয়ার কর্তৃপক্ষকে/মালিককে প্রতিমাসের বেতন পরিশোধের ডকুমেন্ট কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ করার বিধান করা।।

ছ) সকল সাংবাদিকের জন্য ঝুঁকি ভাতা, বিমা ও পেনশন চালু করা।

জ) সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের সংস্কারের মাধ্যমে এটাকে সকল সাংবাদিকের কল্যাণে প্রকৃত অবদান রাখতে সক্ষম করা।

মৎস্যজীবী ও জেলে শ্রম জনগোষ্ঠী

ক) জলমহাল ইজারা প্রথা বাতিল করে লাইসেন্স প্রথা চালু, ফিশিং ট্রলার মৎস্যজীবীদের জন্য গেজেট বাস্তবায়ন এবং নিষিদ্ধকালীন সময়ে বিকল্প কর্ম ও রেশনিংসহ সামাজিক সুরক্ষা প্রদান নিশ্চিত করা।

খ) দাদন প্রথা বিলোপে আইনগত ব্যবস্থা, সহজ শর্তে বিনা সুদে ঋণ প্রদান এবং শ্রমিকদের জন্য পরিচয়পত্র ও ট্র্যাকিং-মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা।

গ) মাছ ধরা ঘাটে অবকাঠামো ও বরফকল নির্মাণ, উপকূলীয় জেলেদের জন্য জমি বরাদ্দ এবং অবৈধভাবে বালু উত্তোলন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা।

ঘ) ইলিশ শিকারের নিষিদ্ধ সময়সীমা ১৫ দিন করা এবং জলদস্যু, বালুদস্যু ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

হকার্স/শহর অঞ্চলে স্বনিয়োজিত শ্রম জনগোষ্ঠী

ক) শহর অঞ্চলে বা বিশেষ এলাকা ভিত্তিক স্বনিয়োজিত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার/যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হকারদেরকে পরিচয়পত্র প্রদান ও তাদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা।

খ) সকল ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি হয়রানিমুক্ত ব্যবসা পরিচালনার জন্য "বিশেষ হকার বাণিজ্যিক এলাকা স্থাপন" করা।

গ) আকস্মিক ও অপরিকল্পিত উচ্ছেদের সময় হকারদের জীবিকার উপকরণ ধ্বংস না করা।

গ) আকস্মিক ও অপরিকল্পিত উচ্ছেদের মাধ্যমে কাজের অনিশ্চয়তা রোধে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পুনর্বাসন পরিকল্পনার শুরু থেকেই শ্রমিক প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অংশিদারিত্বের মাধ্যমে যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

মার্কেট/ দোকান কর্মচারী

ক) দোকান কর্মচারীদের চাকরি সংক্রান্ত সকল শর্তাবলি উল্লেখ করে নিয়োগপত্র প্রদান করা।

খ) দোকান কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরী বোর্ড গঠনসহ প্রত্যেক কর্মী যেন তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হন এমন ন্যায্য ন্যূনতম মজুরী ঘোষণা করা।

গ) শ্রম আইন অনুযায়ী সপ্তাহে দেড় দিন ছুটির বিধান থাকলেও দোকান কর্মচারীরা এই ছুটি পান না। তাদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটির নিশ্চয়তা নিশ্চিত করা।

ঘ) কর্মক্ষেত্রে বা তার আশেপাশে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করা এবং নারী দোকান কর্মচারীদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা।

দপ্তরি/প্রহরি

ক) দপ্তরি ও প্রহরিদের কর্মঘন্টা কমিয়ে আট ঘন্টা করা এবং অতিরিক্ত সময়ের জন্য ওভারটাইম ভাতা প্রদান করা।

খ) চাকরি নবায়নের অনিয়ম বন্ধ করতে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ প্রদান করা। দপ্তরি কাম প্রহরীদের পদটি রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) আউটসোর্সিং নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন করে স্ব স্ব অবস্থানে রেখে দপ্তরী কাম প্রহরী পদটি না রেখে শুধুমাত্র দপ্তরী বা অফিস সহায়ক পদ বহাল রাখা এবং কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করা।

মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ/সেলস ও মার্কেটিং কর্মী

ক) মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভদের চাকরির নিরাপত্তা, অধিকার সুরক্ষা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে শ্রম আইনের প্রয়োগ জোরদার করা।

খ) পেশাগত স্বীকৃতি ও নিবন্ধনের জন্য তাদের প্রস্তাবিত ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) স্থায়ী নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং অবাস্তব সেলস টার্গেট প্রদান বন্ধ করা।

ঘ) মজুরি বোর্ডের আওতায় তাদের জন্য মজুরি ও অন্যান্য সুবিধা ঘোষণা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড ও গ্রাচুইটি নীতি নির্ধারণ করা।

ঙ) জবরদস্তিমূলক শ্রম রোধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এছাড়া রোগীর তথ্য সংগ্রহ বাধ্যকরণ বন্ধ করা।

চ) যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত ভাতা বা যানবাহনের ব্যবস্থা করা এবং কর্মকালীন সড়ক দুর্ঘটনা কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা হিসেবে গন্য করে ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

বিশেষ নিয়োগের ধরনের ভিত্তিতে শ্রমিক

আউটসোর্সিং শ্রমিক

ক) সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী জনবল কাঠামো হালনাগাদ করে আউটসোর্সিং নিয়োগ বন্ধ এবং সরাসরি নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করা।

খ) দীর্ঘ সময় ধরে কর্মরত শ্রমিকদের শ্রম আইন অনুযায়ী অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মূল মালিককে দায়বদ্ধ করা।

গ) বিনা কারণে আউটসোর্সিং শ্রমিকদের চাকরিচ্যুতি বন্ধ এবং প্রকল্প শেষে যোগ্য শ্রমিকদের রাজস্বখাতে স্থায়ীভাবে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

ঘ) আউটসোর্সিং শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, সিবিএ নির্বাচনে ভোটাধিকার এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির সুযোগ নিশ্চিত করা।

রাইড শেয়ারিং/গিগ/প্লাটফর্ম ইকনোমির শ্রমিক

ক) রাইড-শেয়ারিং চালকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে শ্রম অধিকার, ন্যায্য মজুরি এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা।

খ) বহুজাতিক কোম্পানিগুলির দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শ্রমিক সুরক্ষা, মজুরি এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

গ) বিশেষ মজুরি কাঠামো নির্ধারণ এবং কোম্পানিগুলির কমিশন হার যৌক্তিক পর্যায়ে কমানো।

ঘ) রাইড-শেয়ারিং সেবায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে অতিরিক্ত ফি বাতিল এবং শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা।

ঙ) শ্রমিকদের অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

চ) শ্রমিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস এবং যাত্রী ও চালকদের জন্য সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ডাটাবেজ সংরক্ষণ ও ২৪/৭ কল সেন্টার চালু করা।

গৃহভিত্তিক শ্রমিক

ক) গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান, শ্রম আইন ও নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্তকরণ, এবং তাদের সংখ্যা নিরূপণ, জরিপ পরিচালনা ও নিবন্ধন নিশ্চিত করা।

খ) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ এবং ঠিকাদার ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে ন্যায্য পারিশ্রমিক ও সুরক্ষা প্রদানে বাধ্য করা।

গ) ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ প্রদান এবং দরকষাকষি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা।

ঘ) সরকারি উদোগে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ চালু করা, স্বনিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করা।

৬। বিশেষ প্রস্তাবনা

৬.১ শ্রম শক্তি জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা

ক) শ্রম বাজারকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য শ্রম পরিসংখ্যানের ঘাটতি নিরসনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীনে শ্রম ইস্যুতে নিয়মিত জরিপ পরিচালনা করা এবং শ্রম জরিপের ক্ষেত্রে আইএলও-এর সর্বশেষ মানদণ্ড অনুসরণ করা।

খ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক শ্রমশক্তি, শিশুশ্রম ও শ্রম সংক্রান্ত ইস্যুতে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত জরিপসমূহ এই কমিশন কর্তৃক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত 'গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' অনুবিভাগের সাথে সমন্বয় করে পরিচালনা করা এবং জরিপের প্রতিটি পর্যায়ে (বিশেষত পরিকল্পনা পর্যায়ে) ট্রেড ইউনিয়নকে অন্তর্ভূক্ত করা।

গ) শ্রম বাজারের গতি প্রকৃতি ও কর্মসংস্থান, শ্রমিকের অধিকার পরিস্থিতি, শিল্প সম্পর্ক এবং অন্যান্য শ্রম ইস্যুতে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে যৌথ গবেষণা (নিয়োগকারী, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকার, উন্নয়ন সহযোগীদেরকে সম্পৃক্ত করে) সম্পন্ন করা, যাতে করে এসমস্ত গবেষণা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

ঘ) শ্রমিক এবং শ্রমিক অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রমে শ্রমিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বিষয়সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করা।

ঙ) মাঠ পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে শ্রম অধিকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড এবং শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক কোর্স অন্তর্ভূক্ত করা।

৬.২ বাজেট বরাদ্দ

ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানগুলোর আধুনিকায়ন, শ্রমিক কল্যাণ, কর্মসংস্থান ও শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।

খ) শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা, আবাসন, মাতৃত্বকালীন ভাতা, পেনশন স্কিম, আর্থিক সহায়তা, দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসায় বরাদ্দ নিশ্চিত করা।

গ) শ্রমকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে বিমা, বেকার ভাতা, অবসর ভাতা এবং দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণের জন্য উপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ করা।

৬.৩ শ্বেতপত্র প্রস্তুত

- রানা প্লাজা দুর্ঘটনা, তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ডসহ উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা পরবর্তী সরকারি কার্যক্রম, তদন্ত ও বিচার, ক্ষতিপূরণ, শ্রম সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি আর্থিক অনুদান ব্যয় সম্পর্কিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।
- শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন ফান্ডের ব্যবহার সম্পর্কিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।
- করোনা মহামারিসহ বিভিন্ন সময় সরকারি প্রণোদনা/ বিশেষ সহযোগিতা শীর্ষক শ্বেতপত্র প্রকাশ।
- শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতা শীর্ষক শ্বেতপত্র প্রকাশ।

১. ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

> "১৪। কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি
> রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী মানুষকে—কৃষক ও শ্রমিককে—এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"
>
> রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান

বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার অন্যতম মূলনীতি মেহনতি শ্রমজীবী মানুষের সকল প্রকার শোষণ মুক্তি। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা যেখানে সব নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার সুনিশ্চিত হবে। শ্রম অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ১৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ শ্রম সংস্কার কমিশন গঠন করে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে মর্যাদাপূর্ণ শ্রমপরিবেশ গড়ে তোলার গণতান্ত্রিক পথনির্দেশক প্রস্তাবনা তৈরিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে শ্রম সংস্কার কমিশন। কমিশন মনে করে যে, শ্রম জগতে বিরাজমান বৈষম্য মোকাবেলায় শ্রম, শ্রমিক ও তাঁর সামাজিক পুনরুৎপাদন ও অধিকারভিত্তিক বিকাশের প্রশ্ন কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বিবেচনায় না রেখে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শ্রমিকশ্রেণির প্রতি চলমান মর্যাদাহীনতা, বঞ্চনা ও বৈষম্য এবং দীর্ঘ উপেক্ষা ও অবহেলা থেকে উত্তরণের যে জন-আকাঙ্ক্ষা এবং বিপুল শ্রমশক্তির অংশগ্রহণে টেকসই শিল্পায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার যে অপার সুযোগ ও সম্ভাবনা- সে সব আকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার লক্ষ্যেই "শ্রম জগতের রূপান্তর রূপরেখা" শীর্ষক প্রতিবেদনটি কমিশনের সুপারিশ হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। প্রতিবেদনটি শ্রমিক, কৃষক, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিনিধি, শ্রম ও পেশা সংঘ, শ্রম অধিকার প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি, নারী অধিকার সংগঠন, কারখানা মালিক, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ গবেষক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক দল এবং অপরাপর অংশীজনের মতামতের সমন্বিত প্রতিফলন।

সাড়ে সাত কোটি শ্রমজীবী মানুষের দেশ বাংলাদেশ। দেশের অর্থনীতি মূলত শ্রমভিত্তিক। কৃষিপ্রধান এই দেশে কৃষিভিত্তিক পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। উৎপাদন খাতের পাশাপাশি অভিবাসন শ্রমখাতও বাংলাদেশের জন্য অতীব সম্ভাবনাময় একটি খাত। শ্রম ও শিল্পখাতের এই বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য যোগ্য ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, শ্রমিকের ন্যায়ানুগ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় দৃঢ় ভূমিকা, শিল্পের বিকাশের অনুকুল ও সহায়ক নীতি-পরিকল্পনা আবশ্যক। বর্তমান সীমাবদ্ধতা দূরীকরণ এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চাহিদা, সুযোগ ও সম্ভাবনার উপর ভিত্তি করে অগ্রসর চিন্তা নিয়ে এগিয়ে যাওয়াই হবে সঠিক পথনির্দেশ।

১৯৭০-৮০'র দশকেই রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বেসরকারি খাতে বহুজাতিক রপ্তানিমুখি শিল্পখাত প্রতিষ্ঠা করা হয়। রপ্তানিমুখি তৈরি পোশাক শিল্পের দ্রুত বিস্তার ঘটে। সরকারের সাম্প্রতিক পরিকল্পনায় সবচেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ নিশ্চিতকরণ এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেখানে উদ্যোক্তা ও শ্রমিক উভয়েই থাকবে সুরক্ষিত। শ্রম অসন্তোষ সৃষ্টি হয় এমন পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে, শিল্পবিরোধ কিংবা শ্রম অসন্তোষ নিরসনের জন্য থাকতে হবে কার্যকর ব্যবস্থা যেখানে কোনও পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, চাকরির নিরাপত্তা ও সংগঠনের অধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে সর্বক্ষেত্রে। বৈষম্য-শোষণ-হয়রানিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে শ্রম ও শিল্পসংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, গণতন্ত্র ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে শ্রমজীবী মানুষ

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ইতিহাস— লিঙ্গ, বয়স, জাতি, ধর্ম, ভাষা ও পেশা নির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণির সক্রিয় অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগের । ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৬'র স্বাধিকার আন্দোলন, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান এবং গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধ সহ

গণতান্ত্রিক সব সংগ্রামেই শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। স্বাধীনতা পরবর্তী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ১৯৮৩-তে তৈরি হওয়া 'শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ' (স্কপ), পাট-সুতা ও বস্ত্রকল শ্রমিক-কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ সহ জাতীয়, আঞ্চলিক ও সেক্টরাল শ্রমিক আন্দোলন যে সমবেত প্রতিরোধ ও আন্দোলন শুরু করে তা রাজনৈতিক দলগুলির গণতান্ত্রিক অধিকার সংগ্রামের পথও সুগম করে।

৯০'র গণঅভ্যুত্থান থেকে ২০২৪-এর জুলাই - শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রাম এগিয়ে যায়। ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে যুক্ত হয়েছেন রিকশাওয়ালা, দিনমজুর, দোকান কর্মচারী, গৃহশ্রমিক, গার্মেন্টস সহ অন্যান্য কারখানা ও প্রবাসী শ্রমিক। জুলাই গণঅভ্যুত্থান আমাদের সামনে এনে দিয়েছে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি চলমান বৈষম্যের ন্যায্য ও মানবিক রূপান্তরের সুযোগ।

বাংলাদেশের শ্রমিকদের ধারাবাহিক আন্দোলনের ইতিহাস আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস বা মে দিবসেরও সমুন্নত ইতিহাস। কর্মজগতে দৈনিক দীর্ঘ কর্মঘণ্টা কমিয়ে ৮ ঘণ্টায় নিয়ে আসা সমাজকেও মুক্তি দিয়েছে। শ্রম শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আন্দোলন শুধু নিজেদের জন্য নয়, নিজ ও পরবর্তী প্রজন্মের সুস্থ বিকাশের সম্ভাবনা তৈরি করে। সমাজ বিনির্মাণে ও রাষ্ট্রের বিকাশে তা প্রতিফলিত হয়। অথচ রাষ্ট্র পরিচালনা, নীতি প্রণয়ন ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণির প্রান্তিকীকরণ, প্রতিনিধিত্বহীনতা এবং অদৃশ্যকরণ আজও বিদ্যমান।

বাংলাদেশ শ্রমজগতের ঐতিহাসিক রূপান্তরের প্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা

মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ প্রথম দু'দশকেই রাষ্ট্র চরিত্রে, নাগরিকের কল্যাণ, সাম্য ও জনমুখী নীতির সাংবিধানিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের ঘোষণা থেকে পুঁজি ও মুনাফাকেন্দ্রিক বাজারমুখি উদারীকরণ ব্যবস্থার দিকে সরে আসে। দেশের অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প ও বিনিয়োগ নীতি বৈশ্বিক পুঁজির আন্তর্জাতিকীকরণের অধীনস্ত হয়।[1] বাংলাদেশ পরিণত হয় শ্রম সরবরাহের প্রান্ত দেশে। সামগ্রিক কল্যাণের বদলে কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। দাতা দেশ ও সংস্থার নীতি মেনে নেওয়া ও অনুসরণে তৈরি হয়েছে তীব্র চাপ। বহুজাতিক উৎপাদন নির্ভরশীলতা নাজুক শিল্প ও শ্রম পরিস্থিতি তৈরি করেছে।[2] শিল্পায়ন নীতিতে বঙ্গীয় বদ্বীপের অবস্থান, প্রাণ, প্রকৃতি, প্রতিবেশ, নদী ও নদীকেন্দ্রিক জীবনধারা ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়নি।[3]

১৯৭০ দশকের শেষ থেকে পরবর্তী তিন দশকে ৫০০-এর বেশি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কলকারখানা বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। বিপুল পরিমাণ শিল্প ঋণ দেয়া হলেও ব্যক্তি মালিকানাধীন এসব শিল্পে কর্ম সৃষ্টি, উৎপাদন বা মুনাফা বৃদ্ধি হয়নি।[4] মৌলিক শিল্প যেমন পাট, বস্ত্র, সুতা, চিনি, ভোজ্যতেল ও কাগজ কারখানাগুলিতে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন সীমিত বা বন্ধ করা হয়। কাঁচামাল জোগানদার কৃষি অর্থনীতিতে এর প্রভাব পরে। প্রধান রপ্তানিখাত পাট শিল্পে রাষ্ট্রীয় অব্যস্থাপনা, দুর্নীতি ও ধস চরম দুর্দশা তৈরি করে পাটকল শ্রমিকদের জীবনে। আদমজী পাটকল বন্ধে এর ২৬ হাজার শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হন। আরও ক্ষতিগ্রস্ত হন ৫০ লক্ষ পাট চাষি ও তাঁদের পরিবার। বিশ্বব্যাংকের স্ট্রাকচারাল এডজাস্টমেন্টের নামে অপরিণামদর্শী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ করা বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তিগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও দুর্বল করেছে। কৃষিসহ অন্যান্য শিল্পের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। একই সাথে, দ্বিতীয় প্রজন্মের শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত ও বিকশিত হবার সম্ভাবনা সংকুচিত করে। জাতীয় রাজনীতিতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়।

বাস্তবতা হচ্ছে রাষ্ট্র এখনও দেশের সকল শ্রমিকের জন্য আইনগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি; অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত দেশের প্রায় ৮৫% শ্রমিকই আইনের বাইরে রয়ে গেছে। নির্মাণ শ্রমিকের অক্লান্ত শ্রমে তৈরি শহরে তাঁর আবাসন হয় না। সস্তা শ্রমের ওপর ভিত্তি করেই হচ্ছে রপ্তানিমুখি শিল্পের বিকাশ। শ্রমিকদের জন্য নেই পর্যাপ্ত বা

---

[1] Muhammad, Anu. (2021) . *Development Re-examined: Construction and Consequences of Neoliberal Bangladesh.*

[2] Khan, Mohammad Tanzimuddin and Rahman, Mohammad Sajjadur (eds.). (2020). *Neoliberal Development In Bangladesh People on the Margins.* UPL: Dhaka.

[3] Dewan, Camelia. (2021). *Misreading the Bengal Delta: Climate Change, Development, and Livelihoods in Coastal Bangladesh.* University of Washington Press.

[4] Sobhan, Rehman (ed.). (2005). *Privatisation in Bangladesh. An agenda in search of a policy.* UPL: Dhaka.

বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ও হাসপাতাল। নেই আহত বা নিহত শ্রমিকদের জন্য বিমা ব্যবস্থা। কর্মজীবন শেষে শ্রমিকের দেখভাল করার রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। নারীদের সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা না থাকায় শ্রমখাত থেকে ঝরে পড়ছে দক্ষ ও সম্ভাবনাময় নারী শ্রমিকরা। নগর বা গ্রামীণ দিনমজুর নিজ শ্রম বিক্রি করতে প্রতিদিন সকালে হাজির হন অস্থায়ী 'জন বেচার হাটে।' প্রতিদিন তিনি কাজ পাবেন কি না, পেলে কী মজুরি হবে তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। কাজ না পেলে 'উপোষ দিন' দিনমজুরদের এক রূঢ় বাস্তবতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিন কাজ পাওয়া আরও কঠিন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে, হরতাল-অবরোধে বা ক্ষমতার পালাবদলে, দিনমজুর কাজ না পেয়ে যে ক্ষতিগ্রস্ত হন, এ ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের কোনও বক্তব্য বা বিশেষ কোনও কর্মসূচি নেই। বিভিন্ন শ্রম খাতে অটোমেশনের কারণে চাকরি ও নিয়োগ কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন কৃষি ও অন্যান্য শ্রমিকের জীবনে নতুন সংকট নিয়ে আসছে। তাপ প্রবাহে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন দিনমজুর, খোলা জায়গায় কাজ করেন এমন শ্রমিকরা আছেন বজ্রপাতের ঝুঁকিতে, নষ্ট হচ্ছে তাঁদের কর্মঘণ্টা ও আয়। শ্রমখাতের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সক্ষম শ্রমশক্তির জন্য উপযুক্ত মজুরিতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অতীব জরুরি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অ্যাপভিত্তিক সেবার বিভিন্ন শ্রমখাত, যেমন খাদ্য ও পণ্য সরবরাহের নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে দেশজুড়ে কোনও প্রকার আইনি স্বীকৃতি ও সুরক্ষা ছাড়াই। অ্যাপভিত্তিক সেবা খাতের সময় ও টার্গেট-পূরণ ভিত্তিক কাজ গিগ শ্রমিকদের জীবনে অনিশ্চয়তা, নাজুকতা, অস্বাভাবিক কর্মঘণ্টা, অস্বাস্থ্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। কর্মসংস্থানের অভাবে শিক্ষিত তরুণ এ ধরনের কাজে যুক্ত হচ্ছেন। জীবনবাজি রেখে ডেলিভারি সময়ের আগে তৈরি খাবার পৌঁছে দিতে অক্লান্ত ছুটে চলা শত শত তরুণ নামমাত্র মজুরিতে কাজ করছেন সকল জেলা শহরে। নিয়োগকারীরা অ্যাপের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করছে শ্রমিকদের জীবন। ডেলিভারি টার্গেট পূরণ না হলে আছে শাস্তি। প্লাটফর্ম বা অ্যাপভিত্তিক কাজ এক জবরদস্তির কর্ম পরিবেশ। এখানে নিয়োগকারী অদৃশ্য। অ্যাপ মালিক বা প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি দর কষাকষির সুযোগ নেই। এ পর্যন্ত ৪২টি শিল্পখাতে সরকার কর্তৃক নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে কোনও 'জাতীয় ন্যূনতম মজুরি' নেই। ৮৫ ভাগ শ্রমিক, যারা শ্রম আইনের বাইরে, তাদের মজুরির কোনও মানদণ্ড নেই। মজুরিবৈষম্যের কারণে তীব্র হয়ে উঠেছে আয়বৈষম্য।

স্থায়ী কাজের বিপরীতে আউটসোর্সিং কর্মী নিয়োগের কারণে সরকারি চাকরিতে প্রান্তিক শ্রমজীবীদের প্রবেশের সুযোগ বন্ধ হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের প্রতি নীতি নির্ধারকদের অবহেলা-উপেক্ষা, সমাজের অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণ, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোসমূহের ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণে শ্রমিকদের দিন কাটে অশেষ অনিশ্চয়তায়। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ সময়ের দাবি। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের যে স্বপ্ন আজ জাতির সামনে উদ্ভাসিত, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের যে উদ্যোগ আজ রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার হিসেবে গৃহীত এবং স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ – সে সব ক্ষেত্রে শ্রমজীবী মানুষের দক্ষতা উন্নয়ন, সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সুরক্ষার বিষয়টিও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জীবনধারণের উপযোগী মজুরি প্রাপ্তি, শোভন কর্মপরিবেশের নিশ্চয়তা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষা, উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি, যৌন হয়রানি থেকে নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা, দেশে-বিদেশে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে সুরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা, অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে দ্রুত ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কারপূর্বক শ্রমখাতকে অসন্তোষমুক্ত ও উৎপাদনশীল করা জরুরি। গৃহশ্রমিক নির্যাতন কিংবা কর্মস্থলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিতকরণ, শাস্তির ব্যবস্থা, তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় আজও স্বচ্ছ নয়; সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা যায়নি আজও। বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম যোগানদাতা প্রবাসী শ্রমিকদের 'রেমিটেন্স যোদ্ধা' বললেও বিদেশে তাদের 'অড জব' বা কম মজুরির বিপদজনক কাজ থেকে সুরক্ষিত রাখার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ যথাযথ নয়। দলীয় বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী-রাজনীতিক সিন্ডিকেটকে বিপুল পরিমাণ শিল্প ঋণ দিয়ে 'ঋণখেলাপি' সংস্কৃতি তৈরি হলেও তা কর্মসংস্থান সৃষ্টি কিংবা জাতীয় উন্নয়নে তেমন কোনও ভূমিকা রাখেনি। রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে শ্রমিকশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে দেশের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধাবিঘ্ন দূর করা যেতো সহজেই।

শিল্প সংস্কার উদ্যোগ এখন পর্যন্ত বিশেষ কিছু শিল্পকে লক্ষ্য করে। রানাপ্লাজা পরবর্তী তৈরিপোশাক শিল্প সংস্কারে প্রাধান্য পেয়েছে বৈদ্যুতিক আগুন ও ভবন অবকাঠামোগত নিরাপত্তা, যার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু এই সংস্কারে শ্রম

প্রক্রিয়া এবং মজুরি প্রশ্ন বিবেচনায় রাখা হয়নি। অগ্নি ও ভবন ঝুঁকির অবহেলাজনিত দুর্ঘটনার সাথে শ্রমিক কণ্ঠরোধের যুক্ততা আছে। ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সহায়ক হতে পারত।

শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিসরে শ্রমিকদের প্রতি মর্যাদার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন নীতিকাঠামোতে শ্রমজীবী বা মধ্যবিত্ত সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণ, কর্ম ও পেশা উপযোগী দক্ষতা তৈরির প্রতিবন্ধকতা দূর করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি প্রয়োজন। ভোকেশনাল ও পলিটেকনিক শিক্ষার প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন দরকার। গ্রামীণ ও শহরের শিক্ষা ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক। মাদ্রাসা, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমের বিভাজন প্রকট; আছে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও উচ্চমূল্য। ফলে বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থায় পিছিয়ে রাখা শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের জন্য কেবলই আরও পিছিয়ে যাওয়ার পথ। বৈষম্য পুনরুৎপাদনকারী সকল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন জরুরি। প্রয়োজন শ্রম ও শ্রমিকের প্রতি মর্যাদা ও সম্মান তৈরির শিক্ষা।

বৈষম্যহীন শোষণমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন, প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদার জন্য শ্রমিকশ্রেণির লড়াই-সংগ্রাম আজও অব্যাহত। তাঁদের স্বপ্নের বাংলাদেশ কিংবা মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার কাজটি অপূর্ণাঙ্গই রয়ে গেছে। শ্রমিকের ন্যায্য আন্দোলনকে শ্রমিক অবান্ধব আইন ও আইন-বহির্ভূত কৌশলে 'অবৈধকরণ' এবং দমনের অজস্র উদাহরণ আছে বিগত ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থায়।[৫] মুক্তিকামী গণঅভ্যুত্থানের স্পন্দন সেই নিপীড়নের ব্যবস্থাটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে একটি মর্যাদাপূর্ণ শ্রম পরিবেশ গড়ে তোলার সুযোগ দিয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, ক্ষতিপূরণ ও জবাবদিহিতা

গত এক দশকে 'কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায়' নিহত হয়েছেন ৮,২৯৮ জন শ্রমিক, নির্যাতনের শিকার হয়ে মারা গেছেন ১১৩ জন শ্রমিক, আহত শ্রমিকের সংখ্যা ৫,৬১৭ জন। শুধু গত এক বছরে (২০২৪) কর্মক্ষেত্রে 'দুর্ঘটনা-নির্যাতনে' প্রাণহানির হয়েছে ৮২০ জন শ্রমিকের।[৬] ১৯৯০ থেকে ২০১২ পর্যন্ত তৈরি পোশাক কারখানাগুলিতে বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে ৩৩টি। ১৯৯০'র সারাকা গার্মেন্টস অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছিলেন ৩২ জন। ২০০৬'র কেটিএস অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৬২ জন। ২০১২'র তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ডে নিহত হয়েছেন ১২৪ জন। ২০১৩'র রানাপ্লাজা ভবন ধসে নিহত হয়েছেন ১১৩৪ জন, আহত ২,৫০০ জনের বেশি শ্রমিক। ২০২১'র হাশেম ফুডসের অগ্নিকাণ্ডে নিহত হন ৫৪ জন।

রপ্তানিমুখি তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর পুরো বিশ্বের যে নজরদারি, তা চট্টগ্রামের জাহাজভাঙা শিল্পখাতের ওপর নেই। ফলে দুর্ঘটনাপ্রবণ ঝুঁকিপূর্ণ জাহাজভাঙা শিল্পে অঙ্গহানি থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য এমনকি মৃত্যুও আড়ালে থেকে যায়। গত দশ বছরে এই শিল্পে দুর্ঘটনায় ১৪৭ জন শ্রমিক নিহত হয়েছেন কিন্তু ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। জাহাজভাঙা শিল্পখাতের কারণে সমুদ্র উপকূলের প্রাণ, প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানের ভীষণ ক্ষতি হয়ে চলছে।[৭] কৃষক বা নির্মাণ শ্রমিকের কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুও কোনও গুরুত্ব পায় না। বাংলাদেশের কৃষি খাতে কৃষি শ্রমিক থেকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক নানা ঋণ প্রকল্পে জর্জরিত। ক্ষুদ্র ঋণের দায় পরিশোধ করতে না পেরে আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছে।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা বিমার আওতাভুক্ত করা ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ চর্চা সকল কর্মক্ষেত্রে নেই।[৮] শ্রমখাতে জবাবদিহিতার চর্চা অসম। তৈরি পোশাক শিল্পে জবাবদিহিতার যে চাপ তৈরি হয়েছে তা অন্য আর কোনও শিল্পে নেই। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকারি দপ্তরসমূহে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতার ব্যাপক ঘাটতি আছে। আবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিধি একে অপরের সাংঘর্ষিক। বাংলাদেশ শ্রমনীতিতে কৃষি, অকৃষি অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক শ্রমখাতের কথা বলা হলেও আইন তৈরি করা হয়নি। এমনকি বাংলাদেশ স্বাস্থ্যনীতিতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। সংসদীয় আইন প্রস্তাব কমিটিতে শ্রমিকদের বিবেচনায় রেখে নীতি ও আইন প্রণয়ন হয় না।

---

[5] Siddiqi, Dina M. and Hasan Ashraf. "Pandemic Politics: Class, Gender and Stigmatized Labour in Bangladesh's Garment Industry." *New Diversities* 24.1, 2022: 1-19.

[6] বিলস। (২০২৫)। *বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি বিষয়ে সংবাদপত্রভিত্তিক বিলস জরিপ-২০২৪*।

[7] Dewan, Camelia. "Living with toxic development: Shipbreaking in the industrializing zone of Sitakunda, Bangladesh." *Anthropology Today*. Vol 3, Issue 6, 2020: 9-12.

[8] Khatun, Fahmida, Syed Yusuf Saadat, Zazeeba Waziha Saleh, and Faiza Tanaz Ahsan. *Social Safety Net Budget of Bangladesh. Catching Some, Missing Many.* CPD-IRBD Policy Brief, 2024.

বাংলাদেশ সংবিধান ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার: শ্রম নীতি, আইন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কাঠামো

শ্রমজগতে বিদ্যমান অসমতা কেবল কার্যকর আইনি ব্যবস্থার অভাব নয় বরং নীতি নির্ধারকদের "রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির" অভাব। বাংলাদেশে এমন অনেক বিধান রয়েছে যা নিখুঁত নয়, তবে সেগুলি শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য তৈরি। এগুলি উপেক্ষা করা অথবা হেরফের করা শ্রমিক অধিকার খর্ব করে। বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলভিত্তি 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানে'র আলোকে জাতীয় শ্রম নীতি, আইন ও পরিকল্পনা প্রণীত হয়ে আসছে। জাতিসংঘ সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ শ্রম ও মানবাধিকার সংক্রান্ত যে সব আন্তর্জাতিক কনভেনশন স্বাক্ষর ও অনুসমর্থন করেছে, সে সংশ্লিষ্ট নীতি ও আইন প্রণয়ন করতে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং গৃহীত উদ্যোগ সম্পর্কে জবাবদিহিতা করতে দায়বদ্ধ। শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষায় আইন এবং এর প্রাতিষ্ঠানিক বাস্তবায়ন কাঠামোর পুনর্মূল্যায়ন ও যুগোপযোগী পরিবর্ধন জরুরি।

শ্রমজীবীদের মুক্তির লক্ষ্যে সাংবিধানিক অঙ্গীকার

স্বাধীনতার পাঁচ দশকে সংবিধান নির্দেশিত অঙ্গীকারের আলোকে রাষ্ট্র সব নাগরিকের মৌলিক চাহিদা পূরণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেনি। স্ব উদ্যোগে যারা কর্মসংস্থান খুঁজে নিয়েছে তাদের জীবনধারণ উপযোগী মজুরির নিশ্চয়তা বিধান করতে পারেনি। গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবের অঙ্গীকার (অনুচ্ছেদ ১৬) আলোকে কৃষিপণ্যকেন্দ্রিক পরিকল্পনা করা হয়নি। কৃষকের ফসল উৎপাদনে পুঁজি ও কারিগরি সহায়তা এবং কৃষিপণ্য নির্ভর শিল্পস্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় কর্মসংস্থানের বিকাশ হয়নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসলহানির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ, কৃষি শ্রমিক ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের জীবনধারণ ও মৌলিক চাহিদা পূরণ কিংবা উদ্বৃত্ত কৃষি শ্রমের পরিকল্পিত ব্যবহার নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগের অভাব আছে। সকলের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ও যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাগরিক সৃষ্টির অঙ্গীকার (অনুচ্ছেদ ১৭) থাকলেও, বিদ্যমান অসম শিক্ষা ব্যবস্থায় শ্রমিক ও শ্রমিকশ্রেণির সন্তানদের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়ে চলেছে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক যে সব চুক্তি ও দলিলে স্বাক্ষরকারী পক্ষ, এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮; অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তজার্তিক চুক্তি ১৯৬৬; নারীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য বিলোপ কনভেনশন ১৯৭৯ (সিডও সনদ); শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯ (সিআরসি); ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপলস অন বিজনেস এন্ড হিউম্যান রাইটস; টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি); অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তজার্তিক কনভেনশন, ১৯৯০ এবং আইএলও কনভেনশন ও সুপারিশসমূহ। বাংলাদেশ আইএলও'র ৮টি প্রধান কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে, কিন্তু তার আলোকে রাষ্ট্রীয় আইন প্রণয়ন বা সংশোধন করেনি। বাংলাদেশ যৌন ও লিঙ্গীয় হয়রানি সহ কর্মক্ষেত্রে সকল ধরনের সহিংসতা ও হয়রানি নিরসনে আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর করেনি। ২০০৮ এ গৃহীত আইএলও 'ডিসেন্ট ওয়ার্ক এজেন্ডা' প্রোগ্রামভুক্ত বিষয়াদি যেমন মর্যাদাপূর্ণ কর্ম সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ত্রিপক্ষীয় ও সোশাল ডায়লগ এবং কাজের মৌলিক নীতি ও অধিকার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি নেই বললেই চলে।

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি'র ১৭টি লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনায় বাংলাদেশ সম্মত। ৮ নং লক্ষ্য উৎপাদনশীল কর্ম ও শোভন বা মর্যাদাপূর্ণ কাজ নিশ্চিতকরণ। এসব বৈশ্বিক অঙ্গীকার প্রান্তিক শ্রমজীবী মানুষকে পরিকল্পনার কেন্দ্রে আনতে সহায়ক হতে পারে। তবে মনে রাখা প্রয়োজন, শ্রমমান উন্নয়নে যে সব আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের সাথে বাংলাদেশ যুক্ত হয়েছে—এর বাস্তবায়নে—এগুলিকে শ্রমিকদের দৈনন্দিন বাস্তবতা, বাংলাদেশ-নির্দিষ্ট প্রেক্ষিত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর এবং শ্রমিকদের রাজনৈতিক অবস্থান ও প্রয়োজন ইত্যাদির সাথে সমন্বয় করেই এগোতে হবে।

শ্রম সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইন প্রসঙ্গ

শ্রমখাত, কর্মসংস্থান, শ্রমিক সুরক্ষা বিষয়ে বাংলাদেশে যে সব নীতি প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২; জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেফটি নীতিমালা ২০১৩; গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫; জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০; জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি ২০২২; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬;

জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২ এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। সার্বিকভাবে এসব নীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক সহ অভিবাসী ও অভিবাসনে ইচ্ছুক শ্রমিক সকলের সুরক্ষার বিষয়েই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এসব নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, শ্রম—কর্মসংস্থান—দক্ষতা বিষয়ক জাতীয় তথ্যভান্ডার তৈরি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা উন্নয়ন যেমন কর্মসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা, স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্প স্থাপন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ। একই সাথে কর্মপরিবেশ ও শোভন কাজের মান উন্নয়ন, ন্যায্য মজুরি ও কোম্পানি মুনাফায় শ্রমিকের লভ্যাংশ নিশ্চিত করা। শ্রমিক কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু, শিশুশ্রম নিরসন, কর্মক্ষেত্রে নারী—পুরুষ সমতা এবং ব্যবসায়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা ইত্যাদি। উপরি-উক্ত নীতিসমূহে সরকার, মালিক ও তাদের সংগঠন, শিল্প—কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক—কর্মচারী ও তাদের ইউনিয়ন সহ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের ভূমিকা ও দায়িত্বাবলি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

নীতি নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে চলমান আছে আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন প্রক্রিয়া। কিন্তু নীতিসমূহের বাস্তবায়নে আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হচ্ছে জবাবদিহিতামূলক পদ্ধতি কার্যকরী না থাকায় শ্রম সংক্রান্ত সকল নীতি কাগুজে নীতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমশক্তিকে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযোগী, দক্ষ ও সক্ষম করে গড়ে তোলার নির্দেশনা নীতিসমূহে উল্লেখ করা হলেও সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন এবং জবাবদিহিতামূলক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নির্মাণ জরুরি।

সারাদেশের সকল শ্রমজীবী মানুষ শ্রম আইন দ্বারা সুরক্ষিত থাকবে এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' দেশের সকল শ্রমজীবীর জন্য প্রযোজ্য নয়। সিংহভাগ শ্রমিকই রয়ে গেছে আইনের আওতার বাইরে। ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য প্রণীত হয়েছে 'ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' যা একই দেশে দুই আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে শ্রমক্ষেত্রে সৃষ্টি করছে আন্তঃবৈষম্য। বাংলাদেশে আইন বাস্তবায়নের জন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে, এসব কাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র ইতোমধ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ ও ব্যয় করলেও শ্রমিকের কাছে এর সুফল কমই পৌঁছেছে। নাগরিকদের সুরক্ষার অঙ্গীকার থেকে রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পণ করে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে, আবার প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যর্থতার দায় নিতে হয় রাষ্ট্র ও সরকারকে, অপরদিকে শ্রমিকরা জীবন দিয়ে এর মূল্য শোধ করে।

আইন বাস্তবায়ন কাঠামোর সক্ষমতা ও দুর্বলতা পর্যালোচনা

বাংলাদেশে শ্রম সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও সংস্থায় দক্ষ ও উৎসাহী জনবল সংকট আইন বাস্তবায়ন কাঠামোর একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে রয়ে গেছে। আবার রাজনৈতিক বা আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপে এসব প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড প্রভাবিত করার অভিযোগ আছে। যেমন ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, নির্বাচন ও শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আইনগত বিধানে যেমন কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, তেমনি শ্রম অধিদপ্তরের উপর অর্পিত আইনগত দায়িত্ব চর্চার ক্ষেত্রেও অপব্যবহার ও জটিলতা সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষণীয়। শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা দেশের উৎপাদন ইউনিট ও শ্রমিকসংখ্যার অনুপাতে একেবারেই অপ্রতুল। অপরদিকে শ্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম রয়ে গেছে সাবেকি আমলের। আধুনিক প্রশিক্ষণ কোর্স ও প্রশিক্ষকের অভাব তীব্র। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বা প্রবাসী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তা পাওয়ার আবেদন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া হয়ে উঠেছে অত্যন্ত জটিল ও দুর্নীতিপ্রবণ। শত শত কোটি টাকা তহবিলে থাকলেও দুর্দশাগ্রস্ত সাধারণ শ্রমিকের কাছে তা সহজে পৌঁছানোর কোনও উপায় নেই। শ্রমক্ষেত্রে এসব জটিলতা, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, সাবেকিপনা সমূলে উৎপাটন করতে না পারলে শ্রমশক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সাম্য তৈরির এই চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না। রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও পরিকল্পনা গ্রহণের কোনও বিকল্প নেই।

শ্রমখাতে রাজনৈতিক প্রভাবের ফল, শিল্প সম্পর্কের ব্যত্যয় ও ব্যাহত গণতন্ত্র

বাংলাদেশের জাতীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে স্বাধীনতার পর থেকে নীতি ও আইন প্রণয়নে শ্রমিকদের গুরুত্ব কমে যাওয়া এবং রাজনৈতিক দলসমূহে ক্ষমতাকেন্দ্রিক ব্যবসায়ী, বড় শিল্পপতিদের প্রাধান্য ও প্রভাবে রাষ্ট্র তার মূল অঙ্গীকার ও প্রস্তাবনা থেকে সরে এসেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য নিশ্চিত করার বদলে ধারাবাহিকভাবে শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও অবস্থানের ওপর নানা নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিল্প খাত।

শ্রমিক আন্দোলন দূষিতকরণ, শ্রমিকের অপরাধীকরণ, মজুরি ও অন্যান্য আন্দোলন দমন নিয়মিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৯] শিল্প বিরোধ নিরসনে দরকষাকষির বদলে নিয়োগকারী-শ্রমিক সম্পর্কের উপর হস্তক্ষেপের চর্চা সমাজের অন্যত্র প্রভাব ফেলছে। জবাবদিহিতার অভাবে অবহেলাজনিত শিল্প দুর্ঘটনা, প্রতিকারহীন মৃত্যু আজও চলছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বাণিজ্যিকীকরণে শ্রমিকশ্রেণির, মধ্যবিত্তের সন্তানদের গুণগত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবাপ্রাপ্তি ব্যাহত হচ্ছে যা শেষ পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে প্রভাব ফেলছে।

রাষ্ট্র পরিচালনায় ও নীতি প্রণয়নে 'উন্নয়ন' ধারণার পুনর্বিবেচনা একটি জরুরি কাজ, কী এর অর্থ, কার জন্যে উন্নয়নের অগ্রাধিকার। উন্নয়নের এজেন্ডা পুঁজির আহরণ ও সঞ্চয়নের সহায়তার জন্য নয়, বরং শ্রমিক সহ সকল নাগরিকের চাহিদা, প্রয়োজন ও অধিকার নিশ্চিত করা। আমাদের ফিরে যেতে হবে বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহের নির্দেশনা ও প্রস্তাবনার প্রতিশ্রুতির কাছেই। কৃষক এবং শ্রমিকদের সকল ধরনের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার অর্থ কী এবং তা কীভাবে করা যেতে পারে- সেই লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশনের এই সুপারিশ। বাংলাদেশের শিল্পখাতের বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক বাজারের জন্য দক্ষ শ্রমসম্পদ তৈরি, উদ্যোক্তা ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং নিয়োগকারী ও শ্রমিকের ন্যায়ানুগ অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও সহায়ক নীতি-পরিকল্পনা আবশ্যক।

শ্রম সংস্কার কমিশনের এই সুপারিশ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে, একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণে শ্রম জগতের এমন একটি অধিকারভিত্তিক রূপান্তর প্রস্তাবনা যেখানে শ্রমিকদের যেন আর কারও অবহেলা ও দয়ার মধ্যে চলতে না হয় তার পথনির্দেশ দিবে শ্রমিক তাঁর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে চলবেন। এই রূপান্তর প্রস্তাবনা শুধু শ্রমিকদের অধিকারের জন্য নয়, এর বাস্তবায়ন বাংলাদেশে ন্যায্য সমাজ প্রতিষ্ঠায় অপরিহার্য।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার ও কল্যাণ সুরক্ষায় সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণ, শ্রম ও ব্যবসা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার ও দায়বদ্ধতা পরিপালন, রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও আইনকানুনসমূহের নির্দেশনার সঠিক বাস্তবায়ন, আইন বাস্তবায়ন কাঠামোর সক্ষমতা উন্নয়ন সর্বোপরি শ্রম ও শিল্পখাতকে দলীয় রাজনীতির অন্যায় প্রভাব থেকে রক্ষাকল্পে যুগোপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে শ্রম সংস্কার কমিশন "শ্রম জগতের রূপান্তর রূপরেখা" শীর্ষক প্রতিবেদনটি সুপারিশ হিসেবে উপস্থাপন করছে।

১.২ উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি

শ্রম সংস্কার কমিশন শ্রম জগতের ঐতিহাসিক রূপান্তর ও বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে সংস্কার প্রস্তাবনায় শ্রমিক, শ্রমজীবী মানুষ, তাঁর আইনি স্বীকৃতির পাশাপাশি নিয়োগকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাঝে সু-সমন্বিত শিল্প-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার গুরুত্বে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে সকল বিষয়ে কাজ করেছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে শ্রম আইন সংস্কার, শ্রম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের কাঠামোগত সংস্কার, ট্রেড ইউনিয়ন, সংগঠিত হওয়া ও দরকষাকষির চর্চার পরিবেশ উন্নয়ন, শিল্পসম্পর্ক ও ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন, শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ও বিরোধ নিষ্পত্তি, কর্মসংস্থান ও চাকরির নিরাপত্তা, উপযুক্ত মজুরি ও ক্ষতিপূরণ, সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়ন, অভিবাসী শ্রমিক সুরক্ষা, শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমজীবী কিশোরী-কিশোরদের সুরক্ষা এবং পিছিয়ে রাখা শ্রমিক যেমন- নারী কৃষক, গ্রামীণ শ্রমিক, গৃহশ্রমিক, খামারভিত্তিক শ্রমিক, মৌসুমি শ্রমিক, আদিবাসী শ্রমিক, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর শ্রমজীবী গোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষা ও অন্যান্য।

শ্রম সংস্কার কমিশন সুপারিশ প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে বাংলাদেশ সংবিধান, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, ঘোষণা ও নীতিমালা, মানবাধিকার, পরিবেশ, অভিবাসন ও ব্যবসা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলাদি, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০, এলডিসি গ্রাজুয়েশনে অনুসরণীয় বিষয়াদি এবং উন্নয়ন সহযোগী ও ক্রেতা রাষ্ট্রসমূহের প্রত্যাশা, শর্ত ও নীতিমালা ইত্যাদি পর্যালোচনা করেছে। একই সাথে মিডিয়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা, সারাদেশে অংশীজন ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আলোচনা

[৯] Moazzem, Khondker G., & Khondker, Abeer. (2021). *EU's EBA & Prospect of GSP+ for Bangladesh: Addressing challenges related to Labour Laws and Rights.* CPD and Networks Matter: Dhaka.

ও জনগণের মতামত, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে মতবিনিময় এবং আইএলও সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার সাথে মতবিনিময় করেছে।

বাংলাদেশের সকল (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক) শ্রমিকের অধিকার ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সবার জন্য শোভন কাজ—কাজের নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা, সংগঠন ও দরকষাকষির অধিকার এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার—সুরক্ষা ও উন্নয়নে সুপারিশ প্রণয়ন করা যা সুষ্ঠু শিল্পসম্পর্ক চর্চার পরিবেশ তৈরি এবং টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মর্যাদাকর বাংলাদেশ গড়ে তোলার অভিযাত্রায় অবদান রাখবে।

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য বিবেচনায় রেখে কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়াদি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ণ করেছে:

১. **শ্রম সংক্রান্ত আইন ও নীতিসমূহ পর্যালোচনা:** বাংলাদেশে বিদ্যমান শ্রম সংক্রান্ত সকল নীতি, আইন, বিধি ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯, শ্রমনীতি ২০১২, জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি নীতিমালা ২০১৩, গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি ২০১৫, শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০ এবং শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬ পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি করা;

২. **বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সংস্কার:** শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকল্পে আইন ও নীতির কার্যকর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ; যেমন— শ্রম অধিদপ্তর, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নে সুপারিশ করা;

৩. **ট্রেড ইউনিয়ন, শিল্পসম্পর্ক ও ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থার উন্নয়ন:** সকল শ্রমিকের সংগঠিত হওয়া, দরকষাকষি ও প্রতিনিধিত্বশীলতা নিশ্চিত করা, প্রতিষ্ঠান পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর সামাজিক সংলাপ ও দরকষাকষি এবং গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড চর্চার পরিবেশ উন্নয়ন, কার্যকর ও সুসমন্বিত ত্রিপক্ষীয় ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে জাতীয়, সেক্টরাল ও প্রতিষ্ঠান পযার্য়ের বিদ্যমান ব্যবস্থা; যেমন— ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ—টিসিসি'র কাঠামো ও কার্যপরিধি পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি করা; এ লক্ষ্যে বিগত সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্প অসন্তোষসমূহ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় চিহ্নিত করা;

৪. **শ্রমিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি ও বিরোধ নিষ্পত্তি:** সকল শ্রমিকের ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা, অসন্তোষ নিরসন, শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির বিদ্যমান প্রক্রিয়া; যেমন— প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, সালিশ ও মধ্যস্থতা এবং শ্রম আদালত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি ও কার্যপ্রক্রিয়া পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি করা;

৫. **কর্মসংস্থান, কাজের নিরাপত্তা ও দক্ষতা উন্নয়ন:** বিশ্বব্যাপী প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, উৎপাদন প্রক্রিয়া, কাজের ও নিয়োগের ধরন পরিবর্তন; যেমন— চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন, প্লাটফরম/গিগ ইকোনমি, জনমিতির বিন্যাস এবং কর্মসংস্থানের চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় রেখে বিদ্যমান কাজের নিরাপত্তা, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকের বিশেষ করে শিক্ষাধীন, (এপ্রেন্টিস), আউটসোর্সিং , মাস্টাররোলভিত্তিক শ্রমিক, সেবা খাতের শিক্ষানবিস ও যুব কর্মীর সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি;

৬. **শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন, মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা:** শ্রমিক ও তার পরিবারের মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপন নিশ্চিত করা, মৌলিক চাহিদা পূরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা— এসডিজি ও জাতীয় দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যমাত্রা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু ও নারীর জীবনমান উন্নয়নে ঘোষিত নীতিমালা এবং ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য বিবেচনায় নিয়ে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিদ্যমান মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া, মানদণ্ড ও নিম্নতম মজুরি বোর্ডের গঠন ও কার্যপরিধি পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি;

৭. **পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা:** সবার জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা উন্নয়নে বিদ্যমান আইন, নীতি, পরিদর্শন ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড ও পরিশোধ প্রক্রিয়া এবং সংশ্লিষ্ট কাঠামোসমূহ যেমন— জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য নিরাপত্তা কাউন্সিল, প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সেইফটি কমিটি, এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিমসহ অন্যান্য ব্যবস্থা পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি। এ লক্ষ্যে বিগত সময়ের উল্লেখযোগ্য শিল্প-দুর্ঘটনাসমূহ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় চিহ্নিত করা;

৮. **সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম:** সকল শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এর আওতা, প্রক্রিয়া ও বিদ্যমান স্কিমসমূহ, শিল্পাঞ্চলের পরিবেশ উন্নয়ন, শ্রমিক ও তার পরিবারের বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নে সুপারিশ করা। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা, উদাহরণসমূহ থেকে শিক্ষণীয় বিষয় চিহ্নিত করা;

৯. **অভিবাসী শ্রমিক সুরক্ষা:** অভিবাসন প্রত্যাশী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন, মর্যাদাপূর্ণ, হয়রানিমুক্ত ও নিরাপদ অভিবাসন, প্রবাসে সুরক্ষা, প্রবাসী শ্রমিকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি, আইনি সুরক্ষা ও সংগঠিত হওয়া, দরকষাকষি ও প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার, প্রবাসকালীন শ্রমিকের পরিবারের সুরক্ষা ও কল্যাণ এবং প্রত্যাবর্তনকৃত শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন নিশ্চিতকল্পে বিদ্যমান আইন, নীতি ও কাঠামো পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি;

১০. **নারী শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা:** নারী শ্রমিকদের জন্য মর্যাদাকর, বৈষম্যহীন ও হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ, নারী শ্রমিকের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা সহ সকল প্রকার সুবিধা নিশ্চিত এবং নারী— বিশেষ করে গ্রামীণ নারীর উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নকল্পে সুপারিশ তৈরি;

১১. **শিশুশ্রম নিরসন, শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরীদের সুরক্ষা:** শিশুশ্রম নিরসন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে শিশুদের রক্ষাকল্পে বাংলাদেশ সরকারের নীতি, কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচিসমূহ পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি;

১২. **কৃষি, গ্রামীণ, খামারভিত্তিক ও মৌসুমি শ্রমিক সুরক্ষা:** কৃষি শ্রমিক, গ্রামীণ শ্রমিক, খামারভিত্তিক ও মৌসুমি শ্রমিকের আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষা, কর্মহীন সময়ে ও প্রাকৃতিক দুর্যোর্গে সুরক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন, সামাজিক নিরাপত্তা, সংগঠিত হওয়া ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি;

১৩. **আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শ্রমিক সুরক্ষা:** আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈষম্যহীনতা, মর্যাদা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে সুপারিশ তৈরি;

১৪. **গৃহভিত্তিক শ্রমিক ও গৃহশ্রমিক সুরক্ষা:** গৃহভিত্তিক শ্রমিক ও গৃহশ্রমিকদের আইনগত স্বীকৃতি, নির্যাতন থেকে সুরক্ষা, সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সুপারিশ তৈরি;

১৫. **প্রতিবন্ধী ও অনগ্রসর শ্রমজীবী গোষ্ঠীর সুরক্ষা:** প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও প্রতিবন্ধীবান্ধব কর্মক্ষেত্র তৈরি এবং অনগ্রসর ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রমজীবী গোষ্ঠীর মর্যাদা, সুরক্ষা, বৈষম্যহীনতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকল্পে সুপারিশ তৈরি;

১৬. **রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ/বিরাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থান ও শ্রমিক অধিকার সুরক্ষা:** রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বন্ধ/বিরাষ্ট্রায়ত্তকরণের প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থান ও শ্রমিক অধিকার পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও সুপারিশ তৈরি; এবং

১৭. **সাপ্লাই চেইন তৈরি:** সাপ্লাই চেইনের মাধ্যমে বহুজাতিক ও জাতীয় কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত/সংযুক্ত সকল শ্রমিকের জন্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও ঘোষণা অনুযায়ী অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতের জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানিকে জবাবদিহিতাসহ দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকল্পে সুপারিশ তৈরি।

১.৩ কর্মপদ্ধতি, টেকনিকাল কমিটি পরিচিতি ও অংশীজন পরিচিতি

কমিশন তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রাথমিকভাবে কিছু নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। এতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন, নীতি, দলিল এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন ও সুপারিশ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন কেস স্টাডি এবং মিডিয়া প্রতিবেদনও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অংশীজনদের মতামত গ্রহণের জন্য মাঠ পর্যায়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন, মালিক পক্ষের সংগঠন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। সরকারি বিভিন্ন সংস্থা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন, যেমন আইএলও'র সাথেও মতবিনিময় হয়েছে। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ পেশাজীবী ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। জনসাধারণের মতামত সংগ্রহের জন্য অনলাইন ফর্ম, ইমেইল ও লিখিত পরামর্শ ব্যবহৃত হয়েছে।

এই প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে কমিশন একাধিক টেকনিকাল কমিটি গঠন করেছে, যারা শ্রম পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে প্রাসঙ্গিক সুপারিশ তৈরি করেছে। গঠিত কমিটিগুলির মধ্যে রয়েছে— আইন ও নীতি কাঠামো, শ্রম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান ও গর্ভনেন্স, শ্রম অসন্তোষ ও অভিযোগ নিষ্পত্তি, শিল্প সম্পর্ক ও সামাজিক সংলাপ এবং শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ও

কল্যাণ। বিষয়ভিত্তিক পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রণয়নের জন্য আরও আটটি কমিটি কাজ করেছে। এই কমিটিগুলি যথাক্রমে কাজের অধিকার ও অন্তর্ভুক্তি, মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, সংগঠনের অধিকার ও যৌথ দরকষাকষি, শিল্প বিরোধ ও ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীনতা ও বিশেষ জনগোষ্ঠী এবং শিশু ও কিশোর শ্রম এবং জবরদস্তিমূলক শ্রম বিষয় নিয়ে কাজ করেছে। টেকনিকাল কমিটির সদস্যদের তালিকা সংযুক্তি ১.৩.১ এ দেখুন।

কমিশনের এই কার্যক্রমে অংশীজনদের সরাসরি অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। শ্রমিক সংগঠনের সাথে ১৬টি, মালিক সংগঠনের সাথে জেলা পর্যায়ে ৮টি, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে ১০টি এবং পেশাজীবীদের সঙ্গে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ২২টি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী ও ব্র্যান্ড বায়ারদের সাথে ৩টি সভা হয়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংযুক্তি ১.৩.২ এ দেয়া আছে। এছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান মোট ১৬০টি দাবিনামা ও লিখিত মতামত কমিশনের কাছে পেশ করেছে, যা কমিশনের সুপারিশ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। দাবিনামা ও লিখিত মতামত প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা সংযুক্তি ১.৩.৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছ।

১.৪ রিপোর্টের বিভিন্ন ভাগ পরিচিতি

এই রিপোর্টের দ্বিতীয় অধ্যায় শ্রম সংস্কারের জন্য একটি কাঠামোগত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এতে সংস্কারের জন্য গ্রহণযোগ্য ভিত্তি, নীতিগত নির্দেশনা ও সুপারিশ প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। এই অধ্যায়ে একটি বিষয়ভিত্তিক কাঠামো তৈরি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শ্রম সংস্কারের মূল কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে।

তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত বাংলাদেশের শ্রমজগতের বর্তমান অবস্থা, শ্রমিকদের অধিকার এবং এর সঙ্গে জড়িত নানা ধরনের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনাকে বিশ্লেষণ করে এবং অংশীজনদের মতামত ও দাবির ভিত্তিতে সংস্কার অধিক্ষেত্র চিহ্নিত করে মৌলিক বিষয়ভিত্তিক, শ্রম খাত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানভিত্তিক, শ্রমগোষ্ঠীভিত্তিক এবং খাতভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

সর্বশেষ অধ্যায়ে মানবাধিকার ও ব্যবসা, জলবায়ু পরিবর্তন, সামাজিক চুক্তি প্রভৃতি বিশেষ ইস্যুতে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে।

২ শ্রমে।পনঅধ্যায়ে মানবাধিকারন কর

২.১ সংস্কার কাঠামোর ভিত্তি

স্বীকৃত মানবাধিকার ও শ্রম মানদণ্ড

বাংলাদেশের সংবিধান, আইন ও নীতিমালা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানই এ দেশে শ্রমিক অধিকার এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিতের মূল ভিত্তি/হাতিয়ার। সংবিধান প্রতিটি নাগরিকের কর্মের অধিকার, শোষণমুক্ত ও মানসম্পন্ন জীবনযাপন নিশ্চিতের পাশাপাশি বৈষম্য নিরসনের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সংকল্পবদ্ধ।

অনুচ্ছেদ ১৪ ও ১৫: বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪-তে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী (মেহনতি) মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।" বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ সুনির্দিষ্টভাবে মৌলিক চাহিদা পূরণের সাথে সম্পর্কিত। এ অনুচ্ছেদ অনুসারে "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অর্জন নিশ্চিত করা যায়:

(ক) অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা;

(খ) কর্মের অধিকার, অর্থাৎ কর্মের গুণ ও পরিমাণ বিবেচনা করিয়া যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার অধিকার;

(গ) যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকার; এবং

(ঘ) সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার।"

অনুচ্ছেদ ১৯: সুযোগের সমতার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অঙ্গীকার হলো (১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন; (২) মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধা দান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন; এবং (৩) জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

অনুচ্ছেদ ২০: অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম—(১) কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয় এবং "প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী"-এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন; এবং (২) রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন (কোনো) ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না এবং যেখানে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও কায়িক-সকল প্রকার শ্রম সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের ও মানবিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইবে।

অনুচ্ছেদ ৩৪: জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ— (১) সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনভাবে (কোনোভাবে) লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ (আইনত) দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে; এবং (২) এই অনুচ্ছেদের কোন (কোনো) কিছুই সেই সকল বাধ্যতামূলক শ্রমের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যেখানে (ক) ফৌজদারী (ফৌজদারি) অপরাধের জন্য কোন (কোনো) ব্যক্তি আইনতঃ (আইনত) দণ্ডভোগ করিতেছেন; অথবা (খ) জনগণের উদ্দেশ্য সাধনকল্পে আইনের দ্বারা তাহা আবশ্যক হইতেছে।

অনুচ্ছেদ ৩৭: সমাবেশের স্বাধীনতা—জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ৩৮: সংগঠনের স্বাধীনতা—জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে; তবে শর্ত থাকে যে, কোন (কোনো) ব্যক্তির উক্তরূপ সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার কিংবা উহার সদস্য হইবার অধিকার থাকিবে না, যদি-

(ক) উহা নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(খ) উহা ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ, জন্মস্থান বা ভাষার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়;

(গ) উহা রাষ্ট্র বা নাগরিকদের বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোন (কোনো) দেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী বা জঙ্গী (জঙ্গি) কার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়; বা

(ঘ) উহার গঠন ও উদ্দেশ্য এই সংবিধানের পরিপন্থী হয়।

অনুচ্ছেদ ৪০: পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা—আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোন (কোনো) পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের কিংবা কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার জন্য আইনের দ্বারা কোন (কোনো) যোগ্যতা নির্ধারিত হইয়া থাকিলে অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন (কোনো) আইনসঙ্গত পেশা বা বৃত্তি-গ্রহণের এবং যে কোন (কোনো) আইনসঙ্গত কারবার বা ব্যবসায়-পরিচালনার অধিকার থাকিবে।

আইন: বাংলাদেশ শ্রমআইন ২০০৬; বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন ২০১৩; বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫; বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯।

জাতীয় নীতিমালা: শিশু শ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১১; জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১; জাতীয় শিশু নীতি ২০১১; জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২; জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩; প্রবীণ কল্যাণ নীতিমালা ২০১৩; গৃহ শ্রমিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা ২০১৫; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬; জাতীয় যুবনীতি ২০১৭; জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০২০; জাতীয় কর্ম সংস্থান নীতি ২০২২; জাতীয় শিল্পনীতি ২০২২।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থাসহ জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য হিসেবে দায়বদ্ধতা

অনুস্বাক্ষরকৃত আইএলও কনভেনশন ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইন, ঘোষণা ও দলিলাদি: বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রম অধিকারের প্রতি দায়বদ্ধ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক সনদ, চুক্তি ও কনভেনশনে অনুস্বাক্ষরকারী ও অনুসমর্থনকারী দেশ। জাতিসংঘ ঘোষিত ১৮টি প্রধান মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তি ও প্রটোকলের মধ্যে বাংলাদেশ ১৩টি অনুসমর্থন করেছে, যা দেশের মানবাধিকার প্রতিশ্রুতির ব্যাপ্তি এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের প্রতি দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে।

এই চুক্তিসমূহের মধ্যে রয়েছে—সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮), অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (১৯৬৬), নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি (১৯৬৬), নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত সনদ (CEDAW, ১৯৭৯), শিশু অধিকার সনদ (১৯৮৯), বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ এবং নির্যাতন, জোরপূর্বক অন্তর্ধান, অভিবাসী শ্রমিক, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কিত কনভেনশন।

এছাড়া বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৯০টি আন্তর্জাতিক কনভেনশনের মধ্যে ৩৫টি অনুসমর্থন করেছে, যার মধ্যে বহু দলিল মানবাধিকার, শ্রম সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে Fundamental Principles and Rights at Work-এ উল্লিখিত চারটি মৌলিক নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ: ১। সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা ও সমষ্টিগত দরকষাকষির অধিকার; ২। জবরদস্তিমূলক শ্রমের বিলোপ; ৩। শিশুশ্রমের বিলোপ; এবং ৪। কাজের ক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ। এই নীতিগুলি আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের ভিত্তিভূমি এবং বাংলাদেশের শ্রমনীতির কাঠামোগত সংস্কারে অন্যতম নির্দেশক।

মানবাধিকার, পরিবেশ, অভিবাসন ও ব্যবসা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক দলিলাদি: আন্তর্জাতিক শ্রম, মানবাধিকার ও ব্যবসায়িক নীতির সমন্বয়ে গঠিত আধুনিক কাঠামোর অন্যতম অংশ হলো United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), যা রাষ্ট্র, করপোরেট সংস্থা এবং সিভিল সোসাইটির মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষার একটি কাঠামো নির্ধারণ করে। Human Rights Due Diligence (HRDD) একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ, যা ব্যবসায়িক উদ্যোগে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি চিহ্নিত, প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করার উপায় নির্দেশ করে। এই দলিলসমূহ বাংলাদেশের শ্রম বাজারের জন্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। কারণ তারা গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের অংশ হিসেবে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষার আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ করে এবং বহুজাতিক কোম্পানির নৈতিক ও আইনি বাধ্যবাধকতাকে স্বীকৃতি দেয়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি ২০৩০): টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals - SDGs) হলো ২০৩০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানব মর্যাদা, সমতা ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি সর্বজনীন কর্মপরিকল্পনা। এসডিজি-এর মধ্যে লক্ষ্য ৮: "শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি" সরাসরি শ্রমিকদের সঙ্গে সম্পর্কিত, যার অধীনে কাজের নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি, শোভন কর্মপরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার রয়েছে। এছাড়াও লক্ষ্য ৫ (লিঙ্গ সমতা), লক্ষ্য ১০ (বৈষম্য হ্রাস) এবং লক্ষ্য ১৬ (শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান) শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত।

এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনে অনুসরণীয় বিষয়াদি: বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় শ্রম খাতের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি, সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণ এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড মেনে চলা অপরিহার্য। গ্র্যাজুয়েশনের পর বাংলাদেশ বিভিন্ন বাণিজ্যিক ছাড় হারাতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্রম অধিকার রক্ষা এবং উৎপাদন ব্যবস্থার নৈতিকতা নিশ্চিত করাই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা বজায় রাখার অন্যতম উপায়। এক্ষেত্রে শ্রমিকদের শোভন কর্মপরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার, নিরাপত্তা, ন্যায্য মজুরি ও প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়।

সরকারের শ্রমসংক্রান্ত চুক্তি ও অঙ্গীকারসমূহ: সরকার আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শ্রমনীতি সংক্রান্ত একাধিক চুক্তি ও কর্মপরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: National Action Plan on Business and Human Rights, Decent Work Country Programme (DWCP) এবং ILO Road Map on Labour Rights। এসব দলিল শ্রমিকদের অধিকার, অংশগ্রহণ, নিরাপত্তা এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

২.২ সংস্কার নীতি

শ্রম সংস্কার কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রণয়নে যে নীতিমালাগুলি অনুসরণ করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নয়। বরং বাংলাদেশ শ্রমনীতির ভবিষ্যৎ রূপায়ণে প্রাতিষ্ঠানিক নির্দেশক হিসেবে বিবেচিত। নিম্নে প্রতিটি নীতির যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো:

শ্রমের মর্যাদা, স্বীকৃতি ও অধিকার: সমাজের সকল স্তরে শ্রমের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন এবং শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার ও প্রয়োজনীয় সুরক্ষার নিশ্চয়তা একটি মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব। এই নীতির উদ্দেশ্য হলো কাজকে শুধু উপার্জনের মাধ্যম নয়, বরং মর্যাদাসম্পন্ন সামাজিক ভূমিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, যা সমাজে শ্রমিকদের অবস্থানকে সম্মানজনক করে তোলে।

সর্বজনীনতা, বৈষম্যহীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার: ধর্ম, জাতিগোষ্ঠী, লিঙ্গ, জন্মস্থান কিংবা অন্য যে কোনো পার্থক্যের উর্ধ্বে উঠে শ্রমিকদের প্রতি সমান আচরণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই এই নীতির কেন্দ্রবিন্দু। এটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণে সহায়ক নীতি, যেখানে শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন সম্ভবপর হয়।

অংশীদারিত্ব ও ন্যায্য হিস্যা: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে শ্রমিকদের অবদানকে যথাযথভাবে স্বীকৃতি দিয়ে তার সুফল শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সুষমভাবে বিতরণের নীতি এই অংশীদারিত্বের ভিত গড়ে দেয়। এটি শ্রমিকের কর্মপ্রেরণা, উৎপাদনশীলতা এবং দায়িত্ববোধকে উৎসাহিত করে।

সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক, প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ: প্রতিটি শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার অধিকার, তাদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা একটি গণতান্ত্রিক শ্রম পরিবেশের পূর্বশর্ত। শ্রমিক-মালিক-সরকার এই ত্রিপক্ষীয় কাঠামোর মধ্য দিয়ে শিল্প সম্পর্কের ভারসাম্য ও সংহতি রক্ষা সম্ভব।

ন্যায় বিচার: প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং স্ব নিযুক্ত—সব ধরনের শ্রমিকের অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিকার ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজের স্তম্ভ। এতে শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাস, রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা এবং সামাজিক শান্তি রক্ষা পায়।

২.৩ সুপারিশ প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়গুলি নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের বিদ্যমান শ্রম ও শ্রমিক অধিকার পরিস্থিতি, শ্রমিকের জীবনমান, কর্ম সংস্থানের গতিপ্রকৃতি, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ধারা এবং এর প্রেক্ষিতে উদ্ভূত জন-আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশা এক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। একই সাথে কর্মজগতে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও দেশের শ্রম বাজারের ভবিষ্যৎ চাহিদা এই কমিশনের সুপারিশ গঠনে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। পাশাপাশি টেকসই ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখা ও উন্নত করার বিষয়টি কমিশন তার সুপারিশ তৈরিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছে।

বিদ্যমান শ্রম ও অধিকার পরিস্থিতি

শোভন কর্মক্ষেত্রের মানদণ্ড ও ঘাটতি: শোভন কর্মক্ষেত্র বলতে বোঝায় এমন একটি পরিবেশ যেখানে শ্রমিকদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হয়। ১৯৯৯ সালে প্রবর্তিত শোভন কাজের ধারণাটি শ্রমিকের অন্যতম মৌলিক অধিকার হিসেবে বিশেষভাবে স্বীকৃত। শোভন কাজের অধিকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন ধারণায়ও গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম এক লক্ষ্য এই শোভন কাজ। শোভন কাজের সর্বমোট ১০টি নির্দেশক যার অধীনে রয়েছে কর্মসংস্থান সুযোগ; পর্যাপ্ত উপার্জন এবং উৎপাদনশীল কাজ; শোভন কর্ম সময়; কাজ, পরিবার এবং ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য; বিলোপ করা উচিত এমন কাজ, কাজের স্থিতিশীলতা এবং নিরাপত্তা; কর্মস্থলে সমান সুযোগ এবং ট্রিটমেন্ট; নিরাপদ কাজের পরিবেশ; সামাজিক নিরাপত্তা; এবং সামাজিক সংলাপ, শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার প্রতিনিধিত্ব। এ সকল নির্দেশকের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের শ্রমিকের শোভন কাজের পরিস্থিতি এবং বিদ্যমান সমস্যা ও ঘাটতিসমূহ এই সংস্কার কমিশন বিবেচনায় নিয়েছে, যাতে শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নিশ্চিত করা যায়।

বৈষম্য, বেকারত্ব, ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা: বাংলাদেশের শ্রমবাজারে নানা ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান। কাজের স্বীকৃতি ও সুযোগ, অধিকার, মজুরি, সংগঠন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈষম্যসমূহ লক্ষণীয়। এর পাশাপাশি রয়েছে বেকারত্বের উচ্চ হার এবং শ্রম বাজারের ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতা। বেকারত্বের হার যুবকদের মধ্যে অত্যধিক। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে অধিক বেকারত্ব বাংলাদেশের শ্রম বাজারের অন্যতম উদ্বেগের বিষয়। এছাড়া আকস্মিক কর্মহীনতা, দুর্ঘটনা এবং মজুরির অনিশ্চয়তাও দেশের শ্রম বাজার ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ককে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। এমতাবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি ঝুঁকি মোকাবেলার বিষয়টি কমিশন গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় এনেছে।

শ্রমক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, শিল্প ক্ষেত্রে বিবর্তন: বিগত দশকগুলিতে বাংলাদেশের শ্রমক্ষেত্রে আবির্ভূত বৈচিত্র্য বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শ্রমবাজারে বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক, পেশা ও কাজ এবং নিয়োগের বৈচিত্র্য দিন দিন বাড়ছে। একসময় যেখানে শ্রমবাজার ছিল মূলত কৃষিনির্ভর; সেখানে বর্তমানে গার্মেন্টস, আইটি, সেবা খাত, নির্মাণ শিল্প, ফ্রিল্যান্সিং, রাইড শেয়ারিংয়ের মতো বিভিন্ন সেক্টরে শ্রমিকদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রম বাজারে পুরুষের পাশাপাশি নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগামী দিনগুলিতে আরো বৃদ্ধি পাবে। শ্রম বাজার ও শিল্পের এই বিবর্তন ও বৈচিত্র্য একদিকে যেমন নতুন সুযোগের সৃষ্টি করেছে; একই সাথে শ্রমিক অধিকার, সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতের ক্ষেত্রে তৈরি করছে নতুন চ্যালেঞ্জ, যেগুলি কমিশনের সুপারিশে বিবেচিত হয়েছে।

শিল্প সম্পর্ক, অসন্তোষ ও শিল্প বিরোধ: শ্রম অসন্তোষ ও শিল্প বিরোধ সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্কের পথে অন্তরায় যা শ্রমিক ও মালিক উভয়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং প্রকারান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের অর্থনীতি, উৎপাদনশীলতা ও টেকসই উন্নয়ন। বাংলাদেশে শ্রমিকদের বেতন-ভাতা, কাজের পরিবেশ এবং অন্যান্য অধিকার সংক্রান্ত দাবির কারণে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্পে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং এর ফলে শুধুমাত্র শিল্প উৎপাদনই ব্যাহত হয় না, একই সাথে শ্রমিকের জীবিকা, টেকসই ব্যবসা এবং দেশের ভাবমূর্তিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ প্রেক্ষিতে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা, টেকসই ব্যবসা ও স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য শ্রম অসন্তোষ ও শিল্প বিরোধ এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করেছে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন: চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, রোবটিক্স, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI) এর মতো ক্ষেত্রগুলিতে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তনের প্রভাব শ্রমিকদের কাজের ধরন এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে পড়ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস, কৃষি, আসবাবপত্র, চামড়া প্রভৃতি শিল্পে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এ সকল শিল্পে/কাজে নিয়োজিত শ্রমিকের জীবন, জীবিকা ও জীবনমানকে প্রভাবিত করেছে। তাই কমিশন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত ও কাজের ধরনের পরিবর্তন এবং শ্রমিকদের জীবনমানের পরিবর্তনের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে সুপারিশসমূহ প্রস্তুত করেছে।

শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মৌলিক অধিকার ও প্রয়োজন

শ্রমিক অধিকারের পাশাপাশি শ্রমকল্যাণ নিশ্চিত করাও যেহেতু এই সংস্কার কমিশনের মূল লক্ষ্য, সেহেতু সুপারিশ প্রণয়নে কমিশন শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের মৌলিক অধিকার ও প্রয়োজনকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়েছে। শ্রমিক ও তাদের পরিবারের মৌলিক চাহিদা; যেমন খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, চিত্ত বিনোদন ইত্যাদি এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে বিবেচনায় আনা হয়েছে যাতে করে শ্রমিক পরিবারগুলির জন্য একটি সমন্বিত সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

জন-আকাঙ্ক্ষা, শ্রমজীবী মানুষের দাবি ও প্রত্যাশা

সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তন বৈষম্য ও শোষণ মুক্ত এক সমাজের প্রত্যাশা তৈরি করেছে। শ্রমজীবী/শ্রমিকেরা এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে বিধায় তাদের মাঝে নতুন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি ঐতিহাসিক ভাবেই দেশের শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের অধিকার ও কল্যাণের জন্য বিভিন্ন দাবি জানিয়ে আসছে। এই কমিশন পরিবর্তিত পরিস্থিতে উদ্ভূত জন-আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রমজীবী মানুষের ন্যায্য অধিকার অর্জনের প্রত্যাশাকে গুরুত্ব দিয়ে সুপারিশমালা প্রস্তুত করেছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবসার ভাবমূর্তি উন্নয়ন ও দায়বদ্ধতা

বাংলাদেশ এখন গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্কিত এবং দিনে দিনে এই সম্পৃক্ততার পরিধি ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সম্পৃক্ততা বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণির কর্মসংস্থান, অধিকার ও জীবনমানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে। এক্ষেত্রে

বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের শিল্প খাতের ও ব্যবসায়ের সুনাম এবং ব্যবসার উন্নত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা আবশ্যক। পাশাপাশি শ্রম অধিকারের সুরক্ষা ও ব্যবসার নৈতিক দায়িত্ববোধ ও দায়বদ্ধতা বজায় রাখাও আবশ্যক, যা দেশের সামগ্রিক ভাবমূর্তি উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। কমিশন তার সুপারিশ প্রণয়নে এ সকল বিষয়কে বিবেচনায় নিয়েছে।

ঐতিহাসিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন

কমিশন তার সুপারিশ প্রণয়নে বাংলাদেশের শ্রম ও কর্মক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং একই সাথে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের ধারাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। কাজের প্রতি মনোভাব, কাজের মূল্য ও স্বীকৃতি, নারীর শ্রম ও কাজের প্রতি সামাজিক মনোভাবের পরিবর্তন এবং এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তনগুলি মাথায় রেখে শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নীতিমালা ও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৪ সংস্কার প্রস্তাবনার বিষয়ভিত্তিক কাঠামো

কাজের স্বীকৃতি, অধিকার, সুযোগ, দক্ষতা ও নিশ্চয়তা: শ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি, চাকরির নিরাপত্তা, নিয়োগপত্র ও সার্ভিস বুক, আউটসোর্সিং, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, দক্ষতা উন্নয়ন, শ্রমিক/শ্রমশক্তির নিবন্ধন ও জাতীয় শ্রম তথ্যভাণ্ডার, শিক্ষানবিস ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (NEET তরুণদের জন্য) এবং STEM শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সুযোগ, গিগ ও প্ল্যাটফর্ম শ্রমিকের অধিকার।



মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা: জাতীয় ন্যূনতম মজুরি, সেক্টরভিত্তিক মজুরি, মজুরি মানদণ্ড ও জীবন ধারণ উপযোগী মজুরি, মজুরি কাঠামো, মজুরি পরিশোধ পদ্ধতি, মজুরি বৃদ্ধির হার, মজুরি পরিশোধের দায়, মজুরি বৈষম্য, বাধ্যতামূলক আপদকালীন তহবিল, কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ।

নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ: শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি করা শ্রম সংস্কারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিবেচনায় নিতে হবে তা হলো কর্মস্থলের দুর্ঘটনা, পেশাগত ব্যাধি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, অভিযোগ জানানোর প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন; পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা; তথ্য সংরক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন; পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক বিশেষ পেশা এবং বিপদাপন্ন গোষ্ঠী ও প্রকল্প।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ: সর্বজনীন পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচ্যুইটি, রেশনিং, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, সেন্ট্রাল ফান্ড, কর্মহীনতা কালীন সুরক্ষা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা, ডে-কেয়ার, শ্রমিক পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আবাসন; বিশেষ শ্রম জনগোষ্ঠীর জন্য স্কিম/কর্মসূচি, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তা।

সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও যৌথ দরকষাকষি: সর্বজনীন সংগঠনের অধিকার, ইউনিয়নের ন্যূনতম সদস্য সংখ্যা ও আবেদন প্রক্রিয়া, ইউনিয়নের অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা; অসৎ শ্রম আচরণ ও এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন ডিস্ক্রিমিনেশন; যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি, শিল্প বিরোধ উত্থাপন, অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের ক্ষেত্রে শিল্প বিরোধ উত্থাপন, ইউনিয়নে নারীদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব, ত্রিপাক্ষিক প্রতিনিধিত্ব, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শ্রমিক প্রতিনিধিত্ব।

শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি এবং **ন্যায় বিচার:** শ্রম আইনের অস্পষ্টতা এবং অসম্পূর্ণতা, বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালতের সংখ্যা ও সক্ষমতা, স্বতন্ত্র অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।

সমতা, বৈষম্যহীনতা ও অন্তর্ভুক্তি: বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ, সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন ছুটি, বেতন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি, নারীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী প্রতিনিধিত্ব, নারী শ্রমিকদের কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা, নারী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পেশাভিত্তিক ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যবস্থা।

শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম: কাজে প্রবেশের ন্যূনতম বয়স, কাজের মান ও পরিবেশ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা, কিশোর শ্রমিকের শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন, শ্রম মানদণ্ড মনিটরিং ও পরিদর্শন, দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও শাস্তি; কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতে বিবেচ্য ও পূর্বের কার্যক্রম মূল্যায়ন; দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ।

২.৫ প্রস্তাবনার মূল কাঠামো

নিম্নোক্ত পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে এই কমিশনের মূল সংস্কার কাঠামো গঠিত।

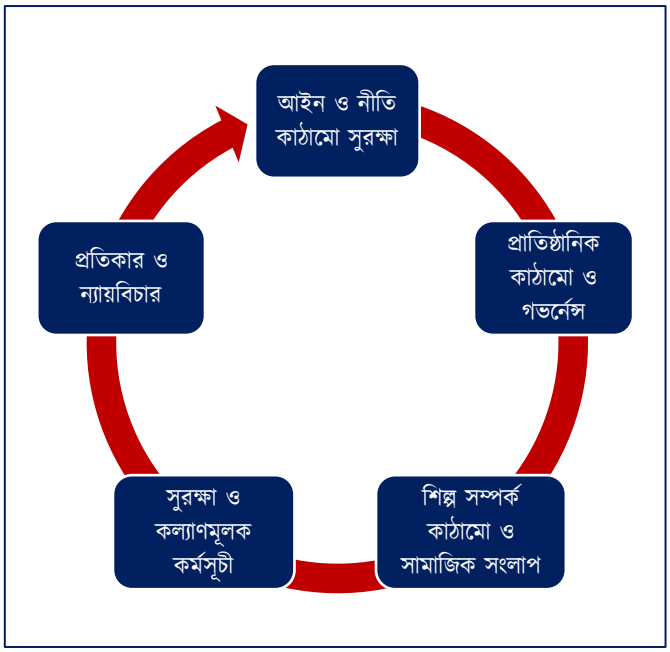
আইন ও নীতি কাঠামোর মাধ্যমে সুরক্ষা: শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিতকরণে শ্রম আইন ও শ্রমনীতির পাশাপাশি সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ও নীতির এক সুসমন্বিত কাঠামো প্রয়োজন, যার মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার ও শ্রম কল্যাণ নিশ্চিতে কমিশন প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়ন এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালার সংশোধন ও উন্নয়নের মাধ্যমে কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও গভর্নেন্স: শ্রম সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং গভর্নেন্স সিস্টেম থাকা জরুরি। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম, দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। কমিশনের সুপারিশ তৈরিতে প্রাতিষ্ঠানিক ও গভর্নেন্স ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও প্রতিষ্ঠানগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করার বিষয়গুলি প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যা শ্রম সংস্কার কার্যক্রমকে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে সহায়তা করবে। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ পর্যালোচনার অধীনে আনা হয়েছে:

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র
শ্রম অধিদপ্তর
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
শ্রম আদালত ও অ্যাপিলেট ডিভিশন
ন্যূনতম মজুরি বোর্ড
সেন্ট্রাল ফান্ড
শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন
জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
শ্রমিকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বিভাগ/প্রতিষ্ঠান

শিল্প সম্পর্ক, সংগঠন ও সামাজিক সংলাপ: শ্রমিক অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক, সংগঠনের অধিকার ও সামাজিক সংলাপের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে শ্রমিকের সংগঠনের অধিকার এবং সামাজিক সংলাপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা ও ঘাটতিসমূহ পর্যালোচনা করে সংগঠন ও সামাজিক সংলাপকে কার্যকর করা প্রয়োজন। সংগঠন ও সামাজিক সংলাপের সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করে এগুলিকে কার্যকর করা হলে এর মাধ্যমে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক এবং একটি সমন্বিত এবং অংশগ্রহণমূলক পরিবেশ তৈরি হবে যেখানে শ্রমিকের অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি: আইন ও নীতিমালার পাশাপাশি সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, যে সকল ক্ষেত্রে আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে কোনো শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিতের সুযোগ সীমিত, সে সকল ক্ষেত্রে কল্যাণমূলক স্কিম ও কর্মসূচির মাধ্যমে শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিতের জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে নতুন স্কিম/কর্মসূচির পাশাপাশি বিদ্যমান স্কিম/কর্মসূচিকে শ্রমিক বান্ধব করা দরকার। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, আউটসোর্সিং, হোমবেজড ওয়ার্ক, গিগ ওয়ার্ক, রাইড শেয়ারিং প্রভৃতি খাতে আইনি সুরক্ষার ঘাটতি মোকাবেলায় সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। এক্ষেত্রে শ্রমিকের চাহিদা ও অনুভূত প্রয়োজন বিবেচনায় নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা, বিমা, পেনশন, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং অন্যান্য সুবিধাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এসব কর্মসূচি শ্রমিকদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমানের উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখতে অবদান রাখবে।



প্রতিকার ও ন্যায় বিচার: প্রতিকার ও ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিকের অধিকার, সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে মূল লক্ষ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিকই যেন প্রতিকার ও ন্যায় বিচারের সুরক্ষা পায়। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের অধিকার রক্ষার জন্য তাদের অভিযোগ বা সমস্যাগুলি দ্রুত নিষ্পত্তি করার জন্য একটি কার্যকর প্রতিকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা জরুরি। এই ব্যবস্থায় শ্রম আদালত, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংস্কার/পরিবর্তন জরুরি।

৩. বিষয়ভিত্তিক মৌলিক সংস্কার প্রস্তাবনা

৩.১ কাজ ও পেশার স্বীকৃতি, কাজের অধিকার, সুযোগ, দক্ষতা, স্থায়িত্ব এবং নিশ্চয়তা

বাংলাদেশের সংবিধান এবং শ্রম আইন নাগরিকদের কাজের অধিকার, সুযোগ, নিশ্চয়তা এবং অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে প্রাধান্য দিয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের কাজ করার অধিকার রয়েছে, যা "কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি" (অনুচ্ছেদ ১৪) রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে চিহ্নিত করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন, যেমন; অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি প্রদান করা। পাশাপাশি "কর্মের অধিকার" (অনুচ্ছেদ ১৫) অনুযায়ী নাগরিকদের উপযুক্ত মজুরি এবং কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করা। "কর্মের অধিকার, কর্তব্য ও সম্মান" (অনুচ্ছেদ ২০) অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিককে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সুযোগ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। "আইনের দ্বারা আরোপিত বাধানিষেধ-সাপেক্ষে কোনো পেশা বা বৃত্তি গ্রহণের অধিকার" (অনুচ্ছেদ ৪০) নিশ্চিত করে নাগরিকদের পছন্দ মতো কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা। জাতীয় শ্রম নীতি ২০১২, "কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরী (তৈরি)" (উদ্দেশ্য ৪.০২) এবং "প্রান্তিক জনগণের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি" (উদ্দেশ্য ৪.০২.৮) নিশ্চিত করার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের বৈষম্যহীন পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে।

তবে দেশের শ্রমবাজারে বেকারত্ব, বিশেষত যুবক ও নারীদের মধ্যে উচ্চ বেকারত্ব, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের উপর নির্ভরশীলতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, বেকারত্ব সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকা এবং লিঙ্গবৈষম্য রয়েছে। বাংলাদেশের শ্রমশক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কোনো না কোনো কাজে নিযুক্ত থাকলেও নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় কম এবং শহরের তুলনায় গ্রামীণ অঞ্চলে পরিস্থিতি আরও চ্যালেঞ্জিং। শিক্ষা এবং দক্ষতার মধ্যে অমিলও বেকারত্বের উচ্চ হার এবং শ্রমবাজারের অকার্যকর ব্যবস্থার লক্ষণ।

দেশের শ্রমবাজারে শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের সংকোচন, কৃষি খাতে উচ্চ কর্মসংস্থান এবং সেবা খাতে ধীর প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে। "অবশিল্পায়ন"-এর কারণে শিল্পখাতে কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে। একদিকে প্রায় ৮৪.৯% শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত, যা তাদের কর্মজীবনে নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাব সৃষ্টি করে। অন্যদিকে গিগ অর্থনীতির উত্থান নতুন সুযোগ তৈরি করলেও সেখানে সুরক্ষা এবং স্বীকৃতির অভাব রয়েছে। তরুণদের মধ্যে কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। বিশেষ করে, যাদের উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি রয়েছে, তারা উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছেন না। এই বৈষম্য বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শ্রম বাজারের কাঠামোগত সমস্যাগুলিকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

শ্রমবাজারের এই সমস্যাগুলি সঠিকভাবে সমাধান করতে হলে দক্ষতা উন্নয়ন, শোভন কাজের সুযোগ তৈরি এবং বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকর নীতিমালা তৈরি করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি, শ্রম অধিকার সুরক্ষিত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শ্রমবাজারে উন্নত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হলে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করা, বিশেষত শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন এবং সমাজের সব স্তরের মানুষের জন্য শোভন কাজ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

বাংলাদেশে বেকারত্ব, বিশেষ করে যুব বেকারত্ব একটি জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতি বছর প্রায় ২২ লাখ শ্রমিক শ্রম বাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার এখনও মাঝারি মাত্রায় রয়েছে—৬১.২%। পুরুষদের অংশগ্রহণের হার ৮০%, যেখানে নারীদের অংশগ্রহণ মাত্র ৪২.৭৭%, যা দেশের শ্রম বাজারে লিঙ্গবৈষম্যের একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। ২০১০ সালের ৪.৬% বেকারত্বের হার ২০২২ সালে ৩.৫৩%-এ নেমে এসেছে, যা একটি ইতিবাচক অগ্রগতি হলেও স্নাতক ডিগ্রিধারীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ২৭.৮% এবং তাদের মধ্যে ১৪.৭% দুই বছরের বেশি সময় ধরে বেকার রয়েছেন।

বাংলাদেশের শ্রম বাজারে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের আধিক্য একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৮৪.৯% শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত, যা ২০১৬ সালের তুলনায় ৫.৬% বেশি। এটি শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি, চাকরির নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাব সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের কৃষি খাত দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৪৫.৪% এর কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, যা কম উৎপাদনশীল হলেও সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে। শিল্প খাতে কর্মসংস্থান কমছে, যার বার্ষিক হ্রাস হার -২.৯৯% এবং সেবা খাতেও সামান্য হ্রাস লক্ষ করা

গেছে। এটি একটি অকাল 'অবশিল্পায়ন'-এর দিকে ইঙ্গিত দেয়, যেখানে অর্থনীতি পূর্ণ বিকাশের আগেই শিল্পখাতের কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে।

বিদেশি কর্মসংস্থান, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে, বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তবে এই খাতের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে দক্ষতার অভাব এবং কম মজুরি একটি বড় সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশি শ্রম অভিবাসীদের মধ্যে ৫০.২৪% কম দক্ষ, ২০.৯৪% আধা দক্ষ, ২৪.৭৬% দক্ষ এবং ৪.০২% বিশেষজ্ঞ। দক্ষ শ্রমিকের অনুপাত ধীরে ধীরে বাড়ছে। তবে কম দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা এখনও অনেক বেশি এবং তাদের মজুরি অত্যন্ত কম।

দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রম বাজারের চিত্র আরও জটিল হয়ে উঠছে শহরমুখী অভিবাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। গ্রাম থেকে শহরে আসা শ্রমিকরা নিরাপদ কাজ এবং উপযুক্ত জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। দেশের শ্রম বাজারে বড় ধরনের সমস্যাগুলির সমাধান এবং সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগানোর জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমতাভিত্তিক এবং টেকসই নীতি কাঠামো প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারের একটি বড় সমস্যা হলো বিভিন্ন পেশার শ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি এবং তাদের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার অভাব। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকরা নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, যা তাদের জীবনের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ব্যাহত করছে। বিভিন্ন খাতভেদে সমস্যাগুলির প্রকৃতি ভিন্ন হলেও মূলত কিছু সাধারণ সমস্যা লক্ষণীয়। বাংলাদেশে রাইড শেয়ারিং কর্মী, খামার বহির্ভূত কৃষি শ্রমিক, গৃহশ্রমিক, গিগ ও অ্যাপ বেইজড শ্রমিক শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত নন। তাদের অধিকাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন এবং তাদের কাজের কোনো স্থায়িত্ব নেই। শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বত্বেও বিভিন্ন পেশার কর্মীরা নিয়োগ ও চাকরির চুক্তির অনুপস্থিতির কারণে অনেক সময় বৈষম্যের শিকার হন। গৃহশ্রমিক, রিকশাচালক, নির্মাণ শ্রমিক, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, দোকান কর্মচারী, চা, পাটকল, রেল এবং ডেকোরেটর্স শ্রমিকদের ক্ষেত্রে চাকরির কোনো লিখিত চুক্তি থাকে না। ফলে তারা যে কোনো সময় কাজ হারানোর ঝুঁকিতে থাকেন। নির্মাণ শ্রমিক, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, দোকান কর্মচারী, চা, পাটকলের ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে শ্রমিক নিয়োগের ফলে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য বেতন, ওভারটাইম, ছুটি বা ক্ষতিপূরণ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন।

স্থায়ী কাজে অস্থায়ী নিয়োগের প্রবণতা রয়েছে বিশেষ করে আউটসোর্সিং, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, বিউটি পার্লার, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট এবং বিক্রয় প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে। এই সকল শ্রমিকদের ১০ থেকে ১৫ বছর কাজ করানোর পরও তাদের চাকরি স্থায়ী করা হয় না। ফলে তারা চাকরির নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হন এবং যে কোনো মুহূর্তে ছাঁটাইয়ের শিকার হতে পারেন। অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ হওয়ার কারণে বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা থাকে না। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কেয়ার ওয়ার্কারস, রাইড শেয়ারিং চালক, গৃহশ্রমিক, দোকান কর্মচারী এবং গণমাধ্যম কর্মীদের কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট থাকে না। ফলে তারা অনিয়ন্ত্রিত সময়ে কাজ করতে বাধ্য হন। বিশেষত পরিবহন শ্রমিক ও রাইড শেয়ারিং চালকরা দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ি চালাতে বাধ্য হন, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

বাধ্যতামূলক ওভারটাইম অন্যতম বড় সমস্যা, যা বিশেষ করে গার্মেন্টস, নির্মাণ, চামড়া শিল্প এবং হোটেল ও রেস্টুরেন্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়। অনেক প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বাধ্য করে এবং এর জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক বা ওভারটাইমের মজুরি প্রদান করা হয় না। পরিচ্ছন্নতা কর্মী, গৃহশ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, দোকান কর্মচারী, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, চিংড়ি, কৃষি, ডেকোরেটার্স শ্রমিক এবং বিক্রয় প্রতিনিধিদের ক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটির অনুপস্থিতি রয়েছে। ফলে দীর্ঘক্ষণ কাজ করার পরও তারা নিয়মিত ছুটি পান না। অনেক ক্ষেত্রেই তারা কোনো উৎসব বা পারিবারিক অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারেন না। আবার অনেক ক্ষেত্রে ছুটি পরবর্তী কাজে যোগদানের নিশ্চয়তা থাকে না।

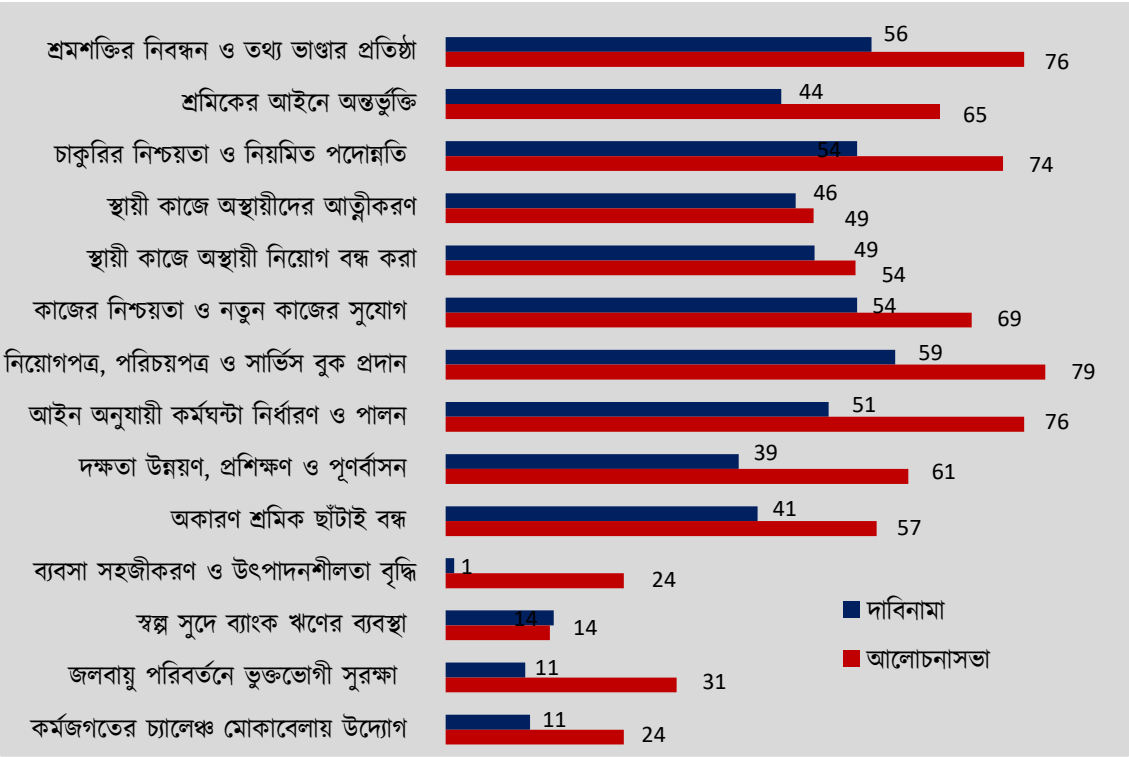
অকারণ ছাঁটাই একটি বড় সমস্যা, যা বিশেষত পরিচছন্নতাকর্মী, কেয়ার ওয়ার্কারস, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, আউটসোর্সিং, গৃহ শ্রমিক, দপ্তরি/প্রহরী, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট, বিক্রয় প্রতিনিধি এবং গার্মেন্টেসের ক্ষেত্রে বেশি ঘটে। অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের কর্মচারীদের কোনো কারণ ছাড়াই ছাঁটাই করে থাকে। রাত্রিকালীন নারী শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করালে অনুমতি ও বাড়ি ফেরার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের থাকা জরুরি। আবার নারীদের ক্ষেত্রে কর্মস্থলে নিরাপত্তাহীনতা ও রাত্রিকালীন কাজে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে। বিউটি পার্লার, গার্মেন্টস, দোকান কর্মচারী এবং

গৃহশ্রমিকদের ক্ষেত্রে রাতের কাজ একটি বড় সমস্যা। রাতের শিফটে কাজ করা অনেক নারীকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়, কারণ তাদের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান থেকে করা হয় না।

অধিকাংশ শ্রমিকের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি নেই। দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের অভাব বাংলাদেশের শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও উপার্জনের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে। গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মী, দোকান কর্মচারী, রাইড শেয়ারিং চালক, বিউটি পার্লারকর্মী, গৃহশ্রমিক, নির্মাণ, চামড়া, জাহাজভাঙা, বন্দর বা রেল শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তারা উন্নত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব বাংলাদেশে বেকারত্বের হার বাড়িয়ে তুলছে। কৃষি, পাটকল, নৌপরিবহন এবং চিংড়ি শিল্পের শ্রমিকরা ক্রমাগত কমসংখ্যক কাজের সুযোগ পাচ্ছেন, যা তাদের জীবিকার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং পেশকৃত দাবিনামার প্রেক্ষিতে সেক্টর ভিত্তিক শ্রমিক অধিকার ও শোভন কাজের ঘাটতির চিত্রের বিস্তারিত দেখুন চিত্র ৩.১-এ।

সর্বোপরি, বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকারের স্বীকৃতি, কাজের নিশ্চয়তা এবং সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন নিশ্চিত করা জরুরি। বিদ্যমান সমস্যাগুলির সমাধানে কার্যকর শ্রমনীতি, আইনি কাঠামোর উন্নয়ন এবং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে তদারকি বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাতে প্রতিটি শ্রমিক তার ন্যায্য অধিকার পেতে পারে এবং একটি সুরক্ষিত কর্মপরিবেশে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে দেশের শ্রম বাজারের কাঠামো সংস্কার, দক্ষ শ্রমিক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং একটি সুষ্ঠু, সমতাভিত্তিক কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়।

চিত্র: ৩.১ অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং পেশকৃত দাবিনামার প্রেক্ষিতে কাজ ও পেশার স্বীকৃতি এবং কাজের অধিকার, সুযোগ, স্থায়িত্ব ও দক্ষতা বিষয়ক শ্রম সংস্কার অধিক্ষেত্র (শতাংশ)



শ্রম খাতে সংস্কার রূপরেখা প্রণয়নে বিভিন্ন পেশাজীবী জনগোষ্ঠী, শ্রমিক, মালিক, পেশাজীবী সংগঠন, শ্রম ও মানবাধিকার সংগঠন এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সাথে কমিশনের সভা থেকে শ্রমিকদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের বিষয়ে মতামত এবং উল্লিখিত সংগঠনসমূহ থেকে প্রাপ্ত লিখিত দাবিনামাসমূহের প্রেক্ষিতে শ্রম সংস্কার অধিক্ষেত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় কাজ ও পেশার স্বীকৃতি ও অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে শ্রমশক্তির নিবন্ধন ও তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা; শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তি; চাকরির নিশ্চয়তা ও পদোন্নতি; স্থায়ী কাজে অস্থায়ীদের আত্মীকরণ; স্থায়ী কাজে অস্থায়ী নিয়োগ

বন্ধ করা; কাজের নিশ্চয়তা ও নতুন কাজের সুযোগ; নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র ও সার্ভিস বুক প্রদান; আইন অনুযায়ী কর্মঘণ্টা নির্ধারণ ও পালন; দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন; অকারণ শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ; ব্যবসা সহজীকরণ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি; স্বল্প সুদে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা; জলবায়ু পরিবর্তনে ভুক্তভোগীকে সুরক্ষা এবং কর্মজগতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উদ্যোগ সংক্রান্ত বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছে।

৩.১.১ শ্রম আইনের সর্বজনীন প্রযোজ্যতা ও শ্রমিকের স্বীকৃতি

শ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে শক্তিশালী শ্রম আইন অপরিহার্য। বর্তমান বাংলাদেশের ২০০৬ সালের শ্রম আইন দেশের প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য কিছু সীমিত সুরক্ষা দিলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, যেখানে অধিকাংশ শ্রমিক কাজ করেন, তারা এই আইনের আওতার বাইরে রয়ে গেছেন। ফলে ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সংগঠনের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষার মতো মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকেন। শ্রম আইনকে অবশ্যই দেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও ILO কনভেনশনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাখতে হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার, ন্যায্যতা ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মানব মর্যাদা রক্ষায় এই আইনের ভূমিকা থাকতে হবে।

শ্রম আইন সংস্কার হবে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করার পরিবর্তে তা আরও শক্তিশালী করার সুযোগ। শিল্প ও নিয়োগকারীদের স্থিতিশীলতা (sustainability) বজায় রাখার বিষয়টি অবশ্যই বিবেচনায় আসবে, তবে শ্রমিকদের অধিকার কখনোই এতে খর্ব হওয়া উচিত নয়। বরং শ্রম অধিকার রক্ষাই হওয়া উচিত টেকসই ব্যবসায়িক অনুশীলনের মূল ভিত্তি। ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং ব্যাপক সামাজিক সুরক্ষা শুধু আইনি দায়িত্ব নয়; বরং এটি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, উৎপাদনশীলতা এবং সামাজিক সংহতির পূর্বশর্ত। একটি সুষম শ্রম আইন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানব মর্যাদার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করবে, যাতে শিল্প উন্নয়নের নামে শ্রম অধিকার কখনো লঙ্ঘিত না হয়।

বাংলাদেশে শ্রম অধিকার সংক্রান্ত আইন মূলত ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন দ্বারা পরিচালিত হয়। এই আইন দেশের প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য এবং কর্মসংস্থান নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিক ও নিয়োগকারীর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ধারণ, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, মজুরি পরিশোধ এবং কর্মক্ষেত্রে আহত হলে ক্ষতিপূরণের বিধান প্রদান করে। তাছাড়া শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, কর্মস্থলে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সংক্রান্ত মানদণ্ডও এই আইনের আওতায় পড়ে। তবে এই আইন মূলত দেশের প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য প্রণীত হওয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করা বিপুল সংখ্যক শ্রমিক আইনি সুরক্ষার বাইরে থেকে যান। ফলে দেশের শ্রম আইনে একটি সর্বজনীন সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট।

বাংলাদেশের সকল শ্রমিক— যে কোনো শিল্প, খাত, কর্মসংস্থানের ধরন এবং তারা প্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে কাজ করুক—সর্বজনীনভাবে শ্রম আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সকলকে আইনের আওতাভুক্ত করা জরুরি। এই নীতির মাধ্যমে প্রত্যেক শ্রমিক তার মৌলিক শ্রম অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে। বাংলাদেশের শ্রম আইন কাঠামোয় এই পরিবর্তনের জন্য দুটি পথ বিবেচ্য হতে পারে: ১) বিদ্যমান শ্রম আইনে সংশোধন এনে এর আওতা সম্প্রসারণ, অথবা ২) একটি নতুন, সমন্বিত শ্রম আইন প্রণয়ন, যা প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সকল শ্রমিককে সমানভাবে সুরক্ষা দেবে। তবে প্রস্তাবিত সংস্কারের পরিধি বিবেচনায় নিলে কেবল সংশোধন যথেষ্ট নাও হতে পারে। ফলে নতুন আইন প্রণয়নই অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের উদাহরণ অনুযায়ী, নীতিনির্ধারকরা চাইলে ভারত, কম্বোডিয়া বা ভিয়েতনামের মতো শ্রম আইন বা কোড তৈরি করতে পারেন, যেখানে বিভিন্ন আইনের সংমিশ্রণে শ্রম সুরক্ষা ও বাস্তবায়ন সহজতর করা হয়েছে।

একটি নতুন আইনি কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, প্রত্যেক শ্রমিক—তারা যে খাতেই কাজ করুক না কেন—ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সংগঠিত হওয়ার অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষির সুযোগ পাবে। বিশেষ করে, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত ও পিছিয়ে থাকা শ্রমিকদের বিশেষ চাহিদা বিবেচনায় নিতে হবে, যাতে তারা বাস্তবিক অর্থে আইনি সুরক্ষা পান। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শ্রম কনভেনশন ও চুক্তির স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে শ্রম আইনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলার বাধ্যবাধকতায় রয়েছে। শ্রম আইনকে অবশ্যই এসব

অঙ্গীকারের প্রতিফলন ঘটাতে হবে, যাতে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, চাকরির নিশ্চয়তা এবং সংগঠনের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়।

শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর আইনি সুরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরি। এ জন্য "শ্রমিক" এবং "নিয়োগকারী" বা "employer" শব্দের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা ।

শ্রম আইনের সর্বাত্মক সংস্কারের ক্ষেত্রে "মালিক" শব্দের পরিবর্তে "নিয়োগকারী" এবং "শ্রমিক" শব্দের পরিবর্তে "কর্মী" (employee) শব্দ ব্যবহারের প্রস্তাব করা যেতে পারে। তবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে ভিন্ন ভিন্ন পদবি (designation) নির্ধারণের স্বাধীনতা থাকবে।

চাকরির ধরন ও খাতভেদে কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা ভিন্ন হতে পারে। তবে এসব পার্থক্য কোনোভাবেই শ্রমিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করতে পারবে না। নিয়োগকারীর সংজ্ঞার বাইরে যে কোনো ব্যক্তি, যিনি প্রতিষ্ঠানে মজুরির বিনিময়ে কর্মরত, তাঁকে শ্রম আইনের বাইরে রাখা যাবে না।

তবে সংগঠন করার অধিকারের ক্ষেত্রে, যে সমস্ত কর্মী "প্রশাসনিক" বা "ব্যবস্থাপনা" দায়িত্বে নিযুক্ত নন, কেবল তাঁরাই "শ্রমিক" হিসেবে বিশেষ সংজ্ঞায় সুনির্দিষ্ট হবেন এবং "শ্রমিক" হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union) গঠন ও তাতে যোগদানের অধিকার লাভ করবেন। অন্যদিকে যাঁরা "প্রশাসনিক" বা "ব্যবস্থাপনাগত" দায়িত্বে নিয়োজিত কিন্তু নিয়োগকারী নন, তাঁরা "কর্মকর্তা" (officer) হিসেবে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য পৃথক "সমিতি" গঠনের অধিকার ভোগ করবেন।

সমস্ত শ্রমিককে আইনের মাধ্যমে যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তাদের মৌলিক অধিকার, ন্যায্য কর্মপরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষার সুযোগ নিশ্চিত থাকে। শ্রম আইন সংস্কার হোক তা বিদ্যমান BLA-এর সংশোধন, নতুন আইন প্রণয়ন অথবা পৃথক খাতভিত্তিক আইনের মাধ্যমে—মূল লক্ষ্য হতে হবে সকল শ্রমিকের সমান অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা। কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শ্রমিকের জন্য ইতোমধ্যে প্রচলিত সুবিধা ও অধিকার আইন সংস্কারের ফলে হ্রাস করা যাবে না। আইনের সংশোধন বা নতুন আইন প্রণয়নের পরেও এসব সুবিধা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।

প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি গৃহীত হলে একটি কার্যকর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে ক্রান্তিকালীন বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। কিছু সংস্কার দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব নাও হতে পারে এবং সেগুলির কার্যকারিতা একটি নির্ধারিত পরবর্তী তারিখে কার্যকর হতে হতে পারে। এই ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে ক্রান্তিকালীন বিধানগুলির মাধ্যমে নিয়োগকর্তাদের নতুন নিয়মাবলির সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় প্রদান করা উচিত, যাতে এই সংস্কারগুলি তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে এবং নিয়োগকর্তা ও কর্মচারী উভয়ের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে-

৩.১.২ শ্রম আইনের সর্বজনীন প্রযোজ্যতা ও শ্রমিকের স্বীকৃতি

ক। শ্রম আইনকে সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এবং শ্রমিকদের স্বীকৃতি ও সুরক্ষা আরও সুসংহত করা।

খ। বাংলাদেশের সকল শ্রমিক—যে কোনো শিল্প, খাত, বিশেষায়িত শ্রম অঞ্চল, কাজের ধরন নির্বিশেষে, প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত—সমানভাবে শ্রম আইনের সুরক্ষার আওতায় আসবে। এই লক্ষ্য অর্জনে বিদ্যমান শ্রম আইনের ব্যাপক সংস্কার অথবা নতুন ও সমন্বিত এক বা একাধিক শ্রম আইন প্রণয়ন করা।

গ। শ্রম আইনের সর্বাত্মক সংস্কারের ক্ষেত্রে "মালিক" শব্দের পরিবর্তে "নিয়োগকারী" শব্দ ব্যবহার করা। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তার প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পদবি নির্ধারণের স্বাধীনতা থাকবে। তবে পদবির পার্থক্যের কারণে কেউ শ্রমিকের সুরক্ষার বাইরে থাকবে না।

ঘ। "শ্রমিক" শব্দের সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত করা এবং "নিয়োগকারী" শব্দের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করা। "নিয়োগকারী" বলতে শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হবে, যিনি কর্মী নিয়োগ, চাকরিচ্যুতি এবং চাকরির শর্তাবলি নির্ধারণে চূড়ান্ত ক্ষমতা রাখেন। এই সংজ্ঞার বাইরে থাকা সকল প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা সকল ব্যক্তি কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন। নিয়োগকারী ব্যতীত সকলের ক্ষেত্রেই শ্রম আইন প্রযোজ্য হবে এবং শ্রম আইনের অধীনে প্রযোজ্য

আইনগত অধিকার ও সুরক্ষার আওতায় আসবেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ব নিয়োজিত ব্যক্তিরাও "শ্রমিক" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

ঙ। শ্রম আইনের সর্বজনীন প্রযোজ্যতা ও শ্রমিকের স্বীকৃতি বিশেষ অঞ্চল ভিত্তিক (ইপিজেড, এসইজেড) শ্রমিকদের জন্য নিশ্চিত করা। একটি সুসংহত ও একক শ্রম আইন কাঠামো তৈরি করা, যার মাধ্যমে বিশেষ অঞ্চল ভিত্তিক ও বিশেষ অঞ্চল-বহির্ভূত শ্রমিকদের জন্য সমান শ্রম অধিকার নিশ্চিত হয়। বিশেষ অঞ্চল ভিত্তিক শ্রমিকদের সাধারণ শ্রম আইনের আওতায় আনা যাতে তারা দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য সম অধিকার ও সুরক্ষা পায়। তবে প্রয়োজনে ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য পৃথক আইন রাখা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, ইপিজেড শ্রমিকদের শ্রম অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দেশের সাধারণ শ্রম আইনের সাথে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। বিশেষ করে, সংগঠিত হওয়ার অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকার এবং আদালত ও আইনি সহায়তার সুযোগ ইপিজেড শ্রমিকদের জন্যও দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের মতোই নিশ্চিত করা। শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার, যৌথ দরকষাকষির অধিকার এবং শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা বিইপিজেডএ (BEPZA)-এর আওতার বাইরে এনে স্বতন্ত্রভাবে শ্রম অধিদপ্তর (DoL) ও শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের (DIFE) মাধ্যমে পরিচালিত করা।

ছ। সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন বিধান রাখা যেন 'শ্রমিক'-এর সংজ্ঞা সম্প্রসারণের কারণে নতুনভাবে আওতাভুক্ত ব্যক্তিগণের আর্থিক প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে পর্যায়ক্রমিক বিধান করা যায়।

৩.১.৩ শ্রমিকের চাকরির আইনগত সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (ইপিজেড) শ্রম আইন ২০১৯ সব ধরনের কারখানা ও খাতে শ্রমিকদের কাজের শর্ত ও পরিবেশের জন্য ন্যূনতম মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে। এই আইনগুলি শ্রমিকদের যেন অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা না হয় এবং কর্মস্থলে ন্যায্য আচরণ নিশ্চিত হয়—তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এ উল্লেখ আছে, কীভাবে আইনের মাধ্যমে চাকরি শেষ করা যেতে পারে। যেমন; শ্রমিক মারা গেলে, কাজ কমে গেলে ছাঁটাই (retrenchment), গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হলে বরখাস্ত, শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার কারণে অব্যাহতি (discharge), মালিকের ইচ্ছায় কারণ ছাড়াই চাকরি শেষ (termination), শ্রমিকের ইচ্ছায় পদত্যাগ (resignation), ৬০ বছর বয়সে অবসর (retirement) অথবা সাময়িক সমস্যার কারণে মালিকের পক্ষ থেকে সাময়িক অব্যাহতি (lay-off)।

তবে এতো সব বিস্তারিত বিধান থাকা সত্ত্বেও শ্রম আইনের অনেক জায়গায় এখনো শ্রমিকদের জন্য ন্যায্যতা ও যথাযথ সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয় না, ফলে শ্রমিকরা বিরূপ পরিস্থিতির শিকার হন। উদাহরণস্বরূপ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিককে নিয়োগপত্র দেওয়ার কথা বলা হলেও বাস্তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা দেওয়া হয় না। ফলে অনেক শ্রমিক কোনো লিখিত প্রমাণ ছাড়া কাজ করেন, যা তাদের নিয়োগকারীর ইচ্ছা মতো চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়।

শ্রম আইনের কিছু ধারা শ্রমিকদের জন্য অন্যায় ও কঠোর। যেমন, ধারা ১৩ অনুযায়ী, যদি কোনো অবৈধ ধর্মঘটে কেউ অংশ না নেয়, তারপরও তাদের মজুরি বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। অর্থাৎ যারা ধর্মঘটে জড়িত না, তারাও মজুরি পায় না। বিশেষ করে যখন ছাঁটাইয়ের কারণ শ্রমিকদের হাতে থাকে না। এছাড়া অসুস্থতার ছুটি (sick leave) নেওয়ার সময় ডাক্তারি সনদ আনার শর্ত অনেক সময় বাস্তবে পূরণ করা কষ্টকর হয়, বিশেষ করে যারা দরিদ্র বা দূরবর্তী অঞ্চলে থাকে এবং যেখানে চিকিৎসা পাওয়া কঠিন। ফলে এই ধরনের শর্ত অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের পীড়া ছুটি ভোগের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

শ্রম আইনের আরও কিছু ধারা শ্রমিকদের জন্য এমন কঠিন শর্ত আরোপ করেছে, যা তাদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ও সুবিধা পাওয়ার পথ রোধ করে। ধারা ১৬ ও ২০ অনুযায়ী, শ্রমিকরা যেন লেঅফের (lay-off) ক্ষতিপূরণ ও চাকরি হতে ছাঁটাইয়ের (retrenchment) কারণে আর্থিক সুবিধা পান, তার জন্য একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কাজ করা বাধ্যতামূলক। এর ফলে যারা অস্থায়ী বা স্বল্পমেয়াদি চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেন, তারা চাকরি হারালে কোনো ধরনের আর্থিক সহায়তা পান না।

ধারা ১৯ অনুযায়ী, কোনো শ্রমিক মারা গেলে তার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ পেতে হলে কমপক্ষে দুই বছর চাকরি করতে হবে। এই শর্তটি খুবই অমানবিক। কারণ দুই বছরের কম সময় কাজ করা শ্রমিক মারা গেলে তার পরিবার কোনো আর্থিক সহায়তা পায় না। অথচ তখনই পরিবারটির ক্ষতিপূরণ পাওয়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি।

এক্ষেত্রে আরও উল্লেখ্য যে, ধারা ২৩ (৩) অনুযায়ী, যদি কোনো শ্রমিককে অসদাচরণের (misconduct) অভিযোগে চাকরিচ্যুত করা হয়, তবে তাকে কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না। এতে শ্রমিকের পূর্বের কাজের অবদান বা দীর্ঘদিনের চাকরির বা সেবার কোনো মূল্যায়ন করা হয় না। এমনকি অনেক সময়, যে অভিযোগে চাকরি শেষ বা বরখাস্ত করা হয়, তা হয়তো ছোটখাটো বা প্রমাণিতও নয়।

কাজের নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে যেসব প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো ধারা ২৬, যেখানে নিয়োগকারীকে কারণ প্রদর্শন ছাড়াই যে কোনো শ্রমিককে চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের জন্য আইনে খুব সীমিত প্রতিকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ফলে যখন শ্রমিক অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত হন, তখন তাদের জন্য ন্যায্যতা পাওয়ার সুযোগ থাকে না। এই ধরনের কর্তৃত্ব শ্রমিকদের বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য ও নেতাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়। কারণ কোনো কোনো নিয়োগকারী এই ধারার অপব্যবহার করে ইউনিয়নের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে এবং সংগঠিত হওয়ার অধিকারকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। এতে করে সংগঠনের স্বাধীনতা ও যৌথ দরকষাকষির (collective bargaining) অধিকার মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হয়।

এই আইনি ঘাটতির বাইরে আরেকটি বড় সমস্যা হলো, যেসব অধিকার ও সুরক্ষা আইন দ্বারা দেওয়া আছে, সেগুলি কার্যকর না হওয়া। শ্রমিকরা যখন তাদের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেন, তখন নানা ধরনের বাধার মুখোমুখি হন। নিয়োগকারীরা অনেক সময় কোনো আইনই মানেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কার্যকর প্রক্রিয়া থাকে না।

যদিও ধারা ৩৩-এ অভিযোগ দায়ের ও প্রতিকার পাওয়ার নিয়ম আছে, তবুও সেই প্রক্রিয়া অনেক সময় অকার্যকর ও দীর্ঘসূত্রতাপূর্ণ। শ্রমিকদের বছরের পর বছর মামলা চালাতে হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ন্যায়বিচার পান না। এই ধীরগতির ও জটিল ব্যবস্থার কারণে শ্রমিকরা অভিযোগ করতেও ভয় পান, আর নিয়োগকারীদের জন্য আইন না মানার সংস্কৃতি চালু থাকে।

এই প্রতিবেদনের বিভিন্ন অংশে আলোচনার ভিত্তিতে এটা স্পষ্ট যে, সব ধরনের শ্রমিকের জন্য — তারা যে সেক্টরেই কাজ করুন না কেন — একটি কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Grievance Redressal System) খুবই জরুরি। এই ব্যবস্থা যেন সহজ, স্বচ্ছ এবং দ্রুত কার্যকর হয়, যাতে শ্রমিকরা তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হলে সহজেই বিচার ও প্রতিকার পেতে পারেন। শ্রমিকদের জন্য এমন বিচারিক প্রতিকার (judicial remedy) পাওয়ার সুযোগ থাকতে হবে, যাতে তারা কোনো ধরনের প্রশাসনিক বা আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মুখে না পড়েন।

যদি এমন একটি শক্তিশালী ও কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা তৈরি না হয়, তবে শ্রম আইন যে অধিকার ও সুরক্ষার কথা বলে, তা শুধু কাগজে-কলমেই থাকবে এবং বাস্তব সমস্যার সমাধান হবে না। তাই যদিও বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনি কাঠামো তৈরি করেছে, তবুও আইনের ভেতরের বিভিন্ন ফাঁকফোকর, দুর্বল প্রয়োগ (enforcement) ও সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক শ্রমিক এখনও প্রকৃত সুরক্ষা পান না। এসব সমস্যার সমাধান এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করা প্রয়োজন, যাতে বাংলাদেশের শ্রমিকরা আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড অনুযায়ী ন্যায্যতা, সম্মান ও মর্যাদা পেতে পারেন। এটি বিশেষভাবে নিশ্চিত করতে হবে যে, যে কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় শ্রমিকদেরকে তাদের আইনগত অধিকার বা পাওনাসমূহ থেকে বঞ্চিত করা না হয় বা যৌথ দরকষাকষি চুক্তি বা যে কোনো নিষ্পত্তিনামায় বর্ণিত সুযোগ সুবিধা থেকে কম সুযোগ সুবিধা প্রদান করা না হয়।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে যে সকল শ্রমিকের চাকরির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। আইন শ্রমিকদের ন্যায্যতা, বিচার এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদানের নিশ্চয়তা দেবে। বিদ্যমান বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ বিশ্লেষণ করে বেশ কিছু অসংগতি চিহ্নিত করা হয়েছে, যা এখানে উল্লেখ করা হলো। তবে এই বিশ্লেষণ চূড়ান্ত নয়, বাস্তবায়নের সময় প্রতিবেদনের অন্যান্য অংশে প্রদত্ত সুপারিশগুলিকেও বিবেচনায় নিতে হবে।

ক। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সব ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র অথবা কাজে নিয়োজিত করার প্রমাণপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করা হবে। যদি লে-অফ ১৫ দিনের বেশি হয় তাহলে লে-অফ চলাকালে শ্রমিকদের

প্রতিদিন কর্মস্থলে হাজির হওয়ার বাধ্যবাধকতার শর্ত বাতিল করা। লে-অফ চলাকালে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

খ। প্রতিষ্ঠান বন্ধের বিধান সংশোধন করে নিশ্চিত করা যে, অবৈধ ধর্মঘটে জড়িত না থাকা শ্রমিকরা মজুরি বা লে-অফ ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হবে না। শ্রমিকরা যদি মজুরি না পেয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়, তবে সেটাকে অবৈধ ধর্মঘট হিসেবে গণ্য না করা। আইনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যে, নির্দিষ্ট সময়ে মজুরি না পাওয়ার কারণে কাজ বন্ধ রাখা কোনোভাবেই আইনবহির্ভূত নয় এবং অনুরূপ কারণে তাদের কোনো সুবিধা কাটছাঁট না করা।

গ। অসুস্থতার ছুটি গ্রহণের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় জটিলতা দূর করা এবং অসুস্থতা ছুটি ০২ দিনের বেশি না হলে চিকিৎসা সনদ দাখিলের প্রয়োজন হবে না মর্মে শ্রম আইনে বিধান যুক্ত করা।

ঘ। অসদাচরণ সংক্রান্ত তদন্তের বিদ্যমান ব্যবস্থা কার্যকর হচ্ছে না বিধায় এ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক ও নিয়োগকারী উভয়ই যেন প্রয়োজনে তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের অবস্থান সুস্পষ্ট করতে পারে সে জন্য শ্রম আইনের পর্যালোচনা করে একটি কার্যকর ব্যবস্থার বিধান রাখা।

ঙ। অসুস্থতা বা স্বাস্থ্যগত কারণে ডিসচার্জের ক্ষেত্রে চাকরি অবসানের ন্যায় (termination) শ্রমিকদের চার মাসের মজুরি প্রদান করা এবং প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী বন্ধের কারণে চাকরির অবসানের ক্ষেত্রে চার মাসের নোটিশ/নোটিস পে প্রদান করা।

চ। যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির (সিবিএ ইউনিয়ন) কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে শ্রম আইনের ২৬ ধারায় টার্মিনেট করা যাবে না মর্মে আইন সংশোধন করা।

৩.১.৪ জাতীয় শ্রমশক্তি নিবন্ধন সিস্টেম ও জাতীয় শ্রম তথ্যভাণ্ডার

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি ৪/৫ বছরের ব্যবধানে জাতীয় শ্রম শক্তি জরিপ পরিচালনা করে থাকে। এই জরিপের ফলাফলগুলি মূলত গবেষণা ও পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই জরিপের ফলাফল থেকে অর্থনীতির কাঠামোগত ও প্রবৃদ্ধির গতিপ্রকৃতির সাথে মিল রেখে কর্ম সংস্থান পূর্বাভাসে সক্ষমতা অর্জন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন সম্ভব নয়।

শ্রমবাজারে নিয়োজিত কর্মী, বেকার,[10] শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশাকারীর হালনাগাদ তথ্যের জন্য ট্রানজেকশনাল সিস্টেম প্রয়োজন, যা বর্তমানে অনুপস্থিত। এর ফলে শোভন কাজের মানদণ্ড অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করা যাচ্ছে না; কর্মীর দক্ষতা ও তার স্তর নির্ণয় করে বাজার চাহিদ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাচ্ছে না; বেকার জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ও বেকার ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না; শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ ও তাঁদের জন্য কর্মসংস্থান পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাচ্ছে না; পেনশন ও বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তিতে যোগ্য নাগরিক চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না; বিশেষ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যাচ্ছে না।

বর্তমানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপ শ্রম বাজারের তথ্য ঘাটতি কিছুটা দূর করলেও তথ্য ঘাটতি এখনও বিদ্যমান। তথ্য ঘাটতির কিছু দিক হচ্ছে:

ক) মজুরি সংক্রান্ত তথ্য ও সূচকের ঘাটতি: ন্যায্য পারিশ্রমিক, লিঙ্গ সমতা এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রচার ও মূল্যায়নের জন্য সঠিক মজুরি তথ্য ও শক্তিশালী সূচক অপরিহার্য। নীতিনির্ধারক এবং গবেষকবৃন্দ এই তথ্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করেন যাতে মজুরির বৈষম্য চিহ্নিত করা, হস্তক্ষেপমূলক পদক্ষেপের প্রভাব পরিমাপ করা এবং আন্তর্জাতিক মান, যেমন; আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার শোভন কর্ম এজেন্ডা (Decent Work Agenda)-এর সাথে জাতীয় কৌশল সংগতিপূর্ণ করা সম্ভব হয়। তথ্য সংগ্রহে কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো উল্লেখযোগ্য ঘাটতি এবং

[10] আইএলও দ্বারা সংজ্ঞায়িত একজন বেকার ব্যক্তি হলেন ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সের একজন ব্যক্তি যিনি একই সাথে তিনটি শর্ত পূরণ করেনঃ একটি নির্দিষ্ট সপ্তাহের জন্য বেকার হওয়া; দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি চাকরি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা ; গত চার সপ্তাহে সক্রিয়ভাবে একটি চাকরি খুঁজেছেন বা তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে একটি শুরু খুঁজে পেয়েছেন। সুত্রঃ INSEE Definition - Unemployed person (according to the International Labour Organization (ILO) definition) | Insee https://www.insee.fr/en/metadonnees/definition/c1129

অসংগতি রয়ে গেছে, যা প্রমাণভিত্তিক নীতি প্রণয়নের সম্ভাবনা ও মজুরি গতিশীলতা (wage dynamics) সম্পর্কে সামগ্রিক বিশ্লেষণে বাধা সৃষ্টি করে।

খ। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের তথ্য ঘাটতি: দেশের মোট কর্মসংস্থানের প্রায় ৮৪.৯ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, কিন্তু মজুরি-সংক্রান্ত বিদ্যমান জরিপগুলিতে এই খাতের শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি অপর্যাপ্ত।[11] বাংলাদেশ শ্রম জরিপ (Labour Force Survey (LFS)) এবং ত্রৈমাসিক মজুরি সমীক্ষা Quarterly Wage Rate Survey (QWRS)-এ মজুরি স্তর সম্পর্কে কিছু তথ্য প্রদান করলেও এগুলির আওতা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য যথেষ্ট নয়। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে চাকরির অনিশ্চয়তা, অনিয়মিত পারিশ্রমিক এবং মজুরির অস্থিরতা সাধারণ সমস্যা হলেও বিশদ তথ্যের অভাবে এই বিষয়গুলি এখনও অপর্যাপ্তভাবে অন্বেষিত।[12]

গ। লিঙ্গ, পেশা ও অঞ্চলের ভিত্তিতে মজুরি তথ্যের স্বল্পতা: লিঙ্গভিত্তিক মজুরি বৈষম্য সম্পর্কে কিছু তথ্য থাকলেও এগুলি সাধারণত জাতীয় বা উপ-জাতীয় স্তরে সংকলিত হয়। ফলে নির্দিষ্ট খাত যেমন; তৈরি পোশাক (RMG), চামড়া শিল্প, কৃষি, গৃহকর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে মজুরির বৈষম্য বোঝার সুযোগ কম। একইভাবে গ্রাম ও নগর-প্রান্তিক অঞ্চলের মজুরি সম্পর্কে বিশদ তথ্যের অভাবে স্থানভিত্তিক বৈষম্য কমানোর জন্য উপযুক্ত নীতি প্রণয়ন কঠিন হয়ে পড়ে।[13]

ঘ। দীর্ঘমেয়াদি তথ্যের অভাব: বেশিরভাগ মজুরি সংক্রান্ত জরিপ এককালীন বা নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিচালিত হয়, যেমন; নমুনা মজুরি জরিপ (Pilot Wage Survey) বা QWRS। ফলে নীতি প্রণয়নের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মূল্যায়ন বা অর্থনৈতিক আঘাতের (economic shocks) ফলে মজুরির পরিবর্তন বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।[14] বিভিন্ন জরিপে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও সরঞ্জামে পার্থক্য থাকায় অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য খণ্ডিত ও তুলনাহীন হয়ে পড়ে।

ঙ। মজুরি বহির্ভূত সুবিধা উপেক্ষা: বিদ্যমান জরিপগুলি সাধারণত কেবল আর্থিক মজুরির ওপর আলোকপাত করে, মজুরি বহির্ভূত সুবিধা যেমন; বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবহন ও বোনাসকে অন্তর্ভুক্ত করে না। অথচ এই সুবিধাগুলি প্রকৃত পারিশ্রমিক ও শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অ-মজুরি সুবিধার অন্তর্ভুক্তি না থাকায়, কর্মী পারিশ্রমিকের প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হয় না।[15]

চ। নীতি প্রয়োজনের সাথে তথ্য সংগ্রহের অসঙ্গতি: যদিও ন্যূনতম মজুরি আইন ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম, বিভিন্ন খাত বা অঞ্চলে এই ন্যূনতম মজুরি মানা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই। নীতিগত সিদ্ধান্ত ও বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মধ্যে অসংগতি থাকায় মজুরি সংক্রান্ত উদ্যোগগুলির কার্যকারিতা কমে যায় এবং সমতা ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির (economic inclusion) লক্ষ্যে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়ে।

এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সকল শ্রমিককে স্বীকৃতি প্রদান, তাদের পেশা, দক্ষতা ও কাজের পরিচিতি নিশ্চিতকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের কর্মী/শ্রমিক, শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারী ও বেকার সকলের নিবন্ধনপূর্বক একটি জাতীয় শ্রম নিবন্ধন সিস্টেম ও তথ্যভাণ্ডার চালু করা প্রয়োজন। এই নিবন্ধন ও ডাটাবেজ শুধুমাত্র শ্রম বাজার বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস, কর্ম সংস্থান গবেষণা এবং নতুন কর্মসংস্থান পরিকল্পনার জন্য ই নয়, অন্যান্য যে সকল ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারে সেগুলি হচ্ছে শোভন কাজের মানদণ্ড বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ, দক্ষতা চাহিদা নিরূপণ এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, বেকার জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা কর্মসূচি প্রণয়ন, পেনশনভোগী চিহ্নিতকরণ ও প্রবীণ শ্রমিকদের সুবিধা নিশ্চিতকর এবং প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমিকদের সহায়তা।

---

[11] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩)। বাংলাদেশ শ্রম শক্তি জরিপ ২০২২

[12] ILO (2010) Monitoring and assessing progress on decent work in Bangladesh: national background study / Abdul Hye Mondal; ILO Office in Bangladesh (ILO-Dhaka); ILO/EC Project "Monitoring and Assessing Progress on Decent Work" (MAP). - Dhaka: ILO, 2010

[13] Mamun (2024), "An Analysis of Wage Determinants and Gender Wage Inequality in the Daily Labor Market of Bangladesh: A Quantile Regression Approach"

[14] Dormann & Guthier, (2018), Reciprocal effects between job stressors and burnout: A continuous time meta-analysis of longitudinal studies

[15] Baird K (2017). The Effectiveness of Strategic Performance Measurement Systems. International Journal of Productivity and Performance Management, January 2017 66(1):3-21.

জাতীয় শ্রম নিবন্ধন সিস্টেম ও তথ্যভাণ্ডার চালু করার জন্য আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে। বিশেষ করে ভারতের e-SHRAM পোর্টাল, যেটি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের নিবন্ধন করে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান করছে। এছাড়াও পাকিস্তানের Workers' Welfare Fund (WWF) ও Employees' Old-Age Benefits Institution (EOBI)-এর আলোকে শ্রমিক কল্যাণ সুবিধার পাশাপাশি পেনশন ব্যবস্থা ও কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা সংযোজনের মাধ্যমে তথ্যভাণ্ডারটি কার্যকর করা যেতে পারে।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক। শ্রমের স্বীকৃতি

বাংলাদেশের সকল শ্রমিকের স্বীকৃতি এবং তাদের পেশা, দক্ষতা, কাজের পরিচিতি ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকল্পে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের কর্মী/শ্রমিক, শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারী ও বেকার সকলের নিবন্ধনপূর্বক একটি জাতীয় ডিজিটাল শ্রম নিবন্ধন সিস্টেম ও তথ্যভাণ্ডার চালু করা। এই জাতীয় ডিজিটাল নিবন্ধন সিস্টেম ও তথ্যভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ:

- সকল শ্রমিকের স্বীকৃতি, পরিচয় ও নিবন্ধন নিশ্চিত করা।
- সামাজিক নিরাপত্তা।
- শ্রম বাজার বিশ্লেষণ, কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরূপণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- দক্ষতা চাহিদা নিরূপণ এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন। কর্মীর দক্ষতা ও তার স্তর নির্ণয় করে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- বেকার জনগোষ্ঠী চিহ্নিতকরণ ও সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা কর্মসূচি প্রণয়ন। বেকার জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা ও বেকার ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ।
- নতুন কর্মসংস্থান পরিকল্পনা করা। শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশকারীবৃন্দের চিহ্নিতকরণ ও তাঁদের জন্য কর্মসংস্থান পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- পেনশনভোগী চিহ্নিতকরণ ও প্রবীণ শ্রমিকদের সুবিধা নিশ্চিতকরণ। পেনশন ও বয়স্কভাতা প্রাপ্তিযোগ্য নাগরিকদের চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ও সেবা নিশ্চিতকরণ।
- প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমিকদের সহায়তা প্রদান। বিশেষ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে তাঁদের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- দুর্ঘটনা কবলিত শ্রমিক শনাক্তকরণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন।
- কর্মসংস্থান গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা। কর্মসংস্থান হালনাগাদ তথ্য ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বার্ষিক হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করা, যার ভিত্তিতে শ্রমবাজারের চলতি প্রবণতা বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরি হবে।

খ। তথ্যভাণ্ডারের সর্বজনীনতা

নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্যভাণ্ডার এমনভাবে নির্মাণ করা উচিৎ যেন এর সর্বজনীনতা নিশ্চিত হয়। তথ্যভাণ্ডারে আলাদা করা। এর মাধ্যমে যাঁদের চিহ্নিত করা যাবে: ক) প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক (নিবন্ধিত কর্মী, বেতনভুক্ত পেশাজীবী); খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক (দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক, গৃহকর্মী, গিগ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক); গ) অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং স্বনির্ভর শ্রমিক; ঘ) প্রবাসী শ্রমিক এবং ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিয়োজিত শ্রমিক; ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের কর্মী/শ্রমিক; চ) শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারী নাগরিক; এবং ছ) বেকার।

গ। অন্যান্য তথ্যভাণ্ডারের সাথে সংযুক্তিকরণ (Interoperability)

জাতীয় শ্রম তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে জাতীয় পরিচয়পত্র তথ্যভাণ্ডার, জাতীয় দক্ষতা তথ্যভাণ্ডার সহ অন্যান্য পরিপূরক তথ্যভাণ্ডারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন (interoperability) করা, যেন যে কোনো কর্মী/নাগরিক দেশের যে কোনো স্থান থেকে প্রয়োজনীয় সেবা পেতে পারেন। উল্লেখযোগ্য তথ্যভাণ্ডারসমূহ-

- জাতীয় দক্ষতা তথ্যভাণ্ডার: শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগের সাথে সংযুক্ত করার জন্য।
- সামাজিক নিরাপত্তা ও পেনশন ব্যবস্থা: উপযুক্ত শ্রমিকদের জন্য প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য (যদি থাকে)।
- জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) ব্যবস্থা: পরিচয় যাচাই ও সরকারি সেবাগুলি সহজলভ্য করার জন্য।
- প্রবাসী তথ্যভাণ্ডার: প্রবাসী কর্মীর সেবা ও পুনঃএকত্রীকরণ সেবা প্রদানের জন্য।

ঘ। ডিজিটাল ও বিকেন্দ্রীভূত প্রবেশাধিকার

- জাতীয় ডিজিটাল শ্রম নিবন্ধন, শ্রম ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ও জাতীয় শ্রম তথ্যভাণ্ডার এমনভাবে স্থাপন করা, যাতে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের কর্মী/শ্রমিক, শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারী ও বেকার সকলের ডিজিটাল ও বিকেন্দ্রীভূত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হয়। এ লক্ষ্যে নিম্নেলিখিত ব্যবস্থার বিধান থাকবে-
- একাধিক মাধ্যমে (অনলাইন পোর্টাল, মোবাইল অ্যাপ, শ্রম অফিস) নিবন্ধনের ব্যবস্থা।
- নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে শ্রমিকের তথ্য হালনাগাদ করার বাধ্যবাধকতা।
- শ্রমিকের তাঁর কর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তার তথ্য সহজে দেখতে ও ব্যবস্থাপনা করার সুযোগ।

ঙ। তথ্য নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা

তথ্যভাণ্ডারটি আন্তর্জাতিক তথ্য সুরক্ষা মান অনুযায়ী পরিচালিত করা। শ্রমিকের ব্যক্তিগত তথ্য অপব্যবহার থেকে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা।

চ। নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক নিবন্ধন

- ২০২৬ অর্থবছর সময়সীমার মধ্যে নিবন্ধন কাজ শুরু ও ডিজিটাল শ্রম ব্যবস্থাপনা চালু করা।
- নিয়োগকর্তা কর্তৃক তথ্য রেজিস্টারে তথ্যভাণ্ডারে শ্রমিকদের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকবৃন্দের জন্য মোবাইল নিবন্ধন কেন্দ্র চালু করে স্বনিবন্ধন উৎসাহিত করা।
- শ্রম পরিদর্শকবৃন্দ কর্তৃক নিবন্ধন সংক্রান্ত বিধিবিধান পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ছ। নীতিগত পরিকল্পনা ও সুবিধা বিতরণে তথ্যভাণ্ডারের ব্যবহার

- ডিজিটাল শ্রম ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, নিবন্ধন ও তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা, নিয়োগ সহ শ্রমশক্তি ব্যবস্থাপনায় এই পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা চালু করা।
- ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ, বেকার ভাতা এবং পেনশন স্কিম বাস্তবায়নের জন্য তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ইউনিয়ন গঠন ও শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রাপ্য নিশ্চিত করার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারি কর্তৃপক্ষ বা অন্যান্য বিধিবদ্ধ সংগঠন তথ্যভাণ্ডার থেকে তথ্য পাবার সুযোগ রাখা।
- নিয়োগকর্তাবৃন্দ কর্তৃক তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করে কর্মশক্তির পরিকল্পনা ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে উদ্বুদ্ধ করা।

জ। শ্রমশক্তি নিবন্ধন ও তথ্যভাণ্ডার বাস্তবায়ন কৌশল

- বাংলাদেশে জাতীয় শ্রম নিবন্ধন ব্যবস্থা ও তথ্যভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করতে প্রাথমিকভাবে পাইলট প্রকল্প চালু করে একটি ছোটো পরিসরে তথ্যভাণ্ডারের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।
- সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের (সরকার, ট্রেড ইউনিয়ন, নিয়োগকর্তা, উন্নয়ন সংস্থা) সম্পৃক্ত করা, যাতে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়।
- পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা, যাতে বিভিন্ন খাত ও অঞ্চলের শ্রমিকদের পর্যায়ক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

ঝ। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) সংশ্লিষ্ট বিশেষ পরিস্থিতি ও সমাধান

অনেক শ্রমিকের সরকারিভাবে প্রদত্ত জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নেই। এছাড়া নানা বাধার কারণে কিছু শ্রমিক চাকরি পাওয়ার জন্য ভুয়া NID জমা দিতে বাধ্য হন। যদিও এটি আইনসিদ্ধ নয়, তবুও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যা সঠিকভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। এ ধরনের শ্রমিক সবসময় চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে থাকেন এবং আইনি ব্যবস্থার মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। কমিশনকে আরও জানানো হয়েছে যে বৈধ NID না থাকার কারণে অনেক মৃত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ প্রদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। যদি শ্রমিকদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার (ডাটাবেস) তৈরি করা হয় যেখানে NID বাধ্যতামূলক করা হয়, তাহলে এ সমস্যা আরও বাড়তে পারে। এই প্রেক্ষিতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (MoLE) শ্রমিকবৃন্দকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাদের NID সংশোধনের সুযোগ দিতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার (GoB) শ্রমিকের ক্ষেত্রে NID না থাকলে জন্ম সনদের ভিত্তিতে চাকরির সুযোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

ঞ। জাতীয় শ্রম সংক্রান্ত জরিপ

জাতীয় পর্যায়ে জরিপে যে সব ঘাটতি চিহ্নিত হয়েছে এবং আঞ্চলিক, খাত ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর জরিপের অভাব চিহ্নিত হয়েছে, তা দূর করতে আইএলও-এর সর্বশেষ শ্রম পরিসংখ্যানবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন (আইসিএলএস) ২০২৩ অনুসরণ করে পরবর্তী জরিপসমূহ পরিচালনা করা। কেননা এতে গৃহীত মানদণ্ডে অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতি অন্তর্ভুক্ত করাকে জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া কাজ ও কর্মসংস্থান, কর্মসংস্থান ও আয়, পরিবারের আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান সম্পর্কিত মানদণ্ড উন্নত করা হয়েছে।

৩.১.৫ আউটসোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালায় স্থায়ী জনবল কাঠামোর কোনো পদে আউটসোর্সিং বা ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে বাস্তবে এই বিধান কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষত এই ব্যবস্থার কারণে সমাজের একটি অংশের সরকারি চাকরিতে প্রবেশ এবং সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার সীমিত হয়ে পড়েছে এবং একই কর্মস্থলে একই ধরনের কাজে স্থায়ী ও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগকৃত শ্রমিকের মজুরি, ওভারটাইম পেমেন্ট, বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং অন্যান্য শ্রম-সুরক্ষা বিষয়ে বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। এছাড়া আউটসোর্সিং সংস্থাগুলির অনেক ক্ষেত্রে শ্রম আইন অনুসারে দায়িত্ব পালন করার প্রবণতা লক্ষ করা যায় না। তারা সাধারণত শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষায় যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে না। ফলে শ্রমিকের অধিকার সুরক্ষার ঘাটতিসহ চাকরির নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। এ প্রেক্ষিতে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) সরকারি দপ্তর এবং সংস্থাগুলিতে স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং ভিত্তিক নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হবে। যারা ইতোমধ্যে স্থায়ী ধরনের কাজে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিযুক্ত আছেন, তাদের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কর্মচারী হিসেবে নিয়োগের পদক্ষেপ নেয়া হবে।

খ) স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে নিয়োগ না করার বিদ্যমান আইনি বিধান কার্যকর করা।

গ) এটি নিশ্চিত করা যে-

- আউটসোর্সিং বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ কখনও শ্রমিকদের আইনি অধিকার এবং সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হবে না।
- শ্রমিকদের মজুরি, সুযোগ সুবিধা এবং অন্যান্য অধিকার যেন স্থায়ী শ্রমিকদের সমমানের হয়। অর্থাৎ "সমান কাজের জন্য সমান মজুরি" নীতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা।
- নিয়োগকর্তা এবং আউটসোর্সিং সংস্থার যৌথ দায়িত্ব কঠোরভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

ঘ) শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে (DIFE) একটি নির্দিষ্ট এবং কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা আউটসোর্সিং বিধিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং কঠোর নজরদারি নিশ্চিত করবে।

ঙ) আউটসোর্সিং সংস্থাগুলিকে শ্রম আইনের অধীনে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের মতো বাধ্যতামূলক নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্য নীতিমালা প্রস্তুত ও কার্যকর করা। এতে শ্রমিকরা যে নিয়োগ ব্যবস্থার অধীনেই থাকুক না কেন, তারা ন্যায্য আচরণ, চাকরির নিরাপত্তা এবং প্রযোজ্য সামাজিক সুরক্ষা পাবেন।

৩.১.৬ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, কাজের অধিকার ও শোভন কাজের নিশ্চয়তা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাম্প্রতিককালে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সেই সাফল্যের প্রতিফলন ততটা সুস্পষ্ট নয়। গত প্রায় দুই দশক ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে প্রবৃদ্ধি অর্জন করে আসছে এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। তবে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়নি। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে বার্ষিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ৩.৩২ শতাংশ, সেখানে ২০১৩ থেকে ২০১৬-১৭ সালের মধ্যে তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ১.৩৩ শতাংশে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি দ্রুততর হওয়ার পরও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির এই ধারা কেন নিম্নমুখী তা বিশ্লেষণ করা ভবিষ্যতের কর্মসংস্থান নীতির দিকনির্দেশনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বেকারত্ব, বিশেষ করে যুব বেকারত্ব, বাংলাদেশের জন্য একটি জাতীয় সমস্যা। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ধারণা অনুযায়ী প্রতি বছর বাংলাদেশের শ্রম বাজারে প্রায় ২২ লাখ শ্রমিক প্রবেশ করে (শিল্প দক্ষতা পরিষদ পরিচালনা নির্দেশিকা, ২০২১)। তবে শ্রমশক্তি অংশগ্রহণের হার এখনও মাঝারি মাত্রায় রয়েছে—৬১.২% (এলএফএস, ২০২২)। পুরুষদের অংশগ্রহণ হার (৮০%), যেখানে নারীদের অংশগ্রহণ মাত্র ৪২.৭৭%, যা লিঙ্গবৈষম্যের একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। অন্যদিকে যদিও শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণের হার ৬১.২% (এলএফএস ২০২২), যা ২০১৬ সালের ৫৮.২% থেকে উন্নীত হয়েছে, তবে লিঙ্গবৈষম্য একটি বড় সমস্যা। পুরুষদের অংশগ্রহণ হার ৮০%, যা নারীদের অংশগ্রহণ হার (৪২.৭৭%) থেকে অনেক বেশি।

তবে বেকারত্বের হার ২০১০ সালের ৪.৬% থেকে কমে ২০২২ সালে ৩.৫৩% হয়েছে, যা ইতিবাচক অগ্রগতি। তবে স্নাতক ডিগ্রিধারীদের বেকারত্বের হার ২৭.৮% এবং এর মধ্যে ১৪.৭% দুই বছরের বেশি সময় ধরে বেকার। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষিতদের বেকারত্বের হার ৯.১% এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকা ব্যক্তিদের বেকারত্বের হার মাত্র ১.৫%। এই তথ্যগুলি শিক্ষার সঙ্গে শ্রমবাজারের অসামঞ্জস্যতার বিষয়টি স্পষ্ট করে, যা উচ্চশিক্ষিতদের জন্য চাকরির অভাব এবং দক্ষতাভিত্তিক কর্মসংস্থানের ঘাটতির দিকে নির্দেশ করে। ২২% যুবসমাজ শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের বাইরে রয়েছে, যা তাদের সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের শ্রমবাজারে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থানের আধিক্য একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ২০২২ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, প্রায় ৮৪.৯% অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে, যা ২০১৬ সালের তুলনায় ৫.৬% বেশি।

বাংলাদেশের কর্মসংস্থান কাঠামোতে কৃষি খাত প্রধান ভূমিকা পালন করে, যেখানে ৪৫.৪% শ্রমশক্তি নিয়োজিত। সেবা খাতে ৩৭.৬% এবং শিল্প খাতে মাত্র ১৭%। নিম্ন উৎপাদনশীল খাত হলেও কৃষিতে কর্মসংস্থানের বার্ষিক বৃদ্ধি হার ১.৮৮%, এই খাতের শ্রমিকরা মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রম শক্তির অন্তর্গত বিধায় সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ এবং একইসাথে বৈষম্যের শিকার। শিল্প খাতে কর্মসংস্থান কমছে, যার বার্ষিক হ্রাস হার -২.৯৯%। সেবা খাতেও সামান্য হ্রাস লক্ষ করা গেছে, যার বার্ষিক হ্রাস হার -০.৬১%। এই প্রবণতাগুলি একটি অকাল 'অবশিল্পায়ন'-এর দিকে ইঙ্গিত দেয়, যেখানে অর্থনীতি পূর্ণ বিকাশের আগেই শিল্পখাতের কর্মসংস্থান হ্রাস পাচ্ছে।

২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত স্ব কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে ৫.৭% হয়েছে। এদিকে নিয়োগকারীর সংখ্যা সামান্য বেড়ে ৩.৮% থেকে ৪.৪% এ পৌঁছেছে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে উদ্যোক্তাবৃত্তি বাড়ছে। কর্ম সংস্থান সৃষ্টিতে আরও সমন্বিত উদ্যোগ, নীতিকাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ঘাটতি রয়েছে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান দেশের অর্থনীতির একটি প্রধান স্তম্ভ, যা রেমিট্যান্সের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। তবে বিদেশে কাজ পাওয়ার জন্য জন্য বিপুল খরচ হয় এবং বাংলাদেশের শ্রমিক কম মজুরি পান, যার ফলে এই খাতের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা একটি গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে। দেশের অভ্যন্তরে জলবায়ু পরিবর্তন এবং শহরমুখী অভিবাসন শ্রমবাজারের চিত্র আরও জটিল করে তুলেছে। গ্রাম থেকে শহরে আসা অভিবাসীবৃন্দ প্রায়শই নিরাপদ কাজ এবং উপযুক্ত জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এই চিত্রটি ইঙ্গিত করে যে, দেশের শ্রমবাজারের মূল সমস্যা সমাধান এবং

সম্ভাবনাগুলি কাজে লাগানোর জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমতাভিত্তিক এবং টেকসই নীতি কাঠামো প্রয়োজন। তরুণদের দক্ষতা উন্নয়ন, নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের আনুষ্ঠানিকীকরণ এবং শ্রম অধিকার রক্ষায় কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আধুনিক করতে হলে কৃষি, শিল্প এবং সেবা খাতের মধ্যে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে। শ্রমশক্তির এই বহুমুখী সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারলে বাংলাদেশ তার পূর্ণ অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে একটি আরও সমৃদ্ধ ও স্থিতিশীল ভবিষ্যৎ নির্মাণ করতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি ২০২২ একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা দিলেও তা বাস্তবায়নের কোনো পরিকল্পনা নেই। অন্যদিকে কর্মসংস্থান তৈরির জন্য কোনো কর্মসংস্থান বিভাগও অনুপস্থিত। একদিকে অভ্যন্তরীণ কর্ম সংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগসমূহকে সমন্বয় করার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নেই, যদিও দুইটি মন্ত্রণালয়ের (শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়) নামের সাথে 'কর্ম সংস্থান' শব্দটি রয়েছে। যদিও বিএমইটি সৃষ্টি হয়েছিল দেশে দক্ষ শ্রমশক্তি তৈরির লক্ষ্যে, এটি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে হওয়ায় এখানে অভ্যন্তরীণ কর্ম সংস্থানকে কেন্দ্র করে কোনো কার্যকর উদ্যোগ নেই।

বেকারত্ব সমস্যা সমাধানে সামষ্টিক অর্থনীতির নিয়ামকগুলির মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক। বাংলাদেশের মত দরিদ্র কিন্তু বর্ধিষ্ণু অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে কর্ম সংস্থান ও মজুরির সম্পর্ক বিদ্যমান। শ্রম সরবরাহ বৃদ্ধির সঙ্গে মূলধন সরবরাহের আনুপাতিক বৃদ্ধি না হলে তা অর্থনীতিতে বেকারত্বের সৃষ্টি করে।[16] বাংলাদেশের মত অর্থনীতিতে বিনিয়োগ ঘাটতি (সামষ্টিক মূলধন ঘাটতি) বেকারত্বের একটি মৌলিক নিয়ামক। জিডিপি – বিনিয়োগ অনুপাত মাত্র ত্রিশ শতাংশ, যা জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং পূর্ণ কর্ম সংস্থানের জন্য সামষ্টিক মূলধন চাহিদার অনেক নিচে। এটি কমপক্ষে ৩৫% হওয়া প্রয়োজন।[17]

অতিনিম্ন সঞ্চয়-জিডিপি অনুপাতের কারণে (২০ শতাংশের আশেপাশে) বৈদেশিক বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে বাংলাদেশের অবস্থান খুব নাজুক। নিম্ন সঞ্চয়-জিডিপি অনুপাতের উপর যোগ হয়েছে পুঁজি পাচার। যার ফলে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের ঘাটতি নতুন শিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থানে সংকট সৃষ্টি করছে। উচ্চমাত্রার কর রেয়াত সত্ত্বেও বিনিয়োগ ঘাটতির কারণ হচ্ছে ব্যবসায় উদ্যোগে প্রবেশ ও ব্যবসায় পরিচালনা সংক্রান্ত অনানুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যয়, আয়কর হয়রানি ও প্রাতিষ্ঠানিক জটিলতায় কালক্ষেপণ।

বাংলাদেশের শ্রম বাজারে এক ধরনের মনোপসোনি (Monopsony) বিদ্যমান, যেখানে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের একক কর্তৃত্ব বিদ্যমান। এখানে সরবরাহ ও চাহিদার পক্ষগুলির মধ্যে বিশাল ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান। এজন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান ও ন্যায্য মজুরি রাষ্ট্রের সরাসরি হস্তক্ষেপ ছাড়া সম্ভব নয়। এজন্য শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার অধিকার সমান গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভরকেন্দ্র শুধুমাত্র সুনির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কাছে সীমাবদ্ধ নয়। কর্মসংস্থান সৃষ্টির সামষ্টিক অর্থনীতিক চলকসমূহের নিয়ন্ত্রণ শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয়ের বাইরে, অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক (মুদ্রা নীতি কমিটি) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে কার্যকরভাবে অন্তর্ভুক্ত না করে শ্রম সংস্কার অসম্ভব। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের যে সব কমিটিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সেখানে অর্থনীতিবিদ ও ব্যবসায়িক প্রতিনিধি থাকলেও শ্রম মন্ত্রণালয় ও শ্রমিক পক্ষের কোনো প্রতিনিধি নেই। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় এই অন্তরায় দূর করা প্রয়োজন। শ্রম সংস্কারের যে প্রস্তাবনাগুলি পেশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে নীতি সিদ্ধান্ত ও তার জন্য বাজেটের প্রয়োজন, সেটিকে রাজস্ব (Fiscal) ও মুদ্রা (Monetary) পলিসির সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।

---

[16] বিষয়টি অপেক্ষাকৃত ভালভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে রবিন্সন মডেল। হ্যারড-ডোমার মডেলে যেখানে মূলধন সঞ্চয় আয় অনুপাত এবং মূলধন উৎপাদনশীলতা দ্বারা নির্ধারিত হয়, রবিনসন স্পষ্টভাবে মূলধন সঞ্চয়ের সঙ্গে লাভ মজুরি সম্পর্ক এবং শ্রম উৎপাদনশীলতাকে যুক্ত করেন। হ্যারড-ডোমার মডেলে, মূলধন সঞ্চয়ের প্রধান চালিকাশক্তি হলো মূলধন, অন্যদিকে জোয়ান রবিনসনের ক্ষেত্রে, এটি শ্রম। Sanket Suman (2025) Joan Robinson's Model of Growth, retrieved from: https://www.economicsdiscussion.net/economic-growth/joan-robinsons-model/joan-robinsons-model-of-growth-with-diagram/13099

[17] Sultana S at al (2020) Investment Absorption Capacity and Current Macroeconomic Conditions of Bangladesh Working Paper Series: WP No 1902. Retrieved on March 17, 2025 https://www.bb.org.bd/pub/research/workingpaper/wp1902.pdf

সুতরাং শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহকে বাস্তবায়ন করতে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পর্যায়ে সরকার প্রধান সহ উপরের প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পৃক্ততা প্রয়োজন, যা এই মুহূর্তে নেই। সবচেয়ে অবহেলিত মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দুটি হলো শ্রম ও কর্ম সংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য এই দুটি মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, অথচ বাজেট বরাদ্দ সবচেয়ে কম।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) কর্মসংস্থান সৃষ্টির অগ্রাধিকার ও কর্ম পরিকল্পনা

- কর্মসংস্থানকে বাংলাদেশের অন্যতম জাতীয় অগ্রাধিকার বিবেচনায় কর্মসংস্থান দশক ঘোষণা করে দেশে ও বিদেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।
- কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির বর্তমান হার পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করতে বছরওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উৎপাদনশীল ও শোভন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি সুনির্দিষ্ট খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

খ) কর্মসংস্থান সৃষ্টির নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- বর্তমান শ্রম বাজার ও ভবিষ্যতের শ্রম জগতের পরিবর্তন, সম্ভাবনা, চাহিদা ও প্রতিবন্ধকতা বিবেচনায় সক্রিয় শ্রম বাজার নীতি (Active labour market policy) অনুসরণ করা এবং এজন্য জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি ২০২২-কে হালনাগাদ করে নতুন 'জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি' প্রণয়ন করা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের পরিবর্তন বিবেচনায় নিয়ে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়মিতভাবে কর্মসংস্থান নীতি হালনাগাদ করা।
- বেকার ও শ্রমবাজারে নতুন প্রবেশকারীদের জন্য উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় "কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ" স্থাপন করা।[18]
- কর্মসংস্থান প্রবৃদ্ধির বর্তমান হার পাঁচ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করতে বছরওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্ক ফোর্স গঠন করা, যার সদস্য থাকবে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, বাণিজ্য ও ব্যবসায় সমিতি, শ্রমিক সংগঠন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
- মর্যাদাপূর্ণ, শোভন ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে শক্তিশালী করা, যেন দেশি বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠানকে এই কাজে সম্পৃক্ত করা যায়।
- জাতীয় শ্রম নিবন্ধন সিস্টেম ও ডাটাবেসকে গবেষণার কাজে লাগানোর উপযুক্ত করা।

গ) কর্ম সৃজন প্রণোদনা

- কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশেষ করে শ্রমঘন উদ্যোগকে উৎসাহিত করা আবশ্যক, এ লক্ষ্যে করনীতির সঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়টি সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। নির্দিষ্ট সংখ্যক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলে এবং তা কেবল টেকসই হলে আনুপাতিক হারে কর রেয়াতের সুবিধা দেয়া। এই ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের জন্য বিশেষ কার্যকর করা।
- কর্মসংস্থানকে কেন্দ্রে রেখে স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়ন। এই পরিকল্পনায় দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য যথাযথ প্রণোদনা রোডম্যাপ প্রণয়ন এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া, যেন কাঙ্ক্ষিত মাত্রার কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ আহরণ করা যায়।

[18] শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠমোর বিস্তারিত রূপ দেখুন সেকশন ৪ এ।

- বড় সরকারি/বেসরকারি প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে এবং প্রণোদনার ক্ষেত্রে শোভন কর্মসংস্থানকে শর্ত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা, যেন এই প্রণোদনা পদ্ধতি শ্রমঘন খাতসমুহকে অধিকতর উৎসাহিত করে।

ঘ) স্বকর্মসংস্থান

- কর্মসংস্থানের উপায় হিসেবে মজুরি ভিত্তিক কর্মসংস্থানের পাশাপাশি স্ব কর্মসংস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সমন্বিত কর্মসূচি চালু করা। এক্ষেত্রে আগ্রহী নারী পুরুষদের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কার্যকর ওয়ান স্টপ সেবা কেন্দ্র চালু এবং মেন্টরশিপ এবং কমন ফ্যাসিলিটি চালু করা।
- স্ব কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি খাতকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে এসএমই (SME) নীতিমালা সংস্কার করা এবং একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা।
- সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাদের অবসরপ্রাপ্তির পূর্বেই প্রশিক্ষণ দিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও জবাবদিহিতার ব্যবস্থা চালু করা।
- বিশেষ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, নারী ও বেকার যুবসম্প্রদায়সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

ঙ) কর্মঘণ্টা ও কাজের সুরক্ষা ও বেকারত্বকালীন সুরক্ষা

- কর্মীদের সুস্থতা ও উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে সকল শিল্প, খাত, বিশেষায়িত শ্রম অঞ্চল, কর্মসংস্থানের ধরন, প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে আইন অনুযায়ী ৮ ঘণ্টা কাজের সময় কার্যকর করা। যেসব কর্মস্থলে অতিরিক্ত কাজের সময় প্রয়োজন, সেগুলিকে ৮ ঘণ্টার শিফটে রূপান্তরিত করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের অব্যাহতি সাপেক্ষে অরিতিক্ত কাজের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।
- কর্মহীন সময়ের জন্য পুনঃদক্ষতা (re-skilling) ও উচ্চতর দক্ষতা (up-skilling)-এ সম্পৃক্ত করে বিকল্প কাজের সুযোগ তৈরি করা। এই ক্ষেত্রে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- আইন প্রয়োগের প্রয়োজনে জীবিকার উপকরণ যেমন; মাছ ধরার জাল, ব্যাটারি চালিত রিক্সা, ফুটপাতের দোকান, ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে বিনষ্ট করলে শাস্তির বিধান চালু করা। এক্ষেত্রে পুনর্বাসন পরিকল্পনার আওতায় বিকল্প ব্যবস্থা করার বিধান বাধ্যতামূলক করা।
- শ্রম বাজারে প্রবেশের ছয় মাসের মধ্যে চাকরি না পেলে কাজের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত করে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শিক্ষানবিস ভাতা চালু করা।
- চাকরিরত শ্রমিক বেকার হয়ে পড়লে নতুন চাকরি না পাওয়া অবধি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সরকারি উদ্যোগে বেকার ভাতা চালু করা। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কর্মহীন শ্রমিকের পেশা ও দক্ষতা অনুযায়ী অন্যান্য সম্ভাব্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ খাতে কাজের সুযোগ তৈরির ব্যবস্থা করা।

৩.১.৭ দক্ষতা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা ও টেকসই ব্যবসা

শ্রমবাজারের গতি প্রবণতা (dynamics) অনুযায়ী চাহিদার যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে, সেই চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসা এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এপেক্স বডির সাথে যৌথভাবে কারিকুলাম সহ অবকাঠামো, দক্ষ প্রশিক্ষক দল সৃষ্টি করে চাহিদা পূরণে প্রস্তুত হওয়া। এই কাজে আন্তর্জাতিক সহায়তা ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পর্ক গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করে দেশের সরকারি, বেসরকারি সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে এর জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

বাংলাদেশের কর্মশক্তি নিম্ন আয়, নিম্ন দক্ষতা এবং নিম্ন উৎপাদনশীলতার একটি দুষ্ট চক্রে জর্জরিত। বাংলাদেশের সকল সেক্টরেই নিম্ন উৎপাদনশীলতা দেখা যায়। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি করেই দক্ষ এবং উচ্চ উৎপাদনশীল শ্রমিক তৈরি করা সম্ভব। এর জন্য জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি (২০২২), জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০২২-

২০২৭ পর্যন্ত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি (এনএসডিপি ২০২০), বাংলাদেশ জাতীয় কর্মসংস্থান কৌশল (২০১৯), জাতীয় শিক্ষা নীতি (২০১০)–এর মত বিভিন্ন নীতি এবং কর্মপরিকল্পনা বিদ্যমান থাকলেও তার কোনো বাস্তবায়ন নেই। জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলেও এর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে এবং বর্তমান সময়ের প্রয়োজন মেটাতে প্রয়োজনীয় বাস্তবায়ন অবকাঠামো নেই।

বাংলাদেশ তৃতীয় স্তরের শিক্ষাকে (tertiary) দুটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে: ক। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) প্রতিষ্ঠানগুলিতে ২-৩ বছর দীর্ঘ ডিপ্লোমা এবং সার্টিফিকেট কোর্স; এবং খ। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ৩ বছর এবং তার বেশি দীর্ঘ ডিগ্রি কোর্স। ২০১৩ সালের উপাত্ত অনুসারে, মাত্র ০.৫২ শতাংশ মানুষ ডিপ্লোমা, প্রশংসা বা সমমানের ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন, যেখানে প্রায় ৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থী পাস ডিগ্রি, অনার্স ডিগ্রি, মাস্টার্স বা সমমানের ডিগ্রি এবং ২.৬৩ শতাংশ শিক্ষার্থী পেশাদার এমবিবিএস/বিডিএস, ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পন্ন করেছেন। অর্থাৎ এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী এবং তাদের বাবা-মা/অভিভাবকদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের ডিগ্রির জনপ্রিয়তা অনেক বেশি। কিন্তু টিভিইটি স্নাতকদের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের শ্রম বাজারের সম্ভাবনা ক্ষীণ। একটি অনুমান দেখায় যে বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ স্নাতকদের ৪৫ শতাংশের তুলনায় টিভিইটি স্নাতকদের ২৫ শতাংশ বেকার। তা সত্ত্বেও এইচএসসি গ্র্যাজুয়েট এবং তাদের পিতামাতারা ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট ডিগ্রির চেয়ে উচ্চ শিক্ষা পছন্দ করেন। উচ্চ শিক্ষিত বেকার সৃষ্টির এই চক্র একটি জাতীয় অপচয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে দক্ষতা তৈরিতে বেসরকারি উদ্যোগে এবং দাতব্য এনজিও পরিচালিত স্কিলিং, আপ-স্কিলিং, রি-স্কিলিং, এন্টারপ্রেনারশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং পূর্ব অভিজ্ঞতার শিক্ষাসনদ জাতীয় বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান আছে। তবে সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব পরিলক্ষিত হয়। একদিকে দ্রুত বর্ধমান অর্থনীতিতে দক্ষ শ্রমিকের তীব্র সংকট বিদ্যমান; অন্যদিকে উচ্চ বেকারত্ব বিশেষত যুব বেকারত্ব আমাদের দক্ষতা উন্নয়নের কার্যক্রমের গুণগত মান এবং কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে।

শ্রমবাজারের গতি প্রবণতা (dynamics) অনুযায়ী শ্রমখাতে তিন ধরনের প্রবণতা বিদ্যমান। যথা: ১। অটোমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের কারণে বিদ্যমান দক্ষতার চাহিদার সংকোচন এবং ছাঁটাইকৃত ও ছাঁটাইয়ের ঝুঁকির মুখে থাকা কর্মীর রি-স্কিলিং এবং আপ-স্কিলিং প্রশিক্ষণের চাহিদা বৃদ্ধি; ২। শ্রমবাজারে দক্ষতার চাহিদা অনুযায়ী নতুন দক্ষতা প্রশিক্ষণের চাহিদা বৃদ্ধি; এবং ৩। স্ব কর্মসংস্থানে আগ্রহী বৃন্দের জন্য উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের চাহিদা বৃদ্ধি। এই প্রবণতা জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচনায় আনা জরুরি।

অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন এবং নীতিমালা দক্ষতা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে দায়িত্ব ভাগাভাগীতে অস্পষ্টতা তৈরি করেছে একই ধরনের কাজ অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান করছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, বিটিইবি এবং বিএমইটি-র দায়িত্ব বণ্টনে অস্পষ্টতা রয়েছে, যা কারিকুলাম উন্নয়ন, প্রশিক্ষক নিয়োগ এবং মান যাচাইয়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। দক্ষতার সঙ্গে যুক্ত ২৪টি মন্ত্রণালয় এবং তাদের অধীনস্ত কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বেসরকারি খাতের প্রতিষ্ঠান, এনজিও চালিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে, যার ফলে প্রশিক্ষণের গুনগত মান নিম্নমানের।[19]

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) কর্ম পরিকল্পনা ও সমন্বিত উদ্যোগ

- দেশের জনশক্তিকে দক্ষ উৎপাদনশীল কর্মীবাহিনীতে রূপান্তরিত করার জন্য প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান বিভাগের নেতৃত্বে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা আবশ্যক।
- অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির ধারা ও গতি-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষতা উন্নয়নের বিদ্যমান অবকাঠামোর পুনর্বিন্যাস ও সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণে সক্ষম জনশক্তি গড়ে তোলা জরুরি।
- দক্ষতা উন্নয়নে সরাসরি নিয়োগকারীর অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যেন তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত জনবল তৈরি সম্ভব হয়।

[19] ILO (2022) ILO Bangladesh Skills Strategy. Bangladesh Country Assessment and Priorities (CAPs). – Dhaka.

- স্বল্প সময়ের মধ্যে কমপক্ষে ৫টি দেশের সঙ্গে মিউচুয়াল রিকগনিশন (এমআরএ) চুক্তি স্বাক্ষর করা, যেন বাংলাদেশি কর্মীবৃন্দের কর্মসংস্থান উচ্চতর দক্ষতা সম্পন্ন খাতে বেশি হয়। পর্যায়ক্রমে বৈদেশিক শ্রমবাজারের বিদ্যমান ও সম্ভাবনাময় দেশগুলির সাথে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে এই এমআরএ স্বাক্ষর করা।
- কর্মপূর্ব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং কর্মকালীন দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচির মাঝে সমন্বয় সাধন।
- দক্ষতা ভবিষ্যৎ চাহিদা (skills anticipation) ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ও ডিজিটাল পদ্ধতির সংমিশ্রণে আরও শক্তিশালী করা, যেন দক্ষতা মানদণ্ড নিয়মিত উন্নত করা যায়।
- বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মদক্ষতা (soft skills) এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানের সক্ষমতা তৈরির জন্য কারিকুলাম সংস্কার করা।
- সংশ্লিষ্ট আইনে পরিবর্তন এনে নারী, তরুণ, প্রতিবন্ধীসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করে বৈষম্য কমিয়ে আনা।
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট খাতে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

খ) নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

- শ্রমবাজারের গতি প্রবণতা (dynamics) অনুযায়ী চাহিদার যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে, সেই চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের সব সরকারি প্রতিষ্ঠানকে একটি ছাতার নিচে নিয়ে আসা এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এপেক্স বডির সাথে যৌথভাবে কারিকুলাম সহ অবকাঠামো, দক্ষ প্রশিক্ষক দল সৃষ্টি করে চাহিদা পূরণে প্রস্তুত হওয়া। এই কাজে আন্তর্জাতিক সহায়তা ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি। এই লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করে দেশের সরকারি, বেসরকারি সব প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা আবশ্যক।
- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রত্যন্ত প্রশাসনিক জেলাগুলিতে "কর্মসংস্থান কেন্দ্র" (employment exchange) স্থাপন করা প্রয়োজন। কেন্দ্রগুলি নিয়োগকর্তা এবং সম্ভাব্য কর্মচারীদের মধ্যে একটি সেতু হিসাবে কাজ করতে পারে।
- দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিদ্যমান নীতি নির্ধারণী ও বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানগুলির বিক্ষিপ্ত ও পরস্পর বিরোধী অবস্থান দক্ষতা উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে অন্যতম অন্তরায়। বিশেষ করে এনএসডিএ ও বিটিইবি-র ম্যান্ডেটের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের মধ্যে সমন্বয় আনার জন্য বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করে সমন্বয় বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া।

গ) শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবিস এবং বেকারত্বের সুরক্ষা

- একটি সর্বজনীন বেকারভাতা চালু সময়সাপেক্ষ বিধায় শ্রম বাজারে নতুন প্রবেশকারী তরুণদের জন্য বিদ্যমান নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অধীনে পরিকল্পিত শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবিস কর্মসূচি চালু করা, যেন কেউ কর্মহীন না থাকে। এজন্য একটি জাতীয় তহবিল গঠন করা।
- সম্ভাবনাময় নতুন পেশা চিহ্নিত করে বিশেষায়িত দক্ষতা সৃষ্টিকারী খাতগুলি চিহ্নিত করে পর্যাপ্ত নীতি সহায়তা প্রদান এবং এই খাতগুলির জন্য দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা আবশ্যক।

ঘ) আর্থিক বরাদ্দ

- জাতীয় বাজেটে শিক্ষা বাজেটের অধীনে উপখাত হিসেবে অথবা আলাদা খাত হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- গবেষণা ও উন্নয়নের (R & D) লক্ষ্য ভিত্তিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। শিল্প ও একাডেমিয়ার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টিতে শিল্প খাতকে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা। এই ক্ষেত্রে শিক্ষা ও দক্ষতা খাতে জাতীয় বাজেটে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দ করা যেতে পারে।

ঙ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রণোদনা

- ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের সাথে কর্মসংস্থান ওতপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় ব্যবসার টেকসই প্রবৃদ্ধি রোডম্যাপ প্রণয়ন। এই রোডম্যাপে টেকসই ব্যবসার মানদণ্ড নির্ধারণ করা।
- বেসরকারি খাতে দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রণোদনা সৃষ্টি করা, বিশেষত যে খাতগুলির অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক চাহিদা রয়েছে।

চ) শিক্ষা সংস্কার ও কারিগরি শিক্ষার মর্যাদা

- জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং তার সাথে দক্ষতা নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি।
- গণহারে স্নাতকোত্তর শিক্ষা লাভের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবসম্মত করতে কারিগরি শিক্ষার মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- টিভিইটি এবং বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ স্তরের ডিগ্রি সহ একটি জাতীয় যোগ্যতার কাঠামো প্রস্তুত করার জন্য কাজ করা, যাতে টিভিইটি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীবৃন্দ তাঁদের জীবনের যে কোনও পর্যায়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারেন।

ছ) দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের কার্যকারিতা

- সরকারি প্রকল্প ভিত্তিক প্রশিক্ষণে বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যাপক দুর্নীতির কারণে অপচয় হয়েছে। এর মূল কারণ ছিল প্রকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে পাশ কাটিয়ে টেন্ডারের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার অভাব আছে এমন প্রতিষ্ঠানের কাজ পাওয়া। এক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। প্রকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করতে রেটিং প্রথা চালু করা এবং ন্যূনতম রেটিং প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ করার ব্যবস্থা করা। এ লক্ষ্যে বিশেষ টাস্কফোর্স গঠন করা।
- দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর প্রকল্পসমূহে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা বাতিল করা, এর ফলে দক্ষতা উন্নয়নের নামে দুর্নীতি ও নৈতিক সংকট (moral hazard) সমস্যা দূর হবে এবং বেসরকারি প্রশিক্ষণ খাতে বিনিয়োগ আসবে।

৩.১.৮ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রতিবন্ধকতা হতে উত্তরণের প্রস্তুতি

যে কোনো শিল্প বিপ্লবের পরে অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটে। কাঠামোগত পরিবর্তনের কালে ব্যাপক বেকারত্ব সৃষ্টি হলেও অর্থনীতির সম্প্রসারণের সাথে সাথে ব্যাপক কর্ম সংস্থান ঘটে। এক্ষেত্রে পুরনো অনেক দক্ষতার কাজের অবলুপ্তি ঘটে এবং নতুন দক্ষতা চাহিদার আবির্ভাব ঘটে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্রেও এই বাস্তবতা বিদ্যমান। তবে একটি নতুন মাত্রা আছে, যা আগের শিল্প বিপ্লব থেকে এটিকে আলাদা করে, তা হলো প্রযুক্তি আত্মীকরণের ফলে পুরনো দক্ষতার শ্রমিকের কর্মহীন হয়ে পড়ার যে গতি, আর নতুন দক্ষতা আয়ত্ব করে আবার কর্মে নিয়োজিত হওয়ার গতি অনেক শ্লথ। এর ফলে আকস্মিক বেকারত্ব সৃষ্টি হয়ে শ্রম বাজারে এবং সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য যৌথ পরিকল্পনা ও তার কার্যকর বাস্তবায়নের বিকল্প নেই।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে জাতীয় অর্থনীতির উপর ব্যাপক প্রভাব পড়ছে এবং শ্লোগান সর্বস্ব অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ এর সুবিধা নিতে এখনও পেরে ওঠেনি। 4IR সহ পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে সকল খাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। অর্থনীতির খাতসমূহে প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে একদিকে যেমন; বিদ্যমান দক্ষতায় নিয়োগ শ্লথ হবে এবং শ্রমিক ছাঁটাই হবে, অন্যদিকে নতুন দক্ষতা সম্পন্ন খাতে নতুন কর্ম সংস্থান সৃষ্টি হবে। তাই কর্ম সংস্থানে ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলা ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর অন্য একটি দ্বিমুখী কৌশল প্রয়োজন।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

কর্মসংস্থানে সম্ভাব্য বিপর্যয় মোকাবেলা

ক। নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তিয়ায়নের পরিকল্পনার আলোকে নিয়োগ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট ট্রেড ইউনিয়নের সাথে যৌথভাবে নিরূপণ করা, যেন আকস্মিক ছাঁটাইয়ের কারণে শ্রম অসন্তোষ দেখা না দেয়। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের জন্য সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন করা। এর মধ্যে যে সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত খাতের শ্রমিকদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

খ। নতুন দক্ষতার চাহিদা আগাম নির্ধারণ করে দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ও বেসরকারি খাত যৌথভাবে একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে। আর নতুন দক্ষতার ঘাটতি মেটাতে বিদেশি কর্মী নিয়োগ এমনভাবে করা যেন পর্যায়ক্রমে দেশীয় শ্রমিক দিয়ে চাহিদা মেটানো যায়। এক্ষেত্রে দেশি-বিদেশি কর্মী নিয়োগের একটি গ্রহণযোগ্য অনুপাত নির্ধারণ করা, যেন দেশীয় কর্মীবৃন্দ শিখে নিয়ে দক্ষতার ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

গ। প্রযুক্তি ভিত্তিক কর্মী প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে কার্বন করের মত কর্মসংস্থান কর চালু করা, আর এই অর্থ শ্রমঘন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রণোদনা প্রদান ও ছাঁটাইকৃত শ্রমিকের পুনর্বাসনে কাজে লাগানো।

ঘ। বিদ্যমান শিল্প দক্ষতা কাউন্সিলগুলিকে (Indsutry Skills Council) শক্তিশালী করা এবং অগ্রাধিকার শিল্পগুলিতে (স্বাস্থ্য, জৈবপ্রযুক্তি, শক্তির বিকল্প উৎস, রোবোটিক্স এবং অটোমেশন সহ) নতুন শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা যাতে প্রশিক্ষণের অগ্রাধিকারের মধ্যে নতুন দক্ষতা চাহিদা পূরণে সক্ষমতা গড়ে ওঠে।

ঙ। শ্রমিকের বিদ্যমান দক্ষতাকে আপগ্রেড করে উচ্চতর দক্ষতা চাহিদা মেটাতে সকল খাতের শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

চ। ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকের জন্য বিশেষ রি-স্কিলিং কর্মসূচি প্রণয়ন এবং প্রশিক্ষণপূর্বক নতুন কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা। প্রশিক্ষণ চলাকালীন বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা করা।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর প্রস্তুতি

ক। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা পূরণ ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট খাতে উপযুক্ত দক্ষ কর্মী সৃষ্টির জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত)-এ দক্ষতা অর্জনের জন্য জাতীয় কর্মসূচি চালু করা, যার মধ্যে স্কলারশিপ, পেশাদারি প্রশিক্ষণ এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অন্তর্ভুক্ত রাখা।

খ। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য প্রধান প্রযুক্তিসমূহ যেমন; AI, রোবোটিকস এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির, ক্লাউড কম্পিউটিং, থ্রিডি প্রিন্টিং, বায়ো টেকনোলজি, শ্রমিকদেরকে প্রস্তুত করতে 'জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি' চালু করা এবং এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক শ্রমবাজার ও উদীয়মান শিল্পের চাহিদার সঙ্গে বেসরকারি খাতের সমন্বয় সাধন।

গ। শিল্প খাতের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে STEM স্নাতকদের জন্য কর্মসংস্থান সুযোগ করা। নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেয়া।

ঘ। গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্য ভিত্তিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি। শিল্প ও একাডেমিয়ার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক সৃষ্টিতে শিল্পখাতকে প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঙ। প্রযুক্তি নির্ভর স্টার্টআপ ও উদ্যোগসমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য জেলা ভিত্তিক ও বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক ১০০টি ইনোভেশন এবং উদ্যোগ হাব (Innovation and Entrepreneurship Hub) তৈরি করা।

৩.১.৯ আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং সুষম নগরায়ণ

বাংলাদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক বৈষম্য বিরাজ করছে, যা অসম শিল্পায়ন, অপ্রতুল নীতিগত সহায়তা এবং শ্রমনীতি ও আইন সংস্কারের অভাবের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। উন্নয়নবঞ্চিত অঞ্চলে টেকসই এবং শোভন কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত থাকায় অর্থনৈতিক স্থবিরতা দেখা দিচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এই বৈষম্য নিরসনের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি সংস্কার ও আঞ্চলিক কর্মসংস্থান উদ্যোগ গ্রহণ না করা হয়, তাহলে এই অসমতা জাতীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে।

বাংলাদেশের শিল্প ও কর্মসংস্থান কেবলমাত্র কয়েকটি শহর কেন্দ্রিক হওয়ায়, বিশেষ করে ঢাকায় অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অনিয়ন্ত্রিত নগরায়ণ শহরগুলির অবকাঠামোর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে। ফলে নাগরিক সেবা ব্যাহত হচ্ছে এবং জীবনযাত্রার মান নিচে নেমে যাচ্ছে। পরিকল্পিত শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ এবং উন্নয়নবঞ্চিত অঞ্চলের উন্নয়ন না হলে শহরমুখী অভিবাসনের কারণে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সংকট আরও তীব্রতর হবে।

বাংলাদেশের অনেক অনুন্নত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় শিল্প অবকাঠামোর অভাব রয়েছে, যার ফলে উচ্চ বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক সুযোগের সীমাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছে। শ্রমঘন শিল্প প্রতিষ্ঠার মতো সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ না থাকায় এই অঞ্চলের জনগণ কর্মসংস্থানের জন্য শহরমুখী হতে বাধ্য হচ্ছে। যদি পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠা করা না হয়, তাহলে আঞ্চলিক বৈষম্য আরও প্রকট হবে এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হবে।

এ ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমশক্তিতে দৃশ্যমান এবং কাঠামোগত আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর জন্য সংস্কারকৃত শ্রমনীতি, শ্রম আইন, কর্মসংস্থান নীতি, শিল্প নীতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নীতির আলোকে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে টেকসই এবং শোভন কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া।

খ) টেকসই ও সুষম নগরায়ণ এবং সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিতভাবে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ এবং বহুমুখীকরণের পাশাপাশি পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করা, যেন শ্রমের বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে শহরমুখী (বিশেষত ঢাকা) অভ্যন্তরীণ অভিবাসী সমস্যার সুরাহা করা।

গ) পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলিতে শ্রমঘন শিল্প, বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকা/শিল্প এলাকা প্রতিষ্ঠার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া, যার সাথে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা থাকে।

৩.১.১০ খাতওয়ারি কর্মসংস্থান

বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি এখনও কৃষি খাত, যা কম উৎপাদনশীল হলেও সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে। অন্যদিকে শিল্প খাত, যা উন্নত অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ, ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। সেবা খাত বড় আকারে কর্মসংস্থান করলেও এর সম্প্রসারণে ধীরগতি লক্ষ করা যাচ্ছে। বাংলাদেশের শ্রমশক্তির গড়ে পাঁচজনের মধ্যে প্রায় চারজন অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত। এটি মূলত গ্রামীণ এলাকা এবং নারী কর্মীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। এই অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজ কর্মীদের নিম্ন মজুরি, চাকরির নিরাপত্তার অভাব এবং সামাজিক সুরক্ষার অপ্রতুলতার দিকে ঠেলে দেয়। এছাড়া তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক গিগ অর্থনীতির উত্থান নতুন সুযোগ তৈরি করলেও কর্মীদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা এবং স্বীকৃতির অভাব রয়েছে। অনলাইন ফ্রিল্যান্সিংয়ের জন্য বাংলাদেশ একটি বৈশ্বিক কেন্দ্র হয়ে উঠছে। কিন্তু গিগ কর্মীরা প্রায়শই কাজের ন্যায্য মজুরি এবং সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হন। একইভাবে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং পদ্ধতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও কর্মীদের অধিকারের বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

কৃষি

ক) যারা কৃষিতে মজুরি বা অন্য কোনোভাবে অন্যের জমিতে শ্রম দেয় তাদেরকে কৃষিশ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত করা।

খ) কৃষিশ্রমিকদের কোনো ধরনের শর্ত ব্যতীত শ্রম আইনের সুরক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) কৃষিশ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, জেলা ও জাতীয়ভিত্তিক শ্রমিক ইউনিয়ন ও ফেডারেশন করার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আইনে সুনির্দিষ্ট বিধান সন্নিবেশ করা।

ঘ) কমিশনের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ইউনিয়ন করার সুপারিশ বিবেচনায় প্রতি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ১০০জন কৃষিশ্রমিক একত্রিত হয়ে সংগঠন করা এবং বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও দরকষাকষি করার অধিকার নিশ্চিত করা।

ঙ) মজুরি, প্রাপ্য এসব বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালত যাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে তার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ব্যর্থ হলে কৃষিশ্রমিকদের শ্রম আইন ১২৪ (ক) অনুযায়ী শ্রম পরিদর্শকের কাছে যাওয়ার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।

চ) কৃষিশ্রমিকদের পেশাগত বিশেষ করে রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারের কারণে অন্যান্য শ্রমিকদের মতো তাদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

ছ) কৃষিশ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জ) কৃষিশ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত, বিশেষ করে সামাজিক বিমায় অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা।

শিল্প

ক) শ্রমঘন শিল্পের প্রসার: বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ, উৎপাদনশীলতার ঘাটতির প্রেক্ষিতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিম্নমুখী প্রবণতার বাস্তবতায় শ্রমঘন শিল্পসমূহকে চিহ্নিত করে শিল্পে কর্মসংস্থান পরিকল্পনা প্রণয়ন, যাতে শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টির হার আগামী তিন বছরের মধ্যে দ্বিগুণ করা যায়।

খ) বৈচিত্র্যকরণ: শিল্পে এবং পণ্যে বৈচিত্র্য এনে এবং নতুন বাজার সৃষ্টির মাধ্যমে তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনার জাতীয় পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে প্রাধান্য দেয়া। রপ্তানি বহুমুখীকরণ শিল্প, বিশেষ উন্নয়নমূলক শিল্পে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পসমূহের তালিকা পুনর্মূল্যায়ন করে নতুন তালিকা প্রণয়ন।

গ) ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন: পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী পরিবার ভিত্তিক, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞার সংস্কার করে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাসমূহ সম্প্রসারণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ। পরিবার ভিত্তিক, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা ঋণ প্রাপ্তির মধ্যে সীমিত নয়। পণ্য ও সেবা উৎপাদনের প্রতিটি ধাপে তাঁরা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। অতীতে ঘোষিত সুবিধাগুলিও এই উদ্যোক্তাগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছায়নি। কর্মসংস্থানের বাস্তবতায় এই আকারের প্রতিষ্ঠানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও তাঁরা অবহেলিত। পরিবার ভিত্তিক, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ, যেন এই খাতে বিদ্যমান কর্মসংস্থানের দ্বিগুণ কর্মসংস্থান আগামী তিন বছরের মধ্যে করা যায়।

ঘ) প্রযুক্তির উন্নয়ন: টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তির আহরণ বিদ্যমান প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং তদানুযায়ী শ্রমিকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে উৎপাদনশীলতা ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বাড়ানো।

সেবা খাত

ক)শ্রমিকের স্বীকৃতি: সেবাখাতের কর্মসংস্থানের বৈশিষ্ট্য পণ্য খাত থেকে ভিন্ন। এই খাতে গত দুই দশকে নতুন নতুন কর্মসংস্থান যুক্ত হয়েছে। সেবাখাতে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমের আধিক্য রয়েছে। শ্রম আইনে সেবাখাতের সব শ্রমিকের স্বীকৃতি প্রদান করা।

খ) কর্মসংস্থান বৃদ্ধি: সেবা খাতে কর্মসংস্থানের জন্য প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে খাতসমূহকে চিহ্নিত করে কর্মসংস্থানের প্রবৃদ্ধি আগামী তিন বছরে তিনগুণ করা।

অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ভিত্তিক কর্মসংস্থান

ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ:

- ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনের সংখ্যা ও নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- একাধিক জায়গায় নিবন্ধনের পরিবর্তে একটি একক নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করা।
- নতুন নিবন্ধিত অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি কর কাঠামো নির্ধারণ করা, যেন অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দকে কর হয়রানির আতঙ্কে থাকতে না হয়। এজন্য পরিষ্কার এবং পূর্বানুমেয় সামঞ্জস্য কাঠামো প্রণয়ন করা যেন তা উদ্যোক্তাবৃন্দের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়।
- যে কোনো ধরনের সিএমএসএমই নিবন্ধনের জন্য উপযুক্ত প্রণোদনাসহ প্রচারাভিযান চালানো।

খ) সিএমএসএমই ভিত্তিক জাতীয় পরিকল্পনা ও রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন:

- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক একটি দীর্ঘমেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, যেখানে সিএমএসএমই-র সংখ্যা কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা, জিডিপিতে সিএমএসএমই-র অংশীদারিত্বের অনুপাত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা এবং উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ও আর্থিক বরাদ্দ দেয়া। এটি ২০২৫-২৬ অর্থ বছর থেকেই শুরু করা। লক্ষ্যমাত্রাসমূহ নিম্নরূপ:
- সিএমএসএমই-র সংখ্যা, ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৭.৮ মিলিয়ন থেকে ২০২৬ সালে ৮.২ মিলিয়ন, ২০৩০ সালে ৯.৪ মিলিয়ন এবং ২০৪০ সালে ১১.৯ মিলিয়নে উন্নীত করা।
- কর্মসংস্থানে সিএমএসএমই-দের অংশীদারিত্ব (অপ্রাতিষ্ঠানিকসহ) বাড়িয়ে ২০৪০ সালে ৬০ মিলিয়নে উন্নীত করা।

গ) স্থানীয় পণ্যের ক্লাস্টার ভিত্তিক উদ্যোগে নারী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দেয়া।

ঘ) অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ, পণ্যের ডিজাইন, প্যাকেজিং, মার্কেটিং, পণ্যের বাজার অনুসন্ধান, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ, ব্রান্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের সাথে সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। উল্লেখ্য, শুধু প্রশিক্ষণের জন্য একটানা দীর্ঘ সময় তাঁদের পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয় না। আবার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ তাঁরা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন।

ঙ) পণ্য উৎপাদনে দক্ষতা থাকলেও ঐতিহ্যগত বাজার ও বিপণন ব্যবস্থার যে বিবর্তন ঘটেছে, তার সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী পণ্য উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাবৃন্দ পরিচিত নন অথবা খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হননি। এজন্য পণ্য বিপণন সেবা চালু করা এবং অনলাইন বাজারের সাথে সম্পৃক্ত করা।

চ) অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীবৃন্দ বাকিতে পণ্য বিক্রয়ে বাধ্য হন এবং বিক্রিত পণ্যের মূল্য আদায়ে হয়রানি ও বিলম্বের শিকার হন। এর থেকে মুক্তির জন্য ডিজিটাল সরবরাহ ঋণ চালু করা।

ছ) অতিক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দের স্বার্থ এবং তাঁদের নিয়োজিত শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষার্থে (যেমন; নিয়োগপত্র, কাজের সময়, মজুরি) উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়া।

জ) গৃহভিত্তিক ও পারিবারিক শিল্পের সঙ্গে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জড়িত। এই ধরনের শিল্প সুরক্ষার জন্য বিশেষ প্রকল্প হাতে নেয়া এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে রক্ষার জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা করা।

ঝ) ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দের পুঁজি ভিত্তিক খরচ কমানো ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য জেলা ভিত্তিক অভিন্ন সুযোগ-সুবিধা (Common Facility) সৃষ্টি করে ভাড়া ভিত্তিক ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা।

ঞ) অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাবৃন্দের ঋণ প্রবাহ বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়নের পাশাপাশি ব্যাংকের ঋণ প্রক্রিয়া খরচ ভর্তুকি দেয়ার উদ্যোগ নেয়া। মান্যতার ঘাটতি (Compliance deficit) মোকাবেলায় বিকল্প ক্রেডিট রেটিং বাধ্যতামূলক করা যায়। এক্ষেত্রে বিদ্যমান সাফল্যকে আরও সম্প্রসারণ করা।

ট) সিএমএসএমই সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রণোদনা দেয়ার জন্য উপাত্ত ভিত্তিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর উদ্যোগে প্রতি দুই বছর পর পর জাতীয় জরিপ ও প্রতি পাঁচ বছরে শুমারি পরিচালনা করা।

শিক্ষাধীনতা

ক) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে শিক্ষাধীনতা কর্মসূচি চালু করা। এক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের পছন্দমত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেয়ার অধিকার থাকবে।

খ) শিক্ষাধীনতা কারিকুলাম এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন শিল্পের বর্তমান চাহিদাকে প্রতিফলিত করে। এই কারিকুলামের মূল উপাদানগুলি হবে:

- উপযোগী প্রশিক্ষণ: নির্দিষ্ট খাতের দক্ষতার চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, যা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, এনএসডিএ এবং বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের যৌথ অংশগ্রহণে প্রস্তুতকৃত।
- হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা: শিক্ষাধীন কর্মী যেন ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা অর্জন করে, যা সমাপ্তির পরে তাদের নিয়োগকর্তাদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে।
- নিয়মিত ফিডব্যাক: নিয়োগকর্তারা প্রোগ্রামের প্রাসঙ্গিকতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করতে প্রশিক্ষণ পদ্ধতির উপর নিয়মিত ইনপুট প্রদান করবেন। এর ফলে উত্তীর্ণদের নির্বিঘ্নে কর্মক্ষেত্রে সংযোজিত হতে সহায়তা করবে।

গ) অনানুষ্ঠানিক খাতের শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবিসের অতীত সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে এনএসডিএ-র অধীনে অনানুষ্ঠানিক খাতের জন্য পৃথক কর্মসূচি চালু করা।

ঘ) যে সব প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় ১০ কোটি টাকার বেশি, তাঁদের জন্য শিক্ষাধীনতা লেভি চালু করা, এই অর্থে যে শিক্ষাধীন কর্মী প্রস্তুত হবেন, তাঁরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লেভি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পাবেন।

ঙ) ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলিকে (এসএমই) এই শিক্ষাধীনতা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করতে আর্থিক প্রণোদনা দেয়া, যেন তাঁরা দক্ষ জনবল পেতে এই প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে পারে। এই আর্থিক প্রণোদনা শিক্ষানবিস ভাতা অথবা কর রেয়াতের মাধ্যমে হতে পারে।

চ) শ্রম বাজারে প্রবেশের আগে এবং পরে শ্রমশক্তির জন্য ব্যাপক ক্যারিয়ার সহায়তা কর্মসূচি চালু করা, যার আওতায় ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় সহায়তার পাশাপাশি শিক্ষাধীনতা ও শিক্ষানবিস কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করা। এই প্রক্রিয়ায় উচ্চমাধ্যমিক পর্যায় থেকে শুরু করা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করা।

৩.২ মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা

মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা শ্রমিকের অধিকার এবং ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী কাজ যেমন; প্রত্যেক নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য তেমনি প্রত্যেকের যোগ্যতানুসারে এবং প্রত্যেকে কমার্নুযায়ী— স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন (অনুচ্ছেদ ২০)। সুনির্দিষ্টভাবে সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনুচ্ছেদ ১৫ (খ)-তে যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিষয় উল্লেখ আছে। শ্রমিকদের মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ হতে হবে যেন তা শ্রমিক ও তার পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। [20] সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও নির্দেশনার আলোকে প্রণীত শ্রমনীতি ২০১২-এর উদ্দেশ্যসমূহে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড অনুযায়ী শোভন কাজ নিশ্চিত করা, শ্রমজীবী মানুষের জীবনমান ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা ও সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

মজুরি এবং ন্যায্য হিস্যা বিষয়ক আন্তর্জাতিক দলিল ও নীতিমালাগুলি শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষিত করতে এবং মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে আন্তর্জাতিক মান ও নীতি নির্ধারণ করে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব সমমানের কাজের জন্য বৈষম্যহীনভাবে সকলের জন্য সমান মজুরি পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের মর্যাদাপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করার জন্য ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান করতে হবে (অনুচ্ছেদ ২৩ (১) ও অনুচ্ছেদ ২৩ (২))। অনুরূপভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ অনুযায়ী রাষ্ট্রসমূহ স্বীকৃতি দেয় যে, সকল শ্রমিকের ন্যায্য ও অনুকূল কর্মপরিস্থিতি পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করবে—ন্যায্য মজুরি ও সমান পারিশ্রমিক, বিশেষত নারীদের জন্য এমন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা হবে, যা পুরুষদের তুলনায় কোনোভাবেই নিম্নমানের হবে না এবং সমান কাজের জন্য সমান পারিশ্রমিক প্রদান করা হবে এবং মজুরি এমন হতে হবে, যাতে শ্রমিক ও তার পরিবার মানব মর্যাদার সাথে জীবনযাপন করতে পারে (অনুচ্ছেদ-৭)।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সম-মজুরি কনভেনশন (ILO Equal Remuneration Convention, 1951) বাংলাদেশ সরকারের মেনে চলার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। দায়বদ্ধতা অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার পুরুষ এবং নারী শ্রমিকদের জন্য সমান মূল্যের কাজের জন্য সমান মজুরি প্রদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এছাড়াও ন্যূনতম মজুরি কনভেনশন, 1970 (ILO Minimum Wage Convention (C131) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনগুলির পরামর্শ গ্রহণ করা, মজুরি নির্ধারণে শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, দেশের সাধারণ মজুরি স্তর, জীবনযাত্রার ব্যয়, সামাজিক সুরক্ষা, সুবিধা এবং অন্যান্য সামাজিক গোষ্ঠীর জীবনমানকে বিবেচনায় নেওয়া, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থানের উন্নতির প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অর্থনৈতিক দিকগুলিও সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া, ন্যূনতম মজুরি বিধি কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিদর্শন ব্যবস্থা গ্রহণ করার মত দিকনির্দেশনা প্রদান করে। যদিও বাংলাদেশ সরকার এই কনভেনশনটি অনুস্বাক্ষর করেনি, তথাপি আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড হিসেবে এই কনভেনশন অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। মজুরি নির্ধারণ কনভেনশন (ILO Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928, No. 26) শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর জোর দেয়, বিশেষত যেখানে মজুরির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশের শ্রম বাজারে মজুরি সংক্রান্ত নানা বৈষম্য ও সমস্যা বিদ্যমান, যা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। বিশেষ করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা যথাযথ ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ওভারটাইম কাজ করলেও যথাযথ ভাতা পান না এবং বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধির কোনো সুনির্দিষ্ট পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা নেই। উপরন্তু শ্রমিকরা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুনাফার অংশীদার হন না। মজুরি পরিশোধে অনিয়ম, বিলম্ব ও বিভিন্ন অবৈধ কৌশল শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তাকে দুর্বল করে তুলছে।

---

[20] এছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানের রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ১৪-তে বলা হয়েছে যে, *"রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতী (মেহনতি) মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে-এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা"*। অর্থাৎ রাষ্ট্র কৃষক ও শ্রমিকসহ জনগণের শোষণমুক্তি নিশ্চিত করবে এবং সমাজের সকল শ্রেণির ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ করবে।

বেশিরভাগ শ্রমিক ন্যূনতম মজুরি পেয়ে থাকলেও সেটি দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকায় তারা আর্থিক সংকটে ভুগছেন। শ্রমিকদের অনেকের আয় দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকে, বিশেষ করে কৃষি, চা শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, রিকশা শ্রমিক এবং গৃহ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই চিত্র প্রকট। কম মজুরির কারণে শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে, যা তাদের জীবনমানের ওপর গুরুতর প্রভাব ফেলে। বিশেষত, সেক্টরভিত্তিক মজুরির অনুপস্থিতি শ্রমিকদের আয়কে অনিশ্চিত করে তুলেছে। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে মজুরির অসামঞ্জস্যতা এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যও একটি বড় সমস্যা। অনেক সেক্টরে এখনো নির্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরি কাঠামো নেই। ফলে শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণ হয় মালিকপক্ষের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কেয়ার ওয়ার্কারস, গৃহশ্রমিক, রাইড শেয়ারিং কর্মী, গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মী এবং হকারদের মতো পেশায় কর্মরত শ্রমিকরা নির্দিষ্ট ন্যূনতম মজুরির অভাবে সবসময় আর্থিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় থাকেন।

শ্রম সংস্কারের মৌলিক লক্ষ্য দরিদ্র শ্রমিকশ্রেণিকে সচ্ছল শ্রমিক শ্রেণিতে রূপান্তর করা এবং একটি মর্যাদাপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণ করা। এই লক্ষ্য পূরণের মূল উপায় হলো সমাজে ধন বৈষম্য কমানো ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা, একই সঙ্গে মজুরি বৈষম্য হ্রাস। এই বিষয়ে একটি জাতীয় ঐক্যমত্য প্রয়োজন। কেননা প্রসাধনমূলক সংস্কার মধ্যমেয়াদে জাতীয় বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। সাংবিধানিক অঙ্গীকার এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার সুস্পষ্ট।[21]

তথাকথিত নিম্ন মজুরি ভিত্তিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতার উপর নিরভিরশীলতার কারণে ন্যায্য মজুরি থেকে শ্রমিক বঞ্চিত হচ্ছে, যার প্রভাব দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ভঙ্গুরতায় প্রতিফলিত হচ্ছে। শ্রম জগতের সংস্কারের আরেকটি মৌলিক লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিম্ন মজুরি ভিত্তিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা থেকে বেরিয়ে আসা। প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে শিক্ষা, উদ্ভাবন ও দক্ষতা উন্নয়নে উল্লম্ফন মূলক কর্মসূচি গ্রহণ আবশ্যক।

বাংলাদেশের ১৮ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছেন। তাঁদের মধ্যে অতি দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করছেন ৫ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ। ইউএনডিপি-র বৈশ্বিক বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক-২০২৪-এ ২০২২–২৩ বছর পর্যন্ত এক দশকের বেশি সময়ের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই প্রতিবেদন মানুষের পর্যাপ্ত আবাসন, পয়োনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, ভোজ্যতেল ও পুষ্টির মতো অতি প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিরাজমান পরিস্থিতিকে ঘাটতি হিসেবে নেয়া হয়েছে। আর এই প্রতিটি উপাদানের সাথে মজুরি প্রাপ্তির বিষয়টির ওতপ্রোত সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলাদেশে সম্পদের ব্যবধান, অর্থাৎ ধনী-গরীবের ব্যবধান স্বাধীনতার পর থেকে আরও বিস্তৃত হয়েছে, যা জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বিপরীত। বাংলাদেশে এখন যে আয়-বৈষম্য বিরাজ করছে, তা রীতিমতো ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। ১৯৭৩ সালের জরিপের ফল অনুযায়ী বাংলাদেশের আয় বৈষম্য পরিমাপক গিনি সহগের মান ছিল ০.৩৬ এবং দেশের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের আয় ঐ সময়ে দেশের মোট আয়ের ২৮.৪% ছিল। ২০১৬ সালে গিনি সহগ বেড়ে দাঁড়ায় ০.৪৮৩ এবং দেশের ১০ শতাংশ শীর্ষ ধনীর দখলে ছিল মোট আয়ের ৩৮%। ২০২১ সালে দেশে শীর্ষ ১০ শতাংশ ধনীর আয় মোট জাতীয় আয়ের ৪৪%। একই সময় দেশের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনীর আয় ১৬.৩.%। অন্যদিকে পিছিয়ে থাকা ৫০% মানুষের আয় ১৭.১.%। অর্থাৎ শীর্ষ আয়ের মানুষের সঙ্গে নিম্ন আয়ের মানুষের আয়ের ব্যবধান আকাশচুম্বী।[22] ২০২১ সালে গিনি সহগ ০.৪৯৯-এ পৌঁছে যায় এবং দেশের ১০ শতাংশ শীর্ষ ধনীর কাছে জমা বেড়ে হয়েছে মোট আয়ের ৪০.৯২%। আরও ভয়াবহ হলো দেশের সবচেয়ে ধনী ৫% মানুষের আয় এখন দেশের মোট আয়ের প্রায় ৩০%। অর্থাৎ দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ আয় যাচ্ছে দেশের ধনী ৩০ শতাংশ মানুষের হাতে এবং বাকি ৭০ শতাংশ মানুষের আয় মোট আয়ের অবশিষ্ট ১ ভাগ। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ এখন উচ্চ আয় বৈষম্যের দেশ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। গিনি সহগের মান ০.৫০ পয়েন্ট পেরোলেই একটি দেশকে উচ্চ বৈষম্যের দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[23] এই আয় বৈষম্যের মূল কারণ অর্থনীতিতে অলিগার্ক শ্রেণির উদ্ভব এবং মজুরি বৈষম্য।

---

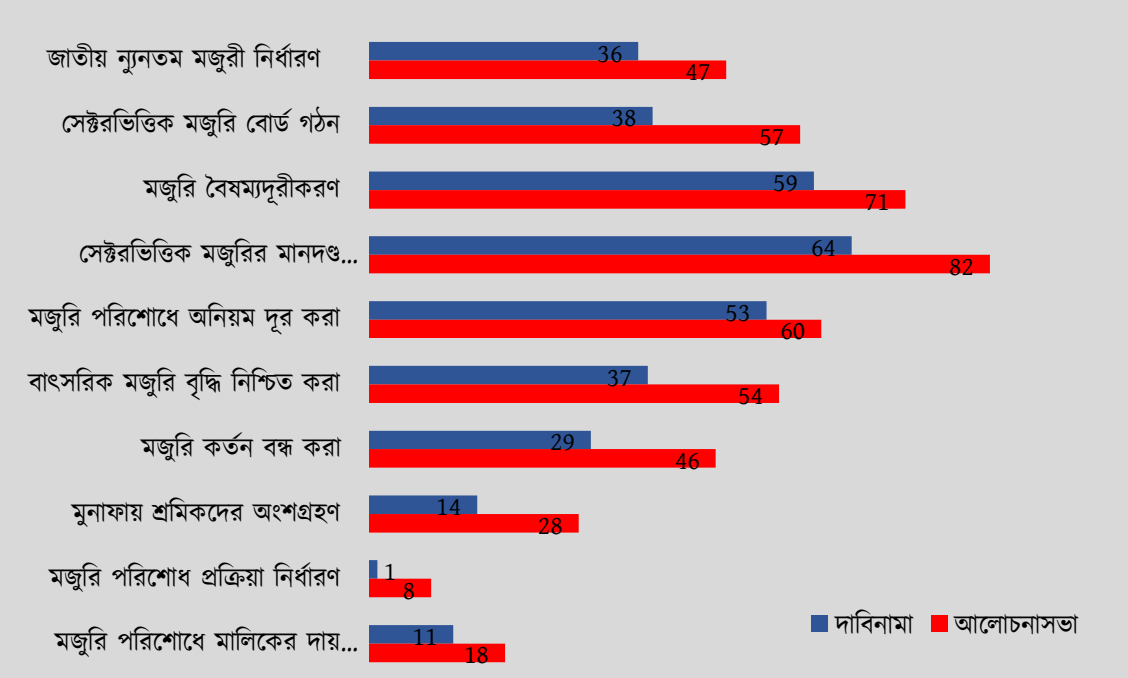
[21] জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৮: সম্মানজনক কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিঃ সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।

[22] World Inequality Database (2021) World Inequality Report 2022 - WID - World Inequality Database https://wid.world/news-article/world-inequality-report-2022/#:~:text=The%20World%20Inequality%20Report%202022%20presents%20the%20most,than%20one%20hundred%20researchers%20from%20around%20the%20world.

[23] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩) হাউজহোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার সার্ভে (HIES)-২০২২

শ্রমিকদের মজুরি বৈষম্য শুধু ব্যক্তি শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার উপরই প্রভাব ফেলে না, এটি দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং সামাজিক ভারসাম্যের ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। বৈষম্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কিছু তৎপরতা নেয়া আশু প্রয়োজন, বাংলাদেশ 'বৈষম্য ফাঁদে' আটকা পড়তে পারে এবং বৈষম্য হ্রাস করা কঠিন হয়ে পড়তে পারে। আর 'বৈষম্য ফাঁদ' বাংলাদেশকে 'মধ্যম আয়ের ফাঁদে' ফেলতে পারে।[24]

চিত্র: ৩.২১ অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং পেশকৃত দাবিনামার প্রেক্ষিতে মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা বিষয়ক শ্রম সংস্কার অধিক্ষেত্র (শতাংশ)



শ্রম খাতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য অংশীজনের সাথে কমিশনের সভা এবং বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত দাবিনামায় শ্রমিকদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের বিষয়ে মতামত দেয়া হয়েছে। এই পর্যালোচনায় দেখা যায় মজুরি ও এর ন্যায্যতা নিশ্চিতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ; সেক্টরভিত্তিক মজুরি বোর্ড গঠন; মজুরি বৈষম্যদূরীকরণ; সেক্টরভিত্তিক মজুরির মানদণ্ড নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন; মজুরি পরিশোধে অনিয়ম দূর করা; বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধি নিশ্চিত করা; মজুরি কর্তন বন্ধ করা; মুনাফায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ; মজুরি পরিশোধ প্রক্রিয়া নির্ধারণ; এবং মজুরি পরিশোধে মালিকের দায় নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ করা হয়েছে।

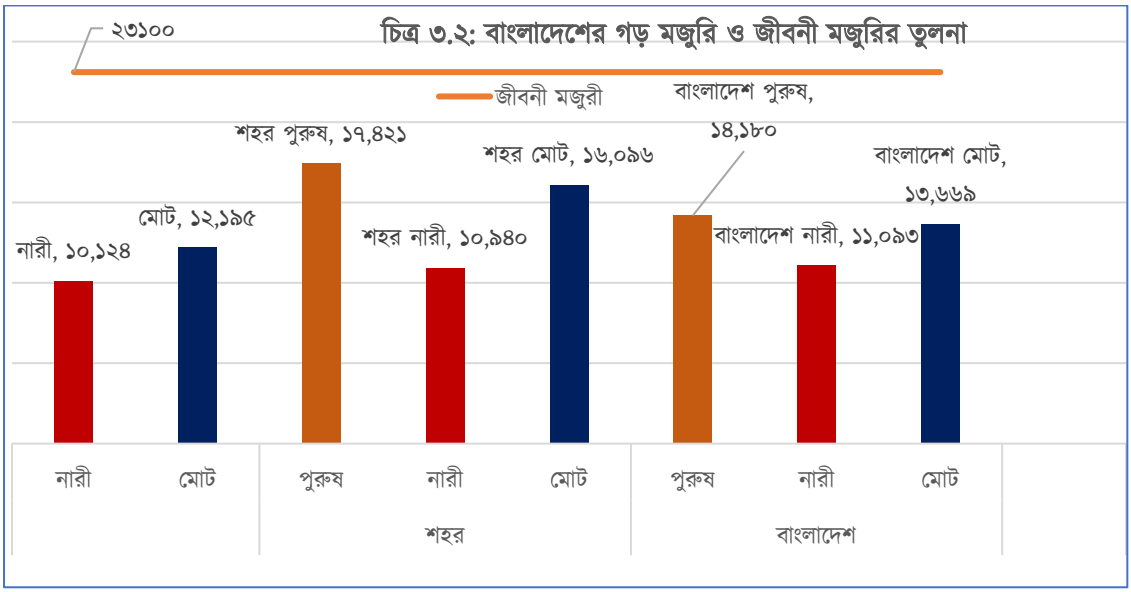
৩.২.১ সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি এবং খাত, অঞ্চল ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে গড় মজুরিতে বাংলাদেশ সবার পেছনে। শুধু তা-ই নয়, এই অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশে ন্যূনতম মজুরি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দারিদ্র্য সীমার নিচে। ক্রয়ক্ষমতার বিবেচনায় ২০১৯ সালে বাংলাদেশের মাসিক ন্যূনতম মজুরি ছিল ৪,০৮০ টাকা (৪৮ ডলার)। তবে তৈরি পোশাক খাতের মজুরি ছিল এর দ্বিগুণ।[25] 'লিভিং ওয়েজ, লিভিং প্ল্যানেট' কোয়ালিশনের গবেষণা অনুযায়ী ২০২৪ সালে ঢাকা শহরের জীবনী মজুরি

[24] Islam N (2014) Will Ineuqlity Lead China to the Middle Income Trap? Frontier Economics of China, 9(3), 398-437.

[25] প্রথম আলো (২০২০) আই এল ও প্রতিবেদন মজুরিতে সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ | প্রথম আলো ডিসেম্বর ০৩, ২০২০ Retrived on March 17, 2025 ।https://www.prothomalo.com/business/analysis/%E0%A6%AE%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%9A%E0%A7%87%E0%A7%9F%E0%A7%87-

(living wage) ২৭,৯০০ টাকা হওয়া উচিত। স্যাটেলাইট শহরগুলিতে এই মজুরি হওয়া উচিত ২৩,১০০ টাকা। এই মজুরি হিসাব করা হয়েছে ৪ জনের পরিবার ধরে, পরিবারে গড় উপার্জনক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ১.৫৮ হিসেবে। এই প্রতিষ্ঠানের মতে, ৪ জনের পরিবারের ন্যূনতম শোভন জীবনধারণের জন্য ঢাকায় ব্যয় ৪৪,০৮১ টাকা। স্যাটেলাইট শহরগুলিতে এই ব্যয় ৩৬,৪৯৯ টাকা।[26] অথচ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে (২০২২) বাংলাদেশে গড় মজুরি/বেতন ১৩,৬৬৯ টাকা[27] এই মজুরি জীবনী মজুরির অর্ধেক। পেশা ভিত্তিক গড় মজুরি অঞ্চল (শহর ও গ্রাম) ভেদে ও লিঙ্গ ভেদে কত, তা চিত্র ৩.২-এ দেখানো হয়েছে।



সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩) বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২ এবং Global Living Wage Coalition (2025) Benchmark Report: Living Wage Report and 2024 Update for Dhaka and Satellite Cities, Bangladesh

বাংলাদেশ সাধারণত যেসব দেশের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে, তেমন অনেক দেশের চেয়েও বাংলাদেশে ন্যূনতম মজুরি কম।[28] সারাদেশে নারী ও পুরুষ শ্রমিকের গড় মজুরিতে পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে (২০২২) বাংলাদেশে পুরুষের গড় মজুরি/বেতন ১৪,১৮০ টাকা, নারীর ক্ষেত্রে ১১,০৯৩ টাকা, পার্থক্য ৩,০৮৭ টাকা। এর মধ্যে পোশাক শিল্পে মজুরি বৈষম্য সব থেকে বেশি। অঞ্চল ভেদে নারী পোশাক শ্রমিকদের মজুরিতে পার্থক্য রয়েছে ৫১ থেকে ৬০ শতাংশ। নারীদের পাশাপাশি পুরুষদের মজুরিতেও রয়েছে বিস্তর ফারাক। অঞ্চলভেদে নারী ও পুরুষ কর্মীর মজুরির পার্থক্য ৯ হাজার ৪০৮ টাকা। নারী পোশাক শ্রমিকদের পাশাপাশি পুরুষদের মজুরিতেও পার্থক্য উঠে এসেছে। অঞ্চলভেদে পুরুষকর্মীদের মজুরির পার্থক্য ৭ হাজার ৯৪৭ থেকে ১৪ হাজার ৪০০ টাকা। সানেমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঢাকায় জীবনযাপনের জন্য শ্রমিকদের মজুরি ১৯ হাজার ২০০ টাকা থেকে ২২ হাজার ৯০০ টাকা হওয়া দরকার।[29]

%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A7%87-%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6

[26] Global Living Wage Coalition (2025) Benchmark Report: Living Wage Report and 2024 Update for Dhaka and Satellite Cities, Bangladesh.

[27] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২৩) বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২, পৃষ্ঠা ৯৪।

[28] যেমন; ভিয়েতনামের ন্যূনতম মজুরি ১৬২ ডলার, ২০২৩ সালে যা বেড়েছে ৫ দশমিক ৭ শতাংশ। এ ছাড়া এশিয়ার দেশ ফিলিপাইনের ন্যূনতম মজুরি ১৪১ ডলার; এ বছর বেড়েছে ৯ শতাংশ। ইন্দোনেশিয়ার ন্যূনতম মজুরি ১৭৩ ডলার। অন্যদিকে বাংলাদেশে সেখানে প্রকৃত মজুরি/বেতন (সবখাত ও পেশা মিলে) গড় মাত্র ১২৫ ডলার। ন্যূনতম মজুরির হিসেবে তা মাত্র ৪৮ ডলার। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি মজুরি দেওয়া হয় ইউরোপের দেশ লুক্সেমবার্গে—মাসিক ২ হাজার ১৪০ ডলার। এরপর দ্বিতীয় স্থানে আছে অস্ট্রেলিয়া, সে দেশের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২ হাজার ২২ ডলার; প্রথম আলো (২০২৪) বেশি মজুরি দেওয়া হয় কোন কোন দেশে, বাংলাদেশের অবস্থান কী | প্রথম আলো https://www.prothomalo.com/business/economics/e5i1xs13uc

[29] SANEM AND MFO (2021) Joint Survey 2020.

বাংলাদেশে কোনো সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা নেই। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশ মজুরি বোর্ড কিছু কিছু খাতে ন্যূনতম মজুরি বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করেছে। মজুরি বোর্ড ঘোষিত বিভিন্ন খাতের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির তালিকা থেকে মজুরির যে হার দেখা যায়, তা অবিশ্বাস্য ভাবে কম। ঘোষিত খাতগুলির ন্যূনতম মজুরির হার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ৩৯টি খাতের ২২টিতেই ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি দারিদ্র্য সীমা থেকে কম (চিত্র ৩.২.১ ও ৩.২.২)।[30] এই তালিকা অনুসারে স' মিলে নিম্নতম মজুরি সব থেকে বেশি (১৭,৯০০ টাকা), এরপর রয়েছে নির্মাণ ও আসবাবপত্র শিল্পে (১৬,২৪০ টাকা), তার জাহাজ ভাঙা শিল্পে (১৬,০০০ টাকা)। অনেক খাতের মজুরি গত চল্লিশ বছরেও হাল নাগাদ করা হয়নি। অনেকগুলি খাতে শ্রমিকের পাশাপাশি কর্মচারীর ন্যূনতম মজুরিও ঘোষিত হয়েছে (চিত্র ৪.২.৩)। এখানেও ১৮টি খাতে কর্মচারীর মজুরি দারিদ্র্য সীমার নিচে। শ্রমিক-কর্মচারী উভয়ের জন্য সবখাতের ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি জীবনী মজুরির (living wage) অনেক নিচে। ন্যূনতম মজুরির বিধান লঙ্ঘন করলে যে জরিমানা করা হয়, তা এতো অপ্রতুল যে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করে না। নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাঁরা উৎপাদন কোটা পূরণ ও রপ্তানির সময়সীমা ঠিক রাখতে শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় কাজ করালেও যথাযথ ওভারটাইম ভাতা দেন না। অনেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা শ্রমিকের পাওনা পরিশোধে বিলম্ব করেন, অথবা পূর্ণাঙ্গ ছুটির সুবিধাদি পরিশোধে অস্বীকৃতি জানান।[31] বিশ্লেষণে আরও দেখা যায়, ৪৪টি খাতের মধ্যে ৩৪টি খাতে ন্যূনতম মজুরি ঘোষিত হয়েছে ২০১৩ সাল থেকে)। উল্লেখ্য, ঘোষিত মজুরিসমূহ বিভিন্ন বছরে ঘোষিত হয়েছে এবং তা ভোক্তা মূল্য সুচক দিয়ে সমন্বয় করা হয় নি। তা করলে এই মজুরির প্রায় সবই দারিদ্র্য সীমার নিচে চলে যাবে।

কাজের পরিমাণ ও মান পুরুষদের মতো বা ক্ষেত্রবিশেষে বেশি হলেও মজুরি বৈষম্য চরমে চাতালের নারী শ্রমিকদের। খাদ্য ও কৃষিসমৃদ্ধ অঞ্চল শেরপুর, দিনাজপুর, খুলনা ছোট-বড় যে কোনো চাতালে প্রায় ৮০ ভাগ নারী শ্রমিক কাজ করেন। চাতালগুলিতে শত শত নারী শ্রমিক কঠোর পরিশ্রম করলেও দিনে মাত্র ১৫০ টাকা থেকে ২০০ টাকা মজুরি পান। অথচ সমপরিমাণ শ্রম দিয়ে পুরুষরা ৫০০ থেকে ৬০০ টাকা মজুরি পান।[32] একটি সর্বজনীন ন্যূনতম জাতীয় মজুরি নির্ধারণ ছাড়া অতি নিম্ন মজুরির এই ধারা থেকে বাংলাদেশের পক্ষে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়।

জীবন ধারণ উপযোগী মজুরি (living wage) ও প্রকৃত গড় মজুরি তুলনা করলে বোঝা যায়, কম মজুরিতে জীবন যাপনের জন্য শ্রমিক ও তার পারিবারিক জীবনে কী ধরনের প্রভাব পড়েছে। তার মধ্যে রয়েছে চরম দারিদ্র্যে নিকৃষ্ট জীবনধারণ, অপুষ্টি ও ঋণ চক্র। যদিও পুষ্টিতে বাংলাদেশের অর্জন অভূতপূর্ব,[33] নিম্ন মজুরি ও চরম বেকারত্ব যে দারিদ্র্য সৃষ্টি করছে, তার প্রভাবে বাংলাদেশ একটি অপুষ্টিতে ভোগা জাতিতে পরিণত হয়েছে। এর ফলে শিশুর মেধা বিকাশ ও সুস্থ সবল কর্মক্ষম জনশক্তি সৃষ্টিতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। অপুষ্টির কারণে জাতীয় উৎপাদনশীলতা ২০ শতাংশ কম। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকেরা দৈনিক মাত্র ১২০ টাকার বিনিময়ে ১ হাজার ৯৫০ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করছেন। অথচ ২০১৬ সালের খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী, দারিদ্র্য সীমার ওপরে উঠতে গেলে একজন মানুষকে দিনে ২ হাজার ১২২ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।

আয় বৈষম্যের সাথে পুষ্টি বৈষম্য সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে আশঙ্কাজনকভাবে পুষ্টির বৈষম্যে ব্যবধানও বেড়ে চলেছে এবং পুষ্টির এই সাফল্য শ্রেণি, অঞ্চল ও নর–নারীভেদে অসম। যেমন; খর্বকায়ত্ব বা বয়স অনুপাতে উচ্চতার গড় সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ভালো, অথচ শ্রেণি ও অঞ্চলভেদে এ ক্ষেত্রে বড় রকমের বৈষম্য থেকে যাচ্ছে। আর্থসামাজিক

---

[30] চিত্র ৪.১.২ ও ৪.২.৩-এ পাঁচটি খাতের ঘোষিত মজুরি প্রদর্শিত হয় নি। এইখাতের মজুরি পিস রেটে অথবা দিন হিসেবে প্রদত্ত হয়।

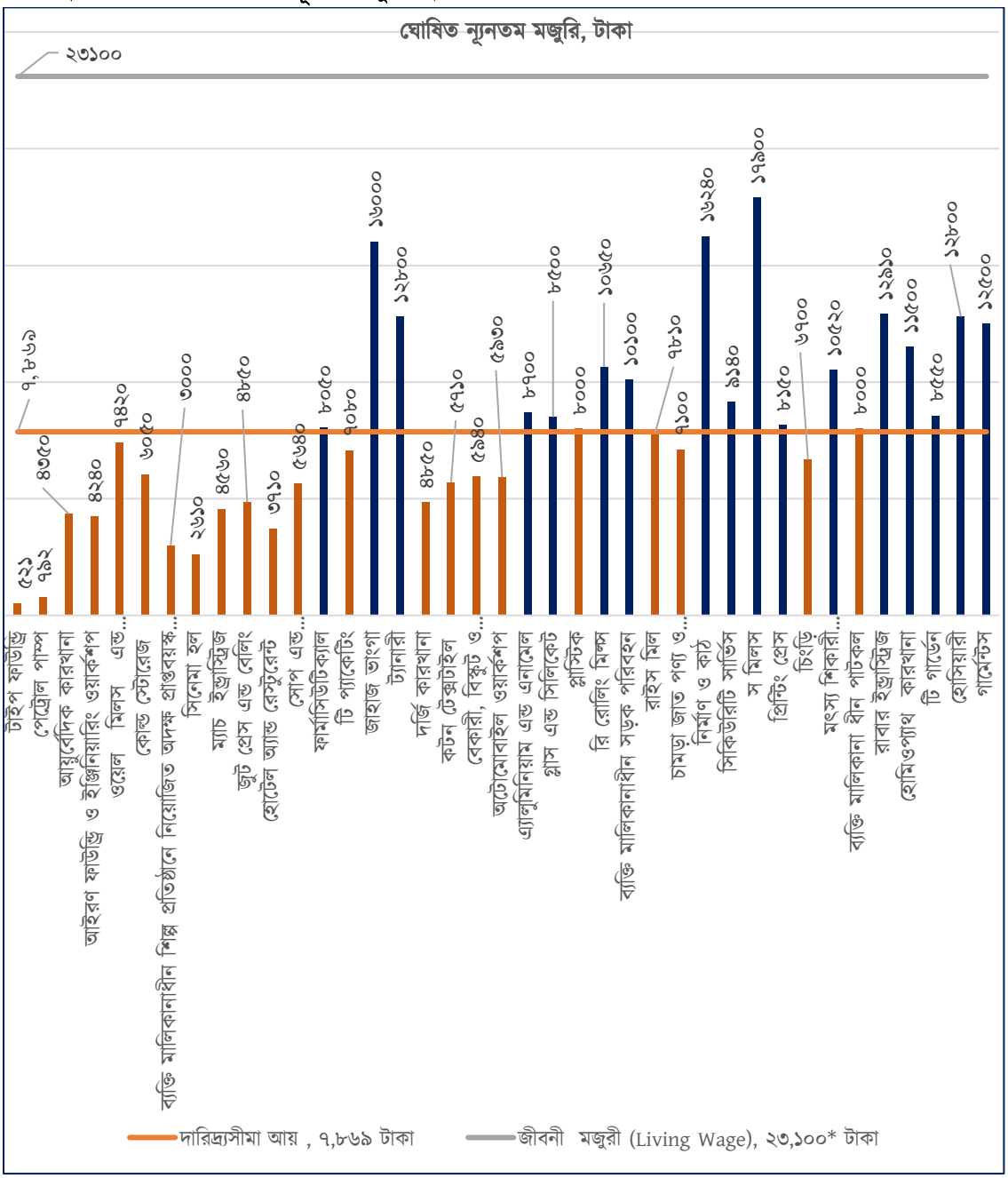
[31] সিপিডি, ২০২৫। শ্রমিকের জীবনযাত্রা, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা ও অধিকার সম্পর্কিত ইস্যুসমূহের সংস্কার: অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্য একটি করণীয় এজেন্ডা, পৃষ্ঠা ২।

[32] "বেতন বৈষম্য আর কম মজুরির চাপে শ্রমিক." (2023, December 10). *Bangla Tribune.*

[33] গত দুই দশকে খাদ্য উৎপাদনে উল্লম্ফন ঘটেছে এবং পুষ্টিসম্পন্ন খাদ্যাভ্যাসের সূচনা হয়েছে। আর এর ফলে সাধারণভাবে জনগোষ্ঠীর পুষ্টি অবস্থারও উন্নয়ন ঘটেছে অনেকটাই। শিশুর পুষ্টির ক্ষেত্রে খর্বকায়ত্ব যেমন কমেছে, মায়েদের পুষ্টিতেও এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন। ২০০৪ সালে শিশুর অপুষ্টি বা খর্বকায়ত্বের হার ছিলে ৫১ শতাংশ। ২০১৭-১৮ সালে এসে এ হার কমে হয়েছে ৩১ শতাংশ। একই সময়ে এসে অপুষ্ট নারীর শতকরা হার ২০০৭ সালের ৩০ শতাংশ থেকে কমে হয়েছে মাত্র ১২ শতাংশ। আগে ক্ষুধা নিবৃত্তিতে ভাতই ছিল একমাত্র উপাদান। এখন সবজি, মাছ বা ডালের মতো পুষ্টিকর খাবার ভাতের পাশে জায়গা করে নিয়েছে। সূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৯) বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-১৮।

অবস্থানে পিছিয়ে থাকাদের মধ্যে খর্বকায় শিশুর সংখ্যা প্রতি ১০ জনে ৪ জনের বেশি। অথচ উচ্চ উপার্জনক্ষম স্তরে এই সংখ্যা দুইয়ের নিচে।

চিত্র ৩.২.১ সরকার ঘোষিত শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরির হাল[34]



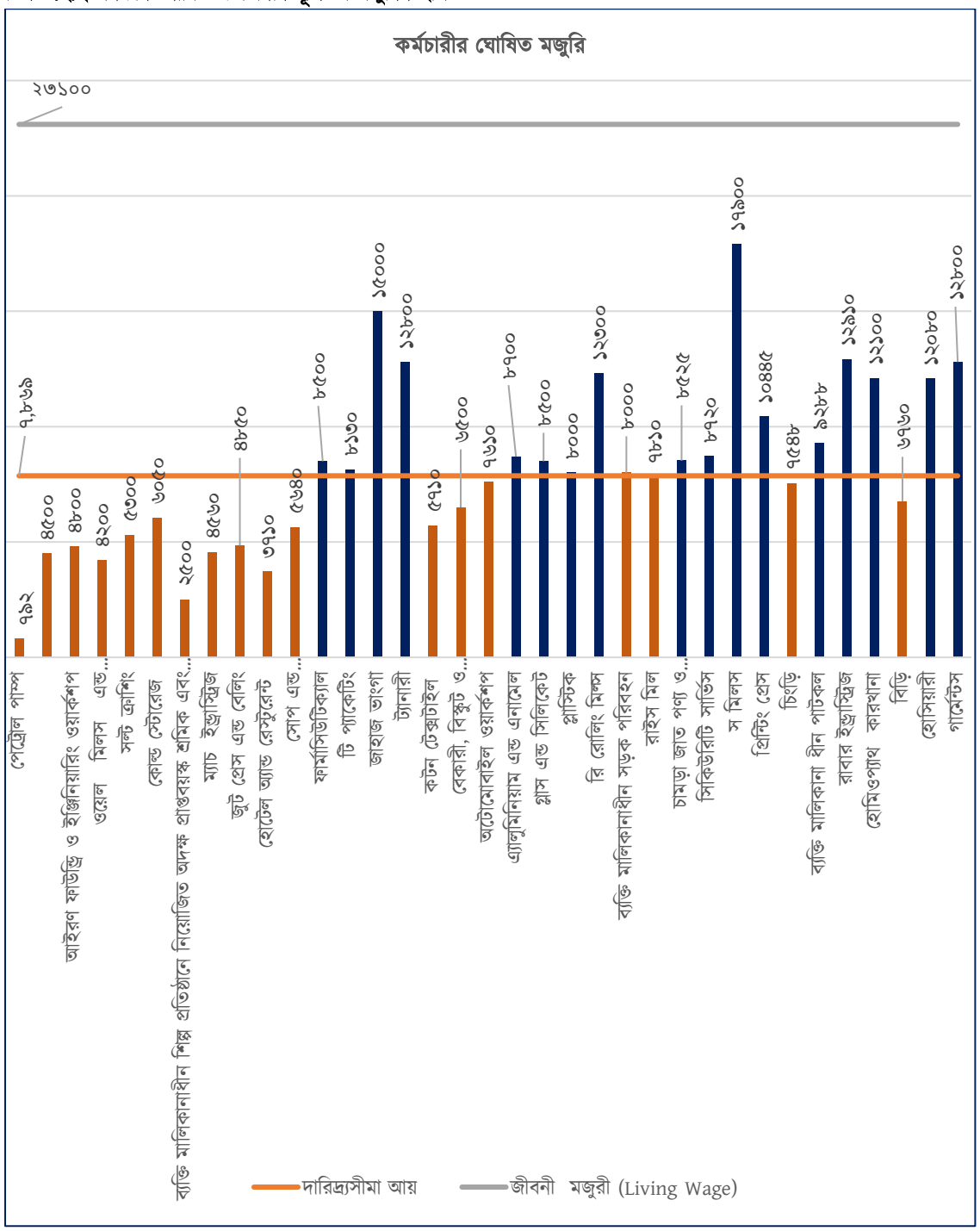
তথ্য সূত্র: Bangladesh Minimum Wage Board নিম্নতম-মজুরি-হার-(সর্বশেষ-ঘোষিত) Retrieved on March 17, 2025

নিম্ন আয়ের পরিবারের মধ্যে প্রতি ১০ জনে মাত্র দুজন শিশু বৈচিত্র্যময় খাবার খেতে পারে। বিপরীতে উচ্চ আয়ের পরিবারে প্রতি ১০ জনে ৫ জনের বেশি শিশু এ সুযোগ পায়। ভিটামিন এ এবং অন্যান্য পুষ্টিসম্পন্ন খাবার নিম্ন আয়ের পরিবারের কাছে সুলভ নয়। নারীদের স্বাস্থ্যচিত্রও একই। উচ্চ আয়ের পরিবারে মায়েদের পুষ্টি অবস্থা নিম্ন আয়ের পরিবারের চেয়ে উন্নত।[35]

[34] ঘোষিত মজুরিসমূহ ভোক্তা মুল্য সূচক দিয়ে সমন্বিত নয়। জীবনী মজুরির অঙ্ক ঢাকার বাইরের ব্যয়ের হিসাব ২৩, ১০০ টাকা ধরে করে হয়েছে, যদিও ঢাকার ক্ষেত্রে এই মজুরি ২৭,৯০০ টাকা

[35] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০১৯) বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ ২০১৭-১৮।

চিত্র ৩.২.২ সরকার ঘোষিত কর্মচারীর ন্যূনতম মজুরির হাল [36]



সুত্রঃ Bangladesh Minimum Wage Board (2025) নিম্নতম-মজুরি-হার-(সর্বশেষ-ঘোষিত) Retrieved on March 17, 2025

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সর্বশেষ শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে (২০২২) গড় আয়ের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, যার ব্যয়ের হিসাব পরে দেয়া হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক ঋণগ্রস্ত। সরকারি পরিসংখ্যানেও তার প্রমাণ মেলে যদিও শুধু শ্রমিকের ঋণ কত তার তথ্য নেই। বাংলাদেশের ৩৭.০৩% পরিবার ঋণগ্রস্ত। এই ঋণ প্রাতিষ্ঠানিক ও

[36] ঘোষিত মজুরিসমূহ ভোক্তা মুল্য সূচক দিয়ে সমন্বিত নয়। জীবনী মজুরির অঙ্ক ঢাকার বাইরের ব্যয়ের হিসাব ২৩, ১০০ টাকা ধরে করে হয়েছে, যদিও ঢাকার ক্ষেত্রে এই মজুরি ২৭,৯০০ টাকা

অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস থেকে নেয়া। ২০১০ সালের খানা আয় ও ব্যয় জরিপের হিসেবে গ্রামের একজন নাগরিকের গড় ঋণ ছিল ২১,৮০৪, যা ২০১৬-জরিপ অনুযায়ী ৩১,৭৪৩ টাকা, ২০২২-এ তা দাঁড়িয়েছে ৪১,৯২১ টাকায়। অর্থাৎ ২০১০-এর তুলনায় ২০২২-এ গড় ঋণ বেড়েছে ৯২.২৭%। অন্যদিকে ২০১০-এ শহরের পরিবার প্রতি গড় ঋণ ছিল ৫৪,১২২ টাকা, ২০১৬-তে ৫৯,৭২৮ টাকা, যা ২০২২-এ এসে লাফিয়ে বাড়ে, ১৩১,৩৯৫ টাকা। অর্থাৎ ২০১০ এর তুলনায় তা বেড়েছে ১৪৩%।[37]

অর্থনীতির তত্ত্বে নিম্ন মজুরি প্রভাব সম্পর্কে বলা হয়েছে। নিম্ন মজুরির কারণে উৎপাদনশীলতা কমে এবং কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা কম হয়। ন্যূনতম মজুরি থাকলে বাজারে টিকে থাকতে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি হয় যা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে প্রণোদনা হিসেবে কাজ করে। এছাড়া ন্যূনতম মজুরি বাড়লে ভোক্তা ব্যয় বাড়ে। এর ফলে অর্থনীতিতে চাহিদা বাড়ায় উৎপাদন বাড়ানোর প্রণোদনা সৃষ্টি হয়। মৌলিক অর্থনীতির সূত্রে বলা হয়, কর্ম বাজারে প্রবেশের প্রণোদনা সৃষ্টি হয় ও উৎপাদনশীলতার উপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরির বিপক্ষে যারা যুক্তি দেন, তাঁদের মতে এর ফলে শ্রমিক ছাঁটাই হতে পারে, প্রতিষ্ঠানের অটোমেশনে ঝোঁক বাড়তে পারে এবং পণ্য ও সেবার দাম বাড়ে।[38]

শিল্প-কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের প্রধান কারণগুলি হচ্ছে মজুরি ও ওভারটাইম বোনাস পরিশোধে বিলম্ব (বিশেষত ঈদ কেন্দ্রিক) (৭৬.৭ শতাংশ), মজুরি (বা পিস রেট) বৃদ্ধির দাবি (৫২.২ শতাংশ), হঠাৎ ছাঁটাই বা কর্মহীন (কারখানা লে-অফ বা ঢাকা শহরের বাইরে স্থানান্তরজনিত ২৯.৩ শতাংশ), দীর্ঘ সময়ের বকেয়া পারিশ্রমিক (২১.৩ শতাংশ), ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দ্বারা মৌখিক ও শারীরিক অসদাচরণ (২০ শতাংশ) এবং কর্মক্ষেত্রে মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ দাবি (৭.২ শতাংশ)। অর্থাৎ ৬টি কারণের তিনটি-ই মজুরি সংক্রান্ত। শ্রমিকদের অসন্তোষ বহিঃপ্রকাশের ধরনগুলির মধ্যে সাময়িক কর্মবিরতি (৮৭.৯ শতাংশ), বিক্ষোভ-প্রতিবাদ সমাবেশ (৪৫.৩ শতাংশ), সড়ক-কারখানা অবরোধ (৩৯.৯ শতাংশ), ধর্মঘট (৩৩.৫ শতাংশ), মানববন্ধন (২৬.৪ শতাংশ) ও সহিংসতা-ভাঙচুর (৯.১ শতাংশ) উল্লেখযোগ্য।[39] বিজিএমইএ-র ভাষ্যমতে ২০২৪-এর শ্রমিক অসন্তোষে তৈরি পোশাকশিল্পে প্রায় চার হাজার ৮০০ কোটি টাকার (৪০০ মিলিয়ন ডলার) ক্ষতি হয়েছে। আর্থিক মূল্যে তা ৫,৬৪৭,০৫৮ জন শ্রমিকের এক মাসের, ৪৭০,৫৮৮ জন শ্রমিকের এক বছরের সম পরিমাণ ন্যূনতম ৮,৫০০ টাকা মজুরির সমান। যদি জীবন ধারণ উপযোগী মজুরি ২৩,১০০ ধরা হয়, তাহলে এই ক্ষতির অর্থে ২,০৭৭,৯২২ জন শ্রমিকের মজুরি দেয়া সম্ভব, ১৭৩,১৬০ জন শ্রমিকের ১ বছরের মজুরি দেয়া সম্ভব।[40] ২০১৭ সালে গাজীপুরে ১৩৯টি, নারায়ণগঞ্জে ৯১টি, চট্টগ্রামে ১৬টি এবং ২০১৮ সালের প্রথম চার মাসে গাজীপুরে ২৮টি ও চট্টগ্রামে সাতটি উৎপাদনমুখী কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সাধারণত সাব-কন্ট্রাক্ট ভিত্তিতে কাজ করা প্রায় ৫৭ শতাংশ ছোট-ক্ষুদ্র এবং ৪০ শতাংশ মাঝারি আকারের কারখানা বন্ধ হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তৈরি পোশাক কারখানা

---

[37] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২২) খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০২২। Retrived on March 17, 2025 https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/2023-04-13-09-35-ee41d2a35dcc47a94a595c88328458f4.pdf , পৃষ্ঠা ২৯।

[38] Maverick J.B (2025) What Are the Pros and Cons of Raising the Minimum Wage? Retrieved on march 17, 2025 https://www.investopedia.com/articles/markets-economy/090516/what-are-pros-and-cons-raising-minimum-wage.asp; US Bureau of Labour Statistics (2021) A $15 minimum wage changes more than just take-home pay : Monthly Labor Review: U.S. Bureau of Labor Statistics, Retrieved on March 17, 2027 https://www.bls.gov/opub/mlr/2021/beyond-bls/a-15-minimum-wage-changes-more-than-just-take-home-pay.htm; Pettinger T (2019) Effect of minimum wage on economic growth, inflation and AD/AS - Economics Help. Retrieved on March 17, 2027 https://www.economicshelp.org/blog/11503/labour-markets/effect-of-minimum-wage-on-adas/

[39] ইসলাম আ ও আলম খ (২০২০) শিল্প শ্রমিক অসন্তোষ পরিস্থিতি ও করণীয় | বণিক বার্তা , ৩০ এপ্রিল ২০২০। Retreived from https://www.bonikbarta.com/home/news_description/228451/%E0%A6%B6%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%AA-%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%85%E0%A6%B8%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8B%E0%A6%B7-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BF-%E0%A6%93-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%80%E0%A7%9F

[40] Bangla News24 (2024) শ্রমিক অসন্তোষে পোশাকশিল্পে ক্ষতি ৪৮০০ কোটি, অক্টোবর ১৯, ২০২৪। Retrived on March 17, 2024. https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/1410244.details

(আরএমজি) বন্ধ হয়, যা প্রায় ৮৮ শতাংশ। তবে অপর্যাপ্ত ক্রয়াদেশজনিত আর্থিক সংকট থেকে অধিকাংশ (প্রায় ৮৯ শতাংশ) কারখানা বন্ধ হয়।[41]

ব্যাপক বেকারত্বের সঙ্গে বিদ্যমান মজুরি কাঠামো ও বৈষম্য একটি অসহনীয় অবস্থার ইঙ্গিত বহন করে, শ্রমাখাতের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ তার একটি প্রকাশ মাত্র। এই অসন্তোষ বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিতিশীলতার অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। তাই শ্রম সংস্কার কমিশনের মজুরি সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলির আশু বাস্তবায়নের পদক্ষেপ জাতীয় অর্থনীতির ও রাজনীতির টেকসই পরিবর্তনের জন্য জরুরি। সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরির গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড নির্ধারণ করা শ্রম সংস্কারের জরুরি করণীয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। এই মানদণ্ডের ভিত্তিতে ঘোষিত সর্বজনীন জাতীয় মজুরি বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত সকল শ্রমিকের জন্য প্রযোজ্য হবে।

সর্বজনীন জাতীয়, খাত, অঞ্চল ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি বিষয়ে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি

- বাংলাদেশের সকল শ্রমিকের জন্য একটি সার্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা, যার ভিত্তিতে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিকসহ সকল খাতের নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত হবে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি অর্থনীতির সকল খাত এবং সরকারি-বেসরকারি, দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত এবং ব্যক্তি পর্যায়ে নিয়োজিত শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণের ন্যূনতম মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হবে।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে মজুরির মানদণ্ড না থাকায়, এই খাতে মজুরি বৈষম্য দূর করতে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক।
- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মর্যাদাকর জীবনযাপন উপযোগী মজুরি/বেতনের (living wage) ধারণাকে ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা।
- সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি প্রতি তিন বছর পরপর মূল্যায়ন ও পুনর্নির্ধারণ করা এবং প্রতি বছর সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার মান বিবেচনায় সমন্বয় করা।

খ) সেক্টর/খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি

- জাতীয় ন্যূনতম মজুরিকে ভিত্তি হিসেবে রেখে কাজের প্রকৃতি, খাতভিত্তিক চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ, ঝুঁকি এবং অঞ্চলভেদে বৈচিত্র্য বিবেচনায় বিশেষ খাত ও পেশার জন্য পৃথক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি কোনো অবস্থাতেই জাতীয় ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হবে না; বরং তা অবশ্যই জাতীয় ন্যূনতম মজুরির সম পরিমাণ বা তার চেয়ে অধিক হবে।
- বিশেষ খাত ও পেশার ক্ষেত্রে ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি জাতীয় ন্যূনতম মজুরির থেকে কম হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় ন্যূনতম মজুরির সম পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে।

গ) যৌথ দরকষাকষি

বিশেষ খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের আইনগত যৌথ দরকষাকষির অধিকার বহাল রাখা। যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি জাতীয় বা খাতভিত্তিক ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম হতে পারবে না।

ঘ) মজুরি নির্ধারণে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য শ্রম, শ্রম অর্থনীতি ও মজুরি বিষয়ে অভিজ্ঞ/দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ এবং শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি স্থায়ী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠন করা।
- সেক্টর/খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য স্থায়ী জাতীয় মজুরি কমিশনের অধীনে এক বা একাধিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ কমিটি গঠন করা।

[41] Bangla News24 (2024) শ্রমিক অসন্তোষে পোশাকশিল্পে ক্ষতি ৪৮০০ কোটি, অক্টোবর ১৯, ২০২৪। Retrived on March 17, 2024. https://www.banglanews24.com/economics-business/news/bd/1410244.details

- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশনের কাঠামো ও কার্যপরিধিসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনগত সংস্কার/সংশোধন করা।
- মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে যৌথভাবে নিয়মিত সংলাপের আয়োজনের বিধান রাখা এবং ন্যায্য মজুরির সুফল বিষয়ে গবেষণা ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা।

ঙ) মজুরি বৈষম্য নিরসন

- মজুরি কাঠামোয় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে ভারসাম্য নিশ্চিত করা।
- সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে মজুরি বৈষম্য কমানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীসহ সকল শ্রমিকের জন্য সমান মজুরি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক করা।

জাতীয় অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ও শিল্পের উন্নয়নের সঙ্গে শ্রমিকের সার্বিক জীবনমানের উন্নয়ন যেন সংগতিপূর্ণ হয়, তা নিশ্চিত করা।

৩.২.২ মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড ও মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি

বাংলাদেশে অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অধিকাংশ খাতে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়নি। মজুরি নির্ধারণের বর্তমান কাঠামো যুগোপযোগী নয়, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে ন্যায্য মজুরি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ন্যূনতম মজুরি/বেতন/পারিশ্রমিকের স্তরসমূহ নির্ধারণ এবং সামঞ্জস্য করা ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ফরমুলা নির্ধারণের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং অংশ। যদি ন্যূনতম মজুরি খুব কম নির্ধারণ করা হয়, তবে শ্রমিক এবং তাদের পরিবারকে মানবেতর জীবন যাপনের দিকে ঠেলে দেয়, যা দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা এবং আয়ের বৈষম্য হ্রাস করার একটি প্রক্রিয়া হিসাবে শ্রম অর্থনীতিতে সর্বজনীন ন্যূনতম মজুরি (UMW) ধারণাটি ব্যাপকভাবে আলোচিত। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন মুদ্রাস্ফীতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জীবনযাত্রার ব্যয়, মজুরি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং শ্রম বাজারের গতিশীলতা সহ বিভিন্ন কারণের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ILO গ্লোবাল ওয়েজ রিপোর্ট ২০২৪-এর একটি বড় উদ্বেগের বিষয় হলো মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত মজুরির হ্রাস, যা নিম্ন-আয়ের কর্মীদের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস ঘটিয়েছে। একবিংশ শতাব্দীতে প্রথমবারের মতো প্রকৃত মজুরি প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক হয়েছে, যা বিশেষভাবে নারী, অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মী এবং স্বল্পদক্ষ শ্রমিকদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।[42] এই তথ্য ন্যূনতম মজুরি রিপোর্ট ২০১৪-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা দেখিয়েছে যে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে কম এবং প্রায়ই আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য সীমার চেয়ে কম থাকে।[43]

একটি সুসংগঠিত সর্বজনীন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ মানদণ্ড অবশ্যই জীবনযাত্রার ব্যাপক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে হতে হবে। আইএলওর প্রতিবেদনে সময়ের সাথে সাথে প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে মুদ্রাস্ফীতি-সূচক মজুরি প্রয়োজনীয়তার উপর আলোকপাত করা হয়েছে (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, ২০২২) এবং ন্যূনতম মজুরি প্রতিবেদন ২০১৪ দেখায় যে মুদ্রাস্ফীতি এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য ন্যূনতম মজুরি সামঞ্জস্য করতে বাংলাদেশের ব্যর্থতার ফলে মজুরি স্থবির হয়ে পড়েছে, শ্রমিকদের জন্য জীবনযাত্রার মৌলিক মান বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে।[44] অর্থনৈতিক ওঠানামা এবং ক্রমবর্ধমান জীবনযাত্রার ব্যয় সামঞ্জস্যের জন্য পর্যায়ক্রমিক মজুরি সংশোধনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।[45]

---

[42] International Labour Organization. (2022). *Global Wage Report 2022–23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power.* Geneva: International Labour Office. Retrieved from /mnt/data/ILO%20Wage%20Report%202024.pdf

[43] Government of Bangladesh. (2014). *Minimum Wage Report 2014 (Part A).* Dhaka: Ministry of Labour and Employment. Retrieved from /mnt/data/Minimum%20Wage%20report%202014%20Part%20A.pdf

[44] Government of Bangladesh. (2014). *Minimum Wage Report 2014 (Part A).* Dhaka: Ministry of Labour and Employment. Retrieved from /mnt/data/Minimum%20Wage%20report%202014%20Part%20A.pdf
Rahman, K., Ahmed, S., & Chowdhury, M. (2023). *Challenges in Minimum Wage Implementation: A Sectoral Analysis.* Dhaka: Economic Policy Review Journal.

[45] Hossain, M., & Islam, T. (2025). *The Dynamics of Wage Determination in Bangladesh: Addressing Inflation and Wage Stagnation.* Dhaka: Bangladesh Policy Institute.

আইএলও-র প্রতিবেদন অনুযায়ী খাদ্য, আবাসন, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, পরিবহন এবং সঞ্চয় সহ প্রয়োজনীয় ব্যয়গুলি পূরণ করার জন্য ন্যূনতম মজুরি যথেষ্ট হওয়া উচিত। মজুরি মানদণ্ডে এই ব্যয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থতার ফলে লুকানো দারিদ্র্য দেখা দেয়, যেখানে শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি অর্জন করলেও প্রয়োজনীয় ব্যয় বহন করতে লড়াই করে।[46]

[ন্যূনতম] মজুরির মানদণ্ড নির্ধারণের ভিত্তি হলো ন্যূনতম মজুরি ব্যবস্থা এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা যেন তা সকল নাগরিকের জন্য একটি টেকসই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং জাতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় আইন, বিধি ও নীতির সামঞ্জস্য প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

ন্যূনতম মজুরির উদ্দেশ্য হলো অযৌক্তিক কম বেতনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের রক্ষা করা। একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক অর্জনের ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত হিস্যা পেতে শ্রমিকের এই জাতীয় সুরক্ষার প্রয়োজন, যা তাঁদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। ন্যূনতম মজুরি দারিদ্র্য জয় এবং বৈষম্য হ্রাস করার নীতির একটি উপাদান, যার মধ্যে পুরুষ, নারী ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী রয়েছে।

ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ দারিদ্র্য বিমোচনের সামগ্রিক কৌশলের একটি উপাদান এবং সকল শ্রমিক/কর্মী ও তাঁদের পরিবারের চাহিদার সন্তুষ্টি নিশ্চিত করার মাধ্যম,[47] যা সামাজিক স্থিতিশীলতা ও প্রগতির পূর্বশর্ত। ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের মৌলিক উদ্দেশ্য কর্মক্ষম নাগরিকের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষার ন্যূনতম স্তর নিশ্চিত করা। ন্যূনতম মজুরি/বেতন নির্ধারণের উদ্দেশ্য হলো মজুরি বৈষম্য নিরসন করা, বিশেষ করে নারী ও পুরুষের মধ্যে মজুরি বৈষম্য। এছাড়াও ন্যূনতম মজুরি নীতি, কর্মসংস্থান নীতির একটি উপাদান, যেখানে যুব কর্মসংস্থান কৌশলে তরুণ কর্মীবৃন্দের জন্য সুবিন্যস্ত মজুরি/বেতন কাঠামো সৃষ্টির ভিত্তি প্রস্তুত করে।[48]

সংস্কার প্রস্তাবনায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। যারা স্বল্পকালীন, চুক্তিভিত্তিক বা মৌসুমি কাজে নিয়োজিত, তাঁদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি নিয়মিত শ্রমিকের মজুরি থেকে বেশি হওয়া প্রয়োজন, যেন অনিয়মিত শ্রমিক পেনশন ও অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই অতিরিক্ত মজুরি কাজে লাগাতে পারেন। অস্ট্রেলিয়া সহ অনেক দেশে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে এই ফরমুলা ব্যবহার করা হয়। যেমন, ২০২৫ সালে অস্ট্রেলিয়ায় নিয়মিত শ্রমিকের ন্যূনতম ঘণ্টা প্রতি মজুরি ২৫.২০ ডলার, অন্যদিকে অনিয়মিত শ্রমিকের ন্যূনতম ঘণ্টা প্রতি মজুরি ৩১.৫০ ডলার (২৫% বেশি)।[49]

সর্বজনীন জাতীয় ন্যূনতম মজুরি এবং খাত, অঞ্চল ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি বিষয়ে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক. মজুরি কাঠামো মানদণ্ড

- পরিবারের একক উপার্জনকারী ব্যক্তিকে বিবেচনা করে ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ নির্ধারণ করা, যাতে একজন শ্রমিকের আয় তার পরিবারের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হয়।
- মোট মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল মজুরি, বাড়ি ভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং যোগাযোগ ভাতা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মূল মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ করা হবে, যাতে ভাতা-সহ ঘোষিত মোট মজুরির ৫৮% এর কম না হয়।

---

[46] Rahman, K., Ahmed, S., & Chowdhury, M. (2023). *Challenges in Minimum Wage Implementation: A Sectoral Analysis.* Dhaka: Economic Policy Review Journal.

[47] ILO (2014) General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135). Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution). Report III (Part 1B), - Geneva, pg. 200.

[48] ILO (2014) General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135). Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (articles 19, 22 and 35 of the Constitution). Report III (Part 1B), - Geneva, pg. 200.

[49] My News Australian Life (2025). 2025 Minimum Wage in Australia. Retrieved on March 26, 2025. https://mynewaustralianlife.com/working-in-australia/2025-minimum-wage-in-australia/

- অন্য সকল ভাতা, যথা: খাদ্য ভাতা, পরিবহণ ভাতা, শিক্ষা ভাতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে চালু থাকা রেশন সুবিধা মজুরি কাঠামোর বাইরে রাখা।
- পিসরেট বা ঠিকা ভিত্তিক কাজের মজুরি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে, যাতে আট ঘণ্টার কাজের বিনিময়ে একজন কর্মী ন্যূনতম মজুরির সমান আয় নিশ্চিত করতে পারেন।

খ. মানদণ্ডভিত্তিক জাতীয় মজুরি নির্ধারণের পদ্ধতি ও উপাত্ত

- মাসিক পারিবারিক খাদ্য ব্যয়: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত বেঁচে থাকার জন্য সুষম খাদ্য তালিকা এবং কৃষি বিপণন অধিদপ্তর বা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো নির্ধারিত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের গড় বাজার দর। আর পরিবারের সদস্য সংখ্যা ধরা হবে সরকারি পে-স্কেলের নির্ধারিত সংখ্যায়।
- মাসিক পারিবারিক বাসস্থান ব্যয়: জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত চার সদস্যের পরিবারের জন্য বাসস্থানের পরিমাণ ও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর নির্ধারিত গড় ভাড়া অনুসারে এই ব্যয় নির্ধারণ করা। এখানে কর্মীর নিজস্ব বাসস্থান আছে কি না, তা বিবেচনায় নেওয়া হবে না।
- মাসিক পারিবারিক স্বাস্থ্য ব্যয়: পরিবার প্রতি গড়ে চারজন ধরে, স্বাস্থ্যবিমার ন্যূনতম প্রিমিয়াম অথবা বাংলাদেশ খানা আয়-ব্যয় জরিপ এবং বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ অনুসারে মূল্যস্ফীতি সমন্বিত গড় স্বাস্থ্য ব্যয়।
- মাসিক পারিবারিক শিক্ষা ব্যয়: পরিবারে গড়ে দুইজন সদস্য ধরে বাংলাদেশ খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুযায়ী মূল্যস্ফীতি সমন্বিত গড় শিক্ষা ব্যয়।
- মাসিক পারিবারিক সামাজিক ও বিনোদন ব্যয়: ব্যক্তিগত (যেমন; যত্ন, পোশাক, জুতা, আসবাবপত্র, মোবাইল, ইন্টারনেট, আর্থিক লেনদেন), সামাজিক (যেমন; অতিথি আপ্যায়ন, উপহার, পারিবারিক অনুষ্ঠান) এবং বিনোদন (যেমন; সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, ভ্রমণ, বাইরে খাওয়া) খাতে পরিবারের চার সদস্য বিবেচনায় এই ব্যয় নির্ধারণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে এই খাতের ব্যয় মোট মজুরির ১০ শতাংশ হিসেবে ধরা হবে। তবে গবেষণা-উপাত্ত অনুযায়ী পরবর্তী কালে তা সংশোধনযোগ্য।
- মাসিক পারিবারিক যাতায়াত ব্যয়: পরিবারের চার সদস্য ধরে মৌসুমভিত্তিক যাতায়াত, কর্মস্থলে যাতায়াত, সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াত এবং দূরবর্তী স্থানে যাতায়াত বিবেচনায় এই ব্যয় নিরূপণ করা হবে।
- ন্যূনতম মাসিক সঞ্চয়: সর্বজনীন ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে আইএলও-এর জীবন ধারণ উপযোগী মজুরি নির্ধারণের অনুসরণীয় নীতিমালা অনুযায়ী শ্রমিকের ন্যূনতম মাসিক সঞ্চয়ের অনুপাত নির্ধারণ করা।
- উপরি-উক্ত সকল ব্যয় হিসাবের ক্ষেত্রে সরকারের কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো সহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও মানদণ্ড ব্যবহার করা।

৩.২.৩ প্রোডাকশন লক্ষ্যমাত্রা যৌক্তিকীকরণ ও পিসরেট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও পিস প্রতি মজুরি নির্ধারণ

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হলো কোনো খাতে মজুরি বৃদ্ধির পর শ্রমিকদের জন্য 'প্রোডাকশন টার্গেট' বৃদ্ধি করা হয়। শ্রমিকের পক্ষ থেকে এ অভিযোগটি প্রতিনিয়ই থাকে। উল্লেখ্য, টার্গেট নির্ধারণের কাজটি এবং পিসরেট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও পিস প্রতি মজুরি নির্ধারণ একপাক্ষিক ভাবে মালিকের পক্ষ থেকে করা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকের মতামত নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি জরুরি তা হলো শ্রমিকের জন্য প্রডাকশন টার্গেট এবং পিসরেট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও পিস প্রতি মজুরি নির্ধারণ যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা, যাতে শ্রমিকের জন্য অতিরিক্ত চাপ না হয় বা তার সামর্থ্যের বাইরে না যায়। এক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

- পিসরেট ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও পিস প্রতি মজুরি নির্ধারণের জন্যে একটি অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া তৈরি করা, যাতে প্রযোজ্য শিল্পে নির্দিষ্ট কাজ ভিত্তিক শ্রমিকের জন্য 'সর্বোচ্চ এবং/অথবা সর্বনিম্ন দৈনিক পিস তৈরির লক্ষ্যমাত্রা' এবং পিস প্রতি মজুরি নির্ধারণ করা যায়। এ লক্ষ্যে কারখানা পর্যায়ে নিয়োগকারী ও শ্রমিক পক্ষ এবং টাইম-স্টাডি বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও বাংলাদেশের প্রেক্ষিত বিবেচনায় শ্রমিকের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং মজুরি ঠিক করা। যে সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ইউনিয়ন থাকবে, সেখানে এই টার্গেট নির্ধারণের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩.২.৪ মজুরি বৃদ্ধির হার ও মজুরি পরিশোধ প্রক্রিয়া

মূল্যস্ফীতির কারণে প্রকৃত মজুরির হ্রাস, যা নিম্ন-আয়ের কর্মীদের ক্রয়ক্ষমতার হ্রাস ঘটিয়েছে।[50] ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে বাংলাদেশের বেতন বৃদ্ধির হার কমে ৮.১২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা জানুয়ারির ৮.১৬ শতাংশ থেকে কম। এটি পরপর ৩৭তম মাস যেখানে মুদ্রাস্ফীতি বেতন বৃদ্ধির চেয়ে বেশি হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ওয়েজ রেট ইনডেক্স (WRI) অনুযায়ী, যা কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের ৬৩টি পেশায় অনানুষ্ঠানিক শ্রমিকদের মজুরি নিরীক্ষণ করে, জানুয়ারি ২০২১ সালের পর এটি মাত্র দ্বিতীয়বার যখন বেতন বৃদ্ধির হার আগের মাসের তুলনায় কমেছে।[51]

মজুরি বৃদ্ধির মানদণ্ড নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বার্ষিক মজুরি বৃদ্ধির হার স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারণের ক্ষেত্রে গড় মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃদ্ধি নিশ্চিত করা। মজুরি বৃদ্ধির হার নির্ধারণের জন্য আইএলও'র ১৯-২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত দলিল "Meeting of experts on wage policies, including living wages" অনুসরণ করা যেতে পারে।.

খ) সকল মজুরি ও ভাতা ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক করা।

৩.২.৫ শ্রমিকদের অর্জিত প্রাপ্য

একজন শ্রমিকের বেতন ভাতা সহ যাবতীয় উপার্জন প্রাপ্তি মৃত্যু, যে কোনো ধরনের চাকরিচ্যুতি বা অন্য কোনো কারণে বঞ্চিত করা শ্রম অধিকার ও মানবাধিকার পরিপন্থী। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নানা অজুহাতে শ্রমিকবৃন্দ তাঁদের প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন, যা তাঁদের পরিবারকে বিপর্যয়ের মুখে ফেলে। এক্ষেত্রে সংস্কারের দাবি দীর্ঘদিনের।

শ্রমিকদের অর্জিত প্রাপ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণের জন্য দুই বছরের চাকরির শর্ত বাতিল করে এক বছর করা।

খ) শ্রমিককে কোনো কারণেই তার অর্জিত প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। বরখাস্তের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার বিধান বাতিল করে শ্রমিকদের পূর্ববর্তী চাকরির ভিত্তিতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ বা গ্রাচ্যুইটি ও অন্যান্য সুবিধা নিশ্চিত করা।

গ) গ্র্যাচুইটি বা ক্ষতিপূরণ শ্রমিকদের প্রাপ্য সুবিধা, যা থেকে তাদের কোনোভাবেই বঞ্চিত করা যাবে না। যেহেতু গ্র্যাচুইটি বা ক্ষতিপূরণ শ্রমিকদের পূর্বের সেবার বা চাকরির সাথে সম্পর্কিত, তাই শ্রমিকদের চাকরি যেভাবেই শেষ হোক না কেন, সবার জন্য গ্র্যাচুইটি বা ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আইনি নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

৩.২.৬ বাধ্যতামূলক তহবিল ও আপদকালীন মজুরি বিমা

অনিয়মিত মজুরি, বকেয়া বেতন একটি স্থায়ী সমস্যা। আর ছাঁটাই জনিত আয় হারানো, একটি শ্রমিক পরিবারকে চরম দুর্দশা আর অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে। বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের ছাটাইয়ের গুরুতর পরিণতি অব্যাহত রয়েছে যা নতুন সামাজিক বিমা কর্মসূচির বিবেচনায় আনতে বাধ্য করে। মজুরি বিমা একটি অভিনব নীতি, যার মাধ্যমে চাকরিচ্যুত শ্রমিক যারা চাকরি হারায় এবং কম মজুরিতে পুনরায় নিযুক্ত হয়, অস্থায়ীভাবে সেই শ্রমিকদের আয়ের ব্যবস্থা করে।

বাধ্যতামূলক আপদকালীন তহবিল ও মজুরি বিমা বিষয়ে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) রপ্তানিমুখি শিল্পের সরবরাহ ও মূল্য পরিশোধ প্রক্রিয়ার কখনো কখনো ব্যত্যয় ঘটতে পারে। এছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারীর মূল্য পরিশোধ করতে সমস্যা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত শ্রমিকরাই দুর্ভোগের শিকার হয়। প্রায়শই প্রতিষ্ঠানের পুর্বপ্রস্তুতির অভাবে শ্রমিকের দুর্ভোগ বাড়ে ও প্রশাসন অসহায় বোধ করে এবং জনদুর্ভোগও বাড়ে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় কমিশন মনে করে রপ্তানিমুখি শিল্পের সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকার একটি আপদকালীন তহবিল গঠন করবে, যেখানে নিয়োগকারী কারখানা/প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের ২ মাসের মজুরি/বেতনের সমপরিমাণ টাকা উক্ত তহবিলে জমা রাখবে। এই তহবিল প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকারী, সরকার ও উক্ত শিল্পের

[50] আইএলও-র গ্লোবাল ওয়েজ রিপোর্ট ২০২৪

[51] Bangladesh Bureau of Statistics (2025)। *মজুরি প্রবৃদ্ধির প্রবণতা*।

মালিকদের এসোসিয়েশনের (যদি থাকে) যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। তবে কোনো কারণে নিয়োগকারীর অবর্তমানে সরকার জরুরি পরিস্থিতিতে নিজস্বভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।

খ) দেউলিয়া আইনের সংশোধন করে প্রথমে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করা, তারপর সরকারের পাওনা পরিশোধ নিশ্চিত করা।

গ) একটি জাতীয় মজুরি নিশ্চয়তা বিমা স্কিম চালু করা, যাতে করে কোনো প্রতিষ্ঠান মজুরি প্রদানে ব্যর্থ হলে, কোনো শ্রমিক ছাঁটাই হলে, পুনরায় কম বেতনে নিযুক্ত হলে, এই বিমার আওতায় তা পরিশোধ করা যায়। এই বিমা স্কিমে নিয়োগকারী ও সরকার বাৎসরিক অর্থ প্রদান করবে। এই স্কিমের ব্যবস্থাপনা কমিশনের আওতায় রাখা যেতে পারে।

৩.২.৭ জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা

ন্যূনতম মজুরি নীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো মজুরি বাস্তবায়ন এবং কার্যকারিতা। যুক্তরাজ্যে কঠোর নিয়ন্ত্রক তদারকি এবং অমান্যতার জন্য জরিমানা ব্যবস্থা চালু করেছে, যা ন্যায্য শ্রম অনুশীলন বজায় রাখতে সাহায্য করে (UK Government, 2023)। অন্যদিকে বাংলাদেশ বড় আকারের অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতি, দুর্বল শ্রম সুরক্ষা এবং কাঠামোগত নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে উল্লেখযোগ্য বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় (Government of Bangladesh, 2014)। এছাড়া দেখা গেছে যে, অস্বচ্ছ মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া এবং শ্রমিকদের পক্ষে অপ্রতুল প্রতিনিধিত্ব মজুরি নিয়ে ন্যায্য আলোচনা করার সুযোগকে সংকুচিত করে (Rahman et al., 2023)। একইভাবে ILO রিপোর্টে বলা হয়েছে যে উন্নয়নশীল অর্থনীতিগুলির অনেক ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরি নীতি কাঙ্ক্ষিত সুবিধা দিতে ব্যর্থ হয়। কারণ এটি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় না, যার ফলে শ্রমিক শোষণ, মজুরি দমন এবং স্থায়ী দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়।[52] এক্ষেত্রে যথাযথ জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার কোনো বিকল্প নেই।

জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচ্য, তার মধ্যে মজুরি বকেয়া রাখা অন্যতম। এপ্রেক্ষিতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) প্রতি মাসের মজুরি পরিশোধের তথ্য অনলাইনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে (DIFE) জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রাখা। অধিদপ্তর শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি সংক্রান্ত বিধান বাস্তবায়ন করবে এবং মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যাণ দপ্তর ও জেলা-উপজেলা প্রশাসন এই বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে।

খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে জাতীয় ও সেক্টরভিত্তিক মজুরি বাস্তবায়নের তথ্য প্রকাশ করা। এই তথ্য ত্রিপক্ষীয়ভাবে পর্যালোচনা করা এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যবহার করা।

গ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের দায়িত্বের মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের বিধান সংযোজন করা।

ঘ) মজুরি প্রদান বকেয়া হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে যৌক্তিক সময়কাল পূর্বেই তা শ্রমিক ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে লিখিতভাবে জানানো। আইন দ্বারা নির্ধারিত তারিখের সাতদিন আগে বিলম্বের বিষয়ে শ্রমিককে অবহিত করা। সেক্ষেত্রে ডাইফি'র মধ্যস্থতায় শ্রমিক ও নিয়োগকারীদের প্রতিনিধির মতামতের ভিত্তিতে মজুরি প্রদানের তারিখ নির্ধারিত হবে। পুনর্নির্ধারিত তারিখের মধ্যে মজুরি প্রদান করা না হলে উক্ত তারিখের পর হতে নির্দিষ্ট ০.৫% হারে ক্ষতিপূরণ (সর্বোচ্চ ৩০ দিনের জন্য) নির্ধারণ করা।

ঙ) যদি ৩০ দিনের বেশি সময় ধরে মজুরি বকেয়া থাকে, তাহলে বিদ্যমান আইনের বিধান কার্যকর হবে।

৩.২.৮ সম্পদবৈষম্য ও ন্যায্য হিস্যা

আয় বৈষম্যের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে দেখা যায়, দেশের তিন ভাগের দুই ভাগ আয় যাচ্ছে দেশের ধনী ৩০ শতাংশ মানুষের হাতে এবং বাকি ৭০ শতাংশ মানুষের আয় মোট আয়ের অবশিষ্ট ১ ভাগ। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ

[52] International Labour Organization. (2022). *Global Wage Report 2022–23: The impact of inflation and COVID-19 on wages and purchasing power.* Geneva: International Labour Office. Retrieved from /mnt/data/ILO%20Wage%20Report%202024.pdf

এখন উচ্চ আয়বৈষম্যের দেশ হওয়ার দ্বারপ্রান্তে। ব্যবসায়িক জগতে, সম্পদের বৈষম্যের সঙ্গে যুক্ত সমস্যাগুলি এতোটাই স্পষ্ট যে নিয়োগকারী সংস্থাও ক্রমবর্ধমানভাবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। সমাজে অসহিষ্ণু ও ভারসাম্যহীনতা নিরাময়ে আরও বেশি সংখ্যক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কেবল শেয়ারহোল্ডারদের নয়, অংশীদারদের স্বার্থের দিকে নজর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় শ্রমিকের অংশগ্রহণের ধারণা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছে। আইনগত ও প্রশাসনিক জটিলতা নিরসন করে এই ধারণা উন্মুক্ত করা গেলে অনেক নিয়োগকারী এই পথে যেতে পারেন। এর ফলে শ্রমিকের দায়িত্ববোধ বাড়ে এবং শ্রম অসন্তোষ নিরসন সহজ হয়। এর ফলে সমাজে আয় বৈষম্য কমানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।

প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে, যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ন্যায্য হিস্যার অংশ হিসেবে মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্বের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। শ্রম আইন অনুসারে একটি কোম্পানিকে তার নিট মুনাফার ৫% 'শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল', কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে ৮০:১০:১০ অনুপাতে প্রদান করতে হয়। বছরের শেষের ৯ মাসের পরে অবশ্যই অর্থ প্রদান করতে হবে। তবে শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ২৩২-এ অনুসারে নিম্নলিখিত দুটি শর্ত পূরণ না করা পর্যন্ত কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের জন্য এই ধরনের তহবিল প্রতিষ্ঠা বাধ্যতামূলক নয়:

১। হয় হিসাব বছরের শেষ দিনে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি টাকার কম নয়।

২। অথবা হিসাব বছরের শেষ দিনে স্থায়ী সম্পদের মূল্য ২০ কোটি টাকার কম নয়।

আইন অনুযায়ী প্রতিটি শ্রমিক-কর্মচারী সমান অনুপাতে শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিলের সুবিধাভোগী এবং তহবিলে অংশগ্রহণের যোগ্য। তবে যে শ্রমিক-কর্মচারী এক বছরে তাদের চাকরির ৬ মাস শেষ করেননি, তারা সেই বছরের ক্ষেত্রে তহবিলে অংশ নেওয়ার যোগ্য নন।

প্রতিটি সংস্থা যেখানে শ্রমিক মুনাফা অংশগ্রহণ তহবিল তৈরি করা হয়, তাদের এই তহবিলের পরিচালনা ও প্রশাসনের জন্য একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করার বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য, একটি সংস্থাকে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে তার ব্যবসায়িক পরিচালনার জন্য অংশগ্রহণ তহবিল ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়। ট্রাস্টি বোর্ড এবং কোম্পানির মধ্যে তহবিলের প্রশাসন সম্পর্কিত কোনও বিরোধের ক্ষেত্রে, এটি অবশ্যই সরকারকে অবহিত করার নিয়ম রয়েছে। বিরোধ নিষ্পত্তিতে ব্যর্থ হলে সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়।

মুনাফায় শ্রমিকের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত প্রস্তাব করছে।

ক) শ্রমিকদের (উপকারভোগী) মুনাফা ভাগের বিদ্যমান বিধান বহাল রাখা এবং তা সকল শ্রেণির শ্রমিকের—যারা বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত এবং যেগুলি লাভজনকভাবে পরিচালিত হয়—মধ্যে সম্প্রসারিত করা এবং এক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত প্রাপ্য নিশ্চিত করা।

খ) বর্তমানে স্পষ্ট নিয়মের অভাবে কল্যাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও ব্যয়সংক্রান্ত বিষয়ে সমস্যা ও অসংগতি থাকায় প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ তহবিল লিখিত ও নির্দিষ্ট বিধি-বিধানের মাধ্যমে পরিচালিত করা।

গ) স্বচ্ছতার স্বার্থে তহবিল ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ট্রাস্টি বোর্ডকে প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও ক্ষতির পূর্ণ তথ্য জানার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক দলিলাদি যাচাই করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা।

ঘ) সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান করা।

৩.২.৯ শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা ও টেকসই ব্যবসা

শিল্প প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাবৃন্দ ন্যায্য মজুরির ক্ষেত্রে যে প্রতিবন্ধকতাসমূহ উল্লেখ করেন, সেগুলি হলো: নিম্ন দক্ষতা, উচ্চ উৎপাদন খরচ, উৎপাদিত পণ্যের নিম্ন বিক্রয় মূল্য, রপ্তানি খাতে বিদেশি ক্রেতাদের সাথে সীমিত দরকষাকষির সক্ষমতা এবং দুর্নীতি। একথা অনস্বীকার্য যে ব্যবসা করতে যে অনানুষ্ঠানিক আর্থিক খরচ এবং জটিল আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক জটিলতা একদিকে অনানুষ্ঠানিক খাতকে আনুষ্ঠানিক কাঠামোয় আসতে বাধাগ্রস্ত করছে, অন্যদিকে ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। নিম্ন উৎপাদনশীলতার সাথে নিম্ন মজুরির যে সম্পর্ক, তা মালিক ও শ্রমিক উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য যে প্রস্তাবনা অনুচ্ছেদ ৪.১-এ প্রস্তাব করা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে নিয়োগকারী ও সরকারের অগ্রণী ভূমিকা ব্যবসায়ের ও

অর্থনীতির স্থিতিশীল অগ্রগতির স্বার্থেই প্রয়োজন। উচ্চ উৎপাদন খরচের জন্য যেসব বিষয় দায়ী, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কর কাঠামো, আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রতা, ব্যবসা নিবন্ধন এবং পরিচালনায় জটিল ও বহুমাত্রিক অনুমোদন প্রক্রিয়া, প্রভাব ও ঘুষ ছাড়া সহজে ও দ্রুত অনুমোদন না পাওয়া, সাপ্লাই চেইনের অদক্ষতা ইত্যাদি।

নিম্নদক্ষতার সাথে নিম্ন মজুরির যে সম্পর্ক, তা মালিক ও শ্রমিক উভয়ের জন্য ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষ ও সরকারের অগ্রণী ভূমিকা ব্যবসায়ের ও অর্থনীতির স্থিতিশীল অগ্রগতির স্বার্থেই প্রয়োজন। এজন্য দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যে প্রস্তাবনা অনুচ্ছেদ ৩.১-এ প্রস্তাব করা হয়েছে, তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

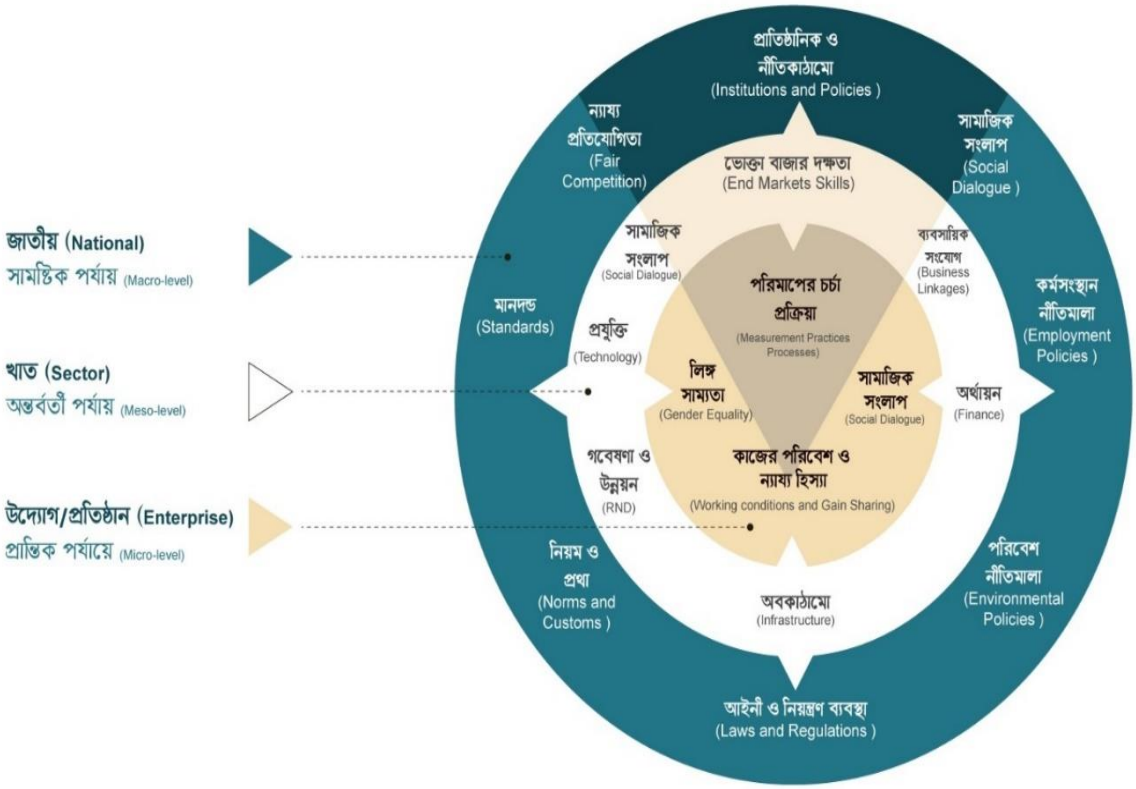
উৎপাদনশীলতা ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের সমন্বয়ের জন্য প্রণীত আইএলও-র অনুসারে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কমিশন সুপারিশ করছে:

ক) জাতীয় পর্যায়

- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মর্যাদাপূর্ণ কাজ এবং টেকসই এন্টারপ্রাইজ বিকাশের কাঠামোগত বাধা শনাক্ত করতে নীতিগত পরিবেশের মূল্যায়ন, যার মাধ্যমে অর্থনীতির ডিজিটাল এবং সবুজ রূপান্তর সংঘটন।
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কাজের পরিবেশ, উদ্যোক্তা, উদ্ভাবন এবং আনুষ্ঠানিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য ব্যাপক কৌশল এবং নীতিগত সংস্কার।
- উৎপাদনশীলতা এবং শালীন কাজের উপর অর্থপূর্ণ সামাজিক সংলাপকে শক্তিশালী করা।

খ) খাত ভিত্তিক

- উচ্চ উৎপাদনশীলতা ও উন্নত কর্মসংস্থানের জন্য কাঠামোগত পরিবর্তনকে উৎসাহিত করতে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার খাতভিত্তিক মূল্যায়ন ও নীতিমালা প্রণয়ন ।
- অভীষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে ভ্যালু চেইন, বিধি ও সহায়ক কার্যাবলির কার্যকারিতা উন্নত করে এবং খাত ভিত্তিক উৎপাদনশীলতা ও উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অর্থবহ সামাজিক সংলাপকে শক্তিশালী করে উচ্চ-অগ্রাধিকার খাত গুলিতে উৎপাদনশীলতা ও কাজের পরিস্থিতি সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়া।



চিত্র ৩.২.৩ আইএলও প্রণীত শোভন কাজের উৎপাদনশীলতা প্রতিবেশ

গ) প্রতিষ্ঠান পর্যায়

- ব্যবস্থাপনার উন্নতিকরণ, কাজের অবস্থার উন্নতি, অর্থপূর্ণ সামাজিক সংলাপকে শক্তিশালী করা, সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধি, টেকসই উৎপাদনে রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা, ব্যবসায়ের টিকে থাকার সক্ষমতা ও ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি এবং কুটির ও ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলিকে আনুষ্ঠানিকতায় রূপান্তরিত করতে এবং ন্যূনতম দক্ষতার স্তর এবং অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে উদ্যোগ গ্রহণ।
- টেকসই ব্যবসায় উন্নয়নে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ।

ঘ) উচ্চ উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কর কাঠামোর সংস্কার করা, যেন পরোক্ষ কর কমিয়ে প্রত্যক্ষ করের সঙ্গে সমন্বয় করা যায়। এছাড়া আমদানি শুল্ক এমনভাবে সমন্বয় করা, যেন তা দেশীয় শিল্প বিকাশে ও বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

ঙ) মজুরি সংক্রান্ত আইএলও -র সনদ সমূহ অনুস্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

চ) আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ওয়ান স্টপ পদ্ধতি চালু করা, ব্যবসা নিবন্ধন এবং পরিচালনায় জটিল ও বহুমাত্রিক অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা।

ছ) সাপ্লাই চেইনের অদক্ষতা দূর করতে ডিজিটাল পদ্ধতি ও প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়ানোর প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়ন ও এতে বিনিয়োগ করা।

জ) মালিক ও উদ্যোক্তাবৃন্দের মানসিকতা পরিবর্তনে রাষ্ট্রকে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের প্রতি ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণ করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিদ্যমান নিম্ন দক্ষতা, নিম্ন উৎপাদনশীলতা, নিম্ন মজুরি, অধিক বৈষম্য ও অস্থিতিশীলতার চক্র থেকে বের হয়ে নিয়োগকারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি ও ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করার কাজ একই সঙ্গে চলমান রাখা।

ঝ) মজুরিকে অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে ন্যায্য মজুরিকে জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে রাজনৈতিক অঙ্গীকার নিশ্চিত করা।

৩.৩. নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা

বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করেছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। এই নীতিমালায় বলা হয়েছে যে, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্য একটি অপরিহার্য বিষয় হওয়া উচিত এবং এর বাস্তবায়ন সরকার, মালিক ও শ্রমিকসহ সকল অংশীদারের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে হবে। ২০১৩ সালে প্রণীত জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালায় শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য উন্নয়ন ও নিরাপত্তার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নীতিমালায় শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি, পেশাগত ব্যাধি সনাক্তকরণ এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ সুনিশ্চিত করার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের সহায়তার কথা বলা হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করতে হলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের বাধা দূর করা এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে। আইনের ৫ম থেকে ৮ম অধ্যায়ে কর্মস্থলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যবিধি, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা সুবিধা সংক্রান্ত স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষত, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখার বিধানসহ, শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০২২ সালের জুন মাসে আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে মৌলিক অধিকার হিসেবে ঘোষণা করা হয়, যার মাধ্যমে একটি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশে কাজের অধিকার নিশ্চিত হবে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটিকে মৌলিক কনভেনশন ১৫৫ এবং ১৮৭ অনুস্বাক্ষর করার দায়বদ্ধতা রয়েছে।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য – একটি মানবাধিকার, যা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির মৌলিক ভিত্তি। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৭৬-এ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে (খ) নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার এবং ন্যায়সঙ্গত ও সুবিধাজনক কর্মের অধিকার উপভোগের বিষয়ে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। ১৯৫০ সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর প্রথম অধিবেশনে পেশাগত স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্য সংজ্ঞায়িত করা হয়। যা ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত ১২তম অধিবেশনে সংজ্ঞাটি নিম্নরূপে সংশোধন করা হয়, যেখানে বলা হয়েছে:

(ক) সকল পেশায় শ্রমিকদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক কল্যাণের সর্বোচ্চ পর্যায়ের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) শ্রমিকদের মধ্যে তাদের কাজের পরিবেশের কারণে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ দূর করা;

(গ) স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিকূল কারণগুলির ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা;

(ঘ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিরূপ প্রভাব থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা;

(ঙ) শ্রমিকদের শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেশাগত নিরাপদ পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখা।

এছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDGs) লক্ষ্য ৮.৮ এবং ৩.৯-এ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং কর্মস্থলে পরিবেশগত দূষণ ও বিপজ্জনক রাসায়নিকের কারণে সৃষ্ট ঝুঁকি কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্ব হিসেবে ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার কথা রয়েছে। তথাপি বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিক অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশে কাজ করছেন। নির্মাণ, পোশাক, চামড়া, পরিবহণ ও গৃহশ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। নিরাপত্তা কমিটির অভাব এবং শ্রমিকদের OSH (Occupational Safety and Health) ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকায় দুর্ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকাংশ কর্মস্থলে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই এবং শ্রমিকদের পেশাগত রোগ ও কর্মসংস্থানজনিত স্বাস্থ্য সমস্যার উপযুক্ত চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয় না। মানসম্মত আবাসনের অভাব ও বিশুদ্ধ পানির সংকটও শ্রমিকদের কর্মক্ষমতায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ এখনো নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বহু খাতে শ্রমিকরা অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হন, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কেয়ার ওয়ার্কারস, গৃহশ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, চামড়া শিল্পের কর্মী, বন্দর শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিক, চা শ্রমিক এবং জাহাজ ভাঙা শিল্পের শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত অনিরাপদ ও

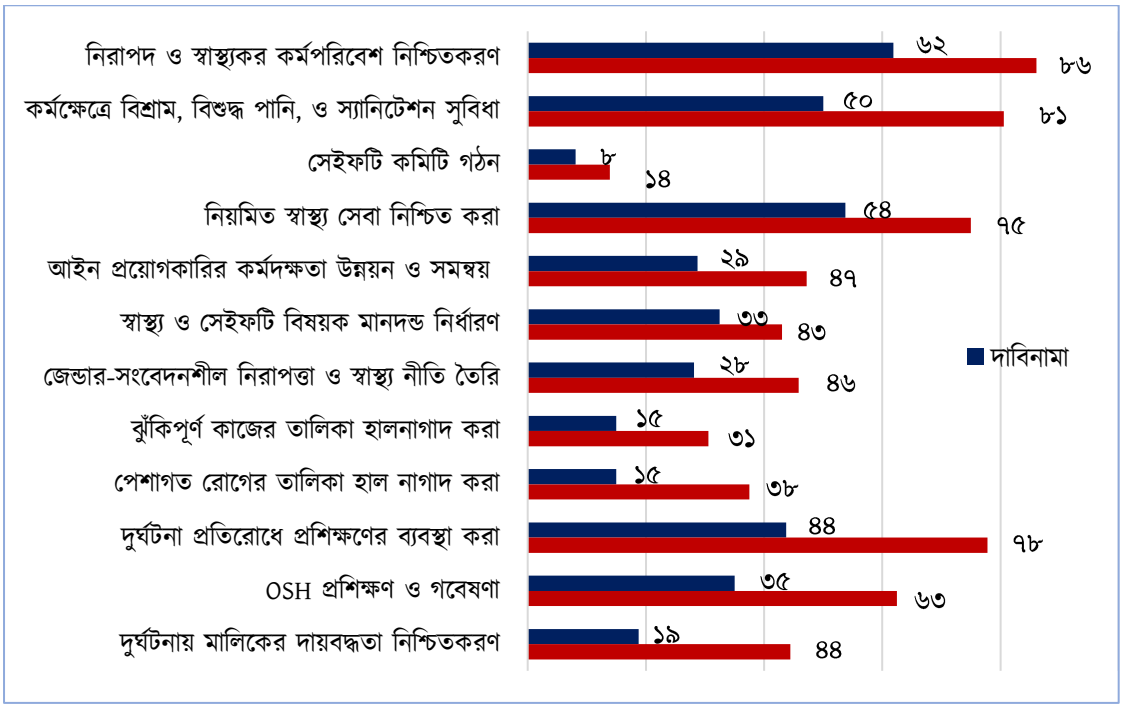
ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করেন, যেখানে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুপস্থিত। এসব খাতে শ্রমিকরা অধিকাংশ সময় সঠিক নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম ছাড়াই কাজ করেন, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে।

ঝুঁকিপূর্ণ কাজের ক্ষেত্রে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি হলেও অধিকাংশ খাতে তা নিশ্চিত করা হয় না। বন্দর, নির্মাণ, জাহাজ ভাঙা শিল্প, পরিবহণ, কৃষি, রেল এবং চামড়া শিল্পে কাজ করা শ্রমিকরা স্বাস্থ্য ঝুঁকি রয়েছে, নিরাপত্তা সরঞ্জাম দেওয়া হয় না। ফলে তারা মারাত্মক শারীরিক আঘাতের শিকার হন বা প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে।

অনেক শ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করার কারণে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা, ত্বকের রোগ, দৃষ্টিশক্তির সমস্যা এবং হাড়ের সমস্যা ইত্যাদিতে ভুগছেন। বিশেষ করে চামড়া শিল্প, নির্মাণ, মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ, পরিবহণ এবং জাহাজ ভাঙা শিল্পে এই ধরনের সমস্যা বেশি দেখা যায়। কর্মক্ষেত্রে ধূলাবালি, রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার, ভারী বস্তু বহন এবং দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে বা বসে কাজ করার ফলে শ্রমিকদের বিভিন্ন পেশাগত রোগ হয়ে থাকে। আবার কিছু কারখানায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাব রয়েছে। বন্দর, রেল, নৌযান, গার্মেন্টস, নির্মাণ, কৃষি, দোকান কর্মচারী, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট এবং চা শিল্পের শ্রমিকরা প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক সরঞ্জাম ছাড়া কাজ করতে বাধ্য হন। এতে তাদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ে এবং প্রায়শই তারা মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হন। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ দেওয়া অত্যন্ত জরুরি হলেও বাংলাদেশে অধিকাংশ শ্রমিক প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ পান না। গার্মেন্টস, নির্মাণ, রেল, পরিবহণ, জাহাজ ভাঙা শিল্প, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট এবং কৃষি খাতের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হতে হয়।

কমিশনের সাথে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা থেকে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতে কর্মক্ষেত্রে বিশ্রাম, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান; সেইফটি কমিটি; স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা; আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মদক্ষতার ঘাটতি দূরিকরণ; স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক মানদণ্ড নির্ধারণ; জেন্ডার-সংবেদনশীল নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতি তৈরি; ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা হালনাগাদ করা; পেশাগত রোগের তালিকা হাল নাগাদ করা; দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা; এবং দুর্ঘটনায় মালিকের দায়বদ্ধতা নিশ্চিতকরণ বিষয়ে সুপারিশ পাওয়া যায়।

চিত্র ৩.৬.৪ অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং পেশকৃত দাবিনামার প্রেক্ষিতে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবশ বিষয়ক শ্রম সংস্কার অধিক্ষেত্র (শতাংশ)



৩.৩.১। সবার জন্য নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি করার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনি কাঠামো ও নীতিমালা সর্বজনীন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এবং হালনাগাদ করা।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অধিকারকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রোফাইল-২০১৯, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করছে। এতদসত্ত্বেও পেশাজীবী এবং শ্রমিকদের পেশাগত দুর্ঘটনা এবং রোগব্যাধি রোধ করার ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়নি। এইজন্য নীতিমালা, আইন, বিধিমালা ও কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যা হবে সর্বজনীন।

একইসঙ্গে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সর্বজনীন আইন, নীতিমালা, বিধিমালা ও কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও তদারকি করার জন্য একটি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা জরুরি যা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক সকল বিষয়াদি দেখভাল এবং বাস্তবায়ন করবে। যেমন; শ্রম আইন, পরিবেশ, শিল্প আইনে উল্লেখিত পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়াদি। এছাড়া আইন বাস্তবায়ন ও লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে শাস্তির বাস্তবায়ন, প্রতিষ্ঠানের বা অধিদপ্তরের গাফিলতি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির সঠিক বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা প্রয়োজন। যেমন; Occupational Safety and Health Administration Authority।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনে "পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা" নেই। সঠিক সংজ্ঞা ও দিকনির্দেশনা না থাকার কারণে শ্রমিকদের ঝুঁকি ও বিপদ-আপদ বাড়ছে। এছাড়া অন্যান্য আইনের সাথে একত্রে থাকার জন্য দুর্বল আইনে পরিণত হওয়া ও প্রয়োগে ঘাটতি কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি বাড়ানোর সাথে সাথে ব্যবসা ও শিল্পের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং ভাবমুর্তি ক্ষুণ্ন করছে এবং আর্ন্তজাতিক শ্রমমান মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি রাখা সম্ভব হচ্ছে না ।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের কারণে শ্রম বাজারে কাজের নতুন নতুন মাত্রা যোগ হওয়া, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, বৈশ্বিক পরিবর্তন এবং কোভিড ১৯-এর মতো নতুন রোগের আর্বিভাবের কারণে নতুন নতুন প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে, যা মোকাবিলা করার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আইনি কাঠামো পরিবর্তন সময়ের দাবি।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ একজন শ্রমিক যদি মনে করে কাজ করলে তার মৃত্যু বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, তাহলে কাজকে না বলার কোনো বিধান নেই। যদিও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ তফসিল ৪-এ সেইফটি কমিটি সংক্রান্ত বিষয়াদিতে সেইফটি কমিটির বিপজ্জনক কাজ নিষিদ্ধ করার এখতিয়ার রয়েছে, কিন্তু শ্রমিকের সরাসরি কাজকে না বলার কোনো বিধান নেই। এছাড়া দেশের সকল প্রকার শ্রমকে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় বিভিন্ন গ্রেডে/মাত্রায় ভাগ না করার জন্য সঠিক ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশে বর্তমান মজুরি বোর্ডের অধীনে ৪৩টি সেক্টর ও অনান্য সেক্টরের প্রতিটির জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার আওতায় নিয়ে আসার জন্য আলাদা সেইফটি গাইডলাইন, যেমন; আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ চেকলিস্ট প্রস্তুত করার বিষয়ে সঠিক কোনো দিক নির্দেশনা নেই এবং ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনায় নিয়ে সেক্টরগুলির জন্য অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ৩২৩ অনুযায়ী সরকার ২০১৩ সালে জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিল গঠন করে। কিন্তু বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা না থাকায় কাউন্সিলের লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হওয়ার সাথে সাথে এর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব দেখা দিয়েছে। যেমন; নিয়মিত সভা না হওয়া, সদস্য বাছাইয়ে রাজনৈতিক বিবেচনা ইত্যাদি। এছাড়া সেইফটি কাউন্সিলের কার্যক্রম বাস্তবসম্মত ও গতিশীল করার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাতগুলিতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা দরকার।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৫০ (৮) ধারায় শ্রমিকের যে সংজ্ঞা রয়েছে সেখানে শ্রমিককে সীমিতভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এবং তা এ আইনের ধারা ২ (৬৫)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ বিধি ১৬ (৩) অনুসারে, ঠিকাদারি সংস্থা/আউটসোর্স প্রতিষ্ঠানের কোনো মালিকের অধীন কোনো শ্রমিক বা কর্মী সরবরাহ করার ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্রে আইনের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত সকল বিধান অনুসরণ করে পরিচালিত হয় মর্মে নিশ্চিত হওয়ার বিধান রয়েছে। কিন্তু পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থাপনা,

আইন-কানুন ইত্যাদি জটিল বিষয়ে ঠিকাদারি সংস্থার বিশেষ জনবল, প্রশিক্ষিত শ্রমিক বা কর্মচারী নেই। ঠিকাদারের শ্রমিকের দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে বা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত বিধানের ব্যর্থতায় উভয়েরই দায়বদ্ধতার বিধান থাকলেও নিয়মিত মনিটরিংয়ের কোনো ব্যবস্থা নেই।

কর্মস্থলে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইনি কাঠামো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, গাইডলাইন প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা (OHS Management) এবং এ সংক্রান্ত কৌশল ও পলিসি প্রস্তুতের মাধ্যমে শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগের প্রতিরোধ, প্রশমন ও প্রতিকারে প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষিত ও সার্বক্ষণিক দায়িত্বপ্রাপ্ত পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তা (OSH Officer) থাকা অত্যাবশ্যক। যদিও শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর ৫৫ (১২) ধারায় বিদ্যমান প্রশিক্ষিত (সেইফটি) কর্মকর্তার কথা বলা হয়েছে, যা শুধুমাত্র অগ্নি নিরাপত্তার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে - যা কর্মস্থলে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

বর্তমানে কৃষি, মৎস্য, পরিবহণ, নির্মাণ, গৃহশ্রম, প্রযুক্তিগত কারণে সৃষ্ট নতুন শ্রম খাতসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের আইনি সুরক্ষা না থাকায় তাদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক বিষয়গুলি উপেক্ষিত। যা তাদের ব্যক্তি ও কর্মজীবনের উপর ঝুঁকি বাড়ানোর সাথে সাথে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও এর নেতিবাচক প্রভাব উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। এখানে উল্লেখ্য যে, কৃষি কাজের সাথে ৩.৯২ মিলিয়ন[53] শ্রম শক্তি নিয়োজিত যারা বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক সার, কীটনাশক, মেশিনারিজ, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য কেমিকেল ব্যবহারে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে রোগব্যাধি ও বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে শারীরিক (যেমন; আরগোনোমিক্যাল) সমস্যায় ভুগছে ও ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার হার বেড়ে যাচ্ছে। তাই কৃষি ও তামাক চাষ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোতে যুক্ত করা এবং আইনি কাঠামোর বাস্তবায়নের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

বাংলাদেশে শ্রম শক্তির ২৫.৩৪ মিলিয়ন[54] যুবক, যার বেশির ভাগই অপ্রাতিষ্ঠানিক ও ঝুঁকিপুর্ণ কাজের সাথে যুক্ত এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞান না থাকার জন্য পেশাগত দুর্ঘটনা ও রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এইজন্য যুব শ্রম শক্তিকে আইনি কাঠামোর মধ্যে নিয়ে এসে তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়টি নিশ্চিত করা অতীব জরুরি।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৬১ (৮), ৮৯, ৯০, ৯০ (ক) সহ বিভিন্ন ধারায় শ্রমিক/কর্মচারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল শ্রেণির ব্যক্তির জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির অধিকার রয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধানসমূহের প্রযোজ্যতার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শ্রমিক/কর্মচারী শব্দ ব্যবহার করার জন্য কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত সকল ব্যক্তি এই আইনের সুবিধাদি পাচ্ছে না। কোনো ব্যক্তি যেন এই আইনের বাইরে না থাকে, এই সকল ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শ্রমিকের পরিবর্তে "ব্যক্তি" অথবা "শ্রমিক/কর্মচারী/ব্যক্তি" দ্বারা প্রতিস্থাপন করা দরকার। প্রতিদিন শ্রমিকদের আবাসস্থল থেকে কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রে থেকে আবাসস্থল বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশিত কাজে বাইরে যাওয়া আসার ক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, যাতে প্রাণহানি বা শারীরিক জখম হয় সেই বিষয়টি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ৮০-তে যুক্ত না থাকার ফলে শ্রমিকরা তাদের আইনি অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ৯০ (ক) অনুযায়ী ৫০ জন বা তদূর্ধ্ব সংখ্যক শ্রমিক কাজ করে এমন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় "সেফটি কমিটি" গঠন করতে হবে। কিন্তু ৫০ জনের কম শ্রমিক কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি তৈরি করার বাধ্যবাধকতা না থাকার কারণে ৫০ জনের কম কাজ করে এমন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি গঠন করা হয় না। তাই ৫০ জনের কম কাজ করে এমন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে সেইফটি কমিটি গঠন করার বাধ্যবাধকতা অথবা শ্রমিকের সংখ্যা ২০ বা ৫০ জনের কম কাজ করে এমন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ০২ জনের (সম্ভব হলে ০১ জন নারী ও ০১ জন পুরুষ)-এর পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ থাকা প্রয়োজন।

একইভাবে সেইফটি কমিটি গঠন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিস্তৃত করার জন্য বিভিন্ন এলাকা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে সেইফটি কমিটি গঠন করার জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। শ্রমিকদের এলাকায় চলাচল, বাসস্থানে নতুন নতুন হয়রানি, সহিংসতা ও বিপদের উৎপত্তি হচ্ছে যা শ্রমিকের জন্য নতুন নতুন ঝুঁকি তৈরি করছে।

[53] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস, এপ্রিল-জুন ২০২৪) https://bbs.gov.bd/site
[54] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস, এপ্রিল-জুন ২০২৪) _ https://bbs.gov.bd/site

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ধারা ৩৫১ (৫ম ও ৬ষ্ঠ অধ্যায়) বলা আছে যে, এই আইনের অধীন বিধি দ্বারা নির্ধারিত করা যাবে (যেমন; আর্দ্রতার মান নির্ধারণ)। এখন পর্যন্ত এই ধারা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাধা তৈরি হচ্ছে।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের মধ্যে সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত স্যানিটারি, পানির ট্যাঙ্কি ও সুয়ারেজ লাইন পরিচ্ছন্নতা কর্মী, হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী, ময়লা-আবর্জনা ব্যবস্থাপনা কর্মী, রাসায়নিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী, ইলেক্ট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মীসহ ও জাহাজ ভাঙা শিল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মী বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি হচ্ছে ও দীর্ঘ মেয়াদে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় এবং শ্রম আইনে কোনো ঝুঁকিভাতার ব্যবস্থা নেই। এই সব ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইনে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ও ঝুঁকিভাতার বিধান যুক্ত করা প্রয়োজন।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমজীবী নারী-পুরুষের প্রতি হয়রানি এবং নির্যাতন প্রতিদিনকার ঘটনা। এইজন্য ২১ জুন ২০১৯-এ কর্মজগতে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসন কনভেনশন ১৯০ গৃহীত হয়। বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে ১৯০ কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করার দায়বদ্ধতা রয়েছে।

এই সামগ্রিক অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং সবার জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরি করার আইনি কাঠামো, আইন ও নীতিমালা পুনর্বিবেচনা করে নতুন বিষয়াদি বা ইস্যু যুক্ত করার মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির আইনি কাঠামো যুগোপযোগী করা সময়ের দাবি।

সবার জন্য নিরাপদ কাজ, স্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশ তৈরি করার জন্য এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনি কাঠামো ও নীতিমালা সর্বজনীন করার লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার সংজ্ঞা যুক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞাসমুহের পরির্বতন ও পরিমার্জন করা। এর মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় মাধ্যমে কর্মীর কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত অধিকার সমুন্নত থাকবে এবং কর্মক্ষেত্রে একটি প্রতিরোধমূলক ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে শ্রমিক কোনো প্রকার ঝুঁকি, দুর্ঘটনা বা শারীরিক, মানসিক অসুস্থতায় পড়বে না এবং রোগ ও দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হলে আইনগতভাবে যথাযথ চিকিৎসা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবে।

খ) ঝুঁকিপূর্ণ/অনিরাপদ কাজ ও ঝুঁকি নিরূপণের জন্য আইনি সংশোধনী এবং হালনাগাদ করা । অনিরাপদ বা ঝুঁকিপূর্ণ কাজকে 'অস্বীকৃতি জানানো'র আইনি অধিকার শ্রম আইনে যুক্ত করা।

- ঝুঁকি নিরূপণ করার জন্য ঝুঁকি নিরূপণ চেকলিস্ট ফরম/ফরমেট যুক্ত করা এবং শ্রম বিধিমালার অধীনে- রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত ঝুঁকিসমুহ চিহ্নিত করার বিষয়গুলি চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা।
- শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর তফসিল ৪-এর অধীনে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত ঝুঁকিসমুহ চিহ্নিত করার বিষয়গুলি চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বাংলাদেশ শ্রম আইনে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ ও পেশা, বিশেষ করে পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত (হাসপাতাল, রাসায়নিক, ইলেকট্রিক/ইলেকট্রনিক্স, জৈব ও ল্যান্ডফিল ইত্যাদি) খাত ও অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য ঝুঁকি ভাতা প্রাপ্তির বিধান যুক্ত করা।

গ) সেইফটি কর্মকর্তা, সেইফটি কমিটির জন্য সংশোধনী এবং হালনাগাদ করা:

- ধারা ৯০ (ক) সেফটি কমিটি গঠন করার বাধ্যবাধকতায় ৫০ জনের পরিবর্তে ২০ জন শ্রমিক নির্ধারণ করা। শ্রমিকের সংখ্যা ২০ বা ৫ জনের নিচে কাজ করে এমন কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ০২ জনের (সম্ভব হলে ০১ জন নারী ও ০১ জন পুরুষ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সম্পর্কে সরকার স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ (অফলাইন/অনলাইন) গ্রহণ করা।
- শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ ও শ্রমিকদের আবাসিক এলাকা ভিত্তিক সেইফটি কমিটি গঠন করার জন্য বিধিমালা প্রণয়ন এবং মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, সামাজিক অংশীজন ও এলাকার জনসাধারণকে নিয়ে এই সেইফটি কমিটি গঠন করা।

- সেইফটি কমিটি যাতে কাজ করতে পারে সেজন্য শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর ৮১, ৮৪ ও ৮৫ ধারায় সংস্কার এনে সেইফটি কমিটির সদস্যদের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা। বিধিতে ৫০ জনের কম শ্রমিকসহ প্রতিষ্ঠানের জন্য সেইফটি কমিটি সম্পর্কিত বিধান সুনির্দিষ্ট করা।
- সেইফটি কমিটির এখতিয়ারের মধ্যে শ্রমিক প্রতিনিধিগণ নিজ স্বাক্ষরে/বিনা স্বাক্ষরে ঝুঁকির বিষয়ে পরিদর্শককে সরাসরি অবহিত করতে পারবেন মর্মে বিধান রাখা।
- ঠিকাদারি সংস্থা কোনো মালিকের অধীন কোনো শ্রমিক বা কর্মী নিয়োগ করার ক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও সুযোগ করে দেওয়ার সাথে সাথে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থাপনা বিষয়কে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে আইনে এবং শ্রম বিধিমালায় বিধি ১৬ (৩)-এ অন্তর্ভুক্ত করা।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ব্যবস্থাপনা (OSH Management System) বিষয়টি (প্রতিষ্ঠানের জন্য পলিসি তৈরি, কর্মপরিকল্পনা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইত্যাদি) সেইফটি কমিটির কর্ম পরিধির মধ্যে যুক্ত করা।
- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর ৫৫ (১২) ধারায় বিদ্যমান প্রশিক্ষিত (সেইফটি) কর্মকর্তার পরিবর্তে একজন প্রশিক্ষিত "পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মকর্তা" নিয়োগের বিধান অন্তর্ভুক্ত করা। কাজের ঝুঁকি বিবেচনায় ৩০০ জনের কম শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে এমন কারখানায় এই বিধান প্রযোজ্য হতে পারে, যা সরকার কর্তৃক নির্দেশিত হবে এবং পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মকর্তার যোগ্যতা (প্রস্তাবিত):
    - সর্বনিম্ন স্নাতক/ডিপ্লোমা ডিগ্রিধারী হতে হবে।
    - "পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য অফিসার" সরকার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রশিক্ষিত হতে হবে অথবা প্রশিক্ষিত না হলে নিয়োগকারী অনুরূপ পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য ৩ মাসের মধ্যে অনুরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন। মৌলিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অথবা ৫ বছরের অভিজ্ঞতাসহ ৩ সপ্তাহ/৬ ক্রেডিটের প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্নকারী হতে হবে অথবা ১৫/২০ পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

ঘ) কৃষিকাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা।

- কৃষিকাজ ও তামাক চাষ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা।
- তদারকি করার জন্য উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে কৃষি বিভাগ, স্বাস্থ্য ও শ্রম বিভাগের সমন্বয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা ও নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার বন্ধ করা।

ঙ। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রোফাইল, নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা:

- নতুন সমস্যা, যেমন; এআই, ডিজিটালাইজেশন, অনলাইন প্লাটফর্ম, অতিমারী-কোভিড সহ যে কোনো সংক্রামক রোগ, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ করা।
- যুব শ্রমিকদের, কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আওতায় থাকা সেক্টর যেমন; এআই, রোবোটিকস, আধুনিক যন্ত্রপাতি, গিগ এবং ডিজিটাল তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারকারী শ্রমিকদের ঝুঁকির বিষয়গুলি নীতিমালায় যুক্ত করা।
- বর্তমান পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি প্রোফাইল এবং কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) ৫ বছর পর পর হালনাগাদ করা এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার সাথে সাথে বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে এসএমই, শিল্প সেইফটি ইউনিট (ISU), জখমের বিমা স্কিমের বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা। এই জন্য সরকার কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করে কারিগরি প্রযুক্তিগত ও পদ্ধতিগত পরামর্শ প্রদানসহ কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা।

চ) 'জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেফটি কাউন্সিল'কে কার্যকর করা:

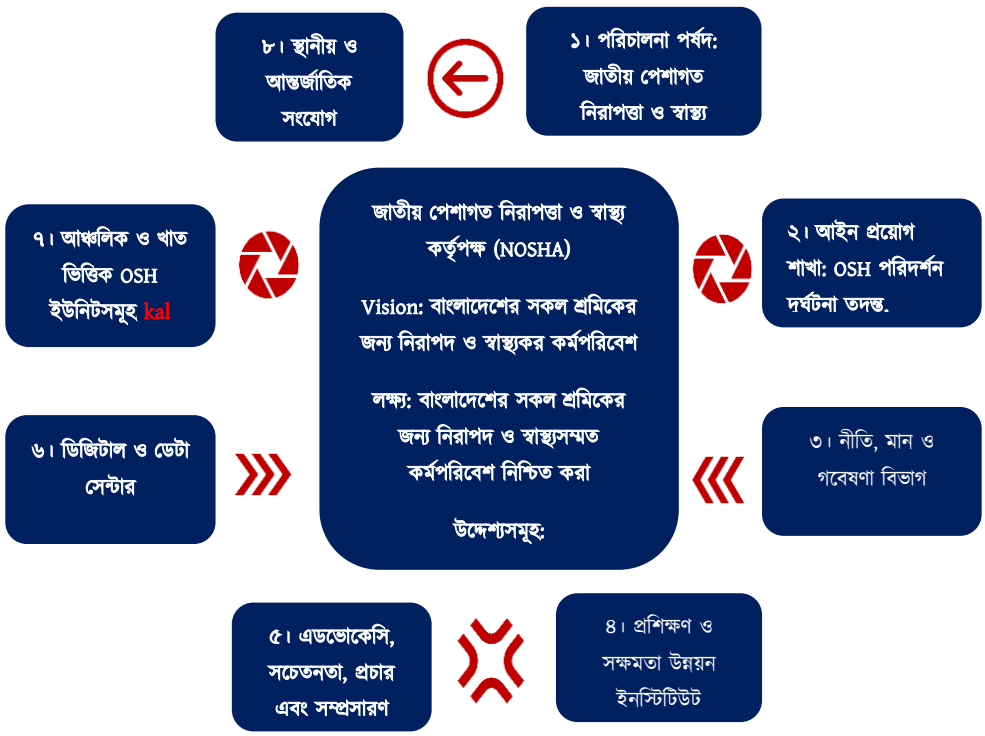
- 'জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেফটি কাউন্সিল'কে কার্যকর করার জন্য একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং প্রয়োজনে সেক্টর ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে যুক্ত করা।
- তফসিল ৪-এর সাথে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিদর্শনের জন্য 'জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও সেইফটি কাউন্সিলে'র সেক্টর ভিত্তিক চেকলিস্ট তৈরি করা।

ছ) পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ বিষয়ক আলাদা আইন করা। প্রস্তাবিত সংশোধনী করার পর ভবিষ্যৎ সমস্যা মোকাবিলা, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য, সেইফটি ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ বিষয়ক আলাদা আইন প্রণয়ন করা, যা সকল শ্রেণি ও পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের সর্বোত্তম স্বার্থ বিশেষ করে পেশাগত স্বাস্থ্য (মানসিক, শারীরিক), নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে আধুনিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন মোকাবেলার ভূমিকা রাখবে। এছাড়া প্রয়োজনে বিশেষ শ্রমগোষ্ঠীর জন্য আলাদা আইন (OSH Law) প্রণয়ন করা। এটা হবে দীর্ঘমেয়াদি একটি কাজ।

জ) Occupational Safety and Health Administration/Authority প্রতিষ্ঠা করা। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, আইন ও বিধিমালা, কর্মপরিকল্পনা (২০২১-২০৩০) বাস্তবায়ন ও তদারকি করার জন্য Occupational Safety and Health Administration/Authority প্রতিষ্ঠা করা যার মাধ্যমে শ্রম আইন বাস্তবায়ন ও অধিকার রক্ষার কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করবে। এটা হবে দীর্ঘমেয়াদি একটি কাজ।

ঝ) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মৌলিক কনভেনশন অনুস্বাক্ষর করা:

- বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক মৌলিক কনভেনশন ১৫৫ এবং ১৮৭ ও অনুস্বাক্ষর করার মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতকরণে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
- কর্মজগতে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসন কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর করা।



৩.৩.২। শ্রম আইন ও শ্রম পরিদর্শন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিদ্যুৎ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরিতে কাজ করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত। কিন্তু এই সংস্থাগুলি ও বিভাগের দক্ষতা, জনবল ও সঠিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মকৌশল না থাকার জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরির লক্ষ্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

শ্রম পরিদর্শনের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে, সকল খাতের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর পরিদর্শন ব্যবস্থা নেই এবং সংশিষ্ট সংস্থা/বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতার অভাব রয়েছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ অনুযায়ী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, মালিকদের সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়নে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট তৈরি ও বাস্তবায়ন হয়নি।

বর্তমানে বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থা তার নিজস্ব পদ্ধতিতে পরিদর্শন করছে। যার ফলশ্রুতিতে পরিদর্শন করার পরও নিরাপদ কর্মক্ষেত্র তৈরি এবং জবাবদিহিতা করার বিষয়টি এখনও প্রশ্নবিদ্ধ। প্রতিটি অধিদপ্তর এবং প্রতিষ্ঠানের আলাদা চেকলিস্ট বা তালিকা রয়েছে যার মাধ্যমে শিল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন (inspection) কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়গুলি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একটি সমন্বিত ব্যবস্থা। এই সমন্বিত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার জন্য সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা না থাকার কারণে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শ্রমিক এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফল অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। ইতোমধ্যে সজীব ফুড ইন্ডাস্ট্রি (২০২২) দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগের মাধ্যমে বিডার (Bangladesh Investment Development Authority) নেতৃত্বে পোশাক শিল্পের বাইরের কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে সমন্বিত পরিদর্শন বাস্তবায়ন করা হয়। এই উদ্যোগের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের ভিত্তিতে সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থাপনা সময়ের দাবি। এই সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বা টাস্ক ফোর্স গঠন করা যেতে পারে।

বর্তমান শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রম চেকলিস্ট ভিত্তিক। সেক্টর অনুযায়ী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির প্রতিরোধ ব্যবস্থার আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আলাদা চেকলিস্ট ও সেক্টর অনুযায়ী চেকলিস্ট না থাকার কারণে পেশাগত রোগ চিহ্নিতকরণ এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

বর্তমান প্রচলিত শ্রম পরিদর্শন সমাপ্ত করার পর প্রতিষ্ঠানটিকে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক কোনো ধরনের স্বীকৃতি বা মূল্যায়নপত্র দেওয়ার বিধান নেই। এই বিধান না থাকার কারণে কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে না। এই ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শন সমাপ্ত হওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের সেইফটি কমিটি, অংশগ্রহণমূলক কমিটি, মালিক ও শ্রমিকদের অবগত করা হয় না এবং পরিদর্শন সমাপ্ত হওয়ার পর পরিদর্শনের সংক্ষিপ্ত (২-৩ পাতা) বিবরণ অথবা মূল্যায়নপত্র প্রদান করা হয় না। এই মূল্যায়নপত্র প্রতিষ্ঠান বা কারখানার প্রধান ফটকে প্রদর্শিত থাকবে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য। এর মাধ্যমে কারখানার স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা এবং সুনাম বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমানে পেশাগত রোগ, ব্যাধি এবং দুর্ঘটনার তথ্য বছরে ০১ বার কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে শ্রম পরিদর্শনের প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয় যা যথেষ্ট নয়। তাই পেশাগত রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রতি ৩/৬ মাস অন্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা আবশ্যক।

বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ "ধারা ৯০-তে সকল কারখানায় সেইফটি কমিটি" তৈরি করার বিধান করা হয়। ইতোমধ্যে ২০২১-২২-এ প্রকাশিত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর তথ্য অনুযায়ী ১১০৭টি সেইফটি কমিটি তৈরি করা হয়েছে এবং এই পর্যন্ত ২০১৮-২০২৩ লেবার ইন্সপেকশন প্রতিবেদন অনুযায়ী মোট ৫৯৫৯টি সেইফটি কমিটি গঠন করা হয়। এর মধ্যে আরএমজি-তে ৩২৬৯টি এবং নন আরএমজি-তে ২৬৯০টি।[55] অনেকেই শুধুমাত্র বিদেশি ক্রেতাদেরকে সন্তুষ্ট করা ও আইনি চাহিদাপূরণের জন্য সেইফটি কমিটি গঠন করেছে। সেইফটি কমিটি যথাযথভাবে গঠন প্রক্রিয়ার দুর্বলতার কারণে শ্রমিক, কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান এর সুফল পাচ্ছে না।

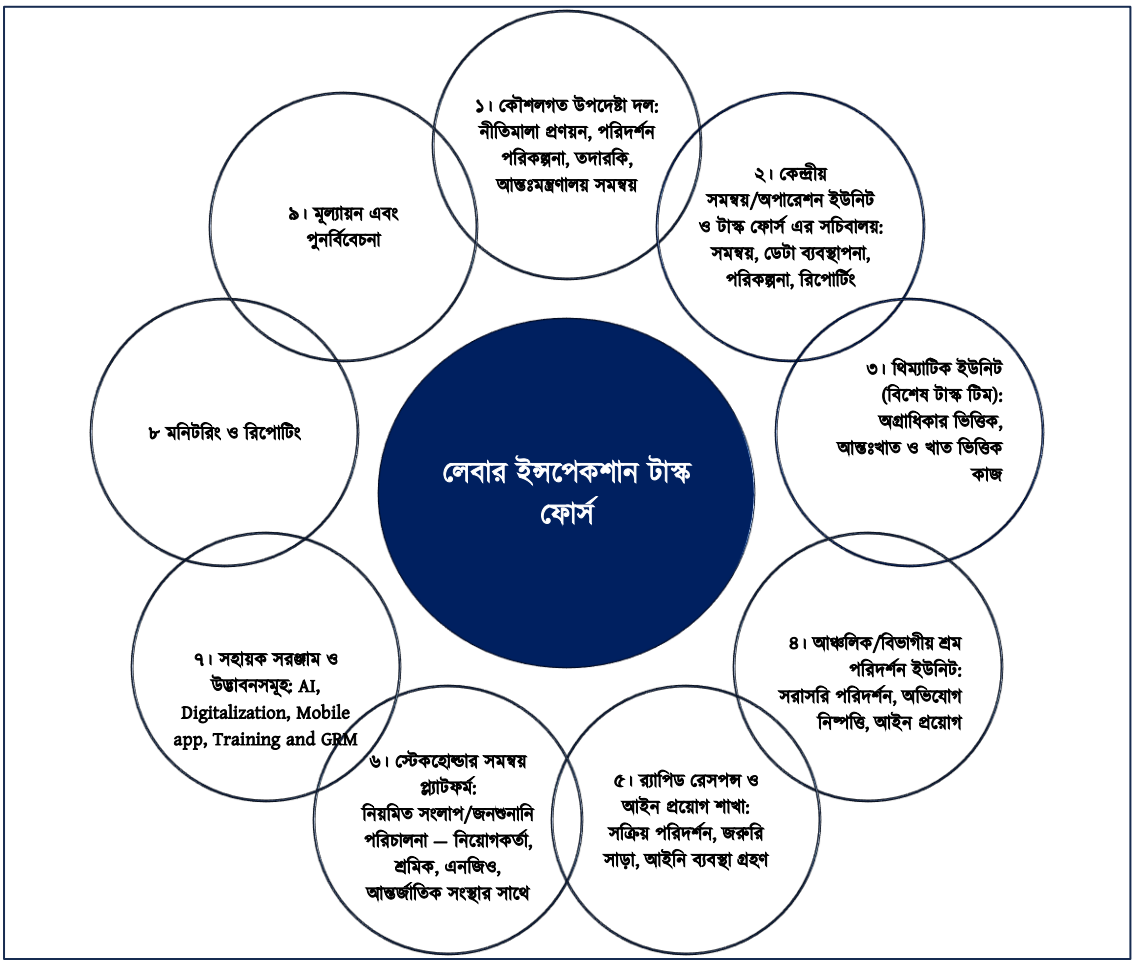
বাংলাদেশে মোট বয়লারের সংখ্যা ১৪৫৮৫টি[56]। বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় কত শ্রমিক আহত ও নিহত হয়েছে - যার সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। এছাড়া অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বয়লার, গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করার জন্য শ্রমিক ও জনসাধারণ বিভিন্নভাবে ঝুঁকিতে পড়ছে। একই সাথে প্রাতিষ্ঠানিক খাতে বয়লার ব্যবহারের সঠিক নিয়ম মেনে না

[55] লেবার ইন্সপেকশন প্রতিবেদন ২০২১-২০২২, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, https://dife.gov.bd
[56] বয়লার প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪। প্রধান বয়লার পরিদর্শক কার্যালয়, https://boiler.gov.bd

চলার কারণে প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিকদের দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে চলেছে। বয়লার পরিদর্শন করার জন্য প্রধান বয়লার পরিদর্শক থাকা সত্ত্বেও তাঁর জনবল, প্রযুক্তি ও অন্যান্য ঘাটতির জন্য এর সঠিক বাস্তবায়ন ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। সেই সাথে শ্রম আইনে শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক বয়লার ইন্সপেকশন বা মনিটর করার জন্য আইনি নির্দেশনা অপর্যাপ্ত। শুধুমাত্র প্রেশার ভেসেল ইন্সপেকশনের জন্য শ্রম বিধিতে নির্দেশনা থাকলেও সেটি অনেক জটিল ও সুনির্দিষ্ট নয়। যে কারণে শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক নামে মাত্র বয়লার পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া বয়লার পরিদর্শক ও শ্রম পরিদর্শক ইন্সপেকশনের মধ্যে সমন্বয় নেই। এই ক্ষেত্রে প্রধান বয়লার পরিদর্শক ও শ্রম পরিদর্শক যৌথভাবে কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে পরিদর্শন করা সময়ের দাবি।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর সংশোধিত ২০২২-এ বিধি ৭৫ অনুযায়ী মহাপরিদর্শক কর্তৃক ঘোষিত কর্তৃপক্ষের (তৃতীয়পক্ষ) মাধ্যমে প্রতিবছর একবার কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকি নিরূপণ করবেন এবং সংশ্লিষ্ঠ এলাকার উপ-মহাপরিদর্শককে অবহিত করবেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এটি বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, তৃতীয়পক্ষ নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঠিক ও স্বচ্ছ বাস্তবায়ন পদ্ধতি প্রয়োজন।

শ্রম আইন ও শ্রম পরিদর্শন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা দূর করার লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:



ক) শ্রম পরিদর্শনের জন্য টাস্ক ফোর্স গঠনে মাধ্যমে সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু করা:

- শ্রম পরিদর্শনের জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন এবং বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার সমন্বয়ে সমন্বিত শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা চালুকরণ। এইজন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও মালিক-শ্রমিক পক্ষের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা । এই টাস্ক ফোর্স এবং সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা তদারকি ও পরামর্শ দিবেন।

- প্রধান বয়লার পরিদর্শক ও কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর যৌথ পরিদর্শন কার্যক্রম প্রণয়ন এবং প্রধান বয়লার পরিদর্শককে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে অন্তর্ভুক্তকরণ। এটা হবে মধ্যমেয়াদি কাজ।

খ) সেক্টর অনুযায়ী আলাদা চেকলিস্ট প্রণয়ন, মূল্যায়নপত্র প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা:

- সেক্টর অনুযায়ী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয় বাস্তবায়ন করার জন্য আলাদা চেকলিস্ট প্রণয়ন করা। একই সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে শ্রম পরিদর্শন চেকলিস্ট হালনাগাদ করা।
- শ্রম পরিদর্শনের প্রতিবেদন বা মূল্যায়নপত্র প্রদান এবং প্রর্দশনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ। পরিদর্শন প্রতিবেদন বা মূল্যায়নপত্র সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

গ) রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনার প্রতিবেদন, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট তৈরি, সেইফটি কমিটির সঠিক বাস্তবায়ন করা:

- রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনার হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রতি ৩/৬ মাস অন্তর কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংক্রান্ত কাজ বাস্তবায়ন করার জন্য কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট তৈরি করা। মালিকদের প্রতিষ্ঠান/সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়নে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি ইউনিট তৈরি করতে হবে যা পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১৩ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত।
- সেইফটি কমিটির সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। নিয়মিতভাবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এই বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপন করা।

ঘ) বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর সংশোধিত ২০২২-এ বিধি ৭৫ বাস্তবায়ন করা দরকার। এই বিধি বাস্তবায়নের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান রেখে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা।

৩.৩.৩। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, আপদ চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশগত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ

বাংলাদেশে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নীতিমালা ২০১৩-তে পেশাগত মানদণ্ড তৈরির বিষয়টি বলা হলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এছাড়া বিদেশি ক্রেতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নতুন নতুন মানদণ্ড যুক্ত করার ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান নানা ধরনের সমস্যা ও আর্থিক ক্ষতির সন্মুখীন হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন-২০১৬, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন-১৯৯৫, বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন ২০১৮, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩, বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড-২০২০, বিস্ফোরক আইন-১৮৮৪, বয়লার আইন-২০২২-তে মানদণ্ডগুলি বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। তাই এই মানদণ্ডগুলি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে তৈরি করা আবশ্যক। এই জন্য একটি বিস্তৃত স্টেকহোল্ডার ম্যাপিং, স্টেকহোল্ডার পরামর্শ এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্প সেক্টর ভিত্তিক জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি (standard) মানদণ্ড প্রণয়নসহ সেক্টর ভিত্তিক মানদণ্ড বাস্তবায়ন করার জন্য এসওপি (SOP) তৈরি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে পোশাক শিল্প, ট্যানারি, রং তৈরি, সার, কীটনাশক, রি রোলিং মিল, সার কারখানা, কৃষি, ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য উৎপাদনশীল খাতে ৫০০ ধরনের (আনুমানিক) রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। বেশিরভাগ সময় এইসব রাসায়নিক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেমন; আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকটি বিবেচনা করা হয় না। এইসকল রাসায়নিক পরিবহণ, লোড আনলোড শ্রমিক এবং অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের জীবনে রোগব্যাধি ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। একইভাবে রাসায়নিক এর তালিকায় কী কী উপাদান রয়েছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা লিপিবদ্ধ করা হয় না। সে জন্য আইনি কাঠোমোতে রাসায়নিক ব্যবসা ও ব্যবহারকারীর জন্য আপদ, চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্তকরণ এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার (OSH management) বাস্তবায়ন জরুরি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, রাসায়নিক আমদানি, সংরক্ষণ, ব্যবহার, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন করার জন্য সরকারিভাবে আইনগত কোনো প্রতিষ্ঠান দায়িত্বপ্রাপ্ত না হওয়ার কারণে রাসায়নিক পদার্থের যথেচ্ছা ব্যবহারের জন্য শ্রমিক, পরিবেশ এবং শিল্প এলাকার মানুষের ঝুঁকি তৈরি হয়ে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। এই জন্য সরকারিভাবে কোনো

প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া জরুরি। অপরিকল্পিতভাবে রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষণ হওয়ার সাথে সাথে শিল্পঘন এলাকার আশে পাশে পানি, মাটি, বায়ু, কৃষি জমি, পশুপাখি, মাছ ইত্যাদি বিষাক্ত হয়ে যাওয়ার ফলে মানুষ এবং শ্রমিকের জীবনের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ ধারা ৬৮-তে বর্ণিত বিপজ্জনক কাজসমূহের সঙ্গে সময়ের প্রয়োজনে এবং শিল্পায়নে আধুনিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে নতুন নতুন বিপজ্জনক কাজ যুক্ত হচ্ছে, যেগুলিকে আইনি কাঠামোতে নিয়ে আসা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ ধারা ৬৮-কে হালনাগাদ করা দরকার।

আধুনিক বিশ্বায়নে বৈশ্বিক পরিবর্তনের ফলে সারা পৃথিবীতে এবং বাংলাদেশে পরিবর্তন লক্ষণীয়। আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার ২০২৪-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রতি বছরে ২.৪১ বিলিয়ন মানুষ, এর মধ্যে ৭১% শ্রমজীবী মানুষ অতিরিক্ত গরমে (হিট) আক্রান্ত হয়েছে। ২২.৮৫ মিলিয়ন আহত এবং ১৮,৭৭০ জন মৃত্যুবরণ করেছে।[57] প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে যে, অতিরিক্ত গরমের কারণে শ্রমজীবী মানুষের মাঝে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ফুসফুস এবং কিডনি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই এবং আইনি কাঠামোতে কোনো দিক নির্দেশনা না থাকার কারণে শ্রমিকদের ঝুঁকি দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই জন্য অতিরিক্ত গরমকে শ্রম আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার সাথে এই বিষয়ে গাইডলাইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা, আপদ চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া এবং পরিবেশগত বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক মানদণ্ড (OSH Standard) তৈরি ও ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন করা:

- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে মিল রেখে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক একক ও সেক্টর ভিত্তিক জাতীয় মানদণ্ড (National OSH Standard) তৈরি করা। এই বিষয়ে সরকার, মালিক, শ্রমিক ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সেইফটি কাউন্সিল কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা।
- কারখানা বা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক ব্যবস্থাপনা (OSH Management System) [পলিসি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, দায়িত্ব ইত্যাদি] কার্যক্রম বাস্তবায়ন। পলিসি, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থাসমূহকে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিয়মিত মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন প্রদান করা।

খ) রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ বির্পযয়, বিপজ্জনক কাজের তালিকা হালনাগাদ করা, রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন করার দায়িত্ব:

- রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পরিবেশগত ঝুঁকিসমুহ চেকলিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা। অথবা শ্রম বিধিমালা ২০১৫ তফসিল ৪ (৪)-এর সাথে ফরম আকারে যুক্ত করা।
- শ্রম বিধিমালার ৬৮ বিধিতে উল্লেখকৃত বিপজ্জনক কাজের তালিকা হালনাগাদ করা। হালনাগাদকৃত তালিকা স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- সরকারিভাবে রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা ও পরিদর্শন করার জন্য যোগ্য কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া এবং তা শ্রম আইনের ৬ অধ্যায়ে যুক্ত করা।
- অপরিকল্পিতভাবে রাসায়নিক ব্যবহার বন্ধ করে পরিবেশ দূষণ রোধ করে এলাকার আশে পাশে পানি, মাটি, বায়ু, কৃষি জমি, পশুপাখি, মাছ, শ্রমিক এবং এলাকার মানুষের জীবন ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা। এই বিষয়ে একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা

গ) সেক্টর ভিত্তিক বিভিন্ন মানদণ্ডের জন্য SOP (Standard Operating Procedure) তৈরি করা।

৩.৩.৪। পেশাগত রোগ ও ব্যাধি নির্ণয়, রিপোর্ট করার প্রক্রিয়া ও ক্ষতিপূরণ

পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্যের বর্তমান চিত্র খুবই নাজুক। যদিও আইনি কাঠামোতে কিছু বিষয় বলা হয়েছে তবে তা যথেষ্ট নয়। এই কারণে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক, কৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমিকরা যে পেশাগত রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয় তা আইনি দুর্বলতার কারণে তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয় না। এছাড়া যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি উল্লেখ্যযোগ্য তা হলো বাংলাদেশে পেশাগত

[57] Ensuring safety and health at work in a changing climate (ILO 2024) _ https://www.ilo.org/publications/ensuring-safety-and-health-work-changing-climate

রোগ ও ব্যাধির কোনো তথ্য নেই। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লেবার ইন্সপেকশন প্রতিবেদন (২০১৯-২০২২),[58] পর্যালোচনা করে পেশাগত রোগ ও ব্যাধির কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে পেশাগত রোগ ও ব্যাধি নির্ণয়ের প্রক্রিয়াটি বেশ জটিল এবং উপেক্ষিত। স্বাস্থ্যনীতি ২০১১-তে পেশাগত রোগ ও ব্যাধি একেবারেই উপেক্ষিত।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল শ্রমঘন দেশে এই পেশাগত রোগব্যাধির সমস্যা অনেকটাই জটিল। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জৈবিক, রাসায়নিক, শারীরিক এবং মানসিক কারণে এই পেশাগত রোগ ও ব্যাধিগুলি কাজের পরিবেশেই উপস্থিত থাকে। প্রতিদিন বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের কারণে কর্মরত শ্রমিকরা দীর্ঘ মেয়াদে রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার, বৈশ্বিক জলবায়ু ও পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন পেশাগত রোগের আর্বিভাব হচ্ছে। এই রোগগুলিকে পেশাগত রোগ হিসেবে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণে শ্রমিক এবং কর্মরত সকলের জীবনে ঝুঁকি তৈরি হওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকেরা চিকিৎসা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হয়। এই সমস্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে নতুন পেশাগত রোগব্যাধিগুলিকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর তফসিল ২-এর অধীন বিদ্যমান পেশাগত রোগব্যাধির তালিকাতে যুক্ত করে হালনাগাদ ও যুগোপযোগী করা দরকার।

পেশাগত রোগব্যাধির কারণে যে কোনো শারীরিক ও মানসিক রোগাগ্রস্ত একজন শ্রমিক ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা থেকে শুরু করে প্রাপ্তি পর্যন্ত সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি জটিল এবং এখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে।

পেশাগত রোগ নির্ণয়ের জন্য প্রাথমিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। অন্যদিকে একটি রোগকে পেশাগত রোগ হিসেবে ঘোষণা করার জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন জেলার সিভিল সার্জন যা কিনা এই প্রক্রিয়াকে জটিল এবং সময় সাপেক্ষ করে তোলে। ফলশ্রুতিতে ভুক্তভোগী শ্রমিক পেশাগত রোগ ও ব্যাধি নির্ণয়ের জটিলতা এবং দীর্ঘসূত্রিতার কারণে সুচিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হয়।

একটি পেশাগত রোগ কর্মক্ষেত্রে কাজের ধরন, শারীরিক ব্যবহার, রাসায়নিক, জৈবিক বা অন্যান্য কারণের দ্বারা হয়ে থাকে। এখানে উল্লেখ্য যে, পেশাগত রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সরকার স্বীকৃত কোনো নির্দিষ্ট হাসপাতাল এবং চিকিৎসক নেই। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী শ্রম পরিদর্শকালে প্রাথমিকভাবে পেশাগত রোগ চিহ্নিত করার দায়িত্ব কলকারখানা প্রতিষ্ঠান ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের। কিন্তু কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে কোনো বিশেষায়িত ল্যাব এবং বিশেষায়িত ডাক্তারদের সমন্বয়ে কোনো বিভাগ বা ইউনিট নেই। যার কারণে পেশাগত রোগ নির্ণয়ে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হয় ও পেশাগত রোগে আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা দীর্ঘায়িত হওয়ার সাথে সাথে তারা পারিবারিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে বিশেষায়িত ল্যাব এবং বিশেষায়িত ডাক্তারদের সমন্বয়ে বিভাগ বা ইউনিট স্থাপন করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে শ্রম অধিদপ্তের অধীনে ৩২টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র আছে যা বর্তমানে কার্যত অকার্যকর। এই কেন্দ্রসমূহ পেশাগত রোগব্যাধি নির্ণয় ও নিরাময়ের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এই কেন্দ্রগুলিতে নারীশ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুবিধা না থাকার কারণে নারীশ্রমিকরা মাতৃকালীন সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হয়। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে দক্ষ চিকিৎসক ও পেশাগত রোগ নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও যন্ত্রপাতির অভাব বিদ্যমান থাকায় শ্রমিকেরা পেশাগত রোগব্যাধি নির্ণয় ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সেবার মান উন্নয়ন, আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা দরকার।

দেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রের উন্নতি হলেও অন্যান্য বিশেষায়িত বিভাগের মত করে পেশাগত রোগ নির্ণয়ের জন্য আলাদা বিভাগ এবং এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বড়ই অভাব। এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের চিকিৎসকদের একাডেমিক কারিকুলামে পেশাগত রোগব্যাধি নিয়ে কমিউনিটি মেডিসিন বিষয়ক অধ্যায়ে নাম মাত্র আলোচনা করা হয় যা পেশাগত রোগ নির্ণয়ের জন্য বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যথেষ্ট নয়। এছাড়া নিপসম (NIPSOM)-এ পেশাগত স্বাস্থ্য ও ব্যাধি

[58] কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, https://dife.gov.bd

নিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম আধুনিকীকরণ করা ও নার্সদের শিক্ষা কারিকুলামে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আলাদা অধ্যায় বা কোর্স যুক্ত করা প্রয়োজন।

পেশাগত রোগের জন্য আলাদা কোনো বিশেষায়িত হাসপাতাল ও পরীক্ষাগার গড়ে উঠেনি। যা কিনা অন্য অনেক রোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। তদুপরি বড় বড় হাসপাতালগুলিতেও আলাদা কোনো বিশেষায়িত বিভাগ বা ইউনিট নেই। যদিও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা ২০১৩-তে বড় বড় হাসপাতালগুলিতেও আলাদা বিশেষায়িত বিভাগ বা ইউনিট স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। এছাড়া শিল্প অঞ্চলে এবং শ্রমঘন এলাকায় সাধারণ মানের হাসপাতালের সংখ্যাও কম। এর ফলে শ্রমিক তার সাধারণ স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই বড় বড় হাসপাতালগুলিতেও আলাদা বিশেষায়িত পেশাগত রোগ ও ব্যাধি বিভাগ বা ইউনিট স্থাপন করার সাথে সাথে শ্রমঘন এলাকায় গুচ্ছভাবে পৃথক স্বাস্থ্য ক্লিনিক বা চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করে শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবার অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বর্তমানে কাজের বহুমাত্রিকতার কারণে শ্রমিক এবং কর্মরত মানুষের মাঝে নতুন নতুন স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি হয়। অংশীজনের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে, অতিরিক্ত কাজের চাপের কারণে শ্রমিকদের মানসিক ও শারীরিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি হয় (যেমন; আরগনমিক্স) এবং দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করা শ্রমিকরা বা বসে কাজ করা শ্রমিকরা সামগ্রিকভাবে ১৯.০% ক্লান্তিতে (১৯.০%) এবং ব্যক্তিগতভাবে ২৯.৯% ক্লান্তিতে ভোগেন।[59] এই সমস্যাগুলির সঠিক দিকনির্দেশনা বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬-এ না থাকার কারণে শ্রমিকদের রোগব্যাধি ও শারীরিক সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলছে।

বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক খাতে ব্যাপকভাবে রাসায়নিক ব্যবহার করার ফলে কত শ্রমিক পেশাগত রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার কোনো তথ্য নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, রাসায়নিক কাজে পেশাগত রোগ নির্ণয়ের কোনো ক্লিনিক বা হাসপাতাল নেই। তাই শ্রমঘন এলাকায় এবং রাসায়নিক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য পেশাগত রোগ নির্ণয়ের ক্লিনিক বা হাসপাতাল তৈরি করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ৮৫%-এরও বেশি নারী কর্মী বিভিন্ন প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা এবং অপুষ্টিতে ভুগছেন,[60] যাদের অধিকাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অধ্যায় ৪-এ প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর অষ্টম অধ্যায়ে চিকিৎসা কক্ষ নারীদের স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে মাতৃত্বকালীন সুবিধাদির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য বিষয়াদি যেমন; মানসিক স্বাস্থ্য, হয়রানি বা সহিংসতার শিকার হলে কাউন্সেলিংয়ের বিধান রাখা হয়নি। তাই বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে এই বিষয়গুলি যুক্ত করে নারীদের স্বাস্থ্যসেবা উন্নত করা দরকার।

পেশাগত স্বাস্থ্যে ও নিরাপত্তার বিষয়ে রাস্তায় কর্মরত শ্রমজীবীদের উপর শ্রবণশক্তি বিষয়ক এক গবেষণায় দেখা যায় যে, ৪১.৯% রিক্সাচালক, ৩০.৭% পুলিশে কর্মরত ট্রাফিক পুলিশ এবং ২৩.৯% সিএনজি ও লেগুনা চালক শ্রবণ শক্তি হারিয়েছে।[61] এখানে উল্লেখ্য যে, শ্রবণশক্তিকে পেশাগত রোগ হিসেবে আইনি কাঠামোতে স্বীকৃতি না থাকার কারণে কর্মজীবী ও শ্রমিকরা সমস্ত আইনি সুযোগ সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই শ্রবণশক্তিকে আইনি কাঠামোতে যুক্ত করা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর তফসিল ২-এর অধীন বিদ্যমান পেশাগত রোগব্যাধির তালিকাটিতে যুক্ত করা প্রয়োজন।

●[59] Sarmin Sultana" Shanta Dutta' Rabeya Yasmin' SK Akhtar Ahmad' Shafiur Rahman Irin Hossain, MH Faruquee, Manzurul Haque Khan (2019), FATIGUE AMONG THE GARMENT WORKERS INA SELECTED INDUSTRY, Journal of Preventive and Social Medicine 38(1), November 2019, pp 45-53; Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/337049033

[60] Takmina Kamal, Surina Tarzid (2024), Occupational Health and Safety in the RMG Sector of Bangladesh: An Enormous Order, Journal of Business and Economic Development 9(2), July 2024, pp35-43; Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/384774012

[61] Noise pollution causing hearing loss in those who work on city roads, 8 November, 2022; Retreived from https://www.tbsnews.net/bangladesh/noise-pollution-causing-hearing-loss-those-who-work-city-roads-528018

আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণায় দেখা যায় যে, সারা পৃথিবীতে আনুমানিক ১৪৩ মিলিয়ন কর্মরত মানুষ মাঝারি থেকে মারাত্মক দৃষ্টিশক্তি সমস্যায় ভুগছে। এর মধ্যে ১৮ মিলিয়ন দৃষ্টিহীনতায় আক্রান্ত এবং ১৩ মিলিয়ন কর্মরত মানুষ দৃষ্টিহীনতায় ভুগছে যা তাদের কর্মস্থল থেকে প্রাপ্ত।[62] তবে বাংলাদেশে কতজন শ্রমিক এ সমস্যায় আক্রান্ত এর কোনো তথ্য নেই। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০১৬-এর অধ্যায় ৬-এর ধারা ৭৫-এ চোখ নিরাপত্তা নিয়ে বলা হয়েছে শুধুমাত্র সেই সকল কাজের ক্ষেত্রে যেমন; যে সকল কাজে বিচ্ছুরিত কণা বা টুকরো হতে বিপদের আশঙ্কা, অতিমাত্রায় আলো বা উত্তাপের কারণে চোখের ক্ষতির আশঙ্কা। কিন্তু যে কোনো কাজেই দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। যেমন; সেলাইয়ের কাজ, কম্পিউটারে কাজ, গাড়ি চালানোর কাজ ইত্যাদি। তাই দৃষ্টিশক্তির যত্নের বিষয়টি আরো বিস্তারিত আইনে যুক্ত করা এবং পেশাগত রোগ ও ব্যাধির তালিকায় পেশাগত রোগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

জাহাজ ভাঙা শিল্পখাতে জড়িত শ্রমিকরা স্বাস্থ্যগত ঝুঁকির মধ্যে কাজ করে। শ্রমিকরা প্রতিদিন এসবেস্টস, লিড, মারকারি, কেডমিয়াম, জিংক, টক্সিক, ধূলাবালি ও অন্যান্য রাসায়নিক কেমিক্যালের মধ্যে কাজ করার ফলে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করে।

প্রায় ৫০,০০০ অধিক শ্রমিক পাথর ভাঙা শিল্পের কাজের সাথে জড়িত। এই সকল শ্রমিকের বেশিরভাগ লালমনিরহাট, পঞ্চগড় ও সিলেট এলাকার। এই সকল শ্রমিকরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। এর মধ্যে বেশিরভাগ সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত। এই রোগ নিরূপণ করার প্রক্রিয়া জটিল ও ব্যয় সাপেক্ষ যা শ্রমিকের পক্ষে বহন করা সম্ভব হয় না। ফলে তা পরবর্তীতে শ্রমিকের মৃত্যু ঝুঁকি তৈরি করে। এই রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় না হওয়ার কারণে শ্রমিকরা আইনগতভাবে প্রাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

একজন শ্রমিকের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক মাত্রা মূল্যায়ন জরুরি। তাই প্রতিবন্ধিতা নিরূপণ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের দ্বারা নিরূপণ করা। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতা নিরূপণ বিষয়ে তথ্য ও দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত। যা আইনে যুক্ত করাসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

পেশাগত রোগ ও ব্যাধি নির্ণয়, রিপোর্ট করার প্রক্রিয়া ও ক্ষতিপূরণের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) পেশাগত রোগব্যাধির তালিকা হালনাগাদ, মানসিক স্বাস্থ্য (স্ট্রেস) ও শারীরিক (আরগনমিক্স) এবং অতিরিক্ত শ্রমঘণ্টা ও রোগব্যাধির শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া, প্রতিবেদন তৈরি সহজতর এবং আইনি কাঠামোসহ সকল বিষয় হালনাগাদ করা:

- শ্রম আইনে পেশাগত রোগব্যাধির তালিকাটি হালনাগাদ/যুগোপযোগী করা: অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে নতুন পেশাগত ঝুঁকি, রোগব্যাধি বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর তফসিল ২-এর অধীন বিদ্যমান পেশাগত রোগব্যাধির তালিকা হালনাগাদ/যুগোপযোগী করা এবং প্রতি ৩-৫ বছর অন্তর হালনাগাদ করা। কোভিডের মতো অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি ও ক্রমবর্ধমান শিল্প ও পেশা থেকে উদ্ভূত ব্যাধিকে পেশাগত রোগের তালিকায় সন্নিবেশিত করা।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের জন্য এলাকা ভিত্তিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ৫০০০-এর কম শ্রমিক কর্মরত আছে এমন কারখানা/প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে ও তত্ত্বাবধানে শিল্প এলাকায় ক্লাস্টার ভিত্তিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা। ৫০০০ ও তদূর্ধ্ব শ্রমিক কর্মরত আছে এমন কারখানায় শ্রম আইনের বিদ্যমান বিধান কার্যকর হবে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ মানসিক স্বাস্থ্য (স্ট্রেস) ও শারীরিক (আরগনমিক্স) এবং অতিরিক্ত শ্রমঘণ্টার কারণে সৃষ্ট রোগব্যাধি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ সংযুক্ত করা। শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করা।
- শ্রম আইনে পেশাগত রোগব্যাধি শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া, প্রতিবেদন তৈরি সহজতর এবং হালনাগাদ করা। এই জন্য একটি সহজবোধ্য ফর্ম শ্রম আইনে তফসিল আকারে যুক্ত করা।

[62] Eye health and the world of work, Geneva: International Labour Office, 2023; Retreived from https://www.ilo.org/publications/eye-health-and-world-work

- শ্রম আইন ২০০৬ এবং শ্রম বিধিমালা ২০১৫ নারী শ্রমিকদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য, হয়রানি বা সহিংসতার উত্তরণের জন্য কাউন্সিলিংয়ের বিধান রাখা।

খ) পেশাগত রোগ নির্ণয়ের জন্য বিশেষায়িত ল্যাব হাসপাতালে বিশেষায়িত OSH ইউনিট বা ক্লিনিক স্থাপন ও কেন্দ্রীভূত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা। কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন একটি বিশেষায়িত ল্যাব এবং বিশেষায়িত ডাক্তারদের সমন্বয়ে একটি বিভাগ বা ইউনিট স্থাপন করা।

- পেশাগত রোগ নির্ণয় করার জন্য নিপসম (NIPSOM)-এর অধীনে একটি বিশেষায়িত ল্যাব স্থাপন করা।
- সকল জেলার শিল্প অঞ্চলে এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সরকারি ও বেসরকারি বড়ো বড়ো হাসপাতালে পেশাগত রোগব্যাধির জন্য বিশেষায়িত ইউনিট বা ক্লিনিক স্থাপন করা। যেখানে কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তর নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করবে।
- শ্রমঘন এলাকা জাহাজ ভাঙা ও স্টিল-রিরোলিং শিল্পখাতে নিয়োজিত এবং রাসায়নিক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য পেশাগত রোগ নির্ণয়ের জন্য ক্লিনিক বা হাসপাতাল তৈরি করা এবং চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- পাথর ভাঙা শ্রমিকদের জন্য প্রতি বছর রোগব্যাধি নির্ণয় করার জন্য আইনি বিধানসহ সমন্বিতভাবে হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করা ও ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা। অর্থাৎ শ্রম অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরির্দশন অধিদপ্তর-এর সমন্বিতভাবে হেলথ ক্যাম্পের আয়োজন করা।
- রোগব্যাধির জন্য কেন্দ্রীভূত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা। এটি গঠিত হবে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের (NOSHTRI) অধীনে।

গ) চিকিৎসক, নার্স ও মেডিকেল টেকনিশিয়ানদের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা একাডেমিক কারিকুলাম যুক্ত করা:

- বাংলাদেশে চিকিৎসকদের জন্য একাডেমিক কারিকুলামে (MBBS) আলাদা পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে আলাদা কোর্স বা বিষয় যুক্ত করার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। এইজন্য সংশিষ্ট মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নার্স ও মেডিকেল টেকনিশিয়ানদের শিক্ষা কারিকুলামে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক আলাদা অধ্যায় বা কোর্স সংযুক্ত বা চালু করা।

ঘ) শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিকে আধুনিকায়ন করা:

- শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিকে আধুনিকায়ন, চিকিৎসক, প্রয়োজনে জনবল ও যন্ত্রপাতি প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য পেশাগত রোগব্যাধি ও কাউন্সেলিং চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
- নারীশ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন সুবিধাদি নিশ্চিত করাসহ ন্যায্য মূল্যে ঔষধের ব্যবস্থা করা।

ঙ) শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ও প্রতিবন্ধিতা সেবা:

- শ্রবণশক্তিকে আইনি কাঠামোতে যুক্ত করা এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর তফসিল ২-এর অধীন বিদ্যমান পেশাগত রোগব্যাধির তালিকাটিতে যুক্ত করা।
- দৃষ্টিশক্তি যত্নের বিষয়টি আরো বিস্তারিত আইনে যুক্ত করা এবং পেশাগত রোগ ও ব্যাধির তালিকায় পেশাগত রোগ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।
- প্রতিবন্ধকতা নিরূপণ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

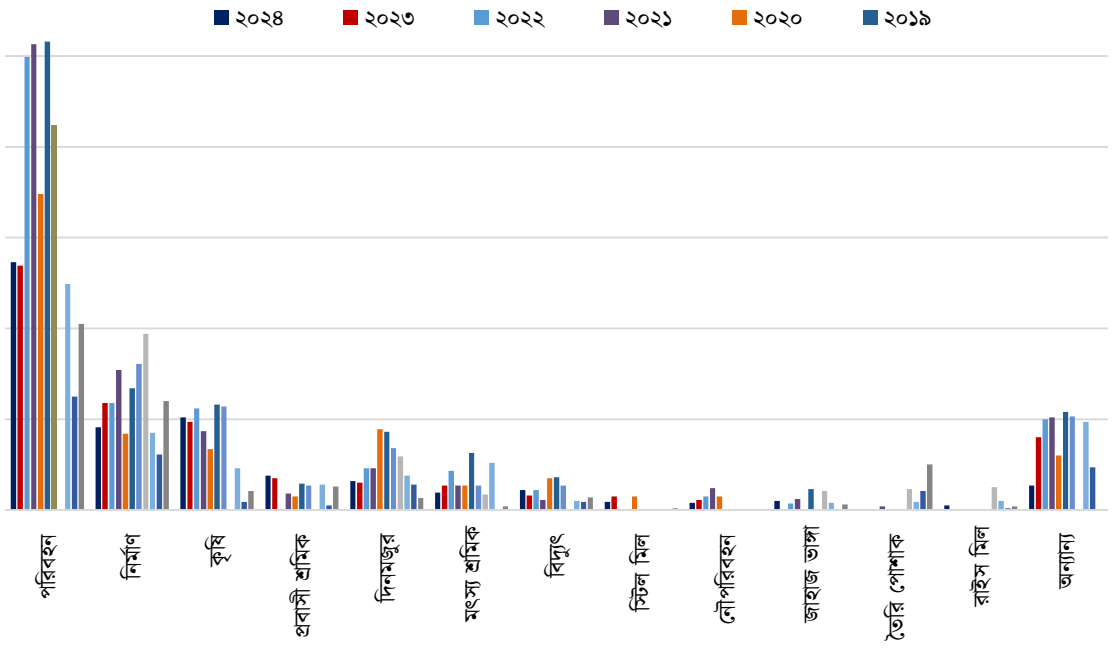
৩.৩.৫ দুর্ঘটনা এবং অভিযোগ করার প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন

বাংলাদেশে পেশাগত দুর্ঘটনা বিষয়ে বিলস কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, গত ১২ বছরে (২০১৩-২০২৪) ১০,২১০ জন নিহত হয়েছেন। ২০২৪-এর রিপোর্ট অনুসারে দেশে সবচেয়ে বেশি ২৭৩ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে পরিবহণ খাতে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১০২ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে কৃষি খাতে। তৃতীয় সর্বোচ্চ ৯১ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় নির্মাণ খাতে। এছাড়া রিকশা শ্রমিক ৪৩ জন, প্রবাসী শ্রমিক ৪৮১৩ জন, দিনমজুর ৩২, বিদ্যুৎ খাতে ২২, মৎস্য শ্রমিক ১৯, জাহাজ ভাঙা শিল্পে ০৯ জন শ্রমিক নিহত হয়।[63] প্রসঙ্গত বলা যায় যে, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার তথ্য অনুযায়ী প্রতি বছর বিশ্বে ২.৯৩ মিলিয়ন (২৯ লাখ ৩০ হাজার) শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে মারা যায়। [64]

জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশের শিল্প খাতে পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়গুলি গুরুত্বের সাথে সামনে আসে ২০১৩ রানা প্লাজা কমপ্লেক্সের মর্মান্তিক ভবন ধ্বসের পরে, যেখানে ১,১৩৪ জন নিহত হয়। সরকার বাংলাদেশ শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ প্রণয়ন করে। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর বিধানগুলি কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা (বিএলআর) ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়। ২০১৮ সালে বাংলাদেশ শ্রম আইন অধিকতর সংশোধন করা হয়, যদিও পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের বিষয়ে আইনে বারবার পরিবর্তন হলেও এখন পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সেইসাথে ২০২৪ সালে জুলাই বিপ্লবে নিহত ও আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা সুবিধাদি পাওয়ার জন্য তাদেরকে আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লেবার ইন্সপেকশন প্রতিবেদনে ২০২১-২০২২ দেখা যায় যে, ১৪৬ জন দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে। সেইসাথে ২০১৯-২০২২ পর্যন্ত লেবার ইন্সপেকশন প্রতিবেদনে পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত হয় যে ৩০৩ জন নিহত হয়েছে।[65] নিহতের সংখ্যা ২০২০-২১ তুলনায় ২০২১-২২-এ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র ৪.৩.১: কর্মস্থলে দুর্ঘটনার চিত্র



[63] দুর্ঘটনা বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৩-২০২৪, বিলস_ https://bilsbd.org/

[64] Topic portal, Safety and health at work, ILO; https://www.ilo.org/topics-and-sectors/safety-and-health-work

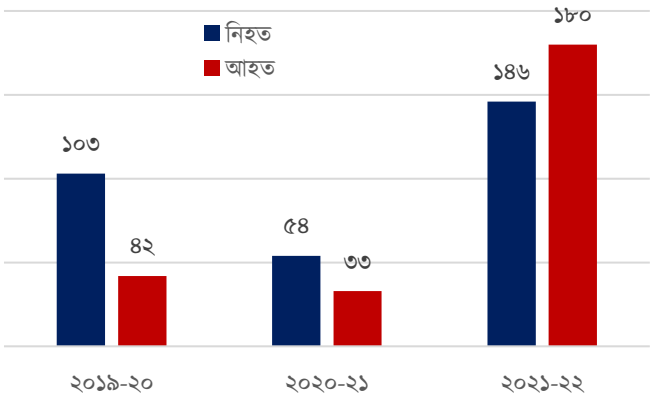
[65] লেবার ইন্সপেকশন প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২২, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, https://dife.gov.bd

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী সামান্য/মারাত্মক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার আইনগত বিধান থাকা সত্ত্বেও আইন অনুযায়ী সামান্য/মারাত্মক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে পরিদর্শক বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে জানানো হয় না। এছাড়া মালিকপক্ষ শুধু মৃত্যুবরণ করলে তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে। কিন্তু সামান্য/মারাত্মক দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য জানানো হয় না, এমন কি লিপিবদ্ধও করা হয় না। এই কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিদপ্তর/কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর সকল দুর্ঘটনা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে পারে না।

বাংলাদেশে যে সমস্ত শিল্পকারখানা/ প্রতিষ্ঠানে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটেছে (যেমন; সারাকা গার্মেন্টস, স্পেক্ট্রাম গার্মেন্টস, রানা প্লাজা, তাজরিন গার্মেন্টস, টাম্পাকো ফয়েলস, এফআর টাওয়ার, বিএম ডিপো, সজীব ফুডস, নিমতলী ট্র্যাজেডি, বেইলি রোড ট্র্যাজেডি, এস এন কর্পোরেশনের গ্রিনইয়ার্ড ইত্যাদি) এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত করা হয়েছে, তার প্রতিবেদন কখনই জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়নি। ফলে দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি সংক্রান্ত কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যানসহ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তা অন্ধকারে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৮০ ধারা দুর্ঘটনা সম্পর্কে নোটিসে কোনো দুর্ঘটনা হলে শ্রমিক বা শ্রমিক পক্ষ হতে বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক সরাসরি দুর্ঘটনার অভিযোগ প্রদানের কোনো বিধান না থাকার কারণে শ্রমিকরা সরাসরি কোনো তথ্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারে না। এই কারণে সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য তথ্য বা ডাটা পাওয়া যায় না। তাই শ্রম বিধিমালা ২০১৫ অনুযায়ী মারাত্মক দুর্ঘটনা ও সামান্য দুর্ঘটনার তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার প্রয়োজন এবং সেই সাথে দুর্ঘটনা হলে শ্রমিক বা শ্রমিক পক্ষ হতে বা ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক সরাসরি দুর্ঘটনার অভিযোগ প্রদানের বিষয়ে শ্রম আইনে বিধান রাখা আবশ্যক।

চিত্র ৪.৩.২: শ্রম প্রতিবেদন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে আহত ও নিহত শ্রমিকের সংখ্যা



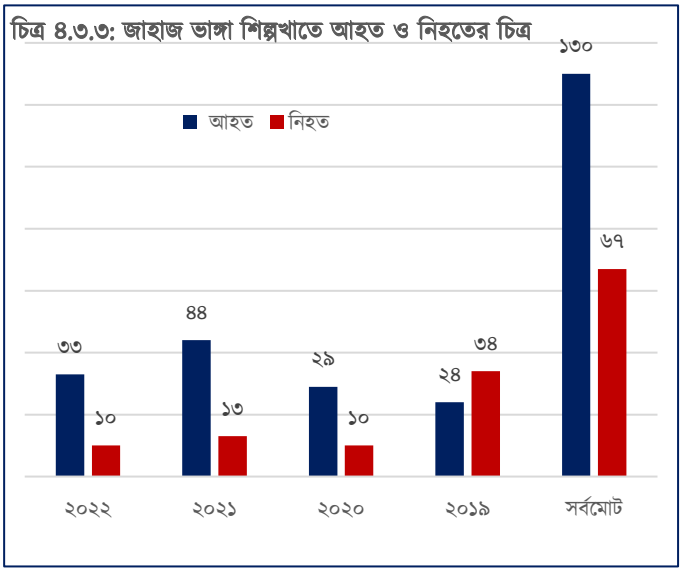
এখানে উল্লেখ যে, রানা প্লাজা ও তাজরিন সহ অন্যান্য দুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী বা অক্ষম শ্রমিকদের সমাজে এবং পরিবারে পুনর্বাসিত হতে বিভিন্ন ধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয় ও সামাজিকভাবে অসহায়বোধ করে। এজন্য আহত ও পঙ্গুত্ববরণকারী বা অক্ষম শ্রমিকদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সামাজিক সংগঠনসমূহ সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে সামাজিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদানরত সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে সংযুক্ত করে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান, পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং গুরুতর আহত শ্রমিকের জন্য জীবনব্যাপী উন্নত চিকিৎসা এবং সেবার নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সেই সাথে ২০২৪ সালে জুলাই অভ্যুত্থানে ৮২০ জন শহিদ (নিহত) ও ১১৮৫০ আহত হয়।[66] এর মধ্যে শ্রমিকদের নিহত ও আহতের হার উল্লেখ্যযোগ্য। এই শ্রমিকদের সুচিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। এই জন্য জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদ (নিহত) ও আহতদের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণ সময়ের দাবি। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে হেলথ কার্ড প্রদানসহ বিনামুল্যে চিকিৎসা পাওয়ার সুব্যবস্থা করা। বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ বিধি ৭০-এ সামান্য দুর্ঘটনার নোটিস: শ্রমিকের কাজে অনুপস্থিতির সময় ২০ দিন হলে তা সামান্য দুর্ঘটনা হিসেবে আখ্যায়িত হবে। এই ক্ষেত্রে ২০ দিন দীর্ঘ সময় হওয়ার কারণে শ্রমিকের কাজে যোগদান এবং অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিত হয়। সেই কারণে বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর বিধি ৭০ সামান্য দুর্ঘটনার নোটিসের ক্ষেত্রে শ্রমিকের কাজে অনুপস্থিতির সময়কাল ২০ দিনের পরিবর্তে ৭ দিন করা প্রয়োজন।

[66] জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশন,২২ মার্চ ২০২৫, Retrived from https://jssfbd.com

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিপূরণের যে বিধান রাখা হয়েছে তা বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যথেষ্ট না। ইতোমধ্যে রানা প্লাজার দুর্ঘটনা পরবর্তীতে ক্ষতিপূরণের সমাধানের একটা অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে। সেই অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি ধরে ক্ষতিপূরণের সমাধানের জন্য আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সময়ের দাবি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১২১ এবং পেইন এন্ড সাফারিং অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করে অথবা পেশাগত দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণের জন্য আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুস্বাক্ষর করে সে মোতাবেক আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

চিত্র ৪.৩.৩: জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পখাতে আহত ও নিহতের চিত্র



সর্বোপরি পেশাগত দুর্ঘটনার জন্য একটি প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। এইজন্য আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থার পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা সিসটেম গাইডলাইন ২০০১-এর বাস্তবায়ন জরুরি। এই গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি কলকারখানা বা প্রতিষ্ঠানে আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ এবং সুপারিশের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং আইনি কাঠামোতে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ এবং সুপারিশ যোগ করে দুর্ঘটনা রোধে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

নির্মাণ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঝুঁকির মধ্যে কাজ করছে। বাংলাদেশের কাঠামোগত উন্নয়নে নির্মাণ শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের বিষয়টি উপেক্ষিত এবং বেশিরভাগ সময় বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তিতে জটিলতা এবং ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট নয়।

জাহাজ ভাঙা শিল্পখাতে ২০২২-এ ১০ জন নিহত হয় ও আহত হয় ৩৩ জন। ২০১৯-২০২২ পর্যন্ত এই খাতে ৬৭ জন নিহত ও আহত হয় ১৩০ জন।[67] গত এক দশকে আইনিসহ অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু আইনি কাঠামোর বাস্তবায়ন দুর্বলতার কারণে জাহাজ ভাঙা শিল্পখাতে দুর্ঘটনা বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

দেশের প্রায় ২ কোটি মানুষ মৎস্য খাতের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে।[68] জীবিকার টানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে মাছ ধরতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রতিবছর নিখোঁজ হয় অনেক জেলে। এখানে উল্লেখ যে, ২০১৬-২০২২ সালের মাঝে ৬০৯টি ট্রলার ডুবি হয়েছে, নিখোঁজ হয়েছে ১৭২, আহত হয়েছে ১১০৬ এবং নিহত হয়েছে ২৫৯ জন।[69] পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে নীতিমালা ২০১৩, বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ এই সকল শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়টি উপেক্ষিত এবং জেলে শ্রমিকদের পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য বিষয়টি আইনি কাঠামোতে অনুপস্থিত।

বৈশ্বিক পরিবর্তন এবং পরিবেশগত বির্পযয়ের কারণে বাংলাদেশে বজ্রপাতের কারণে মৃত্যুর হার দিন দিন বেড়েই চলেছে। গত ১৯৯০-২০১৬ পর্যন্ত ৩০৮৬ জন মৃত্যুবরণ করেছে এবং আহত হয়েছে ২৩৮২ জন। এই সময়ে গড়ে ১১৪

[67] Shipbreaking Industry of Bangladesh: Occupational Health and Safety Standards and Practices, DTDA and Bangladesh Institute of Labour Studies-BILS, January 2024_ https://bilsbd.org

[68] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২৪, ম্যস ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়_ https://mofl.gov.bd/site/view/annual_reports/Annual-Report

[69] সময় সংবাদ, ১৯/০৯/২০২২ সাগরে মাছ শিকারে নিরাপত্তা নেই জেলেদের_ https://www.somoynews.tv/news/2022-09-19

জন মৃত্যুবরণ করেছে।[70] বেশিরভাগই শ্রমজীবী এবং কৃষক যারা কর্মরত অবস্থায় মারা গিয়েছে। এই সকল শ্রমজীবী এবং কৃষকদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণের স্বীকৃতি দেওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১৫০-এ দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিপূরণে অন্তর্ভুক্তকরণ প্রয়োজন।

বাংলাদেশের আনাচে কানাচে গ্যাস সিলিন্ডার গাড়িতে, পরিবহণে, হোটেলে, বাসাবাড়িতে অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যবহার করার কারণে প্রায়শই সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রাণঘাতী দুর্ঘটনা ঘটছে। এর পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও অনুমোদনের দায়িত্ব বিস্ফোরক অধিদপ্তরের। কিন্তু উপযুক্ত ইন্সপেকশন ও মনিটরিং ব্যবস্থা না থাকার কারণে, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষ দুর্ঘটনায় নিহত হচ্ছে যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

দুর্ঘটনা এবং অভিযোগ করার প্রক্রিয়া, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) ক্ষতি ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ, ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণ, পঙ্গুত্ববরণকারী, অক্ষম শ্রমিকদের পুনর্বাসন, দুর্ঘটনার তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা:

- শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৫০ ও ১৫১-এ বিশেষ ধারা যুক্ত করাসহ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
- পঙ্গুত্ববরণকারী, অক্ষম শ্রমিকদের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সামাজিক সংগঠন এবং জনগণকে সম্পৃক্তকরণ করার মাধ্যমে সামাজিক ও প্রশিক্ষণসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান, নিয়মিত চিকিৎসা ও ডিভাইস পরিবর্তন করা। এই ক্ষেত্রে ভুক্তভোগীদের সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে সংযুক্ত করে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থান, পুর্নবাসনের ব্যবস্থা ও আহত শ্রমিকের জন্য জীবনব্যাপী উন্নত চিকিৎসা এবং সেবার নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- ২০২৪ সালে জুলাই অভ্যুত্থানে শহিদ (নিহত) ও আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা এবং সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে হেলথ কার্ড প্রদানসহ বিনামূল্যে সেবা পাওয়ার সুব্যবস্থা করা।
- দুর্ঘটনায় সামান্য ও মারাত্মক দুর্ঘটনার তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা এবং তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের (NOSHTRI) অধীনে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে তথ্যভাণ্ডার গঠন এবং প্রাপ্ত তথ্যসমূহ নিয়মিত হালনাগাদ ও প্রকাশ কর।
- বর্তমান ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপ্রতুল বিধায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা এবং একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আইএলও কনভেনশন ১২১ ও হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণে মানদণ্ড নির্ধারণ করা। ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের উৎসাহিত করতে কোর্ট ফি রদ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) দুর্ঘটনার নিরপেক্ষ, স্বাধীন, তদন্ত কমিটি গঠন এবং সঠিক ও বিস্তারিত প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রকাশ করা:

- বাংলাদেশের সমস্ত শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের দুর্ঘটনার ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে নিরপেক্ষ, স্বাধীন, তদন্ত কমিটি গঠন এবং সঠিক ও বিস্তারিত প্রতিবেদন ও সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে এবং মিডিয়াতে প্রকাশ করা।
- দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/অধিদপ্তরকে দুর্ঘটনার সঠিক রিপোর্ট এবং তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা এবং শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা।

গ। দুর্ঘটনারোধে সমন্বিত পরিদর্শনের উদ্যোগ গ্রহণ করা:

- বিস্ফোরক অধিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন ব্যবস্থাকে শ্রম পরিদর্শনের সাথে যুক্ত করে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- বয়লার পরিবীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও অনুমোদনসহ উপযুক্ত ইন্সপেকশন ও মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।
- জাহাজ ভাঙা শিল্পখাতের জন্য সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ। জেলে শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক ও বজ্রপাতের কারণে মৃত্যুবরণকারী শ্রমজীবী কৃষকদের আইনি কাঠামোতে যুক্তকরণ:

[70] Bangladesh Medical Research Council Bullitin, 2019_ https://bmrcbd.org/Bulletin/Archive.php

- জেলে শ্রমিকদের দুর্ঘটনা কমিয়ে নিয়ে আসার জন্য আইনি কাঠামোতে যুক্তকরণ। নিহত, আহত ও নিখোঁজদের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- বজ্রপাতের কারণে এবং জলজ ও বন্য হিংস্র পশুর আক্রমণে মৃত্যুবরণকারী শ্রমজীবী এবং কৃষকদের দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণের স্বীকৃত দেওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১৫০-এর দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করা।
- নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ১৫০ ও ১৫১ ধারায় বিশেষ ধারা যুক্ত করা সহ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

ঙ) আবাসস্থল থেকে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসার পথে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও ক্ষতিপূরণ:

- আইনি কাঠামোতে আবাসস্থল থেকে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া-আসার পথে নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণের বিধান যুক্ত করা।
- আবাসস্থল থেকে কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্র থেকে আবাসস্থলে যাওয়ার পথে কোনো দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে, যাতে প্রাণহানি বা শারীরিক জখম হয়, বিমার আওতায় ক্ষতিপূরণের বিধান শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.৩.৬ শ্রমিকের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা

বাংলাদেশে বর্তমানে ২৫৫টি সরকারি হাসপাতাল, ৫০৫৪ বেসরকারি হাসপাতাল, ৯৫২৯ ডায়াগনিস্টিক সেন্টার আছে।[71] এইসব প্রতিষ্ঠানে মানুষ চিকিৎসা নিয়ে থাকে। এইসব হাসপাতালের মধ্যে শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত শ্রমিকবান্ধব হাসপাতাল নেই। এই হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা নেওয়া সময় সাপেক্ষ ও শ্রমিকের জন্য ব্যয়বহুল।

শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা তার অধিকার। এই স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কর্মরত শ্রমিকের প্রতিবছর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। শুধুমাত্র বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে ধারা ৬৮ উপবিধি ৫ বিপজ্জনক চায়লনার সাথে জড়িত শ্রমিকদের বছরে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে যা সমস্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ন। এছাড়া শ্রম বিধিমালা ২০১৫তে ১৯ (৪)-এ নিয়োগপত্রের তথ্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়টি অনুপস্থিত।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে ধারা ৬৮ উপবিধি ৫ বিপজ্জনক চালনার সাথে জড়িত শ্রমিকদের জন্য সংক্রামক ব্যাধি ও রোগে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। যা বিপজ্জনক কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকদের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে।

শ্রমিকরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজে থাকে। আর বেশিরভাগ হাসপাতালগুলি রাতের বেলা বন্ধ থাকার কারণে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসা নিতে পারে না। তাই শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকবান্ধব হাসপাতাল বা স্যাটালাইট ক্লিনিক স্থাপন করা প্রয়োজন

শ্রমিকদের জীবন সবসময় অর্থনৈতিক টানাপোড়নের মধ্যে দিয়ে চালিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিকিৎসার জন্য অর্থ না থাকার কারণে চিকিৎসা নিতে আগ্রহী হয় না। তাই তাদেরকে ইন্সুরেন্সের আওতায় মধ্যে নিয়ে আসা ও কার্ডের ব্যবস্থা করা যার মাধ্যমে শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার অধিকার তৈরি হবে। সেই সাথে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার সুবিধাসহ ন্যায্যমূল্যে ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা করা সময়ের দাবি।

শ্রমিকের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা উন্নত ও প্রাপ্তির নিশ্চয়তার লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) চিকিৎসা সুবিধার জন্য শ্রমিকবান্ধব হাসপাতাল, শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে চিকিৎসার সুবিধাসহ ন্যায্য মূল্যে ওষুধ প্রদান, ইন্সুরেন্স ও কার্ডের ব্যবস্থা করা:

- শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিকবান্ধব হাসপাতাল বা স্যাটালাইট ক্লিনিক স্থাপন করতে হবে যেখানে শ্রমিকরা তাদের সুবিধা বা সময় অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে পারে।
- শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রগুলিতে শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসার সুবিধাসহ ন্যায্য মূল্যে ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

[71] BIDA https://bida.gov.bd/healthcare; Retreived on March 7, 2025

- শ্রমিকদের ইন্সুরেন্সের আওতায় নিয়ে আসা ও কার্ডের ব্যবস্থা করা যার মাধ্যমে শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা পাওয়ার অধিকার পাবে।

খ) শ্রমিকের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য শ্রম বিধিমালা ২০১৫-তে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা:

- ঝুঁকিপূর্ণ/Hazardous শিল্পে কর্মরত সকল শ্রমিকদের জন্য বছরে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধান যুক্ত করা। অন্যান্য শিল্পের জন্য ২/৩ বছরে অন্তত একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিধান যুক্ত করা। এরূপ স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্টের গোপনীয়তা নিশ্চিতকরণে কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর ৬৮ (৫) উপবিধি বিপজ্জনক চালনার সাথে জড়িত শ্রমিকদের জন্য সংক্রামক ব্যাধি ও রোগে আক্রান্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা যেমন; আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ ও প্রয়োজন অনুযায়ী পিপিই সরবরাহ করা।

৩.৩.৭। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, তথ্য সংরক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা-২০১৩ তে সরকারের দায়িত্ব (২৭)-এ বলা হয়েছে যে, শিক্ষা কার্যক্রম পাঠ্যসূচিতে স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনো ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তাই পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয়, সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচি বা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করা।

একই সাথে বাংলাদেশে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা যেমন; মাস্টার্স, ডিপ্লোমা কোর্স ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি পূরণে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের (NOSHTRI) অধীনে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা জরুরি।

বর্তমানে শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে শিল্প-সম্পর্ক শিক্ষায়তনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য চলমান কার্যক্রম পর্যাপ্ত নয়। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মধ্যে সামান্য একটি অংশ রয়েছে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে, যা দক্ষতা বা জ্ঞান লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। তাই পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক যুগোপযোগী স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ প্রয়োজন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে কর্মস্থলে একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তৈরি করার মাধ্যমে পেশাগত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা। কিন্তু পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তের অভাবে পেশাগত রোগকে চিহ্নিত এবং উপযুক্ত প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাধাগ্রস্ত হয়। এছাড়া গবেষণালব্ধ উপযুক্ত তথ্য ও উপাত্তের অভাবে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা তৈরি হয়। তাই পেশাগত রোগব্যাধি নিয়ে গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের মাধ্যমে পেশাগত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা জরুরিভাবে প্রয়োজন।

বাংলাদেশে পেশাগত রোগব্যাধি নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম নেই বললেই চলে। পেশাগত রোগব্যাধির বিদ্যমান তালিকা হালনাগাদ করা এখন সময়ের দাবি। আর পেশাগত রোগব্যাধি হালনাগাদ করার জন্য জাতীয় পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে উক্ত রোগব্যাধির তালিকা হালনাগাদ করা প্রয়োজন। দেশে পেশাগত রোগব্যাধি, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কিছু গবেষণা হলেও এ বিষয়ক কোনো কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার নেই। তাই জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অধীনে এ বিষয়ক কেন্দ্রীয় গবেষণাগার ও তথ্যভাণ্ডার গঠন প্রয়োজন।

প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে মধ্যম সারির ব্যবস্থাপকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তাই দেশের সকল শিল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যম সারির ব্যবস্থাপকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা দরকার। একই সাথে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন করা এবং কর্মক্ষেত্রে বিপদ, ঝুঁকি নিরূপণ এবং যথাযথ ব্যবস্থা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের উপর নিয়োগকর্তাদের অনুপ্রাণিত করা দরকার।

কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক ঝুঁকি কমানোর জন্য সেইফটি কালচার বা সংস্কৃতি গড়ে তোলা জরুরি। স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সেইফটি কালচার তৈরি করার জন্য মালিক, শ্রমিকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা ২০১৩ বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

অনানুষ্ঠানিক খাত এবং এসএমই (SME) খাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণের অভাব পরিলক্ষিত। ফলশ্রুতিতে এই সকল খাতে কর্মরত সকল শ্রমিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। তাই অনানুষ্ঠানিক এবং এসএমই খাতে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক অলাদা কার্যকর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা এবং সচেতনতা তৈরি করে অনানুষ্ঠানিক এবং এসএমই খাতে প্রয়োজনীয় উদ্দ্যেগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কার্যক্রমের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি নিরাপদ, শোভন কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা দরকার।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, গবেষণা, সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য সংরক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গবেষণা, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার গঠন করা।

খ) পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ এবং সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং বাস্তবায়ন করা। এই জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কারিকুলাম প্রণয়ন এবং সংযুক্ত কারিকুলামসমূহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা।

গ) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম প্রণয়ন এবং আলাদা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ। এক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে কর্মরত বিশেষায়িত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্তকরণ।

ঘ) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের অধীনে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে নিয়মিত গবেষণা এবং কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার গঠন করা।

ঙ) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটের (NOSHTRI) অধীনে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান যেমন; মাস্টার্স, ডিপ্লোমা কোর্স ও প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।

চ) সকল শিল্প, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যম সারির ব্যবস্থাপকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদান ও সার্বিক স্বাস্থ্য ও সেইফটি শিক্ষা চালু করা।

ছ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) কারিকুলামে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়কে কোর্স হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।

জ)পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক সকল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম হালনাগাদ ও প্রয়োজনে নতুন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

৩.৩.৮। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলি বিশেষ পেশা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের জন্য প্রযোজ্য এবং বাস্তবায়নে প্রকল্প

বাংলাদেশে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত বিশেষ পেশা এবং বিপদাপন্ন পেশার জন্য বিদ্যমান পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক আইনি কাঠামোতে সঠিক কোনো দিক নির্দেশনা শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই খাতের শ্রমিকেরা অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তাই দেশের শ্রমনীতি, শ্রম আইন, শ্রম বিধি ও কর্ম পরিকল্পনা সময়োপযোগী করে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিক এবং কর্মক্ষেত্র নিরাপদ করা জরুরি।

দেশের বর্তমান আইনে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের জন্য শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করার সুযোগ থাকলেও বেশিরভাগ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানের/কারখানায় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক/অঞ্চল ভিত্তিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনি প্রয়োগ ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার কোনো রূপরেখা শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত নেই।

বিশেষ পেশা, বিপদাপন্ন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন গোষ্ঠী, ব্যক্তিপর্যায়ে সাময়িক বা স্থায়ী হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত বা নিয়োজিত কর্মীগণ, নতুন প্রযুক্তি বা প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট পেশা এবং অভিবাসী বা প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিদ্যমান শ্রমনীতি, শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা ও কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত

করা হয়নি। তাই এই সব পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের আপদ চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকি নিরূপণ, পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক জ্ঞান নেই বললেই চলে। এক্ষেত্রে সরাকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। তাই শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি দিন দিন বেড়েই চলেছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করে দক্ষতা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা এখন সময়ের দাবি।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৫ লক্ষ সেলুন ও পার্লার আছে যেখানে প্রায় ২৫-৩০ লাখ পুরুষ ও নারী কাজ করছে এবং কোটি কোটি মানুষকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে।[72] এই সেবা দেওয়ার সময় নিজেরা ও সেবাগ্রহিতা সঠিক পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টি না মেনে চলার কারণে নিজেরা ও সেবাগ্রহিতারা অজান্তেই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এই বিষয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি, আইন ও বিধিমালায় কোনো কিছুই বলা হয়নি। তাই সেলুন এবং বিউটি পার্লারের কাজের সাথে জড়িত শ্রমিক এবং গ্রাহকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চত করার জন্য আইনি কাঠামোতে যুক্ত করা প্রয়োজন।

রাষ্ট্রীয় কোনো আইনগত নির্দেশনা বা বিদেশে কর্মস্থলে রোগাক্রান্ত বা আহত বা নিহত হলে তাদের চিকিৎসা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ক্ষতিপূরণের কোনো আইনি বিধান না থাকার কারণে প্রবাসী শ্রমিকদের জীবনের ঝুঁকি বেড়েই চলেছে। প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে বিদেশ গমনের আগে এই বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা।

বাংলাদেশে প্রায় ৪০০,০০০ বর্জ্য সংগ্রহকারী রয়েছে। শুধুমাত্র ঢাকাতেই, প্রায় ১২০,০০০ এই পেশার সাথে জড়িত। মূলত বর্জ্য শুধুমাত্র ঢাকায় সংগৃহীত মোট বর্জ্যের ১৫%, যা প্রতিদিন ৪৭৫ টন, প্রতিদিন পুনর্ব্যবহার করা হয় (পরিবেশ বিভাগ ২০০৯)[73]। বর্জ্য সংগ্রহকারীদের বেশিরভাগই প্রতিদিন ৮-১০ ঘণ্টা কাজ করে। স্বাস্থ্যগত অবস্থার দিক থেকে, তারা বেশিরভাগই পেটের গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যায় ভুগছেন, যেমন; এপিসোডিক ডায়রিয়া (৩৯%), অন্ত্রের কৃমি (৫৭%) এবং হেপাটাইটিস (২.৫%)। বর্জ্য সংগ্রহকারীদের জীবনযাত্রার অবস্থা ভয়াবহ এবং কাজের পরিবেশ বিপজ্জনক।[74] এছাড়া বিভিন্ন কর্মী তাদের দৈনন্দিন কাজের কারণে শরীরের ব্যথা, পিঠে ব্যথা, অ্যালার্জিতে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ বর্জ্য সংগ্রহকারী শ্রমিকদের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনো আইনি দিক নির্দেশনা নেই।

বর্তমান আধুনিক সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে ই-বর্জ্যের উৎপাদন দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ৫০ মিলিয়ন টন ই-বর্জ্য উৎপাদন হয়। বাংলাদেশে মোট প্রায় ৩.২ মেট্রিক টন ই-বর্জ্য উৎপন্ন হয়। ই-বর্জ্যে বিপজ্জনক পদার্থ থাকে, যা পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এই সমস্ত বর্জ্যের নির্গমনগুলি আশেপাশের পরিবেশকে প্রতিকূলভাবে প্রভাবিত করে এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারী নারীদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। ঢাকায় প্রায় ১২০,০০০ দরিদ্র মানুষ অনানুষ্ঠানিক ই-বর্জ্য কাজের সাথের জড়িত, যার মধ্যে ৫০,০০০ শিশু। পরিবেশ ও সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা (ESDO) তাদের একটি গবেষণায় দেখেছে বাংলাদেশে একটি দক্ষ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার অভাব এই খাতে নিযুক্ত প্রায় ১৫% শিশু শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ ছিল এবং ৮৩% দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশগত সমস্যার সংস্পর্শে এসেছে

[72]How the beauty industry is adapting to the new normal, Dhaka Tribune, 9 June, 2021_ https://www.dhakatribune.com/business/economy/249129

[73] Waste বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন, Retrived from https://www.blfbd.com/waste

[74] The Works and Lives of the Informal Waste Picker: A Case Study at Anandabazar Open Dumping Site, Chattogram City Corporation, Bangladesh_ Nurjahan Begum*, Tarakul Hoque MD Rifat, Mohammed Kamal Hossain, January 2023, Asian Journal of Applied Sciences, https://www.researchgate.net/publication/366809317

বলে জানা গেছে।[75] বিদ্যমান বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ই-বর্জ্য কাজের সাথের জড়িত শ্রমিকদের পেশাগত সেইফটি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কোনো দিক নির্দেশনা নেই।

বাংলাদেশে শ্রেণি ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযান ৫৭,৫৯,৩৫৩[76]। এই মোটরযান চালক ছাড়াও অটোচালক, সিএনজি চালক, ভ্যান ও রিক্সাচালকদের শ্রম আইন ২০০৬-এ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনি প্রয়োগ ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার কোনো রূপরেখা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ অন্তর্ভুক্ত নেই। এছাড়া এইসকল চালক প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক রোগে আক্রান্ত। তাই সকল চালকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির আওতায় নিয়ে আসা জরুরি। এই জন্য আইনি সুরক্ষার পাশাপাশি হাসপাতাল, হেলথ কার্ড, টার্মিনালে ক্লিনিক, দুর্ঘটনার মোকাবিলায় তহবিল গঠন, একটি সমন্বিত উদ্যোগ যা মালিক, শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন জরুরি।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়গুলি বিশেষ পেশা এবং ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমের জন্য প্রযোজ্য করতে এবং বাস্তবায়নে প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) "ঝুঁকিপুর্ণ" এবং "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গোষ্ঠীর" ও আউটসোর্সিং, সেলুন এবং বিউটি পার্লার, ক্ষুদ্র পাদুকা শিল্প, বর্জ্য সংগ্রহকারী ও ইলেক্ট্রনিক্স বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোতে যুক্ত করা:

- "ঝুঁকিপুর্ণ" এবং "বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গোষ্ঠীর" ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক আইনি কাঠামোতে কোনো দিক নির্দেশনা নেই। তাদেরকে বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
- আউটসোর্সিং বা বিশেষ পেশায় নিয়োজিত বা নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যকর আইনি নির্দেশনা এবং সুনির্দিষ্ট কোনো কার্যক্রম নেই বিধায় তাদের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- বর্জ্য সংগ্রহকারী ও ইলেক্ট্রনিক্স বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকদের আইনি কাঠামোতে সংযুক্ত করা।
- সেলুন এবং বিউটি পার্লার কাজের সাথে জড়িত শ্রমিক এবং গ্রাহকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চত করার জন্য আইনি কাঠামোতে সংযুক্ত করা।

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ও অভিবাসী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন, সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ:

- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা, দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন, সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ করা।
- প্রবাসী/অভিবাসী কর্মীদের বিদেশ গমনের পূর্বে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা। উক্ত প্রশিক্ষণে শ্রমিক যে দেশে গমন করবে সেই দেশের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন-কানুন প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) পেশাদার গাড়িচালক, বেসরকারি গণপরিবহণের চালক, ব্যক্তিগত গাড়িচালক, অটোচালক, সিএনজি চালক, ভ্যান ও রিক্সাচালকদের আইনি কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তকরণ সহ হাসপাতাল, হেলথ কার্ড, টার্মিনালে ক্লিনিক, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় তহবিল গঠন:

- পেশাদার গাড়িচালক, বেসরকারি গণপরিবহণের চালক, ব্যক্তিগত গাড়িচালক, অটোচালক, সিএনজি চালক, ভ্যান ও রিক্সাচালকদের শ্রম আইন ২০০৬-এ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ করার পাশাপাশি হাসপাতাল, হেলথ কার্ড, টার্মিনালে ক্লিনিক, দুর্ঘটনা মোকাবিলায় তহবিল গঠন করা।
- একটি সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ যা সরকার, মালিক, শ্রমিক এবং ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন জরুরি।

---

[75] E-waste management in Bangladesh: revisiting the existing legal and policy framework Mohammad Abu Taher* *Assistant Professor, Department of Law & Justice, Southeast University_ https://jnu.ac.bd/journal/assets

[76] বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩_ https://brta.gov.bd

৩.৪ সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

সামাজিক নিরাপত্তা বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫ (ঘ) অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে প্রয়োজনীয় ও পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতৃপিতৃহীনতা কিংবা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার নিশ্চিত করা। এটি নির্দেশ করে যে, কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকা, অসুস্থতা, শারীরিক অক্ষমতা, বিধবা, এতিম, অথবা আর্থিক সংকটে থাকা ব্যক্তিদের জন্য সরকারকে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

জাতীয় শ্রম নীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য দেশি ও অভিবাসী শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা। বিশেষ করে সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে অগ্রাধিকারের দিয়ে শ্রম নীতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে- *"জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকারের দাবি রাখে। তাই সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিকসহ সকল পর্যায়ে কর্মরত শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত প্রত্যেকটি শর্ত প্রতিপালনের জন্য সরকার সচেষ্ট থাকবে।"* বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বিধান অন্তর্ভুক্ত করেছে, বিশেষ করে, মাতৃত্বকালীন সুবিধা (ধারা ৪৫-৫০); কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বা মৃত্যু ঘটলে শ্রমিক বা তার পরিবার ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার (ধারা ১৫০-১৫৬); পেনশন ও প্রভিডেন্ট ফান্ড (২৬৪-২৭৩), গ্রুপ ইন্সুরেন্স (ধারা ৯৯,), গ্রাচুইটি (ধারা ২(১০)। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন ২০০৬-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন; শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণার্থে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, অক্ষম ও অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সহযোগিতা, অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসা ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, দুর্ঘটনায় কোনো শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা, শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যদের শিক্ষা বৃত্তি এবং জীবন বিমাকরণের জন্য যৌথবিমা ব্যবস্থার প্রবর্তন।

আন্তর্জাতিক বিভিন্ন কনভেনশন ও চুক্তিতে এটি অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুচ্ছেদ ২২-এ বলা হয়েছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারী, যা তার ব্যক্তিগত মর্যাদা ও স্বাধীন বিকাশের জন্য অপরিহার্য। অনুচ্ছেদ ২৫ (১)-এ নিশ্চিত করা হয়েছে যে, প্রত্যেকের জন্য একটি জীবনের মান প্রাপ্য, যা তার স্বাস্থ্য ও কল্যাণের জন্য যথেষ্ট, যার মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা সেবা এবং সামাজিক সেবা অন্তর্ভুক্ত থাকবে, বিশেষ করে বেকারত্ব, অসুস্থতা, অক্ষমতা বা অন্য কোনো কারণে জীবিকা হারানোর ক্ষেত্রে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬ এই অধিকার পুনর্নিশ্চিত করে এবং সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারকে স্বীকার করে, যার মধ্যে সামাজিক বিমা অন্তর্ভুক্ত (অনুচ্ছেদ ৯)। নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কনভেনশন (CEDAW) ১৯৭৯ - শ্রম অধিকার এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রসমূহের দায়িত্ব নির্ধারণ করে, বিশেষত মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী পর্যায়ে নারীর স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা (অনুচ্ছেদ ১১ (১) (ঙ) এবং ১২)।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১০২ (১৯৫৩) - সামাজিক সুরক্ষার ন্যূনতম মান (Social Security (Minimum Standards Convention) সুনির্দিষ্টভাবে সামাজিক সুরক্ষার ৯টি ন্যূনতম মান নির্ধারণ করেছে, যার মধ্যে চিকিৎসা সুবিধা, অসুস্থতাজনিত সুবিধা, বেকারত্ব সুবিধা, বয়স্কভাতা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনাজনিত সুবিধা, পারিবারিক সুবিধা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা, অক্ষমতা সুবিধা এবং বিধবাভাতা অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কনভেনশন ১২১ (১৯৬৪) কর্মস্থলে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করে; কনভেনশন ১২৮ (১৯৬৭) অক্ষমতা, বার্ধক্য এবং উত্তরাধিকারীর জন্য সুবিধা প্রদান করে; কনভেনশন ১৩০ (১৯৬৯) চিকিৎসা সুবিধা ও অসুস্থতাজনিত সুবিধা নিশ্চিত করে; কনভেনশন ১৬৮ (১৯৮৮) বেকারত্ব সুরক্ষা এবং কর্মসংস্থান উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়; কনভেনশন ১৮৩ (২০০০) মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং কনভেনশন ১৮৯ (২০১১) গৃহকর্মীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলির দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী দারিদ্র্য বিমোচন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ, জেন্ডার সমতা এবং বৈষম্য হ্রাসের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অভীষ্ট-১ অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে দারিদ্র্য ও

পিছিয়ে পড়া অরক্ষিত জনগণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যার অংশ হিসেবে জাতীয়ভাবে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া এবং এর বাস্তবায়নের জন্য নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা। লক্ষ্যমাত্রা ১০.৪ অনুযায়ী "নীতিমালা, বিশেষ করে রাজস্ব, মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক নীতিমালা গ্রহণ ও ক্রমান্বয়ে অধিকতর সমতা অর্জন" করা হচ্ছে সরকারের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার।

একইভাবে Decent Work Country Program for Bangladesh ২০২২-২০২৬ অনুযায়ী একটি সর্বজনীন, টেকসই ও প্রতিকূলতা-সহনশীল সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য জাতীয় নীতি ও কাঠামো শক্তিশালীকরণ, শ্রমিকদের জন্য অবদান ভিত্তিক সামাজিক বিমা ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং নারীদের, প্রবাসী শ্রমিকদের, প্রত্যাবর্তিত শ্রমিকদের ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগণের জন্য লিঙ্গ-সংবেদনশীল অভিবাসন পরিষেবা এবং সামাজিক সুরক্ষায় প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা সরকারের লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার হিসেবে স্থির করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এসব উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের সকল জনগণের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও সমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শ্রম খাতের উন্নয়নে প্রণীত আইএলও রোডম্যাপ ২০২১-২৬ অনুযায়ী শ্রমিকের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার সুনির্দিষ্টভাবে কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকার করেছে যার মধ্যে বেকারত্ব ভাতা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বিমা স্কিম যার আওতায় শ্রমিকের জন্য কর্মস্থলে দুর্ঘটনা বা আঘাতের কারণে যে কোনো শারীরিক ক্ষতি বা অক্ষমতা ঘটলে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সকল অংশীদার বিশেষ করে শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব অর্থবহভাবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

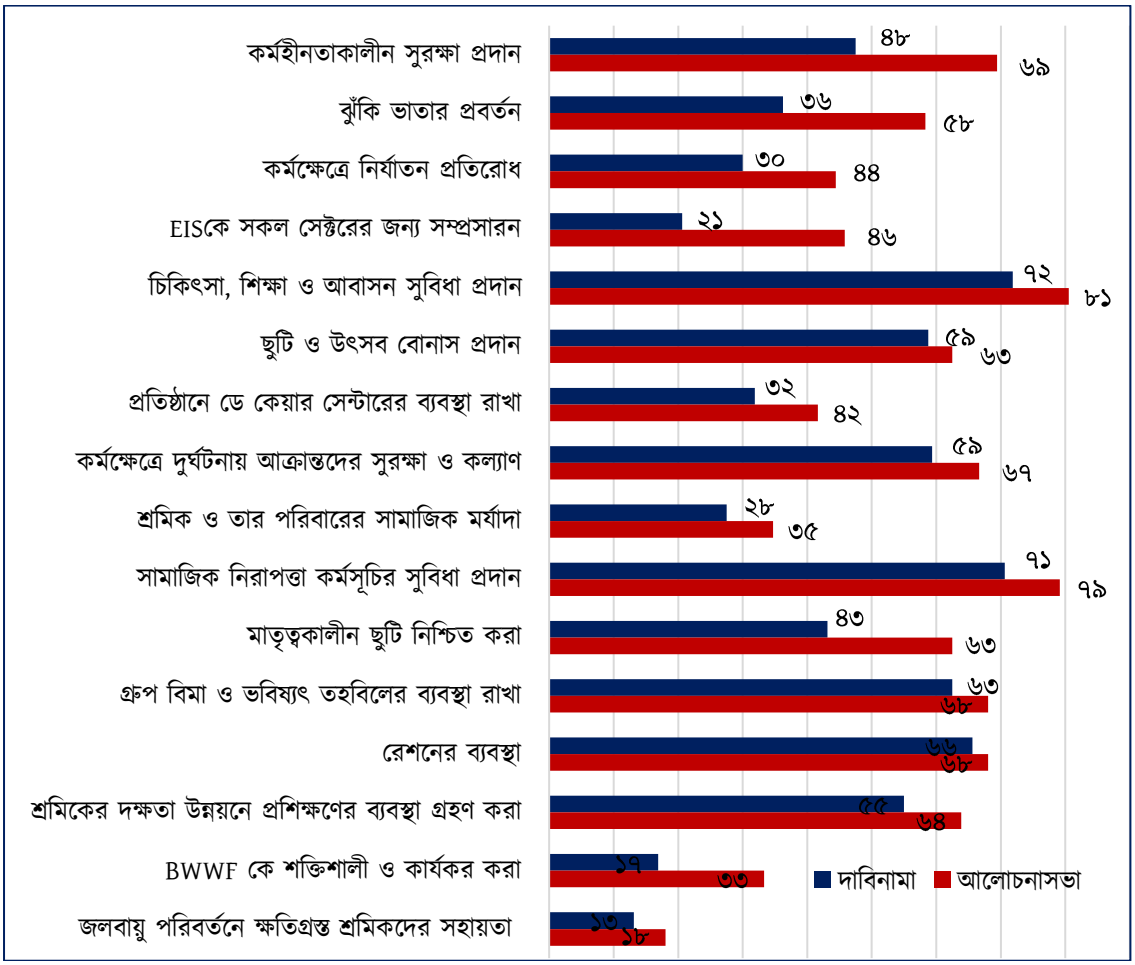
বাংলাদেশের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ১৪০টি প্রকল্প ও কর্মসূচি রয়েছে (২০২৪-২৫ অর্থবছর), যা মোট বাজেটের ১৭.০৬% এবং জিডিপির ২.৩৫% বরাদ্দ পেয়েছে। এর ৩২% মুক্তিযোদ্ধা ও সরকারি চাকরিজীবীদের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু ৭ কোটি ৩৫ লাখ শ্রমজীবীর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক সুরক্ষা বাজেট নেই। বিদ্যমান কর্মসূচিগুলি সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ৮৫% শ্রমিক এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কারণ এসব সহায়তা প্রকল্প ও কর্মসূচি ভিত্তিক এবং স্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করে না। এজন্য প্রান্তিক শ্রমজীবীদের চিহ্নিত করে তাদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও বিনোদনমূলক সুযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন প্রয়োজন। শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সঞ্চয় ব্যবস্থা ও বিনোদনমূলক সুবিধার সমান অধিকার নিশ্চিত করা উচিত।

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ বা অন্য কোনো আইন বা নীতির আওতায় শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ বিষয়ে কোনো সামগ্রিক বা সমন্বিত বিধান নেই। সামাজিক সুরক্ষার অভাবে শ্রমিকরা দারিদ্র্যের ফাঁদে আটকে যায় এবং প্রজন্মান্তরে এই দারিদ্র্য অব্যাহত থাকে, যা জাতীয় অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক জীবন চক্রাকারে নিম্নমুখী হতে থাকে। এজন্য তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশের শ্রম খাতে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অনেক ঘাটতি রয়ে গেছে। কর্মহীনতাকালীন সুরক্ষা, ঝুঁকি ভাতা, চিকিৎসা সুবিধা, কর্মস্থলে নির্যাতন প্রতিরোধ, নিরাপদ আবাসন, টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য বিমা ও তহবিলের ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকদের জীবন ও কর্মপরিবেশ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

শ্রম খাতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য অংশীজনের সাথে কমিশনের সভা এবং বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত দাবিনামায় শ্রমিকদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের বিষয়ে মতামত দেয়া হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে কর্মহীনতাকালীন সুরক্ষা প্রদান, ঝুঁকি ভাতার প্রবর্তন, কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন প্রতিরোধ, এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিমকে সকল সেক্টরের জন্য সম্প্রসারন, চিকিৎসা, শিক্ষা ও আবাসন সুবিধা প্রদান, ছুটি ও উৎসব বোনাস, ডে কেয়ার সেন্টার, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আক্রান্তদের সুরক্ষা ও কল্যাণ, শ্রমিক ও তার পরিবারের সামাজিক মর্যাদা, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধা প্রদান, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও কাজে ফেরার সুযোগ, গ্রুপ বিমা ও ভবিষ্যৎ তহবিলের ব্যবস্থা, রেশনের ব্যবস্থা করা, শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তা, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা বাস্তবায়ন বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা হয়।

চিত্র: ৩.৪.১ অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং পেশকৃত দাবিনামার প্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক শ্রম সংস্কার অধিক্ষেত্র (শতাংশ)



৩.৪.১ সকল শ্রমিকের জন্য 'জীবন-চক্র ভিত্তিক' সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা

সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ একটি শ্রমিকের মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃত হওয়া উচিত। এজন্য, সকল শ্রমিকের (প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব-নিয়োজিত, কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত) জন্য 'জীবন-চক্র ভিত্তিক' সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি আইন প্রণয়ন করা যার মাধ্যমে সকল শ্রমিকের জন্য অবসরকালীন সুবিধা (পেনশন, গ্রাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড), কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা, প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য সুবিধা, মৌসুমি শ্রমিকদের আকস্মিক বেকারত্ব, সকল নারী শ্রমিকের জন্য মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা, নিরাপদ যাতায়াত ও আবাসন সুবিধা এবং বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ক) নীতি কাঠামো: শ্রমিকদের কর্মজীবন, অবসরকাল ও ভবিষ্যতের সুরক্ষা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করতে 'অধিকার ও জীবন-চক্র ভিত্তিক' সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং এ লক্ষ্যে সকল শ্রমিকের (প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত, কৃষি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত) জন্য একটি সমন্বিত সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা ও একটি বাধ্যতামূলক সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল গঠন করা প্রয়োজন, যেখানে নিয়োগকারী, সরকার ও শ্রমিকরা যৌথভাবে অবদান রাখবে।

খ) সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ কর্মসূচির আওতা: এই আইনের কাঠামোর আওতায় সর্বজনীন জীবনচক্র ভিত্তিক সামাজিক বিমা/সুরক্ষা কর্মসূচি, সর্বজনীন মাতৃত্ব সুরক্ষা ও কল্যাণ, আকস্মিক কর্মহীনতা সুরক্ষা এবং চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা

সুবিধা প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব নিয়োজিত, কৃষি, প্রবাসী, ফ্রিল্যান্সারসহ গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীসহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের জন্য নিশ্চিত করা এবং এর আওতায় ভুক্তভোগী ও পরিবারের নির্ভরশীলদের সুরক্ষায় 'সারভাইভার বেনিফিট/সুরক্ষা বন্ড' চালু করা।

গ) প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য সুবিধা: এই নীতিমালায় শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা এবং সুবিধাগুলি নিশ্চিত করতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাধ্যতামূলক করা যেখানে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ঐচ্ছিক থাকবে। কর্মস্থল পরিবর্তন হলে শ্রমিকরা তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড স্থানান্তর করতে পারবেন। জাতীয় পেনশন স্কিমের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে শ্রমিক-বান্ধব স্কিম চালু করা এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/কারখানারকে সরকার কর্তৃক বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা। অংশগ্রহণমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে, কর্মক্ষমতা হারানো শ্রমিকদের জন্য বিমা কর্মসূচি চালু হবে, যাতে তারা আর্থিক সহায়তা এবং চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন। কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এবং আকস্মিক কর্মহীনতার জন্য কিছু সময় পর্যন্ত ভাতা প্রদান করা। এছাড়া সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করা, যার আওতায় ন্যূনতম ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও পূর্ণ বেতন, ডে কেয়ার সুবিধা এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি নিয়ে বৈষম্যমুক্ত কর্মস্থল নিশ্চিত করা।

ঘ) অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব নিয়োজিত এবং ক্ষুদ্র কুটির শিল্প শ্রমিকদের জন্য সুবিধা: এই নীতিমালায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা এবং সুবিধাগুলি নিশ্চিত করার জন্য প্রথমত, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য পেনশন স্কিমের প্রিমিয়ামের একটি অংশ সরকার ও নিয়োগকারীকর্তৃক বহন এবং শ্রমিকদের জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয় কর্মসূচি চালু করা। এছাড়া শ্রমিকদের অবসরের পর স্বাস্থ্যসেবা ও জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা দিতে জীবন বিমা সুবিধাসহ উপযুক্ত কর্মসূচি চালু করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব নিয়োজিত ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প শ্রমিকদের জন্য বিশেষ পেনশন স্কিম চালু করা, যা বিমা সুবিধার আওতায় থাকবে এবং শ্রমিকের আয় অনুসারে কন্ট্রিবিউটরি, নন-কন্ট্রিবিউটরি বা ভলান্টারি হতে পারে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রান্তিক শ্রমিকদের পেনশনের চাঁদা সরকার ও নিয়োগকারী যৌথভাবে বহন করবে। ক্ষুদ্র কুটির শিল্প শ্রমিকদের জন্য প্রতিষ্ঠানকে প্রণোদনা দেওয়ার সুযোগ থাকবে। সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব নিয়োজিত ও ক্ষুদ্র কুটির শিল্প শ্রমিকদের জন্য পৃথক বিমা কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে, যেখানে কর্মক্ষমতা হারালে আর্থিক সহায়তা, চিকিৎসা সেবা, কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ, মেডিকেল বিমা ও মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা সুবিধা দেওয়া হবে। আকস্মিক কর্মহীনতার জন্য একটি সময়সীমা পর্যন্ত ভাতা প্রদান করা হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রান্তিক শ্রমিকের বিমার প্রিমিয়াম সরকার বহন করবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক ও স্ব নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও পূর্ণ বেতন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হবে, যা সরকারি সহায়তা ও নিয়োগকারীর যৌথ তহবিলের মাধ্যমে দেওয়া যাবে।

ঙ) ফ্রিল্যান্সারসহ গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সুরক্ষা: অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য একটি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন ব্যবস্থা চালু করা এবং তাদেরকে পেনশন, স্বাস্থ্য বিমা ও দুর্ঘটনা সুবিধার আওতায় আনা আবশ্যক। ফ্রিল্যান্সারসহ গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সুরক্ষার জন্য গিগ ও প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের সরকারি আইন ও বিধিবিধানের আওতায় আনা প্রয়োজন, যাতে তারা সামাজিক সুরক্ষা, মজুরি সুরক্ষা ও শ্রম অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পারেন।

চ) অভিবাসী শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা: বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা নিশ্চিত করা, বিশেষ করে পেনশন, বিমা ও পুনর্বাসন সুবিধা।

৩.৪.২ কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা সুরক্ষা ও কল্যাণ

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পর শ্রমিকদের প্রদেয় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপ্রতুল এবং ক্ষতিপূরণ ও কল্যাণ সুবিধা পাওয়ার প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল এবং সময়সাপেক্ষ। ডিজিটাল পদ্ধতি এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তার সুযোগ না থাকায় শ্রমিকরা নানা বিড়ম্বনায় পড়েন। পোশাক শিল্প ছাড়া অন্যান্য শিল্প খাতে দুর্ঘটনা বিমার ব্যবস্থা কম, ফলে শ্রমিকরা যথাযথ ক্ষতিপূরণ থেকে বঞ্চিত হন। ২০২২ সালে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো পোষাক কারখানায় কর্মস্থল দুর্ঘটনা বিমা প্রকল্প চালু করলেও অন্য খাতের শ্রমিকদের সচেতনতার অভাব এবং কর্মসংস্থান বিমা প্রকল্প

(EIS)[77] না থাকায় তারা আর্থিক সংকটে পড়েন। ২০২৩ এবং ২০২৪ সালে যথাক্রমে ৭৭২ এবং ৬৩৯টি দুর্ঘটনায় ৮৭৫ ও ৭৫৮ শ্রমিক নিহত হন, বিশেষ করে পরিবহণ, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, নির্মাণ, কলকারখানা এবং কৃষি খাতে। শ্রমিকরা কর্মক্ষমতা হারালে তাদের পরিবার আর্থিক সংকটে পড়ে, যা জীবনযাত্রার মানে স্থবিরতা আনে। সঠিক সুরক্ষা ও ক্ষতিপূরণের অভাবে তারা নিরাপত্তাহীনতা ও মানসিক চাপে ভোগেন, যা পুনর্বাসন জটিল করে তোলে। দুর্ঘটনা বিমার অভাবে শ্রমিক ও তার পরিবার আর্থিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়, ফলে জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। চিকিৎসা সুবিধার অভাবে তাদের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে। নিরাপত্তাহীনতা শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টি করে এবং বিনিয়োগ আকর্ষণে বাধা দেয়। দুর্ঘটনার পর পুনর্বাসন না হলে দক্ষ শ্রমিক হারানোর ঝুঁকি বাড়ে, যা শ্রমশক্তির স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই, শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি, যাতে তাদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয় এবং জাতীয় অর্থনীতি স্থিতিশীল থাকে।

কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বর্তমান ক্ষতিপূরণের পরিমাণ অপ্রতুল বিধায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করা এবং একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আইএলও কনভেনশন ১২১ ও হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের মানদণ্ড নির্ধারণ করা।

খ) দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার পর শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা ও দীর্ঘমেয়াদি ভাতা নিশ্চিত করা। প্রতিবন্ধী ও দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকদের জন্য আজীবন চিকিৎসা, ভরণপোষণ এবং পুনর্বাসন ব্যবস্থা প্রদান।

গ) সকল খাত এবং সকল শ্রমিকের জন্য দুর্ঘটনা বিমা/এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম বাধ্যতামূলক করা এবং এজন্য প্রয়োজনীয় আইনি সংশোধন করা।

ঘ) দুর্ঘটনায় মৃত অথবা আহত হয়ে কর্মক্ষমতা হারানো শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, যতদিন না তারা উপার্জনক্ষম হয়। এ সকল শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের জন্য চাকরি প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়ার নীতি প্রণয়ন।

ঙ) শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও কেন্দ্রীয় তহবিলের জন্য ডিজিটাল আবেদন পদ্ধতি চালু করা এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য ত্রিপক্ষীয় নিরীক্ষা ও মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা। শ্রমিক কল্যাণ এবং বিমা তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় অনলাইন পোর্টাল চালু করা। আবেদন এবং ট্র্যাকিংয়ের সুবিধা দিয়ে ডিজিটাল তহবিল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা। প্রতি তিন মাসের পরিবর্তে প্রতি মাসে পরিচালনা কমিটির সভা আয়োজন বাধ্যতামূলক করা। কল্যাণ সুবিধার আওতা বৃদ্ধি করে সব খাতের শ্রমিককে (প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্ব নিয়োজিত, গিগ/অ্যাপবেজড কর্মী) অন্তর্ভুক্ত করা এবং শ্রমিকদের পরিবারের জন্য সহায়তার পরিধি বৃদ্ধি করে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন সংশোধন করা।

৩.৪.৩ বেকারত্ব ও আকস্মিক কর্মহীনতা থেকে সুরক্ষা

প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সংকট, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, ধর্মঘট ও সহিংসতার কারণে বহু শ্রমিক কাজ হারান, যা তাদের জীবিকার জন্য বড় বাধা সৃষ্টি করে। নির্ধারিত সহায়তা ব্যবস্থা না থাকায় বেকার শ্রমিকরা সামাজিক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন এবং দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব তাদের সঞ্চয় ক্ষয় করে ঋণগ্রস্ত করে তোলে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারিতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফেরিওয়ালা, হকার, নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহণ শ্রমিক ও কৃষিমজুরসহ প্রান্তিক শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন। ২০২০ সালের মে মাস পর্যন্ত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা খাতে প্রায় ৮৬.৫৩ লাখ কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছিল, যার মধ্যে ৩৪.৮৯ লাখ গ্রামে এবং ৫১.৬৫ লাখ শহরে ছিল। লকডাউনের ফলে এই ব্যবসাগুলির বেশিরভাগই বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে প্রায় ৭ কোটি ৮০ লাখ মানুষ জীবিকা হারান।[78] বাংলাদেশে কৃষি ও

[77] BMZ. (2024, May 6). Bangladesh launches pioneering employment injury scheme for the garment sector. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Retrieved from https://health.bmz.de/stories/bangladesh-launches-pioneering-employment-injury-scheme-for-the-garment-sector/

[78] Alam, J. (2022). বাংলাদেশের প্রান্তিক পেশাজীবী মানুষের আয়ের ওপর কোভিড-১৯ এর প্রভাব ও উত্তরণের উপায়: একটি পর্যালোচনা. *Bangladesh Journal of Political Economy*, 2(1), 121-142.

মৎস্য খাতের মৌসুমি শ্রমিকরা বিভিন্ন সময়ে কর্মহীন হয়ে পড়েন। হাওড়, পার্বত্য এলাকা এবং ফল চাষিদের জন্য বর্ষায় প্রায় পাঁচ মাস কর্মহীনতা দেখা যায় এবং মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার নিষিদ্ধ সময়ে আয়হীন অবস্থায় থাকেন। মৎস্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, দেশে ২৪.৫ লাখ মৎস্যজীবী থাকলেও অনেকেই সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হন, বিশেষত ৬৫ দিনের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন।[79] মৌসুমি শ্রমিকদের জন্য কার্যকর কর্মসূচি এবং বাস্তবায়ন কাঠামোর অভাব তাদের দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক ও সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি করে। এই শ্রমিকদের তালিকা সংরক্ষণের অভাবে তারা সরকারি সহায়তা এবং বিকল্প কর্মসংস্থান সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন, ফলে দারিদ্র্যের চক্রে আবদ্ধ থাকেন। কর্মহীনতার কারণে তাদের পরিবারগুলি অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জীবনযাত্রার মানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসব সমস্যা সমাধানে টেকসই কর্মসূচি ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন জরুরি।

মৌসুমি শ্রমিকদের অনিশ্চিত কর্মসংস্থান তাদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। দক্ষতার অভাবে যুব শ্রমিকরা উচ্চ বেতনের কাজ পায় না, দারিদ্র্যের চক্রে আটকে যায় এবং দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব মানসিক চাপ ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। স্থায়ী কর্মসংস্থানের অভাবে শ্রমিকদের আয় অনিশ্চিত থাকায় খাদ্য, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সংকট তৈরি হয়। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক মর্যাদা কমে, পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা দেখা দেয় এবং শিশুদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আহত শ্রমিকদের পুনর্বাসনের অভাব তাদের পরিবার-নির্ভরশীল করে তোলে আর কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়। এই পরিস্থিতি উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে, স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে এবং দারিদ্র্যের চক্র দীর্ঘস্থায়ী করে। শিল্প খাত দক্ষ শ্রমিক সংকটে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে, রপ্তানি আয় কমে যায় এবং নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়। দীর্ঘমেয়াদি বেকারত্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শ্লথ করে, বাজার সংকুচিত করে এবং অপরাধপ্রবণতা বাড়াতে পারে। তাই মৌসুমি শ্রমিকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনর্বাসনমূলক নীতিমালা গ্রহণ করা জরুরি।

বেকারত্ব ও আকস্মিক কর্মহীনতা থেকে সুরক্ষায় শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) ১০০ দিনের কর্মসূচির মতো উদ্যোগ গ্রহণ, যা মৌসুমি শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময়েও কাজের সুযোগ ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা, যাতে মৌসুমি শ্রমিকদের জন্য টেকসই কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা যায়। আধুনিক তথ্যব্যবস্থা (কমিশন প্রস্তাবিত তথ্য ভাণ্ডার) ব্যবহার করে নিয়োগ প্রক্রিয়াকে সহজ ও কার্যকর করা।

খ) শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যরেখে মৌসুমি শ্রমিকদের কর্মমুখি প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনঃকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনী দক্ষতার ওপর গুরুত্ব দেয়া এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করা এবং গ্রামীণ ও সুবিধাবঞ্চিত এলাকায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনকে অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করা। দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং দক্ষ শ্রমিকদের জন্য কাজের সুযোগ বৃদ্ধি ও বেকারদের পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ফলাফল পর্যালোচনা করতে বিশেষ নজরদারি ও মূল্যায়ন সেল গঠন।

গ) জাতীয় বাজেটে মৌসুমি ও বেকার শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে মৌসুমি শ্রমিকদের তালিকা প্রস্তুত ও নিয়মিত হালনাগাদ করা। ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও এনজিওদের একত্রিত করে কর্মসংস্থান উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা।

ঘ) প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি অর্থায়নে বিশেষ তহবিল গঠন।

ঙ) কমিশন প্রস্তাবিত সামাজিক সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করে বেকারত্ব ভাতা/'আন-এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট স্কিম' চালু করা এবং এ লক্ষ্যে একটি তহবিল গঠন করা, যার মাধ্যমে বেকারত্বের সময় শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য ন্যূনতম নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। তহবিল গঠনে নিয়োগকারী, শ্রমিক ও সরকারের যৌথ অর্থায়নের ব্যবস্থা এবং বাজেটে বরাদ্দ রাখা। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তর' বেকারত্ব ভাতা পরিচালনা করবে।

---

[79] COAST Bangladesh. (2024, May 6). Dignified compensation for the fishing ban. COAST Bangladesh. Retrieved from https://coastbd.net/dignified-compensation-for-the-fishing-ban/

৩.৪.৪ মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও কল্যাণ

বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন অধিকার এবং সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত খাতের শ্রমিকদের জন্য কিছুটা বিদ্যমান হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত নারীরা, যেমন; গৃহকর্মী, কৃষি শ্রমিক এবং ছোট শিল্পকারখানার কর্মীরা এই সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত। এই নারীরা মাতৃত্বকালীন সময়ে আর্থিক সহায়তা বা সুরক্ষা পান না, যার ফলে তাদের পরিবার আর্থিক সংকটে পড়ে এবং স্বাস্থ্য ও শিশুর যত্নে সমস্যা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম এবং শ্রমিক কল্যাণ তহবিল কার্যকর না হওয়ায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকরা প্রয়োজনীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।[80] শ্রমিকদের মধ্যে মাতৃত্বকালীন ও পিতৃত্বকালীন অধিকার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে, যার কারণে তারা এই সুবিধাগুলি দাবি করতে ব্যর্থ হন। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতেও অনেক নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং শিশু যত্নের অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং অধিকাংশ শ্রমিক তাদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ। মাতৃত্বকালীন ছুটির অভাবে নারীরা প্রয়োজনীয় বিশ্রাম ও যত্ন নিতে পারেন না, যার ফলে মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়ে। শ্রমিকরা সন্তানদের জন্য সময় ও সহায়তা পায় না বলে শিশুদের পুষ্টি ও শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তাদের জীবনমান কমে যায়। পিতৃত্বকালীন ছুটির অভাবে শিশুর মানসিক বিকাশে সহায়তা কমে যায় এবং পরিবারে ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি হয়, যা শান্তি বজায় রাখতে বাধা দেয়। আর্থিক সুরক্ষা না থাকলে, শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন সময়ে অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে, যা তাদের জীবনযাত্রার মানে বিপর্যয় ঘটায় এবং পরিবারে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে শ্রমিকদের মর্যাদা হ্রাস ও কর্মজীবনে ফিরে আসতে না পারায় অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও কল্যাণে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) যে কোনো শ্রমিকের ন্যূনতম ৬ মাসের মজুরিসহ সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর সক্ষমতা বিবেচনায় শ্রম আইনের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ৪ মাসের সবেতন ছুটির সাথে প্রয়োজনে বাকী দুইমাসের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তহবিল অথবা সরকারের অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার অধীনে সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ও স্ব-নিয়োজিত শ্রমিকের জন্য নিয়োগকারীর পাশাপাশি, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য সামাজিক সহায়তার মাধ্যমে মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার একটি কাঠামো তৈরি করা। সরকারের বিদ্যমান সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুরক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে এসকল কর্মসূচির আওতা এবং সহায়তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

গ) পিতৃত্বকালীন ছুটির জন্য আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী ছুটির পরিমাণ নির্ধারণ করা।

ঘ) সামাজিক বিমার মাধ্যমে ফ্রি-ল্যান্স সহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

ঙ) নারী শ্রমিকের গর্ভকালীন সময় ও সন্তান জন্মদান পরবর্তী সময়ের জন্য নমনীয় কাজের পরিবেশ ও সহায়তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যার অন্তর্ভুক্ত থাকবে মাতৃত্বকালীন ছুটির অতিরিক্ত ঐচ্ছিক দুই বছরের ছুটি (বিনা বেতনে), অতিরিক্ত কাজ থেকে অব্যাহতি, নমনীয় কাজের সময়সূচি এবং কাজের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্রামের সুযোগ।

চ) বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম নীতিতে নমনীয় কাজ সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বিধান ও দিক নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত করা।

৩.৪.৫ অবসরকালীন ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষা

সর্বজনীন পেনশন স্কিম বাংলাদেশের শ্রমিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা হলেও এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রে কয়েকটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি, সচেতনতার অভাব এবং অর্থায়নের সীমাবদ্ধতা এর কার্যকারিতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিশেষত, নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য নিয়মিত চাঁদা প্রদান আর্থিক চাপ তৈরি করছে, যার ফলে অনেক শ্রমিক এই স্কিমের আওতায় আসতে পারছেন না। প্রশাসনিক জটিলতা এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতার অভাবও শ্রমিকদের অংশগ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। শ্রমিকরা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন না থাকায় এই সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, যার ফলে তাদের আর্থিক এবং সামাজিক নিরাপত্তা দুর্বল হয়ে

[80] New Age. (2024, May 6). Female RMG workers in Bangladesh deprived of maternity benefits: Study. New Age. Retrieved from https://www.newagebd.net/article/88178/female-rmg-workers-in-bangladesh-deprived-of-maternity-benefits-study

পড়ছে। এছাড়া, শ্রমিকদের মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক সংযুক্তির জন্য ক্রীড়া, পাঠাগার, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমের অভাব তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত করছে। অবসরকালীন বিনোদন ব্যবস্থা না থাকলে শ্রমিকদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এ পরিস্থিতি তাদের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে এবং শিল্পের উৎপাদনশীলতা ও স্থিতিশীলতা হ্রাস করছে। পেনশন স্কিমের অভাবে শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ছে, যা তাদের সামাজিক অস্থিরতা এবং দারিদ্র্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। এ পরিস্থিতির মোকাবিলায়, কার্যকর আইন প্রণয়ন, স্বচ্ছ তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের জন্য অবসরকালীন বিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা জরুরি। এসব উদ্যোগ শ্রমিকদের জন্য একটি টেকসই আর্থিক কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং তাদের জীবনমান উন্নত করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, দেশে ৭ কোটি ৯ লাখ ৮৩ হাজার কর্মী আছেন, তবে মাত্র ৪.৯% সরকারি চাকরি করা ব্যক্তি ভবিষ্য তহবিল এবং গ্রাচুইটি পান।[81] বাকি ৯৫% শ্রমিক এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত, যা তাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা দুর্বল করে ফেলে, ফলে তাদের জীবনমান এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সংকটাপন্ন হয়।

অবসরকালীন ও ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) ন্যাশনাল পেনশন স্কিমের আওতায় সরকার কর্তৃক চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিক বান্ধব পেনশন স্কিম চালু করা। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট ন্যূনতম পেনশন সুবিধা নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য সরকারি সহায়তা প্রদান করা। ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম ও কেন্দ্রীভূত পেনশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে শ্রমিকদের সহজেই অন্তর্ভুক্তি এবং পেনশন দাবি নিশ্চিত করা। আঞ্চলিক পর্যায়ে পেনশন অফিস স্থাপন ও একটি মনিটরিং ইউনিট গঠন করা প্রয়োজন।

খ) পেনশন তহবিল সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বতন্ত্র কমিটি গঠন করা, যার মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। শ্রমিকদের জন্য সহজলভ্য আইনি সহায়তা এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া সহজতর করতে আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করা। শ্রম কল্যাণ ন্যায়পাল নিয়োগ করে একটি স্বাধীন সংস্থা গঠন করা, যা সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করবে। শ্রমিকদের অভিযোগ দ্রুত গ্রহণ এবং সমাধান করার জন্য একটি হেল্পলাইন বা টোল-ফ্রি নম্বর চালু করে অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য নির্ধারিত সময়সীমা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা রাখা। পেনশন ব্যবস্থাপনা ও আবেদন প্রক্রিয়া ডিজিটালাইজ করার মাধ্যমে শ্রমিকদের তথ্য আপডেট, পেনশনের চাঁদা জমা এবং দাবি করার প্রক্রিয়া সহজ করা। পেনশন তহবিল ব্যবস্থাপনা ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা মনিটর করার জন্য একটি মনিটরিং ইউনিট গঠন করা এবং অনিয়ম রোধে ত্রিপক্ষীয় নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

গ) পেনশন তহবিল ব্যবহারের জন্য নিরীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা। প্রতিটি শিল্পে কার্যকর অভিযোগ পদ্ধতি চালু করে নিয়োগকারী, শ্রমিক এবং সরকারি প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা। তহবিল ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি প্রতিরোধে কঠোর শাস্তির বিধান রাখা এবং অনিয়ম রোধে নিয়মিত মনিটরিং এবং অডিট করা। তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি নিরীক্ষক কমিশন গঠন করা। নিয়োগকারী, শ্রমিক এবং সরকারের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি গঠন এবং পেনশন নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম গঠন করা। শ্রমিক সংগঠনগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার ও সুবিধাগুলি সচেতনভাবে বাস্তবায়ন করা।

ঘ) শ্রমিকদের অবসরকালীন বিনোদন ব্যবস্থার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নীতি প্রণয়ন করা এবং সরকারি সহায়তায় স্থানীয় পর্যায়ে/শিল্পাঞ্চলে ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন করা।

৩.৪.৬ শ্রমিকের পরিবার ও সন্তানের সুরক্ষা

বর্তমান অবস্থায় নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা উপবৃত্তি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং মজুরি বৈষম্যের কারণে তাদের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়ছে। শ্রমিকদের জন্য কার্যকর, উপযোগী বাজার ব্যবস্থা সুবিধার অভাব রয়েছে। এসব

[81] Bangladesh Bureau of Statistics. (2024, May 6). Quarterly Labour Force Survey (QLFS) Q4:2024. Bangladesh Bureau of Statistics. Retrieved from https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/57def76a_aa3c_46e3_9f80_53732eb94a83/2024-05-06-06-58-10aa7c13d49318982373a0f47252ae5f.pdf

সমস্যার সমাধান না হলে শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য OMS (ওপেন মার্কেট সেল) কর্মসূচির অধীনে খাদ্য বিতরণ চলছে। এই কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে দেশের ১,১৩৩টি বিক্রয় কেন্দ্র থেকে খাদ্য শস্য বিক্রি হচ্ছে। সরকারের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতি বছর পাঁচ মাসে গ্রামীণ এলাকার ৫০ লাখ পরিবার বা প্রায় ২.৫০ কোটি মানুষ ১৫ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি চাল পাচ্ছে।[82] নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ব্যবস্থা না থাকলে তাদের সন্তানরা ভালো শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, যা ভবিষ্যতে কর্মসংস্থান এবং উন্নতির সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, মজুরি বৈষম্য এবং রেশনিং ব্যবস্থা না থাকার কারণে শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা সৃষ্টি হয়। আবাসন ব্যবস্থা না থাকলে যাতায়াতের খরচ এবং মানসিক চাপ বাড়ে। মৌলিক সুবিধার অভাবে শ্রমিকদের উৎপাদনশীলতা কমে, যা শিল্পের সামগ্রিক উৎপাদন ক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে। এইসব সমস্যা সমাধান না হলে জাতীয় অর্থনীতি এবং স্থিতিশীলতায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতের বাণিজ্যিকীকরণের ফলে শ্রমিক গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা ও চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বাংলাদেশের সংবিধান ঘোষিত অধিকার। চাকরির অনিশ্চয়তা আর নিম্ন আয়ের কারণে শ্রমিক পরিবারের দারিদ্র্যের পাশাপাশি তাদের শিক্ষাসহ মানবিক জীবন যাপনের পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হয়। মানসম্মত শিক্ষার অভাবে শ্রমিক পরিবারের সন্তানেরা ও দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে ঘুরপাক খেতে থাকে।

শ্রমিকের পরিবার ও সন্তানের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শিল্পাঞ্চল এবং গ্রামীণ এলাকায় ওয়ার্ড/ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে 'রেশন শপ' সুবিধা চালু করা। শ্রমিকদের জন্য 'কার্ড ভিত্তিক রেশনিং' ব্যবস্থা চালু করা, যাতে তারা ন্যায্য মূল্যে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পেতে পারেন। এছাড়া মজুরির সঙ্গে ভর্তুকি ভিত্তিক খাদ্য সহায়তা নিশ্চিত করা।

খ) রেশনিং ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত কারখানা ও শিল্পঘন এলাকা ভিত্তিক 'ওএমএস'-এর মাধ্যমে পণ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

গ) নিম্ন আয়ের শ্রমিক পরিবারের সন্তানের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির নীতি প্রণয়ন ও বাজেটে বরাদ্দ নিশ্চিত করা। প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত শ্রমিক পরিবারের সন্তানের জন্য বৃত্তির সুবিধা বাড়ানো ও মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীকে সাধারণ শ্রমিক পরিবার থেকে নেওয়া এবং তাদের শিক্ষার ব্যয় সরকার ও স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহন করা।

ঘ) শ্রমিকের সন্তানদের জন্য কর্মমুখী শিক্ষা, টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল ট্রেনিং প্রোগ্রাম চালু করা, যা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে।

৩.৪.৭ ডে কেয়ার সুবিধা

ডে কেয়ার সুবিধার অভাব, বিশেষত শ্রমিকঘন এলাকায়, কর্মরত মা ও তাদের শিশুদের জন্য একটি বড় সমস্যা। বেশিরভাগ কর্মস্থলে ডে কেয়ার বা দুগ্ধপান কর্নারের ব্যবস্থা না থাকায় মা-বাবারা দুশ্চিন্তায় থাকেন, যা তাদের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। অনেক নারী সন্তান লালন-পালনের চাপে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন, যা তাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও পেশাগত উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে। কমিউনিটি ভিত্তিক ডে কেয়ার সুবিধার অভাব, ব্যয়সাপেক্ষতা এবং সচেতনতার অভাব নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ সীমিত করছে। নিরাপদ শিশু যত্নের অভাবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়, যা ভবিষ্যতের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে। এই অভাব শিল্পের প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ডে কেয়ার সুবিধার অভাব শিল্পের সামাজিক দায়বদ্ধতার ঘাটতিও নির্দেশ করে, যা সরকার ও কর্মস্থলের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

ডে কেয়ার সুবিধা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

[82] New Age. (2024, May 6). Govt to continue OMS to ensure food for all. New Age. Retrieved from https://www.newagebd.net/post/commodities/250356/govt-to-continue-oms-to-ensure-food-for-all

ক) সকল কর্মস্থল/অঞ্চল ভিত্তিক ডে-কেয়ার চালুর বিধান চালু করা এবং এ লক্ষ্যে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা। বর্তমান শ্রম আইন ও নীতিতে ডে কেয়ার সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে "ডে কেয়ার সুবিধা নীতি" প্রণয়ন করা, যা কর্মস্থলে ডে কেয়ার কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করবে।

খ) কারখানা/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ডে-কেয়ারের পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল ও শ্রমিকের বসবাসের এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি ভিত্তিক ডে-কেয়ার কেন্দ্র স্থাপন।

গ) স্থানীয় পর্যায়ে কমিউনিটি ভিত্তিক ডে-কেয়ারসমূহের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা।

ঘ) ডে-কেয়ার সমূহের পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি সমন্বিত কাঠামো তৈরি করা।

৩.৪.৮ স্বাস্থ্য সুরক্ষা

বর্তমানে শিল্পঘন এলাকায় শ্রমিকদের জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যসেবার অভাব একটি বড় সমস্যা। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা খুবই সীমিত। স্বাস্থ্যবিমার অভাবে শ্রমিকরা আর্থিক সংকটে পড়েন এবং তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার ফলে তারা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে ফিরে এসে একই ধরনের কাজে নিয়োজিত হন, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এসব বিষয় শ্রমিকদের সুস্থতা, মনোভাব এবং কর্মক্ষমতাকে নষ্ট করে, ফলে তাদের কর্মদক্ষতা কমে যায় এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। কর্মক্ষেত্রের দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, পুনর্বাসন এবং পরিবার সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় তাদের জীবনমান ও কর্মক্ষমতা কমে যায়। চিকিৎসা সেবা, মানসিক সহায়তা এবং পুনর্বাসনের অভাবে তারা পুনরায় ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে বাধ্য হন, যা তাদের ভবিষ্যত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলে। ক্ষতিপূরণের অভাবে শ্রমিকরা আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়েন, যা তাদের কাজে আগ্রহ কমিয়ে দেয় এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক পদক্ষেপ না থাকলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়, যা শিল্পের উৎপাদনশীলতাকে প্রভাবিত করে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শ্রমিক কল্যাণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা না থাকলে শিল্পের প্রবৃদ্ধি এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নতি বাধাগ্রস্ত হবে।

স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শিল্প এলাকায় শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করা এবং তাদের বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসা, সঠিক পরামর্শ এবং সেবা নিশ্চিত করা। শ্রমিকের প্রয়োজন বিবেচনায় হাসপাতালসমূহে বিনামূল্যে সান্ধ্যকালীন সেবা চালু করা।

খ) প্রতিটি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রে দক্ষ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য পরামর্শক নিয়োগ দেওয়া যারা শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য, পেশাগত রোগ চিহ্নিত করে উপযুক্ত চিকিৎসা প্রদান করবেন। নারী শ্রমিকদের জন্য নারী চিকিৎসক, নার্স এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা।

গ) শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য 'শ্রমিক স্বাস্থ্য কার্ড' চালু করা, যা তাদের স্বাস্থ্য তথ্য ও প্রাপ্য সুবিধাদি গ্রহণে সাহায্য করবে। পাশাপাশি, ২৪ ঘণ্টা 'টোল ফ্রি' টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান করা, যাতে শ্রমিকেরা যে কোনো সময় স্বাস্থ্য পরামর্শ নিতে পারেন, বিশেষ করে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সমস্যার ক্ষেত্রে।

ঘ) শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা। এই সেবার মধ্যে মানসিক চাপ, উদ্বেগ এবং অন্যান্য মানসিক সমস্যার জন্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

ঙ) শ্রমিকদের জন্য "স্বাস্থ্য সঞ্চয় প্রকল্প" চালু করা, যাতে তারা তাদের ভবিষ্যতের জন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সঞ্চয় করতে পারেন। এছাড়া সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যবিমা চালু করা, যার মাধ্যমে শ্রমিকরা কম খরচে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা লাভ করতে পারবেন।

চ) দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য দ্রুত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা, যাতে তারা আবার নিরাপদভাবে কর্মক্ষম হতে পারে।

৩.৪.৯ প্রতিবন্ধী শ্রমিক সুরক্ষা

প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশে পর্যাপ্ত সুবিধা ও সহায়তা ব্যবস্থা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চেকলিস্টে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য নির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় অনেক প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় সুবিধা প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। এছাড়া কর্মসংস্থান ধরে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, কাউন্সেলিং ও সহায়ক কর্মপরিবেশের অভাব তাদের জন্য কর্মজীবনকে আরও চ্যালেঞ্জিং করে তুলছে। দুর্ঘটনার ফলে অক্ষম হয়ে পড়া শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা, ভরণপোষণ ও পুনর্বাসন সেবার সীমিত সুযোগ তাদের পুনরায় কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসাকে কঠিন করে তোলে। তবে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমি ২৫০ জন প্রতিবন্ধী নারীকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। এছাড়া আইজেসির সহায়তায় ২০১৫-২০১৭ সালের মধ্যে তৈরি পোশাক খাতে ১৫০ জন প্রতিবন্ধী শ্রমিককে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।[83] কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রবেশগম্যতা ও সহায়তার অভাবে তারা দীর্ঘমেয়াদে কর্মজীবন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হন, যা তাদের আয়ের নিরাপত্তা ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে ব্যাহত করে। প্রশিক্ষণ ও কাউন্সেলিং সুবিধার অভাব স্বনির্ভরতা কমিয়ে দেয় এবং পরিবারের ওপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করে। দুর্ঘটনায় অক্ষম হয়ে পড়া শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা না থাকায় তারা আর্থিক সংকটে পড়ে, যা তাদের জীবনমান ও ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করে তোলে।

প্রতিবন্ধী শ্রমিক সুরক্ষায় শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রম আইনে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা। যেমন; কর্মক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা ও সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিতের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধান সংযোজন; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের চেকলিস্টে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ মানদণ্ড সংযোজন; দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতার ক্ষেত্রে আজীবন চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা দিতে সামাজিক সুরক্ষা আইনে বিশেষ বিধান অন্তর্ভুক্ত করা; শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা; দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতার ক্ষেত্রে আজীবন চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করা।

খ) নিয়োগকারী, শ্রমিক সংগঠন ও সরকারের মধ্যে সামাজিক সংলাপ জোরদার করে প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা। দুর্ঘটনায় অক্ষম হয়ে পড়া শ্রমিকদের পুনর্বাসনে সরকার ও নিয়োগকর্তার দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

৩.৪.১০ শ্রমিকের আবাসন

শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ ও সাশ্রয়ী আবাসনের অভাবে তারা অনিরাপদ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হন, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। সরকারি ও বেসরকারি আবাসন প্রকল্পের পরিধি সীমিত, যা শ্রমিকদের চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। জেলা পর্যায়ে এসব সুবিধার অভাবে শ্রমিকদের আবাসন সংকট আরও প্রকট হচ্ছে। অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম শ্রমিকদের জন্য আবাসন সুবিধার অনুপস্থিতি তাদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বাড়ায়। অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ ও নীতিগত দুর্বলতার কারণে শ্রমিকদের জন্য টেকসই আবাসন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না, যা শিল্পখাত ও অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। নিরাপদ আবাসন না থাকায় কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিতি ও চাকরি পরিবর্তনের প্রবণতা বাড়ছে, যা শিল্পের ধারাবাহিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করছে।

শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমিকদের আবাসনকে মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে একটি "শ্রমিক আবাসন নীতি" প্রণয়ন করা। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে শিল্প ও শ্রমঘন এলাকায় সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা।

খ) জাতীয় গৃহায়ণ নীতিমালায় প্রয়োজনীয় বিধান অন্তর্ভুক্ত করা যাতে করে প্রতিটি জেলায় বয়স্ক, অবসরপ্রাপ্ত ও অক্ষম শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে আবাসন ও কল্যাণ সুবিধা নিশ্চিত হয়।

গ) সকল শ্রমিকের জন্য স্বল্পমূল্যে আবাসন নিশ্চিতে 'শ্রমিক আবাসন তহবিল' গঠন এবং শ্রমিকদের জন্য স্বল্পসুদে গৃহঋণ, আবাসন ভর্তুকি এবং আবাসন তহবিল গঠনের জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির

[83] The Daily Star. (2017, December 8). Hiring people with disabilities. The Daily Star. Retrieved from https://www.thedailystar.net/opinion/society/hiring-people-disabilities-1423006

মাধ্যমে স্বল্পসুদে গৃহঋণ সুবিধা চালু। এছাড়া শ্রমিকদের আবাসন নিশ্চিতে শিল্প মালিককে উৎসাহিত করতে প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান এবং এ লক্ষ্যে একটি নীতিমালা প্রস্তুত করা।

ঘ) শ্রমিকদের আবাসন সুবিধার বাস্তবায়নে একটি কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা গঠন করা। শ্রম মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৩.৪.১১ প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণ

প্রবাসে নিহত শ্রমিকদের পরিবার যথাযথ ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় চরম আর্থিক সংকটে পড়ে, আর আহত শ্রমিকদের পুনর্বাসন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে তারা চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ২০০৮ থেকে ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ৪৫,৩০১ জন প্রবাসী শ্রমিকের মৃতদেহ দেশে এসেছে, যার মধ্যে ৬৩% উপসাগরীয় দেশগুলি থেকে।[84] শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে না পারায় জীবনযাত্রা আরও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। হতাশা, মানসিক চাপ এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বাড়ায়, যা সামগ্রিক মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় এবং সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে। আহত বা পঙ্গু শ্রমিকরা পুনর্বাসন ও কর্মসংস্থানের অভাবে পরিবারের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন এবং সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ হারান। দেশে ফিরে আসা শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের অভাব হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা তাদের পরিবার ও সমাজের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলে তাদের পুনর্বাসন ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ করা জরুরি।

দেশে ফিরে আসা শ্রমিকদের পুনর্বাসনের অভাবে তাদের আর্থিক অনিশ্চয়তা বাড়ে, যা নতুন প্রবাসী শ্রমিকদের অনুপ্রেরণা কমিয়ে রেমিট্যান্স প্রবাহ হ্রাস করতে পারে। এটি জাতীয় অর্থনীতির ওপর দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) প্রবাসে নিহত শ্রমিকদের পরিবারের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা। প্রতারিত ও আহত শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা, মানসিক সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি নিশ্চিতকরণ এবং এক্ষেত্রে প্রবাসী শ্রমিকের বিমা থেকে প্রাপ্ত আয়ে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত বিমা তহবিল অলাভজনক হিসেবে ব্যবহার করা।

খ) প্রবাসী শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক জীবনবিমা চালু, যাতে দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর ক্ষেত্রে পরিবার ক্ষতিপূরণ পায়। ফিরে আসা শ্রমিকদের (সক্ষম অথবা আহত) দেশের অর্থনীতিতে পুনরায় অন্তর্ভুক্তির জন্য জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ সুবিধা ও পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা।

৩.৪.১২ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সচেতনতা ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে এই কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তরে একটি ইউনিট/সেল থাকবে যার দায়িত্ব হবে সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়োগকারী ও শ্রমিকের মাঝে সচেতনা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি।

[84] The Daily Star. (2024, May 6). The sickening silence over Bangladeshi migrant worker deaths. The Daily Star. Retrieved from https://www.thedailystar.net/opinion/views/news/the-sickening-silence-over-bangladeshi-migrant-worker-deaths-3198546

৩.৫ সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও যৌথ দরকষাকষি

নাগরিকের সংগঠন করার স্বাধীনতা একটি মৌলিক অধিকার। সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদ নাগরিকদের সংগঠন করার নিশ্চয়তা প্রদান করেছে, "সংগঠনের স্বাধীনতা। জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা—নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে (অনুচ্ছেদ ৩৮)।" সংগঠিত হওয়া, দরকষাকষি ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার আইএলও কর্মক্ষেত্রের মৌলি নীতি ও অধিকারের অংশ এবং এমন একটি উপায় যা শিল্পে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক, গতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা, ভারসাম্যপূর্ণ, স্থিতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায় বিচার ও গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব কার্যকর করার পূর্ব শর্ত। তাই একটি ন্যায়সঙ্গত ও সমতাভিত্তিক শ্রম ব্যবস্থা গড়তে হলে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার, তাদের মতামত প্রকাশের এবং কোনো বাধা ছাড়াই নিয়োগকারীদের সঙ্গে যৌথ দরকষাকষির সুযোগ থাকতে হবে। আইনগত বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি এটি একটি নৈতিক দায়িত্ব, যা সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিকদের মর্যাদা রক্ষার জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশের শ্রমনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের আলোকে শোভন কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করা। শোভন কর্মক্ষেত্রের অন্যতম শর্ত হলো শ্রমিকের 'প্রতিনিধিত্ব'। শ্রমনীতির ভাষ্য মতে, *'শ্রমিকের শ্রম মানব সভ্যতার জনক—এ মূল্যবোধকে সমুন্নত রেখে সরকার শ্রমের মর্যাদা রক্ষা, শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিক ও তার পরিবারের জীবন মান উন্নয়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ'।* শ্রমনীতিতে শ্রমিকদের সংগঠন করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে, "শিল্পে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শ্রমিকদের আইনানুগ অধিকারসমূহ রক্ষা এবং আয়বৈষম্য কমিয়ে আনাসহ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সুস্থ ও দায়িত্বশীল ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি চচার্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের সংবিধান, শ্রম আইন ও আইএলওসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সনদের আওতায় ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি কার্যক্রমকে (গঠন, দরকষাকষি ও সংলাপ) উৎসাহিত করতে সরকার যথাযথ ভূমিকা পালন করবে (১৩.০১. ট্রেড ইউনিয়ন/শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন, দরকষাকষি ও সংলাপ)" শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার তথা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও এর কার্যক্রম সম্পর্কে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬—এ বিধিবিধান সন্নিবেশ করা হয়েছে।

সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৯৪৮ (নং ৮৭) এবং সংগঠিত হওয়া এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৯৪৯ (নং ৯৮) কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সংরক্ষণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনি দলিল। অনুচ্ছেদ ৩ অনুযায়ী, শ্রমিক ও মালিকদের সংগঠনগুলির স্বাধীনভাবে তাদের সংবিধান প্রণয়ন এবং প্রতিনিধি নির্বাচন, প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করার অধিকার থাকবে। এটি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ না করার নিশ্চয়তা প্রদান করে, যা সংগঠনের স্বাধীনতা এবং কার্যক্রমকে সুরক্ষিত রাখে। অনুচ্ছেদ ৫-এ আরও বলা হয়েছে, শ্রমিক ও মালিক সংগঠনগুলির ফেডারেশন এবং কনফেডারেশন প্রতিষ্ঠার অধিকার থাকবে এবং তারা আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পারবে, যা আন্তর্জাতিক সমর্থন এবং সহযোগিতা বাড়াতে সহায়ক। একইভাবে কনভেনশন নং ৯৮ (১৯৪৯) শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির অধিকার এবং ইউনিয়ন বিরোধী বৈষম্য থেকে সুরক্ষা প্রদান করে।

গৃহশ্রমিকদের জন্য শোভন কাজ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ২০১০ (নং ১৮৯) অনুযায়ী গৃহশ্রমিক ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকারের কার্যকর স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে, সদস্য রাষ্ট্রসমূহ গৃহশ্রমিক ও গৃহশ্রমিক নিয়োগকারীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠনের বিধান অনুযায়ী সংগঠন, ফেডারেশন এবং কনফেডারেশনে নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী যোগদান করার অধিকার সুরক্ষিত করবে (অনুচ্ছেদ ৩)। সকল অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত আন্তজার্তিক কনভেনশন ১৯৯০ অনুযায়ী সকল অভিবাসী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের বিষয়ে অধিকার দেওয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৬)।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে অভীষ্ট ৮ (Decent Work and Economic Growth) শ্রমিকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কাজ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্ধারিত হয়েছে। এই লক্ষ্যের মধ্যে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং শোভন কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য সামাজিক সংলাপ ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে শ্রমিকদের সংগঠন করার স্বাধীনতা এবং সমষ্টিগত দরকষাকষির অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়, যা শ্রমিকদের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্য অপরিহার্য।

বাংলাদেশে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুরক্ষার জন্য আইএলও শোভন কাজ বাংলাদেশ কর্মসূচি (DWCP ২০২২-২০২৬) বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। এই কর্মসূচির কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলির মধ্যে রয়েছে: আন্তর্জাতিক শ্রম মান ও কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক অধিকার উন্নত করা, শ্রমবাজার শাসন শক্তিশালী করা এবং সামাজিক সংলাপের সুযোগ বৃদ্ধি করা। বিশেষ করে, শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং শ্রমিকদের সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে আইএলও কনভেনশনগুলির বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ এবং উন্নয়ন সাধন করা। এই কর্মসূচির একটি বিশেষ লক্ষ্য হলো সমষ্টিগত দরকষাকষি এবং সামাজিক সংলাপের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বাংলাদেশে শ্রমিক, মালিক ও সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক আলোচনা (Tripartite Consultation) কাঠামো শক্তিশালী করা এবং শ্রমিক ও মালিক সংগঠনগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। এর মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠন এবং মালিক সংগঠনরা শিল্প সম্পর্কিত সমঝোতায় পৌঁছাতে পারবে, যা শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা ও উন্নতির জন্য সহায়ক হবে।

বাংলাদেশ আইএলও কনভেনশন নং ৮৭ এবং ৯৮-এর অনুসমর্থনকারী দেশ হলেও শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, নিবন্ধন প্রক্রিয়া এবং দরকষাকষির চর্চার ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তির মাত্র কম-বেশি ১৫ শতাংশ শ্রমিক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে নিয়োজিত যারা শ্রম আইনের আওতাভুক্ত। তাদের মধ্যেও একটি বড় অংশ পদ-পদবির কারণে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাছাড়া বিদ্যমান শ্রম আইনে নিবন্ধন ব্যতীত ইউনিয়ন হিসাবে কাজ করার ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ রয়েছে যা শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকারকে সংকুচিত করছে। ইউনিয়ন গঠনের জন্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মোট শ্রমিকের ন্যূনতম ২০% এবং প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে নির্ধারিত অঞ্চলের মোট শ্রমিকের ন্যূনতম ৩০% সদস্যের শ্রম আইনের বাধ্যবাধকতা আন্তর্জাতিক শ্রম মানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় যা প্রমাণের জটিলতা ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা।

ইউনিয়ন নিবন্ধনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা শ্রম অধিদপ্তরের আইনের বিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াগত জটিলতা ইউনিয়ন নিবন্ধনকে আরো কঠিন করে তোলে যেমন; প্রস্তাবিত ইউনিয়নের প্রাতিষ্ঠানিক সাধারণ সভায় উপস্থিতির স্বাক্ষর কার্যবিবরণী খাতায় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং আবেদনকৃত ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে কর্মক্ষেত্রে মোট শ্রমিকের সংখ্যা, তার মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সঠিকভাবে উল্লেখ করে এবং সদস্যরা কেউ ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত হয়নি বা দণ্ডিত হলেও শাস্তির মেয়াদের পরে দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এই মর্মে ঘোষণা দিয়ে নিবন্ধনের আবেদনের সাথে প্রত্যয়ন দিতে হয়। অথচ শ্রমিক ও ইউনিয়নের পক্ষে শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা জানার কোনো আইনগত উপায় নেই। এর ফলে তাদের নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। শ্রম অধিদপ্তর তার সন্তুষ্টি বিবেচনার ক্ষমতা (Descretion and Good Faith) এমনভাবে ব্যবহার করে যা ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকে আরও কঠিন করে তোলে।

ইউনিয়ন গঠনে বাধার মধ্যে ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের সুরক্ষার অভাব প্রকটভাবে ফুটে উঠেছে। শ্রম আইন ২০০৬-এর ২৬ ধারায় বরখাস্ত, ইত্যাদি ব্যতীত অন্যভাবে মালিক কতৃর্ক শ্রমিকের চাকরির অবসান করার একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ধারা ১৮০ অনুযায়ী যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে সে প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত বা কর্মরত না থাকলে ইউনিয়নের নেতৃত্ব হারান। একজন সংগঠক যে কোনো সময় চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে থাকেন আর চাকরি হারানোর ফলশ্রুতিতে তারা ইউনিয়নের সদস্যপদ বা নেতৃত্বের অবস্থান হারান যা সুষ্ঠু ও স্বাধীন সংগঠনের চর্চায় বাধা সৃষ্টি করে।

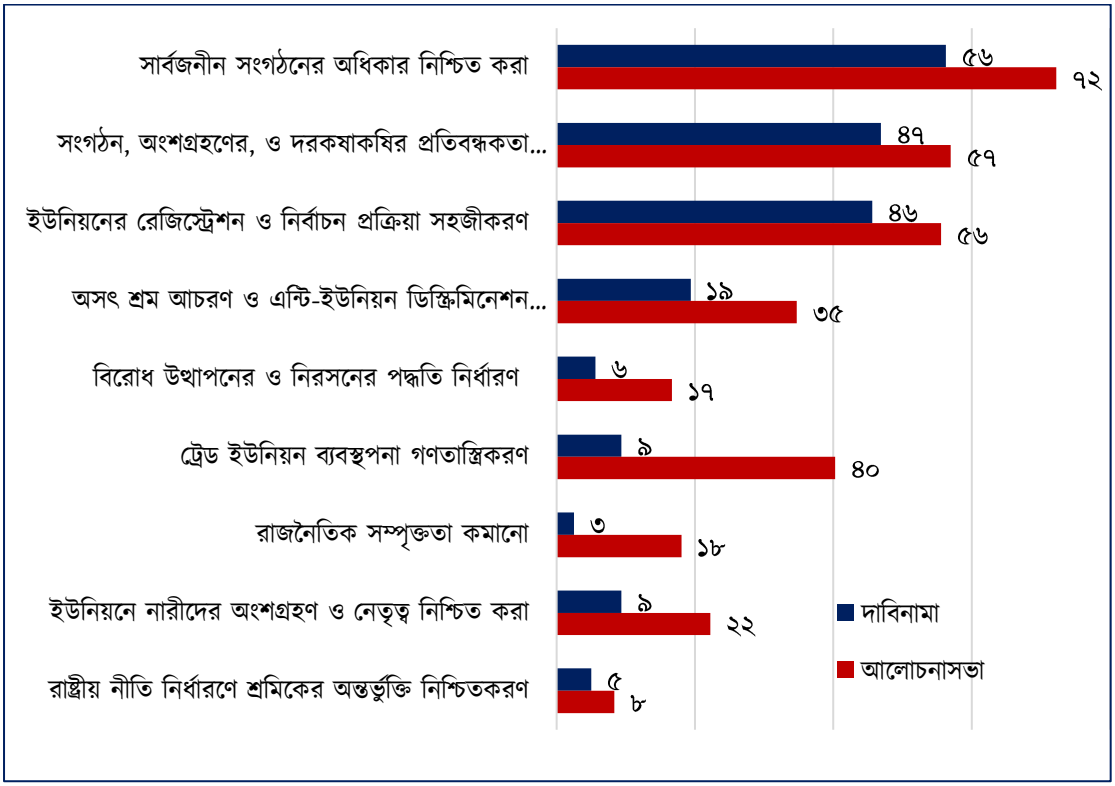
বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার থাকলেও বাস্তবতা ভিন্ন। বাংলাদেশের শ্রমিকরা এখনো সংগঠনের অধিকার ও যৌথ দরকষাকষির পূর্ণ সুযোগ পান না। বেশিরভাগ খাতেই শ্রমিক সংগঠনের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়, বিশেষত পরিচ্ছন্নতাকর্মী, গৃহশ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, পরিবহন শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, পাথর ভাঙা, পাদুকা এবং বন্দর শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের অভাব প্রকট। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার থাকলেও তা বাস্তবায়নে নানা বাধা থাকে। বিভিন্ন শিল্পখাতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ কম এবং অনেক সময় মালিকপক্ষ শ্রমিকদের সংগঠন করা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকারে বাধা সৃষ্টি করে।

যৌথ দরকষাকষির সুযোগ অনুপস্থিত থাকায় শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং অন্যান্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে পড়ে। পরিচ্ছন্নতাকর্মী, কেয়ার ওয়ার্কারস, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, নির্মাণ, বন্দর, চামড়া,

রেল, দোকান কর্মচারীসহ অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের মধ্যে যৌথ দরকষাকষির সুযোগ সীমিত। অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ায় তারা নিয়োগকর্তার সাথে কোনো ধরনের দ্বিপাক্ষিক কোনো চুক্তি করতে পারেন না। আবার সংগঠন করতে গেলে শ্রমিকদের এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন বৈষম্যের শিকার হতে হয়। এই ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের সাথে নির্যাতন, হয়রানি এবং চাকরিচ্যুতির ঘটনা ঘটে থাকে। বিশেষত গার্মেন্টস, নির্মাণ, রেল, বন্দর, পাটকল ও অন্যান্য খাতের শ্রমিকদের সংগঠন করলে এবং তাতে অংশগ্রহণ করলে চাকরিচ্যুত করার মতো ঘটনা ঘটে থাকে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও যৌথ দরকষাকষি করা থেকে বঞ্চিত হন।

শ্রম খাতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য অংশীজনের সাথে কমিশনের সভা এবং বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত দাবিনামায় শ্রমিকদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের বিষয়ে মতামত দেয়া হয়েছে। এই পর্যালোচনায় দেখা যায় সংগঠনের অধিকার এবং এতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতে যে সকল সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সর্বজনীন সংগঠনের অধিকার নিশ্চিত করা, অংশগ্রহণ ও যৌথ দরকষাকষির প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজীকরণ, অসৎ শ্রম আচরণ ও এন্টি-ট্রেড ইউনিয়ন ডিস্ক্রিমিনেশন দূরীকরণ, অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরের ক্ষেত্রে শিল্প বিরোধ উত্থাপনের ও নিরসনের পদ্ধতি নির্ধারণ, ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থপনা গণতন্ত্রকরণ, ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক সম্পৃক্ততা কমানো, ইউনিয়নে নারীদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণ এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ।

চিত্র: ৩.৫ অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং পেশকৃত দাবিনামার প্রেক্ষিতে সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও যৌথ দরকষাকষি বিষয়ক শ্রম সংস্কার অধিক্ষেত্র (শতাংশ)



৩.৫.১. সর্বজনীন সংগঠন ও অন্তর্ভুক্তির অধিকার

শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংঘবদ্ধ হওয়া, কর্মস্থলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা, প্রতিনিধিত্ব এবং যৌথ দরকষাকষিতে অংশ নেওয়ার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। বাংলাদেশের সংবিধান স্বীকৃত এই অধিকার আন্তর্জাতিক মান ও জাতীয় আইনে স্বীকৃত। এই অধিকারগুলি জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা (UDHR), আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) মূল কনভেনশন, জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক

চুক্তি (International Covenant on Economic and Cultural Rights, 1966) বাংলাদেশের সংবিধান এবং শ্রম আইন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। আইএলও স্যোশাল ডায়লগ ইনডিকেটরে প্রত্যেক শ্রমিকের নিয়োগের ধরন, পেশা, পদবি নির্বিশেষে এবং স্ব নিয়োজিত, দিনমজুর শ্রমিকসহ সকলের পেশাগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, প্রত্যেক নিয়োগকারীর সাথে প্রতিনিধিত্ব, দরকষাকষি এবং সামাজিক সংলাপে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করার বিধান রয়েছে।

সর্বজনীন সংগঠন ও অন্তর্ভুক্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বাংলাদেশের সকল শ্রমিকের জন্য যে কোনো শিল্প, খাত বা কর্মসংস্থানের ধরন যা-ই হোক না কেন, তা প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক, লাভজনক বা অলাভজনক—সমানভাবে শ্রম আইনের আওতায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, ইউনিয়নে যোগদান, প্রতিনিধিত্ব এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিকের দরকষাকষি, নিজ এবং সমষ্টিগত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিয়োগকারীর সাথে দরকষাকষি, বিভিন্ন সরকার, স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার সাথে প্রতিনিধিত্ব অ্যাডভোকেসি ও সংলাপে অংশগ্রহণের অধিকার আইন দ্বারা নিশ্চিত করা। দরকষাকষির অধিকার সুরক্ষা ও চর্চার পরিবেশ উন্নয়নের জন্য শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সব ধরনের বাধা দূর করা।

৩.৫.২ সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো প্রস্তাবনা

বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের বাস্তবতা স্বীকার করে এমন একটি সমন্বিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো গঠন করা জরুরি, যা সকল শ্রমিকের সংগঠিত হওয়ার ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশের শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্ত করে একটি ট্রেড ইউনিয়ন কাঠামো গঠন করা জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের মধ্যে পার্থক্য কখনোই সংগঠিত হওয়ার বাধা হওয়া উচিত নয়। শ্রমিকদের পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে এবং শ্রম সুরক্ষা জোরদার করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নলিখিত ইউনিয়ন কাঠামো প্রস্তাব করা যাচ্ছে।

ক) প্রাতিষ্ঠানিক খাতে ইউনিয়ন গঠন

- একক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ইউনিয়ন: নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য স্বতন্ত্র ইউনিয়ন গঠন নিশ্চিত করা।
- চুক্তিভিত্তিক ও আউটসোর্স শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তি: কোনো প্রতিষ্ঠানে কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে নিয়োজিত শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের ও যোগদানের অধিকার থাকবে এবং তাঁরা তাঁদের মালিক অর্থাৎ কন্ট্রাক্টর বা কন্ট্রাক্টিং এজেন্সিতে গঠিত ইউনিয়নে যোগ দিতে পারবেন। এতে নিশ্চিত হবে যে সাব-কন্ট্রাক্টের আওতায় থাকা শ্রমিকরা ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্ব ও শ্রম সুরক্ষার বাইরে পড়বে না।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক খাতে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ইউনিয়ন গঠন

- একটি নির্দিষ্ট শিল্প বা ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করতে সক্ষম হওয়া উচিত।
- প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের জন্য গঠিত ইউনিয়ন উক্ত প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের জন্য গঠিত নিয়োগকারীদের এসোসিয়েশনের সাথে দরকষাকষির পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত একক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের পক্ষে অসন্তোষ নিরসন বা দরকষাকষি করার অধিকার থাকবে।

গ) নির্দিষ্ট শ্রেণির শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকার

নির্দিষ্ট শ্রেণির শ্রমিকদের যেমন; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের বিক্রয় প্রতিনিধি, প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ ভিত্তিক ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকবে। এরূপ ক্ষেত্রে শ্রমিকদের তাদের কর্মস্থলে যেখানে তারা নিযুক্ত রয়েছেন, সেখানেও ইউনিয়ন গঠন বা যোগদানের অধিকার থাকবে।

ঘ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে ইউনিয়ন গঠন

অপ্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির শ্রমিক, যাদের প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি নেই, তাদেরও তাদের যৌথ স্বার্থ রক্ষার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকতে হবে। অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের প্রায়শই প্রচলিত শ্রম সুরক্ষা এবং যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়। যার ফলে তাদের ইউনিয়ন করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এমন আইনি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

- গৃহকর্মী ও ব্যক্তিগত সহকারী: তাদের অন্যান্য কাজের পরিবেশ—প্রায়শই বিচ্ছিন্ন পরিবেশে কাজ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তির অভাব— গৃহকর্মী, মালী, নিজস্ব ড্রাইভার সহ বিভিন্ন পেশাদার ব্যক্তির (যেমন ডাক্তার, আইনজীবী) ব্যক্তিগত সহকারীদের সংগঠিত হওয়া, ইউনিয়ন গঠন এবং ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য আলোচনা করার অনুমতি প্রদান।
- দৈনিক মজুর ও অস্থায়ী কর্মী: যেসব কর্মী অস্থায়ী বা দিন ভিত্তিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত, তাদের ন্যায্য মজুরি, চাকরির নিরাপত্তা, উন্নত কাজের পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষার সুবিধার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকা উচিত।
- হকার্স ও স্ব কর্মে নিয়োজিত কর্মী: স্ব কর্মে নিয়োজিত কর্মীদেরও সংগঠন গঠন ও যোগদানের অধিকার থাকা উচিত, যাতে তারা জোরপূর্বক উচ্ছেদ থেকে সুরক্ষা, ন্যায্য পৌর নিয়ম, আইনি সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য দাবি জানাতে পারে।
- পরিবহণ কর্মী: সকল ধরনের রিকশাচালক, রাইড-শেয়ারিং, প্রাইভেট ড্রাইভার এবং সার্ভিস ডেলিভারি কর্মীদের মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক পরিবহণ কর্মীদের ন্যায্য আচরণ, নিরাপদ কাজের পরিবেশ, নিয়ন্ত্রণমূলক সুরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার সুবিধার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকা উচিত।
- কৃষি কর্মী (যারা কৃষি খামারে কাজ করে না): অনেক কৃষি কর্মী কাঠামোবদ্ধ কৃষি খামারের বাইরে কাজ করে, যেমন; মৌসুমি শ্রমিক, ভাগ চাষি বা স্বাধীন চাষি। এই কর্মীদের ন্যায্য মজুরি, জমির অধিকার, মধ্যস্বত্বভোগী বা ভূমি মালিকদের শোষণ থেকে সুরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষার সুবিধার জন্য ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকা উচিত।

ঙ) স্ব নিযুক্ত কর্মীদের দ্বারা ইউনিয়ন গঠন

- গিগ কর্মী, ফ্রিল্যান্সার, কারিগর এবং স্বাধীন ঠিকাদারসহ স্ব নিযুক্ত কর্মীদের তাদের সম্মিলিত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইউনিয়ন বা সংগঠন গঠনের অধিকার থাকা উচিত।
- এই ইউনিয়নগুলি ন্যায্য নিয়মকানুন, সামাজিক সুরক্ষা এবং সমান কাজের পরিবেশের পক্ষে advocacy করতে পারে, যার মধ্যে ন্যূনতম আয়ের গ্যারান্টি, স্বাস্থ্য সুবিধায় প্রবেশাধিকার এবং অন্যায্য চুক্তি সম্পাদন থেকে সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত।
- এই ধরনের ইউনিয়নগুলি জাতীয় ফেডারেশন গঠনের অধিকার পাবে, যা স্ব নিযুক্ত কর্মীদের ইউনিয়নের খাত ভিত্তিক জাতীয় ফেডারেশন নামে পরিচিত হবে এবং আইন দ্বারা নির্ধারিত শর্তাবলির অধীনে গঠিত হবে।
- স্ব নিযুক্ত কর্মীদের পেনশন তহবিল, স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং জরুরি আর্থিক সহায়তা সহ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলিতে প্রবেশাধিকার থাকা উচিত।

চ) পেশাজীবীদের দ্বারা ইউনিয়ন গঠন

- শিক্ষক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, শিল্পী সহ বিভিন্ন পেশাজীবী এবং ব্যাংক, বিমা, আইটি কোম্পানিতে কর্মরত শিক্ষানবিস/জুনিয়র কর্মকর্তাদের তাদের নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্রের উদ্বেগ এবং খাতগত সমস্যাগুলির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ইউনিয়ন গঠন ও দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা।
- এই ধরনের ইউনিয়ন জাতীয় এবং অঞ্চলভিত্তিক হতে পারে এবং ইউনিয়নগুলি জাতীয় ফেডারেশন গঠনের অধিকার পাবে।
- পেশাজীবীদের নিজস্ব ইউনিয়নের পাশাপাশি নিজস্ব কর্মস্থলেও ইউনিয়ন গঠন এবং যোগদানের অধিকার থাকবে।

৩.৫.৩ সংগঠিতকরণকালীন ইউনিয়নের সুরক্ষা

শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে, শ্রমিকদের অবশ্যই ইউনিয়ন গঠন এবং ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সব ধরনের সুরক্ষা থাকতে হবে, যাতে তারা অযৌক্তিক বিধিনিষেধ, চাকরিচ্যুতি বা হয়রানির সম্মুখীন না হয়। এ লক্ষ্যে ইউনিয়ন গঠন সম্পর্কিত আইনের নির্দিষ্ট বিধানগুলিকে সীমিত না করে শ্রম অধিদপ্তরের আইনগত ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করে বিদ্যমান এসওপি সংশোধনপূর্বক যুগোপযোগী করা, যেন ইউনিয়ন বিরোধী কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে শ্রম অধিদপ্তর সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৩.৫.৪. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া

একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছ ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন ব্যবস্থা বাংলাদেশে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার জন্য অপরিহার্য। বর্তমান শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে যে, সকল ধরনের ট্রেড ইউনিয়নের জন্য, যার মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ইউনিয়ন, স্ব নিযুক্ত কর্মী এবং পেশাজীবীদের ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্ত, নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ হবে। আইনটি নিশ্চিত করবে যে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন যেন ইচ্ছামতো প্রত্যাখ্যান বা অযৌক্তিক বিলম্বের দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয়। শ্রম আইনে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সদস্যসংখ্যার শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত বিধান ইউনিয়ন গঠন, সদস্য সংগ্রহ ও প্রতিনিধিত্বের জন্য একটি বড় বাধা। বড় কর্মক্ষেত্রে বিশেষ করে শ্রমঘন খাতগুলিতে, এই শর্ত পূরণ করা কঠিন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানে মোট শ্রমিকের প্রকৃত সংখ্যা জানা ইউনিয়ন গঠনে ইচ্ছুক শ্রমিকদের পক্ষে অসম্ভব। শ্রমিক সংখ্যা নিয়ে প্রায়শই নিয়োগকারী ও ইউনিয়নের দাবির মধ্যে পার্থক্য হয় যার কারণে শ্রম বিভাগ (DoL) কর্তৃক ইউনিয়ন নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাখ্যানের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এমনকি ইউনিয়ন গঠনের উদ্যোগের কারণে সংগঠকদের চাকরিচ্যুতি বা হয়রানির শিকার হতে হয়। প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত বা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সঠিক শ্রমিক সংখ্যা নির্ধারণ করা শ্রমিক বা ইউনিয়নগুলির জন্য অত্যন্ত কঠিন। শ্রমিকসংখ্যা যাচাইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক রেজিস্টার প্রায়শই নিয়োগকারীদের দ্বারা সংরক্ষিত হয় না বা এটি হেরফের করা হয়। পাশাপাশি শ্রমিকদের পরিচয় ও শ্রমিক সংখ্যার জন্য স্থানীয় এলাকার কাউন্সিলর বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র দাখিলের নির্দেশনা দেয়া হয়, যা ইউনিয়নের পক্ষে সংগ্রহ করা দুরূহ, ফলে ইউনিয়নের আবেদন প্রত্যাখাত হয়। শ্রম আইন অনুসারে ইউনিয়নগুলিকে নিবন্ধনের আবেদন করার আগে গঠনতন্ত্র প্রস্তুত, নেতা নির্বাচন এবং সাধারণ সভা আয়োজন করতে হয় যা শ্রমিকদের জন্য চ্যালেঞ্জিং।

ইউনিয়ন আবেদন অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে শ্রম অধিদপ্তরের (DoL) মহাপরিচালকের অনির্দিষ্ট ঐচ্ছিক ক্ষমতা রয়েছে, যার ফলে অসংগতিপূর্ণ ও অস্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। তদন্তের পরে শ্রম অধিদপ্তরের প্রাপ্ত আপত্তি বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়নের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ থাকে না। ইউনিয়ন প্রত্যাখ্যানের জন্য কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই। যার ফলে বিলম্ব, ইচ্ছামতো প্রত্যাখ্যান এবং দুর্নীতির সম্ভাবনা তৈরি হয়। শিল্পসম্পর্ক উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের সুরক্ষা ও কল্যাণে দরকষাকষি চর্চাকে উৎসাহিত করার জন্যই ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করা প্রয়োজন। ইউনিয়ন গঠনে অধিক সদস্য সংখ্যার শর্ত হ্রাস করা, নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, শ্রমিক সুরক্ষা শক্তিশালী করা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য অধিকতর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ করছে:

ক) সদস্যসংখ্যার সীমার শর্ত সহজীকরণ

- প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সদস্যসংখ্যার সীমার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের মোট শ্রমিকের অনুপাতের শর্তের পরিবর্তে ন্যূনতম শ্রমিক সংখ্যা বিবেচনা করা যেতে পারে। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের অভিজ্ঞতা ও অনুসরনীয় মডেল বিবেচনা এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় পর্যালোচনা সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যা নির্ধারণ ও তৎপ্রেক্ষিতে দরকষাকষির প্রতিনিধি নির্ধারণসহ অন্যান্য বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে একটি ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন।
- প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে ৩০% সদস্যতার প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে ন্যূনতম ৫০ জনে নামিয়ে আনা এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ইউনিয়নের ক্ষেত্রে অঞ্চলভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য সদস্যসংখ্যা ন্যূনতম ৫০ জন এবং জাতীয়ভিত্তিক ইউনিয়নের জন্য ন্যূনতম ৪০০ জন নির্ধারণ করা।

- এই কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রমিকের তথ্যভাণ্ডার (সেকশন ৩.১.৩ দেখুন) তৈরি করার পূর্ব পর্যন্ত নিয়োগকর্তা বা ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্র বা পেশা উল্লেখিত নাগরিক সনদপত্র অথবা সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বা জাতীয় নিবন্ধিত ফেডারেশনের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্রকে শ্রমিকের পরিচয় শনাক্তের প্রমাণক হিসাবে বিবেচনা করা।

খ) স্বচ্ছ এবং ন্যায্য নিবন্ধন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা

- শ্রম অধিদপ্তরকে (DoL) ইউনিয়ন নিবন্ধনের সিদ্ধান্তের জন্য একটি স্পষ্ট, নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে চলা আবশ্যক।
  - ৫৫ দিনের মধ্যে নিবন্ধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া। সময়মতো সিদ্ধান্ত না নেওয়ার জন্য DoL-কে জবাবদিহি করা।
  - কোনো ঘাটতি থাকলে ১২ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি জানানো।
  - ইউনিয়নগুলিকে চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যানের আগে আপত্তিগুলি জানিয়ে পুনরায় চিঠি দেওয়া এবং জবাব দেওয়ার জন্য ১৫ দিনের সময় দেওয়া।
- নিবন্ধন প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধনের জন্য একই স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (SOP) তৈরি এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা, যাতে সকল ক্ষেত্রে অভিন্নতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা যায়।

গ) শ্রম অধিদপ্তরের ক্ষমতার যৌক্তিক প্রয়োগ

- শ্রম অধিদপ্তরকে যে কোনো ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রত্যাখ্যানের জন্য লিখিত, আইনগতভাবে ন্যায্য কারণ প্রদান করতে বিধান রাখা।
- নথিপত্রে ত্রুটির কারণে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিবন্ধন আবেদন প্রত্যাখ্যান না করে, ইউনিয়নগুলিকে ত্রুটি সংশোধন করার সুযোগ দেয়া নিশ্চিত করা।

ঘ) শ্রমিকদের রক্ষা

- ইউনিয়ন সংগঠকদের বরখাস্ত বা হয়রানি করার জন্য শ্রম আইনে শাস্তি বৃদ্ধি করা উচিত।
- শ্রম আইনের ধারা ১৯৫ ও ধারা ১৯৬ (ক) অনুসারে অসৎ শ্রম আচরণের প্রেক্ষিতে শ্রমিকদের শ্রম আদালতে যাওয়ার বিধান নেই। ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করার অধিকার থাকা উচিত এবং মামলাগুলি ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা নিশ্চিত করা উচিত।

ঙ) সাধারণ সভার বিকল্প

- ঐচ্ছিক ক্ষমতা প্রয়োগের বৈষম্যমূলক পদ্ধতি অবসানের জন্য ইউনিয়ন গঠনের সময় একটি প্রাতিষ্ঠানিক সভা আয়োজনের বাধ্যবাধকতা বাদ দেওয়া এবং ইউনিয়নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিকল্প পদ্ধতি চালু করার সুপারিশ করা হলো। বিশেষভাবে, এই ধারার অধীনে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত শ্রমিকদের সাধারণ সভায় বা লিখিত সিদ্ধান্তের (resolution) মাধ্যমে গৃহীত হতে পারে, যা ইউনিয়নের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য দ্বারা তাদের প্রতিষ্ঠান আইডি কার্ড নম্বর (যদি নিয়োগকর্তা দ্বারা প্রদান করা হয়) বা জাতীয় আইডি কার্ড বা জন্ম নিবন্ধন নম্বরসহ যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হবে।

চ) ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য ও সংগঠকদের সুরক্ষা বৃদ্ধি

- শ্রম আইন ২০০৬-এর ধারা ১৯৫ ও ১৯৬ (ক) সংশোধন করে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্য এবং সংগঠকদের সুরক্ষা বাড়ানোর জন্য আরও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আইনে এমন সুরক্ষা ব্যবস্থা সংযোজন করা দরকার যা অসৎ শ্রম অনুশীলন, যেমন; হয়রানি, হুমকি এবং ইউনিয়ন সংগঠক, সদস্য, কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুতি, অবসান বা বরখাস্তের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিকার নিশ্চিত করবে। যারা ইউনিয়ন গঠনের জন্য চাকরি হারান, তাদের নেতৃত্বের ভূমিকা অব্যাহত রাখার অধিকার থাকা উচিত এবং হয়রানির বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার পাওয়া নিশ্চিত করা জরুরি।

- অন্যায্য শ্রম অনুশীলন সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আদালত এবং শ্রম অধিদপ্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা উচিত।
- যদি শ্রম অধিদপ্তর নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তাদের জন্য একটি কার্যকর জবাবদিহিতার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

ছ) ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির নির্বাচন

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ধারা ৩১৭ (৪) (ঘ) সংশোধন করে কেবল ট্রেড ইউনিয়ন কর্তৃক আহুত হলে বা নির্বাচন বিষয়ক কোনো বিরোধ দেখা দিলে ১০% সদস্যদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক নির্বাচন তত্ত্বাবধান বা পরিচালনা করতে পারেন, এ বিষয়ে বিধান যুক্ত করা উচিত।

জ) ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিলের বিধান

- ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা নির্দিষ্ট হারের চাইতে হ্রাস পাওয়ার কারণে ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল করার বিধান রহিত করা উচিৎ।
- কোনো ইউনিয়ন কর্মকর্তা দ্বারা অসৎ শ্রম আচরণ সংঘটিত হলে অসৎ শ্রম আচরণের অভিযোগে ইউনিয়নের নিবন্ধন বাতিল না করার বিধান সন্নিবেশিত করা।

৩.৫.৫ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন

বর্তমান আইনগত কাঠামো অনুযায়ী, একটি ট্রেড ইউনিয়নের ফেডারেশন নির্দিষ্ট কিছু শর্ত সাপেক্ষে কোনো প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি (Collective Bargaining Agent - CBA) হিসেবে ঐ ইউনিয়নের পক্ষে দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ করতে পারে। প্রচলিত বিধান অনুযায়ী, কোনো ফেডারেশন তার অধিভুক্ত ইউনিয়নের নির্বাহী কমিটির সভায় গৃহীত প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদন পেলে শ্রমিকদের পক্ষে যৌথ দরকষাকষি করতে পারে। কিন্তু এই অনুমোদনের জন্য আরও একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা হলো — ফেডারেশন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে এ ধরনের ক্ষমতা প্রদান সংক্রান্ত নির্ধারিত বিধান থাকতে হবে। এই অতিরিক্ত শর্তটি অধিভুক্ত ইউনিয়নের পক্ষে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন নির্বাচনের স্বাধীনতাকে অকারণে সীমিত করে এবং কার্যকর যৌথ দরকষাকষির ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি করে। এমতাবস্থায়, "কোনো ফেডারেশনকে এ ধরনের অনুমোদন প্রদান গঠনতন্ত্রে নির্ধারিত না থাকলে অনুমোদনযোগ্য হবে না" — এই শর্তটি বাতিল করার সুপারিশ করা হচ্ছে। যদি কোনো ইউনিয়ন ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নির্বাহী কমিটি অনুমোদন তবে উক্ত ফেডারেশনকে তাদের পক্ষে যৌথ দরকষাকষিতে অংশগ্রহণ বা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

ফেডারেশনের কার্যক্রম

ক) শ্রমিকদের জন্য আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা

- শ্রম সম্পর্কিত বিরোধ, আইনি বিষয় এবং অ্যাডভোকেসি প্রচেষ্টায় তাদের সম্মতিতে, কোনও নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নয় এমন শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করা।
- অসংগঠিত বা অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আইনি সহায়তা, আর্থিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রদান।

খ) শ্রম অধিকার সুরক্ষা এবং প্রয়োগ

- শ্রম কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করা এবং শ্রম অধিকার লঙ্ঘন, বৈষম্য বা অন্যায্য বরখাস্তের ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- BLA-এর অধীনে আইনি কার্যক্রমে শ্রমিক বা ইউনিয়নের পক্ষে শ্রম সম্পর্কিত মামলা পরিচালনা করা।

গ) ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সংশ্লিষ্ট বিষয়

- বিএলএ সংশোধন করে একটি নির্দিষ্ট বিধান অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যাতে ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলিকে এই কার্য সম্পাদনের জন্য আইনি কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। এই স্বীকৃতি ফেডারেশনগুলিকে শ্রমিকদের অধিকারের পক্ষে সমর্থন, সামাজিক সংলাপে অংশগ্রহণ এবং ইউনিয়নভুক্ত এবং অইউনিয়নভুক্ত উভয় শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদানে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালনের ক্ষমতা দেবে।
- এই সংস্কারগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে, ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলি আরও কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি নিশ্চিত করবে যে, সমস্ত শ্রমিক তাদের শিল্প, কর্মসংস্থানের অবস্থা বা ইউনিয়ন সদস্যপদ নির্বিশেষে - কর্মক্ষেত্রে পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব, সুরক্ষা এবং সহায়তা পাবে।

৩.৫.৬ কমিটি, কমিশন এবং প্রতিনিধি দলে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব

জাতীয় TCC, সরকার গঠিত কমিটি, কমিশন এবং প্রতিনিধি দলে, যেখানে শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সেখানে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের একটি নির্দিষ্ট এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোনীত বা নির্বাচিত করতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা উচিত, যেমন;

- সংগঠনের সদস্য সংখ্যা: এজন্য ফেডারেশনসমূহের চাঁদা দানকারী সদস্যের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণের গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা।
- প্রতিনিধিত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যসংখ্যা প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি কাঠামোগুলি যেনো অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় সেভাবে সদস্য মনোনয়ন প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করা।
- সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্ব নিযুক্ত কর্মী বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে গঠিত ইউনিয়নের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।

বিগত সময়ে সরকারের বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী কাঠামোয় শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা প্রশ্নবিদ্ধ, যার ফলে তারা শ্রমিকদের স্বার্থের সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির পক্ষে প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ক্ষেত্রে মালিকদের সমকক্ষ সমিতি খুঁজে বের করা প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে অথবা অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের কোনো নিয়োগকর্তাদের সমিতি থাকে না, যার সাথে ইউনিয়ন/সিবিএ যৌথ দরকষাকষি বা তাদের সদস্যদের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, যদি প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সদস্য হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে তার ঐ সদস্যদের পক্ষে যৌথ দরকষাকষি বা অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সরাসরি সংলাপে যুক্ত হওয়ার অধিকার রাখবে।

এ প্রেক্ষিতে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করছে:

ক) জাতীয় সামাজিক সংলাপ ফোরাম, ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটি TCC, শ্রম আদালেতের সদস্য মনোনয়ন, সরকার গঠিত যে কোনো কমিটি, কমিশন এবং প্রতিনিধি দলে, যেখানে শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হবে, সেখানে শ্রমিকদের প্রতিনিধিদের একটি নির্দিষ্ট এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোনীত বা নির্বাচিত করতে হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করা উচিত, যেমন; ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের চাঁদা দানকারী সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণ, ফেডারেশনসমূহের চাঁদা দানকারী সদস্যের প্রকৃত সংখ্যা নির্ধারণের গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা উচিৎ। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ফোরামের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী ইউনিয়নের সদস্যের ভিত্তিতে ক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার উপযুক্ত দক্ষতা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্ব নিযুক্ত কর্মী বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে গঠিত ইউনিয়নের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ) যদি প্রতিষ্ঠানপুঞ্জ ভুক্ত কোনো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের সদস্য হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে তার ঐ সদস্যদের পক্ষে যৌথ দরকষাকষি বা অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য সরাসরি সংলাপে যুক্ত হওয়ার অধিকার রাখবে।

গ) শ্রম অধিদপ্তর ইউনিয়ন/ফেডারেশন কর্তৃক দাখিলকৃত বাৎসরিক রিটার্নের ভিত্তিতে চাঁদা দানকারী সদস্যের সংখ্যা অনুযায়ী ইউনিয়ন/ফেডারেশনসমূহের একটি হালনাগাদ তালিকা তৈরি করবে। এই তালিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন কমিটি/ফোরাম/আদালত ও আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলন সহ সামাজিক সংলাপ ফোরাম এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক

বিভিন্ন ফোরামের প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদানের বিধান করা। প্রতি পাঁচ বছর পর পর সদস্যসংখ্যা যাচাইয়ের মাধ্যমে এই তালিকা হালনাগাদ করা। তবে উল্লেখ্য যে, এই সদস্যসংখ্যা ইউনিয়ন বাতিলের কোনও শর্ত হবে না।

ঘ) প্রতিনিধি মনোনয়নের ক্ষেত্রে ক্রম অনুযায়ী আনুপাতিক হারে নির্ধারণ করা। প্রতিষ্ঠান, সেক্টর ও জাতীয় পর্যায়ের একাধিক ইউনিয়নের সম্মিলিত প্লাটফরম বা জোটগত প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তাদের অন্তর্ভুক্ত সকল সংগঠনের মোট সদস্য সংখ্যার যোগফল হিসাব করা।

৩.৫.৭ শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের নীতিমালা

বাংলাদেশের শ্রম আইনের ২০০ নম্বর ধারায় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের জন্য ন্যূনতম শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বিধান অনুযায়ী, সেক্টরভিত্তিক ফেডারেশন গঠনের জন্য কমপক্ষে ৫টি ট্রেড ইউনিয়ন, জাতীয় ফেডারেশনের জন্য ২০টি ট্রেড ইউনিয়ন এবং কনফেডারেশন গঠনের জন্য ১০টি জাতীয় ফেডারেশন লাগবে। যদিও এই বিধান ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের কাঠামো তৈরি করেছে, তবে ইউনিয়ন গঠনের হার দ্রুত বাড়লে অতিরিক্ত সংখ্যক ফেডারেশন তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই অতিরিক্ত ফেডারেশন গঠনের ফলে ইউনিয়ন প্রতিনিধিত্ব দুর্বল হতে পারে। এ ব্যাপারে সরকার ত্রিপক্ষীয় কমিটির মাধ্যমে আইনের বিধিতে প্রয়োজনীয় বিধান সন্নিবেশিত করতে পারবে।

৩.৬ শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ন্যায় বিচার

অধিকার লঙ্ঘন ও বৈষম্য-বঞ্চনার বিরুদ্ধে যথাযথভাবে অভিযোগ পেশ, প্রতিকার ও ন্যায়বিচার প্রাপ্তির নিশ্চয়তা অধিকার সুরক্ষা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান শর্ত। বাংলাদেশের সংবিধান অনুচ্ছেদ ২৭ ও অনুচ্ছেদ ৩১ অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও আইনের আশ্রয় লাভের সম-অধিকারী হবেন যা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির ন্যায় বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা নিশ্চিত করে।

শ্রমনীতি ২০১২ অধীনে বাংলাদেশ সরকার বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া এবং শিল্প অসন্তোষের সুষ্ঠু সমাধান নিশ্চিত করতে সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান এবং শ্রম আদালত, আপিল আদালতের মাধ্যমে বিচার নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। শ্রমনীতিতে সুনির্দিষ্টভাবে (১৫.০০ বিরোধ নিষ্পত্তি) বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকারের প্রচেষ্টা থাকবে যাতে শিল্পবিরোধ উদ্ভব না হয় এমন পরিবেশ বজায় রাখা এবং সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা। কোথাও শিল্পবিরোধের উদ্ভব হলে শিল্পে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে যৌথ আলোচনা, আপোষ-মীমাংসা এবং বিচার ব্যবস্থাসহ, নিষ্পত্তির সকল প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরকার অসৎ শ্রম আচরণকে নিরুৎসাহিত এবং দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা ও সালিসি কার্যক্রমকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করবে। ন্যায় বিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা বিষয়ে শ্রমনীতি উল্লেখ করেছে যে "বিচার প্রার্থীদের হয়রানি হ্রাসের জন্য শ্রম আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করতে সরকার সচেষ্ট থাকবে।"

বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ শ্রমিকদের অধিকার, নিরাপত্তা, মজুরি, কর্মপরিবেশ, ছুটি, ছাঁটাই, শ্রমিক কল্যাণসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অধিকার সম্পর্কিত বিধান প্রদানের পাশাপাশি অধিকার ও আইনে প্রদত্ত সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিধান লঙ্ঘন হলে শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াও নির্ধারণ করে। আইনের চতুর্দশ অধ্যায়ে (ধারা ২০৯-২৩১) বিরোধ নিষ্পত্তি, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, আইনগত কার্যধারা বিষয়ে আইনি কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির একটি কাঠামোগত পদ্ধতি নির্ধারণ করে, যেখানে আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনে সালিসি ও মধ্যস্থতা ব্যবস্থার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার পথ সুগম করা হয়েছে। এ ছাড়াও চতুর্দশ অধ্যায়ে ধর্মঘট ও লক আউট, শ্রম আদালত, শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল, বে আইনি ধর্মঘট ও লক আউট সম্পর্কে বিধান রয়েছে। যদি শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে কোনও বিরোধ ঘটে, তবে তা সমাধান করতে শ্রম আদালত বা শ্রম আপিল আদালত একটি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবে। শ্রম আদালত এবং শ্রম আপিল আদালতের মাধ্যমে শিল্প বিরোধ সমাধান করা এবং আইনিভাবে ন্যায়বিচার প্রদান করার বিধান রয়েছে। এছাড়া শ্রম ট্রাইব্যুনাল শ্রমিকের ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা অনুচ্ছেদ ২৩ ও ২৪-এ অনুযায়ী, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, বিশ্রাম ও অবকাশের অধিকারসহ সংগঠিত হওয়ার অধিকার উল্লেখ করেছে। এর মাধ্যমে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে অধিকার বিষয়ে অসন্তোষ বা বিরোধ উত্থাপন করতে এবং সেগুলির সমাধানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে অনুমোদন দেয়। একইভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬-এর অনুচ্ছেদ ৮, শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, যোগদান, জাতীয় ফেডারেশন তৈরি, আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান এবং ধর্মঘট করার অধিকার নিশ্চিত করেছে। এর মাধ্যমে শ্রমিকরা যদি তাদের কর্মস্থলে কোনো সমস্যায় পড়েন, তবে তারা ধর্মঘটের মাধ্যমে তাদের দাবিগুলি উত্থাপন করতে পারেন, যা তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখে এবং কার্যকরী প্রতিবাদ প্রদর্শন করতে সাহায্য করে।

জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশনা (UNGPs) যেখানে "Protect, Respect and Remedy" কাঠামোর ভিত্তিতে সরকার ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করতে দায়িত্বশীল আচরণ করতে নির্দেশনা দেয়। নির্দেশনা মোতাবেক শ্রমিক সংগঠনগুলির কার্যক্রমে বাধা দিলে তা মানবাধিকার লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য হবে। বাংলাদেশ সরকার এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব হচ্ছে শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার স্বীকৃত দেওয়া এবং যদি কোনো অসন্তোষ বা বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে তা সুষ্ঠু প্রক্রিয়া মাধ্যমে প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করা।

আইএলও কনভেনশন নং ১৫৪ (যৌথ দরকষাকষি, ১৯৮১) যৌথ দরকষাকষি প্রক্রিয়ার ব্যবহারে উৎসাহিত করে, যা শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শিল্প বিরোধ প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে। এটি বাংলাদেশে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় সরকারের জন্য একটি নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করতে পারে। আইএলও রিকমেন্ডেশন নং ৯২ (স্বেচ্ছাসেবী সালিস ও মধ্যস্থতা, ১৯৫১) শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সালিস (Arbitration) এবং মধ্যস্থতা (Conciliation) ব্যবহারের পরামর্শ দেয়। এই পরামর্শ অনুসরণ করে বাংলাদেশ সরকার শ্রমিক-মালিক বিরোধ সমাধানে সরাসরি ধর্মঘট বা লক আউটের পথে যাওয়ার পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খুঁজে বের করতে পারে। আইএলও ত্রিপাক্ষিক পরামর্শ কনভেনশন নং ১৪৪ (১৯৭৬) শ্রমিক, মালিক এবং সরকারের মধ্যে কার্যকর সংলাপ নিশ্চিত করার জন্য ত্রিপাক্ষিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করতে উৎসাহিত করে। এই কনভেনশনটি বাংলাদেশে ত্রিপাক্ষিক পরামর্শ এবং সমঝোতা প্রক্রিয়া শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের জন্য এই কনভেনশনগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং শিল্প বিরোধ প্রতিরোধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব। গত ফেব্রুয়ারি মাসে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষীয় টেকনিক্যাল সভার উপসংহারে শ্রমিকপক্ষ, মালিকপক্ষ ও সরকারপক্ষ 'সকল শ্রমিকের জন্য ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা' বিষয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্যে[85] একমত হয়েছে:

১) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার দলিল অনুসারে, কর্মক্ষেত্রে সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা আইনের শাসনের একটি স্তম্ভ। আইনগত সমতা নিশ্চিতের জন্য প্রয়োজন সহজে আইনি সেবা ও প্রতিকার পাওয়ার নিশ্চয়তা। যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান রেখে কর্মজগতে দ্রুত শ্রম বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তি (LDPR) শক্তিশালী করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

২) শ্রম ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বিশেষ করে লক্ষ্য ৫, ৮, ১০ এবং ১৬ অর্জনকে শক্তিশালী করা। এটি শ্রম অধিকার বাস্তবায়ন এবং ILO-এর বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক শ্রমমান কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩) শ্রম ন্যায়বিচারে সহজগম্যতা অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্য হচ্ছে তত্ত্বগত (substantive) ও পদ্ধতিগত (procedural) উভয় ন্যায়বিচারের উন্নয়ন এবং এর ফলে শ্রমিক এবং নিয়োগকারীদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন এবং তাদের স্বার্থ স্বীকৃতি নিশ্চিত করা। ন্যায্য, যথাযথ এবং ন্যায়সঙ্গত শ্রম সম্পর্ক, সামাজিক শান্তি, কর্মক্ষেত্রে মানবিক মর্যাদা এবং টেকসই উদ্যোগের জন্য সক্ষম পরিবেশের কেন্দ্রে রয়েছে একটি কার্যকর এবং নিশ্চিতযোগ্য LDPR প্রক্রিয়া, যা সকলের জন্য পূর্ণ, উৎপাদনশীল এবং স্বাধীন কর্মসংস্থান এবং শোভন কাজ উৎসাহিত করে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং শোভন কাজ বাংলাদেশ কর্মসূচি ২০২২-২৬, বাংলাদেশের সরকারকে শিল্প সম্পর্ক এবং শ্রমিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কিছু বাধ্যবাধকতা এবং কার্যকরী দায়িত্ব প্রদান করে। এর অভীষ্ট ১৬ শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের আওতায় মূলত সবার জন্য ন্যায়বিচার এবং কার্যকর প্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেয়। এই লক্ষ্যের মাধ্যমে সরকারের কাছে শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা, শ্রম আইন প্রয়োগ এবং শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার দায়িত্ব রয়েছে। শিল্প বিরোধের নিষ্পত্তিতে সরকারের দায়িত্ব এমনভাবে তৈরি হয় যে, তারা যেন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) কনভেনশন অনুযায়ী, শ্রমিকদের জন্য একটি ন্যায়বিচারপূর্ণ এবং আইনসম্মত বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

শোভন কাজ বাংলাদেশ কর্মসূচির (Decent Work Country Program for Bangladesh ২০২২-২০২৬) কৌশলগত অগ্রাধিকার লক্ষ্য ৩ "আন্তর্জাতিক শ্রম মান ও কর্মস্থলের অধিকার উন্নতিতে, শ্রমবাজার শাসন শক্তিশালীকরণ এবং সামাজিক সংলাপ বৃদ্ধি" বাংলাদেশের সরকারের জন্য একটি অঙ্গীকার। এই অগ্রাধিকারটি শ্রমিকদের সংগঠন করার অধিকার এবং ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমের সুরক্ষা নিশ্চিত করা যা শিল্প বিরোধ ও অসন্তোষ নিষ্পত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কর্মসূচি শ্রমিকদের সংগঠন ও তাদের কার্যক্রমের সুরক্ষা প্রদান করে, যার মাধ্যমে সামাজিক সংলাপ এবং বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া আরও কার্যকরী হবে। সরকারকে এই লক্ষ্যগুলির পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার

[85] আনঅফিশিয়াল অনুবাদ

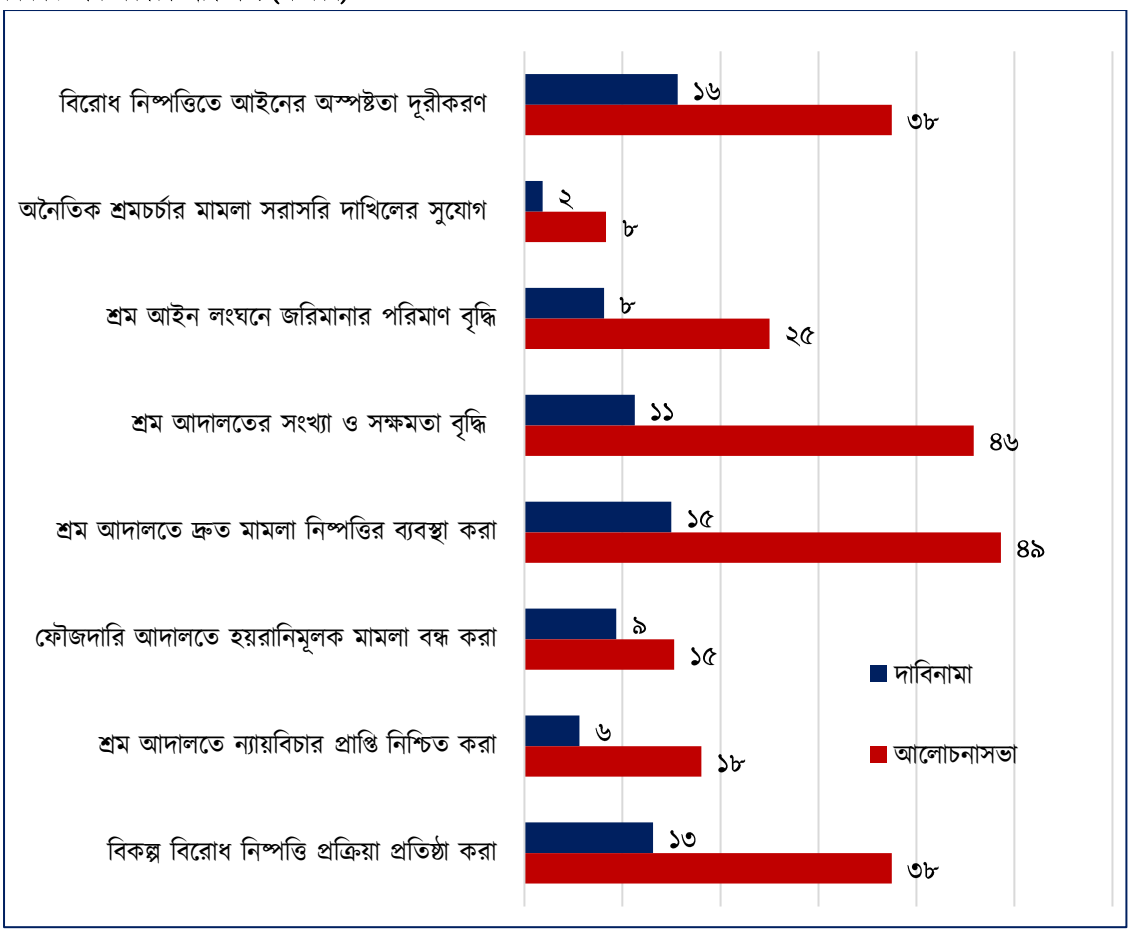
মাধ্যমে একটি শক্তিশালী ও সুষ্ঠু শ্রমবাজার গঠন করতে হবে, যা দীর্ঘমেয়াদি শান্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

তবে বিদ্যমান ব্যবস্থায় অসন্তোষের ধরন ও পরিমাণে বৈচিত্র্য, শ্রমিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের দীর্ঘসূত্রিতা এবং অধিকাংশ শ্রমিকের ন্যায়বিচার পাওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় এ নীতির কার্যকর প্রয়োগের কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না। বাংলাদেশে অত্যন্ত স্বল্প সংখ্যক প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শ্রম আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। তবে এক্ষেত্রেও দীর্ঘসুত্রিতাসহ বিভিন্ন কারণে প্রায়শই শ্রমিক বঞ্চিত হয়। অপরদিকে শতকরা ৮৫ ভাগ অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য প্রাপ্য না পাওয়া বা আইনানুগ অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে কোনো ব্যবস্থাই বিদ্যমান নেই। ফলে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবি মানুষ ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত।

বাংলাদেশে শিল্প ও শ্রম খাতে বিদ্যমান কাঠামোগত দুর্বলতা, ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়নের ঘাটতি ও বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থার অভাবে শ্রমিক অসন্তোষ ক্রমবর্ধমানভাবে জটিল ও সহিংস রূপ নিচ্ছে, যা শুধু কর্মক্ষেত্রেই নয়, বরং জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। শিল্প বিরোধ উৎপত্তি রোধ, নিষ্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা ও চর্চা বিদ্যমান না থাকায় প্রায়শই বিভিন্ন কারখানা ও শিল্পাঞ্চলে কারখানা বন্ধ ও শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, যার ফলে জনদুর্ভোগ ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি শ্রমিকের জীবনহানি পর্যন্ত হয়ে থাকে।

কাজের সুযোগ বন্ধ করা এবং জীবিকার উপকরণ অবৈধভাবে বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা বিভিন্ন খাতে ঘটে থাকে। বিশেষত রিকশা শ্রমিক, হকার, পরিবহন শ্রমিক এবং মৎস্য শ্রমিক প্রায়শই অনিশ্চিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের কর্মস্থল থেকে উচ্ছেদসহ জেল জরিমানা করা হয়। কিন্তু একই শ্রমিকের নিয়োগকর্তার উপর কোনো আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয় না।

চিত্র: ৩.৬.৭ অংশীজনের সাথে আলোচনা এবং পেশকৃত দাবিনামার প্রেক্ষিতে শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ন্যায় বিচার বিষয়ক শ্রম সংস্কার অধিক্ষেত্র (শতাংশ)



বিরোধ নিষ্পত্তিতে ইউনিয়নের অংশগ্রহণে বাধার ফলে শ্রমিকরা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের সুযোগ পান না। বিশেষত গার্মেন্টস, নির্মাণ, বন্দর ও চামড়া শিল্পসহ বিভিন্ন খাতে বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠনগুলি কার্যকর ভূমিকা রাখতে বাধার সম্মুখীন হয়। শ্রমিক ইউনিয়নকে দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় অংশ নিতে বাধা দেওয়া, চাকরিচ্যুতির ভয় দেখানো এবং হয়রানিমূলক ফৌজদারি মামলার মাধ্যমে বিরোধ নিরসনের প্রবণতা দেখা যায়।

শ্রম সংস্কার কমিশনের কাছে বিভিন্ন শ্রম সংগঠনসমূহের প্রদত্ত দাবিনামা থেকে পাওয়া যায় যে, শ্রমিক সংগঠনসমূহ বিরোধ নিষ্পত্তিতে শ্রম আইনের অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের বিষয়ে প্রস্তাব করেন। মানবাধিকার বা সামাজিক সংগঠনসমূহ শ্রমিকের বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মামলা না করা, ট্রেড ইউনিয়নের বাহিরে থাকা শ্রমিকদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি এবং বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া প্রবর্তনের দাবি করেন। পেশাজীবী এবং শ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ অসন্তোষ নিরসনে মালিক ও শ্রমিকের দায়বদ্ধতা, শ্রম আদালতের সংখ্যা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে দাবি করেন। এই বিষয়ে শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিগণের দাবিনামায় শ্রম আদালতের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া আরও শ্রমিকবান্ধব করা এবং নির্ধারিত সময়কাঠামো অনুযায়ী যেন আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে জোর দেয়া হয়। বিকল্প শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আরবিটেশন সেল বা আরবিটেশন কমিশন গঠন করার, হঠাৎ সৃষ্ট শ্রম অসন্তোষ নিরসনের জন্য শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থায়ীভাবে ভ্রাম্যমান আদালত এবং জরুরি অবস্থায় করণীয় নির্ধারণ করতে ত্রিপক্ষীয় ক্রাইসিস কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়াও শ্রম বিরোধ সালিসের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য সালিসের পলিসি এবং সময় সুনির্দিষ্টকরণ এবং প্রতিটি জেলা, থানা শহরে ও ইউনিয়ন পরিষদে শ্রমজীবীদের জন্য সালিস কেন্দ্র চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে।

৩.৬.১ অধিকার লঙ্ঘনে প্রতিকার ও ন্যায়বিচার

শিল্প ও শ্রম অসন্তোষ বৃদ্ধির পেছনের কারণ বহুমুখী এবং এ কারণসমূহ নিয়োগচুক্তি, কর্মপরিবেশ, কর্মস্থলে শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ এবং কাঠামোগত ও প্রশাসনিক দুর্বলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। নিয়োগ শর্তাবলি লঙ্ঘন, যেমন; অপর্যাপ্ত মজুরি, মজুরি পরিশোধে বিলম্ব, ওভারটাইমের যথাযথ পারিশ্রমিক না পাওয়া এবং ছুটি সংক্রান্ত অনিয়ম, শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর পাশাপশি কর্মপরিবেশের অবনতি, বিশেষ করে নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব, বিশ্রামের সীমিত সুযোগ এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে না চলা শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে নিয়মিত আলোচনা ও সমস্যা সমাধানের উদ্যোগের অভাবের কারণে তাদের মাঝে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব অনেকক্ষেত্রে অমীমাংসিত থেকে যায়, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন না থাকা অথবা ট্রেড ইউনিয়ন যথাযথভাবে কার্যকর হতে না পারার কারণে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া উত্থাপন ও দরকষাকষির সুযোগ কমে যায়, যা প্রকারান্তরে তাদের মধ্যে অসন্তোষকে বাড়িয়ে দেয়। অন্যদিকে শ্রম অধিদপ্তর ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের পর্যাপ্ত নজরদারি না থাকায় শ্রম আইন যথাযথভাবে পরিপালিত হচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। অন্যদিকে শ্রম আদালতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ বৃদ্ধি করে। সব মিলিয়ে এসব কাঠামোগত ও প্রশাসনিক সমস্যার কারণে শ্রম অসন্তোষ দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে, যা অর্থনীতির স্থিতিশীলতাকেও প্রভাবিত করছে।

প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় পর্যায়ে টেকসই উন্নয়ন, অব্যাহত উৎপাদন এবং একটি সুসমন্বিত শিল্প সম্পর্ক অপরিহার্য। এজন্য আইন দ্বারা শ্রমিকের অধিকারসমূহের সুরক্ষা, শক্তিশালী পরিদর্শন ব্যবস্থা নিশ্চিত, শ্রমিকের সংগঠিত হওয়া, দরকষাকষি ও প্রতিনিধিত্বের অধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত কার্যকর আলোচনা, দরকষাকষি ও আলোচনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। তবে বাংলাদেশে এই উদ্যোগ খুবই সীমিত ও দুর্বল। সর্বোপরি সংগঠন, দরকষাকষি ও সংগঠনের অধিকার চর্চার কার্যকর পরিবেশ না থাকা, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সংস্কৃতির অনুপস্থিতি এবং ব্যাপক সংখ্যক অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিককে আইনি সুরক্ষার বাইরে রাখার কারণে বঞ্চনা ও বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সামাজিকভাবে বিচারহীনতার সংস্কৃতি তৈরি হচ্ছে। এমতাবস্থায় কমিশন মনে করে, বাংলাদেশের শ্রমজগতে বিদ্যমান বৈষম্য এবং শ্রমিকের অধিকারহীনতা ও ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার

বিপরীতে প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থার অনুপস্থিতি চূড়ান্তভাবে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক ও জাতীয় উন্নয়নের বাধা। এ পরিস্থিতি থেকে উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিশন নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করছে:

ক) সকল শ্রমিকের অধিকার ও ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার জন্য আইনানুগ সুরক্ষা ও সেটি বাস্তবায়নের কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান রাখা।

খ) শ্রমিকের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকার লঙ্ঘন ও প্রাপ্য না পাওয়ার বিপরীতে অভিযোগ দায়েরের নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ, পদ্ধতি ও ব্যবস্থা রাখা এবং প্রতিকার পাওয়ার সময়সীমা নির্দিষ্ট করা।

গ) কারখানা পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে শ্রমিক ও মালিকের যথাযথ প্রতিনিধিত্বে আলোচনার আনুষ্ঠানিক কাঠামো বিদ্যমান থাকা।

ঘ) কার্যকর যৌথ দরকষাকষি চর্চা এবং প্রয়োজনে সালিসি ও মধ্যস্থতার ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা।

ঙ) ব্যক্তিগত অসন্তোষ ও শিল্প বিরোধ উভয় ক্ষেত্রেই বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা।

চ) প্রয়োজন মাফিক যথেষ্ট শ্রম আদালত এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিতে আদালতসমূহের সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

ছ) অপ্রাতিষ্ঠানিক, কৃষি, স্ব নিয়োজিত শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকদের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার বাইরেও অভিযোগ নিষ্পত্তির বিশেষ ব্যবস্থা রাখা।

জ) মজুরি নির্ধারণে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের ভূমিকা ও পদ্ধতি আরও কার্যকর করা এবং মজুরি সময় মতো পরিশোধের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করা।

৩.৬.২ বিরোধ নিষ্পত্তি

প্রাতিষ্ঠানিক খাতের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত বিরোধ নিষ্পত্তি

ক) বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিরোধ কারখানা পর্যায়ে সৃষ্টি হয়। তাই ব্যক্তি ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ে বিরোধ নিষ্পত্তিতে কার্যকর আইনি প্রক্রিয়া বলবৎ ও শক্তিশালী করা।

খ) কারখানা পর্যায়ে শ্রমিক সমাধান না পেলে শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর/শ্রম অধিদপ্তরের কাছে অভিযোগ জানানোর কার্যকর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

গ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শক/শ্রম পরিচালকের কাছে এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে তাদের অনুপস্থিতিতে সরকার নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে যাতে অভিযোগ জানানো ও নিষ্পত্তির আইনানুগ ব্যবস্থা থাকে তা নিশ্চিত করা। শ্রম আইনের ১২৪ (ক) ধারাকে অনুসরণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে আরো পূর্ণাঙ্গ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ) উপর্যুক্ত দুটি পর্যায়ে সমাধান না হলে শ্রম আদালতে দ্রুত প্রতিকার পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা, প্রয়োজনে শ্রম আদালতেই মামলা শুরু হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে একটি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা।

ঙ) শ্রমিকের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বা কোনো কারণে শ্রমিকের চাকরির অবসান হলে স্বচ্ছ ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক নিয়ম অনুসরণ নিশ্চিত করা এবং শ্রমিককে যথাযথ উপায়ে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া।

চ) শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থায় শ্রমিক/শ্রমিক প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনে ইউনিয়ন প্রতিনিধি বা তার অনুপস্থিতিতে শ্রমিকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক রাখা।

শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

ক) প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা ও দরকষাকষির চর্চার অধিকার নিশ্চিত করা।

খ) সেইফটি কমিটি ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধমূলক কমিটি সহ কারখানা ভিত্তিক কমিটিসমূহে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ যথাযথ ও নিশ্চিত করা।

গ) কল্যাণ কর্মকর্তার পদবি ও দায়িত্ব এমনভাবে বিন্যস্ত করা, যাতে তিনি প্রভাবমুক্তভাবে শ্রমিকদের পক্ষে তাদের কল্যাণমূলক কাজ নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

ঘ) ব্যক্তি শ্রমিক যদি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ন্যায়বিচার না পায়, তাহলে সরাসরি হটলাইনে টেলিফোন বা ইমেইল প্রেরণ বা অন্য কোনো মাধ্যমে পরিদর্শন অধিদপ্তরকে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবে, যা আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বলে গণ্য করা হবে এমন সুযোগ থাকা।

ঙ) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ও কার্যকর 'শপ স্টুয়ার্ড মডেল'-এর আলোকে ফ্লোর/বিভাগ বা শ্রমিকের নির্দিষ্ট সংখ্যার ভিত্তিতে শ্রমিক কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি তৈরি ও প্রশিক্ষিত করা, যাতে যে কোনো ধরনের বিরোধ কর্মক্ষেত্রেই সমাধান করা যায়। যে সকল ফ্লোর/বিভাগে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি, সেখানে নারী শপ স্টুয়ার্ড নিযুক্ত করা।

চ) প্রতিষ্ঠান, সেক্টর বা আঞ্চলিক পর্যায়ে বিশেষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় ত্রিপক্ষীয় 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি' গঠন করা।

ছ) জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বৃহৎ সেক্টর যেমন; তৈরি পোষাকশিল্প সহ ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করা।

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত

ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের বিভিন্ন পেশা ও খাত অনুযায়ী সংগঠিত হওয়া, প্রতিনিধিত্ব করা এবং নিয়োগকারী, তাদের অ্যাসোসিয়েশন এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা ও চুক্তি স্বাক্ষর করার আইনগত বিধান তৈরি করা।

খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সকল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে আলাদা অফিস বা ডেস্ক স্থাপন করা, যাতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ের বিরোধ উত্থাপন এবং তাদের আইনি প্রাপ্য নিশ্চিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

জাতীয় পর্যায়

ক) ত্রিপক্ষীয় কমিটিসমূহের গঠন ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, নিয়মিত আলোচনা এবং গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা।

খ) শ্রম অসন্তোষ নিরসনের উদ্দেশ্যে জাতীয় শ্রম সংলাপ ফোরাম গঠন করা। এই ফোরাম শ্রম সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিমালা পর্যালোচনা, নতুন আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বিষয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ করবে।

গ) জাতীয় ও শিল্প পর্যায়ে সম্পাদিত দরকষাকষি চুক্তির আইনানুগ স্বীকৃতি ও ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং তা বাস্তবায়নে দপ্তরসমূহের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

ঘ) প্রতি বছর জাতীয় ত্রিপক্ষীয় শ্রম সম্মেলনের আয়োজন করা যেখানে শ্রমিক অধিকার, শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, নীতি প্রণয়নে শ্রমিকের অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে তিন পক্ষের প্রতিনিধি ও শ্রম অধিকার নিয়ে কাজ করা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আলোচনা ও সমন্বিত পরিকল্পনা গৃহীত হবে।

মধ্যস্থতা (conciliation), সালিস (arbitration) ও সমঝোতার (mediation) মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি

ক) মধ্যস্থতা, সালিস ও সমঝোতার বর্তমান প্রক্রিয়াকে অধিকতর শ্রমবান্ধব, কার্যকর ও যুগোপযোগী করে ব্যক্তিবিরোধ, সমষ্টিগত বিরোধ বা শিল্প বিরোধের ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতে যাওয়ার পূর্বে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আসতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

খ) মধ্যস্থতা, সালিস ও সমঝোতার প্রচলিত প্রক্রিয়ায় সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যাতে কোনোভাবেই হুমকি, ভয়-ভীতি বা আর্থিক প্রলোভনে প্রভাবিত না হয় আদালতকে সে বিষয় নিশ্চিত করতে হবে।

শ্রমিকের ধর্মঘটের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা

ক) শ্রমিকের দাবির প্রতি সম্মান ও গুরুত্ব প্রদান করা এবং দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) কারখানার বাইরে আন্দোলন করে দাবি আদায়ের ধারণা ও চর্চার বিপরীতে আলোচনা ও সংলাপের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির চর্চাকে উদ্বুদ্ধ করা।

গ) নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ দাবি/বিরোধ উত্থাপন ও প্রয়োজনে ধর্মঘট করার অধিকার প্রয়োগ করা।

ঘ) ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান প্রক্রিয়া নিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার মধ্যে বিদ্যমান অসংগতি দূর করা প্রয়োজন, যাতে একটি স্বচ্ছ ও আইনসম্মত কাঠামো তৈরি হয়। শ্রম বিধিমালার ২০৪ নম্বর বিধিকে সংশোধন করে BLA-এর ধারা ২১০ (১১)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা উচিত, যাতে CBA গোপন ব্যালট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পায় এবং ১৫ দিনের মধ্যে ধর্মঘটের নোটিশ প্রদান করতে সক্ষম হয়। প্রক্রিয়াগত ধাপগুলি স্পষ্ট করে শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার প্রয়োগে যে বাধা সৃষ্টি হয়, তা দূর করা জরুরি।

ঙ) সরকার কর্তৃক ৩০ দিনের পর ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার ক্ষমতার সঙ্গে শ্রমিকদের জন্য মজুরি ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করার আইনি বাধ্যবাধকতা থাকা উচিত। যদি কোনো ধর্মঘট সরকার বন্ধ করে দেয়, তাহলে শ্রমিকরা তাদের আইনসম্মত অধিকার প্রয়োগের ফলে আর্থিক ক্ষতির শিকার হবে না। এমন পরিস্থিতিতে পূর্ণ মজুরি প্রদানের বিধান নিশ্চিত করলে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সংকট এড়ানো সম্ভব হবে এবং কর্তৃপক্ষের নির্বিচার হস্তক্ষেপ প্রতিহত করা যাবে, যা শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR)

ক) শ্রম অসন্তোষ কমাতে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি আইনের সংস্কার, কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ও শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। বিরোধ উত্থাপনের পূর্বেই বা সাথে সাথে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমষ্টিগতভাবে সমাধানের উদ্যোগ নিতে হবে।

খ) শিল্প অসন্তোষ নিরসন ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতে দীর্ঘমেয়াদি ও টেকসই সমাধান হিসেবে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে সক্রিয় ও গতিশীল করা।

গ) শ্রম আদালতের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমাতে ও বিরোধের দ্রুত সমাধানে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে বাংলাদেশের শ্রম আইন নির্দেশিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতিগুলিকে বাধ্যতামূলক করা।

ঘ) শ্রমিক ও নিয়োগদাতার সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তিকে কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৩.৬.৩ শ্রম ও শিল্প বিরোধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য আইন ও নীতিমালার সংস্কার

শ্রম ও শিল্প বিরোধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর কতিপয় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শ্রম ও শিল্প বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে শ্রমিকরা দীর্ঘ সময় ধরে হয়রানির শিকার হন। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক ও নিয়োগকর্তার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়া থাকলেও তা সময় সাপেক্ষ এবং জটিল। মধ্যস্থতা (conciliation), সালিসি (Arbitration), শ্রম আদালত (Labour Court) এবং আপিলের (Appellate Tribunal) দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে শ্রমিকরা দ্রুত সমাধান পান না। ফলে শ্রমিকরা কাজ চালিয়ে যাওয়ার সময়ও মানসিক চাপ ও আর্থিক সংকটে ভোগেন, অনেক ক্ষেত্রে চাকরি হারানোর ঝুঁকিও তৈরি হয়।

অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন ও অন্যান্য বিধান কার্যকরভাবে প্রয়োগ হয় না বিধায় তাদের অধিকারের সুরক্ষা দুর্বল। বাংলাদেশের বেশিরভাগ শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, যেখানে এই শ্রমিকদের জন্য আইনি সহায়তা পাওয়ার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত, কারণ তারা সাধারণত ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য নন এবং সরকার বা বেসরকারি আইনি সহায়তা সংস্থাগুলির সেবা গ্রহণ করাও তাদের জন্য কঠিন। ফলে তাদের শ্রম অধিকার লঙ্ঘিত হলেও প্রতিকার পাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

শিল্প প্রতিষ্ঠানে আকস্মিক শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য কার্যকর কোনো তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা শ্রম আইনে নেই। বিদ্যমান আইনি কাঠামোতে অসন্তোষ নিরসনে শ্রম দপ্তর বা শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক সংস্থাগুলিকে সম্পৃক্ত করা হলেও বিভিন্ন কারণে দ্রুত সমাধান হয় না। এতে শ্রমিক অসন্তোষ দীর্ঘায়িত হয়, যা কর্মস্থলে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে এবং শিল্পখাতের উৎপাদনশীলতা ব্যাহত হয়।

অসন্তোষের বা বিরোধ প্রতিরোধ ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আইনি দুর্বলতা বিদ্যমান। মধ্যস্থতা ও সালিসি ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ায় আদালতের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে, যদিও আদালতের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি সন্তোষজনক নয়। বাংলাদেশের শ্রম আইনে সালিসি ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকলেও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় না। অপরদিকে শ্রমিকরা বাধ্য হয়ে ব্যক্তিগত বিরোধের ক্ষেত্রে আদালতের দ্বারস্থ হন, যা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। শ্রম আদালতের মামলাগুলি নিষ্পত্তিতে দীর্ঘ সময় লাগে এবং শ্রমিকদের অনুকূলে রায় হলেও তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়, যা শ্রমিকদের ন্যায়বিচার পাওয়াকে কঠিন করে তোলে।

অসন্তোষ প্রতিরোধ বা নিষ্পত্তির জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট আইনি কাঠামো নেই। ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রম অসন্তোষ প্রতিরোধে, বিশেষ করে তাৎক্ষণিক অসন্তোষের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের শ্রম আইনে পূর্বপ্রস্তুতির জন্য কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। কোনো সংকট তৈরি হলে তা নিরসনের প্রক্রিয়া শুরু হয় কেবল তখনই, যখন শ্রমিক অসন্তোষ চরমে পৌঁছে যায়। শ্রমিকদের দাবি নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা বাধ্যতামূলক নয়, ফলে সমস্যাগুলি দীর্ঘ সময় ধরে জমতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সংঘাতের রূপ নেয়। শ্রম অসন্তোষ প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ, যেমন; নিয়মিত ত্রিপক্ষীয় আলোচনার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা, শ্রমিকদের অভিযোগ জানাবার কার্যকরী প্ল্যাটফর্ম এবং তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি স্বাধীন শ্রম কমিশন গঠনের মতো ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

আইনি সংস্থাগুলির সমন্বয়ের অভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়। শ্রমিক অসন্তোষ বা বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলির মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের অভাব স্পষ্ট। শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম আদালত, শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট সমন্বয় কাঠামো নেই। শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা চিহ্নিত করলেও তা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যথাযথ আইনি উদ্যোগ নিতে পারে না। এছাড়া আদালত, শ্রম দপ্তর এবং সালিসি বোর্ডগুলির মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের দুর্বলতার কারণে বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া দীর্ঘমেয়াদি হয়ে পড়ে, যা শ্রমিকদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথকে আরও কঠিন করে তোলে।

শ্রম ও শিল্প বিরোধ প্রতিরোধ ও প্রতিকারের জন্য আইন ও নীতিমালার সংস্কারের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রম আইন সংশোধন করে দ্রুত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর বিধান সংযোজন করা। আইনের সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত ও শিল্প বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বাধ্যতামূলক সময়সীমা নির্ধারণ করা। আদালতে মামলা দায়েরের পর দ্রুত রায় প্রদান ও বাস্তবায়নের বিধান সংযোজন করতে হবে। পাশাপাশি শ্রমিকদের হয়রানি বা প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপের শিকার হওয়া থেকে রক্ষার জন্য নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা।

খ) শ্রমিকদের জন্য একটি সমন্বিত অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Grievance Redress Mechanism) চালু করা। একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং কার্যকর শ্রমিক অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Grievance Redress Mechanism - GRM) গঠন করা জরুরি, যেখানে শ্রমিকরা সহজে তাদের সমস্যা উত্থাপন এবং দ্রুত সমাধান পাবেন। এই ব্যবস্থার অধীনে অনলাইন পোর্টাল, টোল-ফ্রি হটলাইন এবং সরাসরি অভিযোগ কেন্দ্র কার্যকর করা যেতে পারে, যেখানে শ্রমিকরা তাদের অভিযোগ গোপনীয়তার সাথে জানাতে পারবেন। Grievance Redress Mechanism-এর প্রতিটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত করতে হবে যে, নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় শ্রমিকরা তাদের আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়।

গ) মধ্যস্থতা, সালিস ও সমঝোতার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির সংস্কৃতি গড়ে তোলা। শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে আদালতের ওপর চাপ কমাতে শ্রম আইন সংশোধন করে মধ্যস্থতা (conciliation), সমঝোতা (mediation) এবং সালিসের (arbitration) মতো বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution - ADR) পদ্ধতিগুলি ক্ষেত্র অনুযায়ী বাধ্যতামূলক করা দরকার। মালিক ও শ্রমিকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ ধরনের পদ্ধতির প্রতি আস্থাশীলতা বাড়াতে হবে।

ঘ) বিরোধ নিষ্পত্তির প্রশাসনিক ও আইনি সংস্থাগুলির সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ - শ্রম অধিদপ্তর, শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর, মালিক ও শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন, শ্রম সম্পর্ক কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং শ্রম আদালতের কাজের মধ্যে সুস্পষ্ট সমন্বয় সাধনের আইনি কাঠামো সৃষ্টি করা।

ঙ.) শ্রম ও শিল্প অসন্তোষের তাৎক্ষণিক সমাধান ব্যবস্থা জোরদার করা শ্রম অসন্তোষ প্রতিরোধে সমন্বিত উদ্যোগ, যেমন; নিয়মিত দ্বিপক্ষীয় বা ত্রিপক্ষীয় আলোচনার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা, শ্রমিকদের অভিযোগ দায়েরের কার্যকরী মাধ্যম এবং তাৎক্ষণিক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি কার্যকরী ব্যবস্থা আইনে সংযুক্ত করা।

৩.৬.৪ অসন্তোষ প্রতিরোধের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি ব্যবস্থা

শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেওয়ার কারণ বহুমুখী। কর্তৃপক্ষ পূর্ব থেকে সম্ভাব্য কারণগুলি চিহ্নিত করে প্রাথমিক পর্যায়ে তা প্রতিরোধের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। ফলে শ্রমিকদের ক্ষোভ ধীরে ধীরে বিক্ষোভে রূপ নেয় এবং বিক্ষোভ সহিংসতায় রূপ নেয়। প্রতিটি কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিকদের অংশগ্রহণ কমিটি এবং মালিক প্রতিনিধি বা শ্রম সম্পর্ক কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি আলোচনার মাধ্যম থাকা দরকার। শ্রমিকদের দৈনন্দিন সমস্যাগুলি জানা ও শোনা এবং সেগুলি নিরসনের প্রশাসনিক উদ্যোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি।

মালিক-শ্রমিক-শ্রম প্রশাসন নিয়মিত সংলাপ ও আলোচনা শ্রম আইনে বাধ্যতামূলক নয়। শ্রম ও কারখানা পরিদর্শকগণ কর্মক্ষেত্র পরিদর্শনকালে শ্রমিকদের সাথে খুব কমক্ষেত্রেই আলোচনা বা তাদের সাথে মত বিনিময় করেন। ফলে পরিদর্শকগণ অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন না এবং সমাধনের জন্য দ্বিপাক্ষিক বা ত্রিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মালিক-শ্রমিক সংলাপ সীমিত হওয়ার কারণে অসন্তোষ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। শিল্প-কারখানাগুলিতে বেতন-বোনাস, কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার জন্য মাধ্যম বা প্ল্যাটফর্মের অভাব দূর করা প্রয়োজন।

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ তদারকির ব্যবস্থা নেই। অনেক শিল্প কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব শ্রম অসন্তোষের প্রধান কারণ। শ্রম আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাকে (Labour Inspection System) আরও শক্তিশালী, শ্রমিক বান্ধব, কাগজ ও খাতা-পত্রের পরিবর্তে কাজ ও বাস্তব অবস্থা পরিদর্শন এবং ব্যাপক ভিত্তিক করা প্রয়োজন। পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের জবাবদিহিতাও নিশ্চিত করা দরকার।

বর্তমানে শ্রম অসন্তোষ প্রতিরোধ বা কমানোর জন্য শুধু বিদ্যমান আইন কার্যকর করার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলপ্রসূ ও শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। শ্রম আইন সংস্কার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির পদ্ধতি ব্যবস্থার উন্নয়ন, শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং কার্যকর শ্রমিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনার অভাবে শ্রম ও শিল্প বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অসন্তোষ প্রতিরোধের প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি ব্যবস্থার জন্য আইন ও নীতিমালার সংস্কারের লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমিক অসন্তোষের সম্ভাব্য কারণ চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ: শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেওয়ার আগেই তার সম্ভাব্য কারণগুলি চিহ্নিত করা এবং প্রাথমিক পর্যায়ে তা প্রতিরোধের জন্য উদ্যোগ নেওয়া। প্রতিটি কারখানা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ইউনিয়ন বা অংশগ্রহণ/কর্মস্থলের সহযোগিতা কমিটির ও মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে শিল্প সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Industrial Relations Management Unit) গঠন করা, যা কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত শ্রমিকদের অভিযোগ শুনবে এবং সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেবে।

খ) মালিক-শ্রমিক সংলাপ ও আলোচনার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ: ত্রিপক্ষীয় সংলাপ (Tripartite Dialogue) এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনা (Bipartite Negotiation) বাধ্যতামূলক করা, যেখানে মালিকপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি ও সরকার নির্ধারিত সময় অন্তর আলোচনায় বসবে। শিল্পকারখানাগুলিতে বেতন-বোনাস, কর্মঘণ্টা, ওভারটাইম, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত আলোচনার জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

গ) কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ: অনেক শিল্প কারখানায় নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাব শ্রম অসন্তোষের প্রধান কারণ। শ্রম আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থাকে (Labour Inspection System) আরও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সংখ্যা ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার কার্যকরী কৌশল নির্ধারণ করা।

ঘ) শক্তিশালী ও ব্যাপক ভিত্তিক বিরোধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ: শ্রম অসন্তোষ কমানোর জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা, কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়া এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

৩.৬.৫ শ্রম আদালত ও শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল

বাংলাদেশের শ্রম আদালত ও আপিল ট্রাইব্যুনাল শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং শ্রম বিরোধ সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে কার্যক্রমে বিলম্ব, প্রক্রিয়াগত জটিলতা এবং মামলার নিষ্পত্তিতে অস্বাভাবিক বিলম্ব শ্রমিকের জন্য বহুমুখী সমস্যা তৈরি করছে।

বাংলাদেশের শ্রম আদালত একটি বিশেষ আইনি কাঠামো, যা কর্মীদের জন্য তাদের বিরোধ সমাধান, অধিকার রক্ষা এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করে। প্রধানত বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯ দ্বারা পরিচালিত এই ব্যবস্থা শ্রম আদালতকে চাকরি বা কর্মসংক্রান্ত বিরোধ এবং অভিযোগ সমাধানের প্রধান স্থান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তবে বাংলাদেশের শ্রম বিচার ব্যবস্থা বেশ কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, যা বিরোধের সময় মতো এবং ন্যায্য সমাধান দিতে বাধা সৃষ্টি করছে। আইনি ব্যবস্থা থাকলেও শ্রম আদালত এবং ট্রাইব্যুনালগুলিতে বড় ধরনের বিলম্ব দেখা যায়, যার কারণে মামলার পক্ষগুলির জন্য অনিশ্চয়তা এবং চাপ সৃষ্টি হয়।

দেশের বিপুল সংখ্যক শ্রমিকের জন্য সারাদেশে স্থাপিত শ্রম আদালতের সংখ্যা মাত্র ১৩টি। ঢাকা জেলায় ৩টি, চট্টগ্রাম জেলায় ২টি, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর এবং কুমিল্লা জেলায় ১টি করে এবং খুলনা, সিলেট, রংপুর ও বরিশাল বিভাগে ১টি করে শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে শ্রমঘন ও শিল্প বহুল এলাকা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়েছে। যেমন; সিলেটে শ্রম আদালত স্থাপিত হলেও সেখানে মামলার সংখ্যা কম। অপরদিকে শ্রমঘন ও প্রয়োজন থাকা সত্বেও মৌলভীবাজার বা শ্রীমঙ্গলে কোনো শ্রম আদালত নাই। ফলে শ্রমজীবী মানুষকে বিচারিক আদালতের সুযোগ নিতে অনেক দূর হতে এবং অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করে আদালতে আসতে হয়। অনেক শ্রমিক এ কারণে মামলা করতে ইচ্ছুক হন না। আদালতের সংখ্যা স্বল্পতার পাশাপাশি বিচারকের স্বল্পতাও শ্রমজীবী মানুষের ন্যায় বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি করে। শ্রম আদালতের একজন বিচারক বছরে গড়ে ২৫০টি হতে ৩০০টি মামলা নিষ্পত্তি করতে পারেন। ঢাকার শ্রম আদালতগুলিতে মামলার সংখ্যা উল্লিখিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। অধিক সংখ্যক মামলা একজন বিচারকের পক্ষে পরিচালনা ও আইনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রায় দেওয়া প্রায় অসম্ভব।

২০২৪ সালের এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় দেশের ১৩টি শ্রম আদালতে অপেক্ষমান মামলার সংখ্য ২১,৬১৭টি। ২০২৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৩টি শ্রম আদালত এবং ১টি আপিল ট্রাইব্যুনালে মোট বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ২০,২৮৩ টি। ঢাকা জেলার ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রম আদালতে ৮,৫১৫ টি, গাজীপুর শ্রম আদালতে ৬,০৭৭ টি, নারায়ণগঞ্জ শ্রম আদালতে ২,১১৮টি, চট্টগ্রাম ১ম ও ২য় আদালতে ১,৯৩৪টি, খুলনা শ্রম আদালতে ১৪৮টি, কুমিল্লা শ্রম আদালতে ১৪০টি, রাজশাহী শ্রম আদালতে ৮৬টি, রংপুর শ্রম আদালতে ৮৪টি, বরিশাল শ্রম আদালতে ৮১টি, সিলেট শ্রম আদালতে ৫৬টি এবং শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে ১,০৪৪টি মামলা নিষ্পত্তির অপেক্ষায় আছে।

মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা যেমন রয়েছে তেমনি দীর্ঘসূত্রিতার কারণও আছে। শ্রম আদালতগুলিতে একজন করে সমন সরবারহকারী আছে যার পক্ষে নির্ধারিত সময়ে সরাসরি পক্ষগুলির কাছে সমন পৌঁছে দেওয়া কঠিন। এছাড়া তার জন্য কোনো যাতায়াত ভাতাও বরাদ্দ করা হয় না। এছাড়া বর্তমানে প্রতিটি শ্রম আদালতে ১ জন মাত্র সাচিবিক কর্মী নিযুক্ত আছেন। কোনো মামলায় রায় প্রদান করা হলে সে রায়ের সবকিছু ঠিক করে পক্ষগুলিকে জানানো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় বিচারকে নতুন রায় দেওয়া স্থগিত রাখতে হয়।

শ্রম আইনের ভাষ্য অনুযায়ী ৬০ দিনের মধ্যে একটি মামলা নিষ্পত্তি হতে হবে। কোনো কারণে বিলম্ব হলে পরবর্তী ৯০ দিন অর্থাৎ মোট ১৫০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি হতে হবে। কিন্তু এই সময়সীমা অতিক্রান্ত হলেও কোনো পক্ষই কোনো শাস্তি বা জরিমানার আওতায় পড়েন না। যা পরিণামে বিচার প্রক্রিয়াকে আরো দীর্ঘায়িত করে। শ্রম আদালতে একজন বিচারক চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন এবং ২ জন সদস্য (একজন শ্রমিক প্রতিনিধি এবং একজন মালিক

প্রতিনিধি) তাকে সহায়তা করেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মালিক প্রতিনিধি এবং শ্রমিক প্রতিনিধির সময় মতো উপস্থিত না হওয়ার কারণে মামলার শুনানিতে বিলম্ব হয় যা বিচার ব্যবস্থায় দীর্ঘসূত্রিতা সৃষ্টি হয়।

এ লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রম আদালতের সংখ্যা মামলার পরিমাণ ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাড়ানো প্রয়োজন, প্রয়োজন অনুযায়ী সার্কিট কোর্ট স্থাপন করে উপযুক্ত এলাকায় শ্রম আদালতের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা যেতে পারে, যাতে ন্যায়বিচার দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিশ্চিত হয়।

খ) যুক্তিসংগত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে বাংলাদেশ শ্রম আইনের ২১৬ এবং ২১৮ ধারা সংশোধন করা, যাতে নির্দিষ্ট সময়সীমার কঠোর অনুসরণ নিশ্চিত করা যায়।

গ) প্রক্রিয়াগত সংস্কার এবং আধুনিকীকরণ

- সময় নেয়ার আবেদনকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং বিলম্বের জন্য জরিমানা আরোপ করার ব্যবস্থা করা।
- আদালতের সদস্যদের উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করা এবং রায় দেওয়ার সময়সীমা কঠোরভাবে অনুসরণ করা।

ঘ) অটোমেশন বা স্বয়ংক্রিয়করণের মাধ্যমে কার্যকারিতা বাড়ানো

- শ্রম বিচার ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য নোটিশ প্রদান, মামলার সর্বশেষ অবস্থার তথ্য হালনাগাদ রাখা এবং রায় বিতরণে ডিজিটাল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।
- মামলা পরিচালনা এবং আদালতের মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র বা দলিলাদি সহজে পাওয়ার জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা।

ঙ) শ্রমিকদের জন্য মামলা প্রক্রিয়া সরলীকরণ

- প্রক্রিয়াগত জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে সাক্ষীদের আনুষ্ঠানিক জবানবন্দি বা জেরা শুধুমাত্র তখনই করা উচিৎ যখন তা মামলার নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজন। যদি আদালত সন্তুষ্ট হয় যে, পক্ষগুলি পর্যাপ্ত ডকুমেন্ট বা দলিলাদি জমা দিয়েছে এবং এসব কাগজপত্র গ্রহণযোগ্য, তবে মামলাগুলি মৌখিক যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করা উচিৎ। যদি কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক থাকে, যা আরও স্পষ্টতা দাবি করে, তবে আদালত আনুষ্ঠানিক প্রমাণ গ্রহণ বা সাক্ষীকে জেরা বা জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
- তাছাড়া লিখিত বিবৃতি, আপত্তি বা জবাব দাখিলের সময়সীমা বৃদ্ধির একটি সীমা নির্ধারণ করা উচিৎ যাতে সময় মতো মামলার নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা যায়। অপ্রয়োজনীয় বিলম্বের জন্য জরিমানা আরোপ করা উচিৎ।
- শ্রম আদালতে মামলা সংক্রান্ত পুরো প্রক্রিয়ায় নথি গ্রহণ ও প্রাপ্তিসহ মামলার আদেশ এবং রায়সমূহ সহজ বাংলা ভাষায় করার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা যেন শ্রমিকদের কাছে রায় বোধগম্য হয়।

চ) অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞা

- অন্তর্বর্তী নিষেধাজ্ঞার অপব্যবহার রোধে বিচারক মহোদয়দের নিয়মিত পর্যালোচনা ও নজরদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। আইনে এমন বিধান থাকা প্রয়োজন যে, কোনো পক্ষ যদি আদালতের নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশের সুবিধা নিয়ে মামলার নিষ্পত্তি দীর্ঘায়িত করতে চায়, তাহলে নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ বাতিল করা যাবে।

ছ) শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা

- শ্রম আপিল ট্রাইবুনালে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যাতে অধিক সংখ্যক মামলা শুনানি ও নিষ্পত্তির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। প্রয়োজনে শ্রম আপিলেট ট্রাইবুনাল সার্কিট কোর্ট হিসেবে বিভিন্ন স্থানে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে পারবে। শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনাল শ্রম বিচার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। জেলা জজদের চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়, শ্রম আদালতের চেয়ারম্যান মহোদয়ের রায় তাদের সম-পদমর্যাদার সহকর্মীদের দ্বারা শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে রিভিউ বা পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া শ্রম আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণের জন্য শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানকে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলা সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রদান করা।
- শ্রম আদালতের অন্তর্বর্তী আদেশের বিরুদ্ধে শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করার সুযোগ প্রদান করা।

জ) শ্রম আদালত এবং ট্রাইব্যুনালের জন্য যথেষ্ট অর্থায়ন

- আদালতগুলিকে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য যথেষ্ট আর্থিক সম্পদ এবং জনবল প্রদান করা। এছাড়া এই

আদালতের বিচারকদের জেলা জজদের সমপর্যায়ের সুবিধা প্রদান করা।

ঝ) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR):

- আনুষ্ঠানিক বিচার প্রক্রিয়ার আগে বাধ্যতামূলক আপোষ আলোচনার সময়সীমা নির্ধারণ করা হলে বিরোধ সমাধান দ্রুততর হতে পারে। পারিবারিক আদালতের ন্যায় প্রাক-মামলা শুনানি এবং ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তি করার সুযোগ সম্বলিত বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) পদ্ধতিগুলি শ্রম বিরোধগুলির জন্য প্রয়োগ করা।
- শ্রম আদালতে যাওয়ার পূর্বে বা আদালতের বাইরেই শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আইনগতভাবে যথাযথ বিধান থাকা জরুরি।
- শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও সুবিধা নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা (Grievance Redressal Mechanism - GRM) আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

৩.৬.৬ শ্রমিকদের অপরাধী হিসেবে দেখার প্রবণতা রোধে আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ

শিল্প অন্তোষের ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিকের বিরুদ্ধে যেন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া অজ্ঞাতনামা হিসেবে ফৌজদারি মামলা দায়ের করা না হয় তা নিশ্চিত করা। তবে কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা এবং যদি নির্দিষ্টভাবে কারও বিরুদ্ধে প্রমাণ ভিত্তিক অভিযোগ থাকে তাহলে তারা আইনি ব্যবস্থা এড়াতে পারেন না।

এফআইআরে (FIR) কয়েকজন শ্রমিকের নাম উল্লেখ থাকলেও অসংখ্য অজ্ঞাতনামা শ্রমিকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনা হয়, যার ফলে কারখানায় ভয়, নিরাপত্তাহীনতা ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। এই অবস্থায় নির্বিচারে শ্রমিকদের গ্রেপ্তার করার ঘটনা খুবই সাধারণ। অনেক শ্রমিক, যাদের ওই ঘটনায় কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না বা যারা ঘটনাস্থলেই ছিলেন না, তাদেরও গ্রেপ্তার করে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয় এবং বছরের পর বছর ধরে আইনি হয়রানির শিকার করা হয়। এসব মামলার কারণে শ্রমিকদের বারবার আদালতে হাজিরা দিতে হয়, অনেক সময় দীর্ঘদিন কারাবন্দিও থাকতে হয়। এই ধরনের মামলার আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অর্থনৈতিক ও মানসিক চাপ শ্রমিকদের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শ্রমিকরা কাজ ও আয়ের উৎস হারিয়ে ফেলেন। ফলে তাদের পরিবারসহ তারা চরম সংকটে পড়েন।

এই হয়রানির অংশ হিসেবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রায়ই শ্রমিকদের গ্রামে ও বাড়িতে হানা দেয়। এতে শ্রমিকদের পরিবার ও আশপাশের কমিউনিটিতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এসব অভিযানে শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে অপমানজনক অবস্থায় ফেলা হয়, যা সামাজিকভাবে কলঙ্ক ও মানসিক ট্রমার সৃষ্টি করে। এই কষ্ট শুধু শ্রমিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তাদের পরিবার, শিশু ও বৃদ্ধ সদস্যরাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

শ্রমিকদের কণ্ঠরোধ ও তাদের ন্যায্য দাবি দমনের জন্য যে বেআইনি উপায়ে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থা ব্যবহার করা হচ্ছে, তা অবশ্যই বন্ধ করা উচিত। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, যেন পেশাদার, শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক উপায়ে শ্রম বিরোধ ও অসন্তোষ মোকাবিলা করে—সেজন্য তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। শ্রমিক অসন্তোষ এড়ানোর টেকসই উপায় হলো, শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার,সংগঠিত হওয়ার ও যৌথভাবে দরকষাকষি করার অধিকার সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা এবং সমস্যার মূল কারণের সমাধান করা।

শ্রমিক অসন্তোষে শ্রমিকদের অপরাধীকরণের প্রবণতা রোধে আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ তৈরি করার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করার প্রবণতা দূর করা। শ্রমিকদেরকে শাস্তি দেয়ার চাইতে শিল্পাঞ্চলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যা মোকাবেলা করা। এমন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যাতে শ্রমিকরা প্রতিকার পায় ও বেআইনি কাজ করতে বাধ্য না হন।

খ) অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য দ্রুত ও তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনার সঠিক মূল্যায়নের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা। এই কমিটিতে মালিক, শ্রমিক, শ্রম বিভাগ (DoL), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতিনিধি থাকা উচিৎ। কমিটি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটন করে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করবে।

গ। শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যেসব ফৌজদারি মামলা বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন রয়েছে, সেগুলি 'খ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি বিবেচনায় নিয়ে দ্রুত প্রত্যাহারের ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসাথে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেন পেশাদার, শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক পদ্ধতিতে শ্রম বিরোধ ও অসন্তোষ মোকাবেলা করে—তা নিশ্চিত করতে হবে।

৩.৬.৭ শ্রমিকদের মজুরি সময় মতো পরিশোধ নিশ্চিত করা

বাংলাদেশে শ্রমিক অসন্তোষের অন্যতম প্রধান কারণ হলো সময় মতো মজুরি না পাওয়া। দেশের অধিকাংশ শ্রমিক এমনিতেই নিম্ন মজুরিতে কাজ করেন, যা তাদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত নয়। মাস শেষে প্রাপ্ত মজুরির ওপর তাদের সংসার চালানোর দায়িত্ব নির্ভর করে। ফলে মজুরি প্রদানে বিলম্ব হলে তারা চরম আর্থিক সংকটে পড়েন। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকদের সামনে বিকল্প কোনো পথ খোলা থাকে না। তারা বাধ্য হয়ে বিক্ষোভে নামেন এবং নিজেদের দাবি জানান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব প্রতিবাদ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে, কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা সংগঠনের সরাসরি নেতৃত্ব ছাড়াই। শ্রমিকদের মধ্যে এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠেছে যে, মালিকপক্ষ কিংবা সরকার—কেউই তাদের দুর্দশার যথাযথ মূল্যায়ন করে না। ফলে তারা জনদৃষ্টি আকর্ষণের একমাত্র উপায় হিসেবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ ও অবরোধের মতো কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

শ্রমিকদের মজুরি সময় মতো পরিশোধ নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শ্রমিকদের মজুরি সময় মতো পরিশোধ নিশ্চিত করতে একটি কার্যকর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং মজুরি সময় মতো দেওয়া হচ্ছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, বিলম্বে মজুরি পরিশোধের জন্য জরিমানার ব্যবস্থা করা।

খ) একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে মজুরি সংক্রান্ত বিরোধগুলির সমাধানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে মামলাগুলিকে শুনানির তারিখ নির্ধারণ এবং রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া।

গ) মজুরি না পাওয়ার কারণে শ্রমিকরা যদি প্রতিবাদে নামেন, তবে তার দায় মালিকদেরই নিতে হবে। মজুরি না দেওয়ার জন্য মালিকদের শাস্তির আওতায় আনা।

ঘ) মজুরি ও আইন অনুযায়ী পাওনা সময় মতো না পেয়ে শ্রমিকরা যদি কাজ বন্ধ করে প্রতিবাদ করে, তখন সেটাকে অবৈধ ধর্মঘট না বলা কিংবা সে কারণে শ্রমিকের মজুরি কর্তন না করা।

৩.৬.৮ শ্রমিকের আন্দোলনের সাথে সংহতিসূচক কার্যক্রমকে আইনি সুরক্ষা

শ্রমিক আন্দোলনের চিরায়ত মূল্যবোধ হচ্ছে সংহতি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি, শ্রম ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিপরীতে ইউনিয়ন ও ফেডারেশন এবং শ্রমিক ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, শ্রমিক স্বার্থ নিয়ে কর্মরত সংগঠন, এনজিও, পেশাজীবী সংগঠনের সংহতিসূচক কর্মসূচি এবং কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে আইনে সুরক্ষা দিয়ে বিধান সন্নিবেশ করা, সামাজিক সংলাপ ফোরামে মানবাধিকার সংগঠনসমূহ, শ্রমিক স্বার্থ নিয়ে কর্মরত সংগঠন, এনজিও, পেশাজীবী সংগঠনে, উন্নয়ন সহযোগীদের সামাজিক সংলাপ অংশে যুক্ত করা।

৩.৬.৯ ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি এবং শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব

- অংশগ্রহণ কমিটির নাম পরিবর্তন করে ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি রাখার প্রস্তাব করা হলো।
- প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন থাকুক বা না থাকুক, ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করা।
- প্রতিষ্ঠানে যৌথ দরকষাকষি সংস্থা (সিবিএ) এবং/অথবা অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে, ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটির শ্রমিক সদস্যগণ সিবিএ ও ইউনিয়ন দ্বারা মনোনীত হবেন।
- ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে, ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটি আইনে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করবে। তবে সিবিএ এবং প্রতিষ্ঠানে থাকা অন্যান্য ইউনিয়নের অধিভুক্ত দায়িত্ব ও কার্যক্রম কমিটি গ্রহণ করবে না।
- ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিরাই শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন।
- ওয়ার্কপ্লেস কোঅপারেশন কমিটির শ্রমিক সদস্যদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট বিধান প্রণয়ন করা।

৩.৬.১০ শ্রমিক, প্রতিষ্ঠান ও শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা

শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক ও শিল্পখাতের নিরাপত্তা বিধানে রাষ্ট্রের ভুমিকা রাখা জরুরি। এই লক্ষ্যে শ্রমিক ও শিল্পখাতের নিরাপত্তা রক্ষায় আইন শৃংঙ্খলাবাহিনী, শিল্প পুলিশ কখন, কীভাবে এবং কোন পরিসরে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বিষয়ে সম্পৃক্ত হতে পারে—এ বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে এমন কোনো নীতিগত কাঠামো নেই। এই প্রেক্ষাপটে কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে যাতে আইন শৃংঙ্খলা বাহিনী, শিল্প পুলিশের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।

ক) শ্রম ও শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে আইন শৃংঙ্খলা বাহিনী, থানা, শিল্প পুলিশের ভূমিকা সুস্পষ্ট করা ও সুস্পষ্ট বিধানাবলি প্রণয়ন করা। শিল্প পুলিশ কোনও পরিস্থিতিতে শিল্প সম্পর্ক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তবে শিল্প সম্পর্ক ও শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির সম্ভাবনা থাকলে পুলিশের দায়িত্ব হবে DoL ও DIFE-এর কার্যক্রমে সহযোগিতা করা।

খ) যদি কোনো কর্মকাণ্ডে শ্রম পরিস্থিতি ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটার সম্ভাবনা থাকে সেক্ষেত্রে বিষয়টি শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের পাশাপাশি আইনশৃংঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করার বিধান প্রণয়ন করা।

গ) শ্রম ইস্যু এবং অসন্তোষের পাশাপাশি শিল্প অঞ্চলে শ্রমিকের হয়রানি নিরসন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে স্থানীয় থানা ও আইন শৃঙ্খলাবাহিনীর ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি করা।

ঘ) আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সকল সদস্যকে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব প্রদানের পূর্বে জাতীয় শ্রম আইন, আন্তর্জাতিক শ্রম মান, শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার এবং শ্রম সম্পর্ক বিষয়ক দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল (conflict-sensitive) দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে আইআরআই-এর মাধ্যমে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা। একইসাথে জাতিসংঘের আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের বল ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের নীতিমালা অনুসরণ করা।

৩.৭ সমতা, বৈষম্যহীনতা এবং অন্তর্ভুক্তি

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বলতে বোঝায়, ধর্ম, বর্ণ, জাতিসত্ত্বা, লিঙ্গ, বয়স, প্রতিবন্ধিতা, সামাজিক পরিচয় এবং রাজনৈতিক মতাদর্শসহ এমনি নানা কারণে কোনো শ্রমিকের কোনো সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং অন্যায্য-অসম আচরণের সম্মুখীন হওয়া। বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালা জনগণের জন্য সাম্য ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। সংবিধান অনুচ্ছেদ ২৭-এ সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার বিষয়ে উল্লখ আছে। অনুচ্ছেদ ২৮-এ কেবলমাত্র ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষের ভিত্তিতে সকল ধরনের বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে। একই সাথে সুযোগ আছে নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের। অনুচ্ছেদ ২৯ অনুযায়ী সরকারি চাকরিতে নাগরিকের সমান সুযোগ নিশ্চিত ও সুবিধা বঞ্চিতদের এগিয়ে নেওয়ার জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা নিতে পারবে। বিশেষ জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিতে অনুচ্ছেদ ২৩, ২৩ (ক)-তে বলা হয়েছে,"রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।'' অর্থাৎ এসমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে এমন বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া যাবে যাতে আদিবাসী, বিভিন্ন জাতিসত্তাও সম্প্রদায় তাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও শিক্ষা সংরক্ষিত রাখার পাশাপাশি নাগরিক সুবিধায় সমতা থাকে।

জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২-তে কর্মক্ষেত্রে সমতা প্রতিষ্ঠা একটি প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশেষ করে নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করা অগ্রাধিকারভিত্তিক লক্ষ্য। এর সাথে আদিবাসী, বিভিন্ন জাতিসত্তা, সম্প্রদায়, দলিত, শারীরিক-মানসিক প্রতিবন্ধী, ভাসমান মানুষসহ প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কর্মের সুযোগ ও বৈষম্যহীন পরিবেশ নিশ্চিতকরণ বিষয়টি উদ্দেশ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮)-এ সমতা, বৈষম্যহীনতা এবং শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা অন্তর্ভুক্ত আছে। ধারা ৩৪৫-এর মতে, "কোন (কোনো) শ্রমিকের জন্য কোন (কোনো) মজুরি নির্ধারণ বা নিম্নতম মজুরির হার স্থিরীকরণের ক্ষেত্রে, একই প্রকৃতির বা একই মান বা মূল্যের কাজের জন্য [নারী, পুরুষ এবং প্রতিবন্ধী] শ্রমিকগণের জন্য সমান মজুরির নীতি অনুসরণ করিতে হইবে; এবং এতদসংক্রান্ত কোন (কোনো) বিষয়ে [নারী-পুরুষ-প্রতিবন্ধী] ভেদের কারণে কোন (কোনো) বৈষম্য করা যাইবে না।" অর্থাৎ কর্মস্থলে নারীদের প্রতি বৈষম্যহীন পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সম কাজের জন্য সম মজুরি প্রদানের আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে। একইভাবে নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে সুবিধা নিশ্চিত করতে মাতৃত্বকালীন সুবিধা (ধারা ৪৬-৫০)-এ বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে উৎসাহিত করা ও কর্মস্থলে বিশেষ উদ্যোগের বিষয়ে বিধান রয়েছে।

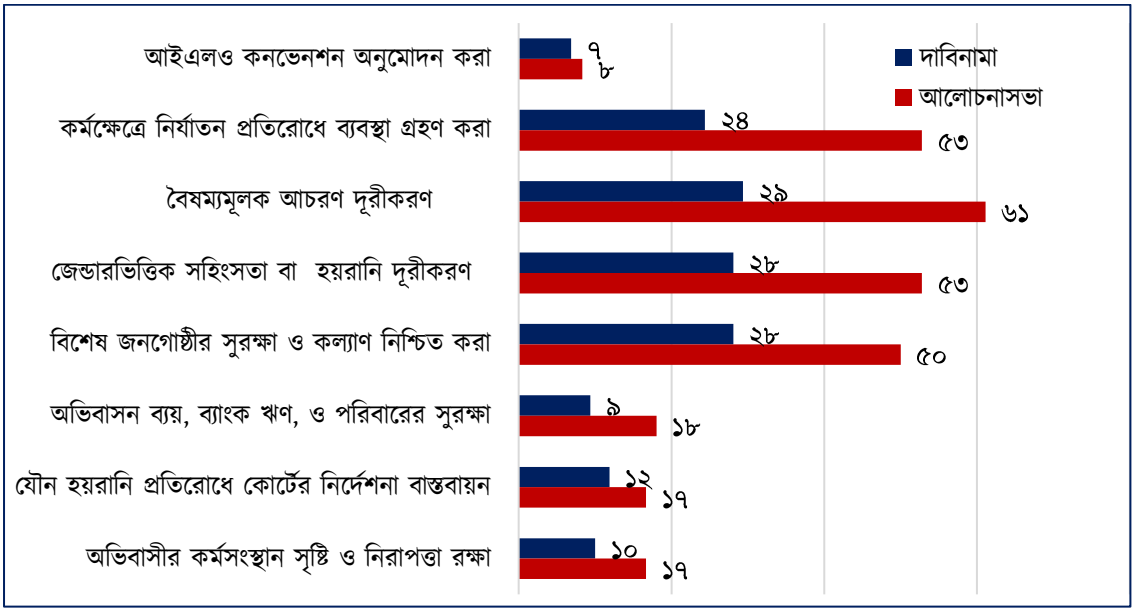
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের নারীদের ক্ষমতায়ন ও সমতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সমতা, অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি, কর্মস্থলে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারকে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণে নির্দেশনা দেয়। এছাড়াও প্রতিবন্ধীর অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩-তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষায় আইনগত ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া নিশ্চিত করেছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিল ও ঘোষণা কর্মক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে সমতা এবং বৈষম্যহীনতার বিধান প্রদান করেছে। বৈষম্য (কর্মসংস্থান ও পেশা) কনভেনশন ১৯৫৮ (নং ১১১), সমান পারিশ্রমিক কনভেনশন ১৯৫১ (নং ১০০)— একইসাথে সকল কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, সমান সুযোগ, পারিশ্রমিক এবং আচরণের বিষয়ে নির্দেশ করেছে। সর্বজনীন মানবাধিকার (UDHR) ঘোষণায় (১৯৪৮), কোনও বৈষম্য ছাড়াই প্রত্যেকের সমান কাজের জন্য সমান মজুরি পাওয়ার অধিকার রয়েছে। ICESCR ঘোষণায় কোনও ধরনের বৈষম্য ছাড়াই সম-মূল্যের কাজের সকলের সমান পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার, বিশেষ করে নারী-পুরুষদের তুলনায় নিম্ন পরিবেশে কাজ করবে না তা রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে (অনুচ্ছেদ ২৩.২)। CEDAW কেবল পারিশ্রমিকের সমতার পক্ষেই নয়, কর্মক্ষেত্রে কাজের মানের মূল্যায়নে সমান আচরণ, সুবিধা এবং চিকিৎসার বিষয়েও বলেছে (ধারা ১১.১ঘ)। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ৫ এ জেন্ডার সমতা এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং SDG ১০ এ বৈষম্যমূলক আইন, নীতিমালার অবসান ঘটানোসহ সকল ধরনের বৈষম্য হ্রাস করে সকলের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য প্রকট। নারী শ্রমিকরা কম মজুরি পান, কর্মস্থলে মানসিক, শারীরিক ও যৌন হয়রানির শিকার হন। এছাড়া সুবিধাজনক কর্মঘণ্টারও নিশ্চয়তা থাকে না। বিশেষ জনগোষ্ঠীর শ্রমিকদের (প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী) নিয়োগে অনীহা লক্ষ করা যায়। নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা এবং উপযুক্ত কর্মপরিবেশ না থাকায় অনেক নারী ও বিশেষ জনগোষ্ঠীর শ্রমিক কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। বিআইডিএসের এক গবেষণায় দেখা যায়, ৩০ বছর হওয়ার আগেই ৬০ শতাংশের বেশি নারী তাঁর কর্মক্ষেত্র ছাড়তে বাধ্য হন; যারা নির্যাতন এবং মজুরি বৈষম্যের কারণে কর্মক্ষেত্রে টিকতে পারেন না।[86] অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ বা কাজে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ জনগোষ্ঠী যেমন; আদিবাসী, দলিত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সুযোগ নেই বললেই চলে। আদিবাসীরা মূলত দৈনিক ভিত্তিতে কৃষি কাজে নিয়োজিত। তৃতীয় লিঙ্গের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত।[87]

শ্রম খাতে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য অংশীজনের সাথে কমিশনের সভা এবং বিভিন্ন সংগঠন-প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত দাবিনামায় শ্রমিকদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের বিষয়ে মতামত দেয়া হয়েছে। এতে সমতা, বৈষম্যহীনতা, নারী ও বিশেষ জনগোষ্ঠী বিষয়ে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ হচ্ছে: কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী ও বিশেষ জনগোষ্ঠী যেমন প্রতিবন্ধী, আদিবাসীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ, কর্মস্থল ও কর্মস্থলের বাইরে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি দূরীকরণ, নারী ও পেশাভিত্তিক বিশেষ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা, অভিবাসন ব্যয়, ব্যাংক ঋণ ও অভিবাসীদের পরিবারের সুরক্ষা এবং অভিবাসন থেকে ফিরে আসা শ্রমিকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং নারী ও বিশেষ জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন অনুমোদন করাসহ নানা প্রস্তাবনা।

চিত্র: ৩.৭.১ শ্রমিক-মালিক সংগঠন, শ্রম ও মানবাধিকার, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং পেশাজীবী সংগঠনের আলোচনা ও দাবিনামার প্রেক্ষিতে সমতা, বৈষম্যহীনতা, নারী ও বিশেষ জনগোষ্ঠী বিষয়ক শ্রম সংস্কার অধিক্ষেত্র (শতাংশ)



উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, সমতা প্রতিষ্ঠা এবং সকল কাজে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে কমিশন নিম্নলিখিত প্রস্তাব করছে:

[86] সমকাল, নির্মম বাস্তবতা মজুরি বৈষম্য, ২১ ডিসেম্বর ২০২৪https://samakal.com/somota/article/271514/নির্মম-বাস্তবতা-মজুরি-বৈষম্য

[87] CPD, *Ibid.*

৩.৭.১ কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বাংলাদেশে গভীরভাবে প্রোথিত, যেখানে নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান, চাকরি বরাদ্দ, মজুরি, সুযোগ সুবিধা এবং কর্মজীবনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কাঠামোগত বাধার সম্মুখীন হয়। শ্রমশক্তিতে পুরুষের অংশগ্রহণের (৭৮.৫৮%) তুলনায় নারীর অংশগ্রহণ কম (১৯.৭%)[88]। সম্মানজনক চাকরি সম্পর্কে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এবং বাড়ির বাইরে যাবার সুযোগের স্বল্পতার কারণে এই কাজগুলিতে নারীর প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত হয়।[89] গৃহ-ভিত্তিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কৃষি কাজের মতো স্বল্প উপার্জনের, অনিরাপদ কাজগুলিতে নারীদের সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত।[90] আদিবাসী জনগোষ্ঠী, দলিত, পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য এসব বাধা আরো প্রকট। এছাড়া অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের ৯৫.৭% নারী,[91] যারা শ্রম আইনে স্বীকৃতি না পাওয়ায় শ্রম সুরক্ষা থেকে বাদ পড়েছেন। ফলে তারা সাধারণ কর্ম অধিকার, মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষার মতো বিধিবদ্ধ সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। স্বীকৃতির অভাবে যৌন কর্মীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

অভিবাসী গৃহকর্মী, যারা আর্থিক চাপ ছাড়াও তাদের নিজের পরিবার এবং সমাজে ফিরে আসতে বাধার সম্মুখীন হন। কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী, যা কেবল কর্মীদেরই নয়, তাদের পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকেও প্রভাবিত করে। বৈষম্য ন্যায্য কর্মসংস্থান নারীদের জন্য ভদ্রোচিত মজুরি এবং পেশাগত অগ্রগতির সুযোগকে সীমাবদ্ধ করে, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা এবং দুর্বলতাকে স্থায়ী করে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে, কর্মক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্য বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করে। প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান থেকে নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বাদ পড়ে যাওয়ায় মেধার পরিসর সীমাবদ্ধ হয় এবং উদ্ভাবন বাধাগ্রস্ত হয়। দারিদ্র্য ও বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে বৈষম্য, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনে বাধা সৃষ্টি করে।[92]

কর্মক্ষেত্রে সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) আইএলও কনভেনশন নং ১৯০ অনুমোদন এবং বাংলাদেশ শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতার বিষয়ে ফৌজদারি আইন সংস্কার করা। ২০০৯ সালের হাইকোর্টের যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নির্দেশিকার কার্যকরী বাস্তবায়ন জোরদার করা।

খ) প্রতিটি সরকারি বেসরকারি কর্মস্থলে বৈষম্যবিরোধী নীতি বাধ্যতামূলক করা।

গ) শ্রম পরিদর্শকদের নারী-পুরুষ বৈষম্য সুনির্দিষ্ট দক্ষতা নিশ্চিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। সেই সঙ্গে আরও নারী পরিদর্শক নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা যোগ করা।

ঘ) বৈষম্যমূলক আচরণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে, তা পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা প্রচারণার জন্য জরুরি উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। জাতীয় প্রচারণাগুলিতে বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতা, ন্যায্য মজুরি এবং লিঙ্গভিত্তিক কাজের ধরন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলিকে মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

ঙ) যৌনকর্মী বা যৌনজীবীর সংজ্ঞায়ন এবং তাদের আইনি সুবিধা নিশ্চিত করা।

---

[88] বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) , বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ, ৩য় কোয়ার্টার জুলাই – সেপ্টেম্বার, ২০২৪.

[89] Kabeer, Huq & Rahaman (2021); Mahmud, S., Bidisha, S.H. (2018). Female Labor Market Participation in Bangladesh: Structural Changes and Determinants of Labor Supply; Kotikula, A., Hill, R., & Raza, W. A. (2019). What Works for Working Women? Unpacking the Constraints on Female Labour Force Participation in Bangladesh.

[90] বিবিএস, বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৩, ২০২২.

[91] বিবিএস, বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৩

[92] General Economics Division, Bangladesh Planning Commission (2020) Eighth Five Year Plan; ILO (2023) Decent Work Country Programmes for Bangladesh 2022-2026.

৩.৭.২ সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ

মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নারী শ্রমিকের অধিকার। এ সুরক্ষা না থাকলে দক্ষ শ্রমিকের অভাব, কর্মক্ষেত্রে নারীর ঝরে পড়া, মানসিক ও সামাজিক অবমূল্যায়ন, অসম মজুরি এবং কর্মজীবনে অগ্রগতির বাধা সৃষ্টি হয়। সন্তান ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হলেও তা যথাযথ স্বীকৃতি পায় না। ফলে নারীরা পুষ্টিহীনতা ও শারীরিক জটিলতায় ভোগেন, যা অপুষ্ট সন্তান জন্মের ঝুঁকি বাড়ায়। পরবর্তী প্রজন্মের শ্রমশক্তি যদি শারীরিকভাবে অক্ষম বা অপুষ্ট হয়, তবে তারা দক্ষ শ্রমিক এবং নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। তাই মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করা সমাজ, শিল্প ও অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য জরুরি।

বর্তমানে বাংলাদেশের মাতৃত্বকালীন ছুটি সর্বজনীন নয়। বাংলাদেশ চাকরি বিধিমালার ১৯৭ (১)[93] অনুসারে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীগণ ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি ভোগ করলেও শ্রম আইনে এই ছুটি ১১২ দিন রাখা হয়েছে। সঠিক তদারকির অভাবে যা বেশিরভাগ খাতে বাস্তবায়ন হয় না। আবার নারী সরকারি কর্মচারীরা সর্বোচ্চ ছয় মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি পেলেও ঐ খাতে ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগকৃত অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিকসহ সকল ধরনের আউটসোর্সিং শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য নয়। অন্যদিকে অনেক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কোনো মাতৃত্বকালীন সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। বরং বিভিন্ন অযুহাতে গর্ভবতী নারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়। যদিও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের গর্ভবতী নারী শ্রমিকদেরকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল থেকে সর্বোচ্চ পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত মাতৃত্ব কল্যাণ সুবিধা প্রদান করার বিধান রয়েছে।[94] প্রচারণার অভাবে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকেরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে অনেক নিঃসন্তান নারী শ্রমিক/কর্মী সদ্যজাত শিশু দত্তক নেন। কিন্তু তাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি পাবার অধিকার নেই। অথচ দত্তক/অভিভাবকত্ব নেয়া শিশুর সঙ্গে অভিভাবকদের সুসম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ তৈরির জন্য তাদের এই ছুটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) বর্তমানে মাতৃত্বকালীন ছুটির আইন সর্বজনীন নয়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নারী শ্রমিকদের জন্য ৬ মাসের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি রয়েছে, তবে শ্রম আইনে এই ছুটি ১৬ সপ্তাহ নির্ধারিত। অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত নারী শ্রমিকরা, যেমন নারী কৃষিশ্রমিক, নারী নির্মাণশ্রমিক ও গৃহশ্রমিক—মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে বঞ্চিত। স্ব নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকারি উদ্যোগে বিশেষ স্কিম বা ইনস্যুরেন্স ব্যবস্থা চালুর নীতিগত পরিকল্পনা করা যেতে পারে। সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত সকল নারী শ্রমিকের জন্য ছুটির ব্যবধান দূর করে ন্যূনতম ৬ মাসের মজুরিসহ সার্বজনীন মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত করা। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর সক্ষমতা বিবেচনায় শ্রম আইনের বিদ্যমান বিধান অনুযায়ী ৪ মাসের সবেতন ছুটির সাথে প্রয়োজনে বাকি দুইমাসের আর্থিক নিরাপত্তা প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় তহবিল অথবা সরকারের অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার অধীনে সুরক্ষা নিশ্চিত করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত এবং স্ব নিয়োজিত সকল শ্রমজীবী নারীর মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের কার্যকর ভূমিকা গ্রহণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট নীতি, আইন ও কল্যাণমূলক সহায়তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, যাতে এসব সুবিধা নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের ওপর নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে।

খ) গর্ভকালীন সময়ে নারী শ্রমিকদের চাকরিচ্যুতি প্রতিরোধে স্পষ্ট আইনি বিধান সংযোজন করা প্রয়োজন, যা মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও শ্রম অধিকার নিশ্চিত করবে। এ বিষয়ে আইএলওর কনভেনশন নং ১১১ (C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958) এবং কনভেনশন নং ১৮৩ (C183 - Maternity Protection Convention, 2000) বিবেচনায় নেয়া।

---

[93] বাংলাদেশ গেজেট, ১১ এপ্রিল ২০২১, এস আর ও নং ৯৩-আইন ২০২১

[94] বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬, এস আর ও নং ৩৪৭-আইন ২০১০, ১৪ অক্টোবর ২০১০, ৪ (৬)

৩.৭.৩ বেতন-ভাতার বৈষম্যের অবসান

সমান মজুরির সাংবিধানিক নিশ্চয়তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মজুরির বৈষম্য বিরাজমান। নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি পান, জাতীয় জরিপ অনুযায়ী নারীরা পুরুষদের তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ কম আয় করছেন। গড় মাসিক আয় পুরুষদের ক্ষেত্রে ছিল ১৪,৪৮৯ টাকা। অন্যদিকে নারীদের ক্ষেত্রে এটি ছিল ১০,৮৩১ টাকা, যা সকল সেক্টরে (কৃষি, শিল্প এবং সেবা) লিঙ্গভিত্তিক আয় বৈষম্যকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।[95]

কৃষির মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এই বৈষম্য আরও প্রকট, যেখানে জাতীয় পর্যায়ে নারী ও পুরুষের মজুরির ব্যবধান প্রায় ৫০ শতাংশ। সব বয়সের মানুষের মধ্যে বয়স্ক নারীরা সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের সম্মুখীন হন। মজুরির ব্যবধান নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে সংখ্যালঘু নারীদের জন্যও উল্লেখযোগ্য, যারা দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম আয় করেন। অন্যদিকে পিস-রেট ও ওজন বহনের কাজে নিয়োজিত স্তন্যদানকারী নারী শ্রমিকদের স্তন্যপান করার জন্য যে উৎপাদনশীলতা এবং আর্থিক ক্ষতি হয়, তা পূরণ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই।

বাংলাদেশে বেতন বৈষম্যের একটি অন্যতম বিষয় হলো সরকারি বেতন কাঠামোর বৈষম্য অর্থাৎ ১ম গ্রেড থেকে ২০তম গ্রেডের বেতনের পরিমাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য। সরকারের সর্বশেষ ঘোষিত বেতন কাঠামোয় সর্বোচ্চ বেতন ছিল ৭৮ হাজার টাকা আর সর্বনিম্ন ছিল ৮ হাজার ২৫০ টাকা। এছাড়া একটি বেতন গ্রেড থেকে পরবর্তী গ্রেডের যে ব্যবধান তার আনুপাতিক হারও সমান নয়। অন্যদিকে একই কাজ করা সত্ত্বেও একজন অস্থায়ী বা আউটসোর্সিং কর্মচারী বা শ্রমিক একজন স্থায়ী কর্মচারী বা শ্রমিকের সমপরিমাণ বেতন-ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। এছাড়া দেখা যায়, একজন কর্মচারী বছরের পর বছর অস্থায়ী পদে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কর্মক্ষেত্রে এ ধরনের বৈষম্য নিরসনে শ্রম আইনে কোনো বিধান নেই।

সকল কর্মক্ষেত্রে বেতন-ভাতার বৈষম্য অবসানে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য সমমানের কাজে সমমজুরি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নীতিমালা পর্যালোচনা ও সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। পিসরেট ও ঠিকা কাজের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের শারীরিক সক্ষমতার স্বাভাবিক পার্থক্যকে ও নারীর আইনানুগ সুবিধা যেমন ওজন বহনের ক্ষেত্রে ছাড়, পিস রেটের টার্গেট, গর্ভকালীন সময়ে হাল্কা কাজের অধিকারকে বিবেচনায় রেখে সমমজুরি নির্ধারণ করা।

খ) মজুরি বৈষম্য রোধে বিদ্যমান শ্রম আইন পর্যালোচনা করে কার্যকর প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

গ) মজুরি বৈষম্য দূর করতে প্রস্তাবিত জাতীয় ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বোর্ডে নারী সদস্য নিয়োগ এবং বোর্ডের ক্ষমতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৩.৭.৪ নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ

বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে সকল নাগরিকের প্রতি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে। তবুও কর্মক্ষেত্রে নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কর্মসংস্থান, মজুরি, সুযোগ সুবিধা এবং কর্মজীবনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে কাঠামোগত বাধা নারীর অর্থনৈতিক সুযোগ এবং অংশগ্রহণকে সীমিত করে। নারীদের জন্য সম্মানজনক এবং উপযুক্ত কাজের বিষয়ে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যাপক হয়রানি ও সহিংসতার কারণে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সুযোগের স্বল্পতার কারণে নারীদের কর্মসংস্থানে প্রবেশাধিকার বাধাগ্রস্ত করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে মজুরি প্রাপ্ত কাজকে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যেখানে নারীদের বেতনহীন ও 'অদৃশ্য' কাজ—যেমন রান্নাবান্না, পরিবার ও শিশুর সেবা—যা নারীরা প্রধানত সম্পাদন করে[96] এবং যা পরিবার, সামাজিক পুনরুৎপাদন ও অর্থনৈতিক কল্যাণে অপরিহার্য, তা 'কাজ' হিসেবে স্বীকৃতি পায় না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই অবমূল্যায়িত হয়।[97]

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা যাদের মধ্যে ৯৫.৭% নারী[98] শ্রম আইনে স্বীকৃতি এবং সুরক্ষা না পাওয়ায় তারা সাধারণ কর্ম অধিকার, কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা, মাতৃত্বকালীন ছুটি, সংগঠন করার অধিকার মতো বিধিবদ্ধ সুবিধাগুলি থেকে

---

[95] বিবিএস, বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৩

[96] BBS, UN Women (2023) Report on Time Use Survey 2021.

[97] বায়েস, আব্দুল (২০২৪) অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে অনুপস্থিত নারীর অবদান, বনিক বার্তা; আনাম, শাহীন (২০১৯) নারীদের বেতনহীন কাজের স্বীকৃতি চাই, প্রথম আলো।

[98] বিবিএস, বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপ, ২০২৩

বঞ্চিত হচ্ছে। এর মধ্যে গৃহকর্মীরাও অন্তর্ভুক্ত, যারা তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং কর্মের অবমূল্যায়নের কারণে অসম্মানজনক আচরণের শিকার হয়।

নারীদের অর্থনৈতিক কাজে এই ব্যাপক বৈষম্যের কারণে বাংলাদেশ লিঙ্গ সমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক - "*অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুযোগ*"-এর দিক থেকে বিশ্বে ১৪৬তম অবস্থানে রয়েছে, যা নেপাল (১৩৬তম) ও শ্রীলঙ্কার (১২৪তম)[99] মতো আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে পেছনে। একই সাথে নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (CEDAW) এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) ১, ৫ এবং ৮-এর অগ্রগতিকেও ক্ষুণ্ন করে, যার লক্ষ্য নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন, দারিদ্র বিমোচন, লিঙ্গ সমতা এবং শোভন কাজের অর্জন। এতে এসডিজি লক্ষ্য ৫.৪-ও অন্তর্ভুক্ত, যা বেতনহীন যত্ন ও গার্হস্থ্য কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়। এই উদ্দেশে যদিও সংসদে প্রস্তাবিত "বৈষম্য বিরোধী বিল ২০২২" উত্থাপিত হয়েছিল, এর প্রয়োগের নিশ্চয়তা প্রদান, প্রতিকারের দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস এবং সামগ্রিকভাবে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।[100]

কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী, যা কেবল স্বতন্ত্র কর্মীদেরই নয়, তাদের পরিবার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকেও প্রভাবিত করে। কর্মে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে এইসব বৈষম্য নারীদের জন্য ন্যায্য কর্মসংস্থান ও মজুরি এবং পেশাগত অগ্রগতির সুযোগকে সীমাবদ্ধ করে, অর্থনৈতিক পরনির্ভরশীলতা এবং দুর্বলতাকে স্থায়ী করে। স্বল্প বেতনের, অনিরাপদ কর্মপরিবেশে নিযুক্ত নারীরা বিশেষত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের আর্থিক স্বাধীনতা কম এবং অর্থনৈতিক সংকটের সময় তারা বেশি ঝুঁকির মুখে পড়ে। কর্মক্ষেত্রে বিরাজমান এই সকল বৈষম্য ও প্রতিবন্ধকতা সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর শ্রমিকদের অসমভাবে প্রভাবিত করে যা নারীর বিকাশ, মেধার পরিসর এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।[101] ফলে বৈষম্য আরও বেড়ে যায়, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করে এবং বাংলাদেশের কর্মশক্তির অধিকাংশকে উন্নয়নের মূলধারার বাইরে রেখে দেয়। বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায়ও নিজের সক্ষমতা বাড়াতে এবং এসডিজির প্রতিশ্রুতি পূরণে বাংলাদেশের জন্য এসব বিষয় বিবেচনা করা অপরিহার্য।

নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি কর্মস্থলে জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা।

খ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডিআইএফই) পরিদর্শকদের জন্য জেন্ডার-সংবেদনশীলতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং পরিদর্শন ব্যবস্থায় নারী কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও অগ্রাধিকার প্রদানের জন্য যথাযথ নীতি গ্রহণ করা।

গ) নারীদের বেতনহীন সেবা কাজকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে 'কাজ' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এই কাজের জেন্ডারভিত্তিক বিভাজন দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিমাপে বেতনহীন সেবা কাজের সূচক সংযোজনের বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে। সেবামূলক খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে নারীদের ওপর এই কাজের বোঝা হ্রাস ও পুনর্বণ্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উন্নত অবকাঠামো, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পুরুষদের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন কমানো সম্ভব হতে পারে। পাশাপাশি যত্নকারীদের জন্য স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামাজিক সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা।

ঘ) নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে এমন বৈষম্যমূলক আচরণ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিশেষ করে, এই প্রচারণাগুলির মাধ্যমে নারীর কর্মক্ষমতা, ন্যায্য মজুরি এবং প্রচলিত জেন্ডার স্টেরিওটাইপ সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারণা মোকাবেলা করা।

ঙ) কর্মস্থলে শ্রমিকদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিত করতে 'তুই' বা 'তুমি' সম্বোধন পরিহার করা, অশালীন ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং পেশাদার আচরণ নিশ্চিত করতে 'আপনি' সম্বোধন বাধ্যতামূলক করার নীতি গ্রহণ করা।

---

[99] World Economic Forum (2023) Global Gender Gap Report.

[100] এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্লাটফর্ম বাংলাদেশ (২০২২) ব্রিফিং নোট ২৬: প্রস্তাবিত বৈষম্য বিরোধী আইন- নাগরিক প্লাটফর্মের প্রতিক্রিয়া

[101] Kabeer, Huq & Rahaman (2021); Mahmud, S., Bidisha, S.H. (2018).

পাশাপাশি শ্রেণি, লিঙ্গ বা অন্যান্য বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উদ্ভূত সম্বোধন, হয়রানিমূলক মন্তব্য বা অসদাচরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নারীর শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম আইনে 'মহিলা' শব্দের পরিবর্তে 'নারী' শব্দ ব্যবহারের জন্য সংশোধনের সুপারিশ করা।

চ) শ্রমজীবী আন্দোলন ও অর্থনীতিতে নারীর ভূমিকা ইতিহাস, পাঠ্যপুস্তক এবং মিডিয়ায় যথাযথভাবে উপস্থাপনের জন্য নীতি গ্রহণ করা, যাতে নতুন প্রজন্ম শ্রমের মূল্য বুঝতে মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে পারে এবং শ্রমিকদের প্রতি সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে।

ছ) শ্রম আইন ও শ্রম সংক্রান্ত সকল আইন ও বিধিমালা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্যমূলক ধারা চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করা। এই লক্ষ্যে আইএলও কনভেনশন নং ১০০ (C100- Equal Remuneration Convention), নং ১১১ (C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958) এবং নং ১৯০ (C190 - Violence and Harassment Convention, 2019) বিবেচনায় নেয়া। উদাহরণস্বরূপ, শ্রম আইনের ৩৩২ ধারায় নারীদের প্রতি অশালীন আচরণ সম্পর্কিত বিধান থাকলেও কর্মক্ষেত্রে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি প্রতিরোধের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত নেই। এটি সংশোধনের ক্ষেত্রে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের নির্দেশনা বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন। শ্রম আইনের ৩৪৫ ধারায় শুধুমাত্র বেতন বৈষম্যের উল্লেখ থাকলেও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য বিশেষত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩.৭.৫ কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি দূরীকরণ

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি (gender-based violence and harassment/GBVH) নারীর মৌলিক অধিকার, সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক সুযোগকে হ্রাস করে। কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক হয়রানির প্রধান কারণগুলির মধ্যে একটি হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের তত্ত্বাবধায়নে কাজ করে যা শ্রমিক এবং নিয়োগকর্তার মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতাকে গভীর করে এবং হয়রানির ঝুঁকি বাড়ায়। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে যেমন; কারখানা ও নার্সিং পেশায়, সাধারণত পুরুষ তত্ত্বাবধায়কের কাছ থেকে নারী শ্রমিকদের প্রতি হয়রানির ঘটনা ঘটে।[102] একই সাথে অপর্যাপ্ত ও অনিরাপদ গণপরিবহন ব্যবস্থা নারীর চলাচল ও কর্মসংস্থানের সুযোগকে উল্লেখযোগ্যভাবে বাধাগ্রস্ত করে। ব্যাপক হয়রানির ফলে অনেক নারী নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি এড়িয়ে চলতে গণপরিবহন ব্যবহার করেন না, দীর্ঘ পথ হেঁটে যান বা বিকল্প ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এর ফলে তাদের মানসিক ও শারীরিক চাপ বাড়ে।[103]

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর ৩৩২ ধারায় কর্মস্থলে নারীদের প্রতি অশোভন আচরণ নিষিদ্ধ করেছে, ৩০৭ ধারায় সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ড বা ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার সাধারণ শাস্তির বিধান রেখেছে।[104] তবে এই বিধানের কার্যকর প্রয়োগ দুর্বল এবং শ্রম আদালতে খুব কমসংখ্যক মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। ৩৩২ ধারায় "শালীনতা" শব্দটির ব্যবহার পিতৃতান্ত্রিক ধারণাকে উৎসাহিত করে, যা যৌন হয়রানির অভিযোগের ক্ষেত্রে অপরাধের ওপর গুরুত্বের পরিবর্তে নারীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে।[105] ২০২২ সালের শ্রম বিধিমালার সংশোধনী ৩৬১এ বিধান কর্মস্থলে অভিযোগ কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক করেছে তবে ২০০৯ হাইকোর্টের নির্দেশনা পুরপুরি মানা হয়নি। যদিও যৌন হয়রানির সংজ্ঞা প্রদান করেছে, তবে এর বাস্তবায়ন এখনও দুর্বল। শ্রম বিধিমালায় যৌন হয়রানির সংজ্ঞা দেয়া থাকলেও শ্রম আইনে তা সুস্পষ্ট নয়। তদন্ত পদ্ধতি, নিষেধাজ্ঞা এবং কমিটি গঠনের বিষয়টিও পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়নি, যার ফলে কর্মস্থলে এর

[102] ILO (2022); Chowdhury, Saifur R. et al (2022) Workplace violence against Bangladeshi registered nurses: A survey following a year of the COVID-19 pandemic; Sultan, Maheen; Huq, Lopita; Sultana, Asifa & Mamun, Saklain Al (2022) Policy Brief: Voicing and Challenging Workplace Sexual Harassment in Bangladesh.

[103] Mowri, Seama & Bailey, Ajay (2023) Affects and assemblages of (un)safety among female bus commuters in Dhaka; BRAC (2018).

[104] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬; ধারা ---

[105] Yasmin, Taslima (2021) Laws against Sexual Harassment: Analyzing the legal framework of Bangladesh.

কার্যকর বাস্তবায়নে ঘাটতি রয়ে গেছে।[106] যৌন হয়রানি প্রতিরোধে হাইকোর্ট বিভাগের যেসব নির্দেশনা কর্মস্থলে হয়রানি বিরোধী কমিটি ও গাইডলাইন বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, সেগুলির প্রয়োগের অভাব রয়েছে।[107] যদিও বিভিন্ন সংগঠন ও বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন একটি যৌন হয়রানি বিরোধী আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে, বাংলাদেশ এখনও কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর আইন প্রণয়ন করেনি।[108] ন্যায়বিচারের প্রবেশগম্যতার অভাব এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য অপর্যাপ্ত সহায়তা ব্যবস্থা এই চ্যালেঞ্জগুলিকে আরও জটিল করে তুলেছে। নারীরা অনিয়ন্ত্রিত আইনি ফি, দীর্ঘায়িত বিচারিক প্রক্রিয়া, আদালতের ভয় এবং আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের বৈষম্যমূলক আচরণসহ উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হন।[109]

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি কর্মপরিবেশকে অনিরাপদ ও প্রতিকূল করে তোলে, যা নারীদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মানসিক আঘাত, প্রতিশোধের ভয় এবং চাকরির নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা বাড়ে, ফলে নারীরা কর্মস্পৃহা হারায়। এসব প্রতিবন্ধকতা নারী শ্রমশক্তিতে অংশগ্রহণকে সীমিত করে। কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নারী শ্রমিকদের আরও নাজুক অবস্থানে ফেলে, বিশেষত যাদের সংগঠিত হওয়ার সুযোগ কম, যৌথ দরকষাকষির সক্ষমতা নেই এবং যেখানে শোভন কর্মপরিবেশ ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার সুযোগ সীমিত। নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের সুযোগ না পাওয়া নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সংকুচিত করে, যা লিঙ্গ বৈষম্যকে আরও গভীর করে তোলে।

কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বা হয়রানি দূরীকরণে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) শ্রম আইনে ২০০৯ সালের হাইকোর্টের রায়ের নির্দেশনা অনুসারে যৌন হয়রানি ও জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার পৃথক সংজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত করা। ২০২২ সালের সংশোধিত বিধিমালায় উল্লেখকৃত অভিযোগ কমিটি হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠন এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার বিষয়ে ফৌজদারি আইন সংস্কার করা।

খ) নারীর প্রতি আচরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আইনে কমিটিতে সদস্য নির্বাচনের ৩৩২ ধারা পুনর্বিবেচনা করা। কমিটিতে কারখানার শ্রমিক ও ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিদের পাশাপাশি নারী বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আরও দুইজনকে যুক্ত করা যেতে পারে।

গ) কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি নিরসনে আইএলও কনভেনশন নং ১৯০ (C190 - Violence and Harassment Convention, 2019) অনুসমর্থন করা।

ঘ) যেসব সেক্টর বা পেশাসমূহে সহিংসতা ও হয়রানি ঘটার সম্ভাবনা বেশি থাকে সে সকল ক্ষেত্রসমূহে (যেমন রাত্রিকালীন কাজ, নার্সিং এবং কল সেন্টার) যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঙ) কর্মক্ষেত্র, যাতায়াতের পথ এবং জনাকীর্ণ স্থানে যৌন হয়রানির শিকার ব্যক্তিদের জন্য কার্যকর অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারীদের জন্য অভিযোগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করা যেতে পারে। অভিযোগ প্রক্রিয়াটি সম্মানজনক, সহজপ্রাপ্য এবং এর মাধ্যমে ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গণপরিবহণ ও পাবলিক জায়গায় যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কঠোর নীতিমালা ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং এ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে জাতীয় এবং শ্রমিকঘন এলাকা পর্যায়ে প্রচারণা করা।

চ) ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশনগুলির মধ্যে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নারী নেতৃত্বসহ কার্যকর হয়রানি বিরোধী কমিটি গঠন এবং জেন্ডার নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা।

---

[106] Husain, T. (2024), Shattered innocence: uncovering the epidemic of sexual violence against women workers in Dhaka, Bangladesh.

[107] Karmojibi Nari (2021). Gender-based violence and harassment in the world of work: evaluating the laws in Bangladesh in light of the mandates of ILO Convention 190.

[108] Yasmin (2021)

[109] Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh (2024); ইয়াসমীন, তাসলিমা (২০২৪) নারীর জন্য ন্যায়বিচারের পথে এখনো যেসব বাধা, প্রথম আলো; Karmojibi Nari (2021); Begum & Saha (2017) Women's Access to Justice in Bangladesh: Constraints and Way Forward.

ছ) স্থানীয় প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে পাবলিক প্লেস ও শিল্পাঞ্চলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের (যেমন; সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন এবং কমিউনিটির সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলা) প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করে বাস্তবায়ন করা।

জ) নারীবান্ধব বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিচার প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা এবং সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

ঝ) পুরুষ ও ছেলেদের শিক্ষামূলক ও সামাজিক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে ক্ষতিকর জেন্ডারভিত্তিক স্টেরিওটাইপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা কমাতে উদ্যোগ নেয়া।

ঞ) বিদেশে কর্মরত সকল নারী শ্রমিকের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে চুক্তি অনুযায়ী সকল প্রাপ্য পরিশোধে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের উদ্যোগ গ্রহণ, যেমন; যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং গন্তব্য দেশগুলির দূতাবাসে জরুরি হটলাইন, আইনি সহায়তা, কাউন্সেলিং এবং আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে। যে সব দেশ আন্তর্জাতিক শ্রমমান কঠোরভাবে পরিপালন করে, সেই দেশগুলিতে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানকে অগ্রাধিকার দেয়া। অভিবাসী শ্রমিক প্রেরণের নামে নারী পাচার বন্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা।

৩.৭.৬ পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ

পদোন্নতির ক্ষেত্রে বৈষম্যের মধ্য দিয়ে নারীদের কর্মক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখা হয়। একই শিল্পে কর্মরত নারী ও পুরুষদের মধ্যে পেশাগত কাজ ও দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে বৈষম্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, তৈরি পোশাক শিল্পে নারীরা প্রধানত স্বল্প-দক্ষতার পদে (গ্রেড ৪ থেকে ৭) নিয়োজিত হন এবং দক্ষ বা উচ্চ-বেতনের পদগুলিতে নারী শ্রমিকদের দেখাই যায় না। ফলে তাদের দক্ষতা এবং যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন হয় না। কারখানাগুলিতে পদোন্নতি বৈষম্যের প্রধান কারণ হলো শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের মধ্যে নারীদের নেতৃত্বদানের সক্ষমতা সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা। পাশাপাশি প্রশিক্ষণের সুযোগের সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূল কর্মপরিবেশ নারীদের উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন, উচ্চ বেতনের বা ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের পদে উন্নীত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সিইডওর (CEDAW) প্রচারিত প্রকৃত সমতা (Substantive Equality) ধারণা অনুযায়ী, নারী ও পুরুষের সাথে সমান আচরণ করলেই প্রকৃত সমতা অর্জন হয় না, কারণ এটি জৈবিক পার্থক্য এবং কাঠামোগত বৈষম্য–যেমন জেন্ডারভিত্তিক ভূমিকা ও স্টেরিওটাইপ–অগ্রাহ্য করে, যা বিশেষভাবে নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করে।

কাঠামোগত বৈষম্যের মূল কারণসমূহ দূর করতে নারীর ন্যায্য প্রবেশাধিকার ও সুবিধা নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যসহ বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য বিদ্যমান। সুতরাং এমন একটি পদোন্নতির বিধিবিধান থাকা আবশ্যক যা কোনোরকম বৈষম্য ছাড়াই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে সকলের সময় মতো পদোন্নতি নিশ্চিত করবে।

খ) পদোন্নতি, পদ বণ্টন ও দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ব্যবস্থাপনা ও তদারকি পর্যায়ে উপযুক্ত কোটাভিত্তিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এসব পদক্ষেপের কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা যেতে পারে। এ ধরনের উদ্যোগ কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে সহায়ক হতে পারে এবং প্রকৃত সমতা (substantive gender equality) অর্জনের লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে।

গ) কর্মস্থলে নারীদের বিভিন্ন পদে সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণকারী নিয়োগকর্তাদের প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেওয়ার একটি ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এটি সফল কার্যপ্রণালিগুলিকে প্রচার করতে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করতে সহায়ক হবে।

৩.৮ শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম

শিশুশ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম নিরসনের রাষ্ট্রের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি রয়েছে। বাংলদেশ সংবিধান সকল শিশুদের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা নিশ্চিতের মাধ্যমে শিশুদের সুরক্ষা, বিকাশ ও শিক্ষিত মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলার জন্য দায়বদ্ধ। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতের পাশাপাশি শিশু শ্রমের অভিশাপ থেকে রক্ষার জন্য সংবিধানে উল্লেখ আছে "রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন (অনুচ্ছেদ ১৭ (ক) অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা)।" অনুরূপভাবে অনুচ্ছেদ ২৮ (৪) উল্লেখ আছে "নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন (কোনো) অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন (কোনো) কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না"। জবরদস্তিমূলক বা বলপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধকরণের বিষয়ে সংবধানে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সংবিধান অনুচ্ছেদ ৩৪ (১) ভাষ্যমতে, "সকল প্রকার জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধ; এবং এই বিধান কোনোভাবে লঙ্ঘিত হইলে তাহা আইনতঃ (আইনত) দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে"। শিশুশ্রমের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। কারণ শিশুকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রমে বাধ্য করা হলে এটি বলপূর্বক শ্রমের আওতায় পড়ে।

শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ে জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২-এর ভাষ্য মতে "প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত, শহর ও গ্রামাঞ্চলসহ সকল ক্ষেত্রে শিশুদেরকে যে কোনো ধরনের শ্রমে নিয়োগের বিষয়কে সরকার নিরুৎসাহিত করবে। বিশেষ করে ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে শিশুদের অংশগ্রহণকে নিষিদ্ধ করতে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে (সংবিধান-অনুঃ ১৭) সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে পারিবারিক ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা সমুন্নত রাখার স্বার্থে বিশেষ বিশেষ পেশার (জামদানি, তাঁত, কাঠ, মৃৎ ও স্বর্ণ শিল্প ইত্যাদি) ক্ষেত্রে শিশুদের অংশগ্রহণ প্রশিক্ষণ বলে গণ্য করবে। শ্রমবাজার সংক্রান্ত তথ্যভাণ্ডারে সরকার শিশু শ্রম সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করবে"।

জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এর মূলনীতি হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধান ও আন্তর্জাতিক সনদসমূহের আলোকে শিশু অধিকার নিশ্চিতকরণ, শিশু দারিদ্র্য বিমোচন, শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ, কন্যা শিশুর প্রতি সকল প্রকার নির্যাতন ও বৈষম্য দূরীকরণ, শিশুর সার্বিক সুরক্ষা ও সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের বিষয়ে শিশুদের অংশগ্রহণ ও মতামত গ্রহণ।

জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০-এর লক্ষ্য শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ ও সবচেয়ে ক্ষতিকর শ্রম থেকে মুক্ত করা এবং তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন করা। এই নীতির মূল লক্ষ্যসমূহ হলো; নির্দিষ্ট কিছু কাজ থেকে শিশুদের প্রত্যাহার করে নেওয়া, শ্রমজীবী শিশুদের অভিভাবকদের আয়বর্ধক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা, শিশুদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনার জন্য উপবৃত্তি ও অনুদান প্রদান, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান, আদিবাসী ও শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করা, শিশু শ্রম নিরসনে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন, বাস্তবসম্মত আইন প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, শিশু শ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অভিভাবক, জনগণ ও নাগরিক সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

বাংলাদেশ শ্রম আইনে শিশু শ্রম সম্পর্কিত একটি পৃথক অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং এই আইন অনুসারে, ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কোনো প্রকার শ্রমে নিয়োগ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং ১৮ বছরের কম বয়সীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ধারা ৩৪)। এই আইন শ্রমজীবী শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বিধান প্রদান করে, যা তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। এছাড়া এই আইনের আওতায় কিশোর শ্রমিকের কাজের ধরন, কর্মঘণ্টা এবং কিশোর শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণে বিভিন্ন নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছারাও বাংলাদেশে শিশু সুরক্ষা ও শিশু শ্রম প্রতিরোধ নিয়ে কয়েকটি আইন রয়েছে। শিশু আইন ২০১৩ বিশেষ করে, শিশুর সংজ্ঞায়ন, শিশু অধিকার, সুরক্ষা, শিশু শ্রম, পাচার ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে। আইনে ১৮ বছরের কম বয়সী সকল ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। শিশুশ্রম, নির্যাতন, পাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে। পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০ শিশুদের পারিবারিক

নির্যাতন থেকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য করা হয়েছে যেখানে শারীরিক, মানসিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার শিশুদের আইনি সহায়তা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

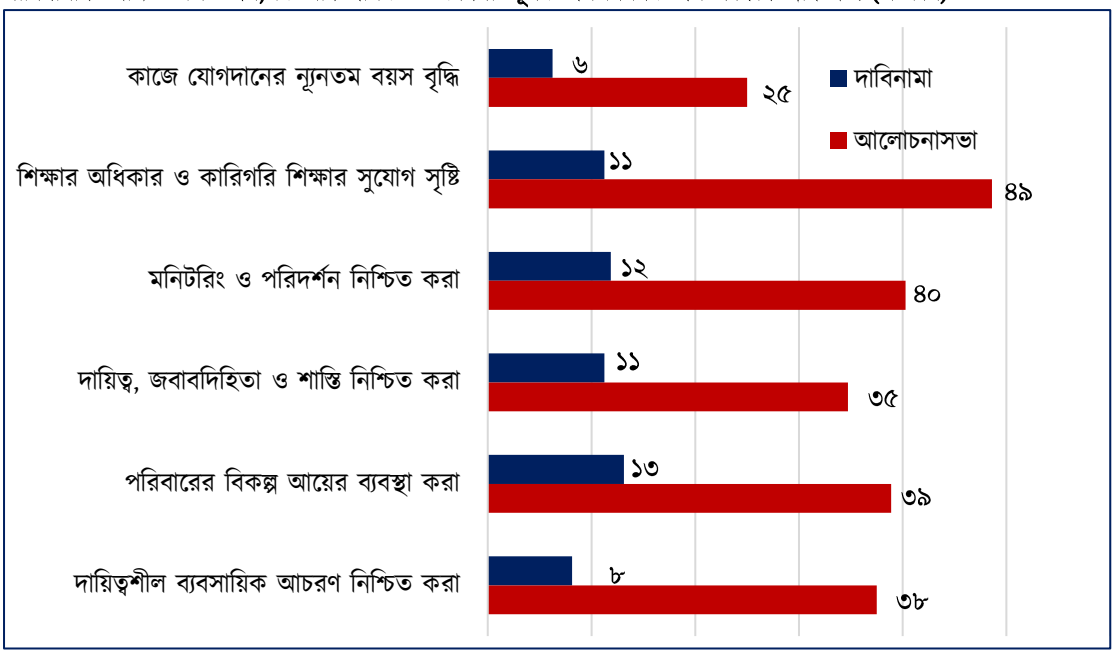
সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮ অনুসারে, শিশুদের জন্য বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা উচিত, যা শিশুদের শ্রমে নিযুক্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে (অনুচ্ছেদ ২৬)। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি ১৯৬৬-তে শিশুদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক শোষণ থেকে রক্ষার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে (অনুচ্ছেদ ১০ (৩))। এছাড়া জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন ২০০৬ শিশুদের বৈষম্য থেকে রক্ষা করতে নির্দেশনা দিয়েছে (অনুচ্ছেদ ২৭(১))। বিশেষ করে শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯-এ শিশুদের জন্য শোষণমূলক কাজ, বিশেষত শিশু শ্রম, নিষিদ্ধ করা হয়েছে (অনুচ্ছেদ ৩২)। এই আন্তর্জাতিক সনদ ও এর আলোকে জাতীয় আইনের মাধ্যমে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য কাজ করা হচ্ছে এবং শিশুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্রের দায়িত্ব বাড়ানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা শিশুশ্রম রোধে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন গ্রহণ করেছে, যা শিশুদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সাহায্য করে। আইএল কনভেনশন ১৩৮ - ন্যূনতম বয়স সনদ ১৯৭৩ অনুসারে, শিশুশ্রমের জন্য একটি সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে কোনো শিশুকে নির্দিষ্ট বয়সের আগে শ্রমে নিয়োগ না করা যায়। এই কনভেনশনটি শিশুদের শিক্ষার অধিকার রক্ষা করতে এবং শ্রমের শোষণ থেকে তাদের সুরক্ষা দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আইএল কনভেনশন ১৮২ - শিশুশ্রমের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ রূপ সম্পর্কিত সনদ ১৯৯৯ শিশুদের জন্য ক্ষতিকর এবং বিপজ্জনক ধরনের কাজ নিষিদ্ধ করে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হতে পারে (অনুচ্ছেদ ৩)। আইএল কনভেনশন ০০৬ - শিল্প ক্ষেত্রে কিশোরদের রাত্রিকালীন কাজ সম্পর্কিত সনদ ১৯১৯ অনুযায়ী, ১৮ বছরের নিচে কোনো কিশোরকে রাতের কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে (অনুচ্ছেদ ১)। আইএল কনভেনশন ০০১ - শিল্প ক্ষেত্রে কাজের সময় সম্পর্কিত সনদ ১৯১৯ শিশুশ্রমের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নির্ধারণ করেছে, যাতে শিশুদের কাজের পরিমাণ সীমিত থাকে এবং তারা স্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে পারে (অনুচ্ছেদ ২)।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-এর অভীষ্ট ৮-এর লক্ষ্য ৮.৭ অনুযায়ী, ২০৩০ সালের মধ্যে শিশুশ্রম, আধুনিক দাসত্ব এবং মানব পাচারের সকল রূপ নির্মূল করার জন্য বিশ্বব্যাপী একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশেষত শিশুদের পাচার এবং শোষণের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শোভন কাজ কর্মসূচি (Decent Work Country Program for Bangladesh, ২০২২-২০২৬) শিশু শ্রম মুক্ত কর্মক্ষেত্র তৈরি, শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং তাদের পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (National Plan of Action to Eliminate Child Labour, ২০২০-২৫) অনুযায়ী, সরকার ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশু শ্রম নির্মূল করার অঙ্গীকার করেছে। ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশ সরকার এই প্রতিশ্রুতি দেয় এবং শিশু শ্রমের বিরুদ্ধে তাদের পদক্ষেপকে আরো শক্তিশালী করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।

মানবাধিকার ও শ্রমিক সংগঠনসমূহ শিশুশ্রম নিরসনে সরকারিভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মনিটরিং জোরদার করা, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশু নিয়োগে শাস্তি স্বরূপ জরিমানা করা, শ্রমঘন অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প এলাকায় সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা, স্কুলে যেতে আগ্রহী নয় এমন শিশু-কিশোরদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শিশুশ্রমিকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা বিষয়ক সুপারিশ করেন। আবার পেশাজীবী সংগঠনসমূহ শিশুশ্রম বন্ধে যে সমস্ত পরিবার শিশুশ্রমের/শিশুর আয়ের উপর নির্ভরশীল সে সমস্ত পরিবারের জন্য বিকল্প আয় বা শিশুর জন্য শিক্ষা ভাতা চালু করার প্রস্তাব করেন। পেশাজীবী সংগঠনসমূহ জবরদস্তিমূলক শ্রম নিরোসনের সুপারিশ করেন। কর্ম পরিবেশ, কাজের শর্ত, অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ পরিস্থিতির বিদ্যমান বাস্তবতায় এই কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

চিত্র:৩.৮.১ শ্রমিক ও মালিক সংগঠন, শ্রম ও মানবাধিকার, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং পেশাজীবী সংগঠনের আলোচনা এবং দাবিনামার প্রেক্ষিতে শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বিষয়ক শ্রম সংস্কার অধিক্ষেত্র (শতাংশ)



৩.৮.১ কাজে যোগদানের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ

বাংলাদেশের বিদ্যমান শিশুশ্রম নিরসনে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, এলডিসি গ্রেজুয়েশন শর্ত পরিপালন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিবেচনায় এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য মর্যাদাবান নাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার বয়স সর্বনিম্ন ১৬ বছরে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক শিশু সনদ ১৯৮৯ অনুযায়ী সকল ক্ষেত্রে শিশুর সংজ্ঞায়নে সর্বনিম্ন বয়স ১৮ মানদণ্ড হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশে শিশু আইন ২০১৩, ধারা ৪ অনুযায়ী বিদ্যমান অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠার) বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল ব্যক্তি শিশু হিসাবে গণ্য হবে। অন্যদিকে শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ২(৬৩) অনুযায়ী "শিশু" অর্থ ১৪ (চৌদ্দ) বছর পূর্ণ করেন নাই এমন কোনো ব্যক্তি যা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের মানদণ্ড অনূর্ধ্ব ১৮ (আঠারো) বছর বয়সের সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, বাংলাদেশ অনুসমর্থনকৃত আইএলও কনভেনশন ১৩৮ অনুযায়ী শর্ত সাপেক্ষে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার অনুমোদিত শিশুর সর্বনিম্ন বয়স হবে ১৫ বছর। বাংলাদেশে শ্রম আইনে অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বছরের কোনো ব্যক্তিকে শিশু হিসেবে সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে আইএলও কনভেনশন ১৩৮ (কাজে যোগদানের নূন্যতম বয়স সংক্রান্ত) এর ব্যতিক্রম অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিস্থিতি বিবেচনার বিধান অনুসরণ করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) বাংলাদেশের বিদ্যমান শিশুশ্রম নিরসনে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, এলডিসি গ্রাজুয়েশন শর্ত পরিপালন, এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বিবেচনায় এবং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য মর্যাদাবান নাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে ২০৩০ সালের মধ্যে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার বয়স সর্বনিম্ন ১৬ বছরে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।

খ) ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সের কিশোরদের এমন ধরনের কাজে নিয়োগ করা যেখানে তাদের দক্ষতা উন্নয়ন ও সৃজনশীলতা বিকাশের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দক্ষতা উন্নয়ন ও সৃজনশীলতা বিকাশের মানদণ্ড বিধি দ্বারা নির্ধারিত করা এবং এ বিষয়ে শ্রম মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে কাজ করা।

৩.৮.২ মানসম্মত শিক্ষার অধিকার ও কারিগরি দক্ষতার সুযোগ

ভবিষ্যতের সুনাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন, সহজলভ্য ও মানসম্পন্ন শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির বিকল্প নেই। একটি দেশের মানব উন্নয়ন সূচকে উন্নতির জন্য সর্বজনীন ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক। মানসম্মত শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে ও কারিগরি দক্ষতার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুযায়ী বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন ১৯৯০-এর ৩ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ এমন কোনো কাজে শিশুদের নিয়োজিত রাখতে পারবে না, যা তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে বাধা দেয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যমান আইনের সঠিক বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ও শ্রমজীবী পরিবারের শিশুদের জন্য কমপক্ষে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পাঠ্য বই ছাড়াও খাতা, কলম, পেন্সিল সহ শিক্ষার আনুষঙ্গিক সব ধরনের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে বিনা খরচে মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা।

খ) যে সকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় অথবা মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই, সেই সকল এলাকায় শিশুদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করে মানসম্মত শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে অতি দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণকাল শেষ হলে শিশু ও তার পরিবারের আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী অনুমোদিত বৃত্তিমূলক/কারিগরি শিক্ষা অথবা অনুমোদিত শ্রমে নিয়োগের বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

গ) সকল সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়কে শিশুশ্রম নিরসন কর্মসূচিতে যুক্ত করতে হবে এবং 'শ্রম থেকে শিক্ষা জীবনে পুনর্বাসনে'র জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এই পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় সরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিতেও বিনামূল্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশু বা কিশোর শ্রমিককে অধ্যয়নের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

ঘ) কিশোর শ্রমগোষ্ঠীর জন্য সহজলভ্য ও মানসম্পন্ন কর্মমুখী কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার সুযোগ নিশ্চিত করে দক্ষতা ভিত্তিক শ্রম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা প্রয়োজন। দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নির্দিষ্ট কারিকুলাম তৈরি করতে হবে এবং তা শ্রম মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বিএমইটি কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। কারিগরি শিক্ষা কারিকুলাম বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শ্রম বাজারের দক্ষতা ও চাহিদা অনুযায়ী প্রস্তুত ও নিয়মিত আপডেট করতে হবে। এই কারিগরি শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ও সহজলভ্য; স্ব স্ব স্থানীয় এলাকায় ব্যবসায়ী কমিউনিটি তাদের ব্যবসার সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে কমিউনিটি ভিত্তিক কিশোর শ্রমিকদের জন্য কারিগরি শিক্ষা পরিচালনার উদ্যোগ নিতে পারেন।

ঙ) শিশুদের মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, বৈষম্য করা, অবহেলা করা, অনৈতিক পন্থা অবলম্বন করে শিশুদের অধিকার হরণ করা বা শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনে বাধাগ্রস্ত হয় এমন ধরনের কাজ বা শিশুর অধিকার লঙ্ঘনজনিত যে কোনো কারণ প্রতিরোধে সুনির্দিষ্টভাবে শাস্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা আবশ্যক।

৩.৮.৩ শ্রম মানদণ্ড মনিটরিং ও পরিদর্শন

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি এবং বিষাক্ত রাসায়নিকের সংস্পর্শে কাজ করে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। কিশোরদের জন্য আইনতভাবে অনুমোদিত শ্রমের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম মানদণ্ড, শ্রমের মৌলিক নীতি, অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। আইনসম্মতভাবে কিশোর শ্রমিক নিযুক্ত করার বিধান থাকলেও প্রয়োজনীয় শর্ত পালন করা হয়েছে কি না বা উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ, কর্মঘণ্টা, কাজের সময়, বিশ্রাম, ছুটি ও মজুরি ও এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাদি আইনগতভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে আইনগতভাবে কিশোর শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

কিশোরদের জন্য আইনতভাবে অনুমোদিত শ্রমের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম মানদণ্ড, শ্রমের মৌলিক নীতি, অধিকার ও কর্মক্ষেত্রে অধিকতর কল্যাণ নিশ্চিত করা অতীব জরুরি। আইনসম্মতভাবে কিশোর শ্রমিক নিযুক্ত করার

বিধান থাকলেও প্রয়োজনীয় শর্ত পালন করা হয়েছে কি না বা উপযুক্ত কর্ম পরিবেশ, কর্মঘণ্টা, কাজের সময়, বিশ্রাম, ছুটি ও মজুরি ও এবং অন্যান্য প্রাপ্য সুবিধাদি আইনগতভাবে পালন করা হচ্ছে কি না তা তদারকির জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ও দায়িত্বশীলতার সাথে ভূমিকা পালন করতে হবে। শ্রম মানদণ্ড মনিটরিং ও পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পে শিশুশ্রম মনিটরিং ও পরিদর্শনের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম ও কিশোর শ্রমিকদের সুরক্ষায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে বিশেষ শিশুশ্রম পরিদর্শন ইউনিট গঠন করা যেতে পারে। এই বিশেষ ইউনিট যে কোনো সময় বাংলাদেশের যে কোনো শিল্প কারখানায় বা কর্মক্ষেত্রে শিশুশ্রম পরিদর্শনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে হবে।

খ) প্রতিটি স্থানীয় পর্যায়ের সমাজ কল্যাণ অফিসের প্রবেশন কর্মকর্তাদের কার্যপরিধিতে নিয়মিতভাবে শিশুশ্রম মনিটরিং ও পরিদর্শন কার্যক্রম বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

গ) জাতীয় শিশু শ্রম কল্যাণ পরিষদ ও জেলা পর্যায়ে গঠিত শিশু অধিকার মনিটরিং ফোরাম এ বিষয়ে তাদের নিজেদের পরিচালিত কার্যক্রম নিয়মিতভাবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করবে। এ ধরনের সকল ফোরামের কার্যক্রম, অগ্রগতি ও ব্যর্থতা চিহ্নিত করতে হবে। প্রতিটি ফোরামের সুনির্দিষ্টভাবে এক বা একাধিক দায়িত্বশীল ব্যক্তি তাদের কার্যক্রমের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জবাবদিহিতার আওতায় থাকবেন।

ঘ) প্রতিটি পর্যায়ে শিশুশ্রম নিরসনে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম, ফলাফল নিমিতভাবে পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনে সীমাবদ্ধতা ও প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করে ধারাবাহিকভাবে সংশোধন করে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবে। বছরে অন্তত একবার যথাযথ কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদন দাখিলের মাধ্যমে অংশীজনদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও অগ্রগতি পেশ করবে এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা চাইতে পারে।

ঙ) শিশুশ্রম নিরসন ও শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য শ্রম মন্ত্রণালয়, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে একটি যৌথ টাস্ক ফোর্স গঠন করা যেতে পারে।

৩.৮.৪ দায়িত্ব, জবাবদিহিতা ও শাস্তি

ভবিষ্যতের সুনাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে বাংলাদেশের সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন, সহজলভ্য ও মানসম্পন্ন শিক্ষা ও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির বিকল্প নেই। একটি দেশের মানব উন্নয়ন সূচকে উন্নতির জন্য সর্বজনীন ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক। জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০ অনুযায়ী বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার আওতা ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন ১৯৯০-এর ৩ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ এমন কোনো কাজে শিশুদের নিয়োজিত রাখতে পারবে না, যা তাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে বাধা দেয়। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিদ্যমান আইনের সঠিক বাস্তবায়নের প্রায় ৩৫ শতাংশ শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রয়েছে। সরকারি হিসাবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার প্রায় ১০০ শতাংশ দাবি করা হলেও প্রকৃত অর্থে তা অনেক কম। পাশাপাশি প্রায় ২০ শতাংশ শিশু প্রাথমিক পর্যায় থেকেই ঝরে পড়ে। এসব শিশুরাই মূলত শ্রমের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। পাশাপাশি কিশোর শ্রমিক যারা কারিগরি শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে পারে, তাদের জন্য এ ধরনের শিক্ষার তেমন কোনো সুযোগ নাই। কিছু কিছু শহর কেন্দ্রিক এ ধরনের প্রতিষ্ঠান থাকলেও তা একদিকে যেমন ব্যয়বহুল, অন্যদিকে এ সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানসম্মত না হওয়ায় কিশোর-কিশোরী বা তাদের পরিবার এ প্রশিক্ষণে তেমন আগ্রহী নয়। সুতরাং প্রস্তাবনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে আইন ভঙ্গের শাস্তি ও রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি মালিক ও অভিভাবকদের দায়িত্ব এবং করণীয় আরো সুনির্দিষ্টভাবে এবং বিস্তারিতভবে আইনে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) শিশুশ্রম আইন ও মানদণ্ড লঙ্ঘনকারী, শিশুদের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শোষণকারীদের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা নীতি অনুসরণ করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত থেকে চূড়ান্তভাবে নিবন্ধন বাতিলের বিধান রাখা যেতে পারে।

খ) শিশুকে কাজে নিয়োগের প্রক্রিয়া জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত কোনো অভিভাবক বা নিয়োগকারী শিশুদের কর্মে নিযুক্ত করতে পারবেন না।

গ) আইন লঙ্ঘন করে শিশুদের কর্মে নিযুক্তের বিষয়ে অভিভাবকের সম্মতি প্রদান নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। শিশুকে কর্মে নিযুক্তের সম্মতির পূর্বে আইন দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করতে হবে। যদি কর্তৃপক্ষ বিকল্প কোনো পন্থা না পায় তবে বিধি মোতাবেক কাজের অনুমতি/পরামর্শ দিতে পারেন। অভিভাবক ও নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ উভয়েই আইনের শর্ত লঙ্ঘন বা অবহেলা করলে শাস্তির আওতায় আসতে পারেন।

ঘ) শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনের শাস্তি বৃদ্ধি করে কঠোরভাবে প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হতে হবে।

৩.৮.৫ দরিদ্র পরিবারের সুরক্ষা

দরিদ্র পরিবারের সুরক্ষার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) চলমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে শিশুশ্রম প্রতিরোধ করবে এমন শর্ত সাপেক্ষ কর্মসূচি উদ্ভাবন করতে হবে। উপকারভোগী বিবেচনায় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া সুনির্ধারিত করতে হবে।

খ) সামাজিক সুরক্ষার পরিমাণ ও পরিধি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন তা শিশুর উপর আর্থিক নির্ভরতা হ্রাস করতে ভূমিকা রাখে; "ফুড ফর এডুকেশন" কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে অসচ্ছল ও শ্রমজীবী পরিবারের শিশুদের শিক্ষায় অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

গ) শিশুর শিক্ষা অধিকার নিশ্চিতের জন্য সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল গঠন করা যেতে পারে। সমাজের বিত্তবান ও সচ্ছল পরিবারকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে অসচ্ছল পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় অবদান রাখার প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে হবে।

ঘ) শ্রমঘন এলাকাসহ সকল শিল্পাঞ্চলে কমিনিউনিটি ভিত্তিক ডে কেয়ার সেন্টার, কারিগরি বিদ্যালয় ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ সেন্টার ও মেডিকেল সেন্টার করা যেতে পারে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রমের আওতায় ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ঙ) শিল্পাঞ্চলে কমিউনিটি ভিত্তিক কল্যাণমূলক কাজে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে হবে। শ্রম কল্যাণ সংক্রান্ত কাজে কোনো শিল্প কারখানা সংক্রান্ত কাজে সিএসআর কার্যক্রম করলে করলে তা কর রেয়াতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই পরামর্শ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

৩.৮.৬ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতে বিবেচ্য ও পূর্বের কার্যক্রম মূল্যায়ন

কার্যকরভাবে শিশু শ্রম প্রতিরোধ ও নিরসনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক, আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য, ভৌগোলিক বৈচিত্র ও শ্রমের ধরন বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এযাবৎ কালে গৃহীত অধিকাংশ কর্মসূচিই এ বিষয়গুলি বিবেচনায় নেয়নি। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহ শিশু শ্রম মোকাবেলায় তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেনি। সেই সাথে পূর্ববর্তী কর্মসূচিগুলি যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে কার্যকারিতা যাচাই না করার কারণে বছরের পর বছর একই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থের অপচয় করা হয়েছে মাত্র।

কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের অভাবে শিশু শ্রম নিরসনের লক্ষ্য অর্জিত না হওয়ায় এখনো অসংখ্য শিশু কাজে নিয়োজিত রয়েছে। শ্রমজীবী শিশুরা বিভিন্নভাবে সহিংসতা, নির্যাতন এবং অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়, কারণ তারা প্রায়শই তাদের পরিবারের থেকে দূরে অবস্থান করে এবং এমন পরিস্থিতিতে কাজ ও বসবাস করতে হয় যেখানে তারা অত্যন্ত ঝুঁকিতে থাকে। শ্রমজীবী শিশুদের প্রতিকূলতা ও নিম্নমানের জীবন যাপন প্রায়শই তাদেরকে একটি ভালো জীবনের সন্ধানে পাচারের ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয় এবং অনেক সময় অনৈতিক ও অপরাধমূলক কাজে জড়িত করার সুযোগ তৈরি করে। শিশুদের কাজের পরিবেশ তাদের মানসিক ও শারীরিক আঘাতের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে এবং এই আঘাতগুলি অপরাধমূলক মনোভাব ও আচরণে পরিণত হতে পারে। শিশুশ্রমের কারণে শিশুদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে

জড়ানোর প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অপরাধী গোষ্ঠীর সদস্য হতে প্রলুব্ধ হয়।

যেহেতু শিশু শ্রম নিরসনে একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায়নি, সেহেতু এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে মালিক পক্ষ শিশু শ্রমিক নিয়োগ দিচ্ছে। শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিক নিয়োগের ফলে উৎপাদনের গতি ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা যেমন থাকে, তেমনি রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাসেরও ঝুঁকি তৈরি হয়। এর ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি ঝুঁকিতে পড়ার সম্ভাবনা তৈরি করে। রাষ্ট্র হিসাবে প্রদেয় প্রতিশ্রুতি এবং অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থতার কারণে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে নেতিবাচক ইমেজ তৈরি করে, যা নানাভাবে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে। এ লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) জাতীয় পর্যায়ের শিশুশ্রম নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণে মাঠ পর্যায়ে শিশুশ্রমের বিস্তৃতি, ধরন ও প্রকৃতির বাস্তবতার প্রেক্ষিতে (তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে) কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা; শিশুশ্রম নিরসন কর্ম পরিকল্পনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শিশুশ্রম দূরীকরণ ও কিশোর শ্রমিক অধিকার প্রাধান্য দেওয়া।

খ) ইতঃপূর্বে গৃহীত সরকারি সকল উদ্যোগ ও কর্মসূচি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা করে অগ্রগতি, সফলতা ও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার সুনির্দিষ্ট কারণসমূহ চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচি গ্রহণ করা।

গ) জাতীয় পর্যায়ের শিশুশ্রম নিরসনে পরিকল্পনা গ্রহণে ত্রিপাক্ষিক সামাজিক সংলাপ, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সাথে সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করা এবং প্রত্যেক অংশীজনের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩.৮.৭ ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা

ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করার লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক ধরনের কাজ রয়েছে যা ধরন অনুযায়ী আপাতদৃষ্টিতে ঝুঁকিপূর্ণ মনে না হলেও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ, কাজের চুক্তির বাইরে অতিরিক্ত কাজ, শোষণ ও নির্যাতনের সুযোগ ও মৌলিক শ্রম অধিকার লঙ্ঘন সেই কাজগুলিকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। ঝুঁকিপূর্ণ তালিকা হালনাগাদের সময় যে সকল কাজ শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্ত করে সেগুলিকেও ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। এমন কাজগুলি চিহ্নিত করে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা হালনাগাদ করতে হবে এবং মূল্যায়নে নারী কিশোরী শ্রমিকের ঝুঁকি ও সমস্যা বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া।

খ) আইন ভঙ্গ করে কেউ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুদের নিযুক্ত করলে কঠোর শাস্তির বিধান নিশ্চিত করতে হবে।

গ) সরকার অনুমোদিত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা শ্রম আইনের তফসিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩.৮.৮ দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ

বিদ্যমান আন্তর্জাতিক নীতিমালার পাশাপাশি জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত নির্দেশনা এবং আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও দেশভিত্তিক হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স আইন ও নির্দেশনায় শিশুশ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম নিরসন মূখ্য বিষয়। রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা এড়াতে শ্রমঘন এলাকা ও রপ্তানিমুখি শিল্পের সাপ্লাই চেইনে দেশীয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সরবরাহকারীদের কর্মক্ষেত্র শিশুশ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম মুক্ত রাখতে রাষ্ট্রের পাশাপাশি প্রাথমিক রপ্তানিমুখি কারখানা মালিক বা ব্যবসায়ীদের এ বিষয়ে অধিকতর দায়িত্বশীল আচরণ ও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) সকল রপ্তানিমুখি শিল্পের ভাবমূর্তি ও মানবাধিকার বিষয়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিতের জন্য তাদের নিজেদের কারখানার পাশাপাশি তাদের সাপ্লাই চেইনে যুক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পণ্য ও সেবা সরবরাহকারীদের কারখানাও সম্পূর্ণরূপে শিশুশ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম মুক্ত রাখতে হবে।

খ) প্রতিটি কারখানা তাদের নিজেদের এবং তাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্কে যুক্ত সকল কারখানাকে শিশুশ্রম ও জবরদস্তিমূলক শ্রম মুক্ত ঘোষণা করার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন ও প্রতিবেদন পেশ করবে।

গ) সে ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কর্তৃপক্ষকে যে কোনো সময় পরিদর্শনের জন্য সুযোগ ও প্রতিবেদন প্রস্তুতে সহযোগিতা করতে হবে।

৩.৮.৯ জবরদস্তিমূলক শ্রম, বাধ্যতামূলক শ্রম ও আধুনিক দাসত্ব নিরসন

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড, আইন ও নীতিমালা অনুযায়ী সকল ধরনের জোরপূর্বক শ্রম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৪ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সকল প্রকার জোরপূর্বক শ্রম নিষিদ্ধ এবং যদি এই আইন কোনো ক্ষেত্রে অমান্য করা হয় তাহলে তা বেআইনি এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৪ অনুযায়ী, "যে কোনো ব্যক্তি যদি অন্যকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম করতে বাধ্য করে, তবে তাকে এক বছরের জন্য কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয় শাস্তি দেওয়া হবে।" বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯ অনুযায়ী কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোনো কর্মে জোরপূর্বক বা বল প্রয়োগে যে কোনো শ্রমিক নিয়োগ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে (ধারা ৭৬)। বাংলাদেশ শ্রম আইন সুনির্দিষ্টভাবে জোরপূর্বক শ্রম বা দাসত্বকে ব্যাখ্যা না করলেও আধুনিক দাসত্বের অনেক ধরন যা কর্মক্ষেত্রে নিয়মিত পরিলক্ষিত হয় তার জন্য শাস্তিমূলক বিধান রেখেছে।

একইভাবে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ জবরদস্তি বা দাসত্বমূলক শ্রম বা সেবা প্রদানকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত আইনের ধারা ৯ মোতাবেক "কোন (কোনো) ব্যক্তি বেআইনিভাবে অন্য কোন (কোনো) ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করাইলে অথবা শ্রম বা সেবা প্রদান করিতে বাধ্য করিলে বা ঋণ-দাস করিয়া রাখিলে বা বলপ্রয়োগ বা যে কোন (কোনো) প্রকার চাপ প্রয়োগ করিলে অথবা করিবার হুমকি প্রদর্শন করিয়া শ্রম বা সেবা আদায় করিলে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ১২ (বার) বৎসর এবং অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে এবং অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।"

আইএলও-এর জোরপূর্বক শ্রম কনভেনশন (নং ২৯) অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে এমন কাজ বা সেবা, যা শাস্তির ভয় দেখিয়ে আদায় করা হয় এবং যা তারা স্বেচ্ছায় করেনি তা জোরপূর্বক শ্রম হিসেবে গন্য হবে।[110]

বাংলাদেশে সুনির্দিষ্ট আইন থাকা সত্ত্বেও এখনো জোরপূর্বক শ্রম এবং আধুনিক দাসত্বের উদাহরণ রয়েছে। অস্ট্রেলিয়া-ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ওয়াক ফ্রি ফাউন্ডেশন পরিচালিত গ্লোবাল স্লেভারি ইনডেক্স (GSI) ২০২৩ অনুযায়ী, ২০২১ সালে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১২ লাখ মানুষ বাংলাদেশে আধুনিক দাসত্বে (Modern Slavery) বসবাস করেছেন। অর্থাৎ প্রতি ১,০০০ জনে ৭.১ জন আধুনিক দাসত্বের শিকার হয়েছেন। উদ্বেগজনকভাবে এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলের ২৭টি দেশের মধ্যে যেখানে আধুনিক দাসত্বের হার সবচেয়ে বেশি, বাংলাদেশ সেই দশটি দেশের একটি। এছাড়া আধুনিক দাসত্বের বিস্তারের দিক থেকে বিশ্বের ১৬০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৫৮তম স্থানে রয়েছে।[111] গ্লোবাল স্লেভারি ইনডেক্স (GSI) ২০২৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে জবরদস্তিমূলক শ্রমের অস্তিত্ব পাওয়া যায় মৎস্য প্রক্রিয়াজাত, জাহাজ ভাঙা, অ্যালুমিনিয়াম, ইট, চা এবং পোশাক শিল্প খাতে। অনানুষ্ঠানিক খাতের পোশাক শিল্পে ৮৬% শ্রমিকই জবরদস্তিমূলক শ্রমের শিকার। শিশুদের উপর জবরদস্তিমূলক শ্রমের গুরুতর প্রভাব পাওয়া গিয়েছে। মাদক উৎপাদন ও বাধ্যতামূলক ভিক্ষাবৃত্তিতে ব্যবহার এবং ইটভাটা, গৃহস্থালি কাজ ও শুঁটকি শিল্পে শ্রমের নামে শিশুরা শোষণের শিকার হয়।[112] বাংলাদেশে নারী ও কিশোরদের যৌন কর্মী হিসেবে আবাসিক হোটেল, যৌনপল্লিতে অনেক সময় কাজ করানো হয় এবং একইভাবে গৃহ কর্মে নারী ও শিশুদের বিভিন্নভাবে শোষণ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল থেকে অন্যত্র কাজের সন্ধানে যারা অভিবাসী হন বা বিদেশে বিশেষত উপসাগরীয় দেশগুলিতে যান, তারা কোনো না কোনোভাবে জোরপূর্বক শ্রমের শিকার হন।[113] বাংলাদেশের চা শ্রমিক, ইট ভাটায় কর্মরত শ্রমিক, জেলে সম্প্রদায়সহ অনেকের ক্ষেত্রে আধুনিক দাস প্রথার প্রভাব লক্ষ করা যায়।

---

[110] GoodWeave International. (2025). *Modern slavery and child labour in the RMG sector of Bangladesh: Report.* Retrieved from https://goodweave.org/wp-content/uploads/2025/02/Modern-Slavery-and-Child-Labour-in-the-RMG-Sector-of-Bangladesh-Report.pdf

[111] https://www.walkfree.org/global-slavery-index/country-studies/bangladesh/

[112] Global Fund to End Modern Slavery 2022, *Forced Labor Among Informal Apparel Workers in Apparel Hubs of Bangladesh: A Prevalence Estimation Report.* Available from: https://www.gfems.org/wp-content/uploads/2022/12/22.12.14_Informal_Apparel-Prevalence-Brief.pdf. [30 March 2023].

[113] https://www.climatechangenews.com/2025/02/18/bangladeshi-migrants-climate-change-modern-slavery-iied/

বাংলাদেশ সরকার আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার Forced Labour Convention, 1930 (Convention No. 29), Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (Convention No. 105) এবং Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 অনুসমর্থন করায় সরকারের উপর মূলত জোরপূর্বক শ্রম নির্মূল, শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়েছে। এছাড়াও Minimum Age (Convention 138) and Worst Forms of Child Labour (Convention 182) অনুসমর্থন করেছে যা জোরপূর্বক শ্রম এবং আধুনিক দাসত্বের সাথে সম্পর্কিত।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, যেমন; ২০১১ সালের UN Guiding Principles on Business and Human Rights এবং OECD Guidelines for Responsible Business Conduct, EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে যার একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রাধিকার হচ্ছে জোরপূর্বক শ্রম এবং আধুনিক দাসত্বের বিলোপ করা। একইসঙ্গে সরবরাহ শৃঙ্খলের স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে দেশভিত্তিক ডিউ ডিলিজেন্স আইনেও জোরপূর্বক শ্রম এবং আধুনিক দাসত্বের বিলোপ অগ্রাধিকার পেয়েছে। ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্য প্রথম দেশ হিসেবে আধুনিক দাসত্ববিরোধী আইন প্রণয়ন করে, যেখানে জোরপূর্বক শ্রম এবং আধুনিক দাসত্বের বিলোপ করার জন্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য নির্দিষ্ট করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। অন্যান্য দেশভিত্তিক আইন যেমন; German Supply Chain Due Diligence Act (LkSG 2021)[114], French Duty of Vigilance Law (2017) সহ অনেক দেশ, সরবরাহ শৃঙ্খলের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জোরপূর্বক শ্রম এবং আধুনিক দাসত্বের বিলোপ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ উন্নত বিশ্বে যে সকল দেশে সংশ্লিষ্ট আইন রয়েছে রয়েছে সে সকল দেশে পণ্য রপ্তানি করতে হলে বাংলাদেশকে সকল ধরনের জোরপূর্বক শ্রম এবং আধুনিক দাসত্বের বিলোপের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং বাংলদেশের একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা, সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতায় সকল ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও অঙ্গীকার বাস্তবায়নের সকল ধরনের জোরপূর্বক শ্রম ও আধুনিক দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভে নিম্নোক্ত সুপারিশ পেশ করা হলো:

ক। বাংলাদেশ শ্রম আইনে সুনির্দিষ্টভাবে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার সংজ্ঞায়ন করা এবং উপযুক্ত শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা। বাংলাদেশ সংবিধান, দণ্ডবিধি, ইপিজেড আইন, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইনে জবরদস্তিমূলক শ্রম নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ হলেও শ্রম আইনে সুনির্দিষ্টভাবে জবরদস্তিমূলক শ্রম সম্পর্কিত ধারণা ও শাস্তির বিধান শ্রম আইনে উল্লেখ নেই। আন্তর্জাতিক আইন, মানদণ্ড ও নীতিমালা অনুযায়ী বাংলাদেশ শ্রম আইনে জবরদস্তিমূলক শ্রমের বিস্তৃত সংজ্ঞায়নের পাশাপাশি ও আধুনিক দাসপ্রথার সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

খ। প্রাতিষ্ঠানিক খাতের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমখাত যেখানে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার অস্তিত্ব রয়েছে বা সম্ভাবনা রয়েছে সেই সকল খাত জরিপের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা। ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম খাতসমূহকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথা থেকে মুক্ত করতে সুনির্দিষ্ট মেয়াদে কার্যকর জাতীয় কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত সকল কার্যক্রম যাচাইযোগ্য ফলাফল নির্ভর হতে হবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্তদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পদ্ধতি ঠিক করে পরিকল্পনা করা।

গ। রপ্তানিমুখি শিল্পে এবং এর অপ্রাতিষ্ঠানিক সরবরাহকারী বা সাপ্লাই চেইনের পরোক্ষ সরবরাহকারীদের চিহ্নিত করে সকল ধরনের জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার বিলুপ্তি নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিশ্ব রপ্তানি বাজারের যে কোনো পণ্যের সরবরাহকারী দেশ হিসেবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত, নিরবচ্ছিন্ন ও সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে হলে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান যেমন; কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে জবরদস্তিমূলক শ্রম ও আধুনিক দাসপ্রথার বিলোপে অধিকতর সোচ্চার হতে হবে। বিশেষ করে পরিদর্শন চেকলিস্টকে আধুনিক দাসত্ব পরিমাপক মাপকাঠির আলোকে হালনাগাদ করা জরুরি।

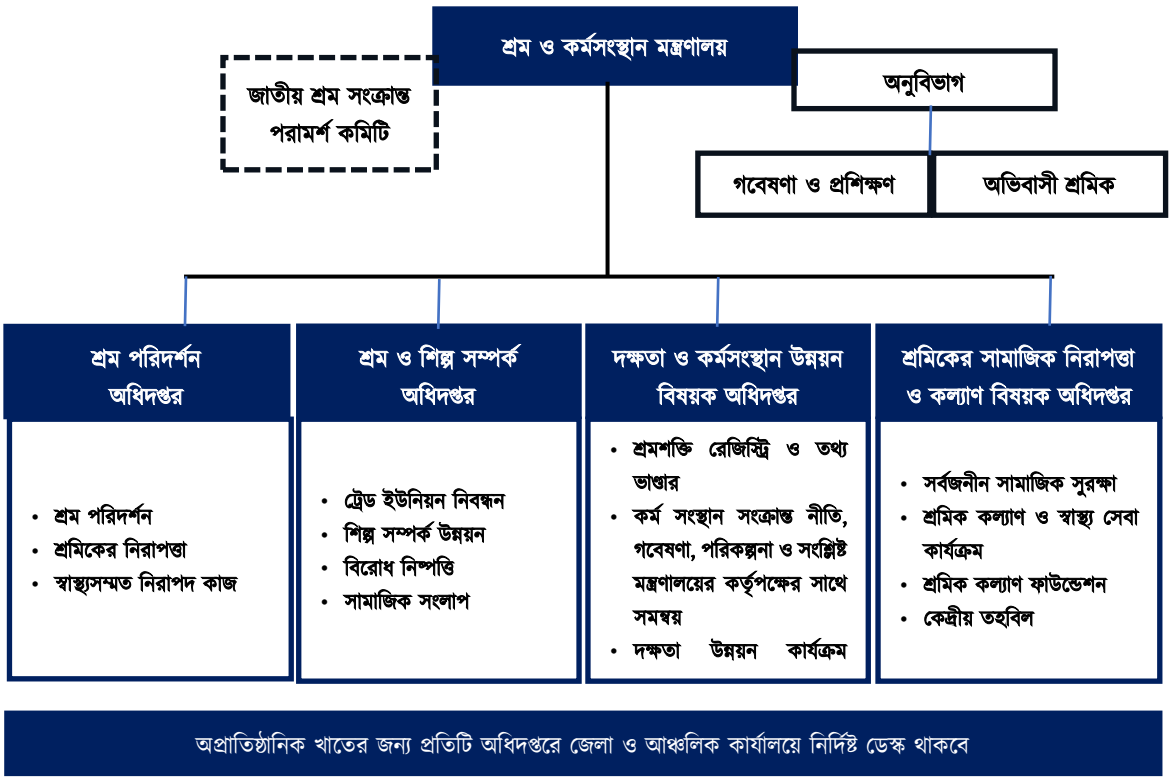
[114] Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) means The Supply Chain Due Diligence Act

ঘ। জবরদস্তিমূলক শ্রমের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খাতসমূহ থেকে শ্রমিকের শোষণ ও বঞ্চনা লাঘবের জন্য সেই সকল শ্রমিকের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ঝুঁকি নির্ণয় করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ঙ। মানব পাচারের প্রতিরোধ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রত্যাশী শ্রমিকদের জবরদস্তিমূলক শ্রম থেকে সুরক্ষার জন্য দেশীয় নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলির (রিক্রুটিং এজেন্সি) জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানকে তাদের মাধ্যমে নিয়োগকৃত প্রত্যেক শ্রমিকের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত সরকারের কাছে প্রতিবেদন আকারে পেশ করার পদ্ধতি গ্রহণ করা।

৪. শ্রমখাত সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রস্তাবনা

সকল কর্মক্ষম নাগরিকের জন্য উৎপাদনমূলক, বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত, শোভন, নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার ও শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে জাতীয় শ্রমনীতির মূল লক্ষ্য যা বাস্তবায়নের মূখ্য ভূমিকা পালন করে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধি (Rules of Business), জাতীয় শ্রমনীতি, ২০১২, জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি ২০২২ সহ অন্যান্য নীতিমালা অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমমানের আলোকে শোভন কর্মক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ও শ্রমিকের অধিকার ও জীবনমান উন্নয়নের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয়ের থাকলেও আইনি ও নীতি কাঠামো প্রণয়ন করা হয়নি। শ্রম খাতের সংস্কারের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে একটি কার্যকর ও গতিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠনের প্রস্তাব এই কমিশনের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে, যা শ্রমজীবী মানুষের প্রত্যাশা, অংশীজনদের মতামত এবং জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। শ্রম বাজারের পরিবর্তন ও বৈচিত্র্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ সংস্কার সর্বজনীন হবে, যাতে ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প সম্পর্ক, শোভন কাজ, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রতিনিধিত্ব, সমতা ইত্যাদি অধিকার নিশ্চিত এবং কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা জোরদার করা যায়। কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ করে সকল ধরনের (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত) শ্রমিকদের জন্য সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে শ্রম মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ অধিদপ্তর ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি পুনর্বিন্যাস, কাঠামোগত সংস্কার সাধন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:



৪.১ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

কাঠামোগত সংস্কার

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের মধ্যে কাজের ভারসাম্য আনয়নে শ্রম সংস্কার কমিশন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে বিদ্যমান ২টি অধিদপ্তরের (কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধদপ্তর) নাম পরিবর্তন এবং নতুন ২টি অধিদপ্তর সৃষ্টি করে মোট ৪টি অধিদপ্তরের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমকে পুণর্বিন্যাস করার সুপারিশ করছে কমিশন।

৪.১.১ শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর

ক) 'কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর'-এর নাম পরিবর্তন করে 'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর' নামকরণ করা এবং বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই অধিদপ্তরের দপ্তর/সাচিবিক ডেস্ক স্থাপন করা। এর মূল দায়িত্ব হবে সকল শ্রমিকের জন্য পরিদর্শন, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ কাজ নিশ্চিত করা।

খ) শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যপরিধিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের শ্রম আইন ও বিধামালার আওতায় রেখে তাদের অধিকার ও পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

গ) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের দপ্তর স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত, অথবা যেখানে অভিযোগ গ্রহণ করার কোনো ব্যবস্থা নেই, সেখানে পেশাগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়ন, শিশু শ্রম, গৃহশ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে এবং কোনো বিশেষ শ্রম পরিস্থিতির মোকাবেলায় জেলা প্রশাসন বা উপজেলা প্রশাসন বা শ্রম অধিদপ্তর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করবে এবং তারা কৃষিসহ বিভিন্ন শ্রমখাতে মৌলিক শ্রম অধিকার (নিয়োগপত্র, স্বাস্থ্যসম্মত কাজ, ক্ষতিপূরণ, সহিংসতা বা হয়রানি সংগঠিত হওয়া) নিশ্চিত করবে।

ঘ) পরিদর্শন এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য কেন্দ্রীয় একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এবং বাস্তব সময়ে তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণের জন্য উন্নত সরঞ্জাম প্রয়োগ করা।

ঙ) চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডাইফের পরিদর্শন ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা এবং শিল্পভেদে স্ট্যান্ডার্ড চেকলিস্ট ও পৃথক নীতিমালা প্রণয়ন করা।

চ) জনবল সংকট, শূন্য পদ পূরণ এবং কর্মরত পরিদর্শকদের পদোন্নতি জটিলতা নিরসন করে দপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনা। একই সাথে শ্রম পরিদর্শকদের আইনানুগ ক্ষমতায়ন এবং নির্মাণখাতসহ অন্যান্য অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদান।

৪.১.২ শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর

- 'শ্রম অধিদপ্তর'-এর নাম পরিবর্তন করে 'শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর' নামকরণ করা, যার মূল কাজ হবে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, বিরোধ নিস্পত্তি এবং সামাজিক সংলাপ আয়োজনের মাধ্যমে অংশীজনের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় বজায় রাখা।
- শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষণ এবং নিশ্চিতকল্পে শ্রম ও শিল্পঘন এলাকা/অঞ্চল বিবেচনায় প্রশাসনিক বিভাগসমূহে বিভাগীয় শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা এবং একই সাথে বিভাগীয় শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক দপ্তরসমূহের অধীনে নতুন আঞ্চলিক দপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আঞ্চলিক শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক দপ্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করা।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন, শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট নিয়োগকারী ও কর্তৃপক্ষ/কমিনিউটি, অভিযোগ নিস্পত্তি ও এ খাতের শ্রমিকের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সংলাপ/আলোচনা/প্রতিনিধিত্ব ও দরকষাকষি নিশ্চিতকরণে ভুমিকা রাখা।
- শ্রম অসন্তোষ প্রতিরোধে নিয়মিত আলোচনার আয়োজন এবং সমাধানের ব্যবস্থা নেওয়ার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি ব্যবস্থা চালু করার নিমিত্ত নীতিমালা প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ করা। আরবিট্রেশন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আরবিট্রেটরের তালিকা প্রতি দুই বছরে মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ করা।
- আইটি-ভিত্তিক শ্রম তথ্য ব্যবস্থাপনা চালু করে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া এবং অভিযোগ নিস্পত্তি আরও সহজ করা।
- শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো যৌক্তিকরণ, পদোন্নতির জটিলতা দূরীকরণ, বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৪.১.৩ দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন অধিদপ্তর

বর্তমানের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সুরক্ষা বিষয়ক কোনো কর্মকাণ্ড লক্ষ করা যায় না। কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন করার যে প্রস্তাব শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উপস্থাপন করেছে তা শ্রম সংস্কার কমিশন

বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী মনে করে। একই সাথে শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান অধিদপ্তরকে দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন অধিদপ্তরে রূপান্তর করা জরুরি। এই অধিদপ্তরের কাজসমূহ হবে:

ক) বাংলাদেশে বর্তমান কর্মসংস্থান পরিস্থিতি, শ্রম বাজার, আর্থ-সামাজিক অবস্থান এবং ভবিষ্যত কর্মজগতের চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে কর্মের জন্য জনশক্তিকে উপযুক্ত ও দক্ষ করে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা।

খ) শ্রমজীবী মানুষদের দক্ষতা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি, কারিগরি জ্ঞান অর্জন এবং প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি।

গ) একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্মশক্তি গড়ে তোলা এবং শিক্ষার সাথে শ্রমবাজারের চাহিদার সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে পেশাগত প্রশিক্ষণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনরায় দক্ষতা অর্জনের কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যা শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠান এবং মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে সমন্বয় করে পরিচালিত হবে।

ঘ) শিক্ষাধীনতা সংক্রান্ত বিধি ও নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং কর্মজীবন পরামর্শ প্রদান (career guidance services) এবং আজীবন শিক্ষার উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কর্মশক্তিকে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নেওয়ার উপযোগী করে তোলা।

ঙ) বিএমইটি'র দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ/কার্যক্রমকে এই অধিদপ্তরের আওতায় নিয়ে আসা, যার ফলে প্রবাস কেন্দ্রিক দক্ষতার পাশাপাশি জাতীয় পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যায়। প্রবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের এই অধিদপ্তরের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন।

চ) প্রস্তাবিত দক্ষতা ও কর্মসংস্থান অধিদপ্তরের আওতায় আরও নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ বিবেচনা করা যেতে পারে:

- দেশে ও বিদেশে কর্মজগতের চাহিদা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের ম্যাপিং করা;
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত লিয়াজো ও যোগাযোগ রাখা এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে কার্যকর সমন্বয় সাধন করা;
- শিল্পভিত্তিক মালিক ও শ্রমিক সংগঠন, সরকারি ও বেসরকারি দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ব্যবসায়ী সমিতি ইত্যাদির সাথে সমন্বয় করা;
- উদ্যোক্তা তৈরির জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা;
- প্রশিক্ষণ/পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান টিকিয়ে রাখা, ভবিষ্যত কাজের উপযোগী আধুনিক কর্মদক্ষতা তৈরি করা, কর্মের মানোন্নয়ন ও সার্টিফিকেশনের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা; এবং
- দেশে বিদেশে চাকরির সুযোগ সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডার তৈরিতে নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা করা।

শ্রম তথ্যভাণ্ডার

এই কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত শ্রম তথ্যভাণ্ডার (সেকশন ৩.১-এ বর্ণিত) শ্রমিকের দক্ষতা ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত হবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক, স্বনিয়োজিত সকলের জন্য তথ্য ও পরিচয়পত্র নিশ্চিতে কাজ করবে। প্রস্তাবিত তথ্যভাণ্ডারে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল শ্রমিকদের ব্যক্তিগত তথ্য ছাড়াও থাকবে শ্রমিকের দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য, শ্রমিকের পূর্ব ও চলমান চাকরি সংক্রান্ত তথ্য, নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য, শিল্প সেক্টর সম্পর্কিত তথ্য, আর্থিক সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য, পেশাগত দুর্ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য, জেলাভিত্তিক চাকরির নিয়োগ সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকবে।

৪.১.৪ শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তর

শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। তবে এসব কার্যক্রমকে এখনো স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা সম্ভব হয়নি। শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে এসব উদ্যোগের স্থায়ী ও সংগঠিত রূপ দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে, শ্রম সংস্কার কমিশন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ' বিষয়ক একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠনের সুপারিশ

করছে অধীনে থাকবে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ও কেন্দ্রীয় তহবিল। পাশাপাশি এই অধিদপ্তরের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হবে:

ক) শ্রমিকের জন্য সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু ও শ্রমিক বিশেষায়িত হাসপাতাল পরিচালনা;

খ) প্রস্তাবিত (সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ অংশে বর্ণিত) সামাজিক ও স্বাস্থ্য বিমা, শ্রমিক প্রভিডেন্ড ফান্ড, সর্বজনীন মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা, সর্বজনীন পেনশন স্কিমে শ্রমিকের অন্তর্ভুক্তি ও সমন্বয় ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা;

গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়সমূহে যে সব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম চলমান আছে, সে সবের মধ্যে শ্রমিক সংশ্লিষ্ট মাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়। এ সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ হতে হবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে।

উল্লেখ্য, দেশের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকের সুরক্ষা ও কল্যাণের জন্য প্রত্যেক জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিষয়ক অধিদপ্তরের আলাদা অফিস বা ডেস্ক থাকবে। তবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই অধিদপ্তরের অফিস/ডেস্ক না থকলে সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কার্যক্রম সরকার চাইলে জেলা প্রশাসন ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট ন্যাস্ত করতে পারবে।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মূল লক্ষ্য শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিত করা, সেই বিবেচনায় শ্রম সংস্কার কমিশন এই কেন্দ্রসমূহকে বর্তমানের শ্রম অধিদপ্তর হতে প্রস্তাবিত 'শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ অধিদপ্তর'-এর অধীনে আনা এবং কেন্দ্রসমূহের দীর্ঘদিনের সমস্যা ও সীমাবদ্ধতাসমূহ দুর করা জন্য নিম্নোক্ত কার্যকর পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

স্বল্পমেয়াদি সুপারিশ

ক) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যান্য হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে অধিকতর চিকিৎসা পেতে শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সুপারিশ/রেফারাল যেন সরকারি নথি হিসেবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়, সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ) প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক ভেদে সকল ধরনের শ্রমিক যেন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র থেকে স্বাস্থ্য সেবা পায় তা নিশ্চিত করা।

গ) বিদ্যমান শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমিকের স্বাস্থ্য সেবা পাওয়া অধিকার মূলে সেবা, চিকিৎসক ও স্টাফদের সংখ্যা বাড়ানো, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সংখ্যা বৃদ্ধি (প্রতিটি জেলায় ১টি ও শিল্পাঞ্চলে একাধিক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডার হতে শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রসমূহে ডাক্তার নিয়োগ দেয়া। বর্তমানে কর্মরত ডাক্তারদের ক্যাডার সার্ভিসের মর্যাদা দেয়া ও ডাক্তারদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান যাতে ক্যারিয়ারের উন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা অপসারণ হয়। বর্তমানে যে সকল ডাক্তার কর্মতর রয়েছে তাদের জন্যেও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন উচ্চতর পর্যায়ের প্রশিক্ষণের সুযোগ করে দেয়া। এ ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাঝে যোগাযোগ ও সমন্বয় স্থাপন করা।

ঙ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে শ্রমিক ও পরিবারবর্গকে প্রাথমিক চিকিৎসার পাশাপাশি জরুরি বিভাগ, পূর্ণাঙ্গ প্যাথলজি বিভাগ, উন্নত ডায়াগনস্টিক টুলসের সংস্থান এবং বিশেষায়িত বহির্বিভাগ (যেমন-চক্ষু, শিশু, গাইনি, মানসিক স্বাস্থ্য ইত্যাদি) স্থাপন করা।

চ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে প্রাপ্য ঔষধের প্রকার এবং পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ছ) সকল শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং শ্রমিকদের জন্য শয্যার ব্যবস্থা করা।

জ) শ্রমিকদের জন্য সান্ধ্যকালীন সেবা গ্রহণের সুবিধা নিশ্চিত করা।

দীর্ঘমেয়াদি সুপারিশ

ক) শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের নাম পরিবির্তন করে 'শ্রমকল্যাণ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র' করা এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের কৌশল নির্ধারণ করা।

খ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে আলাদা করতে হবে এবং স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে শিল্পাঞ্চল/শিল্পঘন এলাকায় শ্রম বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করা।

গ) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের জনবল বৃদ্ধি ও তাদের পদ মর্যাদার (গ্রেড) উন্নতি।

ঘ) দেশের শ্রমঘন অঞ্চলে নতুন নতুন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ) বিনামূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

চ) সিএসআর প্রোগ্রামের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সেবার কাজ উন্নয়নের জন্য সহযোগিতা নেয়ার ব্যবস্থা চালু করা।

ছ) প্রতিটি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র মালিক, শ্রমিক, কমিউনিটি মেম্বার, স্থানীয়ভাবে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন ও কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

ক) কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে, আবেদন গ্রহণ, নিস্পত্তি, বিবরণ সবকিছু ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

খ) সহায়তার যোগ্যতা বিবেচনায় শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের সুপারিশ/রেফারেন্স গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা।

গ) ব্যক্তিপর্যায়ের সুবিধা প্রদান বন্ধ করার লক্ষ্যে ক্রমানুসারে আবেদন নিস্পত্তি করা নিশ্চিত করা।

ঘ) শিক্ষা ও দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মিডিয়া প্রতিবেদনকে প্রমান হিসেবে গ্রহণ করা।

ঙ) ফাউন্ডেশনের তহবিল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আরও বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করতে আইনি বাধ্যবাধকতা শিথিল করা।

চ) শ্রমিকগণ যেন দপ্তরে আসা যাওয়া ব্যতীত অনলাইনে আবেদন করতে পারে এবং অনলাইনে আর্থিক অনুদান পেতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ছ) আবেদন এবং সেবা প্রদানের প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত রাখা, যেন কোনো শ্রমিক সুবিধা হতে বঞ্চিত না হয় বা বৈষম্যের শিকার না হয়।

জ) আবেদন ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে নিস্পত্তি করা।

ঝ) শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অফিস আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্প্রসারণ এবং ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধিকরণ এভং বিভাগীয় ও আঞ্চলিক বাছাই কমিটি গঠনের মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যক্রমকে ত্বরান্বিতকরণ।

কেন্দ্রীয় তহবিল

ক) কেন্দ্রীয় তহবিলে শ্রমিকবান্ধব সেবা প্রদান নিশ্চিত করা। আবেদন প্রক্রিয়া সরলীকরণ করা যেন শ্রমিক তার পরিচয় পত্র দিয়েই আবেদন করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

খ) তহবিলের পুরো কার্যক্রম অনলাইন ভিত্তিক করার মাধ্যমে আবেদন, যাচাই এবং সুবিধা প্রদানের প্রক্রিয়ার দ্রুততা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

গ) প্রতিটি কারখানায় এবং শিল্পাঞ্চলে সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করে শ্রমিকদের আবেদন করতে সহায়তা প্রদান করা।

ঘ) ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে আবেদনের নিস্পত্তি সম্পন্ন করা।

ঙ) তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংস্কার আনা এই তহবিল হতে শ্রমিকের বকেয়া বেতন দেয়ার ব্যবস্থা বাতিল করা।

৪.১.৫ অনুবিভাগ

মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ ২টি অনুবিভাগ থাকবে:

গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ:

এই অনুবিভাগের মূল কাজ হবে শ্রম ইস্যুতে গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা। বর্তমানে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীনে থাকা 'জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট' এবং শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে থাকা 'শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন' প্রতিষ্ঠান দুটি নিয়ে শ্রম সংক্রান্ত ইস্যুতে গবেষণা পরিচালনা এবং যুগোপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে এ অনুবিভাগ গঠিত হবে। এ অনুবিভাগ তার কাজের লক্ষ্যে সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরের সাথে সরাসরি কাজ করবে ও তথ্য আদানপ্রদান করবে।

শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই)

রানা প্লাজা ও তাজরীন হত্যাকাণ্ড পরবর্তী দেশি ও বিদেশি উদ্যোগ ও সহায়তার মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহে কাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের বিপরীতে বৈষম্যের শিকার আরেকটি প্রতিষ্ঠান শ্রম অধিদপ্তরের পরিচালনাধীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস ইনস্টিটিউট বা আইআরআই। যেখানে আইআরআই হতে পারতো শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের সেতুবন্ধন, সেখানে শুধুমাত্র অগ্রাধিকারের অভাবে মাত্র ৪টি আইআরআই অপ্রতুল প্রশিক্ষক, দুর্বল অবকাঠামো, সনাতন প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও অনুন্নত পদ্ধতিতে অনেকটা অদৃশ্যভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহের (আইআরআই) কাঠামোগত, প্রোগ্রামিক এবং অপারেশনাল চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করা জরুরি যাতে করে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের শিল্পে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম আইন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিক তৈরি, মালিক ও শ্রমিকের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, মালিক-শ্রমিকের মধ্যকার শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন, সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ বজায় রাখা এবং বাংলাদেশের শ্রম খাতে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সমর্থ হয়। আইআরআইসমূহের আধুনিকায়ন এবং একই সাথে এই প্রতিষ্ঠানসমূহকে তার লক্ষ্য অর্জনের সামর্থ্য উন্নয়নে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করেছে:

ক. সকল প্রশাসনিক বিভাগে চাহিদার ভিত্তিতে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন স্থাপন করা এবং শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহের বর্তমান সাংগঠনিক কাঠামো সংশোধন করে পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

খ. নারী ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীর জন্য পৃথক হোস্টেল, ডে-কেয়ার সুবিধা এবং প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনসমূহ বিবেচনায় রেখে আইআরআইসমূহের অবকাঠামোর আধুনিকায়ন করা।

গ. প্রশিক্ষণ কারিকুলামসমূহ আধুনিক ও যুগোপযোগী করা। জেন্ডার, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শ্রম, সাপ্লাই চেইন, শোভন কাজ, ৪র্থ শিল্প বিপ্লব, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, জাস্ট ট্রানজিশনের, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ. সরকারি, বেসরকারি ও বিভিন্ন শিল্প খাতের চাহিদার ভিন্নতার বিষয় বিবেচনাপুর্বক নির্দিষ্ট শিল্প, সেক্টরভিত্তিক এবং চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা।

ঙ. শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহে চাহিদাভিত্তিক ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা এবং সান্ধ্যকালীন প্রশিক্ষণ এবং ই-লার্নিং-এর সুযোগ তৈরি।

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI)

ক. শ্রমিকদের জন্য সহজবোধ্য প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করে এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর নিয়মিত কর্মশালা আয়োজন করে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

খ. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকার বা বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে প্রণোদনা (Incentive) দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

গ. দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির জন্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

ঘ. শ্রমিক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে শ্রমঘন এলাকায় (ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম) জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের অফিস

স্থাপনা ও পরিচালনা করা প্রয়োজন। পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতিষ্ঠান এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সহযোগিতাভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ঙ. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NOSHTRI) অধীনে একটি "লিগ্যাল রিসার্চ সেল" স্থাপন করা যেতে পারে এবং নোস্ট্রির প্রধান কার্যালয়ে একটি সমন্বয় অফিস সহ কিছু আঞ্চলিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে যার ফলে শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নের নস্ট্রির অবদান অংশীজনের কাছে দৃশ্যমান বলে প্রতীয়মান হয়।

অভিবাসী শ্রমিক অনুবিভাগ

শ্রমিক হিসেবে অভিবাসী কর্মীদের স্বীকৃতি ও অধিকার নিশ্চিতে কাজ করবে এই অনুবিভাগ। প্রবাসী মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষার করার পাশাপাশি আইএলও সহ বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয় সাধন করবে এই অনুবিভাগ।

৪.১.৬ বিশেষ সুপারিশ

ক) প্রস্তাবিত ৪টি অধিদপ্তরের প্রতিটিতেই অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ বিভাগ রাখা, যার মাধ্যমে সকল ধরনের অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সেবা প্রদান করা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

খ) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জন্য বিসিএস (শ্রম) ক্যাডার তৈরি। প্রস্তাবিত 'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর' ও 'শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর'-এর কর্মকর্তাদের মধ্য হতে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে পদোন্নতির সুযোগ রাখা।

গ) রানা প্লাজা পরবর্তী সময়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের প্রচেষ্টায় যে সকল শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো শ্রমিকের অধিকার ও অবস্থার উন্নয়ন এবং সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে কীভাবে অবদান রেখেছে তার যথাযথ মূল্যায়ন করা।

৪.১.৭ জবাবদিহিতা, অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা

শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ শ্রম মন্ত্রণালয়াধীন, যা একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে শ্রম ইস্যুতে দেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা রক্ষার্থে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জবাবাদিহিতা, অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি শক্তিশালীকরণ অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে কমিশন নিম্নোক্ত ২টি পর্যায়ে সংস্কারের সুপারিশ করছে; ১ম পর্যায়ে জাতীয় শ্রম সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি গঠন ও ২য় পর্যায়ে জাতীয় শ্রম কমিশন গঠন।

জাতীয় শ্রম সংক্রান্ত পরামর্শ কমিটি

ক) শ্রমিক, মালিক ও শ্রমখাতে অভিজ্ঞ/বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে একটি পরামর্শ, পর্যালোচনা ও মনিটরিং কমিটি গঠন করা। শ্রমখাতের দুটি প্রধান অংশীদার, শ্রমিকপক্ষ ও মালিকপক্ষের মধ্যে তথ্যের আদান-প্রদান, যোগাযোগ ও সমন্বয়, পর্যালোচনা, দিক নির্দেশনা, কল্যাণমূলক কার্যক্রম মনিটরিং, সেবা প্রদানকারী অধিদপ্তর সম্পৃক্ত কোনো অভিযোগ পর্যলোচনাপূর্বক মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করবে এই কমিটি। কমিটি শ্রম পরিস্থিতি বিষয়ে সময়বদ্ধ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে এবং শ্রমিকদের মৌলিক সেবাগ্রহণের অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ মন্ত্রণালয়ে পেশ করবে।

খ) এই কমিটির আরেকটি প্রধান কাজ হবে জাতীয় শ্রমনীতি, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নীতিমালা, কর্মসংস্থান নীতি, গার্হস্থ্য নীতি ইত্যাদি নীতিমালা আইনে প্রতিফলনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এই কমিটি শ্রমইস্যুতে জাতীয় ক্রাইসিস মোকাবেলায় সকল পক্ষকে সম্পৃক্ত করে সমাধানের উদ্যোগ নিবে।

গ) 'শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর' এবং 'শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক অধিদপ্তর' কর্তৃক তাদের প্রতিবেদন এই কমিটির কাছে পাঠানো বাধ্যতামূলক হবে এবং কমিটি প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে পরামর্শ প্রদান করবে এবং তার বাস্তবায়ন মনিটর করবে।

ঘ) এই কমিটি বাৎসরিক শ্রম কনভেনশন ও সামাজিক সংলাপ আয়োজন করবে।

ঙ) কমিটির প্রস্তাবিত কাঠামোতে থাকবে জাতীয় ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ থেকে ২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি ও ২ জন মালিক প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়ন থেকে ২ জন ও মালিক সংগঠন থেকে ২জন, শ্রম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি থেকে চেয়ারম্যান মনোনীত ২ জন (১ জন সরকার পক্ষের ও ১ জন প্রধান বিরোধী পক্ষের) এবং ২ জন বিশেষজ্ঞ (আইনজীবী/মানবাধিকার কর্মী/গবেষক/নারী অধিকার/পরিবেশবাদী/শ্রম বিশেষজ্ঞ/অর্থনীতিবিদ)।

চ) এই পরামর্শ কমিটিতে মূল সদস্যদের বাইরে পর্যবেক্ষক হিসেবে আইএলও ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী এবং আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীসহ দেশের কোনো আগ্রহী শ্রম অধিকার সংগঠনের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে।

জাতীয় স্থায়ী শ্রম কমিশন গঠন

ক) সময়বদ্ধ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণীয় হওয়ায় একটি জাতীয় শ্রম কমিশন গঠনকে ২য় পর্যায়ের সুপারিশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে কমিশন। কমিশনের প্রস্তাবিত কাঠামোতে থাকতে পারে ১ জন চেয়ারম্যান (জাতীয়ভাবে গ্রহণযোগ্য বিশিষ্ট শ্রম আইন বিশেষজ্ঞ) এবং সদস্য হিসেবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি থেকে মাননীয় স্পিকার মনোনিত ২ জন, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ১ জন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তা, মালিকপক্ষের ১ জন, শ্রমিকপক্ষের ১ জন, শ্রম আইন, অর্থনীতি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে ১ জন বিশেষজ্ঞ ও শ্রম বিষয়ক ১ জন গবেষক।

খ) কমিশনের মূল কার্যক্রম হবে শ্রম সংস্কার কমিশন-২০২৪-এর প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন তদারকি করা, শ্রম আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/দপ্তরসমূহের কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে পরামর্শ প্রদান করা এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সাথে নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন করা। সুপারিশকৃত এই কমিশনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করবে।

গ) শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি ও জাতীয় পর্যায়ের ক্রাইসিস মোকাবেলার আইনগত ক্ষমতা থাকবে এই কমিশনের। মন্ত্রণালয় বা সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তা নিস্পত্তির দায়িত্ব থাকবে এই কমিশনের। এছাড়াও শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার দায়িত্ব পালন করবে জাতীয় স্থায়ী কমিশন।

৪.১.৮ ত্রিপক্ষীয় কার্যক্রম ও কাঠামোসমূহ জোরদার

জাতীয় পরামর্শ কমিটি ও ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ সহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধায়নে যতগুলো কমিটি আছে, তা কার্যকরকরণ ও নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে একজন যুগ্ম সচিবের দায়িত্বে মন্ত্রণালয়ের আলাদা সাচিবিক ডেস্ক স্থাপন করা। এই ডেস্কের কাজ হবে পক্ষসমূহের মধ্যে সামাজিক সংলাপ আয়োজন, সৌহার্দপূর্ণ অবস্থান শক্তিশালীকরণ, কাঠামোসমূহের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়তা ও নথিপত্র সংরক্ষণে রাখা। মন্ত্রণালয়ের একজন পরিচালক পদমর্যাদার অধীনে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত ও সমন্বয় সাধন করা নিশ্চিত করা।

৪.১.৯ জাতীয় নিম্নতম মজুরি কমিশন

বিভিন্ন পেশার ও ধরনের মজুরি নির্ধারণের প্রক্রিয়া (পে কমিশন, ওয়েজ এন্ড প্রোডাকটিভিটি কমিশন, নিম্নমত মজুরি বোর্ড ইত্যাদি) সমন্বয় করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের সংস্কার করে জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করা হবে (বিস্তারিত সংস্কার প্রস্তাবনার জন্য মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা বিষয়ক অধ্যায়ে-৩.২ দেখুন)। এ কমিশনের ৩টি ভাগ থাকবে;

- জাতীয় নিম্নতম মজুরি
- শিল্প সেক্টরভিত্তিক নিম্নতম মজুরি
- বিশেষ পেশাজীবীদের জন্য নিম্নতম মজুরি।

নিম্নতম মজুরি বোর্ড

ক) নিম্নতম মজুরি বোর্ডের আইনগত কার্যপরিধি ও সক্ষমতা বাড়ানো, যাতে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষনা করতে পারে।

খ) মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান ও নিরপেক্ষ সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে মজুরি, উৎপাদনশীলতা ও শ্রম অর্থনীতি বিষয়ক অভিজ্ঞতাকে প্রাধান্য দেয়া।

গ) মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ডের নিজস্ব গবেষণা সম্পন্ন করা ও এর ভিত্তিতে মজুরি সুপারিশ নির্ধারণের ক্ষেত্রে বোর্ডের নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানো।

ঘ) ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রতিটি সেক্টরের মজুরি সুপারিশ করার সময়ে মজুরির পরিমাণ নির্ধারণের ভিত্তিসমূহ, মজুরির হিসাব পদ্ধতি এবং মজুরির পরিমাণ নিরূপণে ব্যবহৃত তথ্য/উপাত্তসমূহ প্রকাশ করা।

ঙ) মূল্যস্ফীতি ও অন্যান্য মানদণ্ড বিবেচনা করে প্রতি বছর শিল্প সেক্টরের মজুরি মূল্যায়ন করে মর্যাদাকর জীবনধারণের জন্য মজুরি নির্ধারণের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করা।

চ) বর্তমানে ৪২টি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারিত আছে, এটি হালনাগাদ করতে হবে ও শিল্প সেক্টরের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

স্থায়ী জাতীয় মজুরি কমিশন

ক) জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য শ্রম, শ্রম অর্থনীতি ও মজুরি বিষয়ে অভিজ্ঞ/দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবৃন্দ এবং শ্রমিক ও মালিক প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি স্থায়ী জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন গঠন করা। এই কমিশনের আওতায় সরকারি পে কমিশন এবং মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন, সংবাদ পত্র ওয়েজ বোর্ড অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ একক মজুরি কমিশন দ্বারাই বাংলাদেশে সকল মজুরি ও ভাতা নির্ধারণ ও কার্যকর হবে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন প্রতি বছর মর্যাদাপূর্ণ জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম মজুরি হালনাগাদ করে ঘোষণা করবে।

খ) সেক্টর/খাত ও পেশাভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য স্থায়ী জাতীয় মজুরি কমিশনের অধীনে এক বা একাধিক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হবে।

গ) জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশনের কাঠামো ও কার্যপরিধিসহ অনান্য সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার/সংশোধন করা হবে।

ঘ) মজুরি সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় ন্যূনতম মজুরি কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে যৌথভাবে নিয়মিত সংলাপের আয়োজনের বিধান রাখা এবং ন্যায্য মজুরির সুফল বিষয়ে গবেষণাভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হবে।

৫. বিশেষ ইস্যুভিত্তিক সংস্কার প্রস্তাবনা

৫.১ ব্যবসা ও মানবাধিকার প্রেক্ষিতে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ

বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার সংক্রান্ত দায়বদ্ধতার বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত একটি বৈশ্বিক নীতিগত ধারণা বা প্রক্রিয়া। দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বৈশ্বিক নীতিগত ধারণা বা প্রক্রিয়া হচ্ছে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স (Human Rights Due Diligence-HRDD) যার মাধ্যমে বাণিজ্যিক বা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবাধিকার সুরক্ষায় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করবে ও ধারাবাহিকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঝুঁকি চিহ্নিত, প্রতিরোধ এবং সমাধান করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়ার লক্ষ্য হল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ও শ্রম মানদণ্ড অনুযায়ী পরিচালিত হয় কিনা তা নিশ্চিত করা, মানবাধিকার সুরক্ষার বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা। এ প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে মানবাধিকার লঙ্ঘন হলে তার যথাযথ বিচার বা প্রতিকার নিশ্চিত করা। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের কার্যক্রমের মাধ্যমে শ্রমিক, ভোক্তা, এমনকি যে কোনো মানুষের মানবাধিকারের উপর প্রকৃত এবং সম্ভাব্য যে কোনো ক্ষতিকর প্রভাবগুলো চিহ্নিত, প্রতিরোধ এবং প্রশমিত করতে এবং সেই নেতিবাচক প্রভাবগুলো কীভাবে সমাধান করা হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করে।

মানবাধিকার সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা এবং কর্পোরেট খাতের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখে। দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের সুনির্দিষ্ট কাঠামো অনুসরনের মাধ্যমে সরকার ও নিয়োগকর্তাদের প্রতি প্রত্যাশা যে তারা নিজস্ব ব্যবসায়িক কর্ম পরিধিতে যথাযথভাবে মানবাধিকার ও পরিবেশগত সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং তা ধারাবাহিকভাবে চর্চা করবে।

হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স পদ্ধতিটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনগতভাবে স্বীকৃত হচ্ছে এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক ব্যবসা সংক্রান্ত নীতিমালায় একীভূত হয়েছে। বিষয়টি বাংলাদেশের শ্রম খাতের জন্য, বিশেষ করে রপ্তানিমুখি শিল্পের জন্য যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। বর্তমান বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর তৈরি পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) কাঠামো সক্রিয় ভূমিকা রাখবে।

দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের সুনির্দিষ্ট কাঠামো জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতি-নির্দেশনা ২০১১ (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। UNGPs সুনির্দিষ্টভাবে সদস্য রাষ্ট্রের বিদ্যমান মানবাধিকার সুরক্ষার বাধ্যবাধকতা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার সম্মান করার দায়িত্ব এবং উভয়ের জন্য প্রতিকার নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিয়ে ঘোষিত হয়েছে। জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতি-নির্দেশনা ২০১১, তিনটি মূল ভিত্তি সুরক্ষা, মর্যাদা ও প্রতিকার (Protect, Respect, Remedy) এই কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) অনুযায়ী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এর উপর নেতিবাচক প্রভাব প্রতিরোধের জন্য শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় একটি নীতিগত প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করবে (Policy Statement), মানবাধিকার সুরক্ষায় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (Human Rights Due Diligence) গ্রহণ করবে এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রতিকার (Remediation) প্রদান বা সহযোগিতা করবে।

এছাড়াও দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে বেশ কিছু নির্দেশিকা, ঘোষণা ও আইন রয়েছে, যা কোম্পানিগুলোর জন্য মানবাধিকার সম্মান করা ও সুরক্ষার এবং পরিবেশগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো ব্যবসা ও মানবাধিকার (BHR) নীতির মুখ্য নীতি হিসেবে কাজ করে। জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক নীতি-নির্দেশনার (UNGPs) পাশাপাশি জাতিসংঘ গ্লোবাল কমপ্যাক্ট (UN Global Compact) ২০০০, আইএলও বহুজাতিক কোম্পানি ও সামাজিক নীতিমালা সম্পর্কিত ত্রিপাক্ষিক ঘোষণা (MNE Declaration) ১৯৭৭, বহুজাতিক কোম্পানির জন্য ওইসিডি নির্দেশিকা (OECD Guidelines) ১৯৭৬ এবং সাম্প্রতিক ঘোষিত

ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্পোরেট সাসটেইনেবিলিটি ডিউ ডিলিজেন্স ডাইরেকটিভ (CSDDD) ২০২৩ দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের মাধ্যমে মানবাধিকার ও পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে।

মানবাধিকার বা পরিবেশ সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সাধানরণ নীতি নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশে ব্যাবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়ার প্রয়োগযোগ্যতা ও প্রযোজ্যতা রয়েছে। দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা ও আইনসমূহ মূলত কর্পোরেট ব্যবসায়িক দায়বদ্ধতার উপর ভিত্তি করে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য আন্তঃদেশীয় জবাবদিহিতার সুযোগ প্রদান করে। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখি শিল্পের জন্য এটি অধিকতর প্রযোজ্য। তবে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়া আইন ভেদে ছোটো এবং বড়ো সব ধরনের প্রতিষ্ঠানেই প্রযোজ্য, বিশেষ করে যারা আন্তর্জাতিক সরবরাহ শৃঙ্খলে কাজ করে বা বৈশ্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে তাদের জন্য সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা ও সুপারিশ রয়েছে। নীতি নির্দেশনা বা আইনের প্রযোজ্যতা বিধানের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের জন্য এটি প্রযোজ্য কিনা তা নির্ধারণ করার সুযোগ থাকলেও সার্বিকভাবে ব্যবসায়িক আচরণ বা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডকে মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও টেকসই পরিবেশ বান্ধব একটি জবাদিহিতামূলক কাঠামোতে আনতে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রয়োগ ও চর্চার আইনি কাঠামো থাকা উচিত।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নীতিমালা ও আইন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য মানবাধিকার নিশ্চিত করতে নির্দেশনা প্রদান করে। বাংলাদেশেও এই নীতিমালা ও আইনগুলোর বিভিন্ন মাত্রায় প্রযোজ্যতা রয়েছে;

- UNGP (জাতিসংঘের ব্যবসা ও মানবাধিকার নীতিমালা): জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র ও সব ধরনের ব্যবসার জন্য প্রযোজ্য। এটি বাধ্যতামূলক না হলেও বৈশ্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড।
- ILO MNE ডিক্লারেশন: বাংলাদেশসহ সব আইএলও সদস্য রাষ্ট্র ও বহুজাতিক কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য। এটি বাধ্যতামূলক নয়, তবে ILO কাঠামোর সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় ও ত্রিপাক্ষিক ঘোষণা হওয়ায় সদস্য রাষ্ট্রসমূহের উপর আইনগতভাবে মেনে চলার প্রভাব রয়েছে।
- OECD MNE গাইডলাইন: OECD সদস্য দেশসমূহ ও স্বাক্ষরকারী কিছু Non-OCED দেশগুলোর বহুজাতিক কোম্পানি ও তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলের জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশে এসব কোম্পানির কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এটি একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড।
- ইউরোপিয়ান CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive): বৃহৎ ইউরোপীয় কোম্পানি ও তাদের গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের জন্য বাধ্যতামূলক আইন। বাংলাদেশে এসব কোম্পানির সরবরাহ শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- জার্মান সরবরাহ চেইন আইন (LkSG): ১০০০+ কর্মীযুক্ত জার্মান কোম্পানির জন্য বাধ্যতামূলক। এটি সরবরাহ শৃঙ্খলে মানবাধিকার ও পরিবেশগত ঝুঁকি চিহ্নিত ও প্রশমিত করার জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশে এসব কোম্পানির সরবরাহ শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ফ্রেঞ্চ ডিউটি অফ ভিজিল্যান্স আইন: বৃহৎ ফরাসি কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য। বাংলাদেশের সরবরাহ শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে সতর্কতা গ্রহণ বাধ্যতামূলক।
- নরওয়েজিয়ান ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট: নরওয়ের কোম্পানি ও তাদের গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনের জন্য বাধ্যতামূলক। কোম্পানিগুলোকে মানবাধিকার ও কর্মপরিবেশ বিষয়ে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে। বাংলাদেশে এসব কোম্পানির সরবরাহ শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

উপর্যুক্ত নীতিমালা ও আইনগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশে কার্যরত বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে মানবাধিকার ও পরিবেশ সংরক্ষণে আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে বাধ্য করা হয়েছে। এটি শ্রমিক ও সরবরাহ শৃঙ্খলে কাজ করা কর্মীদের অধিকার সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যেহেতু দেশভিত্তিক ও আঞ্চলিক আইন ও নীতিমালার কারণে সেই সকল দেশের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এই বিধান মানতে আইনতগভাবে বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়েছে; সুতরাং বাংলাদেশে রপ্তানিমুখি শিল্পসমূহকে সেই সকল দেশের রপ্তানি বাণিজ্য অবাধ ও নিশ্চিত করার জন্য হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকার সমুন্নত রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ (RBC) নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর রাষ্ট্রীয়

কাঠামো প্রয়োজন হবে। দেশীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় ও সক্রিয় অংশগ্রহণদের মাধ্যমে মানবাধিকার রক্ষায় কাজ করতে পারবে।

দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ (RBC) সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নীতি ও আইনসমূহ পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ, ভোক্তা ও সাধারণ জনগণের প্রতি দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ (RBC) সংক্রান্ত দুইটি মুখ্য বিষয় পাওয়া যায়; (১) হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স ও (২) এনভাইরনমেন্টাল ডিউ ডিলিজেন্স। দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণ (RBC) বিষয়ের আলোকে কীভাবে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার, সুরক্ষা ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ব্যবসার ভাবমূর্তি ও অধিকতর কমপ্লায়েন্স শিল্প হিসেবে সুনাম রক্ষা করা যায় তা নিশ্চিত করার লক্ষে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা করা হলো;

ক। দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনার জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রণয়ন

দায়িত্বশীল ব্যবসা পরিচালনা বিষয়ক একটি বিস্তৃত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) তৈরি করা উচিত, যা ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মানবাধিকার এবং পরিবেশ সুরক্ষিত রেখে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করবে। জাতিসংঘের ব্যবসা এবং মানবাধিকার বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপ, ব্যবসা এবং মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAPs) তৈরির জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রকে উৎসাহিত করে এবং এটি বাস্তবায়ন ও নিয়মিত হালনাগাদ করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে। এই জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) একটি কৌশলগত কাঠামো হিসেবে মানবাধিকার ও পরিবেশগত লঙ্ঘন চিহ্নিত, প্রতিরোধ, প্রশমন এবং প্রতিকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করার জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ প্রণয়ন করতে পারে, বিশেষ করে বাংলাদেশের শিল্পখাতে মানবাধিকার সুরক্ষা ও আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজারে বাংলাদেশের শিল্পের ভাবমূর্তি উন্নত করতে এটি প্রণয়ন করা জরুরি।

জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NAP) প্রস্তুত ও বাস্তবায়তন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে একটি টাস্ক ফোর্স দ্বারা পরিচালিত হতে পারে, যা আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির পাশাপাশি ব্যবসায়ী সম্প্রদায় (নিয়োগকর্তা এবং ব্র্যান্ড), ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজের সংগঠন এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করবে।

খ। শ্রম আইনে মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা

UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সুরক্ষায় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসেবে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য পরামর্শ দেয়। উন্নত দেশগুলি এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করছে যা তাদের দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবসার সরবরাহ শৃঙ্খলের বিস্তৃতি পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য। শ্রম আইনে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে শিল্পের জন্য হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স প্রক্রিয়া অনুসরণে বাধ্যবাধকতা তৈরি করা সম্ভব। এর ফলে আইনতভাবে প্রযোজ্য শিল্প নিয়মিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রকৃত ও সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করবে; পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যমান ঝুঁকি কমাবে; প্রতিকূল প্রভাবসমূহ প্রশমিত, প্রতিরোধ এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার নীতিমালা প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া স্থাপন করবে। এছাড়া এইচআরডিডি প্রক্রিয়ার গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং ফলাফল নিয়মিতভাবে মূল্যায়ন করে মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক কার্যক্রম এবং উদ্যোগগুলির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনে সংশোধন করবে এবং মানবাধিকার সুরক্ষা বিষয়ক পরিচালিত কার্যক্রমের প্রতিবেদন প্রস্তুত ও অংশীজনদের সাথে নিয়মিতভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

আন্তর্জাতিক নীতি ও আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশেষ মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স বিষয়ক একটি পৃথক আইন প্রণয়ন করতে হবে, যা শিল্পের আকার ও পরিসর অনুযায়ী ধাপে ধাপে প্রযোজ্য হবে এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মানবাধিকার সংক্রান্ত জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

গ। HRDD তদারকি ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করা

প্রস্তাবিত স্থায়ী শ্রম কমিশন প্রতিষ্ঠা করে এর আওতায় ব্যবসায়িক কার্যক্রমে মানবাধিকার সংক্রান্ত ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) মনিটরিং ও অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু করা উচিত। এই কমিশনকে স্বাধীন ও কার্যকরী হতে হবে, যাতে এটি শ্রমিক অধিকার সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিশ্চিত করতে পারে। বাংলাদেশের শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক মান (যেমন ILO কনভেনশন, UNGPs, OECD Guidelines) অনুসারে শ্রমিকদের বিভিন্ন অধিকার থাকলেও এসব আইন প্রায়শই বাস্তবায়িত হয় না। একটি স্বাধীন কমিশন থাকলে এটি নিশ্চিত করবে যে আইনগত কাঠামো অনুযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত হচ্ছে কিনা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা হচ্ছে কিনা।

ঘ। রপ্তানিখাতসহ বৃহৎ শিল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিক মানবাধিকার ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণে স্থায়ী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা

ক) রপ্তানি খাতসহ বৃহৎ শিল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিক একটি স্বাধীন ও বিস্তৃত মূল্যায়ন (Independent and Comprehensive Assessment) পরিচালনা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যা রপ্তানি খাতসহ অন্যান্য বৃহৎ শিল্পে পর্যায়ক্রমে মানবাধিকার ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণ করবে। এই মূল্যায়নের মাধ্যমে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের (Responsible Business Conduct - RBC) বাস্তব অবস্থা চিহ্নিত করা হবে এবং আদর্শ মান ও বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যকার ব্যবধান (Gap in Compliance) বিশ্লেষণ করা হবে। একইসঙ্গে, মানবাধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুযোগ নির্ধারণ করা হবে। সুতরাং এই প্রক্রিয়া ধারাবাহিকভাবে ও কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ) যদি বাংলাদেশ সরকার একটি স্বাধীন ও স্বচ্ছ মূল্যায়নের মাধ্যমে মানবাধিকার সুরক্ষায় গৃহীত পদক্ষেপগুলি তুলে ধরতে পারে, তবে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান ধরে রাখতে পারবে। সরকার, শ্রমিক সংগঠন, ব্যবসায়ী গোষ্ঠী, আন্তর্জাতিক ক্রেতা ও ব্র্যান্ড, ট্রেড ইউনিয়ন এবং নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলি যদি একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে বাস্তব চিত্র দেখতে পায়, তবে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন সামাজিক সংলাপ ও অংশীদারিত্বের (Social Dialogue & Stakeholder Engagement) সুযোগ তৈরি হবে।

গ) যদি সরকার এই ধরনের মানবাধিকার ঝুঁকি বিশ্লেষণমূলক মূল্যায়ন পরিচালনা করে, তবে বাংলাদেশে হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) কাঠামো প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি হবে। এর মাধ্যমে সরকার জাতীয় নীতিমালার (National Action Plan on Business & Human Rights - NAP) উন্নয়ন করতে পারবে এবং আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে। একটি জাতীয় পর্যায়ের কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডারের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণের তথ্য, প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কিত তথ্য, মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ এবং যোগাযোগ ও জবাবদিহিতা সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ থাকলে এটি একাধিক অডিটের প্রয়োজনীয়তা কমাবে এবং সরকার, ব্র্যান্ড ও ক্রেতাদের মধ্যে সমন্বয় বাড়াবে। সুতরাং একাধিক অডিটের প্রয়োজনীয়তা কমানোর লক্ষ্যে একটি স্থায়ী, কার্যকর ও গ্রহণযোগ্য মানবাধিকার ঝুঁকি ও প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য একটি স্থায়ী হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক।

ঙ। রপ্তানিমুখি ও বৃহৎ শিল্পের সরবরাহ চেইনে শ্রমিক অধিকার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে একটি বিস্তৃত তথ্যভাণ্ডার তৈরি করা

দেশের সকল রপ্তানিমুখি ও বৃহৎ শিল্পের সরবরাহ (Supply Chain) চেইনের সুনির্দিষ্ট কাঠামো, ব্যাপ্তি ও প্রবাহ নির্ধারণ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষদের (Stakeholders) সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে একটি বিস্তৃত জাতীয় তথ্যভাণ্ডার (Comprehensive Database) তৈরি করা। এতে দেশের রপ্তানিমুখি কারখানা, শ্রমিক, সরবরাহকারী ও অন্যান্য অংশীদারদের চিহ্নিত করা সহজ হবে এবং মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) পরিচালনার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ সহজতর হবে। যেমন বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সরবরাহ চেইন এখনো অস্বচ্ছ ও জটিল। অনেক কারখানা সরাসরি রপ্তানির আওতায়

না পড়লেও সাব-কন্ট্রাক্টিংয়ের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে কাজ করছে। ফলে সত্যিকারের উৎপাদন কাঠামো নির্ধারণ করা কঠিন।

একটি জাতীয় তথ্যভাণ্ডার থাকলে প্রতিটি কারখানার অবস্থান, উৎপাদন প্রক্রিয়া, শ্রমিক সংখ্যা এবং সরবরাহ চেইনের মূল অংশীদারদের তথ্য সহজে পাওয়া যাবে। এটি শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা শনাক্ত করা সহজ করবে এবং দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সহায়তা করবে এবং সার্বিকভাবে শিল্পের ভাবমূর্তি রক্ষা করা যাবে।

চ। বাণিজ্য চুক্তিতে মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) অনুসরণের বাধ্যতামূলক সামাজিক শর্ত/ধারা সংযোজন

বাণিজ্য চুক্তিতে একটি বাধ্যতামূলক ধারা সংযোজন করা, যেখানে মানবাধিকার ডিউ ডিলিজেন্স (HRDD) মানদণ্ড অনুসরণের স্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে। এটি নিশ্চিত করবে যে বাংলাদেশের রপ্তানিমুখি শিল্পে মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী দেশীয় সরবরাহকারীদের সাথে আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠানও সমানভাবে শিল্পে মানবাধিকার, সুনির্দিষ্টভাবে শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

ছ। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থাগুলি চিহ্নিতকরণ এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি

ব্যবসা এবং মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে মাল্টিস্টেকহোল্ডার সহযোগিতা ও সমন্বয় প্রয়োজন। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্ক এবং সমন্বয় বাড়ানো হলে একটি সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাঠামো গড়ে উঠবে, যা মানবাধিকার বিষয়ক চ্যালেঞ্জগুলির সমাধান করতে সহায়ক হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলির মধ্যে মানবাধিকার এবং দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের উপর স্পষ্ট এবং কার্যকর নির্দেশনা প্রদান করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এটি করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় যেমন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য সরকারি সংস্থাগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, ট্রেড ইউনিয়ন, সুশীল সমাজের সংগঠন এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য কার্যকর প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা জরুরি।

৫.২ জলবায়ু পরিবর্তন ও ন্যায্য রূপান্তর

বাংলাদেশ দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন উভয়ের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ এবং গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স ২০২১-এর প্রতিবেদন অনুসারে, বিশ্বের সপ্তম চরম দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ দেশ হিসেবে স্থান পেয়েছে।[১১৫] যদিও বাংলাদেশ বৈশ্বিক কার্বন নির্গমনের একটি সামান্য অংশই অবদান রাখে, তথাপি পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম দিকে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং নদীর পানি বণ্টনের আঞ্চলিক রাজনৈতিক বাস্তবতা জলবায়ু সংকটকে আরও বেশি ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। ভৌগোলিক অবস্থানের পাশাপাশি সমতল, নিম্নভূমির ভূ-প্রকৃতির কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগও বাংলাদেশকে জর্জরিত করে। জলবায়ু-সৃষ্ট দুর্যোগ যেমন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড় এবং ঝড়ো হাওয়া, মৌসুমি বন্যা, আকস্মিক বন্যা, খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ, সমুদ্রের অম্লীকরণ ইত্যাদি বাংলাদেশের নিয়মিত ঘটনা।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শ্রমজীবী মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এটি চাকরি এবং শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে যা আগামীতে আরও প্রকট হতে পারে। বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় সামগ্রিকভাবে কর্মঘণ্টা কমে যেতে পারে। আইএলও হিসেব মতে উচ্চতাপমাত্রা জনিত কারণে ২০২৩ সালের মধ্যে বিশ্বে সর্বমোট শ্রম ঘণ্টার ৩.৮ শতাংশ হ্রাস পাবে, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই হ্রাসের পরিমাণ হবে ৪.৮৪ শতাংশ।[১১৬] বিশেষ করে নারী, অভিবাসী, যুবক, আদিবাসী, দরিদ্র ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক

[115] https://www.undp.org/bangladesh/publications/climate-vulnerability-index-draft
[116]

খাতের শ্রমজীবী মানুষ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পরিবেশগত দুর্যোগের পর সহজে ঘুরে দাঁড়াতে পারে না এবং তাদের জন্য পুনর্বাসন হওয়া বিশেষভাবে কঠিন হয়ে ওঠে।[১১৭]

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ও কার্বন নির্গমন হ্রাস নীতি গ্রহণের ফলে শিল্প ও বাণিজ্য নীতিতে প্রাসঙ্গিকভাবে বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দ কার্বন নির্গমন কমানো এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা ১.৫° এর বেশি না রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছেন, যা প্যারিস চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে জলবায়ু ও সামাজিক বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্ন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিভিন্ন আইনি ও নীতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা সরকার ও অন্যান্য অংশীজনরা অনুসরণ করতে পারে।

বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে জলবায়ু সহনশীল টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন এবং নিট-শূন্য নির্গমনে রূপান্তরকে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন নীতি কাঠামো প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্রকে উদ্যোগ নেওয়ার বাধ্যবাধকতা দিয়েছে (অনুচ্ছেদ ১৮)। জাতীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিকল্পনায় ২০২২-২০৪১-এ ন্যায্য রূপান্তর এবং শিল্পকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে প্রযুক্তি স্থানান্তরের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এটি প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমবাজারের জন্য আধুনিকায়ন, উৎপাদনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যিক ভবনগুলোর তাপমাত্রা সহনশীল করার জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে সংস্কার পরিকল্পনা প্রস্তাব করে। এই পরিকল্পনার আওতায় ৩.৮৩ মিলিয়ন শ্রমিককে ন্যায্য রূপান্তর কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও পুনরায় দক্ষতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ২০৩০ সালের মধ্যে ৩,৫০০টি কারখানাকে LEED সার্টিফিকেশন অর্জনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যাওয়া, পরিবেশবান্ধব রপ্তানি, লজিস্টিক ব্যয় হ্রাস এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি স্থাপনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়েছে যেখানে বিশেষ করে সবুজ অর্থনীতি, সবুজ দক্ষতা, সবুজ কর্মসংস্থান এবং সবুজ উদ্যোগের প্রসারে বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশের পরিবেশগত কর্মক্ষমতা সূচক (Environmental Performance Index) ২০১৮ সালে বিশ্বের নিচের ৫ শতাংশের মধ্যে ছিল, যা ২০৪১ সালের মধ্যে শীর্ষ ৩০ শতাংশের মধ্যে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করেছে।

যুক্তিসংগতভাবে বৈশ্বিক জলবায়ু কার্যক্রম পরিবেশবান্ধব ও নিম্ন-কার্বন নির্গমনের খাতে রূপান্তরের জন্য টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক (RMG) শিল্পের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। বৈশ্বিক ও জাতীয় জলবায়ু কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্র্যান্ড, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (EU) মতো রপ্তানি গন্তব্যগুলোর চাপ ও প্রত্যাশা এই শিল্পকে টেকসই উৎপাদনের দিকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ফলে শিল্পটি ইতোমধ্যে পরিবেশবান্ধব কারখানা প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। একইভাবে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য শিল্পে যে স্বয়ংক্রিয়করণ (অটোমেশন) গ্রহণ করা হয়েছে, তা শ্রমিকদের জন্য একদিকে সুযোগ সৃষ্টি করছে, আবার অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জও আনছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (RMG) শিল্পে সবুজ রূপান্তর (Green Transition) প্রক্রিয়া চলমান থাকলেও যথাযথ সামাজিক সংলাপ, প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের যথাযথ প্রতিফলন উপেক্ষিত হচ্ছে। পোশাক শিল্পের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর দাবি, শ্রমিকদের সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত না করে কারখানাকে শুধু পরিবেশবান্ধব করা হলে তা সবুজ কারখানা হতে পারে, কিন্তু তা প্রকৃত অর্থে সবুজ শিল্প বা টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা হবে না। টেকসই উৎপাদন কেবল তখনই দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর ও বাস্তবসম্মত হবে, যখন ন্যায্য রূপান্তরের (Just Transition) মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত শ্রম অনুশীলন নিশ্চিত করা যাবে। শিল্পের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থায়িত্বকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম মান অনুযায়ী ন্যায্য রূপান্তরের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO, 2017) উল্লেখ করেছে যে, সবুজ কাজের (Green Jobs) মান অবশ্যই ভালো হতে হবে, মর্যাদাপূর্ণ হতে হবে এবং তা অবশ্যই শোভন কাজ (Decent Work) এজেন্ডার চারটি কৌশলগত লক্ষ্য অনুসারে হতে হবে।

[117] International Labour Office. (2018). *The employment impact of climate change adaptation.* Input Document for the G20 Climate Sustainability Working Group International Labour Office (ILO): Geneva.

সুতরাং সবুজ রূপান্তরের পরিবর্তে শিল্প ক্ষেত্রে জাস্ট ট্রানজিশন বা "ন্যায্য রূপান্তর" বিষয়টি প্রাধান্য দেওয়া উচিত। জাস্ট ট্রানজিশন বা "ন্যায্য রূপান্তর" হলো একটি প্রক্রিয়া যা অর্থনীতিকে পরিবেশবান্ধব করার মাধ্যমে ন্যায্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবর্তন নিশ্চিত করে, যেখানে কেউ পিছিয়ে থাকবে না। এটি এমন একটি ধারণা যা টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে একীভূত করে। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) জাস্ট ট্রানজিশনকে একটি ধারণামূলক কাঠামো হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে, যা নিম্ন-কার্বন নির্গমন এবং জলবায়ু সহনশীল অর্থনীতির দিকে পরিবর্তনের জটিলতাগুলো চিহ্নিত করে। এই প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হলো পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। এ লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক। জাতীয় জলবায়ু ন্যায্যতা কৌশলপত্র প্রণয়ন

বাংলাদেশের শ্রমজীবী জনগোষ্ঠী ও তাদের পরিবারের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলা করে জলবায়ু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং পরিবেশবান্ধব শিল্পে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ন্যায্য রূপান্তর নীতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি শ্রম বান্ধব জাতীয় জলবায়ু ন্যায্যতা কৌশলপত্র প্রণয়ন করা জরুরি। জাতীয় জলবায়ু ন্যায্যতা কৌশলপত্র শ্রমিক ও তাদের জন্য জলবায়ু ক্ষতিপূরণে ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। এ ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জলবায়ু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ।

খ। জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন

- পরিবেশ বান্ধব সবুজ অর্থনৈতিতে রূপান্তর বা শিল্পায়ন বা শিল্পে যে কোনো ধরনের প্রযুক্তিগত রূপান্তর প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সকলের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করত এবং সবুজ অর্থনৈতিতে রূপান্তরের সুফল লাভের জন্য একটি জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন করা। এটি শ্রমিক এবং শিল্প উভয়ের জন্য একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক, যৌক্তিক এবং সুরক্ষামূলক রূপান্তরের প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। এই প্রক্রিয়ায় সরকার, মালিক, ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক ও সামাজিক অংশীজনদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা জরুরি।
- জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামোতে বিশেষ খাতভিত্তিক পরিকল্পনা বা রূপরেখা বা নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেমন, তৈরি পোশাক শিল্পে ন্যায্য রূপান্তরের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের জন্য এ শিল্পভিত্তিক একটি ন্যায্য রূপান্তর রূপরেখা প্রণয়ন করা জরুরি। এই শিল্পে মানসম্মত এবং শোভন কাজ তৈরির জন্য শিল্পভিত্তিক একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা যেখানে বিশেষ করে কর্মসংস্থানের উপর সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ এবং চাকরি হারানোর জন্য পর্যাপ্ত এবং টেকসই সামাজিক সুরক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং সামাজিক সংলাপের বিষয়গুলি বিবেচনায় নেয়া হবে।
- শ্রমিক অধিকার সুরক্ষার ও কল্যাণের মত সামাজিক শর্ত মেনে পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন বা সবুজ কারখানা প্রতিষ্ঠা বা রূপান্তর প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রক্রিয়াগত আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করা।

গ। ন্যায্য রূপান্তর পরামর্শক পরিষদ গঠন

- জাতীয় পর্যায়ে একটি ন্যায্য রূপান্তর পরামর্শক পরিষদ গঠন করা। এই পরিষদ একটি স্বাধীন পরামর্শ সংস্থা হিসেবে কাজ করবে এবং নিম্নকার্বন নিঃসরণের অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় দিক—নির্দেশিকা প্রদান এবং মনিটরিং করবে। এই পরিষদের কাজ হবে শিল্পে সবুজায়নের মূল অন্তরায়সমূহ যথা বৈষম্য এবং অবিচারসমূহ চিহ্নিত করে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত করা। ন্যায্য রূপান্তরের বিষয়সমূহ মনিটরিংয়ের জন্য শিল্পভিত্তিক আলাদা আলাদা বিশেষায়িত মনিটরিং ইউনিট গঠন করা। ত্রিপক্ষীয় নীতি অনুসরণ করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এই পরিষদ গঠন করা হবে।

ঘ। জাতীয় জলবায়ু ও ন্যায্য রূপান্তর তহবিল

- জলবায়ু পরিবর্তন ও সবুজ অর্থনীতিতে রূপান্তরজনিত ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবিলা ও সামজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে সরকারি ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে তহবিল গঠন করা। জলবায়ু পরিবর্তন মিটিগেশন এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য জাতীয়

জলবায়ু ও ন্যায্য রূপান্তর তহবিল প্রয়োজন। এই জাতীয় তহবিলের অধীনে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব ও পরিবেশবান্ধব অর্থনীতিতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় উদ্ভূত ক্ষয়-ক্ষতি কমিয়ে আনার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এবং সামাজিক সুরক্ষার আওতা বাড়িয়ে সরকারকে একটি সামাজিক সুরক্ষা তহবিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিশেষ করে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, গবেষণা ও উদ্ভাবন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং রূপান্তর-সংশ্লিষ্ট কর্মচ্যুতির জন্য বিমা এবং ক্ষতিপূরণ দেয়া, কর্মহীন সময়ের জন্য ভাতা ও সুবিধাদি প্রদান, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসন, পরিবর্তিত উন্নত অবস্থার জন্য শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন এবং রি-লার্নিং, চাকরি হারানো শ্রমিককে চাকরি-খুঁজে পেতে সহায়তা এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য এই তহবিলের একান্ত প্রয়োজন।

- তৈরি পোশাক শিল্প এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাতে ন্যায্য রূপান্তরের জন্য বিষয়ভিত্তিক এবং সুনির্ধারিত একটি পরিকল্পনা থাকতে হবে।
- সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সবুজায়ন অর্থনীতির ইতিবাচক প্রভাব বৃদ্ধির জন্য সরকারের উচিত হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়*গুলির* মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো।
- গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ডে'র অর্থায়নের প্রধান উৎস্য হতে পারে। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (SEIP) জন্য জাতীয় বাজেট সহায়তা এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ এবং জাতীয়-মিটিগেশন অর্থায়নের একটি অংশ জাতীয় ন্যায্য রূপান্তর তহবিলে বরাদ্দ প্রদান প্রয়োজন।

ঙ। জলবায়ু পরিবর্তন ও রূপান্তর প্রক্রিয়ায় ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ সক্ষমতা বৃদ্ধি

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ঝুঁকিসমূহ মূল্যায়ন করে তা থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সক্ষম ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যাতে তারা গ্রিন ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করে সহজেই নতুন নতুন ঝুঁকি চিহ্নিত করতে পারে এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মান মনিটরিং করতে পারে। নতুন প্রযুক্তি এবং পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করে কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন মনিটরিং-চেকলিষ্ট আপগ্রেড করা।

চ। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জলবায়ু বিষয়ক নীতিসমূহ হালনাগাদ ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

- অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং জলবায়ু বিষয়ক নীতিসমূহকে আইএলও ন্যায্য রূপান্তর গাইডলাইনস মেনে হালনাগাদ করা। জাতীয়ভাবে নির্ধারিত কার্বন নিঃসরণ মাত্রা এবং দীর্ঘমেয়াদি নিম্নকার্বন নিঃসরণ উন্নয়ন কৌশলসমূহে ন্যায্য রূপান্তরের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং একীভূত করা।
- জবাবদিহিতা বাড়াতে এবং বিরূপ প্রভাব কমাতে ন্যায্য রূপান্তরের নীতিসমূহকে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিসমূহের সাথে সুসংহত এবং একীভূত করা, যেমন শ্রমবাজার নীতি, ব্যাংক ঋণের শর্তাবলি, সরকারি প্রণোদনা এবং অন্যান্য বিনিয়োগ নীতি।
- কারখানাসমূহের সবুজায়ন কিংবা বিদ্যমান কারখানাসমূহে প্রযুক্তি আপগ্রেড করার জন্য বিনিয়োগের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ঋণ এবং আমদানি-রপ্তানি অর্থায়ন ও প্রণোদনার নীতি ও প্রবিধানসমূহে একটি প্রাক সামাজিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বিধান অন্তভুর্ক্ত করা যেতে পারে। এই প্রতিবেদনে শ্রমিকের জীবনে পরিবর্তনের খারাপ প্রভাবসমূহ চিহ্নিত করতে হবে এবং ন্যায্য রূপান্তরের জন্য মিটিগেশন পরিকল্পনা অন্তভুর্ক্ত করা।

ছ। পুনর্বাসন, দক্ষতা বৃদ্ধি, আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং নিশ্চিত করা

- সবুজ রূপান্তরে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের পুনর্বাসন, আপ-স্কিলিং ও রি-স্কিলিং নিশ্চিত করতে হবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বিষয়ে শ্রমিকদের আগে থেকে জানানো এবং প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে। সন্তোষজনক রূপান্তর প্রক্রিয়ার কারণে যদি চাকরি হারানো অনিবার্য হয়ে পড়ে, তবে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের আইনানুগ ক্ষতিপূরণ প্রদানের এবং বিকল্প কোনো চাকরিতে পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা করতে হবে। পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে গবেষণা পরিচালনা করে ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি বিস্তৃত এবং সহজলভ্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

- পরিবর্তনের যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং পরিবেশগত প্রভাব মোকাবেলায় পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে গবেষণা পরিচালনা করে ন্যায্য রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাথে সংগতিপূর্ণ একটি বিস্তৃত এবং সহজলভ্য দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচি প্রণয়ন করা। একটি সমন্বিত পরিকল্পনা এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য এটা জানা জরুরি যে, রূপান্তর প্রক্রিয়ার আগে কী ধরনের দক্ষতা বিদ্যমান ছিল এবং পরে কী ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন হবে।
- অটোমেশন বা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের শুরুতেই সকল শ্রমিককে এ বিষয়ে অবশ্যই জানাতে হবে যে ভবিষ্যতে উৎপাদনের জন্য কী ধরনের দক্ষতার প্রয়োজন হবে এবং শ্রমিকরা যাতে কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা অর্জন করতে পারে এজন্য তাদেরকে পর্যাপ্ত সুযোগ প্রদান এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান আবশ্যক।

জ। নারীদের প্রতি সংবেদনশীল ন্যায্য রূপান্তর নীতি

ন্যায্য রূপান্তর নীতিতে নারী শ্রমিকদের চাহিদা ও চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নেওয়া। নারীদের প্রতি সংবেদনশীল ন্যায্য রূপান্তর নীতি নিশ্চিত করতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নারী শ্রমিকদের প্রতিবন্ধকতা এবং প্রয়োজনের বিষয়গুলি বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং পুনর্বাসন কর্মসূচি গ্রহণ করা। এ বিষয়ে সামাজিক সংলাপ, যৌথ দরকষাকষি বা শিল্প সম্পর্কিত যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা। রূপান্তর প্রক্রিয়া কোনোভাবেই নারী শ্রমিকদের কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য যাতে নষ্ট না করে তা নিশ্চিত করা।

ঝ। আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডসমূহ এবং ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব

- আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডসমূহ এবং ক্রেতাগণ রপ্তানিমুখি শিল্পে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ন্যায্য রূপান্তর নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগকে সর্বাত্মকভাবে এবং সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানাবে। বিশেষ করে মিটিগেশন এবং অভিযোজন পরিকল্পনায় মানবাধিকার এবং পরিবেশগত ডিউ ডিলিজেন্সের বিষয়সমূহ প্রধান্য দিয়ে শ্রমিকের অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত সক্রিয় ভূমিকা রাখার রূপরেখা তৈরি করা।
- ব্র্যান্ডসমূহ, প্রধান রপ্তানি গন্তব্যের দেশসমূহ ও অঞ্চলসমূহ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি যারা রপ্তানিমুখি শিল্পে টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়া উৎসাহিত করে তাদের উচিত হবে দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক আচরণের অংশ হিসেবে রূপান্তরকালীন সময়ের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প প্রণয়নে কারিগরি ও আর্থিকভাবে ভূমিকা রাখা।

ঞ। সবুজ রূপান্তর নির্দেশিকা

- বাংলাদেশের যে কোনো খাতে পরিবেশ বান্ধব শিল্প বা সবুজ রূপান্তর বা অর্থনৈতিক মান উন্নয়নের মতো যে কোনো পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় তা প্রযুক্তিগত অভিযোজন হোক বা ডিজিটালাইজেশন হোক বা অটোমেশন হোক বা রোবটের ব্যবহার বিষয়ে হোক — তা যাতে ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক হয় এজন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক রূপান্তর কাঠামো তৈরি এবং ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি মেনে ন্যায় বিচারকে অবশ্যই জলবায়ু সংকট মোকাবেলার যে কোনো উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। এই চুক্তির প্রস্তাবনায় বলা আছে যে, "কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য রূপান্তরের অন্যতম উপাদান হবে শোভন কাজ এবং মানসম্মত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।"
- ন্যায্য রূপান্তর বিষয়ক যে কোনো নীতি বা কাঠামো প্রণয়ন এবং অনুশীলনে ডিসেন্ট ওয়ার্ক এজেন্ডার চারটি মূল স্তম্ভকে অনুসরণ করা: কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, কর্মের অধিকার এবং সামাজিক সংলাপ।
- শিল্পের সবুজায়ন প্রক্রিয়ায় বাধাহীনভাবে সংগঠন করার এবং সংগঠিত করার অধিকার (কনভেনশন নং ৮৭) এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকারে'র (কনভেনশন নং ৯৮) অবাধ অনুশীলনকে সম্মান, সুরক্ষা এবং সমুন্নত রাখা। শিল্পে ন্যায্য রূপান্তরসহ যে কোনো রূপান্তর প্রক্রিয়ায় শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক সংলাপ, কার্যকর অংশীদারিত্ব এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- সবুজ রূপান্তর বা প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রতিটি উদ্যোগ অবশ্যই পূর্বপরিকল্পিত হতে হবে এবং চাকরি নিরাপত্তার বিষয়টিকে যে কোনো শিল্পের ন্যায্য রূপান্তর বিষয়ক যাবতীয় নীতি এবং কার্যক্রমের কেন্দ্রে স্থান দেওয়া। পর্যাপ্ত নীতি এবং ব্যবস্থা প্রণয়ন করে রূপান্তরকালীন সময়ে চাকরির সম্পূর্ণ সুরক্ষা নিশ্চিত করা যাতে করে রূপান্তর

প্রক্রিয়ায় কর্মহীনতা বা বেকারত্ব তৈরি না হয়। রূপান্তরকালীন সময়ে এবং পরবর্তী কালে শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

- সবুজ কারখানার সার্টিফিকেশনের মূল্যায়ন মাত্র অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও পরিবেশবান্ধব নকশার ওপর সীমাবদ্ধ না রেখে কারখানাগুলির জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও নির্দেশিকার আইনি পরিপালনকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। শ্রমিকদের জীবনকে সবুজ না করে কোনো কারখানাকে সবুজ বলা যায় না। কারণ শ্রমিকরাই উৎপাদনের মূল চালিকাশক্তি। তাই কোনো কারখানাকে সবুজ কারখানা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কারখানার মানবাধিকার ও শ্রমমানের অবস্থা, সবুজায়নের ফলে শ্রমিকদের ওপর প্রভাব এবং পরিবেশগত দিকসমূহ খতিয়ে দেখতে হবে।

৫.৩ বাণিজ্য, বিনিয়োগ, সরকারি ক্রয় ক্ষেত্রে সামাজিক চুক্তি

ক। সামাজিক শর্ত (Social Clause) এমন একটি নীতি যা ব্যবসায় মানবাধিকার, শ্রমিকের অধিকার এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে ব্যবহৃত হয়। ব্যবসায় সামাজিক শর্ত হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার ও শ্রমিক অধিকার বিশেষ করে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, আইএলও কোর কনভেনশন এবং পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক ন্যায্য রূপান্তরের শর্তসমূহ বাধ্যতামূলক মেনে চলার নীতি বা শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে। আইএলও কোর কনভেনশন অনুসারে মৌলিক শ্রমিক অধিকারের পাশাপাশি, সুনির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ন্যায্য মজুরি ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার এবং বিশেষ করে পরিবেশ সুরক্ষা বিষয়ক ন্যায্য রূপান্তরের নীতিসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলার বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড প্রণয়ন করা।

খ। সরকারি ক্রয় ও বিনিয়োগ নীতিতে সামাজিক শর্ত সংযোজন: সকল ধরনের সরকারি প্রকল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন ও সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমে (Public Procurement) ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড বাধ্যতামূলক মেনে চলার নীতি বা শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা। শুধুমাত্র সেইসব কোম্পানিকে সরকারি টেন্ডার বা প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যারা শ্রম আইন, মানবাধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষা নীতি মেনে চলে।

গ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তিতে সামাজিক শর্ত সংযুক্ত করা: বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করা যাতে শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘন না হয়। এ ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক হিউম্যান রাইটস ডিউ ডিলিজেন্স নির্দেশনা বা সংশ্লিষ্ট বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দেশভিত্তিক বাধ্যতামূলক আইন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রান্সপারেন্ট সাপ্লাই চেইন সংক্রান্ত আইন মেনে চলার শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা।

ঘ। ঋণের শর্ত হিসেবে সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড সংযুক্তি: ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যবসায়িক ঋণ প্রদান করার আগে ব্যবসায় সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড বাধ্যতামূলক মেনে চলার শর্ত আরোপ করতে পারে। এর ফলে এক দিকে যেমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি মানবাধিকার, শ্রমিক অধিকার ও পরিবেশ সুরক্ষায় সচেষ্ট থাকবে একই সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করবে। যেমন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিবেশ ও সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (ESRM) নির্দেশিকা ২০১৭ সালে চালু হয় এবং ২০২২ সালে হালনাগাদ করা হয়। এই নির্দেশিকার লক্ষ্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির ঋণ কার্যক্রমে পরিবেশ ও সামাজিক বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা, যা সামাজিক ধারা হিসেবেও কাজ করে। বিশ্বব্যাংক ও আইএফসি যে সব ব্যবসায় ঋণ দেয়, তাদের "Performance Standards on Environmental and Social Sustainability" মানতে হয়। সুতরাং ঋণের শর্ত হিসেবে শ্রমমান বা সামাজিক শর্ত নীতিমালা বা মানদণ্ড সংযুক্তি নতুন কোনো বিষয় নয়; বরং চলমান উদ্যোগগুলিকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্য করা এবং এর দৃশ্যমান বাস্তবায়নে কার্যকর পদ্ধতি প্রণয়ন করা।

ঙ। কোম্পানি নিবন্ধন/নিবন্ধন হালনাগাদ প্রক্রিয়ায় সামাজিক শর্ত আরোপ: সরকারের ব্যবসার নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সামাজিক শর্ত মানদণ্ড অন্তর্ভুক্ত করলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানিগুলি শ্রমিক অধিকার, মানবাধিকার ও টেকসই পরিবেশের বিধানগুলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। একই সাথে কোনো ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির সামাজিক শর্ত মেনে চলার বিষয়টি মূল্যায়নপূর্বক নিবন্ধন হালনাগাদ করার শর্ত আরোপ করা যেতে পারে। এর

ফলে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি ধারাবাহিকভাবে শ্রমিক অধিকার, মানবাধিকার ও টেকসই পরিবেশের বিধানগুলি মেনে চলতে সচেষ্ট থাকবে।

চ। কর ছাড় সুবিধায় সামাজিক শর্ত মানদণ্ড প্রয়োগ: বাংলাদেশ সরকারের কর ছাড় নীতিমালায় বিদ্যমান শর্তের পাশাপাশি সামাজিক শর্তসমূহ আরোপ করা যেতে যেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান না ব্যবসা চালু করণের পাশাপাশি শিল্পে বা ব্যবসায় সামাজিক শর্ত মানদণ্ড মেনে চলতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নও নিশ্চিত হবে যা টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। একই সাথে শতভাগ সামাজিক শর্ত মেনে চলা প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত কর ছাড় সুবিধাও প্রধান করা যেতে পারে।

ছ। সরকারি প্রণোদনা লাভে সামাজিক শর্ত পালন: সরকারি প্রণোদনা (Government Incentives) লাভে সামাজিক শর্ত আরোপ করার মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণ, পরিবেশ সুরক্ষা ও ন্যায়সঙ্গত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব। এই শর্তগুলি সরকারি প্রণোদনার সাথে সংযুক্ত করার ফলে প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং প্রযুক্তি ও উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নত করতে উৎসাহিত করা যাবে।

জ। বসতবাড়ি বা প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণ অনুমোদনে সামাজিক শর্ত: বসতবাড়ি বা প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় সরকার কাঠামো বা প্রশাসনের মাধ্যমে যে অনুমোদন প্রয়োজন হয় সেই নীতিমালায় সামজিক শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে। ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক যে ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ করা হোক না কেন সকল ক্ষেত্রে সামাজিক শর্ত মেনে চলার প্রচলন নিশ্চিত করতে পারলে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৬। বিশেষ শ্রম-জনগোষ্ঠীদের অধিকার ও কল্যাণে সংস্কার প্রস্তাবনা

৬.১ লিঙ্গ ও বয়সভিত্তিক ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন প্রান্তিক শ্রমগোষ্ঠী

৬.১.১ নারী শ্রমিক

নারীরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে, বিশেষত কর্মজগতে তাদের লিঙ্গভিত্তিক ও সামাজিক বৈষম্যের কারণে বিবিধ বাধার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণে, কর্মসংস্থানে এবং পদোন্নতির সুযোগে নারীর প্রবেশাধিকার সীমিত; একই কাজে পুরুষদের থেকে নারীরা কম বেতন পান; নারীর জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুরক্ষা এখনো অপর্যাপ্ত; যৌথ দর কষাকষি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় নারীর প্রতিনিধিত্ব কম; কর্মক্ষেত্রের ভেতরে বাইরে সর্বত্র নারীরা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানির শিকার হন; নারীবান্ধব অবকাঠামোর অভাব, নিরাপত্তা ও কল্যাণ বিধানের ঘাটতি এবং নারীর ঘরে-বাইরের কাজের চাপ তাদের জীবনের নিয়মিত বাস্তবতা। এসকল বাধা এবং সংকট নারীকে ক্রমাগত প্রান্তিক করে, যার ফলে কর্মে নিয়োজিত নারীদের ঝুঁকিপূর্ণ ও স্বল্প বেতনের কাজে অংশগ্রহণের হার বেড়েছে। বিশেষত শহরাঞ্চলে অনিয়মিত কাঠামোর অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে এবং অবৈতনিক পরিচর্যা ও গৃহকর্মে লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী কর্মজগতে প্রান্তিক থেকে প্রান্তিকতর অবস্থায় টিকে থাকার লড়াই করছেন।

বাংলাদেশের সমাজে প্রচলিত পিতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ও সামাজিক প্রত্যাশার দরুন নারীর বিচরণ ও কাজের স্বাধীনতা সীমিত হচ্ছে। ফলে পুরুষের তুলনায় অর্থনৈতিক সুযোগের প্রতিবন্ধকতা নারীকে বেশি পোহাতে হয়। এই বাস্তবতার আলোকে বৈষম্য দূর করা, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবিকা নিশ্চিত করা এবং ন্যায্য ও বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশে নাগরিক হিসেবে নারী শ্রমিকদের পূর্ণ অংশগ্রহণের স্বাধীনতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্ন-লিখিত প্রস্তাব করছে।

প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী

বাংলাদেশে নারীর নেতৃত্ব, প্রতিনিধিত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক ভূমিকা এখনও সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কাঠামোগত বাধার কারণে সীমিত। নারীর অগ্রগতি ও কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায় হলো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা প্রথাগত লিঙ্গভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে পিতৃতন্ত্রকে শক্তিশালী করে এবং নারীর প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা বৃদ্ধি করে, যা অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণে নারীর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, সামাজিক অপমানের ভয়, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং সহায়তা নেটওয়ার্কের অভাব নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সরকারি-বেসরকারি খাতে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।[118] রপ্তানিমুখি পোশাক খাতের মতো ক্ষেত্রে বিপুলসংখ্যক নারী কাজ করলেও ব্যবস্থাপনায় পুরুষের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায় এবং উচ্চপর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ খুবই কম।[119] সরকারি চাকরিতে নারী কর্মকর্তার সংখ্যা মাত্র ২৯.৩ শতাংশ।[120]

দেশের সংবিধান জনজীবনে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার করলেও নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সমতা না থাকলে নারীর অধিকার অর্জন সহজ হবে না। নারীর ক্ষমতায়নের জন্য শক্তিশালী আইন প্রণয়ন এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) ৫ নারীর ক্ষমতায়নের ওপর জোর দেয় এবং বাংলাদেশ বেইজিং ঘোষণা (Beijing Declaration and Platform for Action, 1995) এবং CEDAW-এর মতো আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে লিঙ্গসমতা অর্জনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণতান্ত্রিক সমাজে জনসংখ্যার প্রতিটি অংশের সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা জরুরি। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণ সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করে এবং সমাজের জন্য আরও কার্যকর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিনির্ধারণে সহায়তা করে।

---

[118] Moyeen, Sabah et al. (2022).

[119] Macchiavello, Rocco, Menzel, Andreas, Rabbani, Atonu & Woodruf, Christopher. (2020). Challenges of Change: An Experiment Promoting Women to Managerial Roles in the Bangladeshi Garment Sector; Chaumtoli Huq (2019) "Women's Empowerment" in the Bangladesh Garment Industry through Labor Organizing.

[120] The Financial Express. (July 8, 2023). Number of women joining government jobs increasing gradually.

নারী শ্রমিকের প্রতিনিধিত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা নিশ্চিত করবার জন্য শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) কর্মক্ষেত্রে এবং কর্মক্ষেত্রের বাইরে সামাজিক সংলাপ, যৌথ দরকষাকষি বা শিল্প সম্পর্কিত যে কোনো শ্রমিক প্রতিনিধিত্বমূলক কাঠামোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ন্যায্যতার ভিত্তিতে নারীর আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

খ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের সকল পর্যায়ের কমিটিতে আনুপাতিক হারে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা।

গ) যৌথ দরকষাকষি ও দাবিনামার সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় নারী নেতৃবৃন্দের মতামত ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দেয়া।

ঘ) ফেডারেশনগুলির মধ্যে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে নারী নেতৃত্ব সহ কার্যকর হয়রানি-বিরোধী কমিটি গঠন করা।

ঙ) নারী নেতৃত্বের বিকাশে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও নারীর অংশগ্রহণ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা। সরকারের শিল্প সম্পর্ক ইনস্টিটিউটের পাঠ্যক্রমে নারী নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা।

চ) অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীর জন্য গৃহীত সরকারি বিভিন্ন স্কিম ও প্রণোদনা বণ্টন প্রক্রিয়ায় নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

নারীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণ

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর ৮৯-৯৯ ধারা এবং বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এর সম্পর্কিত নির্দেশিকাগুলির আওতায় বিভিন্ন কল্যাণ সুবিধার বিধান রয়েছে, যা নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এর মধ্যে কর্মস্থলে দিবাযত্ন কেন্দ্রের ব্যবস্থা এবং নির্ধারিত স্তন্যপান কক্ষ, নারী পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট, প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা এবং নারী এমবিবিএস ডাক্তার ও প্রশিক্ষিত চিকিৎসা কর্মী বিশেষ করে ৫,০০০-এর বেশি শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হলে সেখানে গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।[121] তবে এই বিধানগুলির কার্যকর বাস্তবায়ন ও তদারকি অত্যন্ত দুর্বল,[122] যা বিশেষ করে রপ্তানিমুখি পোশাক শিল্পের বাইরের কর্মস্থলগুলিতে প্রকট এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

সন্তান লালনপালনে যেহেতু সমাজে নারীদের প্রাথমিক যত্নদাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, ফলে দিবাযত্ন কেন্দ্রের অপ্রতুলতা নারীদের শ্রমবাজারে অংশগ্রহণে উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ০-৬ বছরের শিশুদের মায়েরা, কর্ম জীবনের পাশাপাশি গৃহস্থালি দায়িত্ব এবং বয়স্ক ও শিশুর পরিচর্যায় দ্বিগুণ চাপে (double burden) থাকেন। উপরন্তু ৭ থেকে ১৪ বছরের শিশু এবং কিশোরদের জন্য নিরাপদে স্কুলে যাওয়া এবং স্কুল থেকে নিরাপদ অবস্থানে ফিরে আসার কোনো উদ্যোগ বা অবকাঠামো না থাকায় কর্মজীবী মায়েরা আশঙ্কার মধ্যে থাকেন। নিম্নআয়ের পরিবার ও শহরে বসবাসকারী কর্মজীবী নারীরা আরও বেশি সমস্যার মুখোমুখি হন। যেমন দিবাযত্ন কেন্দ্রের খরচ বহন করার সামর্থ্য না থাকার কারণে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন[123] এবং গৃহস্থালি দায়িত্ব একসঙ্গে সামলাতে গিয়ে চরম কষ্টের মধ্যে পড়েন, যা তাদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা এবং সন্তানের ভবিষ্যতের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।[124] শিশু সেবাযত্নের সীমিত সুযোগ নারীদের উচ্চ বেতনের চাকরি অনুসন্ধানের ক্ষমতাকেও সংকুচিত করে।

---

[121] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (ধারা ৮৯-৯৯); বাংলাদেশ শ্রম বিধি ২০১৫, (৭৭, ৭৮, ৮৬, ৯৪, ৯৫)

[122] Akhter, S., Rutherford, S. & Chu, C. (2019) Exploring the system capacity to meet occupational health and safety needs: the case of the ready-made garment industry in Bangladesh; Syed, R.F., Mahmud, K.T. & Karim, R. (2024) Do Labour Welfare Policies Matter for Workers? Evidence from the Garment Supply Chain Industry in Bangladesh; Elsey, H., Fieroze, F., Shawon, R.A. et al. (2020) Understanding demand for, and feasibility of, centre-based child-care for poor urban households: a mixed methods study in Dhaka, Bangladesh.

[123] Elsey, H. et al. (2020)

[124] Taş, E. O. & Ahmed, T. (2024). Women's Economic Participation, Time Use, and Access to Childcare in Urban Bangladesh; Kabeer, Huq & Rahaman . (2021). Kotikula, Aphichoke, Hill, Ruth, Raza, Wameq A.

বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৩টি সরকার পরিচালিত কমিউনিটি-ভিত্তিক দিবাযত্ন কেন্দ্র, ১০০টির বেশি বেসরকারি কেন্দ্র এবং এনজিও পরিচালিত কিছু কমিউনিটি-ভিত্তিক কেন্দ্র রয়েছে।[125] তবে বেশিরভাগ বেসরকারি দিবাযত্ন কেন্দ্র নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য অত্যন্ত ব্যয়বহুল। পাশাপাশি পর্যাপ্ত কেন্দ্রের অভাব, প্রশিক্ষিত যত্নকর্মীর সংকট, নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ এবং দিবাযত্ন কেন্দ্রে শিশু লালনপালন বিষয়ে প্রচলিত নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে এই সেবার গ্রহণযোগ্যতা ও কার্যকর বাস্তবায়ন সীমিত হয়ে পড়েছে।[126] কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা ও নিরাপত্তা সুবিধা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। যেমন; নারীদের নিরাপত্তা, সুস্থতা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য নারীদের জন্য পৃথক ও পর্যাপ্ত সংখ্যক টয়লেট, মাসিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE), মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসুবিধা এবং প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা। কিন্তু কর্মক্ষেত্রসমূহে নারীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থার ঘাটতি রয়েছে।

নারীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) সকল কর্মক্ষেত্রে ব্রেস্টফিডিং কর্নারের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

খ) কর্মঘন এলাকায় কমিউনিটি-ভিত্তিক, স্বল্পমূল্যে ও ভর্তুকির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাবারের ক্যান্টিন এবং লন্ড্রি ও কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ) শ্রমঘন এলাকায় এবং কর্মক্ষেত্রে কার্যকর ও বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে দিবাযত্ন কেন্দ্র এবং ১৪ বছর পর্যন্ত শিশু/কিশোরদের জন্য নিরাপদ অবস্থান ব্যবস্থা চালুর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই সুবিধাগুলির ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও কর্মক্ষেত্র-ভিত্তিক প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ) নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিবাযত্ন কেন্দ্র ও শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়নে 'ডিআইএফই'র পরিদর্শকদের সম্পৃক্ত করা।

ঙ) কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সংখ্যানুপাতে পৃথক ও স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগারের ব্যবস্থা করা। প্রতিটি শৌচাগারে ঢাকনাযুক্ত আবর্জনার ঝুড়ি ও ধৌতকরণের পৃথক জায়গা রাখা।

চ) কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের মাসিককালীন জরুরি প্রয়োজন মেটাতে স্যানিটারি ন্যাপকিন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা।

ছ) কর্মক্ষেত্রে স্থাপিত স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে নারী ডাক্তার ও নার্সের পাশাপাশি নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

জ) নারী শ্রমিকদের জন্য নারীবান্ধব অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিরাপত্তা কমিটির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি এই কমিটিতে নারীদের সমানুপাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ঝ) রাত্রিকালীন কাজে নারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের লিখিত সম্মতি গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা এবং নারীদের রাতে নিরাপদে বাড়ি ফেরার জন্য কর্মস্থল থেকে পরিবহণ সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঞ) দেশের জেলা শহরসমূহে সরকারিভাবে কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করা এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামে নিম্ন আয়ের নারী শ্রমিকের জন্য আবাসিক কলোনি স্থাপন করা।

ট) নারীদের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকার কর্মজীবী নারীদের ভিন্ন চাহিদা বিবেচনায় রেখে মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি নারীবান্ধব নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এ লক্ষ্যে নারী-বান্ধব পরিবহণ, পর্যাপ্ত আলোযুক্ত স্টপেজ স্থাপন এবং মনিটরিং ব্যবস্থা কার্যকর করা।

কাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য রক্ষা

কলকারখানা সহ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে জীবিকা নির্বাহের কাজের পাশাপাশি সমাজ নারীর কাঁধে ঘর-গেরস্থালী ও শিশু লালন পালনের সামাজিক কাজ চাপিয়ে দেয়। ফলে ঘর ও বাইরের দ্বৈত কাজের বোঝা থেকে রক্ষা

(2019). What works for working women? Understanding female labor force participation in urban Bangladesh.

[125] ILO (2024) Government of Bangladesh launch Roadmap for Childcare in Bangladesh.

[126] Taş, E. O., & Ahmed, T. (2024); Elsey, H. et al. (2020); Zhang, J. et al. (2020) What drives parents to consider center-based child care for their children? The case of Bangladesh; Rahman, Tashmina; Arnold, Tamara; Shams, Farzana & Rahman, Mokhlesur (2022) Raising the Quality of Child Caregiving in Bangladesh.

পাওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে নারীর জন্য শোভন পরিবেশ, নির্ধারিত কর্মঘণ্টা এবং শ্রম আইন অনুযায়ী ছুটি বা অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার বিধানগুলি যথাযথ ভাবে পালন করা হয় না। বাংলাদেশে কর্মরত অধিকাংশ নারী অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে নিয়োজিত। এই খাতে শ্রম আইন কার্যকর না হওয়ায় অনেক নারীকে আট ঘণ্টার বেশি সময় কাজ করতে হয়। অন্যদিকে অনেক প্রাতিষ্ঠানিক খাতেও শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মঘণ্টা যথাযথভাবে মেনে চলে হয় না এবং অনেক ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের অতিরিক্ত সময় এবং রাতের শিফটে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে গৃহস্থালির কাজ, শিশু পালন, বয়স্ক ও অসুস্থদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব প্রধানত নারীদের ওপর অর্পিত হয়, যা কেবল তাদের পেশাগত দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতাকে ব্যাহত করে না, বরং তাদের উপর চাপায় দ্বৈত বোঝা। ফলে নাগরিক হিসাবে কিংবা দক্ষ শ্রমিক হিসাবে ভূমিকা রাখা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নেতৃত্বে নারীর অংশগ্রহণ কঠিন করে তোলে।[127]

বাংলাদেশে একটি সুগঠিত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কেয়ার ইকোনমি এবং কেয়ার সেক্টরের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না থাকার কারণে নারীরা নিজেদের ওপর থাকা অবৈতনিক কাজের চাপ কমাতে পারছে না। শ্রমঘন এলাকাগুলিতে কমিউনিটি-ভিত্তিক চাইল্ড কেয়ার, ওল্ড এজ হোম, হাসপাতাল, স্বল্পমূল্যের খাবারের ক্যান্টিন বা কাপড় ধোয়ার সুবিধা না থাকার অসম প্রভাব নারীদের উপরেই পড়ছে। এছাড়া নারীরা অবৈতনিক পারিবারিক পরিচর্যার অংশ হিসেবে নিজের, শিশুর এবং বাড়ির বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত থাকে। যদি একটি সংগঠিত, ব্যয়-সাশ্রয়ী এবং কমিউনিটি-ভিত্তিক যত্নব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়, তবে পরিবারগুলি দক্ষ ও প্রশিক্ষিত পরিচর্যাকারীদের (caregivers) কাছ থেকে এই ধরনের সেবা গ্রহণ করতে পারবে। এর ফলে নারীদের অবৈতনিক শ্রমের পরিমাণ হ্রাস পাবে এবং তারা কর্মসংস্থানের অন্যান্য সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে।

নারী শ্রমিকদের দ্বৈত কাজের বোঝা থেকে রক্ষায় শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিকদের জন্য বিরতি ব্যতীত সর্বোচ্চ আট ঘণ্টার কর্মদিবস এবং সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটি সহ অন্যান্য ছুটি যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা এবং এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের (DIFE) মাধ্যমে তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করা। মাতৃত্বকালীন ছুটির পর পুনরায় কাজে যোগদানের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের জন্য ছয় মাসের নমনীয় কর্মঘণ্টা প্রবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা করা।

খ) প্রাতিষ্ঠনিক শ্রমিকদের জন্য প্রতিষ্ঠান-কারখানায় ডে কেয়ার ও কর্মঘন এলাকায় কমিউনিটিভিত্তিক ডেকেয়ার, স্বল্পমূল্যে ও ভর্তুকির মাধ্যমে স্বাস্থ্যকর খাবারের ক্যান্টিন এবং লন্ড্রি ও কাপড় ধোয়ার ব্যবস্থা স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

গ) কর্মঘন এলাকায় কমিউনিটিভিত্তিক সান্ধ্যকালীন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

ঘ) শ্রমিক এলাকায় শিশুদের সরকারি স্কুল , বিনোদনের স্থান এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষা স্কুল গঠনে সরকারের ভূমিকা নেয়া।

ঙ) আইএলও কনভেনশন ১৫৬ (C156 - Workers with Family Responsibilities Convention, 1981) অনুযায়ী শ্রম আইনে সংশোধনী আনার বিষয়ে নীতিগত পদক্ষেপ নেয়া।

নারী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন

নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পথে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো উচ্চশিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ কোর্সে তাদের কম অংশগ্রহণ, যা দক্ষতা উন্নয়নে বড় বাধা সৃষ্টি করছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, স্বয়ংক্রিয়তা ও জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক নারী চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছেন। অথচ এই ঝুঁকি মোকাবিলায়

[127] Time Use Survey ২০২১- প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে অবৈতনিক সেবা ও গৃহস্থালি শ্রমের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট বৈষম্য বিদ্যমান—পরিচর্যা ও গৃহস্থালির কাজে নারীরা ৫.৯ ঘণ্টা এবং পুরুষরা ০.৮ ঘণ্টা ব্যয় করেন। অর্থাৎ নারীরা পুরুষদের তুলনায় প্রায় ৭.৩ গুণ বেশি সময় ব্যয় করেন। অন্যদিকে, পুরুষরা ৬.১ ঘণ্টা সময় বৈতনিক কাজের জন্য ব্যয় করেন, যেখানে নারীরা মাত্র ১.২ ঘণ্টা সময় বৈতনিক কাজের জন্য ব্যয় করেন। এক্ষেত্রে পুরুষের নারীদের তুলনায় বৈতনিক কাজে অংশগ্রহণ ৫ গুণ বেশি। BBS & UN Women Bangladesh (2022) Time Use Survey 2021

দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনঃদক্ষতা অর্জনের উদ্যোগ পর্যাপ্ত নয়। পাশাপাশি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য ও চাকরির বিজ্ঞপ্তি নারীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য কোনো কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্মের অনুপস্থিতি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ফলে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন চাকরিতে নারীদের অংশগ্রহণ হ্রাস পাচ্ছে, যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়নে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

যদিও নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, সামাজিক প্রত্যাশার ফলে পরিবারগুলি উচ্চশিক্ষায় তাদের কম বিনিয়োগ করে, যা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেয়েদের পিছিয়ে পড়ার অন্যতম কারণ এবং তাদের পেশাগত সম্ভাবনা সীমিত করে। ১৫-২৪ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে মাত্র ২ শতাংশ মৌলিক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT) দক্ষতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, কারিগরি শিক্ষা এবং পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের অংশগ্রহণ ছেলেদের তুলনায় যথেষ্ট কম। বাংলাদেশের কারিগরি শিক্ষায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা মাত্র ২৯ শতাংশ, যা এখনও পুরুষদের তুলনায় অনেক কম। যদিও দেশের সকল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে নারীদের জন্য ২০ শতাংশ কোটা সংরক্ষিত রয়েছে, তারপরও নারী-পুরুষের সমানুপাতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।[128] দেখা গেছে, প্রশিক্ষণ সুবিধাগুলি সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ না থাকা, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নারীদের জন্য নিরাপদ হোস্টেল ও যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবে নারীরা এইসব প্রশিক্ষণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে বেশিরভাগ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান জেলা ও উপজেলা শহরে অবস্থিত হওয়ায় গ্রামে বসবাসকারী নারীদের পক্ষে এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রভাব বিভিন্ন খাতে প্রতিফলিত হচ্ছে, যেখানে স্বয়ংক্রিয়তা (Automation), উন্নত প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ব্যবহার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আগামী কয়েক দশকে প্রস্তুত তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল, কৃষি-খাদ্য, আসবাবপত্র, পর্যটন ও আতিথেয়তা এবং চামড়া ও ফুটওয়্যার খাতের প্রায় ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান উচ্চ মাত্রার স্বয়ংক্রিয়করণের ঝুঁকিতে রয়েছে। এর প্রভাব ইতোমধ্যে পোশাক শিল্পের মতো খাতে দৃশ্যমান, যেখানে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।[129] অটোমেশনজনিত পরিবর্তনের ফলে যেসব নারীপ্রধান খাত সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে, তা নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এখনো পর্যন্ত কার্যকর কোনো পূর্বাভাসমূলক উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এখনও সঠিক সেক্টর ম্যাপিং বা পুনঃদক্ষতা (Reskilling) ও দক্ষতা উন্নয়ন (Upskilling) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি, যা একদিকে যেমন নারীর কর্মসংস্থান হারানোর ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলছে অন্যদিকে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সীমিত করছে।

নারী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়নে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) প্রস্তাবিত তথ্য ভান্ডারে বাংলাদেশের সকল কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা এবং এই তথ্যভাণ্ডার সম্পর্কে নারী শ্রমিকদের অবহিত করার জন্য কার্যকর প্রচারণা চালানো।

খ) নারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং কার্যকর যোগাযোগ, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, নেতৃত্ব ও পরিচালনার মতো সামাজিক দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) বিকল্প কর্মসংস্থান যেমন কেয়ার সেক্টর, গিগ ইকোনোমি, প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা খাত ও ফ্রিলান্সিংয়ে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা এবং সেন্টারগুলিতে নারীদের জন্য পৃথক ও নিরাপদ হোস্টেল সুবিধা নিশ্চিত করা।

ঙ) বিদেশে কর্মসংস্থানের চাহিদাসম্পন্ন সেক্টর (যেমন কেয়ারগিভার, নার্সিং) এর উপর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রযুক্তি, প্রকৌশল, ড্রাইভিং ও ব্যবস্থাপনার মতো পুরুষ-প্রধান দক্ষতাভিত্তিক খাতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

জ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থা গড়ে তুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীদের সরাসরি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। পাশাপাশি চাকরির সুযোগ তৈরির জন্য নিয়োগ অভিযান, চাকরি মেলা আয়োজন এবং নারীদের অংশগ্রহণ কম এমন খাতগুলিতে তাদের অন্তর্ভুক্ত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

---

[128] Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS),(2023), Bangladesh Education statistics

[129] Ahmed, Asif Uddin & Zaman, Asad Uz (2022) Future Skills: Finding Emerging Skills to Tackle the Challenges of Automation in Bangladesh; The Daily Star (December 9, 2023) Female workforce in garment industry slips to 53%.

ঝ) STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) বিষয়ে নারীদের উৎসাহিত করতে জেন্ডার সংবেদনশীল জাতীয় প্রোগ্রাম, বিশেষ স্কলারশিপ, পেশাদারী প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষানবিস সুযোগ প্রদান করা। স্কুলে ছাত্রীদের STEM-এ উৎসাহিত করতে, বর্তমানে সফল STEM-এ নিয়োজিত নারীদের ইতিবাচক উদাহরণ তুলে ধরা এবং মেন্টরশিপের ব্যবস্থা করা।

ঞ) চলমান জাতীয় চাকরি বাতায়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করার পাশাপাশি নারীদের এটি ব্যবহারে উৎসাহিত করতে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।

৬.১.২ তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া জনগোষ্ঠী

হিজড়া জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাদের জীবনধারা এবং সামাজিক পরিচয়ে এক ধরনের ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে দেশে মোট হিজড়া জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২৬২৯ জন,[130] যাদেরকে স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থানসহ সমাজের সকল ক্ষেত্রে অবহেলা, বৈষম্য এবং নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। ২০১৪ সালে ২২ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকার হিজড়া জনগোষ্ঠীকে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে যা তাদের জন্য বিশেষ কিছু অধিকার যেমন ভোটাধিকার, স্বাস্থ্যসেবা এবং সরকারি চাকরিতে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।[131] তবে এর বাস্তবায়ন তেমন কার্যকরী হয়নি। এখনও তারা কর্মক্ষেত্র, শিক্ষা এবং অন্য সামাজিক ক্ষেত্রে সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং সমাজে তাদের অবস্থান ও মর্যাদার উন্নতি ঘটেনি। এই কমিশন মনে করে যে তৃতীয় লিঙ্গ/হিজড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে এদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো সহ সমন্বিত সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন যাতে তারা মানবাধিকার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন এবং কর্মসংস্থানে সমান সুযোগ পেতে পারে এবং সমাজের অন্য সকলের ন্যায় সুস্থ-স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারেন। এ প্রেক্ষিতে এই কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) দেশের তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে যে কোনও উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে তাঁদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা ও পরিচয়পত্র প্রদান করা।

খ) যথাযথ দক্ষতা উন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া এ জনগোষ্ঠীকে মূলধারার কর্মসংস্থানে অন্তর্ভুক্তি ও জীবনমান উন্নয়নে সঠিক উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা এবং যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে তাদের মতামত এবং অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

গ) হিজড়া জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে তাদের জন্য সরকারের গৃহীত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিসর বৃদ্ধি করা।

ঘ) তাদের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন যেখানে তাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা বিনোদনের সুব্যবস্থা থাকবে।

৬.১.৩ যুব শ্রম জনগোষ্ঠী

যুব জনগোষ্ঠী যে কোনো দেশের সম্পদ, দেশের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। তবে এই যুবদের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি বিভিন্ন তথ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২-এ ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের যুব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে; জাতীয় যুবনীতি ২০১৭-এ ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের যুব বলা হয়েছে; অন্যদিকে শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২-এ ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের যুব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। শ্রমশক্তি জরিপের সংজ্ঞা বিবেচনা করলে, দেশে বর্তমানে যুব (১৫-২৯ বয়সী) জনগোষ্ঠী রয়েছে প্রায় ৪৬ মিলিয়ন যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ।[132] এর মধ্যে একটি বড় অংশ (৩৪.২৬%) NEET জনগোষ্ঠী যারা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, কোনো কাজে বা

---

[130] Population and Housing Census 2022, Preliminary Report, Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Information Division Ministry of Planning, Government of the Peoples Republic of Bangladesh, 2022, 2023-09-27-09-50-a3672cdf61961a45347ab8660a3109b6.pdf

[131] হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, সমাজ সেবা অধিদপ্তর, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। https://dss.gov.bd/site/page/e3108b96-8e64-4fb4-be8e- / হিজড়া-জনগোষ্ঠীর-উন্নয়ন

[132] জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ২০২৩।

কোনো প্রশিক্ষণে সম্পৃক্ত নেই।[133] অন্যদিকে শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে, দেশের শ্রম শক্তিতে যুব জনগোষ্ঠী রয়েছে ২৬.৮২ মিলিয়ন (পুরুষ ১৩.৬ মিলিয়ন এবং নারী ১৩.২ মিলিয়ন) যা মোট শ্রম জনগোষ্ঠীর ৩৬.৭ শতাংশ।[134] মোট যুব শ্রম জনগোষ্ঠীর মধ্যে কর্মে নিয়োজিত আছেন ২৪.৭ মিলিয়ন (৯২ শতাংশ), যার মধ্যে পুরুষ ১২.২ মিলিয়ন ও নারী ১২.৫ মিলিয়ন এবং প্রাক্কলিত বেকার হল ২.১৫ মিলিয়ন (৮ শতাংশ)। বর্তমানে দেশে শিক্ষিত বেকারত্বের হার অনেক বেশি (৪৭ শতাংশ)। এর অন্যতম কারণ হল প্রয়োজনের তুলনায় কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা। প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ মানুষ দেশের শ্রমশক্তিতে যুক্ত হচ্ছে, কিন্তু সে তুলনায় নতুন কর্মসংস্থানের সংখ্যা সীমিত।

এই কমিশন মনে করে যে মানসম্মত শিক্ষার অভাব, শ্রম বাজারের চাহিদার সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয়হীনতা, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার ঘাটতি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের অভাবে দেশের সম্ভাবনাময় যুবজনগোষ্ঠী দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত হতে পারছে না এবং এর ফলে দেশ 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট'-এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই বিষয়ে কমিশন সুপারিশগুলি হলো:

ক) সরকারি বিভিন্ন দলিলে (যেমন শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২, জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ এবং জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২) যুবকদের সংজ্ঞায় বয়সের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভিন্নতা দূর করে যুবকদের একটি একক সংজ্ঞা (নির্ধারিত বয়স) প্রদান করা।

খ) শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে না থাকা তরুণদের জন্য (NEET) একটি লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষানবিস ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা। এই কর্মসূচি শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হবে, যাতে তরুণরা উচ্চ-বৃদ্ধি খাতগুলিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারে।

গ) যুবকদের STEM (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত) ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় প্রোগ্রাম চালুকরণ, যার মধ্যে স্কলারশিপ, পেশাদারি প্রশিক্ষণ এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। শিল্পখাতের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে STEM স্নাতকদের জন্য কর্মসংস্থান সুযোগ তৈরি এবং শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলি বর্তমান বাজারের চাহিদার সাথে মিলিয়ে নির্ধারণ করা।

ঘ) কর্মের গুরুত্ব এবং মর্যাদা সম্পর্কে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা। যেমন; পাঠ্যক্রমে কর্মনৈতিক (work ethics) নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করা, বিভিন্ন আয়ের শ্রেণির পেশাজীবীদের দিয়ে অতিথি বক্তৃতার আয়োজন, পিতামাতাদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতা শিশুদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে উৎসাহিত করা এবং শিক্ষার্থীদের পেশাজীবীদের সাথে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করে যুবদের গঠনমূলক কাজে যুক্ত করা।

ঙ) শিল্পের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি লক্ষ্যভিত্তিক শিক্ষানবিস ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা, যাতে তরুণরা উচ্চ-বৃদ্ধি খাতগুলিতে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারে।

---

https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2024-01-31-15-51-b53c55dd692233ae401ba013060b9cbb.pdf

[133] শুমারিকালে ১৫-২৫ বছর বয়সী জনসংখ্যার মধ্যে যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছিল না, কোনো কাজে নিয়োজিত ছিল না, কিংবা কোনো ধরনের প্রশিক্ষণেও সম্পৃক্ত ছিল না এমন জনগোষ্ঠীকে NEET জনগোষ্ঠী হিসেবে গণনা করা হয়।

[134] শ্রমশক্তি জরিপ ২০২২. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ২০২৩। https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/b343a8b4_956b_45ca_872f_4cf9b2f1a6e0/2023-10 25-07-38-4304abd7a3f3d8799fbcb59ff91007b1.pdf

৬.১.৪ প্রবীণ শ্রম জনগোষ্ঠী

জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ অনুসারে বর্তমানে দেশে প্রবীণ জনগোষ্ঠী[135] রয়েছে প্রায় ১ কোটি ৫৩ লক্ষ ২৭ হাজার,[136] যাদের ৩৬.৫৬ শতাংশ এখনো কোনো না কোনো উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত আছেন।[137] বর্তমানে সর**কারি** চাকরিতে অবসর গ্রহণের বয়স ৫৯ বছর। অন্যদিকে শ্রম আইন অনুযায়ী [ধারা ২৭ (১)] কোনো প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিকের অবসর গ্রহণের বয়স ৬০ বছর। অপরদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক, অস্থায়ী এবং স্বনিয়োজিত কাজে কর্মরত জনগোষ্ঠীর অবসরের কোনো বয়স সীমা নেই। দেশের লক্ষ লক্ষ প্রবীণ কৃষিকাজ, দিন মজুরি বা রিকশা চালানোর মত অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজে যুক্ত আছেন। যদিও বয়সজনিত শারীরিক সমস্যা, দুর্বলতার কারণে তাদের জন্য কাজ করা কঠিন। তবু প্রয়োজনের তাগিদে এখনও কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। দেশের বেশিরভাগ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য তেমন কোনো সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি প্রণীত সর্বজনীন পেনশন স্কিমে বর্তমানে যাদের বয়স ৬০ বছর বা তার বেশি তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং বর্তমানে যে ৬০০ টাকা হারে বয়স্ক ভাতা দেয়া হয় তার পরিমাণ এতই অল্প যে তা দিয়ে বাসস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবার খরচ তো দূরের কথা, একজনের খাদ্য চাহিদা মেটানোই সম্ভব না। কমিশন মনে করে যে, রাষ্ট্রকেই এই প্রবীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, বিনোদন এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) অপ্রাতিষ্ঠানিক, অস্থায়ী এবং স্বনিয়োজিত কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর অবসরের বয়স নির্ধারণ করে তাঁদের অবসরকালীন ভাতা বা সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আনা। এক্ষেত্রে অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণে 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা ২০১৩' বিবেচনায় নেয়া যেতে পারে। এ নীতিমালা অনুযায়ী ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

খ) কাজে নিয়োজিত নন এমন দরিদ্র প্রবীণ শ্রম জনগোষ্ঠীকে বয়স্ক ভাতার আওতায় নিয়ে আসা এবং তাদের দৈনন্দিন চাহিদা (খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা এবং অন্যান্য চাহিদা) বিবেচনায় বয়স্ক ভাতার পরিমাণ যৌক্তিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা। বর্তমানে বয়স্ক ভাতা প্রাপ্তির বয়সসীমা পুরুষদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৬৫ বছর এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ৬২ বছর নির্ধারণ করা আছে। যেহেতু জাতীয় প্রবীণ নীতিমালায় ৬০ বছর বয়সীদের প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, সেই দিক বিবেচনায় বয়স্ক ভাতায় অন্তর্ভুক্তির ন্যূনতম বয়স ৬০ বছর নির্ধারণ করা।

গ) অবসর পূর্ব মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা, যাতে অবসর পরবর্তী কালে প্রবীণদের সামাজিক সম্পৃক্ততা ও তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। এক্ষেত্রে অবসর জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যগত সামর্থ্য ও বয়স বিবেচনা করে স্ব স্ব গ্রাম ও শহর এলাকায় তাঁদের এমন কাজে যুক্ত করা বা উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা করা যাতে তাঁদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা নতুন প্রজন্মের সাথে বিনিময় ও স্থানান্তর করতে পারে। এ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবী ও উন্নয়ন সংস্থাসমূহের কার্যক্রম উৎসাহিত ও জোরদার করা। আগ্রহী প্রবীণ ব্যক্তির স্বকর্মসংস্থানের জন্য সহজ শর্তে সুদমুক্ত বা স্বল্পসুদে ঋণের ব্যবস্থা করা।

ঘ) প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্য বিমা প্রণয়ন করা বা সরকারি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বিনামূল্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা চালু করা। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রবীণ ব্যক্তিগণ যাতে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুত চিকিৎসা পেতে পারেন এজন্য পৃথক কাউন্টার ও ওয়ার্ড স্থাপন করা এবং তাঁদের চিকিৎসার সুবিধার্থে 'হেলথ সার্ভিস কার্ড' চালু করা।

---

[135] 'জাতীয় প্রবীণ নীতিমালা' ২০১৩ এ ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সী ব্যক্তিদের প্রবীণ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

[136] বিবিএস, জনশুমারি ও গৃহ গণনা ২০২২ প্রাথমিক প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা: ২০২২।

https://sid.portal.gov.bd/sites/default/files/files/sid.portal.gov.bd/publications/01ad1ffe_cfef_4811_af97_594b6c64d7c3/PHC_Preliminary_Report_(English)_August_2022.pdf

[137] বিবিএস, শ্রম শক্তি জরিপ ২০২২, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা: ২০২৩।

৬.১.৫ আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী

আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী মূলত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত এবং দেশের উন্নয়নের সামগ্রিক সুবিধা থেকে অনেকাংশেই বঞ্চিত।[138] বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৬ লক্ষ ৫০ হাজার আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর মানুষ (মোট জনসংখ্যার প্রায় ১ শতাংশ) বসবাস করে। এদের মধ্যে পুরুষ হল ৮ লক্ষ ২৪ হাজার ৭৫১ জন এবং নারী ৮ লক্ষ ২৫ হাজার ৪০৮ জন, যারা ৫০ বা তারও বেশি বিভিন্ন আদিবাসী ও উপজাতি জনগোষ্ঠী (ITPs) থেকে এসেছে।[139] এ সকল জনগোষ্ঠীর অধিকারের বিষয় কিছু রাষ্ট্রীয় নীতি কাঠামোয় প্রতিফলিত হলেও নীতিগত প্রতিশ্রুতিকে কার্যকর করার উদ্যোগ খুবই সীমিত। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত আদিবাসী ও উপজাতি বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুসমর্থন করেনি।

আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দক্ষতা উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ উভয় ক্ষেত্রেই তারা দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর তুলনায় পিছিয়ে আছে। যদিও বেশিরভাগ আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী (প্রায় ৭৫ %) কোনো না কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত আছেন তবে তাদের অংশগ্রহণ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বেশি (৮৯.৮৪%)[140] যেখানে মজুরি কম এবং কোনো সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। অপরদিকে যে পেশায়ই নিযুক্ত থাকুক না কেন, আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে বৈষম্যের সম্মুখীন হন এবং যা শুরু হয় কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে। কর্মক্ষেত্রে আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী কর্মীরা সবচেয়ে বেশি মজুরি বৈষম্যের সম্মুখীন হন। উদাহরণস্বরূপ মজুরির এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে একজন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কর্মীর গড় মাসিক মজুরি ২,১৫৯ টাকা যেখানে জাতীয় গ্রামীণ মজুরি ১০,৫৪৫ টাকা।[141] আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী শ্রমিকেরা তাদের প্রয়োজন মঅনুযায়ী উৎসব ছুটি ভোগ করতে পারেন না। শ্রম আইনে সকল শ্রমিকের জন্য মজুরি সহ ১১ দিন উৎসব ছুটির বিধান থাকলেও বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী শ্রমিকেরা সাংগ্রাই, বিজু ইত্যাদি বৃহৎ সামাজিক উৎসবে কোনো ছুটি পান না এবং এ ছুটি মূলত ঈদ-উল ফিতর ও ঈদ-উল আযহার সময় সমন্বয় করা হয়। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে দক্ষতার বিশেষ গুরুত্ব থাকলেও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী কর্মক্ষম জনসংখ্যার মাত্র ২.৬৪ শতাংশ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন, যার মধ্যে ২.৭৯ শতাংশ পুরুষ এবং ২.৫ শতাংশ মহিলা।[142] যে কারণে আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগণ কম মজুরিতে অদক্ষ কাজে শ্রম দিতে বাধ্য হন। বর্তমানে সরকারের প্রায় ১৪০টি (২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে এর মধ্যে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী/আদিবাসীর জন্য কোনো সুরক্ষা কর্মসূচি নেই।[143]

আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও ন্যায্য অধিকার সুরক্ষায় কমিশনের প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপ:

ক) আদিবাসী ও উপজাতি বিষয়ক আইএলও কনভেনশন নং ১৬৯ অনুসমর্থন করা এবং আইন মন্ত্রণালয়ে বিবেচনাধীন বৈষম্য বিলোপ আইন চূড়ান্ত করে এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

খ) আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার শ্রমিক সহ সকল সম্প্রদায়ের শ্রমিকেরা যাতে তাদের বৃহৎ উৎসবের সময় ছুটি ভোগ করতে পারেন, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা শ্রম আইন ও বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

গ) জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদানে তাদের ভোগকৃত ভূমি দখল বন্ধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারি উদ্যোগে তাদেরকে উপযুক্ত পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের জন্য

---

[138] Kazi Ali Toufique et al., Baseline Assessment of Skills and Employment of Indigenous and Tribal Peoples in Bangladesh, BIDS and ILO, Dhaka: 2017.Retrieved from: https://www.ilo.org/publications/baseline-assessment-skills-and-employment-indigenous-and-tribal-peoples

[139] GoB, *Census & Household Survey 2022: Primary Report*, Bangladesh Bureau of Statistics, Department of Census & Information Management, Ministry o Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh (www.bbs.gov.bd), p.33-34.

[140] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১০৮।

[141] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১১০।

[142] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -১১৬।

[143] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সামাজিক সুরক্ষা বাজেট প্রতিবেদন: ২০২৪-২৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। সুরক্ষা কার্যক্রম (২০২৪-২৫).pdf

যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। বিশেষ করে স্থানীয় চাহিদা বিবেচনা করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার যুবকদের ট্যুরিজম শিল্পে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

ঘ) বর্তমানে সরকারি চাকরিতে আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী জন্য ১ শতাংশ কোটা বহাল আছে। ক্ষুদ্র আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে সকল সরকারি-বেসরকারি চাকরিতে তাদের জন্য কোটা যৌক্তিকীকরণ করে সংরক্ষণ করা।

ঙ) আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর বংশ পরম্পরায় চলে আসা কুটির শিল্প টিকিয়ে রাখার জন্য সরকারিভাবে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এ ক্ষেত্রে মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার অফিসের মাধ্যমে আদিবাসীদের কুটির শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। একই সাথে উদ্যোক্তা হিসাবে নানা প্রণোদনা প্রদান, সুদমুক্ত ঋণ সহায়তা এবং প্রয়োজনে তাদের জন্য পৃথক ব্যাংক ঋণ নীতিমালা গ্রহণ করা।

চ) আদিবাসী/বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগোষ্ঠীর স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ও তৈরিকৃত পণ্য, যেমন; কৃষিপণ্য ও কুটির শিল্প সামগ্রীর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত হন। এখানে মধ্যস্বত্বভোগী ও সিন্ডিকেটের স্থানীয় বাজার নিয়ন্ত্রণ এই শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করছে। তাই তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে বাজার ব্যবস্থাপনায় তদারকি বৃদ্ধি সহ মধ্যস্বত্বভোগী ও সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬.১.৬ প্রতিবন্ধী শ্রম জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ২.৮০ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধী, পুরুষের ক্ষেত্রে ৩.২৮ শতাংশ এবং নারীর ক্ষেত্রে ২.৩২ শতাংশ।[144] এ জনগোষ্ঠী শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্যসেবা এবং প্রতিবন্ধিতা-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত। তাদের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি সীমিত, যার পেছনে রয়েছে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার ঘাটতি, বৈষম্য এবং অনুপযুক্ত কর্মপরিবেশ। বর্তমানে কর্মক্ষম বয়সী প্রতিবন্ধীদের মাত্র ৩৩.৭৮ শতাংশ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত, যেখানে পুরুষদের অংশগ্রহণ ৪৭.৫৯ শতাংশ এবং নারীদের ১২.৮০ শতাংশ। কর্মরতদের মধ্যে অধিকাংশই স্বনিয়োজিত (৫৪.৪২ শতাংশ), বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত ১৬.৩৭ শতাংশ এবং সরকারি খাতে মাত্র ৫ শতাংশ কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন।[145] কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা প্রায়ই বৈষম্যমূলক আচরণ, হয়রানি এবং সামাজিক উপহাসের শিকার যা তাদের মানসিক ও পেশাগত অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করে। একই সঙ্গে, উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও যাতায়াত ব্যবস্থার অভাব তাদের অংশগ্রহণ সীমিত করে দেয়। প্রতিবন্ধীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের সুযোগও খুবই সীমিত; মাত্র ২.৬৬ শতাংশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, যা প্রধানত কম্পিউটার, তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প ও কুটিরশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

জাতিসংঘের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (UNCRPD), যেটি বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে, প্রতিবন্ধিতাকে একটি বৈচিত্র্যময় মানবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে বিবেচনা করে সকল ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেয়। যদিও 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩' কর্মসংস্থানে বৈষম্য নিষিদ্ধ করেছে এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষার অধিকার স্বীকৃতি দিয়েছে, তবুও আইনটিতে 'প্রতিবন্ধী শ্রমিক' সম্পর্কে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই এবং নারী প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষার বিষয়ে কোনও পৃথক বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অপরদিকে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও সুরক্ষা বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নেই, ফলে তারা শ্রম আইন অনুযায়ী ন্যূনতম সুরক্ষাও পান না। এ পরিস্থিতে কমিশন মনে করে যে প্রতিবন্ধী শ্রমিকের শ্রম আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা এবং প্রতিবন্ধিতার ধরন বিবেচনায় নিয়ে উপযোগী দক্ষতা উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহায়ক কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। এ সম্পর্কে কমিশনের প্রস্তাবসমূহ নিম্নরূপ:

---

[144] বিবিএস, জাতীয় প্রতিবন্ধী ব্যক্তি জরিপ (এনএসপিডি) প্রতিবেদন ২০২১, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ , পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২।

[145] CSID, Employment Situation of People with Disabilities in Bangladesh, 2014. Retrieved from: https://www.google.com/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://webapps.ilo.org/surveyLib/index.php/catalog/871/download/6312&ved=2ahUKEwjwpZzFvpWLAxXu1jgGHVZlCbEQFnoECAsQAg&usg=AOvVaw2EFbGnT2xrVwp6-3fq47h_

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১ শতাংশ কোটা বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী ১ শতাংশ কোটা যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঙ্গে তৃতীয় লিঙ্গ যোগ থাকায় সংখ্যাটি আরো কমে যাচ্ছে।

ক) প্রতিবন্ধী শ্রমিকের সংজ্ঞা শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা এবং প্রতিবন্ধী শ্রমিকের অধিকার, সুযোগ সুবিধা ও সুরক্ষা, নারী প্রতিবন্ধীদের বিশেষ অধিকার ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কিত বিধান সম্বলিত একটি অধ্যায় শ্রম আইনে সংযুক্ত করা। এক্ষেত্রে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩'-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে, যেমন; প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যে কোনো সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মে নিযুক্ত হওয়ার অধিকার রাখেন এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের সাথে কোনো ধরনের কোনও বৈষম্য করা যাবে না, কর্মক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বিশেষ করে নারী প্রতিবন্ধীদের বিষয় বিবেচনা করে সবার জন্য সঠিক সুযোগ সুবিধা ও সমতা নিশ্চিত করা, তাঁদের 'প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা' (reasonable accommodation) প্রাপ্তির অধিকার, দক্ষতা প্রশিক্ষণ — এ সমস্ত বিধান শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

খ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লিঙ্গভিত্তিক ডাটাবেজ তৈরি করা, যাতে সেই ডাটাবেজ অনুসরণ করে লিঙ্গ ও প্রতিবন্ধিতার ধরন বিবেচনায় তাদের কারিগরি দক্ষতা প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের জন্য সুযোগ তৈরি করা যায়। শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলেও প্রশিক্ষণ সুবিধা প্রসারিত করা। বিশ্ববাজারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কাজের চাহিদা জরিপ করে সে অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ প্রতিবন্ধী বান্ধব করা।

গ) সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের জন্য কোটা সংরক্ষণ করা।

ঘ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্যোক্তা হতে উৎসাহিত করতে প্রশিক্ষণের সাথে সাথে তাদের জন্য পুঁজির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম হাতে নিতে পারে, যেমন; সুদমুক্ত বা স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান। বেসরকারি সংস্থাসমূহকে এ বিষয়ক প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহিত করা।

ঙ) প্রতিটি কর্মক্ষেত্র এবং কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতের সুবিধার্থে সব ধরনের গণপরিবহণ, যেমন; মেট্রোরেল, বাস, ট্রেন, লঞ্চ, স্টিমার প্রতিবন্ধী বান্ধব করা। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করার জন্য কারখানা বা ভবন নির্মাণে Building Construction Act, 1952 এবং তার অধীন বিধি অনুসরণ করা, যেমন; লিফট, র‍্যাম্প সুবিধা থাকা। গণপরিবহণে প্রতিবন্ধী সুরক্ষা আইন অনুযায়ী মোট আসন সংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকর করা।

চ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান উৎসাহিত করতে কোনো প্রতিষ্ঠানের মোট জনবলের ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী হলে বার্ষিক করের ৫ শতাংশ ফেরত প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থা কার্যকর করা এবং এ বিষয়ে প্রচারণা বৃদ্ধি করা।

৬.১.৭ অভিবাসী শ্রমিক

আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)-এর হিসাব মতে, ১৯৭৬ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৭১ লাখ বাংলাদেশি শুধু অভিবাসী শ্রমিক[146] হিসেবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমান। এর মধ্যে ১৯৯১ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নারী অভিবাসী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ ২৬ হাজার।[147] বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বাংলাদেশি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছেন।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভিবাসী শ্রমিকদের এই উল্লেখযোগ্য অবদান বিবেচনা করে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা এবং শ্রমিকদের অধিকার, কল্যাণ ও সুরক্ষা নিশ্চিন্তে বাংলাদেশ সরকার নানবিধ আইন, বিধিমালা এবং নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তবে এসব আইন ও নীতিমালাসমূহ প্রয়োগ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা রয়েছে। যেমন, বৈদেশিক কর্মসংস্থান বেসরকারি নিয়োগকারী সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার দিক নির্দেশনা থাকলেও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য নিয়োগের ক্ষেত্রে উচ্চ খরচ বা শোষণ নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। এছাড়াও অভিবাসী শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি, অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা, বৈদেশিক শ্রমবাজারের সম্প্রসারণ, অভিবাসী শ্রমিকদের

[146] বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ অনুযায়ী "অভিবাসী কর্মী" অর্থ বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যিনি অন্য কোনো রাষ্ট্রে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কর্মের উদ্দেশ্যে যাইবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছেন বা গমন করিতেছেন; কোনো কর্মে নিযুক্ত রহিয়াছেন; অথবা কোনো কর্মে নিযুক্ত থাকিবার পর বা নিযুক্ত না হইয়া বাংলাদেশে ফেরত আসিয়াছেন;

[147] https://old.bmet.gov.bd/BMET/stattisticalDataAction

পুনঃএকত্রীকরণ এবং ট্রেড ইউনিয়নে অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ সংক্রান্ত নানাবিধ চ্যালেঞ্জ সামগ্রিক উন্নয়নের অন্তরায়।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে নিয়োগ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া বেশ অস্বচ্ছ এবং শোষণমূলক। কোন দেশে এবং কোন খাতে বৈধভাবে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে; সেই দেশের অভিবাসন ব্যয় কতো হবে; কর্মচুক্তি, কর্মক্ষেত্র, কর্মঘণ্টা, মজুরি, ওভারটাইম, সাপ্তাহিক ছুটি, চিকিৎসা খরচ, থাকা-খাওয়ার খরচ এবং প্রাক-বহির্গমন ওরিয়েন্টেশন সহ বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক তথ্য অভিবাসী শ্রমিকদের কাছে থাকে না। কোথা থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে; কীভাবে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে; কীভাবে ব্যাংক থেকে ঋণের আবেদন করতে হবে; এসব তথ্যেরও সহজলভ্যতা তাদের কাছে নেই।

এ ছাড়াও পেশাভিত্তিক দক্ষতার অভাব এবং গন্তব্য দেশের আইন-কানুন, সমাজের নিয়ম-নীতি সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা বিভন্ন সময়ে স্থানীয় সাব-এজেন্ট বা মধ্যসত্ত্বভোগীর শরণাপন্ন হন। এসকল সাব-এজেন্ট বা মধ্যসত্ত্বভোগীরা সাধারণত অভিবাসীদের সাথে বাংলাদেশের রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলির মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এই সকল সাব-এজেন্টগণ রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির চাহিদার ভিত্তিতে কর্মী ঠিক করে দেয়। তারা রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির পক্ষ হয়ে অভিবাসীদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা অভিবাসীদের মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রলোভন দেখায় এবং এই কাজের বিনিময়ে তারা অভিবাসন প্রত্যাশীদের থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে- যা কিনা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ডকুমেন্টেশন ছাড়া লেনদেন হয়ে থাকে। এছাড়াও অধিকাংশ শ্রম অভিবাসন প্রত্যাশীরা স্বল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর হওয়ায় তারা প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম নিয়ে ভীত থাকার কারণে সাব-এজেন্টের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আর এসব মধ্যসত্ত্বভোগীদের কাছে টাকা দিয়ে, তাদের নির্দেশনা মতো পাসপোর্ট করা থেকে শুরু করে গন্তব্যদেশে যাওয়া পর্যন্ত পুরো অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। সেক্ষেত্রে একজন অভিবাসন প্রত্যাশীকে ডক্যুমেন্ট খরচ, নিরাপত্তা সম্পর্কিত খরচ, দক্ষতার উন্নয়ন সম্পর্কিত খরচ, যাতায়াত খরচ, নিয়োগ পরিষেবা ফি, প্রাক-বহির্গমন খরচ সহ অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের খরচ বহন করতে হয়। বাংলাদেশিদের অভিবাসন ব্যয় পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশের তুলনায় ৩ থেকে ৪ গুণ বেশি হয়। বাংলাদেশ সরকারের শ্রমশক্তি জরিপ-২০২২ এর মতে, অভিবাসনের জন্য পুরুষ শ্রমিকদের গড়ে ৪০৩,০১০ টাকা ও নারী শ্রমিকদের গড়ে ১৫৪,৪২২ টাকা খরচ হয়।[148]

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার অভাব একটি বড় সমস্যা। অধিকাংশ বাংলাদেশের রিক্রুটমেন্ট এজেন্সির সাথে গন্তব্যদেশের নিয়োগকর্তার কোনো সরাসরি যোগাযোগ না থাকায় ভিসা কাজ সংক্রান্ত সঠিক তথ্য এবং এর সহজলভ্যতা না থাকায় অভিবাসী শ্রমিকরা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, নিয়োগের ধরন, শর্তাবলি, বিদেশে কাজের প্রকৃত পরিবেশ সম্পর্কে শ্রমিকদের সঠিক তথ্য দেওয়া হয় না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের অভিবাসন প্রক্রিয়াটি নিয়ম বর্হিভূত হয়ে যায়। এদিকে অভিবাসন বাবদ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের পাশাপাশি সঠিক তথ্য না থাকার কারণে তারা সঠিক চাকরি ও ন্যায্য মজুরি সহ কর্মক্ষেত্রের সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নিয়োগ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা-২০২৫ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিক্রুটিং এজেন্ট শ্রেণিবিভাগ) বিধিমালা-২০২০ বাস্তবায়ন করা, যাতে করে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলির মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। প্রতি বছর এই শ্রেণিবিভাগ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা, যাতে বিদেশগমন প্রত্যাশী অভিবাসী শ্রমিকেরা সঠিক তথ্য পেতে পারেন।

খ) যে সকল রিক্রুটমেন্ট এজেন্সি গন্তব্যদেশের নিয়োগকর্তার সাথে দীর্ঘকালীন সরাসরি সম্পর্কের দালিলিক প্রমাণ দেখাতে পারবে এবং যাঁদের বিরুদ্ধে বিগত ৫ বছরে কোনো প্রকার অভিযোগ নেই, তাঁদেরকে দ্রুততার সাথে 'এক্সপ্রেস' পদ্ধতিতে অভিবাসনের সকল প্রক্রিয়া সম্পাদন করার অনুমতি প্রদান করা।

[148] Labour Force Survey 2022

গ) মেডিকেল, পাসপোর্ট, বিমান টিকেট (স্পেশাল লেবার ফেয়ারসহ), এয়ারপোর্ট সার্ভিস সহ যাবতীয় প্রক্রিয়ায় অভিবাসী শ্রমিকের জন্য স্পেশাল সার্ভিস প্রদান করা। প্রবাসী শ্রমিকদের ভিসা এবং বিএমইটি ছাড়পত্র থাকা সাপেক্ষে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের হ্রাসকৃত মূল্যে টিকেট প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা।

ঘ) সরকারিভাবে অভিবাসন ব্যয়ের স্বচ্ছ তালিকা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা এবং তদারকি জোরদার করা।

ঙ) 'ডিজিটাল কমপ্লেইন সিস্টেম' প্রবর্তন করা যাতে অভিযোগকারীরা ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে অভিযোগের অবস্থা জানতে পারে।

চ) অভিবাসন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভিসা বাণিজ্য ও অবৈধ এজেন্সিগুলির কার্যক্রম বন্ধ করতে আইনি উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং মধ্যসত্ত্বভোগী বা সাব এজেন্টদেরকে জবাবদিহিমূলক কাঠামোর মধ্যে আনা। বিদেশ গমনকালে প্রত্যেক কর্মীর বিএমইটি রেজিস্ট্রেশন ফি, রিক্রুটিং এজেন্সির এককালীন জামানত এবং করিডোর স্প্যাসিফিক (নির্দিষ্ট দেশ, যেমন, সিঙ্গাপুর, সৌদি আরব ইত্যাদি) জামানত যৌক্তিক হারে কমানো।

ছ) সরকার কর্তৃক গৃহীত রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিদের শ্রেণিবিন্যাস বিধি অনুযায়ী এজেন্সিগুলির সম্ভাব্য গন্তব্যদেশে মার্কেটিং ও প্রোমোশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বৈধ পন্থায় বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণের ব্যবস্থা রাখা, যাতে করে এজেন্সিগুলির মধ্যে নিয়মিত নিয়োগের প্রতিযোগিতা তৈরি হয় এবং যে কোনো ধরনের বিদ্যমান অবৈধ অর্থ প্রেরণের প্রবণতা হ্রাস পায়।

জ) শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত চুক্তিতে সমঝোতা চুক্তির পরিবর্তে 'দ্বিপাক্ষিক চুক্তি' স্বাক্ষরের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং যে কোনো চুক্তির আগে সকল স্টেকহোল্ডার ও রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলির সাথে পরামর্শক্রমে চুক্তির বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা এবং চুক্তিসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।

ঝ) অভিবাসন প্রক্রিয়া ও ভিসা সংক্রান্ত সকল তথ্য সহজলভ্য করা। মন্ত্রণালয়, বিএমইটি, বোয়েসেল ও বায়রা'র ওয়েবসাইটে অভিবাসীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ (যেমন বিদেশে কাজের ধরন, সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয়, অভিবাসনের বৈধ প্রক্রিয়া) সহজভাবে পরিবেশন করা।

ঞ) বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন-২০১৩ ও সংশোধনী-২০২৩, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী অধ্যাদেশ-২০২৪ ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন-২০১৮ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১৭, আন্তর্জাতিক অনুসমর্থনকৃত সনদ The UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families-1990 এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করা।

ট) সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক অনুসমর্থনকৃত সনদ The UN Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families-1990 এর পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

ঠ) অভিবাসন ইচ্ছুক শ্রমিকের জন্য বিদ্যমান ডাটাবেজকে শ্রমিকের দক্ষতা ও সার্টিফিকেশন সহ প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে নিয়মিত আপডেট করার মাধ্যমে একটি কার্যকরী ডাটাবেজে উন্নীত করা, যাতে করে রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলি ডাটাবেজ ব্যবহার করে কর্মী নির্বাচন করতে পারে।

ড) শ্রম অভিবাসন সংক্রান্ত আইএলও'র আর্ন্তজাতিক সনদের অনুসমর্থন করা।

অভিবাসী শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি

প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় লক্ষাধিক শ্রমিক বিদেশে পাড়ি জমায়। এদের মধ্যে একটি বড় অংশই অদক্ষ বা স্বল্পদক্ষ। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে টিকে থাকার জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা, ভাষার জ্ঞান এবং পেশাগত মানের স্বীকৃতি থাকা প্রয়োজন। অথচ আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের দক্ষতার চাহিদার সাথে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে কোনো একটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিলে বা দক্ষতা অর্জন করলে গন্তব্য দেশে এর স্বীকৃতি দেওয়া হয় না, ফলে বৈদেশিক শ্রমবাজারে তিনি অদক্ষ শ্রমিক হিসেবেই বিবেচিত হন। অন্যদিকে বিদেশি ভাষাজ্ঞান না থাকার কারণে গন্তব্যদেশে ও কর্মক্ষেত্রে তারা অনেক ধরনের সমস্যা ও বৈষম্যের শিকার হন। অভিবাসন প্রত্যাশীদেরকে দক্ষতার প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সারাদেশে বিএমইটি'র অধীনে ১১০টি টিটিসি স্থাপন করা হয়েছে, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসকল ট্রেনিং সেন্টার থেকে বিদেশে চাকরি পাবার সংখ্যা খুবই কম। উপরন্তু, এসকল সেন্টারের প্রশিক্ষণ মান নিয়েও জনমনে শংকা বিদ্যমান।

চাহিদাসম্পন্ন দক্ষতা ও ভাষাগত সীমাবদ্ধতার কারণে বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকরা উচ্চ বেতন, উন্নত কাজের পরিবেশ, ভালো কাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। বৈদেশিক শ্রম বাজারে বাংলাদেশ 'অদক্ষ শ্রমিকের' দেশের ইমেজ তৈরি হয়। আবার, অনেকেই তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা দক্ষতা অনুযায়ী কাজ পান না, যার ফলে তাদের আয় ও নিরাপত্তা প্রভাবিত হয়, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে বাধ্য হন। অন্যদিকে দেশে ফিরে আসার পর তাদের দক্ষতাকে কাজে লাগাতে না পারার ফলে দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, মাথাপিছু আয় কমে যায়। আমাদের প্রশিক্ষণের কোনো আন্তর্জাতিক বা রিজিওনাল স্বীকৃতি না থাকায় শ্রমিকের দর কষাকষির ক্ষমতা কমে যায়। এতে করে কম মজুরিতে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ কাজের জন্য বাধ্য হতে হয়। সঙ্গতিপূর্ণ প্রশিক্ষণের ঘাটতি শ্রমিকের দক্ষতা সৃষ্টিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় বৈদেশিক শ্রমবাজারে তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতাও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ না থাকার ফলে যাত্রাপথে, বিমানবন্দরে, এমনকি গন্তব্যদেশে অভিবাসী শ্রমিকরা নানারকম প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন।

অভিবাসী শ্রমিকের দক্ষতার উন্নয়ন এবং স্বীকৃতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে।

ক) বিএমইটি'র অধীনে ইন্সটিটিউট অফ মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) এবং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি)-সমূহের দক্ষতা ও কার্যকারীতাসমূহ মূল্যায়ন করা।

খ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে 'জব প্লেসমেন্ট' বাধ্যতামূলক করা ও তার প্রতিবেদন প্রকাশ করা এবং তদানুযায়ী সরকারের টিটিসিসমূহের বাজেট বরাদ্দ করা; 'শিক্ষানবিস (এপ্রেন্টনশিপ)' নিয়োগের জন্য ব্যক্তিখাতের মালিকপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় বাজারেও কাজের সুযোগ তৈরি করা।

গ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে ভাষা ও সাংস্কৃতিক জ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সংগতিপূর্ণ কোর্স প্রণয়ন করা এবং মান যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন করা।

ঘ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে 'আরপিএল', 'আপ-স্কিলিং' ও 'রি-স্কিলিং' প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণ শেষে তাঁদের সঠিক কাজে নিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

ঙ) বিএমইটি হতে বৈদেশিক শ্রম বাজারের দক্ষতার চাহিদা মোতাবেক National Skill Development Authority-NSDA'র কাছে বিভিন্ন ট্রেডের জন্য Competency Standard-CS এবং Competency Based Learning Materials-CBLM প্রণয়ন ও প্রশিক্ষক তৈরি করা।

চ) আইএমটি এবং টিটিসিসমূহে দক্ষ প্রশিক্ষক নিয়োগ প্রদান এবং তাদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা; প্রশিক্ষণ শেষে সনদ প্রদান করা।

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়; জনশক্তি,কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি); বাংলাদেশ ওভারসীজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল); জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও); বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা); ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড; প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক; এবং গন্তব্যদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেট অফিস অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের জন্য পর্যাপ্ত বাজেটের অভাব সহ অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং জনবল সংকট রয়েছে। একই সাথে প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে চরম সমন্বয়হীনতা রয়েছে, আর রয়েছে কাজের দ্বৈততা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা। মাঠ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন স্থানে দপ্তর থাকাতে অভিবাসী কর্মীর আর তার পরিবারের অতিরিক্ত সময় ও অর্থ খরচ করতে হয়। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের জটিলতা ও কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ঋণ প্রদান করতে না পারায় ব্যাংকের উপরও মানুষ আস্থা হারাচ্ছে। গন্তব্যদেশে অভিবাসী শ্রমিকদের সর্বোচ্চ সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা হলো দূতাবাস ও শ্রম উইংস বা কনস্যুলেট অফিসগুলি। অভিবাসী শ্রমিকদের আইনি সহায়তা, স্বাস্থ্যসুরক্ষা সহায়তা এবং পাসপোর্ট নবায়ন সহ সকল ধরনের তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করা শ্রম উইংসের কাজ। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভিবাসী শ্রমিকরা প্রত্যাশিত সেবা থেকে বঞ্চিত হন। এক্ষেত্রে মিশনের কোন জবাবদিহিতা বা বছরভিত্তিক টার্গেট নেই। অন্যদিকে অসুস্থ অভিবাসী শ্রমিকদের দেশে ফেরত আনা ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান; অভিবাসী শ্রমিকের মরদেহ দেশে ফেরত আনা সহ দাফন বাবদ

অভিবাসীর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড। এছাড়া অভিবাসী শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তিও প্রদান করে এই বোর্ড। অভিবাসী শ্রমিকের চাঁদায় গঠিত এই তহবিলের আয় ও ব্যয় নিয়ে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। ফলে ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড-এর অপারেশন ব্যয়, আর অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারের জন্য কল্যাণ কর্মসূচির ব্যয়ের আনুপাতিক হার নিয়েও রয়েছে অস্বচ্ছতা। উপরন্তু, বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামোতেও রয়েছে অভিবাসী কর্মী, শ্রমিক সংগঠন এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিত্বের অভাব। সর্বোপরি, 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড'-এর কল্যাণমূলক কার্যক্রমেও রয়েছে সীমাবদ্ধতা। তাছাড়া, এসব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমের যথাযথ প্রচারণা না থাকায় অভিবাসী শ্রমিকরা কাঙ্ক্ষিত সেবা গ্রহণ করতে পারছে না। এছাড়া এ সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের অভিবাসী শ্রমিকের প্রতি শ্রমিক-বান্ধব আচরণ নিয়েও রয়েছে নানাবিধ ক্ষোভ ও অভিযোগ।

এসব প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, দ্বৈততা, সমন্বয়হীনতা, আচরণগত সমস্যা, জবাবদিহিতার অভাবের কারণে অভিবাসী শ্রমিকরা যথাসময়ে চাহিদা মোতাবেক সেবা পান না। কনস্যুলেট অফিসে কম সংখ্যক জনবল, শ্রম অভিবাসন-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের অভাব ও দূরত্বের জন্য অভিবাসী শ্রমিকরা কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা গ্রহণ করতে পারছেন না। এছাড়া লেবার এট্যাশে নিয়োগের ক্ষেত্রেও যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব না দেওয়ায় সেবাও মানসম্মত হয় না। দূতাবাসগুলি নতুন শ্রমবাজার ও দক্ষতার চাহিদা নিরুপণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তৈরি বা বিদ্যমান অভিবাসী শ্রমিকদের পক্ষে সোচ্চার ভূমিকা পালন না করায় বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি শ্রমিকদের চাহিদা কমছে।

সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে।

ক) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ সকল সংস্থাসমূহের 'অ্যালোকেশন অব বিজনেস' অতি দ্রুত পরিমার্জন, সংশোধন ও সমন্বয় করা; যাতে করে সকলের দায়িত্ব সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত থাকে ও দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভব হয়। প্রবাসী কল্যাণ বোর্ডের কর্মকর্তাদের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা।

খ) প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য মানসম্মত 'প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ' প্রদান বাধ্যতামূলক করা; 'অ্যালোকেশন অব বিজনেস'-এর মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা।

গ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ঋণ (বিশেষ করে প্রত্যাগতি অভিবাসীদের জন্য ঋণ) আবেদনের 'ডক্যুমেন্টেশন' ও 'প্রসেসিং' এ দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা ও অভিবাসন প্রত্যাশীদের অহেতুক হয়রানি বন্ধ করে সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা এবং Key Performance Indicator 'কেপিআই' প্রবর্তন করা।

ঘ) লেবার এট্যাশেদেরকে সে দেশের বিদ্যমান 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান সংক্রান্ত দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি বা এমওইউ' মোতাবেক 'জয়েন্ট কমিটি' সভার আয়োজন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং কোনো চুক্তি না থাকলে সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা। এই বিষয়টি তাঁদের বছরভিত্তিক 'পারফরম্যান্স'-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা হিসাবে বিবেচিত হবে।

ঙ) দূতাবাসের শ্রম কল্যাণ শাখার বছরওয়ারি প্রতিবেদন প্রকাশ করা। প্রত্যেক লেবার এট্যাশেকে বিদেশে মিশনের পোস্টিং শেষে দেশে ফিরে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতে কমপক্ষে ৩ বছর কাজ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

চ) লেবার এট্যাশে কর্মকর্তাদের আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার বিশ্লেষণ করে মন্ত্রণালয়কে সম্ভাব্য বাজার ও পেশার তথ্য নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা।

ছ) দূতাবাস ও কনস্যুলার অফিসগুলিতে (লেবার উইংসহ) সেবা প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ ও বাজেট বরাদ্দ দিয়ে সর্বস্তরে সেবা নিশ্চিত করা। এই কাজের জন্য কর্মকর্তা নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষেত্রে শ্রম অভিবাসন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গকে প্রাধান্য দেওয়া; প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন ব্যক্তিকে 'চুক্তিভিত্তিক' নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

জ) বিএমইটি, জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, টিটিসি ও ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় করে এবং দ্বৈততা পরিহার করে এর কার্যক্রম বাড়িয়ে প্রাতিষ্ঠানিক সেবাসমূহকে সহজলভ্য করা।

ঝ) জেলা পর্যায়ে জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, টিটিসি ও ওয়েলফেয়ার অফিসসমূহের কাজের সমন্বয় বৃদ্ধি এবং অভিবাসী শ্রমিক ও তার পরিবারদের সহজে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অফিসসমূহ একই স্থানে/ভবনে স্থাপন করা।

ঞ) অভিবাসী শ্রমিকদের কর্মপরিবেশ, সমস্যাবলি সরেজমিনে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা; তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য ও সেবা প্রদান করা।

ট) বিদেশের মিশনগুলির শ্রম কল্যাণ উইংসগুলিকে অভিবাসী শ্রমিকের মৃতদেহ দেশে প্রেরণ সহ নিয়োগকর্তার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদানে ভূমিকা রাখা।

অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা

প্রবাসে অধিকাংশ অভিবাসী শ্রমিকরা ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করে। এসব শ্রমিকদেরকে কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা হয় না। অনেক শ্রমিক আছেন, যারা কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন, অন্যান্য শ্রমিকদের চেয়ে তাদের কর্মঘণ্টা বেশি হয় এবং মজুরি কম হয়, চিকিৎসা সুবিধা ও অসুস্থতার সময় পর্যাপ্ত ছুটির ব্যবস্থা থাকে না। অনেকের স্বাস্থ্যবিমা না থাকায় চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হন। এছাড়াও বিদেশে কাজ করার সময় অভিবাসী শ্রমিকরা একাকিত্ব, পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতার মতো মানসিক চাপের মুখোমুখি হন। কিন্তু এইসব সমস্যা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় মানসিক স্বাস্থ্যসেবা বা কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা থাকে না। অভিবাসী শ্রমিকদের এসব নিরাপত্তা ও সুরক্ষা প্রদানে লেবার অ্যাটাশে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ২০১৯ সালে সরকার কর্তৃক জীবন-বিমা সম্পর্কে কোনো সচেতনতা ও ক্যাম্পেইন না করার কারণে অভিবাসী শ্রমিকরা এ বিষয়ে ভালভাবে অবহিত নন। বিমার আদায় খুবই কম। বিশেষ করে নারী অভিবাসী শ্রমিকের বিমা সুবিধা আদায়ের হার খুবই নগণ্য। অসুস্থ (মানসিক ও শারীরিক) প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য কোনো বিশেষ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি নেই।

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার মান বজায় না রাখার কারণে প্রায়শই দুর্ঘটনা হয়; এমনকি শ্রমিকের অঙ্গহানি বা মৃত্যুও ঘটে। মানসিক দুর্বলতার প্রভাব পড়ে তাদের কাজের উপর, কাজের মান ঠিক থাকে না, কর্মস্থলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এমনকি, মানসিক স্বাস্থ্যসেবার অভাবে অনেকে আত্মহননের পথ বেছে নেন। লেবার অ্যাটাচে কার্যকরী ভূমিকা পালন না করায় গন্তব্যদেশে শ্রমিকরা নানারকম জটিলতায় পড়েন। প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য কোনো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি না থাকায় আপদকালীন সময়ে তারা কোনো সহায়তা পান না।

অভিবাসী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষায় শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে।

ক) ২০১৯ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিপত্র 'বিদেশগামী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক বিমা ব্যবস্থার' নিয়মিত মূল্যায়ন করা, যাতে করে প্রয়োজনবোধে বিমার কভারেজ, ব্যাপ্তি এবং উপকারভোগী বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

খ) 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড' ত্রিপক্ষীয় ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদের কাঠামো সংশোধন করা এবং বোর্ডে অভিবাসী কর্মীর প্রতিনিধিত্ব নিরপেক্ষভাবে নিশ্চিত করা।

গ) আত্মহত্যা বা এইডস/এসটিডি বা অন্য কোনো কারণে কোনো প্রবাসী কর্মী বিদেশে মারা গেলে তার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা ইন্স্যুরেন্স সুবিধা প্রদান করা।

ঘ) প্রত্যাগত অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য 'রি-ইন্টিগ্রেশন' কর্মসূচি বোর্ডের 'অ্যালোকেশন অব বিজনেসস' নিয়মিত দায়িত্ব হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এজন্য যথাযথ বাজেট বরাদ্দ করা।

ঙ) অভিবাসী শ্রমিকদের কল্যাণ ও সামাজিক সুরক্ষার জন্য গবেষণা ও অন্যান্য দেশের 'বেস্ট প্র্যাকটিসে'র ভিত্তিতে নতুন কল্যাণমূলক কর্মসূচি ও সুরক্ষা স্কিম গ্রহণ করা।

চ) মন্ত্রণালয় হতে গন্তব্যদেশের সাথে 'দ্বিপাক্ষিক সামাজিক সুরক্ষা চুক্তি'র ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ছ) ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডে'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করতে প্রশিক্ষণ এবং কেপিআই-এ এ বিষয়ে নির্দেশিকা অন্তর্ভুক্ত করা

নারী অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্ভোগ

প্রতিবছর বাংলাদেশ হতে পুরুষদের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিক আন্তর্জাতিক শ্রম অভিবাসন করে থাকেন। অভিবাসনকালে, গন্তব্যদেশে বা কর্মক্ষেত্রে নারীরা নানারকম শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হন। এমনকি পাচারের মতো ঘটনাও নারীদের সাথে বেশি ঘটে। অধিকাংশ নারী শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গৃহকর্মী হিসেবে

যান। তাদের নির্দিষ্ট কোনো কর্মঘণ্টা ও ছুটি থাকে না। পাসপোর্ট ও মোবাইল আটকে রাখা, পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে না দেওয়া, বেতন না দেওয়া বা কম দেওয়া, যৌন নির্যাতন সহ মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের ঘটনাও নারী শ্রমিকদের সাথে ঘটে। এছাড়াও পোশাক কারখানায়ও নারীরা প্রায় একই রকম নির্যাতনের শিকার হন। একই কাজের জন্য একই রকম মজুরির বিধান থাকলেও নারী শ্রমিকদেরকে পুরুষদের চেয়ে কম মজুরি দেওয়া হয়। অন্যদিকে দেশে ফিরে আসার পর নারী শ্রমিকদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে হেনস্তা ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়।

পুরুষদের মতো নারী অভিবাসীর সংখ্যা গতানুগতিক হারে বাড়ছে না, বরং প্রতিবছর তা কমছে। অভিবাসনের ক্ষেত্রে নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, একই সাথে নিম্ন মজুরি প্রদানের প্রবণতা নারীদের শ্রম অভিবাসনের জন্য অনাগ্রহী করে তুলছে। যেহেতু দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা নারী; ফলে দেশে বেকারত্বের সংখ্যাও বেড়ে যায়। সমাজ ও পরিবার হতে স্টিগমা'র শিকার হয়ে থাকেন। প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীর জন্য কোনো বিশেষ কর্মসূচি না থাকায় আবারও তারা অভিবাসনের পথ বেছে নেন বা খুবই অসম্মানজনক জীবন-যাপন করেন।

নারী অভিবাসী শ্রমিকদের দুর্ভোগ দূরীকরণে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) নারী অভিবাসী শ্রমিকদের প্রেরণকারী ও গন্তব্য - দুই দেশেই ২৪/৭ হেল্পলাইন পরিষেবা কার্যকরভাবে চালু করা।

খ) লেবার এট্যাশেদের কাজে নারী অভিবাসী কর্মীর কল্যাণ কাজ বাধ্যতামূলক করা।

গ) 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড' আইন, ২০১৮-তে নারী অভিবাসী শ্রমিকের কল্যাণে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা, চিকিৎসা সুবিধা, দেশে-বিদেশে সেইফ হোম প্রতিষ্ঠা করা এবং বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা।

ঘ) নারী অভিবাসী শ্রমিকদের বিশেষ করে প্রবাসী নারী গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিতে লেবার এট্যাশে, রিক্রুটিং এজেন্সি, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাসমূহ - এমনকি ট্রেড ইউনিয়নগুলিরও কার্যকরী ভূমিকা পালন করা; বিশেষ করে অ্যাম্বাসিগুলিতে তাদের জন্য বিশেষ সেবা দিবস আয়োজন করা।

ঙ) ভিন্ন দেশে নারীদের গৃহকর্ম পেশা ছাড়াও অন্য পেশায় অন্তর্ভুক্তির জন্য গবেষণা ও কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো।

চ) অভিবাসী ও প্রত্যাগত অভিবাসী নারী শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান অভিবাসন আইন, বিধি ও নীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা; অথবা তাদের জন্য পৃথক আইন, বিধি ও নীতিমালা গ্রহণ করা; যাতে করে তাদের সর্বোচ্চ সুরক্ষা, সম্মান ও কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।

ছ) নারীদের গৃহকর্মী ও গার্মেন্টস কর্মীর প্রশিক্ষণ ছাড়াও নতুন পেশার প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে বিদেশে প্রেরণ করা।

জ) প্রত্যাগত অভিবাসী নারী শ্রমিকের জন্য বিশেষ কল্যাণ কর্মসূচি গ্রহণ করা; বিশেষ করে দুঃস্থ প্রত্যাগত নারী শ্রমিকের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ঝ) বিএমইটি'র অধীনে যে সকল মহিলা টিটিসি আছে তাদের মূল্যায়ন করে নন-ট্রেডিশনাল ট্রেডে প্রশিক্ষণ সুযোগ বৃদ্ধি করা।

ঞ) অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন; প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি), বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল), জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস (ডিইএমও), বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সি (বায়রা), ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক এবং গন্তব্য দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও কনস্যুলেট অফিসগুলিতে 'কেপিআই'য়ে জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিশ্চিত করা।

বৈদেশিক শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর ১০ লাখের বেশি শ্রমিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজের জন্য যান, যার মধ্যে স্বল্পদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের সংখ্যাই সর্বাধিক। পরিসংখ্যান মতে, বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৮০% শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে শ্রমিক হিসেবে যাচ্ছেন। বাকি ২০% যাচ্ছেন দক্ষিণ-এশিয়া ও ইউরোপের কিছু দেশে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে গৃহস্থালি কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা উক্ত দেশের শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত নন। এ পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সমস্যা শ্রম আদালতের আওতাধীন নয়। ফলে নিয়োগকর্তার সাথে পারস্পারিক সমঝোতা ছাড়া শ্রমিকের সমস্যা সমাধানের অন্য কোনো উপায় নেই।

অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ সম্পর্কিত যে আন্তর্জাতিক কনভেনশন রয়েছে, সেগুলির কোনোটিতেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ স্বাক্ষর করেনি। কর্মী গ্রহণকারী কিছু দেশের সাথে উৎস দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সমঝোতা চুক্তি আছে। কিন্তু সমঝোতা চুক্তি মানার জন্য কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থারও কোনো উন্নতি হয় না। শুধু কাতার (১৯৯৮, ২০০৮) ও কুয়েত (২০০০)-এর সাথে বাংলাদেশের দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি রয়েছে।[149] বৈদেশিক শ্রমবাজার নিয়ে মন্ত্রণালয়ের কোনো অ্যাকশনভিত্তিক স্টাডি হয় না। লেবার এট্যাশেদের বাজার যাচাই করা আর সম্ভাবনাময় পেশার বা দক্ষতার যাচাই করার কথা থাকলেও সেটা করা হয় না। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত বাজেটও রাখা হয় না।

গত কয়েক দশকেও বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশ তেমন কোনো ব্যাপ্তিলাভ করে নেই। এখনো আমাদের বাজারের বেশির ভাগই মধ্যপ্রাচ্য নির্ভর। অদক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থানই বেশি হয়েছে। দক্ষ কর্মীর সোর্স কান্ট্রি হিসাবে বাংলাদেশ এখনও কোনো ইমেজ তৈরি করতে পারে নেই। প্রশিক্ষণের মান কাজের চাহিদা অনুযায়ী না হওয়া ও রিক্রুটিং এজেন্সিগুলি আন-এথিক্যাল বিজনেসের কারণে বৈদেশিক বাজারে বাংলাদেশের সুনামও তেমন একটা অর্জন হয় নেই। চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষ বানানো যাচ্ছে না। দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশি শ্রমিকদের একদিকে যেমন গ্রহণযোগ্যতা কমছে, অন্যদিকে কর্মরত শ্রমিকরা শোষণের শিকার হচ্ছে। কর্মী গ্রহণকারী দেশগুলির সাথে দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি না থাকায় শ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। বৈদেশিক মুদ্রা আয়কারী উৎসদেশগুলির মধ্যে নিম্ন আয়ের দেশ ও অদক্ষ কর্মীর দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে বাংলাদেশ।

বৈদেশিক শ্রমবাজারের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে।

ক) রিক্রুটমেন্ট এজেন্সিগুলির 'সিন্ডিকেট' নির্মূল করা এবং এর জন্য সকল স্টেকহোল্ডাদের নিয়ে পরার্মশক্রমে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

খ) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজার গবেষণার জন্য বাজেট বরাদ্দ এবং তার ভিত্তিতে অ্যাকশন প্ল্যান গ্রহণ সহ নিয়মিত পর্যালোচনা ও অগ্রগতি মূল্যায়ন করা।

গ) সম্ভাব্য শ্রমবাজার সম্প্রসারণে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিজ উদ্যোগে কূটনৈতিক আলোচনা শুরু করা। প্রয়োজনবোধে গন্তব্যদেশে সম্ভাব্য নিয়োগকারী দেশগুলিকে আমন্ত্রণ জানানো।

ঘ) শ্রমিক প্রেরণকারী ও গ্রহণকারী দেশসমূহের আঞ্চলিক সংগঠনগুলির (যেমন, কলম্বো প্রসেস, আবুধাবি সংলাপ) শীর্ষ সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিবাসী কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ।

ঞ) শুধু সমঝোতা চুক্তি নয়, শ্রমিক গ্রহণকারী দেশগুলির সাথে শ্রমিকদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে 'দ্বিপাক্ষিক চুক্তি' করা এবং তার পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

চ) বৈদেশিক শ্রমবাজারে বাংলাদেশি শ্রমিকের ভারসাম্য রক্ষার্থে লেবার এট্যাশে ও দূতাবাসগুলির সক্রিয় ভূমিকা পালন করা।

রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনা

রেমিট্যান্স বাংলাদেশের জিডিপি'র একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বৈদেশিক কর্মসংস্থান থেকে পাঠানো অর্থ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে অপূরণীয় ভূমিকা রাখে। সাধারণত ব্যাংক, মানি ট্রান্সফার সার্ভিস বা মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে দেশে রেমিট্যান্স পাঠানো হয়, যা বৈধ বলে স্বীকৃত। তবে রেমিট্যান্স পাঠানোর ফি/চার্জ, জটিলতা এবং প্রসেসিংয়ে দীর্ঘসূত্রিতার জন্য অনেকেই হুন্ডি তথা অবৈধ উপায়ে দেশে টাকা পাঠান। অনেক শ্রমিক মনে করেন, ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে টাকা পাঠালে ফি/চার্জ বেশি কাটা হয় এবং লেনদেন প্রক্রিয়া ধীরগতির হয়। এছাড়াও প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রেমিট্যান্স আসার পরেও উৎপাদনশীল কাজে তা বিনিয়োগের জন্য যথাযথ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা নেই।

হুন্ডির ক্ষেত্রে কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক নথিপত্র বা আইনি প্রক্রিয়া ছাড়াই এই লেনদেন সম্পন্ন হয়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ে না। হুন্ডির মাধ্যমে অবৈধভাবে ডলার কেনাবেচার ফলে বিনিময় হার অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে, মুদ্রাস্ফীতি বাড়ে। এছাড়া হুন্ডি হলো অর্থপাচারের একটি মাধ্যম। বৈধ ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে লেনদেন হওয়ায় এটি সরকারি রাজস্ব হারায়।

[149] BILS Journal 2017

রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনায় শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) রেমিট্যান্স প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রচলিত ডিজিটাল মাধ্যম এবং ব্যাংকিং প্রক্রিয়াগুলি সহজ ও দ্রুত করার পাশাপাশি লেনদেন ফি কমানো।

খ) স্বল্প খরচে নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ ডিজিটাল ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে অভিবাসীদের উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্যে প্রণোদনা সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি হুন্ডির ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং হুন্ডি চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইন প্রয়োগের মাধ্যমে অবৈধ লেনদেন বন্ধ করা।

গ) প্রতিবছর প্রাপ্ত রেমিট্যান্সকে বিনিয়োগে রূপান্তরিত করতে নীতি ও কৌশল প্রণয়ন করা।

অভিবাসী শ্রমিকদের পুনঃএকত্রীকরণ

চাকরির চুক্তির মেয়াদ শেষে বা অপ্রত্যাশিত যে কোনো কারণে অভিবাসী শ্রমিকরা দেশে ফিরে আসেন। দীর্ঘসময় প্রবাসে থাকার ফলে তারা পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বিচ্ছিন্নতা অনুভব করেন। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদেরকে তাদের পরিবার ভিন্ন চোখে দেখে, সহজে মেনে নিতে চায় না। অন্যদিকে দেশে ফেরত আসা এই বিশাল জনগোষ্ঠী ট্রেডভিত্তিক কর্মসংস্থানের সাথে যুক্ত হতে পারে না, আবার যথেষ্ট পুঁজি না থাকার কারণে তারা ব্যবসাও শুরু করতে পারে না। প্রবাস ফেরত এই শ্রমিকদের মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় তাদের অর্জিত দক্ষতাও দেশে কাজে লাগানো হয় না। ফেরত আসা দুস্থ ও অসুস্থ শ্রমিকদের কোনো সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি না থাকায় অনেকেই মানবেতর জীবন যাপন করেন। ফিরে আসা অভিবাসী শ্রমিকদের কাউন্সেলিং করা না গেলে তারা পারিবারিক ও সামজিকভাবে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়। এই অভিবাসী শ্রমিকদের সঠিকভাবে পুনর্বাসন করা না গেলে সমাজের দায়বদ্ধতা তৈরি হয়। দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মাথাপিছু আয় কমে যায়। অনেকেই উপায় না পেয়ে অবৈধভাবে বা বৈধভাবে আবারও বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করেন।

অভিবাসী শ্রমিকদের পুনঃএকত্রীকরণে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) বিমানবন্দরে বিশেষ সেবা ও ভালো আচরণ নিশ্চিত করে হয়রানি কমানোর উদ্যোগ গ্রহণ।

খ) প্রত্যাগত শ্রমিকদের জন্য দ্রুত 'রি-ইন্টিগ্রেশন পলিসি' বাস্তবায়ন, বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সকল দুস্থ ও অসুস্থ শ্রমিকদের জন্য মাসিক ভিত্তিতে 'সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি' চালু সহ নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

গ) 'আপ-স্কিলিং', 'রি-স্কিলিং' ও 'আরপিএল'-এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করে প্রবাসীদের দক্ষতা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ঘ) 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডে'র তহবিল থেকে কোনো সরকারি ক্যাডার কর্মকর্তার বেতন ও ভাতাদি গ্রহণ বাতিল করা এবং 'ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড'কে জেন্ডারভিত্তিক প্রত্যাগতদের তথ্য ও উপাত্ত নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করা সহ প্রত্যাগত নারী শ্রমিকদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

ট্রেড ইউনিয়নে অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

অভিবাসী শ্রমিকরা কর্মস্থলে বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হন। বিশেষ করে গৃহশ্রমিক হিসেবে অভিবাসন করা নারী শ্রমিকরা কর্মস্থলে হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হন। গন্তব্য দেশগুলিতে দু-একটি ব্যতিক্রম প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠানে অভিবাসী শ্রমিকদের ইউনিয়ন করতে দেওয়া হয় না। ইউনিয়ন করতে না দেওয়ায় শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হতে পারেন না। ফলে তারা কোনো বিষয়ে একক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন না। সংগঠন করতে না দেওয়ায় শ্রমিকরা তাদের সমস্যা, অনিয়ম বা বৈষম্যের প্রতিবাদ করতে পারে না। কম পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কর্মঘণ্টায় কাজ করতে হয় তাদের। দ্বি-পাক্ষিক বা ত্রি-পাক্ষিক চুক্তির অভাবে শ্রমিকের অধিকার, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুরক্ষা সেবা ব্যাহত হচ্ছে।

ট্রেড ইউনিয়নে অভিবাসী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তিকরণ লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ও ওয়েজ আর্নার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ডে প্রবাসী শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

খ) অভিবাসী শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় উৎস ও গন্তব্য দেশের সরকারের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করা।

গ) প্রত্যাশী এবং প্রত্যাগত শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকার প্রদান করা।

অভিবাসী শ্রমিকদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ

গড়ে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ বাংলাদেশি শ্রম অভিবাসনের লক্ষ্যে দীর্ঘসময় দেশের বাইরে থাকেন। তারা জাতীয় এবং স্থানীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। দেশের অর্থনীতিতে অগ্রণী ভূমিকা রাখলেও তারা ভোট দিয়ে তাদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারেন না। ভোটের অধিকার না থাকার ফলে তারা রাজনৈতিক মতামত প্রদানে সম্পৃক্ত হতে পারেন না। বিশাল এই জনগোষ্ঠী দেশের আর্থ-সামাজিক মূলধারার বাইরে থেকে যান। ফলে দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাদের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটে না।

অভিবাসী শ্রমিকদের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ লক্ষ্যে শ্রমসংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত সুপারিশ করছে:

ক) অভিবাসী শ্রমিকদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করা।

খ) অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য স্ব স্ব কর্মস্থলের নিকটবর্তী দূতাবাস বা কনস্যুলার অফিসে গিয়ে অনলাইনে ভোট প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৬.১.৮ পরিচ্ছন্নতাকর্মী/বর্জ্য ব্যবস্থাপনা শ্রমিক/দলিত জনগোষ্ঠী

পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক এবং সামাজিকভাবে অবহেলিত এক জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে দলিত ও হরিজন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৫৬ লক্ষ,[150] যাদের একটি বড় অংশ পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভায় কাজ করেন। পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অধিকাংশই আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে দৈনিক মজুরিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত, ফলে তারা বেতন বৈষম্যের শিকার। একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী যেখানে আনুতোষিক সহ প্রায় ২০,০০০ টাকা পান, সেখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাসিক গড় আয় ৪-৫ হাজার টাকা এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভার একজন পরিচ্ছন্নতার্কমীর আয় ২ হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা। এছাড়া সিটি কর্পোরেশনভেদে নিয়োগ, মজুরি ও সুবিধাদিতে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়।

পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা কোনোরকম সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই ম্যানহোল, টয়লেট ও সুয়ারেজ পরিষ্কারের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করেন। ফলে তারা স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকেন এবং ক্যান্সার ও এজমার মতো জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার অনেক বেশি।[151] পরিচয়ের কারণে তাদের চিকিৎসা পেতে অসুবিধা হয়।[152] তাদের আবাসনের সমস্যাও প্রকট, থাকার জন্য বরাদ্দকৃত ছোট ঘরে জায়গা হয় না বিধায় অনেকেই নিজ সন্তানকে নিকটাত্মীয়ের বাসায় রাখেন। যুগ যুগ ধরে এভাবে পরিচ্ছন্নকর্মীরা বৈষম্য ও বঞ্চনার সাথে জীবন সংগ্রামে লিপ্ত থেকে দিন অতিবাহিত করছেন। কমিশন মনে করে যে তাদের এ অবস্থার আশু পরিবর্তন হওয়া জরুরি।

ক) আউটসোর্সিং বন্ধ করে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা এবং দীর্ঘদিন থেকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত শ্রমিকদের স্থায়ীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) পরিচ্ছনতাকর্মীদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো প্রস্তুত করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে দক্ষতাভিত্তিক পদোন্নতি নিশ্চিত করা। শ্রম আইন অনুযায়ী উৎসব বোনাস প্রদান করা।

গ) অগ্রাধিকারভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় (যেমন; পেনশন ভাতা, ভবিষ্যৎ তহবিল) অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে পরিচ্ছনতাকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা এবং সন্তানদের জন্য শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

ঘ) পরিচ্ছন্নতা কাজে পেশাগত স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমাতে আধুনিক পরিচ্ছন্নতা উপকরণ বা যন্ত্রপাতি নিয়মিতভাবে এবং বিনামূল্যে সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

---

[150] অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি, https://msw.gov.bd/site/page/22f31a43-bdab-4613-9fa2-বেদে,-দলিত,-হরিজন - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

[151] এক গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, রাজধানী ঢাকায় পরিচ্ছন্নতা—কর্মীদের ২০ ভাগই ক্যান্সার আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন, এবং এর এজমায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন ২৩ ভাগ কর্মী।

আশহাবুর রহমান শোয়েব, পরিচ্ছন্ন কর্মীদের অমানবিক জীবন, দৈনিক পূর্বকোন, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

https://dainikpurbokone.net/anniversary-supplement/107077/দৈনিক পূর্বকোণ | বাংলাদেশে আধুনিক সংবাদপত্রের পথিকৃৎ

[152] প্রাগুক্ত।

ঙ) পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি অনেক বেশি তাই নির্দিষ্ট বিরতিতে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি নির্ণয় করা এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও ভাক্সিন নিশ্চিত করা। সবার জন্য হেলথ কার্ড সরবরাহ করা এবং ঝুঁকি ভাতা নির্ধারণ করা। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

চ) পরিচ্ছনতাকর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের শোভন জীবনযাপন নিশ্চিত করতে "পরিচ্ছন্নতাকর্মী আবাসিক এলাকা" স্থাপন করার মাধ্যমে মানসম্পন্ন আবাসন নিশ্চিত করা।

ছ) শিল্পভিত্তিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী জন্য নিরাপদ স্যানিটেশন ও উন্নত স্বাস্থ্যবাস নিশ্চিত করে কারখানাভিত্তিক ওয়াশ কমিটি গঠন, সুনির্দিষ্ট নীতি ও ওয়াশ চেকলিস্ট প্রণয়ন করা।

জ) নারী কর্মীদের জন্য পরিবারিক জীবন ভারসাম্যময় ও নিরাপদ হয় এমন ধরনের কাজের ধরন, রুটিন ও পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং বিশেষ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নীতি গ্রহণ করা।

ঞ) প্রয়োজনে দলিত/হরিজন জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে "সংরক্ষণ নীতি" প্রবর্তন করে পর্যায়ক্রমে অনগ্রসর অবস্থা থেকে উত্তরণ করা। পেশাগত পরিচয়ের কারণে হরিজন ও দলিত পরিবারের যে কোনো সদস্যকে রাষ্ট্রীয় যে কোনো ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ শাস্তিযোগ্য করা।

৬.১.৯ জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক

ক) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তার জন্য বিশেষ নীতি গ্রহণ করা। এজন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তার জন্য বিশেষ তহবিল/জরুরি ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা।

খ) জলবায়ু দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গঠন এবং সবুজ অর্থনীতির বিকাশমান খাতগুলিতে তাদের পুনঃপ্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

গ) পরিবেশ বান্ধব শিল্পকে প্রণোদনা দেয়ার পাশাপাশি পরিবেশ বান্ধব দক্ষতা অর্জনের জন্য উৎসাহিত করার জন্য প্রণোদনা চালু করা।

৬.২ কৃষিভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

৬.২.১ কৃষি শ্রমিক

বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। মোট দেশজ জাতীয় উৎপাদনে এই খাতের অবদান প্রায় ১৪ শতাংশ। এই খাত দেশে কর্মসংস্থানেরও বৃহৎ উৎস। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী মোট কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ৭২,৯১,৮৪০ (মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৪৫ শতাংশ) জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬৮,৪৪,৫৩১ (৯৩.৮৭ শতাংশ) এবং নারীর সংখ্যা ৪৪,৭৩০৯ জন (মোট কর্মজীবী নারীর প্রায় ৬০ শতাংশ)।[153] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সালের সংজ্ঞা অনুসারে কৃষি ক্ষেত্রে সাময়িক, অস্থায়ী, স্থায়ী, মৌসুমি এবং চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক বিদ্যমান।[154] ২০১৭ সালের কৃষি মন্ত্রণালয়ের গবেষণা অধিশাখা হতে অধিদপ্তরের অধীন ফার্মগুলিতে শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা থাকলেও[155] ব্যক্তি পর্যায়ে ফার্মগুলির জন্য কোনো নীতিমালা নেই। অধিকাংশ কৃষি শ্রমিক মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ পান এবং নিয়োগপত্র ছাড়া কাজ করেন।[156] তবে সরকারি ও বড় খামারে নিয়োগপত্র ও আইডি কার্ড দেওয়া হয়।

দিন হাজিরা শ্রমিকরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করেন। উভয় পক্ষের মৌখিক চুক্তি অনুযায়ী মজুরি নির্ধারিত হয়। চুক্তিভিত্তিক শ্রমিকরাও দিনব্যাপী করেন তবে এক্ষেত্রে সময়সীমা নির্ধারণে মূল ভূমিকা পালন করেন শ্রমিকরা।

---

[153] Report on Agriculture and Rural Statistics 2018. Bangladesh Bureau of Statistics, 2019, https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/

[154] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-952/section-print-29070.html

[155] কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ২০১৭। গবেষণা অধিশাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ, ঢাকা। https://file-chittagong.portal.gov.bd/

[156] Hossain & M. Ahmed, "Economic and Social Upgrading of Smallholders in Rice Value Chains of Bangladesh: A Case Study," An unpublished Research Report, International Centre for Development and Decent Work, Germany (2018).

চুক্তি অনুযায়ী তারা মজুরি পান। অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনো ওভারটাইম ভাতা পান না। কৃষির ২১টি ধাপের প্রতিটিতে শ্রমিকরা কাজ করেন।[157] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ কৃষি শ্রমিকের সংজ্ঞা থাকলেও তাদের কাজের স্বীকৃতি ও অধিকার সম্পর্কে উল্লেখ নেই।[158] সাধারণত কৃষি ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কোনো অর্জিত ছুটি পান না। তবে খামারের শ্রমিকরা সাপ্তাহিক ১ দিন ছুটি ভোগ করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন খামারের শ্রমিকরা ২০১৭ সালের নীতিমালা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা পান। তবে খামার বহির্ভূত কৃষি শ্রমিকদের কাজের যেমন অনিশ্চিয়তা আছে তেমনি দুর্যোগ ও বিপদে নেই কোনো অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা।[159]

সরকারিভাবে কৃষি শ্রমিকদের নূন্যতম মজুরি নির্ধারণ করা নেই। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের ঊর্ধ্বে একজন কৃষি শ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরি ৩৮৬ টাকা। এর মধ্যে পুরুষের ৩৮৮ টাকা এবং নারীর ৩৪৬ টাকা।[160] কৃষির অনেক ধাপ এখন যান্ত্রিক হওয়াতে একজন শ্রমিক প্রতিদিন কাজ পান না। অন্যদিকে দেখা যায়, কৃষিখাতে নারী-পুরুষ শ্রমিকের মধ্যে মজুরি বৈষম্য রয়েছে। নারী শ্রমিকেরা পুরুষের সমান বা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় দীর্ঘক্ষণ ও জটিল কাজ করেন। তবুও তারা মর্যদা ও মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হন।[161]

শোভন কাজের নীতি অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে কৃষি শ্রমিকদের কোনো নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। অথচ অন্য যে কোনো পেশার থেকে কৃষিতে সবচেয়ে বেশি আহত ও ক্ষতের সংখ্যা বেশি।[162] সরকারি-বেসরকারি খামারে কিছু নির্দেশনা থাকলেও খামার বহির্ভূত শ্রমিকদের জন্য তা অনুপস্থিত। কৃষিতে অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার হলেও শ্রমিকরা কোনো ধরনের সুরক্ষা পান না, ফলে তারা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে থাকেন। অন্যদিকে কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ হয়েছে। প্রশিক্ষণের অভাবে তা ব্যবহার করতে গিয়ে শ্রমিকরা নানাভাবে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন।[163] এক্ষেত্রে সরকারের কৃষি বিভাগের বিশেষ কোনো নির্দেশনা ও ব্যবস্থা নেই। এছাড়া কৃষিতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবে তারা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হন। কৃষি শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য কোনো সরকারি ও বেসরকারি কল্যাণ তহবিল বা বিমা ব্যবস্থা নেই। কৃষিতে কিশোর শ্রম লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারের কিশোররা অর্থের বিনিময়ে কৃষি কাজ করে। এই কিশোররা কৃষি যন্ত্র পরিচালনাও করে থাকে যা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।[164] কৃষি যন্ত্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারি কোনো নির্দেশনা ও পদক্ষেপ নেই। কৃষি শ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তোরণে এবং তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে কমিশন প্রস্তাব করছে যে,

ক) কৃষিকাজে নিয়োজিত সকল শ্রমিকদের কাজের ধরন, সময় ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সার্বক্ষণিক কৃষি শ্রমিক, খণ্ডকালীন কৃষি শ্রমিক, ঋতুভিত্তিক বা অস্থায়ী কৃষি শ্রমিকদের সংজ্ঞায়িত করে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা। এ ক্ষেত্রে কোন কোন কাজ কৃষি কাজ হিসাবে গণ্য হবে সে বিষয়ে শ্রম আইনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা আবশ্যক।

খ) কৃষি শ্রমিকদের তার এলাকার স্থানীয় সরকার বা প্রশাসন কর্তৃক তার কাজের ধরন এবং প্রকৃতি অনুযায়ী যেমন কোন ধরনের কৃষি কাজে নিয়োজিত আছেন এবং সার্বক্ষণিক কৃষি শ্রমিক, খণ্ডকালীন শ্রমিক, ঋতুভিত্তিক শ্রমিক বা অস্থানীয় শ্রমিক ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধীকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান করা।

গ) কৃষি শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ও শর্তাবলি উন্নত করার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। বিশেষ মৌসুমে বিশেষ করে বোরো ও আমন ধান ওঠার আগে ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষি শ্রমিকদের যখন কাজ থাকে

---

[157] বিশ্বাস, সমীরন, 'কৃষিতে নারীর অবদান'। https://www.jugantor.com/todays-paper/little-talk/

[158] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬। http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-952/section-print-29070.html

[159] J. Hossain & M. Ahmed, "Economic and Social Upgrading of Smallholders in Rice Value Chains of Bangladesh: A Case Study."

[160] Report on Agriculture and Rural Statistics 2018. Bangladesh Bureau of Statisrics, 2019, p-36 https://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/

[161] আহম্মেদ, ফারুক, 'কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ আছে, মূল্যায়ন নেই'। https://www.bonikbarta.com/editorial/ls7QBvWnYdMN4aib

[162] Parvez, M. & Shahriar, M. (2018). Agricultural Farm-Related Injuries in Bangladesh and Convenient Design of Working Hand Tools. *Journal of Healthcare Engineering*, Hindawi.

[163] আহম্মেদ, ফারুক, 'স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষায় অবকাঠামোর অভাবে কমছে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা'। https://www.bonikbarta.com/editorial/l9ZHKC4KEXE2hSDC

[164] বাবুল, খান, 'শিশু বয়সেই ওরা কৃষক'। https://mzamin.com/news.php?news=52571#gsc.tab=0

না, সে সময়ে তাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের আওতায় কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়া বা ভাতা প্রদান করা আবশ্যক।

ঘ) আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর উপজেলা পর্যায়ে সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ প্রদান করে কৃষি শ্রমিকদের দক্ষ শ্রমশক্তিতে পরিণত করা জরুরি। প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নারী কৃষি শ্রমিকদেরও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক।

৬.২.২ চাতাল/রাইস মিল শ্রমিক

বাংলাদেশের কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত রাইস মিল বা চাতাল। দেশে বর্তমানে কতটি চাতাল মিল রয়েছে এর নির্দিষ্ট কোনো পরিসংখ্যান নেই। খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য মতে, দেশে তিন ধরনের রাইসমিল রয়েছে: হাস্কিং মিল, আধা-স্বয়ংক্রিয় মিল এবং স্বয়ংক্রিয় মিল। লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা) এর তথ্য মতে দেশে বর্তমানে ৫০৭টি হাস্কিং মিল এবং ৫৮৮৫টি অটো রাইস মিল রয়েছে।[165] তবে এই সকল চাতাল এবং অটো রাইস মিলে বর্তমানে কত সংখ্যক শ্রমিক কাজ করেন তার কোনো সঠিক পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি।

শ্রম আইনের আওতাভুক্ত হলেও চাতাল শ্রমিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যূনতম সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বেশিরভাগ শ্রমিকই কোনো নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র পান না। চাতাল বা মিলে শ্রমিকদের কাজের কোনো নির্দিষ্ট সময় সীমা নেই[166] এবং কাজের তুলনায় মজুরি অত্যন্ত কম এবং অনেক সময় তাও বকেয়া থাকে।[167] আবার নারী ও পুরুষ শ্রমিকভেদে মজুরি বৈষম্য রয়েছে।[168] চাতাল/রাইসমিলে শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হয়।[169] শ্রমিকরা মাতৃত্বকালীন ছুটি, চিকিৎসা সুবিধা, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তার থেকে বঞ্চিত। বর্তমানে চাতাল ব্যবসায়ীরা ব্যাংক ঋণের চড়া সুদ, বাজারের অস্থিতিশীল অবস্থা এবং বড় ব্যবসায়ীদের আধিপত্যের কারণে মিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে কাজ হারাচ্ছেন হাজার হাজার শ্রমিক। আবার অটো রাইস মিলগুলিতে তুলনামূলকভাবে কম এবং দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন হয়। তাই অটো রাইস মিলগুলিতে কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। তাই চাতাল শ্রমিকদের কাজের নিশ্চয়তা ও আর্থিক সমস্যার সমাধানে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) কর্মহীন চাতাল শ্রমিকদের বিশেষ করে এই খাতে কর্মহীন নারী শ্রমিকদের সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অথবা সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে নিয়োজিত করার ব্যবস্থা করা।

খ) মজুরির স্বল্পতার কারণে বিশেষ করে যখন কাজ কম থাকে তখন চাতাল মিল শ্রমিকরা মালিকের কাছ থেকে আগাম টাকা নেন। যা পরিশোধ করার জন্য শ্রমিকদের বাধ্য হয়ে ঐ চাতালে কাজ করতে হয় বা অনেক সময় অন্য চাতাল মালিকের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে হয়। এর ফলে ঋণের এই চক্র থেকে তারা বের হতে পারেন না। তাই শ্রমিকদের এই ঋণ চক্র বা দাদন চক্র থেকে মুক্ত করার জন্য সরকারিভাবে সহজ শর্তে আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা।

৬.২.৩ চা শ্রমিক

বাংলাদেশের চা শিল্প কর্মসংস্থান, উৎপাদন এবং রপ্তানি আয়ের অন্যতম প্রধান খাত। গুরুত্ব বিবেচনায় কমিশন এ খাতে কর্মরত শ্রমিক, শ্রমিক প্রতিনিধি, মালিক, মালিক প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংগঠনের সাথে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলায় একাধিকবার মতবিনিময় সভায় মিলিত হয়। শ্রমিকদের জীবনমান নিশ্চিত, সুষম শিল্প

---

[165] লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন (লিমা), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[166] জাকির হোসেন, মোস্তাপিজ আহমেদ, এবং আফরোজা আখতার, "চাতাল শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি: যৌক্তিক পরিমাণ ও পরিমাণের যৌক্তিকতা," ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টডিজ, ২০১০.

[167] মো. মিনহাজুল হক, অটো রাইস মিল কর্মীদের ঈদ: বোনাস লাগবে না, আমাদের বেতন দেন, প্রথম আলো, ৪ জুন ২০২৪। https://www.prothomalo.com/opinion/letter/08j70gmaed

[168] ঢাকা প্রকাশ, "পুরুষের চাইতে কম মজুরি পায় চাতালে কর্মরত নারীরা," ঢাকা প্রকাশ, ৮ মার্চ, ২০২৪, https://www.dhakaprokash24.com/saradesh/rajshahi/60190

[169] মো. মিনহাজুল হক, প্রাগুক্ত

সম্পর্ক ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে নানামুখী পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন অংশীজনের সাথে আলোচনা করে এ শিল্পের কিছু বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যা গুরুত্বের সাথে বিবেচনার দাবি রাখে।

এই খাতের শ্রমিকদের ঐতিহাসিকভাবে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে চা বাগানে কাজ করার জন্য নিয়ে আসা হয়। তারা বংশপরম্পরায় বাগানের অভ্যন্তরে বসবাস করে। তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় আলাদা। ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন এবং চা শ্রমিক প্রতিনিধিদের বক্তব্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, গ্রাচ্যুইটি/পেনশন, ছুটি, বাসস্থান ইত্যাদি ইস্যুতে মূল শ্রম আইনের সাথে চা শ্রমিকদের প্রাপ্তির মধ্যে বৈষম্য ও অসামঞ্জস্যতা রয়েছে যা চা শ্রমিকদের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। অন্যদিকে নিয়োগকারীগণ বিদ্যমান বাস্তবতা তুলে ধরেছেন, যা এ সেক্টরে ভারসাম্যপূর্ণ ও বাস্তবভিত্তিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

এ প্রেক্ষাপটে শিল্পের উৎপাদনশীলতা, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় নিয়ে চা শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যাসমূহ তথা ভূমি অধিকার, বাসস্থান, স্বাস্থ্যসেবা, কারিগরি শিক্ষা, সন্তানদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কাজের সুযোগ, স্থায়ীকরণ, তাদের নিজের ও পরিবারের জীবনমান উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মজুরি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, ইউনিয়নের নিয়মিত নির্বাচন নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে কমিশনের সুপারিশ হলো, চা শিল্প ও শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলির স্থায়ী ও কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক শ্রমিক ও নিয়োগকারী প্রতিনিধি, সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে আগামী ৬ মাসের মধ্যে একটি পৃথক কমিটি গঠন করা। এই কমিটি সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা, মতবিনিময় সভা হতে প্রাপ্ত মতামত, সুপারিশ ও দাবিসমূহ বিবেচনায় নিয়ে এবং অংশীজনদের সাথে পরামর্শ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত সুপারিশমালা তৈরি করবে যা থেকে চা খাতের বিদ্যমান সকল সমস্যা সমাধানে একটি সামগ্রিক পথনির্দেশনা পাওয়া যায়। [অংশীজনদের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামত, সুপারিশ ও দাবি এই প্রতিবেদনে সংযোজনী আকারে যুক্ত করা হয়েছে।]

৬.৩ রপ্তানিমুখি শিল্প ও এলাকাভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

৬.৩.১ গার্মেন্টস (তৈরি পোশাক) খাতের শ্রমিক

বাংলাদেশের ৪০ লাখ তরুণ নারী-পুরুষ পোশাক শ্রমিক তাদের কাজের মধ্য দিয়ে দেশের পতাকা ও নাম সারা দুনিয়ায় পরিচিত করেছে। তৈরি পোশাক (আরএমজি) শিল্পখাত পরিণত হয়েছে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তিতে। জিডিপিতে এর অবদান ১০.৩৫%[170] এবং মোট রপ্তানি আয়ের ৮২ শতাংশই আসে এই খাত থেকে।[171] দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী রপ্তানি বাজারে এ দেশের অংশ প্রায় ৭.৯ শতাংশ।[172] কর্মরত শ্রমিকের বড় অংশ নারী (৫৮%)। গত পাঁচ বছরে করোনা-মূল্যস্ফীতি-মুদ্রাস্ফীতি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপ সহ নানা সংকট মোকাবিলা করেছে দেশ। প্রভাব পড়েছে অর্থনীতির সাথে পোশাকখাতেও। দেশীয় ও বৈশ্বিক ধাক্কায় অন্যসব রপ্তানি খাত নানা সময় টালমাটাল হয়েছে। কিন্তু এতসব ঘাত-প্রতিঘাতের মাঝেও পোশাক খাতের অগ্রযাত্রা থামেনি, এ খাত অর্থনীতির প্রাণ ভোমরা হয়ে থেকেছে। সরকারের ধারাবাহিক সহযোগিতা ও প্রণোদনা এইখাতে বিশেষ ভূমিকার রেখেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসার উদ্যোক্তাদের স্বপ্ন, পরিণত হয়েছে শত বিলিয়ন ডলারে নেবার অঙ্গীকারে। নতুন নতুন বাজার সীমানা বৃদ্ধি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ২৫০টি সবুজ কারখানা সহ বিশ্বের নিরাপদতম সবুজ কারখানার দেশ হিসেবে স্বীকৃতি, জলবায়ু অভিঘাত বিবেচনায় টেকসই উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০ লক্ষ্য নির্ধারণ সহ নানা আয়োজন - সবই এ খাতের অবনতি নয়, উন্নতিরই চিহ্ন।

কিন্তু তৈরি পোশাক শিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রপ্তানি আয় এবং কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সত্ত্বেও এই শিল্পের শ্রমিকের অধিকার, সুরক্ষা ও কল্যাণের সামগ্রিক চিত্রটি অনেক ক্ষেত্রেই উদ্বেগজনক। বর্তমানে মর্যাদাপূর্ণ-শোভন মজুরি-কর্ম পরিবেশ, নিরাপত্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সুরক্ষা—এই শিল্পের দীর্ঘমেয়াদি স্থিতিশীলতার জন্য অন্যতম করণীয়। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, সাপ্তাহিক ছুটি সহ অন্যান্য ছুটির ঘাটতি, স্বল্প মজুরি ও অপ্রতুল মজুরি বৃদ্ধি, প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন চর্চার অনিশ্চয়তা এবং নারী শ্রমিকের ঘর ও বাহিরের দ্বৈত কাজের বোঝা—এ শিল্পের শ্রমিকের নিত্যদিনের সমস্যা। শ্রম আইনে দৈনিক সর্বোচ্চ দুই ঘণ্টা ওভাটাইমের বিধানে এ খাতের ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যায়। এ অবস্থায় শীর্ষ রপ্তানি খাতের গৌরবের পেছনের কারিগর শ্রমিকদের জীবন সমান তালে অগ্রসর করার বিষয়টি এখন কেন্দ্রীয় বিষয়। কারণ এর সাথে যুক্ত আছে দেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রশ্ন। ৪০ লাখ শ্রমিকের পরিবারের সংখ্যা ধরলে মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই এখানে যুক্ত।

বিরাট নতুন শ্রমশক্তি হিসেবে পোশাকখাতে উপস্থিত নতুন নারীরা একটা সময় এই খাতে ৮০ ভাগই হলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে। প্রযুক্তির বিকাশ, ঘর গৃহস্থালি ও শিশু লালন-পালন ও কারখানার কাজের দ্বৈত বোঝা নারী পোশাক শ্রমিককে সমাজে নাগরিক হিসাবে যথাযথ ভূমিকা রাখা, দক্ষ শ্রমিক হয়ে ওঠা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে বাধা দেয়। এ কারণে নারী পোশাক শ্রমিকের জন্য বিশেষ উদ্যোগ, মাতৃত্বকালীন ছুটি, প্রজনন-মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পর্যাপ্ত ডে কেয়ার, ব্রেস্ট ফিড কর্নার, যৌন হয়রানি ও সহিংসতা মুক্ত কর্ম পরিবেশের নিশ্চিয়তার গুরুত্ব বিবেচনা করতে হবে মালিক ও সরকারকে। কারণ এ সমস্ত আয়োজনের সীমাবদ্ধতা নারী শ্রমিকরা ছিটকে পড়ে, কর্মদক্ষতা বাড়ানোর ও ক্যারিয়ার উন্নতির সুযোগ হয়ে পড়ে সীমিত। তাই নারী শ্রমিকদের অপারেটর হিসেবে যতটা দেখা যায়, অন্যান্য সিনিয়র পদে তেমন দেখা যায় না। এভাবেই নতুন মেশিন আর ঘরে-বাইরের সব সামলে চতুর্থ বিপ্লব এবং অটোমেশনের যুগে পিছিয়ে পড়ছেন নারীরা।

জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন শ্রমিকদের জন্য অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। ৮০-এর দশক থেকে পোশাক খাতের এই দীর্ঘযাত্রায় ২০১৩ সালে রানা প্লাজায় হাজারো প্রাণহানী ও তাজরীনের ঘটনা নতুন জাগরনী ডাক নিয়ে

---

[170] Bangladesh Bank (2023). Quarterly Review on Readymade Garments (RMG): April-June of FY23. External Economics Wing, Research Department, Bangladesh Bank.

[171] GoB (2023). Bangladesh Economic Review 2023. Dhaka: Ministry of Finance, Government of the People's Republic of Bangladesh.

[172] Zaman, A. U. (2023, August 2). Bangladesh retains 2nd position in garment exports. Textile Today.https://www.textiletoday.com.bd/bangladesh-retains-2nd-position-in-garment-exports.

সামনে আসে। সারা দুনিয়া নতুন করে বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকের জীবনের গল্প জানতে শুরু করে। সস্তা মজুরের পরিচয় দূর করা, মর্যাদাপূর্ণ মজুরি, নিরাপদ জীবন ও প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত ও আইনি হয়রানি মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে সরকার-শ্রমিক-মালিক-বিদেশি বায়ার, ভোক্তা সকলের মনোযোগে আসে।

বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকরা 'মেইড ইন বাংলাদেশ ট্যাগ' পোশাকের সাথে সেলাই করে পাঠায় বিদেশি বাজারে। এই পুরো প্রক্রিয়ায় শ্রমিক ও পোশাকখাত হয়ে উঠে গ্লোবালাইজেশনের অংশ। এই খাতে মুনাফার বড় অংশ যায় বিদেশি বাজারে। তাই শ্রমিকের অধিকার আদায়ে সরকার ও মালিকের দায়বদ্ধতার পাশাপাশি বিদেশি বায়ারের দায়বদ্ধতার, ক্রয় চর্চার ধরন ইত্যাদি প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে এইখাতে যুক্ত আছে। একই সাথে রপ্তানি নীতি নির্ধারণ ও বিদেশি বায়ারদের সাথে দরকষাকষিতে উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্ব দেবার প্রয়োজনীয়তাও সামনে আসছে। সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতে পোশাকখাতের শ্রমিক-উদ্যোক্তার ভূমিকার বিকাশ এবং শ্রমিকের জীবন-জীবিকা-জবানের অধিকার সুরক্ষা-কল্যাণে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক) পোশাক খাতে শ্রমিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা করার সুযোগ ও প্রকৃত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিতে সরকার ট্রেড ইউনিয়ন শর্ত শিথিলযোগ্য করা।

খ) সকল শ্রমিকের কাজের শর্ত উল্লেখ করে নিয়োগপত্র নিশ্চিতের ব্যবস্থা তদারকি জোরদার করা।

গ) গার্মেন্টস শিল্পে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও পরিবর্তিত চাহিদার সাথে শ্রমিকদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য মালিক ও সরকারের উদ্যোগে শ্রমিকদের পুনঃপ্রশিক্ষণের নতুন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং তাদের দক্ষতার সার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ঘ) কারখানায় ও এলাকায় প্রয়োজনীয় যথাযথ মানসম্পন্ন ডে কেয়ার, বাসস্থান ও কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা।

ঙ) যৌন নিপীড়ন ও সহিংসতামুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতে হাইকোর্ট নির্দেশ ২০০৯ ও আইএলও ১৯০ নীতিমালা ও অভিযোগ সেল গঠন করা।

চ) কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকের প্রমোশন এবং আপগ্রেডেশনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রমোশন ও আপগ্রেডেশনের নীতি তৈরি করা, যাতে তাদের ক্যারিয়ারে উন্নতির সুযোগ নিশ্চিত হয় এবং কারখানার ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়।

ছ) শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কারখানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় স্কিম বা প্রোগ্রাম চালু করা। এছাড়া প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে পেশাদার কাউন্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।

জ) কারখানাগুলি যেন তাদের অটোমেশন/প্রযুক্তিগত পরিবর্তন পরিকল্পনা এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং দক্ষতার চাহিদা আগে থেকেই প্রকাশ করে সে জন্য কৌশল নির্ধারণ করা।

ঝ) কোনো শ্রমিককে সম্মতি ব্যতিরেকে কর্ম দিবসে অতিরিক্ত কাজ না করানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সর্বদাই এ শিল্পে কাজের চাপ এবং অতিরিক্ত শ্রম/শ্রমিকের চাহিদা বিদ্যমান। এক্ষেত্রে শ্রমিককে অমানবিক কর্মঘণ্টার চাপ হতে মুক্ত করতে বিভিন্ন কারখানায় 'শিফট ভিত্তিক' কাজ চালু করা। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি, উৎসব ছুটি সহ সকল ছুটি যথাযথভাবে কার্যকর আছে কিনা তদারকি করা।

ঞ)বিজিএমইএ/বিকেএমইএ'র ডাটাবেস হতে কারখানাগুলির মধ্যে শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিকর তথ্য শেয়ারিং বন্ধ করা, যাতে তা তাদের ক্ষতির কারণ না হয়, ভবিষ্যৎ কাজের সুযোগের জন্য কোনো প্রতিবন্ধতকা সৃষ্টি না করে।

ট) রানা প্লাজা ও তাজরীন শ্রমিক প্রাণহানীর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির বিচারপ্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করা। দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের জন্য মানদণ্ড পূর্ণ মূল্যায়ন করা।

ঠ) পোশাক শ্রমিক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক স্থান সুরক্ষা, স্মৃতিসৌধ ও জাদুঘর গঠনে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যক্রম, শিক্ষা কোর্স ও মিডিয়ায় শ্রমিকের জীবন গাঁথা মর্যাদাপূর্ণভাবে উত্থাপন ও ইতিহাস সংরক্ষণ করতে হবে।

ড) শ্রমিকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হয়ারানিমূলক সকল মামলা প্রত্যাহারে ব্যবস্থা নেয়া। শ্রমিকের আইনি সুরক্ষায় সরকারের উদ্যোগী ভূমিকা রাখা।

ঢ) রাত্রিকালীন কাজের ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করা। এ ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর পক্ষ হতে পরিবহণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ণ) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী রপ্তানিমুখি তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য একটি "জাতীয় কর্মস্থল নিরাপত্তা নীতিমালা" প্রণয়ন করা প্রয়োজন, যাতে দেশি বিদেশি সকলেই একটি একক মানদণ্ড মেনে চলতে পারে।

ত) সকল রপ্তানিমুখি শিল্পের সুরক্ষা তদারকি ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সেফটি ইউনিট গঠন প্রয়োজন, তা একটি ত্রি-পক্ষীয় উচ্চ পর্যায়ের কমিটির কাছে যার জবাবদিহিতা থাকবে।

থ) পোশাক শিল্পে কর্মরত সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জীবনমান ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি মধ্যম মেয়াদি রোডম্যাপ প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

দ) কারখানায় নিরাপত্তা নিশ্চিতে দেশীয় সামর্থ্য উন্নয়ন এবং দেশীয় বিশেষজ্ঞ সহ বিশেষ ব্যবস্থা সরকারি ব্যবস্থাপনা তৈরি করা। এই ব্যবস্থাপনার জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

ধ) জাতীয়ভাবে সরকার, মালিক ও ট্রেড ইউনিয়িনের যৌথ অংশীদারিত্বে গার্মেন্টস শিল্পের জন্য ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন এবং ন্যায্য রূপান্তরের বিষয়সমূহ মনিটরিংয়ের জন্য মনিটরিং ইউনিট গঠন।

৬.৩.২ চিংড়ি শিল্প শ্রমিক

বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মধ্যে চিংড়ির অবদান প্রায় ৮৬ শতাংশ। চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা, ঘের এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৪৬ লাখ ৯৭ হাজার। এখাতে কর্মরত শ্রমিকের ৮০ শতাংশই নারী শ্রমিক।[173] খামারগুলিতে নারী ও পুরুষ শ্রমিক একইসাথে একই রকম কাজ করলেও সম পরিমাণ কাজের জন্য দৈনিক একজন পুরুষ পায় ৩৫০ টাকা এবং নারী শ্রমিক পান ১৮০-২০০ টাকা। মজুরি বৈষম্যের জন্য একজন নারী শ্রমিক বছরে প্রায় ৩৬ হাজার টাকা কম আয় করেন।[174] চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পে শ্রমিকদের মজুরি সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম। শ্রমিকরা দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও প্রায়ই ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতে হয়।[175]

চিংড়ি ঘেরে কর্মপরিবেশ অস্বাস্থ্যকর। বিশ্রামের জন্য ছাউনি নেই, শৌচাগারের অভাব ও খাবার পানির সংকট রয়েছে। কিছু চিংড়ি খামারের পানি পঁচে যাওয়ার কারণে দূষিত পরিবেশে কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়েন। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে নারী শ্রমিকরা স্বল্প মজুরিতে (কেজি প্রতি ১০ টাকা) চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণে নিয়োজিত। দীর্ঘদিন লবণ পানিতে কাজের ফলে তারা ডায়রিয়া, আমাশয়, শরীর ফুলে যাওয়া, চর্মরোগ, মাথা ঘোরা, অসময়ে গর্ভপাত ও জরায়ু ক্যান্সারের ঝুঁকিতে থাকেন। ক্যান্সারের ঝুঁকির কারণে নারী শ্রমিকের অনেকেই অল্প বয়সেই জরায়ু অপসারণে বাধ্য হন।[176] চিংড়ি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি এবং কাজের পরিবেশ বিবেচনায় কমিশন প্রস্তাব করছে যে,

ক) চিংড়ি শিল্পে নিয়োজিত সকল শ্রমিকের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। নিয়োগকারীর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে সকল শ্রমিকের জন্য সুরক্ষা সরঞ্জাম যেমন; মাস্ক, গ্লাভস, গামবুট ইত্যাদি নিয়মিতভাবে সরবরাহ করা এবং শ্রমিকদের সেগুলি ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।

খ) স্বাস্থ্যের অবস্থা নিয়মিতভাবে যাচাই করার জন্য নির্দিষ্ট বিরতিতে মেডিকেল ক্যাম্প পরিচালনা করে স্বাস্থ্য ঝুঁকি নির্ণয় ও চিকিৎসা নিশ্চিত করা। সবার জন্য হেলথ কার্ড সরবরাহ করা।

গ) কর্মক্ষেত্রে বিশ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক বিশ্রামের স্থান, মাতৃদুগ্ধ কর্নার, সুপেয় পানির সরবরাহ ও শৌচাগার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

---

[173] "চিংড়ি শিল্পে নারী শ্রমিক বৈষম্যের শিকার, সমস্যা সমাধানের তাগিদ ডেপুটি স্পিকারের," Voice Ekattor, সেপ্টেম্বর ৩০, ২০২৩, https://voiceekattor.com/চিংড়ি-শিল্পে-নারী-শ্রমিক/

[174] প্রাগুক্ত

[175] এস এম চন্দন, "খুলনার চিংড়ি শিল্প শ্রমিকদের কথা," Weekly Ekota, March 16, 2025, https://www.weeklyekota.net/index.php/home?page=details&serial=12015.

[176] "চিংড়ি শিল্পে কি হচ্ছে: জরায়ু ক্যান্সারে নারীত্ব হারিয়ে সংসার ভাঙছে অনেক নারী শ্রমিকের," দৈনিক দৃষ্টিপাত, অক্টোবর ০২, ২০২৩।

ঘ) চিংড়ি শিল্পে কর্মরত নারী-পুরুষের সমমানের কাজে সমমজুরির বিধান নিশ্চিত করা।

৬.৩.৩ ট্যানারি শ্রমিক

বাংলাদেশের ট্যানারি শিল্প একটি শ্রমনির্ভর খাত। বাংলাদেশের ২২০টি ট্যানারি থেকে উৎপাদিত প্রক্রিয়াজাত চামড়ার মোট ৭৬ শতাংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। এই খাতে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রায় ৮৫০,০০০ কর্মী নিয়োজিত রয়েছে, যার মধ্যে ৬০ ভাগ নারী।[177] বাংলাদেশের শ্রমঘন অন্যান্য শিল্পের মতোই, শ্রমমান ও কর্মস্থলের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে চামড়া ট্যানিং শিল্পও ব্যতিক্রম নয়, যেখানে অমানবিক কর্মপরিবেশ একটি সাধারণ বিষয়। ট্যানারি শ্রমিকদের জন্য উন্নত জীবনযাত্রা ও কর্মপরিবেশের লক্ষ্যে হাজারীবাগ থেকে স্থানান্তরের পরেও শিল্পটি পরিবেশ দূষণ যেমন প্রতিরোধ করতে পারেনি, তেমনি এখনও শ্রমিকদের জন্য মৌলিক শ্রম অধিকার, যেমন নিয়োগপত্র ও চুক্তিপত্র, ন্যূনতম মজুরি এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি।[178] এমনকি সাভারের হেমায়েতপুরে চামড়া শিল্প নগরী গড়ে তোলা হলেও সেখানে শ্রমিকের আবাসন এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতের জন্য কোনো মেডিকেল সেন্টার/হাসপাতাল স্থাপন করা হয়নি। চামড়া খাতে শ্রমিকদের সাধারণত ঠিকাদারের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়। এই খাতে স্থায়ী শ্রমিকের চেয়ে অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেশি। শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিককে নিয়োগপত্র ও চুক্তিপত্র প্রদানের বিধান থাকলে ট্যানারি ফ্যাক্টরিগুলিতে তা মেনে চলা হয় না। একটি গবেষণায় দেখা যায় প্রায় ৯৫ ভাগ শ্রমিকের কোনো নিয়োগপত্র বা চুক্তিপত্র নেই।[179] আবার ট্যানারিগুলি অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ দেয় যারা ১০ থেকে ১৫ বছর চাকরি করার পরও স্থায়ী হতে পারেননি।[180] স্থায়ী না হওয়ার কারণে নিয়োগপত্র, আইডি কার্ড সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত। ২০২৪ সালে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত গেজেট অনুযায়ী ট্যানারি শ্রমিক ও কর্মচারীর মজুরি সাভার এলাকার জন্য ১৮০০১ টাকা এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ১৭০৪৮ টাকা নির্ধারিত হয়েছে[181] কিন্তু এখন পর্যন্ত তার বাস্তবায়ন হয়নি। পেনশন, বিমা সুবিধা ও উৎসবভাতা সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকেও অনেক শ্রমিক বঞ্চিত। আবার নবিস শ্রমিকদের কোনো মজুরি দেয়া হয় না, শুধু হাতখরচ দেয়া হয়।[182]

ট্যানারি শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার মধ্যে কাজ করে থাকেন। গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সমস্যা হচ্ছে অনিরাপদ রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, অস্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ, স্বাস্থ্য সেবার অনুপস্থিতি, কম মজুরি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের অভাব।[183] Human Rights Watch-এর একটি প্রতিবেদনে ট্যানারি শ্রমিকদের নানা ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়ে এবং এসকল কারখানায় ব্যবহৃত সালফিউরিক অ্যাসিড, ক্রোমিয়াম এবং সীসা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য যেসব বিরূপ প্রভাব ফেলে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[184] ক্ষতিকর রাসায়নিকের অসুরক্ষিত ব্যবহারের ফলে ত্বক ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ ট্যানারি শ্রমিকদের মধ্যে সাধারণ স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা যায়।[185] আরেকটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ত্বকের রোগ, মাসকিউলোস্কেলেটাল ব্যাধি, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা, দীর্ঘস্থায়ী মাথাব্যথা এবং শ্বাসকষ্টজনিত রোগ চামড়া শিল্পের শ্রমিকদের সাধারণ স্বাস্থ্য

---

[177] Bangladesh Investment Development Authority, "Leather and Leather Goods," Retrieved March 2, 2025, from https://bida.gov.bd/storage/app/uploads/public/650/adb/872/650adb872b637097610685.pdf

[178] Jitendra Nath Paul, "Savar tannery states: A project that offers lessons from errors," The Business Standard, 26 January 2022.

[179] M. A. Eusuf, M. A. Khaleque, and E. A. Rana, *Employment and working conditions in Bangladesh's leather industry Evidence from a survey of tannery workers*, 2022, https://togetherfordecentleather.org/wp-content/uploads/2022/09/Report-Conditions-in-Bangladeshs-leather-industry-final.pdf

[180] জনকণ্ঠ, "চামড়া শিল্পনগরে হ-য-ব-র-ল অবস্থা," ২৪ জুন, ২০২৪, https://www.dailyjanakantha.com/different-news/news/724920.

[181] Nurnahar Akter Tania, "Tannery workers demand minimum wage Tk25,000," Textile Today, 30 March 2024.

[182] জনকণ্ঠ, "চামড়া শিল্পনগরে হ-য-ব-র-ল অবস্থা," ২৪ জুন, ২০২৪, https://www.dailyjanakantha.com/different-news/news/724920.

[183] Md Tuhin Mia, Md Atiqur Rahman Sarker, and Md Zahidul Islam, "Labor rights of tannery workers in Bangladesh: an overview," *Management* 5, no. 1 (2022): 78-92.

[184] Human Rights Watch, "Toxic Tanneries: The Health Repercussions of Bangladesh's Leathers," (2012).

[185] A. R. Sarker, "Occupational Health and Safety (OHAS) crisis in tanneries of Bangladesh: Is this the violation of labor rights," *European Journal of Business and Management (EJBM)* 6, no. 16 (2014): 2222-1905.

সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম।[186] এমতাবস্থায় শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, ট্যানারি শিল্পের শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সহ তাদের ন্যায্য মজুরি এবং চাকরির নিরাপত্তায় আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি। কমিশন এ প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সুপারিশ করছে:

ক) ট্যানারি শিল্পে অস্থায়ী নিয়োগ এবং মধ্যস্বত্বভোগী কনট্রাক্টরের মাধ্যমে অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করে শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ দেয়া এবং শ্রম আইন অনুযায়ী চাকরির সকল শর্তের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

খ) ট্যানারি শিল্পের জন্য ন্যূনতম মজুরির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে মজুরি বাস্তবায়নের মূল্যায়ন রিপোর্ট তৈরি করা।

গ) ট্যানারির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও রাসায়নিক ঝুঁকি বিবেচনায় এ খাতের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শ্রম পরিদর্শক নিয়োগ করা আবশ্যক। পাশাপাশি একটি নিয়ন্ত্রিত ও কাঠামোবদ্ধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই শিল্পে কর্মপরিবেশজনিত ঝুঁকি নিরূপণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা।

ঘ) ট্যানারি শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি বিবেচনায় আলাদা স্বাস্থ্য ঝুঁকি নীতিমালা প্রণয়ন করা। এই নীতিমালার আওতায় ট্যানারিসমূহে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (OSH) অফিসার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা।

ঙ) চামড়া শিল্প নগরীতে ট্যানারি শিল্প শ্রমিকদের জন্য পেশাগত ব্যাধি বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।

চ) চামড়া শিল্প নগরী কেন্দ্রিক শ্রমিক আবাসন এবং শ্রমিক পরিবারের সন্তানের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করা।

৬.৩.৪ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের শ্রমিক

রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়ন ও বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য গঠিত একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল যা দেশের রপ্তানি আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখছে। বর্তমানে দেশের ৮টি ইপিজেড-এ প্রায় পাঁচ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন, যার ৬৬% নারী। এসব শ্রমিক তৈরি পোশাক, চামড়া, ইলেকট্রনিকস, প্লাস্টিক, টেক্সটাইল, ওষুধ সহ বিভিন্ন রপ্তানিমুখি শিল্পে কর্মরত। ইপিজেড বহির্ভূত শ্রমিকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ দ্বারা সুরক্ষিত হলেও ইপিজেড শ্রমিকের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা একটি পৃথক আইন 'বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯' দ্বারা নির্ধারিত। এই আইন ইপিজেড শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, বেতন পরিশোধ, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিধান সহ শ্রমিকদের কল্যাণ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এবং ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৯-এর মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান। এই আইনের মাধ্যমে শ্রমিকরা ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (WWA) গঠন করতে পারেন, যা ইপিজেডে কর্মরত শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করে। উল্লেখ্য, ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন (WWA) ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প নয়। এমনকি এই শ্রমিক কল্যাণ সমিতিগুলি বেসরকারি সংস্থার সাথে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না এবং বাইরের ইউনিয়ন বা ফেডারেশনের সাথে তাদের সম্পর্ক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়া এ আইনে শ্রম আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার অধিকারও অত্যন্ত জটিল এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত।

শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, ইপিজেড-এর ভেতরে ও বাইরে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে অধিকার ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যমান পার্থক্য/বৈষম্য নিরসন জরুরি এবং এ লক্ষ্যে শ্রম সংস্কারের একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হলে ইপিজেড শ্রমিকদের জন্য আলাদা আইন রাখার বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন। আদর্শগতভাবে, দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য শ্রম আইনের আওতায় ইপিজেড শ্রমিকদেরকেও আনা উচিত, যাতে করে ইপিজেডের বাইরের শ্রমিকদের জন্য যে শ্রম অধিকার, কল্যাণমূলক ও সুরক্ষার বিধান রয়েছে সেগুলি ইপিজেড শ্রমিকদের জন্যও প্রযোজ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে, একটি সুসংহত ও একক শ্রম আইন কাঠামো তৈরি করা প্রয়োজন, যা ইপিজেড ও ইপিজেড-বহির্ভূত শ্রমিকদের শ্রম অধিকারের সমান সুরক্ষা প্রদান করবে। একক শ্রম আইনি কাঠামো শুধু শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করবে না, বরং আন্তর্জাতিক শ্রম মানের সাথে বাংলাদেশের শ্রম আইনকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করবে এবং শ্রমিকের কাজের স্থান (ইপিজেড, ইপিজেড-বহির্ভূত) ব্যতিরেকে সব শ্রমিকের জন্য ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত করবে।

---

[186] Rahman MM, Hassan MR, Kabir S, Immamuzzaman M, Rahman SR, Basher MS. Health Problems of Bangladeshi Tannery Workers. Mymensingh Med J. 2022 Apr;31(2):421-427. PMID: 35383761.

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক. একটি সুসংহত ও একক শ্রম আইন কাঠামো তৈরি করা যা ইপিজেড ও ইপিজেড-বহির্ভূত শ্রমিকদের শ্রম অধিকারের সমান সুরক্ষা প্রদান করবে। আদর্শগতভাবে অন্যান্য শ্রমিকদের জন্য প্রযোজ্য শ্রম আইনের আওতায় ইপিজেড শ্রমিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা, যাতে করে ইপিজেডের বাইরে শ্রমিকদের জন্য যে সকল শ্রম অধিকার বিদ্যমান সেগুলি সমভাবে ইপিজেড শ্রমিকদের জন্যও প্রযোজ্য হয়।

খ. ইপিজেড শ্রমিকদের শ্রম আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে শ্রমিক কল্যাণ সমিতিসমূহের সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ রাখা।

গ. ইপিজেডের বিশেষ কার্যক্রম ও বাস্তবিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটি পৃথক শ্রম আইন রাখা যেতে পারে। প্রয়োজন হলে এটা নিশ্চিত করা যে উক্ত আইনে নির্ধারিত ইপিজেড শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা দেশের সাধারণ শ্রম আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বিশেষ করে সংগঠিত হওয়ার তথা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার (FoA), যৌথ দরকষাকষির অধিকার (CBA) এবং আদালত ও আইনি সহায়তার সমান সুযোগ দেশের অন্যান্য শ্রমিকদের মতোই ইপিজেড শ্রমিকদের জন্যও নিশ্চিত করা।

৬.৩.৫ ডক/বন্দর শ্রমিক

বাংলাদেশে বর্তমানে তিনটি সমুদ্র বন্দর রয়েছে, তা হল চট্টগ্রাম, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর। এসকল সমুদ্রবন্দর সমূহে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মরত আছেন, তবে কত সংখ্যক শ্রমিক এই বন্দরসমূহে কর্মরত আছেন সে বিষয়ে কোনো পরিসংখ্যান বা তথ্য নেই। বিভিন্ন সময়ে দেশের বন্দর ও ডক শ্রমিকরা তাদের জীবনমান উন্নয়ন, কর্মপরিবেশ ও পেশাগত সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে কথা বললেও তাদের অবস্থার তেমন উন্নয়ন ঘটেনি।

বন্দরসমূহ সম্পূর্ণরূপে সরকারি মালিকানায় পরিচালিত হলেও শ্রমিকদের জন্য বিদ্যমান ব্যবস্থাপনায় একাধিক কাঠামোগত ও নীতি-সংক্রান্ত সমস্যা বিদ্যমান। চট্টগ্রাম বন্দরে অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী প্রায় ৮৭০০ জন স্থায়ী কর্মী থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে কর্মরত আছেন মাত্র প্রায় ৫০০০ জন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে, যা দেশের উচ্চ বেকারত্বের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এক গভীর অসংগতির প্রতিফলন। তদুপরি আউটসোর্সিং প্রথায় নিয়োজিত ২৭০ জন কর্মচারী সহ বন্দরের শ্রম-সম্পৃক্ত কার্যক্রমে কয়েক হাজার শ্রমিক যুক্ত থাকলেও তাদের একটি বড় অংশ অনিয়মিত এবং বৈষম্যের শিকার।

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এ বন্দর শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে। তবে তা বাস্তবায়ন নিয়ে চ্যালেঞ্জ রয়েছে। শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ ও ন্যায্য মজুরি নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হলেও তা বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। বন্দরের শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগে বিধি ও আইন থাকলেও সেই অনুযায়ী সবসময় শ্রমিক নিয়োগ হয় না। ঝুঁকি নিয়ে কাজ করলেও বন্দরের শ্রমিকদের কোনো ঝুঁকি ভাতা নেই, উৎসব ভাতা নেই, এমনকি দুর্ঘটনায় শ্রমিক আহত বা নিহত হলেও ক্ষতিপূরণ পান না, কর্মক্ষেত্রে নেই কোনো নিরাপত্তার সরঞ্জাম।[187]

২০১০ সালে বন্দর শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও পেশাগত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বার্থ ও টার্মিনাল অপারেটর এবং ডক বন্দর শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশনের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির বিষয়বস্তু ছিলো বুকিং সেন্টারের মাধ্যমে বাই-রোটেশন পদ্ধতিতে শ্রমিক কর্মচারীদের বুকিংয়ের ব্যবস্থা করা, একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা ও মজুরি বোর্ড গঠন করে শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি নির্ধারণ করা, হাসপাতাল তৈরি ও বাসস্থানের জন্য ডরমেটরি চালু করা সহ অন্যান্য সমস্যা সমাধান করা। কিন্তু চুক্তি অনুযায়ী শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা পায়নি। বরং চুক্তি অনুযায়ী বন্দরের শ্রম শাখার অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়োগ না দিয়ে লাখ টাকার বিনিময়ে নাম-পরিচয়বিহীন বহিরাগত লোক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে, যা বন্দরের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ।[188] এছাড়া বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিসিটি (নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল) ও

[187] 'স্পষ্ট করে বলতে চাই, আমরা তাঁরাই, যাঁরা নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ করব', প্রথম আলো, ২২ ডিসেম্বর ২০২৪। https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/bsz32wgdob

[188] "লাখ টাকার বিনিময়ে লোক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দরে," চট্টগ্রাম প্রতিদিন, ফেব্রুয়ারি ২৬, ২০২২, https://banglanews24.com/public/daily-chittagong/news/bd/914594.details

সিসিটিগুলিকে (চিটাগং কনটেইনার টার্মিনাল) বেসরকারিকরণের উদ্যোগ নেওয়ার মত বিষয় দেখা দিয়েছে, যা এই সেক্টরের জন্য হুমকি স্বরূপ এবং এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী।

বন্দর সম্পর্কিত শ্রম আইনের ধারা ১৮৫ (ক) শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকারকে খর্ব করে। ধারা ১৮৫ (ক) অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষে নিযুক্ত কর্মচারীগণ তাদের স্ব স্ব কর্তৃপক্ষে কেবল একটি করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারবেন। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহারকারী, বার্থ-অপারেটর, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটর ও বন্দর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত নিয়োগপত্র সহ কাজে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীগণ সমষ্টিগতভাবে স্ব স্ব বন্দরে একটি করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করতে পারবেন।[189] উল্লেখিত কোনো শ্রমিক বা কর্মচারী উপ-ধারা (৩)-এর অধীন কোনো ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হতে পারবেন না, যদি না তিনি এক (১) বছরের অধিককাল কাজে অবিরামভাবে নিযুক্ত থাকেন এবং শ্রমিক বা কর্মচারী হিসাবে নিয়োগপত্র থাকে।[190] ধারা ১৮৫ (ক) এর ৬, ৭ এবং ৮ ধারায় যথাক্রমে ছয় মাসের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন করার বাধ্যবাধকতা, ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর বা উক্ত ধারায় ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার পর বন্দরে বিদ্যমান অন্য সকল ট্রেড ইউনিয়ন বিলুপ্ত হওয়া এবং সরকার কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ ও নিবন্ধন বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বন্দর শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেয়া হয় না এবং শ্রমিকরা অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এই ধারা শ্রমিকদের সংগঠনের অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক।

ডক/বন্দর শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ সুপারিশ করছে:

ক) বন্দর ও ডক শ্রমিকদের আইএলও কনভেনশন ৮৭, ৯৮ এবং শ্রম আইন ২০০৬-এর ভিত্তিতে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হরণকারী শ্রম আইনের ১৮৫ (ক) ধারা বাতিল করা।

খ) দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে অর্জিত শ্রমিক কর্মচারীদের সকল সুযোগ সুবিধা বহাল রাখতে হবে। ২৫/১০/২০১০ সালে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠকে গৃহীত 'সমঝোতা স্মারকে'র (MOU) চুক্তি মোতাবেক ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের বাই-রোটেশন বুকিংয়ের ব্যবস্থা করা ।

গ) বার্থ অপারেটরের মাধ্যমে নিয়োজিত সকল শ্রমিক কর্মচারীকে নিয়মিত করা ও বন্দরের শ্রম শাখার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদান, বেতন বৈষম্য দূরীকরণে রোটেশনে কাজ দেয়া।

ঘ) ঝুঁকি ভাতা, উৎসব ভাতা, বন্দরের শ্রমিকদের মতো পেনশন প্রদান।

ঙ) যে সকল প্রাইভেট কোম্পানির সাথে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হওয়ার পথে তাদের সাথে নতুন করে কোনো চুক্তি না করা এবং বন্দরকে বেসরকারিকরণের সকল প্রক্রিয়া বন্ধ করে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বন্দরের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা।

চ) বন্দরে নতুন করে আউটসোর্সিং ও চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করা।

ছ) কর্মরত ও বন্দরে শ্রম শাখায় যাচাই-বাছাইকৃত সকল শ্রমিক-কর্মচারীর বন্দরের পরিচয়পত্র প্রদান করা।

জ) কর্মরত সকল শ্রমিককে দুর্ঘটনার ঝুঁকি মুক্ত রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬.৪ শিল্পভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

৬.৪.১ রাষ্ট্রায়ত্ত বন্ধ কারখানা

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পাট শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতার পর এ শিল্প জাতীয়করণ করা হয়। এর মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার আশা করা হয়েছিল, গঠন করা হয়েছিলো বাংলাদেশ জুট মিল কর্পোরেশন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটি নানা সংকটের সম্মুখীন হতে থাকে। বন্ধ হয় একের পর এক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কারখানা। স্বাধীনতার পরপর যেখানে পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি আয়ের ৮৭ শতাংশ আসতো যা বর্তমানে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে।[191] মূলত দুর্নীতি, অদক্ষতা, অযোগ্যতা ও অব্যবস্থাপনের

[189] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮), ধারা ১৮৫ক(৩)

[190] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮), ধারা ১৮৫ক(৫ ক, খ)

[191] বাংলাদেশে পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা, দৈনিক আজাদী, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১। বাংলাদেশে পাটশিল্পের বর্তমান অবস্থা - দৈনিক আজাদী

কারণে একের পর এক পাটকল বন্ধ হতে থাকে। শ্রমিক ছাঁটাই ও মজুরি না দেওয়ার কারণে কাজ করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন শ্রমিকরা। এর ফলশ্রুতিতে দেখা দেয় শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক-আন্দোলন ও সামাজিক অস্থিরতা।[192] যদিও বেসরকারি খাতের অনেক পাটকল ঠিকই মুনাফা করতে পারছে।[193]

সর্বশেষ ২০২০ সালের ১ জুলাই সরকার ২৫টি পাটকল বন্ধ করে দেয়। এর বাইরেও বিভিন্ন সময় অনেক পাটকল বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যার ফলে কর্মহীন হয়ে পড়ে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক।[194] যদিও কর্মচ্যুত শ্রমিকদের পুনর্বাসন বিষয়ে তখন বলা হয়েছিলো যে, 'অবসায়নের পর মিলগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণে পিপিপি, যৌথ উদ্যোগ, জিটুজি, লিজ মডেলে পরিচালনার উদ্যোগ নেওয়া হবে। নতুন মডেলে পুনরায় চালু করা মিলে অবসায়নকৃত শ্রমিকরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজের সুযোগ পাবেন এবং একই সঙ্গে এসব মিলে নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে।' আরো বলা হয়েছিলো, সকল শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি এককালীন দ্রুত পরিশোধ করা হবে। কিন্তু এ সকল শ্রমিকেরা তাদের বেতন ও পাওনাদি নিয়ে ক্রমশ জটিলতার সম্মুখীন হন। এখনও পর্যন্ত বহু শ্রমিক তাদের প্রাপ্য বেতন ভাতা পাননি। পাঁচটি বন্ধ পাটকলের (খালিশ পুর জুটমিল, দৌলতপুর জুটমিল, জাতীয় জুটমিল, কর্ণফুলী জুটমিল ও কর্ণফুলী কার্পেট মিল) শ্রমিক, শ্রম সংস্কার কমিশনে অভিযোগ করেন যে, তাদেরকে দৈনিক মজুরিভিত্তিক শ্রমিক হিসেবে দেখিয়ে তাদের বকেয়া মজুরি পরিশোধ করা হয়নি। এসকল শ্রমিকেরা প্রতি নিয়ত হতাশা এবং দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হচ্ছেন। অনেক শ্রমিক এখনো কর্মহীন জীবন আতিবাহিত করছেন বা অনেকে দিন মজুরি করে জীবন অতিবাহিত করছেন।[195] এ সকল শ্রমিকদের শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) বর্তমানে সরকার বন্ধ পাটকলসমূহ ইজারা প্রদানের মাধ্যমে চালুর চেষ্টা করছে। ইজারা প্রদান বাতিল করে সকল বন্ধ সরকারি পাটকল পুনরায় রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে চালুর ব্যবস্থা করা।

খ) পাটকলগুলিতে পুনরায় উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা ও কার্যকর পরিচালনার লক্ষ্যে বিগত দিনে ট্রেড ইউনিয়ন, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে, সেগুলি পর্যালোচনা করে দেশের পাটশিল্প ও পাটচাষকে টেকসই করার লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

গ) বিভিন্ন সময়ে সরকারের অদূরদর্শী পরিকল্পনা ও আমলাদের দুর্নীতি ও মাথাভারী অপচয়ের ফলে পাটকলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত ও পর্যালোচনা প্রয়োজন।

ঘ) পাটকল এলাকায় অবস্থিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথভাবে পরিচালনা করা, যাতে শ্রমিকের সন্তানদের শিক্ষা অব্যাহতভাবে চলতে পারে।

ঙ) পাটচাষ, পাটদ্রব্য উৎপাদন ও রপ্তানি - সমগ্র বিষয় বিবেচনায় রেখে পাটখাতকে উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

চ) বিভিন্ন সময়ে পাটকল বন্ধের সাথে শ্রমিকদেরকে তাদের প্রাপ্য পাওনা (যেমন; বেতনভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড) থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সে সব পাওনা ক্ষতিপূরণ সহকারে শ্রমিকদের পরিশোধ করে তাদের জীবনযাত্রা পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করা।

ছ) বন্ধ কারখানাগুলিকে এলাকার প্রয়োজন ও আর্থ-সামাজিক বিবেচনায়, স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক বহুমুখী শ্রমঘন শিল্পে রূপান্তরে কার্যকর পদেক্ষপ গ্রহণ করা প্রয়োজন যা বন্ধ কারখানার কর্মহীন শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।

জ) পাটকল শ্রমিক ও তাদের পরিবারের কর্মক্ষম সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণ/বিকল্প প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মহারা পাটকল শ্রমিক ও তার পরিবারের সদস্যদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

---

[192] প্রাগুক্ত,

[193] বাংলাদেশের সরকারি পাটকলগুলি বন্ধ করলো সরকার, দায় আসলে কার, বিবিসি নিউজ বাংলা, ১১ জুলাই ২০২০। https://www.bbc.com/bengali/news-53360302

[194] প্রাগুক্ত,

[195] কল্লোল মোস্তাফা, পাটকলগুলি বন্ধ করে কী লাভ হলো, সমকাল, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ । পাটকলগুলি বন্ধ করে কী লাভ হলো

৬.৪.২ জাহাজ ভাঙা শিল্প

বাংলাদেশে জাহাজ ভাঙা শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ কঠিন, কারণ আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যানের অভাব রয়েছে। তবে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে এ শিল্পে প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিক সরাসরি ও ১ লাখ পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন।[196] তবে পরিত্যক্ত জাহাজ আমদানি কমে যাওয়ায় এবং কিছু কারখানা বন্ধ হওয়ায় অনেক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। বিএসবিআরএ ও শিপ ব্রেকিং ওয়ার্কার্স ট্রেড ইউনিয়ন ফোরামের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে ৩০টি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড বন্ধ হওয়ায় ১০ হাজার শ্রমিক বেকার হয়েছেন।[197]

দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে জাহাজ ভাঙা শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এই শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এই শিল্পে শ্রম আইনের প্রয়োগ সম্পূর্নরূপে উপেক্ষিত। এই খাতের শ্রমিকেরা দৈনিক মাত্র ৩০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪০০ টাকা মজুরিতে ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দৈনিক ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা কাজ করলেও এই শিল্পে জড়িত শ্রমিকেরা কোনো ওভারটাইম ভাতা পান না। কোনো শ্রমিককে নিয়োগপত্র কিংবা পরিচয়পত্র দেয়া হয় না। শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার থাকলেও এই শিল্পের শ্রমিকেরা সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত বাধাগ্রস্থ হন। ইউনিয়ন গঠনের প্রচেষ্টায় শ্রমিকদের হয়রানি ও বরখাস্তের মুখোমুখি হতে হয়। এছাড়া শ্রমিকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত, যা তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[198]

অনেক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের ন্যায় জাহাজ ভাঙা শিল্পে কর্মরত শ্রমিকরাও 'কাজ করলে মজুরি' নীতিতে কাজ করে থাকেন। শ্রমিকদের অধিকাংশই কোনো ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক চুক্তি ছাড়াই নিয়োগপ্রাপ্ত হন, যা তাদের চাকরির নিরাপত্তা ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে। বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি পাওয়ার অধিকার থাকলেও বাস্তবে তারা তা পান না।[199] এই শিল্পে শ্রমিকদের জন্য নৈমিত্তিক ছুটি, পীড়া ছুটি, অর্জিত ছুটি, সাপ্তাহিক কিংবা উৎসব ছুটি—কোনো কিছুরই প্রচলন নেই। শ্রমিকেরা প্রতিনিয়ত স্বাস্থ্য ও জীবনের মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেন। অস্থায়ী ভিত্তিতে এবং ঠিকাদারের অধীনে কাজ করে বিধায় শ্রমিকেরা আহত বা নিহত হলে নিয়োগকর্তা চিহ্নিত করা যায় না। ইয়ার্ডের মালিকরা নিজেরা জাহাজ ভাঙার কাজ না করে অধিক মুনাফার লোভে ঠিকাদারের মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক কাজ করায়। এই সমস্ত ঠিকাদারদের মূলধন বিনিয়োগের সক্ষমতা কম থাকার কারণে শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে না অর্থাৎ ঝুঁকি নিরসনে পূর্ব সতর্কতামূলক কোনো ব্যবস্থা এই সকল ঠিকাদারগণ নেন না। এমনকি শ্রমিকদের পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত আত্মরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি (পিপিই) সরবরাহ করা হয় না। ফলে মৃত্যু ঝুঁকি নিয়েই শ্রমিকেরা বছরের পর বছর কাজ করে চলেছে।[200] ২০১০ সাল থেকে ২০১৮ সালের মধ্যে এ খাতে প্রায় ৯০০ জন শ্রমিকের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে।[201] পুরাতন পরিত্যক্ত জাহাজ রিসাইক্লিং সংক্রান্ত ২০০৯ সালের হংকং কনভেনশনে গৃহিত প্রস্তাবে উল্লেখ আছে যে, প্রতিটি পরিত্যক্ত জাহাজ বর্জ্যমুক্ত করে রিসাইক্লিং করতে হবে। কিন্তু বিষয়টি জাহাজ বিক্রেতা বা ক্রেতা কেউই মানছেন না। ফলে পরিত্যক্ত জাহাজে থাকা বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিক উপাদানের সংস্পর্শে শ্রমিকদের কাজ করতে হয় বিধায় তাদের ফুসফুসের নানাবিধ জটিল রোগ সহ ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার ঝুঁকির মধ্যে থাকে। শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ে কাজ করে এমন একটি বেসরকারি সংস্থা ওশী ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় দেখা গেছে, এক তৃতীয়াংশ শ্রমিকের শরীরে ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর এসবেস্টসের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।[202] জাহাজ ভাঙা শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে কমিশন প্রস্তাব করছে যে,

---

[196] মেরাজ হাসান ও রায়া তাবাসসুম, 'জাহাজ ভাঙা শিল্পের অপার সম্ভাবনা', দৈনিক ইনকিলাব, ৫ মার্চ ২০২০। https://m.dailyinqilab.com/article/272865/জাহাজ ভাঙা শিল্পের অপার সম্ভাবনা

[197] সুকান্ত হালদার, সিফায়াত উল্লাহ, 'পরিত্যক্ত জাহাজ আমদানি কমেছে, কাজ হারিয়েছেন ১০ হাজার শ্রমিক', দি ডেইলি স্টার বাংলা, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, https://images-bn.thedailystar.net/economy/news-447591

[198] হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, বাংলাদেশ: শ্রম অপব্যবহার থেকে শিপিং ফার্মগুলি মুনাফা তুলে নিচ্ছে, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩। https://www.hrw.org/bn/news/2023/09/28/bangladesh-shipping-firms-profit-labor-abuse

[199] প্রাগুক্ত।

[200] ফজলুল কবির মিন্টু, 'ঝুঁকিতে জাহাজ ভাঙা শিল্পের শ্রমিকেরা', ১৮ মার্চ ২০১৮। https://bangla.bdnews24.com/blog/233043

[201] পরিবেশ বিপর্যয়ে জাহাজ ভাঙা শিল্প, দৈনিক করতোয়া, ১১ জানুয়ারি ২০২৫। https://www.dailykaratoa.com/article/113709

[202] প্রাগুক্ত।

ক) জাহাজ ভাঙা শিল্পে একটা জাহাজ ভাঙা শেষ হলে অন্য আর একটি জাহাজ ভাঙার কাজ শুরুর পুর্ব পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় ভাতা প্রদান ও নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

খ) শিপব্রেকিং শিল্পে দুর্ঘটনার হার শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত এবং উন্নত ডিজাইন, প্রযুক্তি এবং উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরো দক্ষ ও নিরাপদ করা।

গ) আমদানিকৃত পরিত্যক্ত জাহাজে অ্যাসবেসটস, ভারি ধাতু, খনিজ তেল, জাহাজের তলা ও ব্যালাস্ট ওয়াটার, পলিসাইক্লিক অ্যারোমাটি হাইড্রোকার্বন, পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল, স্লাজ অয়েল ও অর্গানোটিন সহ বেশ কিছু বিপজ্জনক পদার্থ থাকে যা মানুষ এবং পরিবেশ উভয়ের জন্যই ক্ষতিকর। এই খাতের শ্রমিকেরা প্রতিনিয়ত এই সকল বিপজ্জনক পদার্থ বা বর্জ্যের সংস্পর্শে কাজ করে। কিন্তু তাদের জন্য কর্মক্ষেত্রে গোসল বা কাপড় পরিবর্তনের জন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকায় তারা বর্জ্যযুক্ত কাপড় পড়েই বাড়িতে যায় এবং নিজ নিজ এলাকার পুকুরে গোসল করে। এর ফলে একদিকে যেমন জাহাজের বর্জ্য এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে একই সাথে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়ছে। এ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপদ গোসলের ব্যবস্থা করা এবং নিরাপদ পোশাক সরবরাহ করা আবশ্যক।

ঘ) জাহাজ ভাঙার সময় ঝুঁকিপূর্ণ অংশ চিহ্নিত করতে নির্ধারিত রঙের ব্যবহার অনেক ইয়ার্ডে যথাযথভাবে মানা হয় না, ফলে শ্রমিকরা অজ্ঞতার কারণে দুর্ঘটনার শিকার হন। ঝুঁকি সঠিক পদ্ধতিতে চিহ্নিতকরণে কল কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের তদারকি বৃদ্ধি করা। কাজের ঝুঁকি, ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ কালার কোড এবং জরুরি পরিস্থিতিতে সঠিক পদক্ষেপ সম্পর্কে শ্রমিকদের অবহিতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ঙ) ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া জটিল হওয়ায় তা সহজ করার জন্য আইনগত উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত জাহাজ ভাঙা শিল্প একমাত্র চট্টগ্রামে অবস্থিত। সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠনের ক্ষেত্রে একাধিক বিভাগীয় ট্রেড ইউনিয়ন অন্তর্ভুক্তির শর্ত বাতিল করা প্রয়োজন।

চ) ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও পরিচালনার বিরুদ্ধে ভয়ভীতি প্রদর্শন, চাকরিচ্যুতি বন্ধে শ্রম আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছ) জাহাজ ভাঙা শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদান, কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা ও গ্রাচুইটি সহ চাকরির অবসানে পাওনা নিশ্চিত করা।

জ) আহত ও অসুস্থ শ্রমিকদের (প্রাক্তন শ্রমিকসহ) চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের স্থায়ী ব্যবস্থা করা। শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঝ) অতীতের দুর্ঘটনাসমূহের তদন্ত প্রতিবেদন জনসমক্ষে প্রকাশ করা ও দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তির বিধান করা এবং সুপারিশ অনুযায়ী কর্মপরিবেশ উন্নয়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঞ) এই শিল্পের বিশেষ বৈশিষ্ট্যর কথা বিবেচনায় রেখে ইয়ার্ডভিত্তিক সেইফটি কমিটি ও এলাকাভিত্তিক নিরাপত্তা ও পরিবেশ রক্ষা কমিটি গড়ে তোলা (কমিউনিটিকে যুক্ত করার মাধ্যমে)।

ট) স্থানীয় কৃষি জমি ও জলাশয়সমূহের পরিবেশের উপর ক্ষতিকর কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা করা জরুরি। কৃষি জমি ও জলাশয়সমূহকে নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য শিল্প ও জীবনচক্র রক্ষার জন্য জাহাজ থেকে কোনো ক্ষতিকর বর্জ্য সাগরে নিক্ষেপ বা নিষ্কাশন না করা। বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশের পূর্বে অবশ্যই জাহাজ বর্জ্যমুক্ত করা এবং জাহাজ নিরীক্ষার সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে সম্মিলিতভাবে জাহাজ পরিদর্শন ও কাটার অনুমতি দ্রুত সময়ে প্রদান করা।

ঠ) হংকং কনভেনশন বাস্তবায়ন এবং ইয়ার্ডে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের তালিকা করে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি। বিকল্প কর্মসংস্থান না হওয়া পর্যন্ত তাদের ভাতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬.৪.৩ ক্ষুদ্র পাদুকা শিল্প শ্রমিক

বাংলাদেশের পাদুকা শিল্প রপ্তানি আয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং দেশের অর্থনীতির অগ্রগতিতে অবদান রাখছে। ভালো মানের পণ্য, কাঁচামালের সহজ প্রাপ্যতা, কম মজুরি এবং মুদ্রা বিনিময় হারের সুবিধার কারণে বাংলাদেশ পাদুকা শিল্পের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত হয়েছে। কারখানাগুলির বেশির ভাগ ঢাকা, ভৈরব, চট্টগ্রাম ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অবস্থিত। এই ধরনের কারখানার সংখ্যা ঢাকায় প্রায় ৭ হাজার, ভৈরব ক্লাস্টারে ছোটো বড়ো ৫ হাজার এবং চট্টগ্রামে কয়েকশ রয়েছে। সব মিলিয়ে কারখানার সংখ্যা ১১ হাজারের উপরে এবং প্রায় চার লক্ষাধিক শ্রমিক এই কারখানাগুলিতে কাজ করেন।[203] তবে কাজের অনিশ্চয়তা, স্বল্প মজুরি, শিশুশ্রম, জবরদস্তিমূলক শ্রম ও অস্বাস্থ্যকর কর্মপরিবেশের সাথে পুঁজি স্বল্পতা ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবও এই সকল কারখানার সাধারণ চিত্র।

অনানুষ্ঠানিক বৈশিষ্ঠ্যের কারণে পাদুকা শ্রমিকদের কাজের কোনো নিশ্চয়তা নেই। ঈদ, পূজা, পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি উৎসবে চাহিদা থাকার কারণে বছরে সাত মাস কাজ করলেও বাকি সময় কাজ থাকে না। দৈনিক মজুরি ও ফুরনভিত্তিক শ্রমিকরা কাজ করেন। ফুরনভিত্তিক কাজের ক্ষেত্রে হেল্পাররা সাধারণত পেটেভাতে কাজ করেন এবং মাসে একবার বাড়ি যাওয়ার যাতায়াত খরচ দেয়া হয়। বেশিরভাগ হেল্পারের বয়স ১০ থেকে ১৪ বছরের মধ্যে। আবার একজন আপারম্যান দৈনিক ১৪ ঘণ্টা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ৩০০ টাকা ডজন হিসেবে দুই ডজন জুতার কাজ করার বিনিময়ে ৬০০ টাকা পেয়ে থাকেন। যেখানে শ্রম আইন অনুযায়ী, আট ঘণ্টার অতিরিক্ত কাজের জন্য দ্বিগুণ মজুরি হিসাবে ১৪ ঘণ্টা কাজের জন্য একজন আপারম্যানের দৈনিক মজুরি হওয়ার কথা ৮৬০ টাকা। শ্রমিকদের নিম্ন মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করার ফাঁদ হিসেবে কারখানার মালিকরা শ্রমিকদের অগ্রিম টাকা দিয়ে থাকেন। যে টাকা শ্রমিকরা কখনোই শোধ করতে না পারায় এই শিল্পের মালিকরা শ্রমিকদের ঋণের ফাঁদে আটকে রেখে ইচ্ছে মতো ফুরনভিত্তিক কাজের মজুরি নির্ধারণ করে জবরদস্তি কাজ করতে বাধ্য করা হয়। 'চামড়াজাত পণ্য ও জুতা কারখানা' শিল্প সেক্টরের জন্য ২০২০ সালে নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হলেও তার বাস্তবায়ন এসব ব্র্যান্ডহীন জুতা কারখানায় হয়নি।

শিল্প ও কর্মপরিবেশের বিচারে সরু রাস্তা ও ঘিঞ্জি পরিবেশে গড়ে উঠা এই কারখানাগুলি হচ্ছে একেকটি মৃত্যুকূপ। প্রতিটি কারখানা মাচাং সিস্টেম হওয়ায় শ্রমিকরা দীর্ঘসময় বসে কাজ করার পর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারেন না। তাছাড়া কারখানায় বিভিন্ন ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার থাকায় জুতা তৈরির প্রতিটি ধাপের সঙ্গে ভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি যুক্ত থাকে। আঠার তীব্র বিষক্রিয়া শ্বাসযন্ত্র ও হৃদযন্ত্রের অকার্যকারিতা এবং মৃত্যুর কারণ হতে পারে।[204] ক্ষতিকর রাসায়নিকের কারণে চর্মরোগ, শ্লেষ্মা ঝিল্লির প্রদাহ, চোখের জ্বালা এবং চোখের ব্যথার মতো সমস্যা হতে পারে। একটি নির্দিষ্ট স্থানে দীর্ঘক্ষণ কাজ করার ফলে মেরুদণ্ড ও কাঁধের ব্যথা সহ পেশী ও হাড়ের সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে।[205] ২০টি ফ্যাক্টরির উপর গবেষণায় দেখা গেছে পাদুকা কারখানায় যোগদানের পর শ্রমিকদের মাথা ব্যথা, পেটে ব্যথা, কাঁধের ব্যথা ও চোখের সমস্যা আগে থেকে বেড়েছে।[206]

বাংলাদেশের শ্রমনির্ভর পাদুকা শিল্প বর্তমানে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে, যা মূলত আমদানি নির্ভর বাজার, মূলধনের সংকট এবং দক্ষ শ্রমশক্তির অভাবের কারণে সৃষ্টি হয়েছে। একসময় পাদুকা শিল্প দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে রাখলেও বর্তমানে চীন, ভারত ও মিয়ানমার থেকে আমদানিকৃত পাদুকার আধিপত্য বিস্তার করেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে দেশীয় পাদুকা কারখানাগুলি দেশের বাজারের মাত্র ১০ থেকে ১৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে, যেখানে ৮৫ থেকে ৯০ শতাংশ বাজার বিদেশি পণ্য দ্বারা দখলকৃত।[207] দেশীয় পাদুকা কারখানাগুলির টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের মধ্যে দক্ষ কারিগরের অভাব, মূলধনের অপ্রতুলতা এবং উচ্চ সুদের হার শিল্প

---

[203] প্রকাশ দত্ত, "পাদুকা শ্রমিক: নাম মাত্র মজুরি আর মর্যাদাহীন জীবন," সর্বজনকথা, ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

[204] Rajnarayan R. Tiwari, "Child labour in footwear industry: Possible occupational health hazards." *Indian Journal of occupational and environmental medicine* 9, no. 1 (2005): 7-9.

[205] J. Nieves Serratos-Perez and Carlos Mendola-Anda, "Musculoskeletal disorders among male sewing machine operators in shoemaking," *Ergonomics* 36, no. 7 (1993): 793-800.

[206] Amal Kanti Deb, Manjushree Chowdhury, Forhad Ahammed Bin Azam, and Md Israil Hossain, "Workers' Health and Workplace Condition Evaluation (WCE) Of the Footwear Industries in Bangladesh," *IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food* Technology (IOSR-JESTFT) e-ISSN (2018): 2319-2402.

[207] ফজলুল কবির মিন্টু, "পাদুকা শিল্প রক্ষায় করনীয়," বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণি: আইন ও অধিকার, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০২০।

উদ্যোক্তাদের জন্য বড় বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদের হার এবং সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তির সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক উদ্যোক্তা ব্যবসায় সম্প্রসারণ বা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটাতে পারছেন না।[208]

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক) শ্রম আইন অনুসারে শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করা।

খ) ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য পৃথক শিল্প এলাকা গড়ে তুলে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি জামানতবিহীন ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা, কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হার কমানো ও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে পাদুকা শিল্পের উন্নয়ন করা।

গ) প্রতিটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, বাজার, বাসস্ট্যান্ড এবং অফিস আদালত চত্বরে পাদুকা শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে ছোটো ছোটো কর্মচত্বর বরাদ্দ করা। এ ধরনের কর্মচত্বরগুলির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা করতে স্থানীয় প্রশাসন, শ্রমিক সংগঠন ও উদ্যোক্তাদের সমন্বয় প্রয়োজন। কর্মচত্বরগুলিতে বিদ্যুৎ, পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হলে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও স্বাস্থ্যমান উভয়ই বৃদ্ধি পাবে।

৬.৪.৫ ফার্নিচার শ্রমিক

বর্তমানে দেশে প্রায় ২০ লক্ষ শ্রমিক ৪০ হাজারের মতো ফার্নিচার প্রতিষ্ঠানে মাসিক বেতন ও দৈনিক হাজিরার ভিত্তিতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।[209] এসকল প্রতিষ্ঠানের বেশিরভাগই কুটির, অতিক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। ফার্নিচার শ্রমিকদের অধিকাংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করেন, যেখানে শ্রমিকদের অধিকারের নিশ্চয়তা তুলনামূলকভাবে কম। শ্রমিকরা বংশ পরম্পরায় ও গতানুগতিক সনাতন পদ্ধতিতে কাজ করে থাকেন। ফলে পরিশ্রমের তুলনায় প্রাপ্ত মজুরি কম এবং অনানুষ্ঠানিক খাত হওয়ার কারণে কাজের নিশ্চয়তাও থাকে না। বেশিরভাগ শ্রমিক অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করেন এবং তাদের নিয়োগ ব্যক্তিগত পরিচিতির মাধ্যমে হয়ে থাকে। এই খাতের এসএমইগুলি তাদের শ্রমিকদের নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র প্রদান করে না এবং শ্রমিকরা দৈনিক মজুরিভিত্তিক বা চুক্তিভিত্তিক কাজ করে থাকে।

অধিকাংশ কারখানায় পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। শ্রমিকদের কাঠের গুঁড়া, রং, বার্নিশ, আঠা ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে হয়। যা শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা বা চর্মরোগ, হাঁপানি সহ অন্যান্য শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। কঠিন কাঠের ধূলা বিশেষ করে নাকের ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে। এছাড়া কিছু বার্নিশ, রঙ এবং দাগযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ লিভার ও কিডনির ক্ষতি করতে পারে এবং এমনকি কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের ত্রুটি সৃষ্টি করতে পারে।[210] একটি গবেষণায় দেখা গেছে ফার্নিচার কারখানাগুলিতে তীব্র শব্দ দূষণ হয়, যা শ্রমিকদের শ্রবণ শক্তি ও কাজে মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়।[211] শ্রমিকদের সাধারণত ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE) প্রদান করা হয় না এবং তীব্র শব্দের মধ্যে কাজ করলেও শ্রমিকরা শ্রবণ সুরক্ষার যন্ত্র ব্যবহার করেন না।

এই শিল্পে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিকের অভাব রয়েছে। বৈশ্বিক চাহিদা মেটাতে শিল্পে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতার গুরুত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে এই শিল্পে মোট শ্রমশক্তির ৬৬.০৭ শতাংশ অদক্ষ শ্রমিক এবং ৩০.৪৮ শতাংশ অর্ধদক্ষ শ্রমিক রয়েছে।[212] এ থেকে বুঝা যায় ফার্নিচার শিল্প মূলত নিম্নশিক্ষিত ও অদক্ষ বা অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। অপর দিকে এই সেক্টরে শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে। ফলে এই খাতের সম্ভাবনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলেও

---

[208] সম্ভাবনার পাদুকা শিল্পে সংকট অর্থায়ন ও দক্ষ কর্মীর, লিংকবিডি নিউজ, জানুয়ারি ৪, ২০২৫।

[209] সুকান্ত হালদার, "মানসম্পন্ন কাঁচামালের অভাব ও উচ্চ শুল্ক আসবাবপত্র শিল্পের প্রধান বাধা," দ্যা ডেইলি স্টার বাংলা, নভেম্বর ১০, ২০২২. https://bangla.thedailystar.net/economy/industry/news-414381

[210] Dr Asli Tamer Vestlund (2013), Health and Safety in the Furniture Industry, Furniture and Joinery production. https://www.furnitureproduction.net/resources/articles/2013/10/1551098359-health-and-safety-furniture-industry

[211] Md. Alamgir Hasan, Md Abul Kalam Azad, Md. Kamruzzaman, and Md. Moniruzzaman, "Noise Pollution Levels and Their Impact on Workers in Wood Furniture Factories," ISAR Journal of Multidisciplinary Research and Studies, Vol 2(9), 2024.

[212] Selim Raihan, Bazlul H. Khondker, and Md. Nadim Uddin, "Skill Gap in the Furniture Sector of Bangladesh," Labour Market Study under Skills for Employment Investment Program (2022), Page 16.

এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিদ্যমান শ্রমবাজারের অপূর্ণ চাহিদা পূরণ করা গেলে, ফার্নিচার খাতের বাজার মূল্য ২০৩৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে।[213]

শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, ফার্নিচার শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ প্রয়োজন:

ক) শ্রম আইন অনুসারে একজন শ্রমিক যে ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার কথা ফার্নিচার শ্রমিকদের সেই সুযোগ সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। যেমন নিয়মিত মজুরি, ছুটি, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান করা সহ কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিশুদ্ধ পানি ও পয়োনিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা।

খ) চুক্তিভিত্তিক মজুরির পরিবর্তে সরকার কর্তৃক ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা। এক্ষেত্রে ফার্নিচার শিল্পের কাজের প্রকৃতি বিবেচনায় এই ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা।

গ) নিয়োগকারী কর্তৃক সকল শ্রমিকের জন্য পেশাগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা এবং শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া।

ঘ) ফার্নিচার শ্রমিকদের পেশাগত ব্যাধি নিরূপণে নিয়মিত বিরতিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের পরীক্ষার করা এবং এই স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রতিবেদন সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ।

ঙ) ফার্নিচার শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পমেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স সহ আরও কারিগরি স্কুল স্থাপন করা, যেখানে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে।

চ) ফার্নিচার সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতে দক্ষ নারী কর্মশক্তি গড়ে তুলতে নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। এর সাথে ফার্নিচার শিল্পে নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে সরকার কর্তৃক বিশেষ সুবিধামূলক নীতি যেমন মর্টগেজবিহীন বা সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করা।

৬.৪.৬ পাথরভাঙা শ্রমিক

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি পাথর প্রক্রিয়াকরণ কারখানা লালমনিরহাট, পঞ্চগড় এবং সিলেট অঞ্চলে অবস্থিত। পাথর ভাঙা শ্রমিকের সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানা গেলেও বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় সিলেটে ৫০ হাজারের অধিক,[214] লালমনিরহাটে প্রায় ৪০ হাজার[215] এবং পঞ্চগড়ে প্রায় ১০,০০০ শ্রমিক[216] পাথর ভাঙার কাজ করেন। শ্রমিকদের ৪০ ভাগই নারী শ্রমিক।[217] কর্মসংস্থানের অভাব থাকায় শ্রমিকরা বাধ্য হয়েই স্বল্প মজুরিতেই পাথর ভাঙার মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করে থাকেন। আবার মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়েছে, যেখানে একজন পুরুষ শ্রমিক পায় ৫০০ থেকে ৫৫০ টাকা এবং একজন নারী শ্রমিক পায় ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা।[218] পাথর ভাঙা একটি ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, যেখানে শ্রমিকরা বিভিন্ন রোগ ব্যাধির শিকার হন। পাথর ভাঙা শ্রমিকদের একটি পেশাগত রোগ হচ্ছে সিলিকোসিস। সাধারণত সিলিকা ধূলিকণা নিঃশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণের ফলে এ রোগ হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, পাথর কাটার শ্রমিকদের ৮৯% দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রজনিত সমস্যার রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বুকে চাপ অনুভব (৭৬%), শ্বাসকষ্ট (৭৪.৫%) এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশি (৬৬.৫%)।[219] সিলিকোসিস রোগে আক্রান্তরা সর্বোচ্চ ২ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকেন।

পাথর ভাঙার সাইটগুলি শ্রমিকদের জন্য শুধু ঝুঁকিপূর্ণই নয়, এটা পরিবেশের জন্যও ক্ষতিকর। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, অধিকাংশ কারখানা নিবন্ধন ছাড়াই পরিচালিত হচ্ছে

---

[213] Selim Raihan, Bazlul H. Khondker, and Md. Nadim Uddin, "Skill Gap in the Furniture Sector of Bangladesh," Labour Market Study under Skills for Employment Investment Program (2022), Page 17.

[214] Bappa Maitra, "Around 1,500 illegal stone crushing mills in Sylhet jeopardising public health, degrading environment," bdnews24.com, December 01, 2024, https://bdnews24.com/bangladesh/0851b252e98d

[215] এস দিলীপ রায়, "ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত ৪০ হাজার পাথর শ্রমিক," দ্যা ডেইলি স্টার, মে ০১, ২০২২।

[216] এম মোবারক হোসেন, "পুরুষের মতই পাথর ভাঙে হাজারো নারী, মজুরিতে বৈষম্য," Dhaka Mail, ৮ মার্চ ২০২৩, https://dhakamail.com/country/76089

[217] এস দিলীপ রায়, "ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত ৪০ হাজার পাথর শ্রমিক," দ্যা ডেইলি স্টার, মে ০১, ২০২২।

[218] এম মোবারক হোসেন, "পুরুষের মতই পাথর ভাঙে হাজারো নারী, মজুরিতে বৈষম্য," Dhaka Mail, ৮ মার্চ ২০২৩, https://dhakamail.com/country/76089

[219] Shamim Ahmed, Shah Ashiqur Rahman Ashiq Choudhury, Abir Hasan Dip, Taposh Bose, Ashis Kumar Sarkar, Mohammed Atiqur Rahman, and Jannatul Ferdous, "Respiratory symptoms, spirometric, and radiological status of stone-cutting workers in Bangladesh: A cross-sectional study," *Health science reports* 5, no. 5 (2022): e753, https://doi.org/10.1002/hsr2.753

এবং শ্রমিকদের জন্য কোনো স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই।[220] এছাড়া কারখানাগুলি কোনো পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যার ফলে ব্যাহত হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। পাথরভাঙা শ্রমিকদের জন্য কমিশনের প্রস্তাবনা নিম্নরূপ:

ক) পাথর ভাঙা শ্রমিকদের চাকরির পূর্বে এবং চাকরিতে যোগ দেয়ার পর নিয়মিতভাবে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, যেমন বুকের রেডিওগ্রাফি এবং ফুসফুসের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা নিশ্চিত করা আবশ্যক। এই লক্ষ্যে প্রতি মাসে শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য মালিক কর্তৃক উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে।

খ) স্থানীয় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র এবং স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমন্বিতভাবে শ্রমিকদের সিলিকোসিস রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। এই লক্ষ্যে প্রতি বছর অন্তত একবার শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা যেতে পারে।

গ) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের পাথর ভাঙার সাইটগুলি নিয়মিত তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।

৬.৫ সেবাখাতভিত্তিক শ্রমগোষ্ঠী

৬.৫.১ রেলওয়ে শ্রমিক

রেলখাত রাষ্ট্রীয় ভাবে পরিচালিত একটি খাত যা রেলযান এর মাধ্যমে সর্বনিম্ন ভাড়া, নিরাপদ ভ্রমন নিশ্চিতকরণের মধ্য দিয়ে যাত্রী কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে এই খাতে প্রায় ২৫০৮৩ জন নিয়মিত কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছেন।[221] এই সেক্টরে কর্মকতার নিয়োগে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও পিএসসি থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে থাকলেও কর্মচারী নিয়োগে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব চাকরি বিধি ও নীতিমালার উপর নির্ভরশীল। এই সেক্টরে শ্রমিক ও কর্মচারী নিয়োগে সম্প্রতি সময়ে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ কার্যক্রম প্রদান করা হয়েছে যার কারণে এই সেক্টরের শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত অনেক শ্রমিকরা দীর্ঘদিন যাবত কাজ করলেও তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ না হওয়ায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ ও চাকরি নিয়ে চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে। অনেক শ্রমিকের দীর্ঘদিন যাবত কাজ করে অন্য সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স সীমা শেষ হয়ে গিয়েছে। তাদের বেতন প্রদানেও নানা জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কিছু পদে আউটসোর্সিং করা হয়েছে এবং হচ্ছে যার ফলস্বরূপ এই পদ সমূহের শ্রমিক কর্মচারীদের কাজের নিরাপত্তা সহ কল্যাণ ও সুরক্ষার কাঠামো নিশ্চিত হচ্ছে না।[222] এই সেক্টরকে আরো জনকল্যাণমুখী করতে এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মচারী এবং শ্রমিক নিয়োগে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা দরকার যার মাধ্যমে শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। এই লক্ষ্যে কমিশন প্রস্তাব করছে যে,

ক) সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের তথা ট্রেড ইউনিয়নের মতামত গ্রহণ করা এবং সকল স্তরে নিয়মিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধানের কার্যকর উদ্যোগ নিয়ে প্রত্যাশিত শিল্প সম্পর্ক জোরদার করা এবং এই সেক্টরের উন্নয়নে কাজ করা।

খ) নিয়োগবিধি ২০২০ সংশোধনপূর্বক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির অত্যাবশ্যকীয় কারিগরি শূন্য পদে পিএসসির পরিবর্তে নিজস্ব কমিটির মাধ্যমে জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা। বর্তমানে নিয়োগ বিধির কারণে কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতিতে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর কারণে কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে সম্প্রতি অনুসৃত এককেন্দ্রিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় দুই জোনে আলাদা কমিটির মাধ্যমে বিভাগীয় প্রধানদের পদোন্নতি দ্রুততর করার বিষয়টি বিবেচনা করা।

---

[220] Abu Siddique, "Stone crushing industry exposes workers to deadly silicosis disease," Dhaka Tribune, September 28, 2017, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/nation/126805/stone-crushing-industry-exposes-workers-to-deadly

[221] বাংলাদেশ রেলওয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বাংলাদেশ রেলওয়ে। গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। https://railway.gov.bd/site/page/ce7dd6af-c7c8-4811-86b3-ba871e2e406e/

[222] অস্থায়ী শ্রমিকদের অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ, বাংলা ট্রিবিউন ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪। অস্থায়ী শ্রমিকদের অবরোধ, ঢাকার সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ বন্ধ

গ) রেলের জন্য আউট সোর্সিং বন্ধ করে পূর্বের নিয়মে টিএলআর/অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তির প্রবাহ জারি রাখার উদ্যোগ নেওয়া।

৬.৫.২ নৌযান শ্রমিক

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। দেশের সকল মালবাহী যানবাহনের ৫০ শতাংশ এবং এক—চতুর্থাংশ যাত্রীবাহী যানবাহন নদীপথে চলাচল করে। অভ্যন্তরীণ নদীপথে নৌবহর বা জাহাজের পরিমাণ বাড়ছে এবং বর্তমানে নিবন্ধিত জাহাজের পরিমাণ ২২,৩০০। তাছাড়া ৭ লক্ষ ৫০ হাজার প্রচলিত দেশীয় নৌকার একটি বড় অংশকে যন্ত্রচালিত (ট্রলার) করা হয়েছে। যার আনুমানিক ৬৫ শতাংশ নৌকা হচ্ছে যাত্রীবাহী, যেগুলি প্রধানত গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের কাজে নিয়োজিত এবং বেশিরভাগই মালামাল পরিবহনে ব্যবহৃত হয়। দেশে ২০ হাজার নৌযানে কাজ করছেন অন্তত ২ লাখ শ্রমিক। আমদানি ও রপ্তানি পণ্য পরিবহনের অনেকাংশেই নৌ পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল হওয়া সত্ত্বেও নৌযান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও নিরাপত্তার বিষয়টি সব সময় উপেক্ষিত।[223] দেশের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত নৌযান শ্রমিকরা অনেক অবহেলিত, তাদের সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, নেই কোনো সেবামূলক হাসপাতালের ব্যবস্থা। নৌযান শ্রমিকেদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র দেওয়ার চুক্তি হওয়ার পরেও তা প্রদান করা হয় না। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে নৌযান শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবির বিষয়ে সরকার ও মালিক পক্ষের সাথে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও মালিকরা তা প্রদান করেন না। নৌযান শ্রমিকদের জন্য সরকার ও মালিক পক্ষের সমন্বয়ে ট্রাস্টি বোর্ড এর মাধ্যেমে প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়ন নেই। তাছাড়া ২০১৬ সালের পর থেকে নৌ শ্রমিকদের বেতনভাতাও পুনর্নির্ধারণ হয়নি।[224] নৌ শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) শ্রম আইন অনুযায়ী দ্রব্যমূল্য বিবেচনায় নিয়ে নৌযান শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরি বৃদ্ধিকরণে মজুরি বোর্ড গঠন করে সময় উপযোগী নূন্যতম মজুরি নির্ধারণে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা।

খ) নৌযান শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নাবিক কল্যাণ তহবিল ও ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে কন্টিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা। সব মালিক সমিতিকে এক প্ল্যাটফর্মে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যক।

গ) নৌপরিবহণ সেক্টরে কর্মরত অধিকাংশ শ্রমিকের কোনো নিয়োগপত্র এবং পরিচয়পত্র নেই। শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র প্রদানের ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং তা নিশ্চিতকরণে সরকারি তদারকি জোরদার করা আবশ্যক।

ঘ) নৌপরিবহণ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত জলদস্যু এবং ডাকাতের কবলে পড়ে। নৌপরিবহণ সেক্টরে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য প্রতিটি বন্দর/নৌপথে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬.৫.৩ পরিবহণ

বিআরটিএর তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশে নিবন্ধিত মোটরযানের সংখ্যা ৫৮.৯৭ লাখ, যার মধ্যে অধিকাংশই পরিবহণ খাতভুক্ত। দেশজুড়ে পরিবহণ খাতে প্রায় এক কোটি শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছেন বলে অনুমান করা হয়, যদিও তাঁদের সুনির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করা কঠিন।[225] অধিকাংশ শ্রমিক অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োজিত এবং শ্রম আইন অনুযায়ী নিয়োগপত্র, নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা, ছুটি বা নিরাপত্তার কোনো সুবিধা পান না। যদিও মোটরযান অধ্যাদেশ ১৯৮৩, শ্রম আইন

223 বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কতৃর্পক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ), জানুয়ারি, ২০১৬, পরিবেশগত এবং সামাজিক দিক নিরূপন কার্যনির্বাহী সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বাংলাদেশ আঞ্চলিক অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ প্রকল্প—১ (চট্টগ্রাম—ঢাকা—আশুগঞ্জ করিডোর) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়।

224 নৌ শ্রমিকদের কষ্টের কথা কেউ শোনে না। কালবেলা, 05 মার্চ ২০২৪, https://www.kalbela.com/ajkerpatrika/lastpage/70822

225 এক কোটি পরিবহণ শ্রমিকের জীবনের চাকা থমকে; ০৮নভেম্বর ২০২৩, দৈনিক দেশরুপান্তর, https://www.deshrupantor.com/465789

২০০৬ এবং সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮-তে নিয়োগপত্র ও শ্রমিক সুরক্ষার বিধান রয়েছে, বাস্তবে তা কার্যকর নয়; বেসরকারি মালিকরা অধিক মুনাফার আশায় শ্রমিকদের অনানুষ্ঠানিকভাবে নিয়োগ দেন।

অধিকাংশ পরিবহণ শ্রমিক দৈনিক ১৩ থেকে ১৫ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করেন এবং ৯০ শতাংশের কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই।[226] ফলে তাঁদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যা সড়ক দুর্ঘটনার একটি অন্যতম কারণ। বাস চালক-শ্রমিকদের জন্য সুষ্ঠু মজুরি ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি। চালকদের অনেকেই দৈনিক চুক্তিতে বাস চালান, যেখানে আয় নির্ভর করে মালিককে নির্ধারিত টাকা জমা দেওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থের ওপর। এই খাতে আয় অনিশ্চিত এবং চাপ বেশি থাকায় শ্রমিকরা অতিরিক্ত যাত্রী বহন, বেপরোয়া গতি ও প্রতিযোগিতামূলক আচরণে জড়ান, যা সড়কে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে শ্রমিকরা বা তাঁদের পরিবার কোনো ধরনের ক্ষতিপূরণ পান না। কল্যাণ তহবিলের নামে তাঁদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করা হলেও শ্রমিক প্রয়োজনের সময়ে সহায়তা পান না।

শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট শ্রমনীতি, ন্যায্য মজুরি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং নিয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) সড়ক পরিবহণ নীতিমালা ২০২২ সংস্কার করে একটি সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন এবং সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮-এর অসংগতিপূর্ণ ধারাগুলি মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সংশোধন করা। সেক্ষেত্রে সড়ক পরিবহণ আইন সংশোধন করে সড়ক নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ব্যবহারে যুক্ত সকল পক্ষকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা।

খ) পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা এবং পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং মহাসড়কগুলিতে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর পর পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সহ পরিবহণ শ্রমিকের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করা।

গ) কোনো পরিবহণ শ্রমিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হলে মালিক এবং সরকারের পক্ষ থেকে তার সুচিকিৎসা এবং তহবিলের ব্যবস্থা এবং তা প্রদানে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সকল পরিবহণ শ্রমিকের জন্য 'দুর্ঘটনা বিমা' চালু করা।

ঘ) হাইওয়ে ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের পূর্বে ও পরে রোড সেইফটি অডিট করতে হবে এবং রোড সেইফটি ম্যানেজমেন্টের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৬.৫.৪ রিকসা/ব্যাটারি রিকসা-ইজিবাইক/ভ্যান চালক

বাংলাদেশে রিকশা, বিশেষ করে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক অন্যতম প্রধান যাত্রীবাহী বাহন। ঢাকায় বৈধ-অবৈধ মিলিয়ে প্রায় ১৫ লাখ রিকশা চলাচল করছে[227] এবং সারাদেশে প্রায় ৬০ লক্ষের বেশি তিন চাকার রিক্সা ও ভ্যান রয়েছে,[228] যা প্রায় ৭০-৭৫ লক্ষ পরিবারের কর্মসংস্থানের উৎস এবং প্রায় ২.৫ কোটি মানুষের জীবিকা এ খাতের ওপর নির্ভরশীল। রিকশাচালকরা মূলত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে আসা দরিদ্র ব্যক্তি, যারা জলবায়ু পরিবর্তন, কৃষিতে কাজের অভাব, শিক্ষাগত সীমাবদ্ধতা ও পুঁজির অভাবে শহরমুখী হয়ে রিকশা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছেন।

রিক্সা শ্রমিকেরা মানবেতর পরিবেশে বসবাস করেন এবং নিরাপদ খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসেবা[229], টয়লেট, নিরাপদ আবাসন ও সামাজিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত। তাদের প্রায় সবাই ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং অধিক আয়ের আশায় অতিরিক্ত সময় রিক্সা চালান, যার ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। এদের অধিকাংশের লাইসেন্স নেই, গ্যারেজ ও রিকশার বৈধ কাগজপত্র নেই এবং প্রতিনিয়ত চাঁদাবাজি, হয়রানি, ছিনতাই ও দুর্ব্যবহারের শিকার হন। গড়ে একজন

---

[226] বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) গবেষণা অনুযায়ী, পরিবহণ খাতের প্রায় ৮৬ শতাংশ চালক দৈনিক ১৩ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন এবং ৯০ শতাংশের কোনো সাপ্তাহিক ছুটি নেই। বিশেষ করে দূরপাল্লার গণপরিবহনে নিয়োজিত শ্রমিকদের মধ্যে ৫০ শতাংশের বেশি দৈনিক ১৫ ঘণ্টারও বেশি কাজ করেন এবং ২০ শতাংশ একেবারেই কর্মবিরতি পান না।

[227] সানজানা চৌধুরী, রিকশা বৃত্তান্ত: কবে, কোথা থেকে, কে প্রথম এই বাহনটি বাংলাদেশে আনেন, বিবিসি বাংলা, ঢাকা, ২৭ নভেম্বর ২০২১, https://www.bbc.com/bengali/news-59214407

[228] আনোয়ার হোসেন, "ব্যাটারি রিকশা বাড়তে দিয়ে এখন সামলানো যাচ্ছে না," প্রথম আলো, ২১ নভেম্বর ২০২৪, https://www.prothomalo.com/bangladesh/capital/b4pe9wztea

[229] প্রায় ৯৪ ভাগ রিক্সাচালক অসুস্থতায় ভোগেন। মুন্নী আক্তার, "আগে চাকরী করছিলাম, কিন্তু পোষায় না'-ঢাকার একজন রিকশাচালক," বিবিসি বাংলা, ২৭ জুন ২০১৯, https://www.bbc.com/bengali/news-48788566

চালক দিনে ৭০০–৮০০ টাকা আয় করেন, কিন্তু গ্যারেজ ভাড়া ও কিস্তি বাবদ বড় অংশ ব্যয় হয়। অনেক চালক এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে রিকশা বা ইজিবাইক কিনেছেন, যার কিস্তি পরিশোধে সাপ্তাহিক চাপ রয়েছে।

ব্যাটারিচালিত রিকশার গতির কারণে শহরে অনেক জায়গায় চলাচলে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু এর ফলে চালকদের উপার্জনের একমাত্র উপায়ও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বাস্তবতা হলো, এই বাহনগুলি পরিবেশবান্ধব, নবায়নযোগ্য শক্তির মাধ্যমে চালানো সম্ভব এবং তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি জ্বালানি সাশ্রয়ী এবং স্বল্প খরচে যাত্রী পরিবহনে সক্ষম।[230] কমিশন মনে করে যে নকশা উন্নয়ন, গতি নিয়ন্ত্রণ, প্রশিক্ষণ ও একটি বাস্তবসম্মত নীতিমালার মাধ্যমে এ খাতকে নিয়মের মধ্যে এনে রিকশা-ভ্যান চালকদের জন্য একটি নিরাপদ ও সম্মানজনক জীবিকার পথ তৈরি করা সম্ভব।

বিভিন্ন সময়ে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অভিযানের সময় শ্রমিকের জীবিকার উপকরণ নষ্ট/ধ্বংস করতে দেখা যায়, যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এতে করে শ্রমিকের বর্তমান আয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতের আয়ের সুযোগও নষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক ঋণ নেয়ার মাধ্যমে এসকল উপকরণ ক্রয় করে থাকে, কাজেই উপকরণ হারিয়ে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেলে তার জন্য ঋণের বোঝাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কমিশনের সুপারিশ হলো:

ক) প্রতিটি সড়ক ও মহাসড়কে ইজিবাইক, রিকশা সহ ব্যাটারিচালিত, স্বল্পগতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য সার্ভিস রোড/বাই লেন নির্মাণ করে সড়কে বিশৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনা নিরসন করা। নির্দিষ্ট স্থানে পার্কিং এরিয়া স্থাপন করা এবং পার্কিং এরিয়ায় টয়লেট ও বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা।

খ) দুর্ঘটনা রোধে ব্যাটারিচালিত বা তিন চাকার যানবাহনের নকশা আধুনিকায়নের মাধ্যমে কারিগরি ত্রুটি সংশোধন করা ও গতি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। এক্ষেত্রে নকশা আধুনিকায়নে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের যান্ত্রিক, বিদ্যুৎ ও পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করা এবং পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ইজিবাইক, রিকশা সহ ব্যাটারিচালিত বাহন নির্মাতাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে টাস্ক ফোর্স প্রণীত নকশা অনুযায়ী গাড়ি নির্মাণের ব্যবস্থা করা।

গ) ব্যাটারিচালিত বা তিন চাকার যানবাহনের জন্য "থ্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২৪" চূড়ান্ত করে দ্রুত গেজেট প্রকাশ করা এবং বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ঘ) এই যানবাহনগুলিকে একটি সুশৃঙ্খল নীতি কাঠামোয় আনার লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশন, থানা, উপজেলা ও পৌরসভার ইউনিয়ন/ওয়ার্ডভিত্তিক ব্যাটারিচালিত সব যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান সহজতর করা এবং সকল চালককে সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ ও ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা।

ঙ) বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় বন্ধ করতে ইলেকট্রিক বা ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা যা অন্যদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ তৈরি করবে।

চ) কোনোভাবেই শ্রমিকের জীবিকার উপকরণ নষ্ট/ধ্বংস না করা এবং এ বিষয়ে অভিযান পরিচালনাকারী ব্যক্তিদেরকে সচেতন করা এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটলে অভিযুক্তকে তাদের দায়বদ্ধতা/জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

৬.৫.৫ নির্মাণ শিল্প শ্রমিক

বাংলাদেশের নির্মাণ শিল্প একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত। ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে এই খাতের বাজার মূল্য ০.৭ বিলিয়ন ডলার। এই বিকাশমান খাতটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছে। বাংলাদেশ শ্রমশক্তি জরিপের তথ্য মতে ইমারত নির্মাণ কাজে নিয়োজি শ্রমিকের সংখ্যা ২৭ লক্ষ ৪২ হাজার, যার মধ্যে ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার পুরুষ এবং ২৯ হাজার নারী শ্রমিক রয়েছেন। বিশেষায়িত নির্মাণ কাজে নিয়োজিত আছেন ৬ লক্ষ ১৩ হাজার শ্রমিক, যার মধ্যে পুরুষ শ্রমিক ৬ লক্ষ ১২ হাজার এবং ১৮ হাজার নারী শ্রমিক।[231] জাতীয় অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ফলে আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক স্থাপনা এবং সড়ক, সেতু ও বিমানবন্দরের মতো অবকাঠামোগত প্রকল্প সহ নির্মাণের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সেক্টরে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে।

---

[230] ব্যাটারিচালিত বাহনে একজন যাত্রী পরিবহণে যেখানে মাত্র ১৩ পয়সা খরচ হয়, সেখানে অন্য পরিবহণে ন্যূনতম ৫৭ পয়সা খরচ হয়।

ইমরান হাবিব রুমন, "ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান, ইজিবাইক: কর্মসংস্থান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রশ্ন," সর্বজন কথা ,৭ম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা (২০২১) https://sarbojonkotha.info/sk-28-battery-rickshaw/

[231] Bangladesh Labour Force Survey 2022

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নির্মাণ খাতের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এই খাতের কর্মসংস্থানের সাধারণ চিত্র হচ্ছে অনিশ্চিত কর্মসংস্থান, স্বল্প মজুরি এবং ঝুঁকিপূর্ণ কর্মপরিবেশ। নির্মাণ শ্রমিকদের সারাবছর ধারাবাহিকভাবে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা থাকে না। এর প্রধান কারণ হলো এই খাতের শ্রমিকরা দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, শতকরা ৮০ ভাগ শ্রমিকই দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।[232] কর্মসংস্থানের এই অনানুষ্ঠনিকতা নারী শ্রমিকদের জন্য আরো বেশি। ৯০ ভাগ নারী শ্রমিককে দৈনিকভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয় যেখানে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনামূলকভাবে মাসিক বা ফুরনভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়।[233]

কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা ও অনানুষ্ঠানিকতা ছাড়াও নির্মাণ শ্রমিকদের নিম্ন মজুরি ও অনিয়মিত বেতন প্রাপ্তির সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। একটি জরিপে দেখা গেছে যে, রাজমিস্ত্রিরা গড়ে বেতন পান ১২৬২৭ টাকা, যেখানে সরকার ঘোষিত রাজমিস্ত্রিদের জন্য ন্যূনতম মজুরি হচ্ছে ২৪৫৮০ টাকা।[234] নির্মাণ খাত সংশ্লিষ্ট প্রায় প্রতিটি গ্রেডেই শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরির ৪৪ থেকে ৬৩ শতাংশ পর্যন্ত মজুরি পান।[235] এই খাতে নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য বিদ্যমান। একটি গবেষণায় ৯০ শতাংশ নারী শ্রমিক জানিয়েছেন যে, একই ধরনের এবং সমপরিমাণ কাজের জন্য তারা পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় কম মজুরি পান।[236] এই খাতের শ্রমিকরা যেহেতু দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি পান তাই অসুস্থতা বা কোনো কারণে বেতন সহ ছুটির সুবিধা তারা ভোগ করতে পারেন না।

নির্মাণ খাতটি ধারাবাহিকভাবে বিকাশ লাভ করলেও এই খাতের শ্রমিকরা এখনো শোভন ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। কর্মস্থলে তাদের জীবনের নিরাপত্তা ও পেশাগত দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা প্রশিক্ষণ ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব বা নিরাপত্তা সরঞ্জামাদি প্রদানে মালিকের অনীহা, ক্ষতিকর রাসায়নিক ও ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে কাজ করা, অতিরিক্ত শব্দ ও ধূলার প্রভাব এবং উপযুক্ত শৌচাগার সুবিধার অনুপস্থিতি নির্মাণ শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকির সাথে বেড়েছে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর সংখ্যা বিলসের তথ্য মতে, গত দশ বছরে ১,১৪৩ জন নির্মাণ শ্রমিক কাজে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মারা গেছেন।[237]

২০২০ সালের জাতীয় ভবন বিধিমালা অনুযায়ী, কংক্রিটের সঙ্গে কাজ করা শ্রমিকের হেলমেট ও গ্লাভস পরিধান, ড্রিলিং, ওয়েল্ডিং বা অন্যান্য চোখের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করা শ্রমিকদের গগলস পরা, ওয়েল্ডার এবং গ্যাস কাটার ব্যবহারকারী শ্রমিকদের গ্লাভস, নিরাপত্তামূলক বুট এবং অ্যাপ্রোন সহ সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা বাধ্যতামূলক হলেও নির্মাণ শ্রমিকদের নিয়োগকর্তা কর্তৃক এই ধরনের নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয় না।[238] আবার শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত কলকারখানা পরিদর্শকেরা নির্মাণাধীন ভবন নিয়মিত ও যথাযথভাবে পরিদর্শন করেন না।

কর্মস্থলে দুর্ঘটনা ছাড়াও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও সিমেন্টের ক্ষতিকর রাসায়নিকের প্রভাবের কারণে শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের পেশাগত রোগের শিকার হন। নারী নির্মাণ শ্রমিকদের উপর একটি গবেষণায় দেখা যায়, সিমেন্ট এবং চুনের কারণে শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ হয়। তাছাড়া পর্যাপ্ত খাবার পানি এবং পরিচ্ছন্নতার সুযোগ না থাকায় নারী শ্রমিকরা প্রস্রাবের সংক্রমণ, কোষ্ঠকাঠিন্য ও জরায়ু স্খলন, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত হন।[239] নির্মাণ খাতে সামাজিক নিরাপত্তা অধিকার অত্যন্ত অবহেলিত। কিছু কিছু কোম্পানি মালিকানাধীন ক্ষেত্রে শ্রমিকরা ক্ষতিপূরণ বা

---

[232] Jakir Hossain, Afroza Akter, Mostafiz Ahmed, Md. Mahmudul Haque, and Sekender Ali Mina, "Workers Rights in the Construction Sector of Bangladesh" Safety and Rights Society 2024, Page 30.

[233] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা 30.

[234] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা 40.

[235] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা 40.

[236] Abrar, C.R., M.S. Reza, Internal Migrant Workers and the Construction Sector in Bangladesh: Tackling informalityand exploitative labour practices. RMMRU, University of Dhaka, Dhaka, Bangladesh (2014) 6 pp. (RMMRU Policy Brief 11)

[237] Bangladesh Institute of Labour Studiues, Labour Market Situation 2015 to 2024.

[238] Obaidur Masum, ''No safety measures for construction workers,'' bdnews24, May 1, 2017. https://bdnews24.com/bangladesh/no-safety-measures-for-construction-workers

[239] Nahid Sultana, Jannatul Ferdousi, and Md Shahidullah. "Health problems among women building construction workers." *Journal of Bangladesh Society of Physiologist* 9, no. 1 (2014): 31-36.

চিকিৎসা ব্যয়ের অর্থসাহায্য পেলেও বেশির ভাগ শ্রমিক তা পান না। এছাড়া প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি ও গ্রুপ ইনস্যুরেন্স এর কোনো ব্যবস্থা এ খাতে নেই।[240]

দেশ ছাড়াও বিদেশে বাংলাদেশি শ্রমিকদের মধ্যে নির্মাণ শ্রমিকদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসী বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রায় ৬০ শতাংশ নির্মাণ খাতে নিয়োজিত।[241] বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস হলো রেমিটেন্স, যার একটি বড় অংশ সরাসরি নির্মাণ শ্রমিকদের মাধ্যমে আসে। বর্তমানে দেশীয় ও বিদেশি নির্মাণ খাতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিম্ন-দক্ষ ও মাঝারি-দক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা থাকলেও ভবিষ্যতে এ কাজে নিম্ন-দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা কমতে পারে।[242] তাছাড়া অভিবাসন প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে অনেক অভিবাসন প্রত্যাশি শ্রমিক হয়রানির শিকার হন। তাই, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিবাসন প্রত্যাশী নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং বিদেশে অভিবাসন সহজীকরণ করা আবশ্যক।

শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, নির্মাণ শ্রমিকদের অধিকার ও কল্যাণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা আবশ্যক:

ক) নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা দূর করে সকল শ্রমিকের জন্য কাজের সুযোগ ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা এবং নারী শ্রমিকদের কাজের সুযোগ এবং মজুরি বৈষম্য দূর করা।

খ) ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ এবং নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে ব্যবস্থা নিতে হবে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল সংকট দূর করে নির্মাণাধীন ভবন পরিদর্শন বাড়াতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি।

গ) নির্মাণ শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিতে রেশনিং ব্যবস্থা সহ সরকারি উদ্যোগে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য কলোনি স্থাপন করে সুলভ মূল্যে দীর্ঘমেয়াদি লিজ প্রদানের মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিকদের বাসস্থান নিশ্চিত করা। কলোনিতে শ্রমিকদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ঘ) দুর্ঘটনায় আহত ও নিহত বা আজীবন পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এক জীবনের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণের বিধান শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক। তাছাড়া নির্মাণ শ্রমিকরা যেহেতু উঁচু ভবনে কাজ করেন, তাই নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য একক বিমা চালু করা প্রয়োজন।

ঙ) দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে স্থাপনার মূল মালিক এবং ডেভেলপারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করার বিধান রাখা।

চ) অভিবাসন প্রত্যাশী নির্মাণ শ্রমিকদের বৈধ ও সুশৃঙ্খল অভিবাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা এবং নির্মাণ শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও নীতিগত বিষয়। এজন্য প্রথমত, বিদেশে যেতে আগ্রহী নির্মাণ শ্রমিকদের পাসপোর্ট ও ভিসা প্রসেসিং সহজতর করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, সরকারিভাবে নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ। তৃতীয়ত, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান নিশ্চিত করা প্রয়োজন। চতুর্থত, চাকরির তথ্য সরকারিভাবে যাচাইয়ের ব্যবস্থা করা, বিদেশে যাওয়ার আগে চাকরির শর্তাবলি, বেতন-ভাতা, চাকরির নিশ্চয়তা সহ শ্রমিককে বিদেশে প্রেরণের জন্য সরকারের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া এবং বিদেশগামী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ।

৬.৫.৬ বেসরকারি স্বাস্থ্য খাত

বাংলাদেশে বিগত চার দশকে স্বাস্থ্যসেবার বৃহৎ অংশ বেসরকারি ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবার ৬৫ শতাংশ দিচ্ছে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার।[243] বর্তমানে বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক (রোগ নির্নয়) সেন্টারে বিশাল আকারের পুঁজি বিনিয়োগ হচ্ছে।

---

[240] Jakir Hossain, Afroza Akter, Mostafiz Ahmed, Md. Mahmudul Haque, and Sekender Ali Mina, "Workers Rights in the Construction Sector of Bangladesh" Safety and Rights Society 2024, Page 51.

[241] Laurent Bossavie, "Low-skilled temporary migration policies: The case of Bangladesh," *background paper to the World Development Report* (2023).

[242] Abul Barkat, Sk Ali Ahmed, Faisal M Ahamed, and Muhammad Badiuzzaman, "Skill Demand Survey in Construction Sector," PKSF (2018)

[243] "বেসরকারি খাতে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা," প্রথম আলো, ২৮ নভেম্বর ২০২১। https://www.prothomalo.com/lifestyle/বেসরকারি-খাতে-বাংলাদেশের-স্বাস্থ্যসেবা

এই খাত ক্রম প্রসারমান। বড় বড় মহানগর, শহর ছাড়িয়ে বর্তমানে এই খাত উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়েও প্রসারিত। যৌথ কোলাবরেশনে এই খাতে বিদেশি পুঁজিও বিনিয়োগ হচ্ছে। সুনির্দিষ্ট কোনো জরিপ বা তথ্য না থাকলেও এই খাতে আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক খাত। তবে বড় বড় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া হাজার হাজার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নার্স, টেকনিশিয়ান, ওয়ার্ড বয়, আয়া, ওয়ার্ড মাস্টার, স্ট্রেচার বহনকারী, জমাদার, মালীদের জীবনমান ও অবস্থা খুবই করুন। কারো কোনো নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র নেই। বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতের শ্রমিক/কর্মচারীরা যে মজুরি বা বেতন পান তা দিয়ে তাদের পরিবারের সকল ব্যায়ভার বহন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে তাদের জন্য সরকার ঘোষিত কোনো ন্যূনতম মজুরির কাঠামোও নেই। চার/পাঁচ হাজার টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ বিশ হাজার টাকা পদানুযায়ী বেতন দেয়া হয়। এই সেবা কর্মীরা অস্বাস্থ্যকর এবং অনিরাপদ পরিবেশে দীর্ঘ কর্মঘণ্টা (১১ ঘণ্টা বা তার বেশি সময়) কাজ করে যা তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। সারা বছরে সবেতন কোনো ছুটি নেই। কোনো বিশেষ প্রয়োজনে, এমনকি অসুস্থতার কারণে এক দিন অনুপস্থিত থাকলে দুই/তিন দিনের বেতন কেটে নেওয়া হয়। যেহেতু তারা সাধারণত আনুষ্ঠানিকভাবে সংগঠিত হয় না, তাই নিয়োগকর্তা বা সরকারি কর্তৃপক্ষের সাথে তাদের সম্মিলিত প্রতিনিধিত্ব খুব কম বা নেই বললেই চলে।[244]

বড় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে এখন কনট্রাক্টর বা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। তারা 'কাজ নেই মজুরি নেই' ভিত্তিতে কাজ করেন এবং বোনাস সহ অন্যান্য সুবিধা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়। নারী শ্রমিকেরা মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে বঞ্চিত হন। দীর্ঘদিন একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করার পরেও তারা চাকরির অনিশ্চয়তায় ও মানসিক চাপের মধ্যে থাকেন। বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের বর্তমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কমিশন নিম্নলিখিত সংস্কার পদক্ষেপসমূহ প্রস্তাব করছে:

ক) বেসরকারি স্বাস্থ্য শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার থাকলেও বিপুল সংখ্যক শ্রমিক/কর্মচারী শ্রম আইনের কোনো সুযোগ সুবিধা তারা পান না। তাই এই খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রম আইন অনুযায়ী সকল অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য সরকারি তত্ত্বাবধান জোরদার করা প্রয়োজন।

খ) এই মজুরি বঞ্চনা দূর করতে শ্রম আইন অনুযায়ী নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করে বর্তমান বাজারদর বিবেচনায় তাদের জন্য বেঁচে থাকার উপযোগী নিম্নতম মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা জরুরি।

গ) এই খাতে কর্মরত নারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য সামাজিক সুবিধা নিশ্চিত করা জরুরি। শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এবং বিমার ব্যবস্থা করা, যাতে অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে কর্মচ্যুতি ঘটলে তাদের আর্থিক অসচ্ছলতার কোনো ঝুঁকির সম্মুখীন না হতে হয়।

ঘ) বর্তমানে এই খাতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীরা প্রতিষ্ঠানের মুনাফার হিস্যা থেকে বঞ্চিত। প্রতি বছর শেষে ব্যক্তি/কর্পোরেট/যৌথ মালিকানাধীন নির্বিশেষে সকল নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানে ব্যালেন্স শিট প্রদান করা ও প্রতিষ্ঠানের মুনাফায় শ্রমিক-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৬.৫.৭ হোটেল রেস্টুরেন্ট শ্রমিক

দেশে প্রতিনিয়ত বাড়ছে হোটেল ও রেস্টুরেন্টের সংখ্যা, বাড়ছে এ খাতে শ্রমিকের অংশগ্রহণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বুরোর তথ্য অনুযায়ী এই খাতে কর্মরত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ২০ লাখ ৭১ হাজার এর কিছু বেশি। যার মধ্যে পুরুষ শ্রমিকের সংখ্যা ১৯ লাখ ৭০ হাজার ৯৭০ জন এবং নারী শ্রমিক ১ লাখ ৭৩৭ জন।[245] হোটেল ও রেস্টুরেন্টে কর্মরত শ্রমিকদের নেই সঠিক কর্মঘণ্টা এবং তাদের মজুরি কাঠামোও অপ্রতুল (সর্বশেষ ২০১৭ সালে ঘোষিত নূন্যতম মজুরি—৩৭১০ টাকা[246])। এ খাতে নিয়োজিত বেশিরভাগ শ্রমিক অস্থায়ী বা মৌসুমি ভিত্তিতে নিয়োগ পান এবং প্রতিদিন আট

[244] Jakir Hossain, Mostafiz Ahmed, and Afroza Akter, Workers Rights in Bangladesh Care Economy: Decent Work and Deficits for personal Care and Non-Clinical Health Care Workers, Karmojibi Nari and Friedrich Ebert Stiftung (FES), Dhaka: 2021.

[245] বিবিএস, হোটেল রেস্টুরেন্ট জরিপ ২০২১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যাবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২।

[246] বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত সকল শ্রেণির শ্রমিকের জন্য সরকার কর্তৃক নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের সর্বশেষ সাল ও সর্বনিম্ন গ্রেডের নিম্নতম মোট মজুরি।

ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। এক তৃতীয়াংশের বেশি কর্মী প্রতিদিন নয় থেকে দশ ঘণ্টা কাজ করে, আবার এক তৃতীয়াংশের বেশি কর্মী প্রতিদিন এগারো থেকে বারো ঘণ্টা কাজ করে। এছাড়া এক চতুর্থাংশের বেশি কর্মী কোনো বিরতি বা বিশ্রাম ছাড়াই নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন।[247] হোটেল ও রেস্তোরাঁয় কর্মরত ৩২ শতাংশ কর্মী দৈনিক ভিত্তিতে মজুরি পান এবং বাকি ৬৮ শতাংশ কর্মীরা মজুরি পান সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে, যা প্রায়শই অপ্রতুল।[248]

বাংলাদেশের হোটেল-রেস্টুরেন্টে কর্মীরা মৌখিক চুক্তিতে নিয়োগ পান। ফলে মালিক ইচ্ছা মতো বরখাস্ত করতে পারেন। এক্ষেত্রে তাদের কাজের কোনো স্থায়িত্ব বা নিরাপত্তা নেই। বিশেষ করে, রমজান মাসকে সামনে রেখে ব্যবসা মন্দার অজুহাতে হোটেল-রেস্টুরেন্ট শ্রমিকদের ব্যাপক ছাটাই করা হয়। ফলে শ্রমিকরা বেতনের পাশাপাশি ঈদ বোনাস থেকেও বঞ্চিত হয়। এই খাতে আবার শিশুশ্রমও বিদ্যমান রয়েছে। শিশুরা সাধারণত অনানুষ্ঠানিকভাবে টেবিল বয় বা ওয়েটার হিসেবে কাজ করে। আইন অনুযায়ী শিশুশ্রমের জন্য কাজের সময় ৬ ঘণ্টা। তবে মালিকরা এটি ১২ ঘণ্টা নির্ধারণ করেন, অথচ তাদের দৈনিক মাত্র ৮০—১২০ টাকা মজুরি দেয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মতো কাজ করলেও তারা কম মজুরি পান এবং এতে তাদের কিছুই করার থাকে না। হোটেল ও রেস্তোরাঁয় কর্মরত শ্রমিকদের কল্যাণে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) হোটেল-রেস্টুরেন্ট খাতের শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মালিক কর্তৃক বাধ্যতামূলক লিখিত নিয়োগপত্র বা চুক্তিপত্র প্রদান এবং তা নিশ্চিতকরণে সরকারি (যেমন; ডাইফ এ ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে) তদারকি জোরদার করা অপরিহার্য।

খ) শ্রম আইন অনুযায়ী সকল হোটেল-রেস্টুরেন্ট শ্রমিকের জন্য সাপ্তাহিক দেড় দিন ছুটি, স্ব বেতন অন্যান্য ছুটি, উৎসব ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি।

গ) রোজার মাসে দিনের বেলা হোটেল-রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকার অজুহাতে কিছু প্রতিষ্ঠিত হোটেল ছাড়া অধিকাংশ হোটেলে এক থেকে দেড় মাসের জন্য শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। এভাবে শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ আবশ্যক। এ সময় ছাটাইকৃত হোটেল-রেস্টুরেন্ট শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম চালু করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ঘ) হোটেল-রেস্টুরেন্টে শিশুশ্রম রোধে কঠোর আইন প্রয়োগ করতে হবে এবং শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৬.৫.৮ গৃহ শ্রমিক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১৫-১৬ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী গৃহস্থালীর কাজের সাথে জড়িত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ ৬৯ হাজার, যার মধ্যে ৮০ শতাংশ নারী এবং ২০ শতাংশ পুরুষ। এদের মধ্যে ৬৯.৬ শতাংশ শহর অঞ্চলে এবং ৩৭.৩ শতাংশ গ্রামাঞ্চলে কাজ করেন।[249] শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী, দেশে গৃহস্থালীর কাজের সাথে জড়িত মোট শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখ।[250] আন্তর্জাতিক সংস্থা অক্সফামের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকের সংখ্যা ১ কোটি ৫ লাখ, যাদের ৮০ শতাংশ নারী। সুতরাং এই তথ্য বিশ্লেষণ করলে এটি বোঝা যায় যে, গৃহশ্রমিকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমানভাবে বেড়েই চলছে।[251] গৃহশ্রমিকদের কাজের নির্দিষ্ট কোনো কর্মঘণ্টা নেই, দিনে ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টার বেশি কাজ করেন। ৮৭ শতাংশের কোনো ধরনের সাপ্তাহিক ছুটি নেই। মজুরি সহ মাতৃত্বকালীন ছুটি পান একবারেই সামান্য সংখ্যক গৃহশ্রমিক। বাংলাদেশ শ্রম আইনে গৃহশ্রমিক অন্তর্ভুক্ত না হবার জন্য এই বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে। বিপুল এই শ্রম জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় ২০১৫ সালে

---

https://mwb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mwb.portal.gov.bd/page/8157a5ff_d278_4cbe_92ba_8b010a3b6851/2024-12-03-10-20-9c930c5fd8de477fe0030df425d0b605.pdf

[247] BILS, Internship Study Reports on Four Sectors. https://bilsbd.org/wp-content/uploads/2019/02/Internship-Study-Report_BILS.pdf

[248] প্রাগুক্ত।

[249] Workers_Situation_Analysis_Report_2019_BILS.pdf?utm_source=chatgpt.com

[250] বাংলাদেশে গৃহশ্রমিকদের কর্মক্ষেত্র পরিস্থিতি ও নির্যাতন: ২০১৯ সালের প্রতিবেদন, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ (২০২০), https://bilsbd.org/wp-content/uploads/2020/04/Domestic-

[251] রিফাত পারভীন, "গৃহকর্মী: শ্রমিকের মর্যাদা নেই, সরকারের দায়িত্ব শুধু কিতাবে," bdnews24.com, মার্চ ০৫, ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/bangladesh/vjd7w9jdpd.

গৃহকর্মী কল্যাণ ও সুরক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু এর জন্য আইন না থাকায় নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন সম্ভবপর হচ্ছে না।

২০২৩ সালে বিলস এর একটি গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গৃহকর্মীদের ৮৪ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন এবং এদের মাসিক গড় আয় মাত্র ৫ হাজার ৩১১ টাকা।[252] গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে যে, দেশের প্রায় ৬৭ শতাংশ গৃহকর্মী মানসিক নির্যাতনের শিকার, প্রায় ৮১ শতাংশ নারী গৃহকর্মীর কর্মক্ষেত্রে চাপের কারণে মানসিক অবস্থা খারাপ থাকে, সামাজিকীকরণে হীনম্মন্যতায় ভোগেন ৯২ শতাংশ গৃহকর্মী, উদ্বেগ ও হতাশায় ভুগেন ৬৮ শতাংশ এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগেন ৬০ শতাংশ গৃহকর্মী।[253]

গৃহশ্রমিকদের নিয়োগপত্র নেই, মৌখিক চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ হওয়ায় অধিকার খর্ব হলেও প্রতিকারের পাওয়া কঠিন। তাদের মধ্যে স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিক রয়েছে, সেক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে বসতবাড়িতে কাজ করা গৃহশ্রমিকদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার শিশু গৃহকর্মী রয়েছে।[254] গৃহশ্রমিকদের মজুরি এলাকা ভেদে ভিন্ন হয়। গৃহকর্মীদের অধিকারের বিষয়ে নিয়োগকর্তাগণের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। ফলে তারা ন্যায্য মজুরি, স্বাস্থ্যসেবা, বিশ্রাম ও নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হন এবং সরকারি কল্যাণমূলক কর্মসূচির সুফল কম পান।[255] আবার বিদ্যমান সহযোগিতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি সম্পর্কে অধিকাংশ শ্রমিক জানেন না। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের কল্যাণে অসুস্থ বা আহত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও তাদের সন্তানের উচ্চ শিক্ষায় সহায়তা দিলেও জটিল আবেদন প্রক্রিয়ার কারণে শ্রমিকদের জন্য এটি সহজলভ্য নয়। গৃহশ্রমিকদের বর্তমান পরিস্থিতির উন্নয়নে এবং তাদের আইনি অধিকার নিশ্চিতে কমিশন কর্তৃক দাবিকৃত প্রস্তাবসমূহ হলো:

ক) ‘গৃহকর্মীর কল্যাণ ও সুরক্ষা নীতিমালা’ ২০১৫ প্রণয়নের পর নয় বছর অতিবাহিত হলেও এর কোনো বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয় না। তাই গৃহশ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেয়া এবং তাদেরকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করার পূর্ব পর্যন্ত ‘গৃহকর্মীর কল্যাণ ও সুরক্ষা নীতিমালা’ ২০১৫-এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

খ) গৃহশ্রমিকদের (আবাসিক, অনাবাসিক, খণ্ডকালীন, স্থায়ী) জন্য একটি স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান চুক্তি প্রণয়ন করা, যেখানে কর্মঘণ্টা, বেতন, ছুটি, খাওয়া, থাকার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুবিধা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকবে। শ্রমিক যদি নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করতে চায় সেক্ষেত্রে কার বরাবর, কোন স্থানে, কীভাবে করবেন এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা সহ যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

গ) বিপুল সম্ভাবনা, চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করে গৃহশ্রমিকদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্য সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন যা তাদের কর্মসংস্থানের আরও বেশি সুযোগ ও নিরাপত্তা প্রদান করবে।

ঘ) গৃহকর্মে ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের নিয়োগ বন্ধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও কার্যকর বাস্তবায়ন করা জরুরি।

ঙ) গৃহকর্মীদের সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করা।

৬.৫.৯ পরিচর্যা কর্মী (কেয়ার ওয়াকার্স)

পরিচর্যা বা কেয়ার সমাজের জনগণের সুস্থতা, সার্বিক উন্নয়ন এবং কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা একটি কার্যকর ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সহায়ক। এটি একজন বা একাধিক ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, আবেগিক এবং বিকাশমূলক চাহিদা পূরণের জন্য পরিচালিত হয়। বিশ্বব্যাপী পরিচর্যা কাজের অধিকাংশই বেতনহীনভাবে সম্পাদিত হয়, যা প্রধানত সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত নারী ও কিশোরীদের দ্বারা পরিচালিত হয়; বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়।

---

[252] প্রাগুক্ত।

[253] গ্লোরিয়া অমৃতা, ”দেশে ৬৭ শতাংশ গৃহকর্মী নির্যাতনের শিকার,” খবরের কাগজ, ডিসেম্বর ২১, ২০২৩, https://www.khaborerkagoj.com/special-report/795672

[254] Workers_Situation_Analysis_Report_2019_BILS.pdf?utm_source=chatgpt.com

[255] ”বাংলাদেশে গৃহকর্মীদের অধিকার: বর্তমান প্রেক্ষাপট ও করণীয়,” DeshNewsBD, জানুয়ারি ২৪, ২০২৫, https://deshnewsbd.com/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6/3347

এটি মূলত অপ্রাতিষ্ঠানিক, অপরিকল্পিত এবং অবমূল্যায়িত অবস্থায় রয়েছে। আন্তর্জাতিকভাবে পরিচর্যা খাতে উচ্চ চাহিদা থাকলেও বাংলাদেশি কেয়ার গিভাররা প্রায়ই পর্যাপ্ত দক্ষতার অভাবে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ছেন।

পরিচর্যা কর্মীরা সরাসরি (যেমন; শিশুর যত্ন, অসুস্থ ও বৃদ্ধদের সেবা) বা পরোক্ষভাবে (যেমন; রান্না, বাজার করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা) পরিচর্যা কার্যক্রমে যুক্ত থাকেন। এটি সমাজ ও কর্মক্ষেত্রের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ হলেও অধিকাংশ পরিচর্যা কার্যক্রম বেতনহীন। বেতনভিত্তিক পরিচর্যার ক্ষেত্রে নার্স, শিক্ষক, চিকিৎসক ও গৃহকর্মীরা উভয় ধরনের সেবা প্রদান করেন। বাংলাদেশে পরিচর্যা পেশায় বহু নারী ও পুরুষ দীর্ঘদিন ধরে নিয়োজিত থাকলেও এখনো এটি "সম্বনিত পরিচর্যা খাত" হিসেবে গড়ে ওঠেনি। পরিচর্যা কর্মীদের জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি না থাকায়, তাদের সামাজিক ও আইনি সুরক্ষা ব্যহত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিকভাবে পরিচর্যা কর্মীদের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা অনুপস্থিত থাকায় বিভিন্ন দেশ নিজস্ব আইন ও নীতিমালার মাধ্যমে এ খাত সংজ্ঞায়িত করেছে। কিছু দেশে নির্দিষ্ট পেশা ও দক্ষতার ভিত্তিতে স্বীকৃতি দেওয়া হলেও অনেক দেশে এটি আইনি কাঠামোবিহীন। বাংলাদেশে এখনো এ সংক্রান্ত নীতিমালা বা নির্দেশিকা প্রণীত হয়নি এবং সরকারিভাবে কোনো স্বীকৃতি নেই। তবে বিপুলসংখ্যক কর্মী এ খাতে নিযুক্ত থাকায় খাতটিকে একটি সুসংগঠিত সেবা খাত হিসেবে গড়ে তোলা হলে এটি আরও কার্যকর হতে পারে।

বাংলাদেশে পরিচর্যা খাতের সঠিক পরিসংখ্যান অনুপস্থিত। যেমন; মোট খাতের সংখ্যা, কর্মরত শ্রমিকের পরিমাণ ও লিঙ্গভিত্তিক অনুপাত। অধিকাংশ পরিচর্যা কর্মী শোভন কাজের নিশ্চয়তা থেকে বঞ্চিত এবং এ খাতে তদারকি ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকা ও চট্টগ্রামে গৃহকর্ম, নার্সিং, স্বাস্থ্যসেবা, শিশু ও প্রবীণদের যত্নের মতো খাতে কর্মরত শ্রমিকরা ওভারটাইম সুবিধা, কর্মসংস্থানের স্থায়িত্ব এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশের অভাবে ভুগছেন। ৭৫ শতাংশ শ্রমিক অতিরিক্ত কাজের পরও নির্ধারিত পারিশ্রমিক পান না, ৪০ শতাংশ পূর্ব ঘোষণা ছাড়া চাকরি হারান এবং ৫৭ শতাংশ রোগ বা ভাইরাসের ঝুঁকিতে থাকেন। তদুপরি ১৭ শতাংশ দাহ্য পদার্থজনিত ঝুঁকির সম্মুখীন হলেও অর্ধেকেরও কম নিয়োগকর্তা নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য বা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করেন।[256]

পরিচর্যা পেশায় নিযুক্ত কর্মীরা সহিংসতারও শিকার হন। বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালের ১,২৬৪ জন নার্সের ওপর পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, তাদের ৭০ শতাংশ কর্মক্ষেত্রে সহিংসতার শিকার হয়েছেন।[257] অন্য এক জরিপে দেখা যায়, ২০১১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে ৬২৬ জন গৃহকর্মী নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছেন।[258] 'বাংলাদেশে হ্যালোটাস্ক' ও 'আমার আস্থা' এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলি বেতনভিত্তিক পরিচর্যা খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনতে সহায়তা করছে, যা গৃহকর্মীদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করছে। তবে এসব প্ল্যাটফর্ম এখনো ন্যায্য চুক্তি, সুরক্ষিত কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্যবিমা ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানে ব্যর্থ এবং প্রদত্ত মজুরি জীবনযাত্রার মানদণ্ডের তুলনায় কম। পরিচর্যা খাতে বিনিয়োগ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। দেখা গেছে যে, জিডিপির ৩.৯৯ শতাংশ বিনিয়োগ করলে ২০৩৫ সালের মধ্যে প্রায় ৭ মিলিয়ন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে, যার ৯১ শতাংশ নারীদের জন্য। এ ধরনের বিনিয়োগ লিঙ্গভিত্তিক কর্মসংস্থান বৈষম্য হ্রাস, লিঙ্গসমতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারে এবং গৃহস্থালি শ্রমের বোঝা কমাতে সহায়ক হবে। তাই পরিচর্যাকর্মীদের সার্বিক উন্নয়নে কমিশন নিম্নে উল্লেখিত প্রস্তাবসমূহ করছে:

ক) সরকারি বেসরকারি সকল শিশু পরিচর্যা কেন্দ্রের তালিকা করে তাদের একটি নীতি কাঠামোর মধ্যে পরিচালনা করার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। সরকার কতৃর্ক পরিচালিত শিশু যত্ন কেন্দ্রে আউটসোর্সিংয়ের পরিবর্তে এর সাথে সংশ্লিষ্টদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ ও দক্ষতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

খ) এই খাতের কর্মীদের সময়োপোযোগী দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাইরে দক্ষ পরিচর্যা কর্মী হিসেবে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা।

---

[256] Mostafiz Ahmed, Decent Work Status of the Care Workers: A Rapid Assessment, ILO and BILS, 2024.

[257] Nawaz Farhin Antara, "Study reports 70% of nurses face gender-based violence at workplace," Dhaka Tribune, December 10, 2023, https://www.dhakatribune.com/bangladesh/333078/speakers-70%25-of-nurses-face-gender-based-violence.

[258] অলোক ভট্টাচার্য, "গৃহকর্মীদের সুরক্ষা আইন ও বাস্তবায়ন," যায়যায়দিন, নভেম্বর ০৯, ২০২৪, https://www.jaijaidinbd.com/todays-paper/campus/505480

গ) কেয়ার অর্থনীতি আরও প্রসার ঘটাতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি ও ব্যক্তিগত/উদ্যোগে গড়ে উঠা সেন্টারসমূহকে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান এবং একটি নির্দিষ্ট মডেল অনুসরণ করে সেন্টারসমূহকে পরিচালিত করার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

ঘ) পারিবারিক দায়িত্ব থাকা শ্রমিকদের কাজ ও পারিবারিক জীবনের ভারসাম্যের ক্ষেত্রে নমনীয় কাজের (কর্মসংস্থানের ধরন ও চুক্তি, কর্মঘণ্টা, ছুটির ব্যবস্থা) জন্য জাতীয় পর্যায়ে আইনি ও নীতি কাঠামো কাঠামো তৈরি করা এবং প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত নীতিমালা তৈরি করা এবং তা কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদন করানো।

ঙ) পরিচর্যা কর্মীদের সাথে সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন ১৫৬ ও ১৮৩ অনুসমর্থন করা।

৬.৫.১০ বিউটি পার্লার কর্মী

দেশে বিউটি পার্লার শিল্পের বিকাশের সাথে সাথে এই খাতে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের স্বল্প শিক্ষিত নারীরা বিশেষ করে নৃগোষ্ঠী/আদবাসী নারীরা এই খাতে বেশি নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে দেশে নিবন্ধিত পার্লারের সংখ্যা সাড়ে তিন লাখের মতো এবং নারী কর্মজীবীদের মোট সংখ্যার ১৮ শতাংশ পার্লারে কাজ করছেন।[259] বাংলাদেশে পার্লার সেবা এবং সৌন্দর্য পণ্যের বাজার বছরে প্রায় ৫০০ কোটি ডলারের।[260]

এই খাতের শ্রমিকেরা দেশের অর্থনীতিতে একটি বৃহৎ ভূমিকা রেখে চলেছে কিন্তু তারা অধিকার সম্পর্কিত সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত।[261] শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও তারা আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি ও অধিকার পান না। বেশিরভাগ পার্লার কর্মীদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র না থাকার কারণে তাদের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। এছাড়া দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অপ্রতুল ছুটি, অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত বেতন ও অতিরিক্ত সময় কাজ করা তাদের নিত্য সঙ্গী। এই খাতে নিম্নতম মজুরি কাঠামোর অনুপস্থিতির কারণে কর্মীরা কম মজুরিতে কাজ কতে বাধ্য হন।

বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের সময় তাদের মধ্যরাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। তখন তাদের বিশ্রামের সুযোগও থাকে না। পার্লার কর্মীরা যে সকল বিউটি পণ্য নিয়ে কাজ করেন তাতে অনেক রাসায়নিক উপকরণের উপস্থিতি রয়েছে। দীর্ঘক্ষণ দাড়িয়ে এবং রাসায়নিক উপকরনের সংস্পর্শে কাজ করার কারণে পার্লার কর্মীদের মেরুদন্ডের সমস্যা, ত্বকের সমস্যা, এলার্জি এবং অসময়ে গর্ভপাত – এই ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা শেষে রাতে বাড়ি ফেরার পথে তাদের অনেক সময় যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হতে হয় এবং পরিচয়পত্র না থাকার কারণে রাস্তায় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে পার্লার কর্মী হিসেবে প্রমাণ করা যায় না বরং পুলিশী হয়রানির শিকার হতে হয়। এ খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এখনও অনেকেই অনানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কাজ করেন, যা তাদের মজুরি বঞ্চনার সম্মুখীন করছে। বিউটি পার্লারকর্মীদের শোভন কাজের পরিবেশ এবং সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিতে, কমিশন নিম্নলিখিত সুপারিশ প্রস্তাব করছে:

ক) সকল বিউটি পার্লার শ্রমিকদের পেশাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা সুরক্ষার জন্য শ্রম আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি, অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

খ) এ খাতের শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন করে কাজের মান ও ঝুঁকি বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট মজুরি কাঠামো নির্ধারণ করা ও তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পদোন্নতি কাঠামো তৈরি করা।

গ) কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম প্রদান সহ সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা নির্দেশিকা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

ঘ) কর্মক্ষেত্রে ও রাত্রিকালীন বাড়ি ফেরার সময় হয়রানি প্রতিরোধ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। শ্রমিকদের সামাজিক মর্যাদা, সুরক্ষা ও নিরাপত্তার স্বার্থে কমিউনিটিভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

---

[259] রয়া মুনতাসীর, "এ দেশের বিউটি পারলার," প্রথম আলো, ২৭ আগস্ট ২০১৯। এ দেশের বিউটি পারলার | প্রথম আলো

[260] প্রাগুক্ত।

[261] জাকির হোসেন, মোস্তাফিজ আহমেদ, ও আফ্রোজা আখতার,

ঙ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে কর্মীদের স্বাস্থ্যসেবা এবং সন্তানদের জন্য ডে কেয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

৬.৫.১১ কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স শ্রমিক

বর্তমান সময়ে বেশিরভাগ সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজনে মানুষ কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্সসমূহের উপর নির্ভর করে। স্বাভাবিকভাবেই বহু মানুষ এই খাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছেন। কিন্তু এই কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স খাতে নিয়োজিত শ্রমিকরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখলেও তাদের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। এই শ্রমিকরা অস্থায়ী হিসেবে দৈনিক মজুরি ভিত্তিতে কর্মে নিয়োজিত আছেন। এরা মূলত কম মজুরি এবং সামাজিক সুরক্ষাহীন অবস্থায় কাজ করেন। কর্মক্ষেত্র থেকে এদের কোনো নিয়োগপত্র বা পরিচয়পত্র দেয়া হয় না যা তাদের নিরাপত্তাহীনতার ঝুঁকি বাড়ায়। উদাহরণসরূপ, এদের যেহেতু অনেক সময় অধিক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়, কাজ থেকে ফেরার পথে প্রায়শই তাদের পুলিশি হয়রানির মধ্যে পড়তে হয়।[262]

এই খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের মজুরি এত কম (কমিউনিটি সেন্টার শ্রমিকদের কাজ প্রতি দৈনিক মজুরি ৪০০ টাকা এবং ডেকোরেটার্স শ্রমিকদের মজুরি ৫০০ টাকা) যে উৎসব বা ভরা মৌসুমেও তাদের মাসিক আয় ৫-৬ হাজার টাকার বেশি হয় না। এরা কোনো ধরনের নিয়মিত সুবিধা যেমন, ছুটি, উৎসব ভাতা, অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য ওভারটাইম ভাতা বা সামাজিক সুরক্ষা পান না। অথচ অনুষ্ঠান শেষে মালিকরা বিনা মজুরিতে হল পরিষ্কার ও ধোয়া–মোছার কাজ করতে বাধ্য করেন, যা অত্যন্ত অমানবিক।[263] শ্রমিকরা সারা বছর অন্যের উৎসব আয়োজনে ব্যস্ত থাকলেও অর্থনৈতিক দৈনতার কারণে তারা পরিবারের সাথে কোনও আনন্দ, উৎসব পালন করতে পারেন না। শ্রমিকদের এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে এবং শ্রম অধিকার সুরক্ষায় ও জীবনমান নিশ্চিতে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

ক) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুসারে এই খাতের শ্রমিকদের ন্যূনতম শোভন ও মর্যাদাকর জীবনধারণ উপযোগী মজুরি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এই উদ্যোগ তাদের জীবিকা নির্বাহের নিশ্চয়তার সাথে সাথে কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি করবে।

খ) বিশেষ দিনগুলিতে, যেমন হিন্দুদের বিয়ের দিনে, শ্রমিকদের অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। এ অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি প্রদান করা। কেননা আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও বাংলাদেশ শ্রম আইন ১০৮ ধারা অনুসারে অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত মজুরি প্রদানের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে।

গ) বর্তমানে কমিউনিটি সেন্টারসমূহে দুর্ঘটনাবশত কোনো ক্রোকারিজ ভেঙে গেলে তার জন্য শ্রমিকদের জরিমানা করার অঘোষিত নিয়ম বাতিল হওয়া বাঞ্চনীয়। এটি একটি অমানবিক চর্চা যা শ্রমিকদের মনের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে।

ঘ) রমজান মাসে কমিউনিটি সেন্টারগুলিতে কোনো কাজ থাকে না বিধায় পুরো রমজান মাস এই খাতের শ্রমিকেরা আয় শূন্য থাকেন। তাই রমজান মাসের কর্মহীন সময়ে অর্থনৈতিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে এই একমাস তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা বা বিনামূল্যে এক মাস চলার মত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করা যেতে পারে। এছাড়া শ্রম আইন অনুসারে মালিকের পক্ষ থেকে দুই ঈদে বোনাস প্রদান নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।

ঙ) এই খাতে কর্মরত শ্রমিকেরা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে কোনো ক্ষতিপূরণ বা সবেতন ছুটি পান না। শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মস্থলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুচিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং চিকিৎসাকালীন সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে সবেতন ছুটি প্রদান নিশ্চিত করা জরুরি।

চ) এ সেক্টরে কোনও কারণ ছাড়াই প্রায়শই শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়। এখানে ছাঁটাই বলতে মালিকের তালিকা থেকে শ্রমিকের নাম বাদ দেয়াকে বুঝানো হয়েছে। শ্রম আইন অনুযায়ী যথাযথ কারণ ও আগাম নোটিশ ছাড়া শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধে কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

---

[262] ফজলুল কবির মিন্টু, 'কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স শ্রমিকদের সংকট ও সমাধান', দৈনিক আজাদী, ৮ জুলাই ২০২৪। https://dainikazadi.net/কমিউনিটি-সেন্টার-ও-ডেকোর-4/

[263] প্রাগুক্ত।

ছ) বর্তমানে এই খাতে অনেক অদক্ষ শ্রমিক নিয়োজিত আছেন। তাই এই খাতে কর্মরত শ্রমিকদের কাজের ধরন অনুযায়ী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা যা শ্রমিকের পেশাদারিত্ব ও কাজের মান উন্নয়নের সাথে সাথে এ সেক্টরের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে।

৬.৫.১২ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কর্মী

বাংলাদেশে মোট ৪,৫৪৭টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) রয়েছে যা ডিজিটাল বৈষম্য দূর করতে কাজ করছে।[264] প্রতিটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে সাধারণত ২ জন উদ্যোক্তা কাজ করেন, যেখানে একজন পুরুষ ও একজন নারী উদ্যোক্তা আছে। এই খাতের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল নারী ও পুরুষের সমান অংশগ্রহণ। এইভাবে ৪,৫৪৭টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে মোট ৯,০৯৪ জন উদ্যোক্তা কর্মরত আছেন।[265] এই সেন্টারগুলি সাধারণত গ্রামীণ জনপদে অবস্থিত এবং ঐ সকল এলাকার মানুষকে ডিজিটাল সেবা প্রদানের কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। উদ্যোক্তারা স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত হয়ে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হন এবং সেবা প্রদান করেন। এই খাতের সাথে সংশ্লিষ্টদের নির্ধারিত কর্মঘণ্টা বা ছুটির কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই। উদ্যোক্তারা সাধারণত চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পান। তবে অনেক সময় এই উদ্যোক্তাদের তাদের পরিচয়ের জন্য আইডি কার্ড প্রদান করা হয়।[266] উদ্যোক্তারা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেলেও তাদের এই কাজ সরকারি চাকরি হিসেবে স্বীকৃত নয়। উদ্যোক্তাদের বেতন নির্ধারিত নয়। প্রকৃত অর্থে তাদের আয় নির্ভর করে তারা যে সেবা প্রদান করে সেই সেবা থেকে উপার্জিত অর্থের উপর। অধিকাংশ ইউডিসি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের একটি কক্ষে পরিচালিত হয়। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা, ইন্টারনেটের ধীরগতি যার কারণে সেবা প্রদানে বাধা এবং কর্মস্থলে বসার জন্য স্থান স্বল্পতা উদ্যোক্তাদের প্রধান সমস্যা। উদ্যোক্তাদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা, বিমা বা সরকারি পেনশন সংক্রান্ত কোনো ব্যবস্থা নেই। ইউডিসিতে কর্মরত উদ্যোক্তাদের শোভন কাজের অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নের সংস্কার প্রস্তাব করছে:

ক) ৪৫৭৮টি ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে পরিচালিত চুক্তিপত্র দ্বারা আবদ্ধিত জবরদস্তিমূলক নিষিদ্ধ শ্রম (যা ১৯৭২ সালের ৩৪ (১) অনুযায়ী নিষিদ্ধ শ্রম নামে পরিচিত) বাতিল করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখের ০৫.১৬৬.০২২.০০.০০.০৪৪.১৯৮৮-১৩৬৫ (২৫০) নম্বর পরিপত্র মোতাবেক এই খাতে নিয়োজিতদের রাজস্বখাতে সরাসরি নিয়োগ যোগ্য শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

খ) এই সেক্টরের সাথে যুক্ত কর্মীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ হলেও সকল ক্ষেত্রে শ্রম আইন অনুযায়ী কাজের শর্তসমূহ নিশ্চিত করা আবশ্যক যেখানে কর্মঘণ্টা, মজুরি, ছুটি, চাকরির নিরাপত্তা ও সুরক্ষার মত মৌলিক বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দিয়ে শোভন কাজ নিশ্চিত করা যায়।

গ) এই সেক্টরে নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতার প্রয়োজন বিশেষত তথ্য ও যোগাযোগের উপর। সুতরাং এই পেশায় সংশ্লিষ্টদের নিয়োগের একটি মানদণ্ড নিধার্রণ করতে হবে এবং তাদের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে, যাতে তারা সফল উদ্যোক্তা হতে পারেন। অন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার পার্সোনাল নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ অনুসারে 'ডাটা এন্ট্রি অপারেটর' পদে নিয়োগের নিয়ম অনুযায়ী তাদের নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

৬.৬ পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠী

৬.৬.১ সাংবাদিক/গণমাধ্যম কর্মী

বাংলাদেশে সাংবাদিকদের জন্য প্রথাগত শ্রম আইন অনুযায়ী কিছুটা আলাদা পরিস্থিতি বিদ্যমান। সাংবাদিকদের দাবির প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়, যার আওতায় সংবাদপত্র কর্মীদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সুবিধা ও অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। এ আইনের অধীনে সাংবাদিক ও সংবাদপত্র

---

[264] মো. ওসমান গনি, গ্রামীণ উন্নয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, প্রতিদিনের সংবাদ। ২০ জুন ২০১৬ https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/editor-choice/8255

[265] প্রাগুক্ত।

[266] https://doict.jamalpur.gov.bd/bn/site/files/Faw2-চুক্তিপত্র-উদ্যোক্তা-এবং-ইউনিয়ন-পরিষদ-চেয়ারম্যান

কর্মচারীদের মজুরি বোর্ড হয়ে আসছিল। ২০০৬ সালে এই আইন বাতিল করে সংবাদপত্রের জন্য বেশ কয়েকটি ধারা শ্রম আইনে যুক্ত করা হয়।[267] এরপর শ্রম আইন অনুযায়ী মজুরি বোর্ড গঠিত হয়। মজুরি বোর্ড অনুযায়ী সাংবাদিক, সকল সংবাদপত্রের কর্মকর্তা কর্মচারি, প্রেস শ্রমিক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মজুরি প্রাপ্ত হন। শ্রম আইনে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে বলা হয়েছে সংবাদপত্র শ্রমিক। তবে সেখানে অনলাইন এবং ব্রডকাস্ট অর্থাৎ রেডিও টেলিভিশন কর্মীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।[268] ফলশ্রুতিতে অনেক গণমাধ্যমকর্মী আইনের সুরক্ষার বাইরে রয়ে গেছেন।

সকল গণমাধ্যমকর্মীদের আইনি সুরক্ষার জন্য সাংবাদিকদের দাবির মুখে নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) অ্যাক্টের সঙ্গে টেলিভিশন ও ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিক ও কর্মীদের চাকরির শর্তগুলি যুক্ত করে ২০১৭ সালে 'গণমাধ্যম কর্মী (চাকরির শর্তাবলি) আইন ২০১৭' নামে একটি আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়। খসড়ায় ব্যাপক পরিবর্তন করে সংসদে যে বিল উত্থাপন করা হয় তাতে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম কর্মীদের সংজ্ঞায়ন সহ অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।[269] গণমাধ্যমের ধরন ও ধারণা বদলে যাওয়ার কারণে নতুন ধরনের গণমাধ্যমে অপ্রথাগত সংবাদকর্মী যেমন খণ্ডকালীন, চুক্তিভিত্তিক, সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে চুক্তিভিত্তিক, সুনির্দিষ্ট ঘটনাভিত্তিক সংবাদকর্মী, ফ্রি ল্যান্সার গণমাধ্যমকর্মীদের অন্তর্ভুক্তির ঘটেছে যাদের সম্পর্কে খসড়ায় উল্লেখ নেই। প্রস্তাবিত আইনে সপ্তাহে ৪৮ কর্মঘণ্টা কাজের প্রস্তাব করা হয়েছে যা সপ্তাহে ৬ দিন কর্মদিবস নির্দেশ করে। খসড়ায় ওভারটাইমের বিষয়েও সঠিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। আবার আলোচ্য বিলের ১২ ধারায় গণমাধ্যম মালিকদের অতিরিক্ত কর্মী ছাঁটাই করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তবে অতিরিক্ত কর্মী কারা এই বিষয়ে সেখানে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। ন্যূনতম ওয়েজ বোর্ড গঠনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক না করে সরকারের বিবেচনা ও ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। ওয়েজ বোর্ড না থাকলে বেতনকাঠামো কেমন হবে, তারও কোনো নির্দেশনা দেয়া হয়নি। একইভাবে ভবিষ্যত তহবিল গঠনের বিষয়টিও মালিক পক্ষের ইচ্ছাধীন রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত বিধানে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম কর্মীদের চাকরির সুরক্ষা, সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি ও অধিকার এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও দরকষাকষির বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা দেয়া হয়নি। বাতিল করা হয় বিদ্যমান গ্র্যাচুয়িটি সুবিধা। এর পরিবর্তে নামমাত্র ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা রাখা হয়। কমানো হয় অর্জিত ছুটি, বিনোদন ছুটি সহ বিদ্যমান অনেক সুবিধা। বাদ দেওয়া হয় নৈশ পালা ভাতা ও দায়িত্ব ভাতার মতো সুবিধা। সাংবাদিক ও সম্পাদকের কোনো সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাই রাখা হয়নি। গড়পড়তা সবাইকে 'গণমাধ্যম কর্মী' নামে পরিচয় দেওয়া হয়।[270] পরবর্তীতে আইনটি পাস হয়নি।

আবার বিদ্যমান শ্রম আইনেরও সঠিক প্রয়োগের অভাব পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশে পত্রপত্রিকার সাংবাদিকদের বেতন-ভাতার জন্য নবম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ অনুসরণ করার কথা থাকলেও কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মানা হয় না সেই মজুরি বোর্ড।[271] আবার টেলিভিশন ও অনলাইন সাংবাদিকদের জন্য এই মজুরি বোর্ড কার্যকর না। তাদের জন্য আলাদা কোনো মজুরি বোর্ডও নেই। টেলিভিশন সাংবাদিকদের বেতন নির্ধারিত হয় মালিকপক্ষের ইচ্ছায়। সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় তারা সংবাদপত্রের সাংবাদিকদের থেকে অনেক কম বেতন পান। এছাড়া টেলিভিশন ও অনলাইন সাংবাদিকদের নির্দিষ্ট কোনো কর্মঘণ্টা নেই, ছুটির দিনেও তারা কাজ করেন এবং অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য কোনো বাড়তি টাকাও দেয়া হয় না।[272]

টেলিভিশনে ক্যামেরার পিছনে যারা কর্মরত আছেন তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট পদবি নেই। পেশার ধরন ও কাজ একই হলেও বিভিন্ন টেলিভিশনে তারা বিভিন্ন নামে কর্মরত। অন্যদিকে একই ধরনের পেশায় পত্রিকায় কর্মরতদের ফটো সাংবাদিক হিসেবে অবহিত করা হয়। এটা একই ধরনের কাজে বৈষম্য তৈরি করছে।

শ্রম আইন বাস্তবায়নে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং কারখানা পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শ্রম মন্ত্রণালয় এবং শ্রম অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের, তবে সাংবাদিকতা এবং সংবাদমাধ্যমে এই দায়িত্বের কোনো ভূমিকা নেই।

---

[267] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[268] বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬, ধারা ২(৭২), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

[269] আজাদুর রহমান চন্দন, "সাংবাদিকদের চাকরি-আইন কেন জরুরি," bdnews24.com অক্টোবর ৮, ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/opinion/d2182597a32b

[270] আজাদুর রহমান চন্দন, "সাংবাদিকদের চাকরি-আইন কেন জরুরি," bdnews24.com অক্টোবর ৮, ২০২৪, https://bangla.bdnews24.com/opinion/d2182597a32b

[271] সাংবাদিকরা শ্রমিক, নেই শ্রম অধিকার, BJC News, মে ০১, ২০২১, https://www.bjcnews.com/discussed/news/496

[272] Ibid

এই খাতে দায়িত্ব পালন করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ডিএফপি। অথচ শ্রম আইনে এর সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা নেই।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক) সব ধরনের সংবাদমাধ্যমের (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট) সাংবাদিক ও কর্মীদের জন্য 'দ্য নিউজপেপার এমপ্লয়িজ (কন্ডিশন অব সার্ভিস) অ্যাক্ট ১৯৭৪'-এর আদলে পৃথক আইন প্রণয়ন বা বিদ্যমান শ্রম আইনে পৃথক অধ্যায় সংযোজন করা।

খ) বিদ্যমান শ্রম আইনে 'সংবাদপত্র শ্রমিক'-এর সংজ্ঞা সম্প্রসারণ করে 'গণমাধ্যম শ্রমিক/কর্মী' করা এবং মাধ্যমে অনলাইন এবং ব্রডকাস্ট অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশন সহ সকল ধরনের গণমাধ্যম কর্মীদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সকল সাংবাদিকের জন্য নিয়োগপত্র প্রদান বাধ্যতামূলক করা।

ঘ) সাংবাদিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা এবং ছুটির বিধানসমূহ কার্যকর করা এবং নারী সাংবাদিকের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর করা।

ঙ) ক্যামেরার পিছনে যারা কর্মরত আছেন তাদের সকলকে চিত্র সাংবাদিক হিসেবে অবহিত করা।

চ) সাংবাদিকদের বেতন নিয়মিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিটি মিডিয়ার কর্তৃপক্ষকে/মালিককে প্রতি মাসের বেতন পরিশোধের ডকুমেন্ট কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নিকট প্রেরণ।

ছ) সকল সাংবাদিকের জন্য ঝুঁকি ভাতা, বিমা ও পেনশন চালু করা।

জ) সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের সংস্কারের মাধ্যমে এটাকে সকল সাংবাদিকের কল্যাণে প্রকৃত অবদান রাখতে সক্ষম করা।

৬.৬.২ মৎস্যজীবী ও জেলে শ্রম জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের ১৪ লক্ষ নারী সহ প্রায় ২ কোটি অর্থাৎ ১২ শতাংশ লোক মৎস্য সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করে এবং সামগ্রিক শ্রমশক্তির মধ্যে ৯৬ শতাংশ শ্রমিক অপ্রশিক্ষিত।[273] অধিকন্তু তাদের আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব দেখা যায়, যা তাদের উৎপাদনশীলতা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করে।[274] মৎস্য শ্রমিকদের মধ্যে জেন্ডার, বয়স এবং স্থানভিত্তিক বৈষম্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বাংলাদেশের মৎস্য খাতে নারীরা প্রধানত প্রক্রিয়াজাতকরণ, মাছ ধরা এবং বাজারজাতকরণে জড়িত। তবে তাদের কাজের শর্ত ও সুযোগ পুরুষদের তুলনায় কম। তরুণ-প্রবীণ ও শহর-উপকূলভিত্তিক শ্রমিকদের মধ্যেও বৈষম্য বিদ্যমান। তবে বাংলাদেশে মৎস্য শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রমের আওতায় বিশেষ ভাতা ও সহায়তা প্রদান করা হয়।

মৎস্য শ্রমিকরা প্রায়শই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কাজ করেন। সমুদ্রে মাছ ধরার ঝুঁকি, ঠান্ডা ও রোগের শঙ্কা, রাসায়নিকের সংস্পর্শ এবং অনিয়মিত ও কম আয় তাদের জীবনে সংকট তৈরি করে। আয় কম হওয়ায় অনেক সময় তারা মহাজন বা ফিশিং ট্রলার মালিকদের কাছ থেকে ঋণ নিতে বাধ্য হন, যা তাদের আরও দরিদ্রতার দিকে ঠেলে দেয়। মৎস্য শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করা, তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মানবিক মর্যাদা এবং অধিকার নিশ্চিতকরণে সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট সকলের একসাথে কাজ করা জরুরি।

বিভিন্ন সময়ে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অভিযানের সময় শ্রমিকের জীবিকার উপকরণ (যেমন মাছ ধরার জাল, নৌকা) নষ্ট/ধ্বংস করতে দেখা যায় যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। এতে করে শ্রমিকের বর্তমান আয় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি ভবিষ্যতের আয়ের সুযোগও নষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রেই শ্রমিক ঋণ নেয়ার মাধ্যমে এসকল উপকরণ ক্রয় করে থাকে। কাজেই উপকরণ হারিয়ে আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেলে তার জন্য ঋণের বোঝাও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এই বিষয়ে কমিশনের নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে:

ক) জলমহাল ইজারা প্রথা বাতিল করে লাইসেন্স প্রথা চালু করে প্রকৃত মৎস্যজীবী ও জেলেদের আইন অনুযায়ী স্বাধীনভাবে মাছ ধরার অধিকার দেওয়া।

---

[273] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর (২০২৪),

[274] Muhammad Hasan Jamil Sakib, "Study on Fishing Labour and Working Conditions in Small-Scale Fisheries of Bangladesh," *Sylhet Agricultural University and Hadayet Ullah, WorldFish, Bangladesh and South Asia Office*

খ) মাছের প্রজননকালীন সময়ে সরকার ঘোষিত যে সময়কালের জন্য মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয়, সেই কর্মহীন সময়ে নিষেধাজ্ঞার কারণে শ্রমিকদের যে ক্ষতি হয়, সেটা পযার্লোচনা করে মৎস্যজীবী ও জেলেদের জন্য বিকল্প কর্মের ব্যবস্থা করা বা ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য জীবনধারণ উপযোগী বরাদ্দ এবং রেশনিং সহ প্রয়োজনীয় সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সর্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

গ) ফিশিং ট্রলার মৎস্যজীবীদের জন্য ২০২২ সালে প্রকাশিত গ্যাজেট বাস্তবায়ন করা।

ঘ) অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে শোষণের হাতিয়ার "দাদন" প্রথা (৩০% সুদ হার) বিলোপে আইনগত ব্যবস্থা করা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করা। প্রয়োজনে সহজ শর্তে এবং বিনা সুদে সরকারি স্বল্পমেয়াদি ঋণ কর্মসূচি চালু করে শ্রমিকদের মালিক/মহাজন হতে দাদন নেবার প্রথা বিলুপ্ত করা প্রয়োজন।

ঙ) সকল শ্রমিকদের পরিচয়পত্র নিশ্চিত ও একটি বিশেষ "ট্র্যাকিং এন্ড মনিটরিং" ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সমুদ্রে মাছ শিকার করতে যাওয়া ও ফেরত আসা শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, বিপদ সংকেত অবগত করা ও পরিবারকে তাদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত করার পদ্ধতি চালু করা। এক্ষেত্রে কোস্টগার্ডের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে পরিবারের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনে উদ্ধার করে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা।

চ) প্রতিটি মাছ ধরা ঘাটে শ্রমিকদের মাছ নিয়ে উঠানামার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা এবং মাছ সংরক্ষণের জন্য প্রতিটি এলাকায় বরফকল নিমার্ণ করা।

ছ) উপকূলীয় জেলেদের বাসস্থানের সমস্যা প্রকট। এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাগর শিকস্তি খাস জমি উপকূলীয় জেলেদের বরাদ্দ দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করা।

জ) মাছ ধরার উপকূলীয় ছোটো বোট মালিকদের হয়রানিমূলক পরিবেশে লাইসেন্সবিহীন বোটকে অবতরণ ঘাট ব্যবহার করতে না দেয়া।

ঝ) মৎস্য শিকার এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা।

ঞ) ইলিশ প্রজননকালে ইলিশ শিকার নিষিদ্ধের সময়সীমা ২২ দিনের জায়গায় ১৫ দিন করা।

ট) জলদস্যু, বালুদস্যু কর্তৃক জেলে আহত ও নিহত হলে এবং মৎস্য শিকারের উপকরণ জাল, নৌকা হারালে শ্রম আইন ২০০৬ অনুসারে কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু আইন প্রয়োগ করে দায়ী ব্যক্তিদের কাছ থেকে শ্রম আদালতের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রয়োজনীয় আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা।

ঠ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে জেলেদের মৃত্যু বা মৎস্য শিকারের উপকরণের ক্ষতি হলে মৎস্য দপ্তর কর্তৃক পরিবারের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলকেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

ড) কোনোভাবেই শ্রমিকের জীবিকার উপকরণ নষ্ট/ধ্বংস না করা এবং এ বিষয়ে অভিযান পরিচালনাকারী ব্যক্তিদেরকে সচেতন করা এবং এ ধরনের ঘটনা ঘটলে অভিযুক্তকে তাদের দায়বদ্ধতা/জবাবদিহিতার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ঢ) মৎস্যজীবী ও জেলে সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিক্রয় ইত্যাদি সকল ধরনের শিশুশ্রম থেকে মুক্ত রাখা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ণ) মৎস্যজীবী ও জেলে সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। জাহাজভাঙা শিল্প কিংবা অন্যান্য শিল্প স্থাপনের কারণে সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলে সম্প্রদায় এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বালু উত্তোলন ও বাল্কহেডের কারণে মাছ ধরা কঠিন হয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে মৎস্যজীবী ও জেলে সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬.৬.৩ হকার্স/শহর অঞ্চলে স্বনিয়োজিত শ্রম জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের প্রধান শহরগুলিতে লক্ষাধিক হকার কর্মরত, যাদের বেশিরভাগ পুরুষ।[275] অস্থায়ী ভিত্তিতে স্বনিয়োজিতভাবে কাজ করে বিধায় তাদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ও ছুটির ব্যবস্থা নেই; তারা দৈনিক ৮–১২ ঘণ্টা কাজ করেন। হকারদের

[275] মো: মাজহারুল ইসলাম, মো: আলী হায়দার, শরীফ মো: আমিরুল ইসলাম, এবং সৈয়দ মেহেদী হাছান, 'চট্টগ্রাম শহরের হকারদের জীবন ও জীবিকা এবং নগরীয় প্রাতিবেশিক এলাকায় তার প্রভাব', ভূগোল ও পরিবেশ জার্নাল ১১তম বর্ষ, মার্চ, ২০২১ https://www.researchgate.net/publication/352777310_cattagrama_saharera_hakaradera_jibana_o_jibika_ebam_

প্রতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি না থাকায় এ খাতটি অপ্রাতিষ্ঠানিক রয়ে গেছে। অনেক হকার স্থানীয় সংস্থার কাছ থেকে পরিচয়পত্র পেলেও এটি সর্বজনীন নয়।[276] হকার বোর্ড গঠনের প্রস্তাব থাকলেও তা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

হকাররা সাধারণত নিজেদের ব্যবসার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করলেও অবৈধ চাঁদাবাজি, উচ্ছেদ অভিযান এবং জব্দ মালামাল ধ্বংস করার ঘটনা তাদের পেশাকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। তাদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত অনিরাপদ—ধূলাবালি, বর্জ্য, দুর্গন্ধ এবং খোলা জায়গায় অবস্থানের ফলে স্বাস্থ্যঝুঁকি সর্বব্যাপী। পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা, চিকিৎসা বা কল্যাণমূলক কোনো সুবিধাও তারা পান না। পুনর্বাসনের দাবি দীর্ঘদিনের হলেও গৃহীত কার্যক্রমগুলি কখনোই কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয় না এবং তারা প্রশাসনিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। এ প্রেক্ষিতে শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

ক) শহর অঞ্চলে বা বিশেষ এলাকাভিত্তিক স্বনিয়োজিত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার/যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হকারদের পরিচয়পত্র প্রদান করা ও শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি নিশ্চিত করা।

খ) সকল ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি হয়রানিমুক্ত ব্যবসা পরিচালনার জন্য "বিশেষ হকার বাণিজ্যিক এলাকা স্থাপন" করা।

গ) আকস্মিক ও অপরিকল্পিত উচ্ছেদের সময় হকারদের জীবিকার উপকরণ ধ্বংস না করা এবং উচ্ছেদ বাস্তবায়নকারী ব্যক্তি/কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে সচেতন করা।

গ) আকস্মিক ও অপরিকল্পিত উচ্ছেদের মাধ্যমে কাজের অনিশ্চয়তা রোধে যৌক্তিক সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন পরিকল্পনা গ্রহণ করা। পুনর্বাসন পরিকল্পনার শুরু থেকেই শ্রমিক প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্বের মাধ্যমে যে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

৬.৬.৪ মার্কেট/দোকান কর্মচারী

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে ২৫ লাখ ৪১ হাজার পাইকারি ও খুচরা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে প্রায় ৯২ লাখ লোক কর্মরত আছেন এবং এর মধ্যে ২ লাখ ৩ হাজার ১৯১ জন নারী কর্মী।[277] অন্যদিকে দোকান কর্মচারী ফেডারেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সারাদেশে দোকান, শপিংমল, চেইনশপ, ডিপার্মেন্টাল ষ্টোর, রিটেইলশপ, হোলসেল, ইলেকট্রিক দোকান, সেলুন, বিউটি পার্লার, ওষুধের দোকান এই ১০টি সেক্টরে প্রায় ৬০ লক্ষাধিক দোকান কর্মচারী কাজ করেন।[278] 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' -এর আলোকে এই সকল দোকান কর্মচারীদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও তারা তা থেকে বঞ্চিত। দোকান কর্মচারীদের কোনো নিয়োগপত্র নেই, কোথাও কোথাও শুধু নামে মাত্র পরিচয়পত্র আছে। তাদের কোনো নিদিষ্ট কোনো কর্মঘণ্টা নেই। দৈনিক গড়ে ১০/১২ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়। তবে অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনো ওভারটাইম ভাতা পান না। এছাড়া বিশেষ দিনগুলিতে বা বিভিন্ন উৎসবে সময়ের কর্মঘণ্টার কোনো হিসেব থাকে না। শ্রম আইন অনুযায়ী তাদের দেড়দিন সাপ্তাহিক ছুটি পাওয়ার কথা থাকলেও কোনো দোকান কর্মচারী তা পান না। বড়জোর এক দিন সাপ্তাহিক ছুটি পান, তবে উৎসবের মাসগুলিতে তাও পান না। তাদের সবচেয়ে বঞ্চনার জায়গা হল তাদের জন্য সরকার ঘোষিত কোনো ন্যূনতম মজুরি না থাকা। এমনকি এই সেক্টরের জন্য ন্যূনতম মজুরি বোর্ডও নেই। যে কারণে মালিকেরা তাদের ইচ্ছে মাফিক কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা কর্মচারীদের ন্যায্য চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত। অধিকাংশ কর্মচারীই ১০ হাজার টাকার কম

---

nagariya_pratibesika_elakaya_tara_prabhaba_Street_vendor%27s_livelihood_and_their_impact_in_the_urban_neighbourhood_A_case_study_in_Chittagong_city

[276] সাইদুল ইসলাম, থমকে আছে ঢাকা দক্ষিণ সিটির হকার পুনর্বাসন উদ্যোগ, ডেইলি ভোরের ডাক ডট কম, ৮ জানুয়ারি ২০২। https://www.dailybhorerdak.com/news/237933

[277] বিবিএস, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায় জরিপ প্রতিবাদন ২০২১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যাবস্থাপনা বিভাগ, পরিকল্পপনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২২। 2022-09-11-07-01-f7682f00c346db36d7060ad3d8564197.pdf

[278] ৬০ লক্ষাধিক দোকান কর্মচারীদের ঈদ বোনাস ও রেশনিং ব্যবস্থা চালুর দাবিতে মানববন্ধন, সময় নিউজ, ২ মার্চ ২০২৪। https://somoynewsbd.net/%E0%A7%AC%E0%A7%A6-%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B7%E0%A6%BE%E0%A6%A7%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%A6%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE/

বেতন পান এবং এই নিম্ন বেতনও অনেক সময় বকেয়া পড়ে যায়।[279] ফলে অনেককেই প্রতি মাসে নিয়মিত ধারদেনা করে চলতে হয়। বড় বড় শপিং মল ছাড়া বেশির ভাগ কর্মস্থানে বা তার আশেপাশে দোকান কর্মচারীদের জন্য কোনো স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট নেই। এমনকি নারী কর্মচারীদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা নেই।

দোকান/মার্কেট কর্মচারীদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় তাদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে শ্রম সংস্কার কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক) দোকান কর্মচারীদের কোনো নিয়োগপত্র না থাকায় তাদের চাকরি মালিকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এজন্য চাকরি থাকাকালীন ও চাকরি পরবর্তী শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় চাকরি সংক্রান্ত সকল শর্তাবলি উল্লেখ করে নিয়োগপত্র প্রদান করা।

খ) কর্মচারীদের জন্য কোনো মজুরি বোর্ড নেই, যার কারণে তাঁদের ন্যূনতম মজুরিও নির্ধারিত না। দোকান কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি বোর্ড গঠন সহ প্রত্যেক কর্মী যেন তার নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষার নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হন এমন ন্যায্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা।

গ) শ্রম আইন অনুযায়ী সপ্তাহে দেড় দিন ছুটির বিধান থাকলেও দোকান কর্মচারীরা এই ছুটি পান না। তাদের জন্য সাপ্তাহিক ছুটির নিশ্চয়তা দেয়া।

ঘ) কর্মক্ষেত্রে বা তার আশেপাশে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেটের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে নারী দোকান কর্মচারীদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা করা।

৬.৬.৫ দপ্তরি/প্রহরী

সারাদেশে ২০১৩ সালে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৭ হাজার দপ্তরি-কাম প্রহরী নিয়োগ দেয়া হয়।[280] সরকারি বিদ্যালয়ে চাকরি করে অমানবিক ও নজিরবিহীনভাবে তাদের রাত দিন দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এ পদে নিয়োগের পর থেকে তাদেরকে দিনে স্কুলের দপ্তরি আর রাতে প্রহরী হিসেবে ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।[281] প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রণিত 'আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী পদে জনবল সংগ্রহ নীতিমালা, ২০১৯' এ আউটসোর্সিং সেবাদানকারীদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা উল্লেখ নেই।[282] দপ্তরি ও প্রহরী হিসেবে দিনে রাতে কাজ করার পরও তাদের ওভার টাইমের জন্য কোনো টাকা দেয়া হয় না। বিদ্যালয়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাজ, টয়লেট পরিষ্কার, বাগান পরিষ্কার, দাপ্তরিক কাজ সহ অনেককে প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। তারা যেহেতু বিদ্যালয়ের প্রহরীর দায়িত্বে নিয়োজিত, বিদ্যালয়ে চুরি হলে তাদেরকেই জরিমানা দিতে হয়।[283] একই পদে কাজ করলেও তাদের এলাকাভিত্তিক বেতন বৈষম্য রয়েছে। কোনো উপজেলায় ১৪ হাজার ৪৫০ টাকা আবার কোথাও ১৬ হাজার ১৩০ টাকা করে বেতন পাচ্ছে। কোনো উপজেলায় উৎসব ভাতা পাচ্ছে, আবার কোথাও পাচ্ছে না। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দপ্তরী কাম প্রহরী পদটি মূলত আউটসোর্সিং পদ। আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুযায়ী এটি কোনো সর**কারি** বেতনধারী চাকরি বা পদ নয়। এসব কর্মীদের সেবামূল্য চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত। তাই যতদিন কাজ করবেন ততদিন চুক্তি মোতাবেক বেতন প্রাপ্য হবেন। আবার প্রতি তিন বছর পর পর ১৫০ টাকার স্ট্যাম্পে চাকরি নবায়ন করতে হয়। চাকরি নবায়ন করতে গেলে ম্যানেজমেন্টের লোকজন অর্থের দাবি করেন। টাকা দিতে অপারগ হলে অন্য লোক নেয়ার চেষ্টা করা হয়। তাই এখাতে কর্মরত ব্যক্তি এক অনিশ্চয়তায় মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। দপ্তরি প্রহরীদের অনিশ্চয়তা দূরীকরণে কমিশন সুপারিশ করছে যে,

---

[279] দোকান-কর্মচারীদের মানবেতর জীবন, প্রথম আলো, ১৩ মে ২০২০।
দোকান-কর্মচারীদের মানবেতর জীবন। প্রথম আলো

[280] প্রাথমিকের দপ্তরি-কাম প্রহরীদের আন্দোলন স্থগিত, ঢাকা টাইমস, ২৪ আগস্ট ২০২০, https://www.dhakatimes24.com/2020/08/24/180463

[281] প্রাগুক্ত।

[282] "দপ্তরী কাম প্রহরীদের বেতন সংক্রান্ত পরিপত্র জারি," SonaliNewes, ফেব্রুয়ারি ,১৭, ২০২২ https://www.sonalinews.com/education/news/167196

[283] ৪ দফা দাবিতে দপ্তরি কাম প্রহরীদের অধিদফতর ঘেরাও, জাগো নিউজ ২৪. কম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯। ৪ দফা দাবিতে দপ্তরি কাম প্রহরীদের অধিদফতর ঘেরাও

ক) দপ্তরি ও প্রহরীদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে নির্দিষ্ট আট ঘণ্টা করা এবং অতিরিক্ত সময়ের জন্য ওভারটাইম ভাতা প্রদান করা।

খ) চাকরি নবায়নের অনিয়ম বন্ধ করতে স্থানীয় প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ প্রদান করা। দপ্তরি কাম প্রহরীদের পদটি রাজস্ব খাতে অন্তর্ভুক্তকরণ।

গ) আউটসোর্সিং নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন করে স্ব স্ব অবস্থানে রেখে দপ্তরি কাম প্রহরি পদটি না রেখে শুধুমাত্র দপ্তরি বা অফিস পদ বহাল রাখা এবং কাজের পরিধি সুনির্দিষ্ট করা।

৬.৬.৭ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ/সেলস ও মার্কেটিং কর্মী

বাংলাদেশে প্রায় ২৮৪টি[284] নিবন্ধিত ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি থাকলেও এ খাতে কর্মরত মোট জনশক্তির সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের (এমআর) প্রায় ৯৮% পুরুষ।[285] বড় কোম্পানিগুলিতে স্থায়ীভাবে এমআর নিয়োগ দেওয়া হলেও ছোট ও মাঝারি কোম্পানিতে অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের প্রবণতা বেশি। তাদের নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা না থাকায় দিনে প্রায় ১৬–১৭ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, যার মধ্যে রয়েছে সকাল থেকে চিকিৎসকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, বিকেলে ফার্মেসি ও ডিস্ট্রিবিউটরদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সন্ধ্যায় রিপোর্ট তৈরি। সাপ্তাহিক ও সরকারি ছুটিও অনেক সময় নিশ্চিত নয়, বিশেষ করে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ক্ষেত্রে।

প্রাথমিকভাবে একজন এমআরের বেতন মাসে ১৫–২০ হাজার টাকা এবং বিভিন্ন ভাতা যুক্ত হয়ে তা ২০–২৫ হাজারে পৌঁছায়। কাজের ভিত্তিতে প্রণোদনা দেওয়া হলেও টার্গেট পূরণের চাপে হাসপাতাল, ক্লিনিক ও ডাক্তারের চেম্বারে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা এবং রোগীর প্রেসক্রিপশোনের ছবি তোলা এবং তা উর্ধতনের কাছে পাঠানোর বাধ্যবাধকতা অনেক সময়ই তাদের জন্য অপমানজনক অভিজ্ঞতার জন্ম দেয়।

এমআরদের চাকরির নিরাপত্তা অনিশ্চিত; লক্ষ্য পূরণে ব্যর্থ হলে বিভাগ পরিবর্তন বা চাকরি হারানোর ঝুঁকি থাকে। অন্যদিকে চাকরির নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও চাকরি পরিবর্তনের স্বাধীনতাও সীমিত, কেননা চাকরির শুরুতে মূল শিক্ষা সনদ জমা নেওয়া ও ব্লাঙ্ক চেক জমা নেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। এছাড়া 'ক্রেডিট সেল' এমআরদের জন্য এক অতিরিক্ত আর্থিক ও মানসিক বঞ্চনার উৎস। ২০১১ সালে বাংলাদেশ মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হলেও এখনো তাদের কোনো কার্যকর ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি, ফলে পেশাগত অধিকার ও মর্যাদা রক্ষায় তারা পিছিয়ে রয়েছেন।

কমিশনের প্রস্তাবসমূহ:

ক) চাকরির নিরাপত্তা, অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মঘণ্টা ওভার টাইম সুবিধা, ছুটি, চাকরির অবসান, সামাজিক সুরক্ষা ও ক্ষতিপূরণ সহ অন্যান্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

খ) পেশাগত স্বীকৃত ও নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় অগ্রাধিকার দিয়ে বাংলাদেশের সকল মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ/সেলস ও মার্কেটিং কর্মীদের জন্য প্রস্তাবিত ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী বা সেলস টার্গেট অর্জনভিত্তিক শর্তে নিয়োগের পরিবর্তে কোম্পানির আকার ও সক্ষমতা নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়োগ নিশ্চিত করা। নিয়োগের সময় চাকরির সকল শর্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা এবং চাকরিতে যোগদানের পর অবাস্তব, অযৌক্তিক এবং জবরদস্তিমূলক সেলস টার্গেট প্রদানে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করা। ক্রেডিট সেলের দায় কোম্পানি কর্তৃক গ্রহণ করা।

---

[284] Md. Eousuf Efti, Medical representative turnover intention: A growing concern in Bangladesh's pharmaceuticals industry, The Financial Express, 6 July 2023.
https://thefinancialexpress.com.bd/views/reviews/medical-representative-turnover-intention-a-growing-concern-in-bangladeshs-pharmaceuticals-industry

[285] S.M. Yasir Arafat, Zuhayer Ahmed, Md. Jahid Hasan, and S.M. Hafiz Al Asad, "Medicine Promoting Marketing Factors: Survey among Representatives in Bangladesh," *International Journal of Information Research and Review*, Vol. 03, Issue, 05, pp. 2315-2318, May, 2016.

ঘ) মেডিকেল রিপ্রেসেন্টেটিভ/সেলস ও মার্কেটিং কর্মীদের নিম্নতম মজুরি বোর্ডের এখতিয়ারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি ঘোষণা করা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি নীতি নির্ধারণ করা।

ঙ) চাকরির শুরুতে মূল শিক্ষা সনদ জমা নেওয়া, ব্লাঙ্ক চেক জমা নেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের আগে চাকরি ছেড়ে দিলে হয়রানি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে জবরদস্তিমূলক শ্রমে নিযুক্ত করার অপকৌশল/অসদাচরণ হিসেবে চিহ্নিত করা এবং যে কোনো শর্তে বাধ্যতামূলক বা জবরদস্তিমূলক শ্রম প্রমাণ হলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ) মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের অনৈতিক, বিব্রতকর বা সামাজিকভাবে হেয় হতে পারে—এমন কোনো কাজে জোরপূর্বক নিয়োজিত করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা। বিশেষভাবে, রোগীর গোপন তথ্য সম্বলিত প্রেসক্রিপশনের ছবি সংগ্রহে বাধ্য করা বন্ধ করা কোম্পানিকে এর জন্য দায়ী করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিধান করা।

ছ) পেশাগত দায়িত্ব পালনে উপযুক্ত যাতায়াত ভাতা প্রদান অথবা যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির দায়িত্বে ব্যবস্থা করা।

জ) পেশাগত দ্বায়িত্ব পালনের সময় সড়ক দুর্ঘটনাকে কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা হিসেবে গণ্য করা এবং আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।

৬.৭ বিশেষ নিয়োগের ধরনের ভিত্তিতে শ্রমিক

৬.৭.১ আউটসোর্সিং শ্রমিক

বাংলাদেশের শ্রমবাজারে আউটসোর্সিং শ্রমিকরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখলেও তারা অনিশ্চিত কর্মসংস্থান, ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হওয়া, শ্রম অধিকার লঙ্ঘন এবং সামাজিক সুরক্ষার অভাবে চরম বৈষম্যের সম্মুখীন। জাতীয় শ্রম শক্তি জরিপ ২০২২ অনুযায়ী, দেশে অস্থায়ী ও অনিশ্চিত কাজে যুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা অনেক। সরকারি পর্যায়ে ছয় লক্ষাধিক শ্রমিক আউটসোর্সিং ব্যবস্থায় থাকলেও বেসরকারি পর্যায়ে প্রকৃত সংখ্যা অজানা। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক, কারিগরি, প্রযুক্তিগত, রক্ষণাবেক্ষণ, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আউটসোর্সিং শ্রমিকদের ব্যাপকভাবে নিযুক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া নিরাপত্তা প্রহরী, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, মালী, কুক সহ বিভিন্ন পদে আউটসর্সিং শ্রমিকেরা নিয়োজিত রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী শ্রমিকও রয়েছেন যারা প্রসূতি ছুটি ও অন্যান্য আইনি সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

আইনগতভাবে আউটসোর্সিং নীতিমালা (২০০৮, ২০১৮) ও সংশোধিত শ্রম আইন (২০১৩) থাকলেও শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষায় তা অপর্যাপ্ত। অধিকাংশ আউটসোর্সিং কর্মীর নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র বা সার্ভিস বুক নেই। ফলে তারা চাকরিকালীন আইনি সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত হন এবং যে কোনো সময় নোটিশ ছাড়াই চাকরি হারাতে পারেন। আইন অনুযায়ী আউটসোর্সিং শ্রমিকদের অধিকার প্রদান ও কল্যাণ নিশ্চিতের জন্য মূল নিয়োগকারী দায়বদ্ধ নন। অন্যদিকে ঠিকাদার সংস্থাগুলির মতে তারা শুধুমাত্র সার্ভিস চার্জ পেয়ে থাকেন। ফলে তারা শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না।

আউটসোর্সিং শ্রমিকদের জন্য আউটসোর্সিং নীতিমালা ২০১৮-এর আওতায় নির্ধারিত মজুরি থাকলেও শ্রমিকেরা নির্ধারিত হারে মজুরি পান না। ঠিকাদারেরা মজুরির বড় অংশ কেটে রাখে এবং প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক তার জন্য নির্ধারিত মোট মজুরির পরিমাণ জানে না। এছাড়া একই পদে স্থায়ী ও আউটসোর্সিং শ্রমিকদের মজুরিতে ব্যাপক বৈষম্য বিদ্যমান। সাপ্তাহিক ছুটি সহ অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়ে ওভারটাইম ভাতা না দেওয়া, একই দিনে একাধিক মালিকের অধীনে কাজ করানো—এসব জবরদস্তিমূলক শ্রমের নমুনা। দীর্ঘ সময় একই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেও আউটসোর্সিং শ্রমিকদের স্থায়ী করা হয় না বা পদোন্নতি মেলে না। অনেকে বারবার ভিন্ন ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ পেয়ে শ্রম আইনগত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। নিরাপত্তা প্রহরী পদ সহ কয়েকটি পদে নিযুক্ত পদের শ্রমিককে ঠিকাদার একাধিক মালিকের অধীনে একই দিনে কাজ করতে বাধ্য করেন, যা জবরদস্তিমূলক শ্রমের শামিল।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫-এর বিধি ১৬(৩) অনুযায়ী, ঠিকাদার সংস্থার নিশ্চিত করার কথা যে, শ্রমিক সরবরাহকৃত প্রতিষ্ঠান পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধি মেনে চলে। বর্তমানে ১২৫০টি ঠিকাদার সংস্থা নিবন্ধিত থাকলেও

তদারকির অভাবে বহু সংস্থা নজরদারির বাইরে রয়েছে। ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক অনিরাপদ কর্মপরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্বাস্থ্য, ওয়াসা, বিদ্যুৎ ও নিরাপত্তা খাতে হাজারো শ্রমিক কাজ করলেও তারা পেশাগত সুরক্ষা পান না। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেমন; চিকিৎসা সুবিধা, স্বাস্থ্য বিমা, কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ, প্রভিডেন্ট ফান্ড বা গ্র্যাচুইটি না থাকায় তাদের ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চিত।

শ্রমিক সংগঠনে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রেও আউটসোর্সিং শ্রমিকরা নানা বাধার সম্মুখীন হন। সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হলে তাদের চাকরিচ্যুতির হুমকির সম্মুখীন হতে হয় যা তাদের অধিকার রক্ষার পথ সংকুচিত করে। বর্তমানে আউটসোর্সিং শ্রমিকদের জন্য কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই, যা তাদের আরও দুর্বল অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। স্থায়ী কর্মীদের তুলনায় আউটসোর্সিং শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম সীমিত থাকে। ফলে তারা দীর্ঘমেয়াদে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়েন।

আউটসোর্সিং শ্রমিকদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, এসকল শ্রমিকদের অধিকার, ন্যায্য মজুরি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সংগঠনের অধিকার ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর নীতি ও আইনের প্রয়োগ অপরিহার্য। এ ক্ষেত্রে কমিশন নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ সুপারিশ করছে:

ক) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, কর্পোরেশন ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কাজের জন্য আউটসোর্সিং নিয়োগ বন্ধ করতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির স্থায়ী জনবল কাঠামো হালনাগাদ করে আইনের ধারা ও বিধি অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা।

খ) ঠিকাদারের মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ বা কমিশনের ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করে সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করা। যারা ৫-১০ বছর বা তদূর্ধ্ব সময় ধরে কর্মরত থেকে দক্ষতা অর্জন করেছেন, তাদের শ্রম আইন অনুযায়ী অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে মূল মালিককে (Principal Employer) দায়বদ্ধ করা।

গ) ঠিকাদারের অধীনে বা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মরত শ্রমিক বা কর্মীদের বিনা কারণে চাকরিচ্যুত না করা, নতুনভাবে টেন্ডার আহ্বান না করা এবং ইতোমধ্যে যারা চাকরি হারিয়েছেন, তাদের পুনর্বহাল করার করার বিষয়টি বিবেচনা করা। প্রকল্প শেষে শ্রমিকদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বিবেচনায় স্থায়ীভাবে রাজস্বখাতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

ঘ) আউটসোর্সিং শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার প্রদান করা এবং তারা যেখানে কর্মরত সেই প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়নের মূলধারায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তারা যাতে কাজের পরিবেশ, নিরাপত্তা ও বৈষম্যমূলক আচরণ সংক্রান্ত ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অভিযোগ উত্থাপন ও নিষ্পত্তির সুযোগ পায় এবং সিবিএ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পায় সে ব্যবস্থা রাখা।

৬.৭.২ রাইড শেয়ারিং/গিগ/প্লাটফর্ম ইকনোমির শ্রমিক

বাংলাদেশের নগর পরিবহণ ব্যবস্থায় রাইড-শেয়ারিং খাত সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত, ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় শহরগুলিতে এটি নাগরিকদের যাতায়াতের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ২০২২ সালের হিসাব অনুযায়ী, শুধুমাত্র ঢাকা শহরেই ১.৫ লক্ষেরও বেশি রাইড-শেয়ারিং শ্রমিক সক্রিয় ছিলেন এবং সারাদেশে এই সংখ্যা আনুমানিক ৮ থেকে ১০ লক্ষ।[286] ২০১৮ সালের পর থেকে এই সেক্টরের প্রসার বাড়তে থাকে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর সময় অন্যান্য খাতের চাকরি হারানো মানুষজন এই পেশায় যুক্ত হন। তবে রাইড-শেয়ারিং খাতে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত—নারী চালকদের সংখ্যা ১% এরও কম, যেখানে পুরুষ চালকের সংখ্যা প্রায় ৯৯%।[287] উল্লেখ্য, এই খাতের শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট আইনগত স্বীকৃতি না থাকা, সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায্য মজুরির অভাব, নিরাপত্তাহীনতা ও স্বাস্থ্য সমস্যা তাদের জীবনযাত্রাকে অনিশ্চিত ও চ্যালেঞ্জপূর্ণ করে তুলেছে। এর সাথে রয়েছে সংগঠিত হওয়ার সীমিত সুযোগ ও নিবন্ধিত শ্রমিক ইউনিয়ন না থাকার সমস্যা। অধিকাংশ চালকেরই

[286] https://www.thedailystar.net/business/news/ride-sharing-become-1-billion-market-bangladesh-5-7-years-3271811

[287] https://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/0/40342

নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা এবং ছুটির কোনো ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘ সময় ধরে গাড়ি বা মোটরসাইকেল চালানোর ফলে চালকদের মধ্যে পিঠ ও কোমরের ব্যথা, মানসিক চাপ ও ক্লান্তি তাদের নিত্য সঙ্গী। অন্যদিকে রাইড-শেয়ারিং কোম্পানি কর্তৃক চালকদের আয়ের উপর আরোপিত কমিশনের কোনো সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই; দৈনিক আয়ের ২০-২৫% পর্যন্ত কমিশন কোম্পানিগুলিকে দিতে হয়। শ্রম সংস্কার কমিশন মনে করে যে, সরকার, নীতিনির্ধারক ও রাইড-শেয়ারিং কোম্পানিগুলির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে রাইড-শেয়ারিং চালকদের শ্রম অধিকার, আর্থিক নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এ প্রেক্ষিতে কমিশনের সুপারিশ সমূহ নিম্নরূপ:

ক. রাইড-শেয়ারিং চালকদেরকে 'শ্রমিক' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া এবং রাইড-শেয়ারিং খাতের শ্রম অধিকার, ন্যায্য মজুরি এবং নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা বা সেল প্রতিষ্ঠা করা যার দায়িত্ব হবে বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুসরণ করে শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ, নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন এবং কোম্পানিগুলির কার্যক্রম তদারকি করা।

খ. যে সব বহুজাতিক কোম্পানি রাইড-শেয়ারিং শ্রমিকদের ব্যবহার করছে তাদেরকে উক্ত কোম্পানির সরবরাহ চেইনের সক্রিয় শ্রমিক হিসেবে বিবেচনা করা এবং আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শোভন কর্মপরিবেশ, মজুরি ও শ্রমিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

গ. জাতীয় পর্যায়ে বিশেষ মজুরি কাঠামো নির্ধারণের মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া রাইড-শেয়ারিং কোম্পানিগুলি কর্তৃক নির্ধারিত কমিশন হার ন্যায্য ও যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা প্রয়োজন, যাতে শ্রমিকরা তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী যথাযথ আয় পেতে পারেন।

ঘ. রাইড-শেয়ারিং সেবার পরিচালনায় স্বচ্ছতা এবং শ্রমিকদের ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে চালকদের ওপর আরোপিত প্রতিদিনের প্ল্যাটফর্ম ফি এবং যাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া সিটি ও ইন্টারসিটি ট্রিপ ফি স্থায়ীভাবে বাতিল করা এবং চালকদের যেন অপ্রত্যাশিত আর্থিক বোঝার সম্মুখীন হতে না হয় সে জন্য কমিশন বা নির্ধারিত সার্ভিস ফি ব্যতীত অতিরিক্ত কোনো চার্জ আরোপ না করা।

ঙ. রাইড-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মে কর্মরত শ্রমিকদের অ্যাকাউন্ট স্থগিত বা বাতিল করার ক্ষেত্রে ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া/পদক্ষেপ অনুসরণ করা প্রয়োজন:

১) কোনো চালকের অ্যাকাউন্ট বন্ধের আগে শ্রম আইন অনুযায়ী বাধ্যতামূলকভাবে নোটিশ প্রদান করা এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা।

২) যাত্রীদের অভিযোগের ভিত্তিতে চালককে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা থেকে নিষিদ্ধ না করে, নির্দিষ্ট তদন্ত পদ্ধতির মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়া।

৩) ভিত্তিহীন বা অযৌক্তিকভাবে সাময়িক বরখাস্ত করা হলে চালকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করা।

চ. রাইড-শেয়ারিং শ্রমিকদের কর্মপরিবেশে নিরাপত্তা ঝুঁকি হ্রাস এবং কাজের নিশ্চয়তা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা:

১) যাত্রীদের অসদাচরণ, অনৈতিক বা বেআইনি কর্মকাণ্ডের জন্য চালককে দায়বদ্ধ না করা এবং চালকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উভয় পক্ষের জন্য সুনির্দিষ্ট নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ।

২) অ্যাপ দ্বারা পরিচালিত রাইডে পেশাজীবী চালকের পাশাপাশি গাড়ির মালিকের বিস্তারিত তথ্যের ডাটাবেজ সংরক্ষণ।

৩) যাত্রী ও চালক উভয়ের জন্য ২৪/৭ কল সেন্টার বা সাপোর্ট সার্ভিস চালু করা যাতে কোনো সমস্যার দ্রুত সমাধান সম্ভব হয়।

৬.৭.৩ গৃহভিত্তিক শ্রমিক

ক) গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান করে তাদের সুরক্ষার জন্য শ্রম আইন ও নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

খ) গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ এবং তাদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় পর্যায়ে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের সংখ্যা ও কাজের ধরন নিয়ে জরিপ পরিচালনা করা এবং সরকারি সংস্থার মাধ্যমে এদের নথিভুক্ত করে নিবন্ধিত করা আবশ্যক।

গ) মজুরি বঞ্চনা থেকে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য বেঁচে থাকার উপযোগী ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা আবশ্যক। ঠিকাদার ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও সুরক্ষা প্রদান করতে বাধ্য করা।

ঘ) গৃহভিত্তিক শ্রমিকেরা শ্রমের অধিকার, সংগঠিত হওয়া বা দরকষাকষি বিষয়ে অবগত নন। শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের সুযোগ প্রদান করা এবং শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিতে দরকষাকষির সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক।

ঙ) সরকারি উদ্যোগে গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা এবং স্বনিয়োজিত গৃহভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে তাদের প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করা।

৭ বিশেষ প্রস্তাবনা

৭.১ শ্রম শক্তি জরিপ, শ্রম সংক্রান্ত গবেষণা ও শিক্ষা

ক) শ্রম বাজারকে স্বচ্ছ, জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ও নির্ভরযোগ্য শ্রম পরিসংখ্যানের ঘাটতি নিরসনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর অধীনে শ্রম ইস্যুতে নিয়মিত জরিপ পরিচালনা করা এবং শ্রম জরিপের ক্ষেত্রে আইএলও-এর সর্বশেষ মানদণ্ড অনুসরণ করা।

খ) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক শ্রমশক্তি, শিশুশ্রম ও শ্রম সংক্রান্ত ইস্যুতে জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত জরিপসমূহ এই কমিশন কর্তৃক শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রস্তাবিত 'গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ' অনুবিভাগের সাথে সমন্বয় করে পরিচালনা করা এবং জরিপের প্রতিটি পর্যায়ে (বিশেষত পরিকল্পনা) ট্রেড ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করা।

গ) শ্রম বাজারের গতি প্রকৃতি ও কর্মসংস্থান, শ্রমিকের অধিকার পরিস্থিতি, শিল্প সম্পর্ক এবং অন্যান্য শ্রম ইস্যুতে নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে যৌথ গবেষণা (নিয়োগকারী, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকার, উন্নয়ন সহযোগীদের সম্পৃক্ত করে) সম্পন্ন করা, যাতে এই সমস্ত গবেষণা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতিনির্ধারণে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

ঘ) শ্রমিক এবং শ্রমিক অধিকারের প্রতি সংবেদনশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রমে শ্রমিক অধিকার এবং আন্তর্জাতিক শ্রমমান বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রম ও শিল্প সম্পর্ক বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করা।

ঙ) মাঠ পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন নীতি বাস্তবায়নের সাথে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে শ্রম অধিকার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ড এবং শিল্প সম্পর্ক বিষয়ক কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা।

৭.২ বাজেট বরাদ্দ

ক) বাংলাদেশে শ্রমখাত সংশ্লিষ্ট দুটি মুখ্য মন্ত্রণালয় – শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যৌথভাবে জাতীয় বাজেট বরাদ্দের এক ভাগ বরাদ্দও পাচ্ছে না। অথচ এই দুই মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মানুষেরা দেশে-বিদেশে অর্থনীতির মূল শক্তি ও ভরসা। জাতীয় বরাদ্দের ক্ষেত্রে শ্রমখাত কম মনোযোগ পাচ্ছে, কম গুরুত্ব পাচ্ছে। বাজেট বরাদ্দের অগ্রাধিকার তালিকায় তারা নেই। বছরওয়ারি জাতীয় বরাদ্দের হিস্যায় শ্রমজীবীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির অংশীদারিত্বও বাড়ছে না। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ, কর্মসংস্থান, নিরাপত্তা ও শিল্পসম্পর্ক উন্নয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় দুটির অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির আধুনিকায়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ ও তাদের জন্য শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি প্রয়োজন। বিশেষ করে শ্রমিকের কল্যাণ ও চাহিদা বিবেচনায় রেখে শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু, বেসরকারি খাতের শ্রমিকদের আবাসন ব্যবস্থা করা, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, জাতীয় পেনশন স্কিম প্রণয়নের মধ্য দিয়ে সকল শ্রমিকের জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু করা, শ্রমিক ও শ্রমিক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার জন্য বাজেটে সুস্পষ্ট বরাদ্দ থাকা আবশ্যক।

খ) শ্রমকল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি যেমন; বিমা, বেকার ভাতা, অবসর ভাতা, দুর্ঘটনাজনিত দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিপূরণ প্রদান সংক্রান্ত প্রকল্প/সেবা প্রদান কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের তহবিল হতে যথাযথ বাজেট বরাদ্দ করা।

৭.৩ শ্বেতপত্র প্রস্তুত

ক) রানা প্লাজা দুর্ঘটনা, তাজরিন ফ্যাশন অগ্নিকাণ্ড সহ উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনা পরবর্তী সরকারি কার্যক্রম, তদন্ত ও বিচার, ক্ষতিপূরণ, শ্রম সংশ্লিষ্ট দেশি-বিদেশি আর্থিক অনুদান ব্যয় সম্পর্কিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

খ) শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন ফান্ডের ব্যবহার সম্পর্কিত শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

গ) করোনা মহামারী সহ বিভিন্ন সময় সরকারি প্রণোদনা/বিশেষ সহযোগিতা শীর্ষক শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

ঘ) শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সরকারি প্রকল্পের সফলতা ও ব্যর্থতা শীর্ষক শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

সংযুক্তি

সংযুক্তি ১.৩.১: টেকনিকাল কমিটির সদস্যদের তালিকা

গবেষণা ও প্রতিবেদন কমিটি

প্রফেসর ড. জাকির হোসেন, সম্মানিত কমিশন সদস্য
মোস্তাফিজ আহমেদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ড. আফরোজা আখতার, গবেষক
মোঃ আওরঙ্গজেব আকন্দ, মওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
ড. মো. ছায়েম আলী খান, গবেষক
ড. আয়শা ইয়াসমিন, গবেষণা সহযোগী।

মূল কমিটি

ক। আইন ও নীতি কাঠামো বিষয়ক কমিটি

এডভোকেট এ কে এম নাসিম, সম্মানিত কমিশন সদস্য
ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, সম্মানিত কমিশন সদস্য
তাসলিমা আখতার, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এ এন এম সাইফুদ্দিন, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এডভোকেট বরকত আলি, ব্লাস্ট
এডভোকেট নজরুল ইসলাম, সলিডারিটি সেন্টার
মোঃ মাছুম বিল্লাহ, আইন কর্মকর্তা, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

খ। শ্রম সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো ও গর্ভনেন্স পর্যালোচনা কমিটি

ড. মাহফুজুল হক, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এ এন এম সাইফুদ্দিন, সম্মানিত কমিশন সদস্য
সাকিল আখতার চৌধুরী, সম্মানিত কমিশন সদস্য
মোঃ শফিকুর রহমান, শ্রম অধিদপ্তর
রেজুয়ানুল হক আজম, গবেষণা সহযোগী।

গ। শ্রম অসন্তোষ, বিচার ও অভিযোগ নিষ্পতি পদ্ধতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত কমিটি

ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এডভোকেট এ কে এম নাসিম, সম্মানিত কমিশন সদস্য
তপন দত্ত, সম্মানিত কমিশন সদস্য
তাসলিমা আখতার, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এডভোকেট আতিকুর রহমান
ইমতিয়াজ আহমেদ সজল, ঢাকা ইন্টান্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
এডভোকেট তৌফিক ইমতিয়াজ, বিলস।

ঘ। শিল্প সম্পর্ক (যৌথ দরকষাকষি ও সামাজিক সংলাপ) সংক্রান্ত কমিটি

কামরান টি. রহমান, সম্মানিত কমিশন সদস্য
চৌধুরী আশিকুল আলম, সম্মানিত কমিশন সদস্য
এ এন এম সাইফুদ্দিন, সম্মানিত কমিশন সদস্য

আহসান হাবিব বুলবুল, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
খন্দকার শাফিন হাবিব শান, সলিডারিটি সেন্টার
ফাহমিনা মিশু কাশেম, জাতীয় শ্রমিক জোট
লস্কর মোঃ তসলিম, শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র।

ঙ। শ্রম জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ কর্মসূচি সংক্রান্ত কমিটি
রাজেকুজ্জামান রতন, সম্মানিত কমিশন সদস্য
ফজলে শামীম এহসান, সম্মানিত কমিশন সদস্য
সেকান্দার আলী মিনা, সেফটি এন্ড রাইট সোসাইটি
মো: মোসফিকুর রহমান, গবেষক।
আরিফুল ইসলাম, সম্মানিত কমিশন সদস্য
মোস্তফা আল হোসাইন আকিল, ছাত্র প্রতিনিধি, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ সায়েদুজ্জামান মিঠু, বিলস
মেহেদী ইমাম, গবেষক।

বিষয় ভিত্তিক টেকনিক্যাল কমিটি

ক। কাজের অধিকার, সুযোগ, নিশ্চয়তা ও অন্তর্ভুক্তি
ড. অনন্য রায়হান, সম্মানিত কমিশন সদস্য
সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, সম্মানিত কমিশন সদস্য
ড. ওয়াসেল বিন শাদাত, গবেষক
আরিফুল ইসলাম, সম্মানিত কমিশন সদস্য
মোস্তফা আল হোসাইন আকিল, ছাত্র প্রতিনিধি, শ্রম সংস্কার কমিশন।

খ। মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা
ড. অনন্য রায়হান, সম্মানিত কমিশন সদস্য
ফজলে শামীম এহসান, সম্মানিত কমিশন সদস্য
সাদিক মাহমুদ, গবেষণা সহযোগী
সজীব দে, বিলস।

গ। নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত কর্ম পরিবেশ
ফারুক আহম্মদ, সম্মানিত কমিশন সদস্য
আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
প্রফেসর ড. হাসানাত ম আলমগীর, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি
এ কে এম মাছুম উল আলম, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস
ড. মোহাম্মদ হায়াতুন নবী, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি
খন্দোকার আব্দুস সালাম, বিলস
মোঃ ওমর ফারুক, আলদি সি আর সার্পোট এশিয়া
সৈয়দ জেরিফ উদ্দিন আহমেদ, গবেষণা সহযোগী
সিফাত চৌধুরী, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব লেবার স্টাডিজ।

ঘ। সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ কমিটি ও শ্রম জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ কর্মসূচি সংক্রান্ত কমিটি একই টিম হিসাবে গণ্য হবে।

ঙ। সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব, ও যৌথ দরকষাকষি
সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব, ও যৌথ দরকষাকষি ও শিল্প সম্পর্ক (যৌথ দরকষাকষি ও সামাজিক সংলাপ) সংক্রান্ত কমিটি একই টিম হিসাবে গণ্য হবে।

চ। শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি, এবং ন্যায় বিচার
শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি, এবং ন্যায় বিচার ও শিল্প সম্পর্ক (যৌথ দরকষাকষি ও সামাজিক সংলাপ) সংক্রান্ত কমিটি একই টিম হিসাবে গণ্য হবে।

ছ। সমতা, বৈষম্যহীনতা, নারী এবং বিশেষ জনগোষ্ঠী
কোহিনূর মাহমুদ, পরিচালক, বিলস
তাসলিমা আখতার, সম্মানিত কমিশন সদস্য
ব্যারিস্টার নিহাদ কবীর, সম্মানিত কমিশন সদস্য
সানজিদা সুলতানা, অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক, কর্মজীবী নারী
আদিবা আফরোজ, গবেষক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
মৌসুমী নিশাত শিমুল, প্রোগ্রাম অফিসার, বিলস
তাকিয়া চৌধুরী, সহকারী কর্মকর্তা-এডভোকেসি, বিলস
তৃষিয়া নাশতারান, সংগঠক ও সম্পাদক, ফেমিনিস্ট অ্যালায়েন্স অফ বাংলাদেশ (এফএবি)।

জ। শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক ও জবরদস্তিমূলক শ্রম
রাজেকুজ্জামান রতন, সম্মানিত কমিশন সদস্য
আসিফ আইয়ুব, যুগ্ম মহাসচিব, বিইএফ
আফজাল কবির খান, এডুকো
হাবিবুর রহমান, বিইএফ।

বিশেষ বিষয় ভিত্তিক টেকনিক্যাল কমিটি

অভিবাসন
সাকিল আখতার চৌধুরী, সম্মানিত কমিশন সদস্য
আসিফ আইয়ুব, বিইএফ
মাজহারুল ইসলাম, আইএলও
সানজিদা খোশনূর, গবেষণা সহযোগী।

সার্বিক সহযোগিতা প্রদানরত বিলস টিম

কোহিনূর মাহমুদ, পরিচালক
নাজমা ইয়াসমীন, পরিচালক
এম এ মজিদ, উপপরিচালক
মো: ইউসুফ আল মামুন, উপপরিচালক
মো: মনিরুল ইসলাম, উপপরিচালক
টিটু মিজান, সিনিয়র কর্মকর্তা, সমন্বয়, তথ্যপ্রযুক্তি ও রক্ষণাবেক্ষণ
চৌধুরী বোরহান উদ্দিন, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
মনিরুল কবির, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
মো সায়েদুজ্জামান মিঠু, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার

সজীব দে, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
শামীম আহমেদ, রিসার্চ অফিসার
সাবরিনা শারমিন সেবা, অফিসার, মনিটরিং এন্ড ডকুমেন্টশন
মো হুমায়ুন কবির, সিনিয়র একাউন্টস অফিসার
মো আল মামুন-সিদ্দিক, সিনিয়র একাউন্টস অফিসার
মারথা হিমানি দেউরী, একাউন্টস অফিসার
মৌসুমী নিশাত শিমুল, ইনফরমেশন অফিসার
তাকিয়া চৌধুরী
মো: আল-মামুন, লাইব্রেরিয়ান
সামিয়া খান, ইন্টার্ন।

সংযুক্তি ১.৩.২: সভায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের তালিকা

শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
২) জাতীয় শ্রমিক জোট
৩) বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন
৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৫) বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার ফেডারেশন
৬) ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল বাংলাদেশ কাউন্সিল
৭) গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন
৮) গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি ও নৌ পরিবহন শ্রমিক কেন্দ্র
৯) জাতীয় সোয়েটার্স গার্মেন্টস ওয়ার্কারস ফেডারেশন
১০) রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কারস ফেডারেশন
১১) বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
১২) বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
১৩) গার্মেন্টস টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন
১৪) বিপ্লবী শ্রমিক সংহতি
১৫) গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
১৬) রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
১৭) জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
১৮) বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ
১৯) জাতীয় গার্মেন্টস শ্রমিক জোট
২০) বাংলাদেশ সংযুক্ত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
২১) গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলন
২২) গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
২৩) জাতীয় নির্মাণ শ্রমিক জোট বাংলাদেশ
২৪) গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
২৫) সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট
২৬) বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও সংগঠন
২৭) জাতীয়তাবাদী কৃষক দল
২৮) জাতীয় কৃষক জোট
২৯) বাংলাদেশ কৃষক মজুর সংহতি
৩০) বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি
৩১) বাংলাদেশ কৃষক সমিতি
৩২) বাংলাদেশ এগ্রিকালচারাল ফার্ম লেবার ফেডারেশন
৩৩) শাহজালাল ফার্টিলাইজার শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
৩৪) বাংলাদেশ কৃষক ক্ষেতমজুর সমিতি
৩৫) নারী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন
৩৬) শ্রমিক অধিকার ঐক্য পরিষদ
৩৭) বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড কংগ্রেস
৩৮) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
৩৯) গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ট্রাস্ট
৪০) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন
৪১) সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
৪২) বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
৪৩) জাতীয় তৃণমূল শ্রমিক ফেডারেশন
৪৪) বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
৪৫) বাংলাদেশ লেবার কংগ্রেস
৪৬) বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন
৪৭) বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
৪৮) বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফোরাম
৪৯) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক জোট
৫০) ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিট সেন্টার
৫১) শ্রমিক দল, রাজশাহী
৫২) রাজশাহী জেলা শ্রমিক দল রেলওয়ে
৫৩) শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৫৪) বরিশাল বাস মালিক সমিতি
৫৫) বাংলাদেশ কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
৫৬) বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
৫৭) কৃষি ব্যাংক এমপ্লোয়িস ফেডারেশন
৫৮) বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লোয়িস ফেডারেশন

৫৯) উত্তরা ব্যাংক শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
৬০) রূপালী ব্যাংক কর্মচারী সংঘ
৬১) জনতা ব্যাংক এমপ্লোয়িজ ফেডারেশন
৬২) বাংলাদেশ হাউজবিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পরেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
৬৩) বাংলাদেশ ব্যাংক জাতিয়তাবাদী কর্মচারী দপ্তর
৬৪) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমিতি
৬৫) অগ্রণী ব্যাংক কর্মচারী সমিতি
৬৬) সোনালী ব্যাংক সি. বি. এ.
৬৭) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল
৬৮) বাংলাদেশ অটোরিকশা হালকা যান ফেডারেশন
৬৯) ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, ট্যাক্সিকার, অটোট্যাম্পু, অটোরিকশা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন
৭০) বাংলাদেশ অটো-রিকশা লাইট ভেহিকেল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
৭১) ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন কমিটি ফর ওয়ার্কার্স এডুকেশন
৭২) শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
৭৩) বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৪) পাথর শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৫) বাংলাদেশ টি এস্টেস্ট স্টাফ এসোসিয়েশন
৭৬) ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৭) কে জি জি কর্মচারী ইউনিয়ন
৭৮) লঞ্চ লেবার এসোসিয়েশন
৭৯) বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন
৮০) পাটকল শ্রমিক দল
৮১) স'মিল ইউনিয়ন, খুলনা
৮২) ব্যাংক ফেডারেশন খুলনা
৮৩) ইজিবাইক ইউনিয়ন, বরিশাল
৮৪) রিকশা, ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন, বরিশাল
৮৫) বরিশাল লেবার কর্মচারী ইউনিয়ন
৮৬) বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন
৮৭) বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
৮৮) বরিশাল বাস শ্রমিক ইউনিয়ন
৮৯) বিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, বরিশাল
৯০) পাট শ্রমিক ইউনিয়ন বরিশাল
৯১) উজিরপুর উপজেলা জেলে শ্রমিক ইউনিয়ন
৯২) রাঙামাটি জেলা শ্রমিক দল
৯৩) পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম
৯৪) শ্রমিক দল বান্দরবন
৯৫) কক্সবাজার বাসদ
৯৬) শ্রমিক দল রাঙামাটি
৯৭) সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট
৯৮) সিলেট গ্যাস ফিল্ড কর্মচারী ইউনিয়ন
৯৯) জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
১০০) বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার শ্রমিক টিইউসি
১০১) রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
১০২) বিপ্লবী শ্রমিক সংহতি
১০৩) সেন্ট্রাল উইমেন্স কমিটি – বিজিআইডাব্লিউএফ
১০৪) রাষ্ট্র সংস্কার শ্রমিক আন্দোলন
১০৫) এনজিডাব্লিউএফ
১০৬) বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন

মালিক সংগঠনসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
২) নবাবগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতি, রংপুর
৩) বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স এন্ড রিসাকেলার্স এসোসিয়েশন
৪) রংপুর মোটর মালিক সমিতি
৫) চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স
৬) রংপুর জেলা ট্রাক মালিক সমিতি
৭) বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতি
৮) রংপুর জেলা রেস্তোরা মালিক সমিতি
৯) বিজিএমইএ
১০) ক্লিনিক ডায়াগস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন, রংপুর
১১) বিকেএমইএ
১২) জেলা ইট ভাটা মালিক সমিতি রংপুর
১৩) ব্যাটারিচালিত রিকশা মালিক সমিতি, রংপুর
১৪) বেকারি মালিক সমিতি, রাজশাহী
১৫) রাজশাহী স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং মালিক সমিতি
১৬) রাজশাহী মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী সমিতি
১৭) বালাদেশীয় চা সংসদ
১৮) ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
১৯) বরিশাল-পটুয়াখালি বাস মালিক সমিতি
২০) বরিশাল মৎস্য আড়ৎদার এসোসিয়েশন
২১) বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভলপমেন্ট সোস্যাইটি
২২) উইমেন চেম্বার, বরিশাল
২৩) ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স
২৪) বিসিক মালিক সমিতি সিলেট
২৫) সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
২৬) বাংলাদেশ সুইটস মেনুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশন
২৭) সিলেট ব্রিকস ওনার সোসাইটি

মানবাধিকার সংগঠনসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) অক্সফ্যাম
২) বাংলাদেশ বিজনেস এন্ড ডিজেবিলিটি নেটওয়ার্ক
৩) প্র্যাক্টিকাল একশন
৪) জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা
৫) এশিয়া ফ্লোরওয়েজ এলায়েন্স বাংলাদেশ
৬) উইমেন উইথ ডিজেবিলিটিস ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন
৭) বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
৮) ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ডিজেবলড উইমেন
৯) ডোমেস্টিক গার্মেন্টস ওয়ার্কারস ফেডারেশন
১০) জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশন
১১) আফওয়া জোট
১২) সি আর পি
১৩) চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হসপিটাল
১৪) রানা প্লাজা ট্রাস্ট
১৫) চট্টগ্রাম জেলা নারী সংহতি
১৬) Médecins Sans Frontières
১৭) ইয়াং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন
১৮) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৯) প্রত্যয় সোশ্যাল ফাউন্ডেশন
২০) ওশি ফাউন্ডেশন
২১) ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতাল
২২) বাংলাদেশ ব্যাঙ্কস এমপ্লয়িজ ফেডারেশন
২৩) জাতীয় আদিবাসী পরিষদ
২৪) মানবাধিকার ও পরিবেশ আন্দোলন বাংলাদেশ
২৫) RDRS
২৬) রূপসা
২৭) সেন্টার ফর রিসোর্স স্টাডিজ
২৮) খুলনা মুক্তি সেবা সংস্থা
২৯) এডভোকেসি অফ এমপ্লয়মেন্ট প্রোজেক্ট
৩০) অকুপেশনাল সেইফটি বোর্ড অব বাংলাদেশ
৩১) Vision Spring
৩২) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন
৩৩) বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব প্ল্যালার্স
৩৪) পাব্লিক সার্ভিস ইন্টারন্যাশনাল
৩৫) সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি
৩৬) ইউনিয়ন নেটওয়ার্ক ইন্টান্যাশনাল
৩৭) অগ্নি ফাউন্ডেশন
৩৮) ইউসেপ
৩৯) এডুকো
৪০) রিলায়েন্ট উইমেন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (RWDO)
৪১) কর্মজীবী নারী
৪২) বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস (BLAST)
৪৩) ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্টারন্যাশনাল
৪৪) শাপলা (এনজিও), রাজশাহী
৪৫) খিয়াং আদিবাসী সংগঠন
৪৬) পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ
৪৭) আদিবাসী ফোরাম
৪৮) ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ
৪৯) ন্যাশনাল ডমেস্টিক উইমেন ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন
৫০) লেদার ডেবেলপমেন্ট ফোরাম
৫১) ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স

পেশাজীবী সংগঠনসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ
২) হকার্স ফেডারেশন
৩) সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
৪) রোড ক্রস হকার্স
৫) হোম-বেইজড ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক-বাংলাদেশ
৬) ছিন্নমূল হকার্স সমিতি
৭) সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন
৮) বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও শিল্প শ্রমিক ঐক্য পরিষদ
৯) Bangladesh FMCG HR Society
১০) BGSSF
১১) অ্যাপ-বেইজড ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন
১২) মাস্টাররোল কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
১৩) বাংলাদেশ ফ্রিল্যান্সার ডেভেলপমেন্ট স্যোসাইটি
১৪) ভ্রাম্যমাণ হকার্স
১৫) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর মাস্টাররোল দৈনিক শ্রমিক
১৬) শ্রমিক দল
১৭) লাইট হাউজ, রাজশাহী
১৮) এ. বি. শ্রমিক পার্টি
১৯) মহিলা পরিষদ, রাজশাহী
২০) বঙ্গবন্ধু এভিনিউস' সংগ্রাম পরিষদ

২১) কুলি মজুর শ্রমিক ইউনিয়ন, রংপুর
২২) দপ্তরি কাম প্রহরী
২৩) জেলা বাঁধন প্রতিবন্ধী সংস্থা
২৪) বাংলাদেশ পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন
২৫) দিনের আলো হিজড়া সংঘ
২৬) রিক্সা ভ্যান চালক ইউনিয়ন
২৭) লেডিস অর্গানাইজেশন ফর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার
২৮) রাজশাহী চিনি কল
২৯) রাঙামাটি ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন
৩০) ইজিবাইক শ্রমিক ফেডারেশন
৩১) বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন
৩২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি
৩৩) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন
৩৪) ইয়াং ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট ইউনিটি
৩৫) ঢাকা রাইড-শেয়ারিং ড্রাইভার্স ইউনিয়ন
৩৬) টিভি ক্যামেরা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন
৩৭) বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ
৩৮) ঢাকা সাব এডিটর কাউন্সিল
৩৯) দপ্তরি কাম প্রহরী
৪০) লেবার রাইটস জার্নালিস্ট ফোরাম
৪১) সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
৪২) ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার
৪৩) বিউট পার্লার শ্রমিক ইউনিয়ন
৪৪) ঢাকা ইউনিয়ন অব জার্নালিস্ট
৪৫) উত্তরা ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
৪৬) বাংলাদেশ হকার্স সংগ্রাম পরিষদ
৪৭) বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন

শ্রম সংশ্লিষ্ট এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) শ্রম অধিদপ্তর
২) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
৪) বিসিক জেলা কার্যালয় রংপুর
৫) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র
৬) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ
৭) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন
৮) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৯) চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উন্নয়ন সহপযোগী সংস্থাসমূহের সাথে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে অংশগ্রহণকারী সংগঠনসমূহের তালিকা

১) FNV
২) 3F
৩) ILO
৪) GIZ
৫) ActionAid
৬) BRAC
৭) ETI
৮) USAID
৯) RISE
১০) US Embassy
১১) Denish Embassy
১২) Fair Ware Foundation
১৩) Care Bangladesh
১৪) FES
১৫) WSUP
১৬) WARBE
১৭) OXFAM
১৮) Europian Union

এছাড়াও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং ব্যক্তিবর্গের সাথে বিভিন্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন

১) লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশন (প্রতিনিধিগণ)
২) রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর
৩) শ্রম আইন সংস্কার কমিটি (সদস্যগণ)
৪) খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম
৫) এম এম আকাশ
৬) ইয়ানাতুল ইসলাম
৭) হামিদা হোসেন
৮) আনু মোহাম্মদ
৯) মোঃ রিজওয়ানুল ইসলাম
১০) শাহীন আনাম
১১) মোশাহিদা সুলতানা

সংযুক্তি ১.৩.৩: দাবিনামা ও লিখিত মতামত প্রদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা

যে সকল শ্রমিক সংগঠন কমিশনের নিকট সুপারিশ/দাবিনামা পেশ করেছে, তার তালিকা

১) বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
২) গার্মেন্টস শ্রমিক পরিষদ
৩) ট্যানারি শিল্পের শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন
৪) ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন নারী চালক শ্রমিক ইউনিয়ন
৫) বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন
৬) ডক জাতীয়তাবাদী শ্রমিক
৭) স্ক্যাভেঞ্জার্স এন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের
৮) মেঘনা পেট্রোলিয়াম এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
৯) বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
১০) বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ
১১) উত্তর চট্টলা উপকূলীয় জলদাশ কল্যাণ ফেডারেশন
১২) বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
১৩) কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স
১৪) বিউটি পার্লার শ্রমিক
১৫) চট্টগ্রাম হালকা মোটরযান চালক-শ্রমিক ইউনিয়ন
১৬) গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
১৭) চট্টগ্রাম মহানগর নির্মাণ শ্রমিক দল
১৮) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, খুলনা
১৯) বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন
২০) সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
২১) ট্রেড ইউনিয়ন প্লাটফর্ম ফর মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স
২২) বাংলাদেশ জাতীয় বিদ্যুত শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
২৩) সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন
২৪) শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, খুলনা
২৫) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি), চট্টগ্রাম
২৬) খুলনা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন
২৭) বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
২৮) বাংলাদেশ ট্যুরিজম এন্ড হোটেলস ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন
২৯) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
৩০) চট্টগ্রাম ওয়াসা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক কর্মচারী দল
৩১) কেন্দ্রীয় চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন
৩২) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
৩৩) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
৩৪) উত্তর খুলনা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন
৩৫) জাতীয় গাহর্স্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন
৩৬) সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
৩৭) ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ
৩৮) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
৩৯) মৌলভীবাজার মৎস্যজীবী ইউনিয়ন
৪০) বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
৪১) বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন, খুলনা
৪২) বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন
৪৩) বৃহত্তর বরিশাল রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন
৪৪) শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ
৪৫) সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, মৌলভীবাজার
৪৬) বাংলাদেশ রেল শ্রমিক ইউনিয়ন
৪৭) বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন
৪৮) রংপুর জেলা হোটেল রেস্তরা শ্রমিক ইউনিয়ন
৪৯) ইন্টান্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন
৫০) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, বরিশাল
৫১) বাংলাদেশ অটোরিকশা-হালকাযান পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন
৫২) ট্যাক্সি কার, অটোটেম্পু, অটোরিক্সা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন, ঢাকা
৫৩) এ্যালায়েন্স অব ট্রেড ইউনিয়ন
৫৪) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন
৫৫) সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট
৫৬) পঞ্চগড় জেলা ট্রাক, ট্রাক্টর, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন
৫৭) সোনারগাঁও হোটেল শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন
৫৮) ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন
৫৯) ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিক্সা চালক ঐক্য পরিষদ
৬০) পপুলার ফার্মাসিটিউক্যাল লিঃ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
৬১) উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
৬২) ডক বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
৬৩) বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
৬৪) ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন
৬৫) জাতীয় কারিগর ও শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন
৬৬) বগুড়া জেলা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র হকার্স ইউনিয়ন
৬৭) ১০০ টিএসসি মেম্বার কনটিগুইটি
৬৮) বাংলাদেশ গণপূর্ত কর্মচারী ইউনিয়ন, পানি উন্নয়ন বোর্ড বগুড়া
৬৯) ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, (টি ইউ সি), বগুড়া
৭০) বগুড়া পাদুকা শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়া
৭১) বাংলাদেশ ব্যাংকস এমপ্লয়িজ ফেডারেশন
৭২) বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ

৭৩) বগুড়া জেলা জাতীয়তাবাদী হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৪) খুলনা হ্যান্ডলিং শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৫) চা শ্রমিক ইউনিয়ন, মৌলভীবাজার
৭৬) স্বাধীনতা আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ
৭৭) পল্লি বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
৭৮) দৌলতপুর থানা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন
৭৯) গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

যে সকল পেশাজীবী সংগঠন কমিশনের নিকট সুপারিশ/দাবিনামা পেশ করেছে, তার তালিকা

১) বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর আউটসোর্সিং কর্মচারীগণ
২) বাংলাদেশ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালক কল্যাণ সমিতি
৩) ঢাকা ওয়াসা আউটসোর্সিং এ নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ
৪) ঢাকা রাইড-শেয়ারিং ড্রাইভার্স ইউনিয়ন
৫) জি. সি. বি. চট্টগ্রাম বন্দর ল্যাসিং অ্যান ল্যাসিং শ্রমিক
৬) বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
৭) রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ
৮) বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, মৌলভীবাজার
৯) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দল
১০) মিলনপুর মাঝিপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, রংপুর
১১) প্রাথমিক দপ্তরিদের চাকরি জাতীয়করণ দাবি আদায় সমন্বয় পরিষদ
১২) বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন, খুলনা
১৩) বিক্রয় বিপণন শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ
১৪) সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন
১৫) বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেনটেটিভ এ্যাসোসিয়েশন
১৬) টিভি ক্যামেরা সাংবাদিক
১৭) হোম-বেইজড ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক-বাংলাদেশ
১৮) বাংলাদেশ অবিভাগীয় ডাক কর্মচারী পরিষদ
১৯) জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড
২০) বিক্রয় বিপণন শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ
২১) পল্লি বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ
২২) কার, মাইক্রো, এ্যাম্বুলেন্স চালক কল্যাণ উপ-কমিটি
২৩) বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের
২৪) অ্যাপ-বেইজড ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন
২৫) গ্রামীণ ব্যাংকে দৈনিক ভিত্তিক পিয়ন কাম গার্ড
২৬) বাংলাদেশ এফএমসিজি এইচ আর সোসাইটি
২৭) গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম
২৮) বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার এসোসিয়েশন
২৯) সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকা আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ
৩০) ড্রাইভারস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন
৩১) বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
৩২) আউটসোর্সিং কর্মচারীগণ
৩৩) বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ
৩৪) জাতীয় কৃষক জোট
৩৫) মেট্রোরেল প্রকল্প আউটসোর্সিং কর্মচারী
৩৬) জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা
৩৭) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ
৩৮) Bangladesh Business & Disability Network
৩৯) বাংলাদেশ হকার সংগ্রাম পরিষদ
৪০) বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি
৪১) ওয়ার্ক এন্ড হেলথ সেইফটি এসিস্টেন্ট সেন্টার
৪২) সকল বাঁওড় জলমহালে ভুক্তভোগী ভূমিজ জেলে জনগোষ্ঠী
৪৩) ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৩ শাখা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৪৪) কৃষিশ্রমিক অধিকার মঞ্চ
৪৫) গ্রামীণফোন শ্রমিক ঐক্য পরিষদ
৪৬) ফায়ার সার্ভিস
৪৭) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ
৪৮) খালিশপুর জুটমিল কারখানা কমিটি
৪৯) সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
৫০) সোনারগাওঁ টেক্সটাইল শ্রমিক কর্মচার সংগ্রাম পরিষদ
৫১) অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি
৫২) চা-বাগান শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী জনগণ
৫৩) BFSCD এর আউটসোর্সিং কর্মচারী, বাবুর্চি ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীবৃন্দ
৫৪) নগরের পরিচ্ছন্নতাকর্মী
৫৫) চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত আউটসোর্সিং কর্মচারী
৫৬) আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ
৫৭) পাটকল রক্ষা আন্দোলন (যশোর-খুলনা)
৫৮) নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
৫৯) অলিম্পিক সিমেন্ট লিমিটেড শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ
৬০) জাতীয় সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় নারীজোট
৬১) NESCO (NORTHERN ELECTRICITY SUPPLY COMPANY PLC) এ কর্মরত আউটসোর্সিং/এল ই এম কর্মচারী
৬২) পল্লি দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্মচারী
৬৩) রং, বোর্ড, কাঠ শিল্প শ্রমিক ফ্রন্ট, বগুড়া
৬৪) রিকসা, ব্যাটারি রিকসা-ইজিবাইক, ভ্যান সংগ্রাম পরিষদ, বগুড়া

৬৫) প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাস্টাররোল/অনিয়মিত কর্মচারী
৬৬) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিরাপত্তা প্রহরী
৬৭) ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিক্সা চালক ঐক্য পরিষদ
৬৮) মাস্টাররোল কর্মচারী ঐক্য পরিষদ
৬৯) সিএমএইচ ঢাকা এর আউটসোর্সিং কর্মচারী
৭০) মাস্টার রোল দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কল্যাণ পরিষদ
৭১) বাংলাদেশ জাহাজী শ্রমিক সংঘ
৭২) বাংলাদেশ টি এষ্টেট স্টাফ এসোসিয়েশন
৭৩) ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিঃ বিক্রয় বিপণন শ্রমকি কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ

যে সকল মানবাধিকার সংগঠন কমিশনের নিকট সুপারিশ/দাবিনামা পেশ করেছে, তার তালিকা

১) নারীপক্ষ
২) ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন ফর দ্যা আরবান পুউর
৩) বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ
৪) রানা প্লাজা অ্যাকসিডেন্ট ভিকটিমস্ রাইটস নেটওয়ার্ক
৫) ইপসা
৬) অ্যাকশন এইড
৭) মমতা
৮) ক্ষুব্ধ নারী সমাজ
৯) সিপিডি
১০) হোমবেইজড ওয়ার্কার্স রাইট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ
১১) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ
১২) Bangladesh FSM Network
১৩) বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
১৪) বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ
১৫) হরিজন ঐক্য পরিষদ
১৬) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৭) ভিসন স্প্রিং
১৮) ইথিক্যাল ট্রেডিং ইনিশিয়েটিভ
১৯) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস
২০) কর্মজীবী নারী
২১) OXFAM
২২) সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি
২৩) Medecins Sans Frontieres
২৪) নাগরিক উদ্যোগ
২৫) কর্মজীবী নারী
২৬) বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট
২৭) Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement
২৮) স্যানিটেশন ওয়ার্কার্স ফোরাম
২৯) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস
৩০) বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ এন্ড সায়েন্সেস

যে সকল মালিক সংগঠন কমিশনের নিকট সুপারিশ/দাবিনামা পেশ করেছে, তার তালিকা

১) ন্যাশনাল টি কোম্পানি লি.
২) পঞ্চগড় জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ মালিক সমিতি
৩) পঞ্চগড় জেলা ট্রাক, ট্যাংকলরি ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি
৪) বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন
৫) রংপুর জেলা ট্রাক কাভার্ডভ্যান ও ট্রাক্টর মালিক সমিতি
৬) Bangladesh Garments Manufacturers and Exporters Association
৭) বাংলাদেশীয় চা সংসদ
৮) বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি
৯) বাংলাদেশ বাস ট্রাক ওউনার্স অ্যাসোসিয়েশন
১০) বেপজা

যে সকল শ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কমিশনের নিকট সুপারিশ/দাবিনামা পেশ করেছে, তার তালিকা

১) শ্রম অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম
২) শ্রম অধিদপ্তর
৩) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অদিদপ্তর, চট্টগ্রাম
৪) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অদিদপ্তর
৫) শিল্প সর্ম্পক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম
৬) শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র
৭) শিল্প পুলিশ
৮) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন
৯) শ্রম অধিদপ্তর, দিনাজপুর

সংযুক্তি ৪.৩: শ্রমিক, মালিক, পেশাজীবী, শ্রম ও মানবাধিকার সংগঠন ও শ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত শ্রমসংস্কার বিষয়ক প্রস্তাবনা

ট্যানারি শিল্পের শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন

১. ২১শে নভেম্বর ২০২৪ তারিখে ঘোষিত নিম্নতম মজুরি অবিলম্বে প্রতিটি কারখানায় বাস্তবায়ন করা;
২. ট্যানারি কারখানাগুলিতে শ্রম আইনের সকল ধারা বাস্তবায়নে দ্রুত ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
৩. শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নয়নে সেইফটি কমিটি গঠন ও কার্যক্রম জোরদার করা সহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
৪. চামড়া শিল্প নগরীতে ৫০ শয্যাবিশিষ্ট একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা;
৫. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর-এর পরিদর্শন কার্যক্রম স্বচ্ছ, কার্যকর ও জোরদার করা;
৬. প্রসূতি কল্যাণ সুবিধাসহ নারী শ্রমিকদের প্রাপ্য সকল সুযোগ- সুবিধা নিশ্চিত করা;
৭. শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু সহ টিসিবির মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে খাদ্য সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা;
৮. শিল্পের স্বার্থে অবিলম্বে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শ্রমিককে চাকরিচ্যুত করা বন্ধ করা;
৯. রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্সবিহীন মধ্যস্বত্বভোগী বে-আইনি ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ করানো বন্ধ করা এবং কারখানায় স্থায়ী কাজে স্থায়ীভাবে শ্রমিক নিযুক্ত করা;
১০. ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার স্বাধীনতায় এবং আইন দ্বারা স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার চর্চায় প্রশাসনিক এখতিয়ার বহির্ভূত হস্তক্ষেপ না করা এবং আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ মোতাবেক শ্রমিকদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করা;
১১. সোশ্যাল কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সিইটিপিকে পুরোপুরি কার্যকর করার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক চামড়া শিল্প নগরী গড়ে তুলে লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি)-এর সনদ অর্জন করা;
১২. ট্যানারি শিল্পকে আনুষ্ঠানিক সেক্টরের ধারাবাহিকতায় ফিরিয়ে আনা।

প্রাথমিক দপ্তরিদের চাকরি জাতীয়করণ দাবি আদায় সমন্বয় পরিষদ

১. আউটসোর্সিং নিয়োগ নীতিমালা পরিবর্তন করে স্ব স্ব অবস্থানে রেখে দপ্তরি কাম প্রহরী পদটি না রেখে শুধুমাত্র দপ্তরি বা অফিস পদ বহালের জোর অনুরোধ জানাচ্ছি।
২. দপ্তরি কাম প্রহরীদের রিটের বিপরীতে হাইকোর্টের প্রদানকৃত রায় বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. পূর্বের ন্যায় ২টি উৎসব ভাতা বহাল ও নববর্ষ ভাতা প্রদানের অনুরোধ জানাচ্ছি।
৪. শারীরিক অসুস্থতা ও মানবিক দিক বিবেচনা করে নৈমিত্তিক ছুটির আবেদন জানাচ্ছি।
৫. কর্মক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা/মৃত্যু বরণ করলে এক জীবন সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
৬. কাজের সুনির্দিষ্ট পরিধি না থাকায় প্রতিনিয়ত সহকর্মীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, তাই অবিলম্বে কাজের পরিধি সুর্নিদিষ্ট করতে হবে।
৭. অন্যান্য কর্মচারীর মত বর্তমান বাজার পরিস্থিতি বিবেচনায় বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করতে হবে।
৮. গত ২০১৪ সালের ন্যায় প্রাপ্যতার ভিত্তিতে মহার্ঘ্য ভাতা প্রদান নিশ্চিত করা।
৯. সরকারি বিধি মোতাবেক একজন কর্মচারী ৮ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করবে কিন্তু আমাদেরকে ২৪ ঘণ্টা দায়িত্ব পালন করতে হয়। তা থেকে মুক্তি পেতে চাই।
১০. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দপ্তরি কাম প্রহরীদের সন্তাদের শিক্ষার ভাতার আওতায় আনা।

ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেড পরিবেশক বিক্রয় বিপণন শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ

১. ইউনিলিভার বাংলাদেশ লিমিটেডসহ বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, গ্রুপ কোম্পানি সহ বিভিন্ন কোম্পানির পণ্য বিক্রয় বিপণন কাজে নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠিত হওয়ার অধিকারের প্রেক্ষিতে আইনগত বাধা দূর করা প্রয়োজন।
২. বিক্রয় বিপণন কাজে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের আইনগত বাধা দূর করা প্রয়োজন।
৩. শ্রম আইন সংস্কার ও বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ও যথাযথ ভূমিকা প্রত্যাশা করি।

বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেনটেটিভ এ্যাসোসিয়েশন (ফারিয়া)

১. সুনির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা নির্ধারণ যা শ্রম আইন অনুযায়ী হতে হবে। এ ব্যাপারে স্থায়ী নীতিমালা করা।
২. শিফট অনুযায়ী কাজ করাতে হবে।
৩. সাপ্তাহিক ১ দিন ছুটি নিশ্চিত করা এবং সকল সরকারি ছুটি বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন করতে হবে।
৪. রুগির ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপত্রের ছবি তোলার জন্য চাপ প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে।
৫. অসামঞ্জস্যপূর্ণ সেলস টার্গেট দেয়া যাবে না (সেক্ষেত্রে বছরে ১০% এর বেশি সেলস টার্গেট বাড়ানো যাবে না)।
৬. সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া কাউকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া যাবে না। সেক্ষেত্রে অব্যাহতি দিতে হলে শ্রম আইন অনুযায়ী সকল দিক লক্ষ্য রেখে অব্যাহতি দিতে হবে।
৭. মোটরসাইকেল কোম্পানির প্রফেশনাল কাজে ব্যবহৃত হয়। তাই মোটরসাইকেল এর দাম সম্পূর্ণ কোম্পানিকে বহন করতে হবে।
৮. প্রতি বছর সেলারির কমপক্ষে ১০% ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে।
৯. সকল মার্কেটিং কর্মচারীদের পরিবারসহ চিকিৎসা সেবা কোম্পানিকে বহন করতে হবে।
১০. বর্তমান বাজার মূল্য অনুযায়ী TA/DA নির্ধারণ করতে হবে।

১১. একটি পেশা হিসাবে সকল মানদণ্ড থাকার পরেও মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ পেশার রাষ্ট্রীয় আইনে কোনো স্বীকৃতি নেই। অতএব মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ পেশাকে আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে।
১২. যেসব কোম্পানি ক্রেডিট সেল করে, ক্রেডিটের সকল দায়-দায়িত্ব সেই সকল কোম্পানিকে বহন করতে হবে।
১৩. মার্কেটিং ও সেলস ডিপার্টমেন্টে ট্রেড ইউনিয়ন থাকতে হবে।
১৪. সকল ঔষধ কোম্পানির মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের জন্য শ্রম আইন বাধ্যতামূলক করা।
১৫. প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দেওয়া।
১৬. শ্রম আইনে শ্রমিকের 'সংজ্ঞার' সংশোধন/পরিবর্তন। শ্রমিকের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন। আমরা মনে করি মালিক ব্যতীত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলেই শ্রমিক।
১৭. শ্রম আইনে শ্রমিকের সংজ্ঞার পরিবর্তন বা পরিমার্জন আনা জরুরি। যে সংজ্ঞার মধ্যে অধিক এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের অন্তর্ভুক্তি থাকে।
১৮. চাকরির সমস্ত শর্তাবলি এবং সুযোগ সুবিধা পরিষ্কারভাবে প্রকাশ থাকতে হবে।
১৯. নিয়োগ প্রদানের সময় কর্মী বা শ্রমিকের সাথে কোনো অবৈধ চুক্তি, শিক্ষা সনদের মূল কপি এবং ব্ল্যাংক চেক যাতে জমা নিতে না পারে সেই বিষয়টি শ্রম আইনে সংযোজন করতে হবে।
২০. যে সকল প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি তাদের সকল সেক্টরের কর্মীদের পরিচালনার ক্ষেত্রে বর্তমান শ্রম আইন মেনে চলে না তাদেরকে কীভাবে শ্রম আইনের আওতায় আনা যায় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
২১. শ্রমিকের গ্র্যাচুইটির বিষয়টি আরো স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে শ্রম আইনে সংযোজন করতে হবে।
২২. প্রতিষ্ঠান বা নিয়োগকর্তা কর্মীদের শ্রম আইন অনুযায়ী পরিচালনা করছে কিনা সেটা নিশ্চিত করার জন্য স্টেক হোল্ডার এবং শ্রম অধিদপ্তরের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে এবং এটি শ্রম আইনে সংযোজন করতে হবে। কোম্পানি বা নিয়োগ কর্তা এটি না করলে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখতে হবে।
২৩. শ্রম আপিল ট্রাইবুনালে অভিযোগ নিষ্পত্তির মেয়াদ সর্বোচ্চ ছয় (৬) মাস করতে হবে।
২৪. শ্রম অধিদপ্তরের স্টেক হোল্ডারদের সাথে বিভিন্ন আলোচনায় স্টেক হোল্ডার হিসেবে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
২৫. শ্রম আইনের ধারা ১৮৩ এর উপধারা ২ সংশোধন করতে হবে - অনধিক বিশ (২০) জনের পরিবর্তে বিশের (২০) কম বা বেশি যে কোনো সংখ্যা করতে হবে।
২৬. শ্রম আইনের ধারা ১৮৩ এর উপধারা ২ সংশোধন না করলে ১৮৩ ধারার উপধারা ৩ এ যেসকল সেক্টর অন্তর্ভুক্ত আছে সেখানে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ বা অন্য যে কোনো সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ পেশাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

পল্লি বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন

পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড আইন-২০১৩ এর ৩১ ধারা বাতিলপূর্বক এবং বাংলাদেশ শ্রম আইনের পল্লি বিদ্যুতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে ধারা সংযোজন করে আমাদের এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শ্রম আইন আইএলও কনভেনশন এর আলোকে কর্মচারীদের ন্যায় সঙ্গত সাংবিধানিক অধিকার, ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠাকরণে পথ সুগম করার নিমিত্ত সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কমিশনের নিকট আবেদন।

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ

১. রাষ্ট্রের স্বায়িত্বশাসিত অর্ধ-স্বায়িত্বশাসিত সহ সকল সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে বেতন বৈষম্য দূর করে একটি নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো গঠন করতে হবে।
২. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ঝুঁকি ভাতা দিতে হবে।
৩. পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে আউটসোর্সিং নিয়োগ বাতিল করে রাজস্ব খাতে চাকরিতে স্থায়ী নিয়োগ দিতে হবে।
৪. পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্য মানসম্মত বাসযোগ্য বাসস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. হরিজনদের আদি পেশা ঝাড়ুদার পরিচ্ছন্নতা কর্মী। তাই বংশপরম্পরায় এই পেশায় হরিজনদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দিতে হবে।
৬. কাজে কর্তব্যরত অবস্থায় স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
৭. পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে কর্মরত নারী কর্মীদের রাত্রীকালীন কাজে নিরপত্তা দিতে হবে।
৮. পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে ব্লক পদ চলমান রয়েছে। সেটি বাতিল করে প্রমোশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. শিক্ষিত হরিজন জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী অন্যান্য পদে চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে হরিজন সম্প্রদায়ের জাত হরিজনদের ৮০% কোটা বরাদ্দ বাস্তবায়ন করতে হবে।

স্ক্যাভেঞ্জার্স এন্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

১. বর্জ্য ব্যবস্থপনা বিভাগে কর্মরত অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতা কর্মীসহ চালক ও অন্যান্য বিভাগের দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকদের অন্যায়ভাবে কর্মচ্যুতদের জরুরি ভিত্তিতে চাকরিতে পুনর্বহালকরণ এবং ৬০ জন পরিচ্ছন্ন কর্মীর স্থগিত বেতন চালুকরণ।
২. বর্জ্য ব্যবস্থপনা বিভাগে কর্মরত অস্থায়ী পরিচ্ছন্নতা কর্মী সহ চালক ও অন্যান্য বিভাগের দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ।
৩. অস্থায়ী পরিচ্ছন্ন কর্মীদের সহ চালক ও অন্যান্য বিভাগের দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকদের ৫৯ বৎসর প্রথা বাতিল সহ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর ন্যায় সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থাকরণ।
৪. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচ্ছন্নতা কাজের স্বার্থে স্মরক নং- ৪৬.২০৭.০০০.০৩.০৩/০১৯.২০১৪-৩৮১ তারিখ ১২/০৫/২০২১ বাতিল পূর্বক স্মারক নং: ৯৭৯ তাং। ১০/০৬/১৯৯২ পুনর্বহালকরণ।
৫. বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচ্ছন্নতা কর্মী সহ চালক ও অন্যান্য বিভাগের দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকদের মৌখিক ভাবে বন্ধ হওয়া ঈদ বোনাস/দুর্গা পূজা বোনাস। উৎসব ভাতা পুনরায় চালুকরণ এবং সকল অস্থায়ী বেতন কর্তন বন্ধকরণ।

৬. কর্মরত অবস্থায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী সহ চালক ও অন্যান্য বিভাগের দক্ষ/অদক্ষ শ্রমিকের মৃত্যু অনুদান, সড়ক দুর্ঘটনায় পঙ্গুত্ব বরণ অন্যান্য রোগ ব্যাধিতে আক্রান্তদের ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ন্যায় সুযোগ সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থাকরণ।
৭. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত বহুতল ভবন নির্মাণ ও কলোনিতে ক্ষতিগ্রস্থদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাসা বরাদ্দ প্রদান।
৮. আইডি কার্ডের ঠিকানা পরিবর্তন করে সুন্দর ভাষায় লেখা হোক।
৯. হরিজনদের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা বৈষম্যকে দূরীকরণ।
১০. উত্তর বা দক্ষিণ তথা চট্টগ্রামের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বেতন, ভাতার বৈষম্য দূরীকরণ।
১১. পরিবহন কর্মীদের জন্য সুন্দরভাবে পর্যাপ্ত বাসস্থান নির্মাণ করা।
১২. নিয়োগ পত্র প্রদান করতে হবে।
১৩. সিটি কর্পোরেশন অর্গানোগ্রামে পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদ সংযুক্তি করতে হবে।

বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন

১. রেশন কার্ডের মাধ্যমে গার্মেন্টস শ্রমিকদের চাল-ডাল-তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী স্বল্প মূল্যে প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।
২. আইএলও কনভেনশনের আলোকে ইপিজেডসহ সকল গার্মেন্টস কারখানায় শ্রমিকদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে এবং একই আইন প্রচলন করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনে সকল আইনি বাধা দূর করতে হবে।
৩. সংবিধান সংস্কারে সকল শ্রমিকের খাদ্য নিরাপত্তা রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করার ধারা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৪. শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও জীবিকা নিরাপত্তায় মালিক, সরকার, বায়ার উদ্যোগী হয়ে 'জরুরি স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা' তহবিল গঠন করতে হবে। যে তহবিল থেকে স্বাস্থ্য নিরাপত্তাসহ শ্রমিকের জীবিকার উপর হুমকি আসলে তা মোকাবিলা করা হবে।
৫. অনানুষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমজীবীসহ কর্মহীন ও কর্মঅক্ষম শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করতে ‘সার্বজনীন কল্যাণ তহবিল’ গঠন করতে হবে।
৬. গার্মেন্টস শিল্প অঞ্চল ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, সাভার, আশুলিয়া এবং চট্টগ্রাম ৬টি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প অঞ্চলে আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল নির্মাণ করতে হবে। যেখানে দেশি-বিদেশি ডাক্তার থাকবে, যার ব্যয় বহন করবে গার্মেন্টস মালিক-বিদেশি বায়ার ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।
৭. ২০১২ সালের তাজরীন ফ্যাশনে অগ্নিকাণ্ডে এবং ২০১৩ সালের রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে নিহত-আহত শ্রমিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, আহতদের চিকিৎসা-ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাজরীন গার্মেন্টস এর মালিক খুনি দেলোয়ার এবং রানা প্লাজা ভবন ধ্বসে ভবন মালিক সোহেল রানার জামিন বাতিল ও বিচার এবং ওই ভবনের গার্মেন্টস কারখানার মালিকসহ সকল দায়ী-দোষীদের শ্রমিক হত্যার অভিযোগে বিচার করতে হবে।
৮. স্বৈরাচারী সরকারের আমলে শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে সকল কমিটিতে মালিক-সরকারের মনোনীত বশংবদদের বাদ দিয়ে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে সকল কমিটি গঠন করতে হবে।

গ্রামীণ ব্যাংকে দৈনিক ভিত্তিক পিয়ন কাম গার্ড

১. অবিলম্বে দৈনিক ভিত্তিতে পিয়ন-কাম-গার্ড হিসেবে কর্মরত সকল কর্মচারীকে নিয়োগের ৯ মাস পর থেকে স্থায়ীকরণ করতে হবে।
২. নিয়োগপত্র, ছবিসহ পরিচয়পত্র, সবেতন সাপ্তাহিক ও অন্যান্য ছুটি, বোনাসসহ বাংলাদেশের শ্রম আইন ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুযায়ী প্রাপ্য অধিকার দিতে হবে।
৩. গ্রামীণ ব্যাংক-এর চাকরিবিধি অনুযায়ী মাসিক বেতন, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন, গ্র্যাচুইটি, ঋণ সুবিধাসহ সামাজিক নিরাপত্তার যাবতীয় সুবিধা প্রদান করতে হবে।
৪. আন্দোলন ও সংগঠন দমনে শাস্তিমূলক ছাঁটাই-বদলি বন্ধ করতে হবে। চাকরিচ্যুতদের ক্ষতিপূরণসহ পুনর্বহাল করতে হবে। নেতৃবৃন্দের নামে ব্যাংক কর্তৃক দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে লোকনিয়োগ বন্ধ করতে হবে।
৫. দাবি আদায়ের আন্দোলনে আজিজুল হক বাবুল, আব্দুল আজিজ, ইলিয়াস শাহী'সহ যাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে তাদেরকে পুনর্বহাল করতে হবে।

গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম

১. বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা-১ (ণ) বাতিল করে গৃহ শ্রমিকদেরকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রমিক হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও মর্যাদা দিতে হবে।
২. 'গৃহকর্মী কল্যাণ ও সুরক্ষা নীতিমালা' ২০১৫ এর যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। নীতিমালার আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি মনিটরিং সেল গঠন ও এর কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হবে।
৩. লিখিত চুক্তিপত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে। চুক্তিপত্রে সকল ধরনের গৃহকর্মীদের (আবাসিক, অনাবাসিক, খণ্ডকালীন স্থায়ী, কাজের সময় ও ধরন, বেতনের পরিমাণ ও বেতন পরিশোধ সপ্তাহে একদিন ছুটি দুর্যটনাজনিত চিকিৎসা ও মাতৃত্বকালীন ছুটি) বিষয়গুলি অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে।
৪. গৃহকর্মীর প্রতি যৌন শারীরিক ও মানসিকসহ সকল প্রকার নির্যাতন বন্ধ করতে হবে।
৫. ১৪ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে গৃহকর্ম পেশাসহ সকল পেশায় নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।
৬. গৃহকর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য রাষ্ট্রীয় অনুমতি দিতে হবে।
৭. গৃহকর্মীদের জন্য রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করতে হবে।

৮. নিয়োগকারী যেমন তার দায়িত্ব (নাম সম্বোধন করে ডাকা ও দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো, মাসের প্রথম ৭দিনের মধ্যে বেতন প্রদান কাজ বাতিলের ১ মাস আগে জানানো ইত্যাদি) সঠিকভাবে পালন করবে তেমনই গৃহকর্মীকেও তার দায়িত্ব (নিয়মিত ও যথা সময়ে কাজে আসা না জানিয়ে ছুটি কাটানো আপচয় ও দায়িত্বে অবহেলা ইত্যাদি) সঠিকভাবে পালন করতে হবে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় নারীজোট

১. বাজারদর বা মূল্যস্ফীতির বিবেচনায় বাঁচার উপযোগী ন্যায্যমজুরি নিশ্চিত করতে হবে।
২. শিশুশ্রম নিষিদ্ধ করে সকল শ্রমিক পরিবারের জন্য আত্মবিকাশের উপযোগী পরিবেশ ও ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৩. শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে ভয়-ভীতিহীন, স্বাস্থ্যকর নিরাপদ পরিবেশ থাকতে হবে।
৪. শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে অবশ্যই ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিতে হবে।
৫. পাটকল, চিনিকল, বস্ত্রকল সহ বন্ধ শিল্পগুলি চালু করতে হবে।
৬. শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা চিকিৎসা সেবা বিভিন্ন পরিষেবা রাষ্ট্রকে বহন করতে হবে।
৭. চা বাগান, বস্তি, চরাঞ্চল হাওর বাউর এলাকায় হতদরিদ্র শ্রমিকদের উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৮. আমার সর্বশেষ প্রস্তাব হচ্ছে যাদের সমস্যা, যারা বঞ্চিত, যারা অবহেলিত সেই জনগোষ্ঠীকেও রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে।
৯. বৃহৎ শিল্প থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানায় 'যৌথ ব্যবস্থাপনা' গড়ে তুলতে হবে। এই যৌথ ব্যবস্থাপনায় যেমন মালিক থাকবে তেমনি কর্মচারীর প্রতিনিধি থাকবে এবং শ্রমিক প্রতিনিধি থাকবে।
১০. এই যৌথ ব্যবস্থাপনা চালু না হলে ব্যবস্থাপনায় শ্রমিক কর্মচারীদের আইনগত অংশীদারিত্ব না থাকলে শ্রমিকদের ন্যায় সঙ্গত অধিকার কখনো নিশ্চিত হবে না।
১১. করুনা বা দয়া নয় শ্রমিকের ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে নিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে সংসদ সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক কর্মচারী, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, সাংবাদিক, শিক্ষক, আইনজীবী সহ সমাজের সকল অংশে মানুষের অংশীদারিত্ব ভিত্তিক রাজনীতি চালু করতে হবে।
১২. শ্রমিকগণ জনগণের বিরাট অংশ। সুতরাং রাষ্ট্রের মালিকানার সাথে শ্রমিকরাও অংশীদার।

নারীপক্ষ

আইন ও নীতি সংক্রান্ত:

- কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি বিলোপ সংক্রান্ত আইএলও কনভেনশন ১৯০ (Violence and Harassment Convention, 2019 (No. 190) গার্হস্থ্য এবং গৃহকর্মীদের উপযুক্ত কাজ আইএলও সনদ ১৮৯ (C189 Convention on Domestic Workers) এ অণুস্বাক্ষর করা।
- শ্রম-আইন সংশোধন করে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতের কাজকে স্বীকৃতি দেওয়া। নারীর অংশগ্রহণ বেশি এমন কর্মক্ষেত্রগুলিতে (যেমন: গৃহকর্মী, যৌনকর্মী, কৃষি শ্রমিক) ক্রমান্বয়ে শ্রম-আইন এর আওতায় এনে ন্যূনতম মজুরি ও অন্যান্য অধিকার নিশ্চিত করা।
- নারী অভিবাসী শ্রমিক নিয়োগ ও প্রেরণ সংক্রান্ত আইন হালনাগাদ করা, যার মধ্যে আবাসন ব্যবস্থা, মৃত্যুজনিত কারণের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা, দেশে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা করাসহ অভিবাসী শ্রমিকদের আইনি অধিকার সহজ ও মানসম্মত করা।

কাঠামো সংক্রান্ত:

- কৃষক ও জেলে হিসেবে নারীর কাজের স্বীকৃতি প্রদান, নারী কৃষকের কৃষিজমি ব্যবহারের ভিত্তিতে কৃষিকার্ড ও কৃষিঋণ বরাদ্দ করাসহ নারী কৃষকদের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা।
- বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের কাজের সম সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব বণ্টনে বৈষম্য নিরসনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সমান ও ন্যায্য মজুরি পাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি পরিবীক্ষণ ও মালিকপক্ষ'র জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার (rights of association) এবং সম্মিলিতভাবে দর কষাকষির অধিকার (collective bargaining rights) এর উপর বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়া, শ্রমিক আন্দোলনে নারী প্রতিনিধিত্ব ও নেতৃত্ব বাড়ানো এবং শ্রম আন্দোলনকে আরো গণতান্ত্রিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করা;
- ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী নির্বিশেষে উত্তরাধিকার, সম্পত্তি ও জমিতে সকল সন্তানের সম-অধিকার নিশ্চিত করা।
- অবৈতনিক সেবাকর্মে নারীর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

সেবা সংক্রান্ত:

- জনপরিসরে এবং কর্মক্ষেত্রে যাতায়াতে নারীর নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ, স্থানীয় সরকার এবং নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যকরী ভূমিকা নিশ্চিত করা।
- কর্মজীবী নারীদের যথাযথ সুবিধা প্রদান করা যেমন, নারীবান্ধব আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নারীর উপযোগী কৃষিযন্ত্র বাজারজাত করা; নারী উদ্যোক্তাদের ঋণের সুযোগ এবং সহজ অভিগম্যতা নিশ্চিত করা;
- নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ট্যাক্স রিবেট ও প্রণোদনার মাধ্যমে উৎসাহিত করা
- সরকার ও নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাতৃদুগ্ধ পান কেন্দ্র, শিশু দিবাযত্নকেন্দ্র, নিরাপদ যানবাহন ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা ও তৃণমূলের প্রতিটি পর্যায়ে কর্মজীবী নারীদের আবাসনের সু-ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ

১. বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যূনতম জাতীয় মজুরি নির্ধারণের লক্ষ্যে জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করা।
২. শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের পরিবারের পুষ্টিহীনতা দূর করার লক্ষ্যে প্রত্যেক শ্রমিক পরিবারের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা।
৩. সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অন্যথায় বেকার শ্রমিকদের বেকার ভাতার ব্যবস্থা করা।
৪. পরিবহন শ্রম সেক্টরে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নির্মূল করা।
৫. শ্রম অধিদপ্তরকে দুর্নীতি ও শ্রমিক হয়রানী মুক্ত করা।
৬. রাষ্ট্রের সকল নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
৭. শ্রমিকদের জন্য সরকারি হাসপাতালে প্যাথলজি টেস্টসহ সকল চিকিৎসা সম্পূর্ণ ফ্রি করা।

ইপসা

১. কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
২. কোনো দুর্ঘটনার পর তদন্ত কমিটি গঠনের সময় যাদের সমাজে এবং শ্রমিকদের মধ্যে সকলের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন মানুষদেরকে তদন্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৩. প্রত্যেকটি জেলা বা উপজেলায় শ্রমঘন এলাকায় একটি করে ট্রমা সেন্টার এবং বিশেষায়িত হাসপাতাল থাকতে হবে যেখানে বিশেষ ইকিউপমেন্ট ও প্রশিক্ষিত ডাক্তার থাকবেন যারা এ ধরনের চিকিৎসাসেবা দিতে পারবেন।
৪. অহেতুক শ্রমিক নির্যাতন, বিশেষ করে শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের ফলে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান করা হোক।
৫. অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে শ্রমিকদের আইনি অধিকার নিশ্চিতকরণে এলাকা ভিত্তিক সুশীল সমাজ, মালিক, শ্রমিক প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে এবং এক এক কমিটির মেয়াদ হবে একবছর, এর বেশি না।
৬. ট্রেড ইউনিয়নের রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি আইন করে নিষিদ্ধ করা উচিত।
৭. সরকারি ইনস্পেকটরদের ভূমিকা নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে যে অসন্তোষ বিরাজমান আছে তা আস্থার জায়গায় নিয়ে আসতে হবে।
৮. জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ইন্সপেক্টরদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে। তবে অবশ্যই তাদের নিয়োগ হতে হবে নিজ জেলা থেকে দূরবর্তী কোনো জেলায়।
৯. শ্রম আদালতকে মূল আদালতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১০. শিশুশ্রম নিরসনে প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের পাশাপাশি অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পের ক্ষেত্রেও নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে।
১১. শুটকি, এলুমিনিয়াম, ম্যাটাল বেজড ফ্যাক্টরি সাথে মেটাল বেজড ইনফরমাল সেক্টরগুলিতে মনিটরিং জোরদার করতে হবে।
১২. সকল ক্ষেত্র থেকে শিশুদের শিশুশ্রম নিরসনে সরকারি ভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।
১৩. ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরসনে শাস্তিস্বরূপ পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করতে হবে। এবং এই জরিমানার অর্থশিশুশ্রম নিরসনে কল্যাণ ফান্ড গঠনের মাধ্যমে সেই ফান্ডে জমা করতে হবে।
১৪. শ্রমঘন অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প যেসকল এলাকায় সবচেয়ে বেশি সেকল এলাকায় সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে
১৫. শিশুদের মধ্যে যারা ১৪- ১৮ বছর বয়সী কিশোর তাদেরকে যারা স্কুলে যেতে আগ্রহী নয় তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য আমরা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
১৬. সরকার মালিক সমাজ উন্নয়ন কর্মী মানবাধিকার কর্মী এসকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয় জোরদার করতে হবে।
১৭. সরকারি যে কমিটিগুলি আছে সেই কমিটিগুলির মিটিংগুলি নিয়মিতকরণ এবং এই মিটিংগুলিকে প্রাইওরিটির পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে।
১৮. সামাজিক ব্যবসায় প্রণোদনা ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে শ্রমিক অর্থোন্নতি করতে হবে।
১৯. সিকিউরিটি গার্ডদের অধিকার নিশ্চিতে শ্রম আইনে উল্লেখিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করতে হবে।
২০. জাহাজ ভাঙার শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা রক্ষার্থে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন নিরাপদে জাহাজ ভাঙার বিশেষায়িত প্রশিক্ষণগুলি দিতে হবে। আন্তর্জাতিক মানসম্মত কাজের সুষ্ঠু ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের শ্রমআইনের নীতিমালার আলোকে একটি কার্যকর কাঠামো দাঁড় করাতে হবে
২১. ইয়ার্ডগুলিতে সেসব সেইফটি অফিসার আছে তারা সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ সেন্টার থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে।
২২. শ্রমিক সুরক্ষায় ইয়ার্ডে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি যেমন: উইনঞ্চ মেশিনের ওয়্যার/ক্যাবল, ক্রেন, ক্রেন এর ওয়্যার, টাওয়ার ক্রেন, গ্যাস ডিটেকশন মিটারগুলিসহ প্রত্যেক সরঞ্জামের মান নিয়মিত সনামধন্য মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরীক্ষা করাতে হবে এবং বেস্ট প্রেকটিস্ড থার্ড পার্টি অডিট কর্তৃক নিয়মিত তদসংক্রান্ত সেইফ ওয়ার্কিং লোড ভেলিডেটি সনদ নিশ্চিত করতে হবে।
২৩. শিপ ইয়ার্ডগুলিতে সুযোগ্য সেইফটি অফিসার নিয়োগ করতে হবে। ম্যান এন্ট্রি ফর হট ওয়ার্ক এর জন্য ইয়ার্ডের সেইফটি অফিসাররাই দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে।
২৪. দেশীয় সকল নিয়মনীতি মেনে জাহাজ কাটার কাজ করা হচ্ছে কিনা তার জন্য জাহাজের টেংক বিভাজনের সকল পর্যায়ের ছবি এবং ভিডিও এর মাধ্যমে ডকুমেন্টেড করে রাখা উচিত যাতে পরিকল্পনা অনুযায়ী জাহাজ পুন:প্রক্রিয়া হচ্ছে কিনা তা যাচাই বা পর্যবেক্ষণ করা যায়।
২৫. দুর্ঘটনার কারণ উদঘাটনের লক্ষে সকল ইয়ার্ডকে সার্বক্ষণিক সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা যেতে পারে।

মমতা

১. গৃহ ভিত্তিক পোষাক শ্রমিকদের মালিকের অধীনে ছোট ছোট ফ্যাক্টরী বা ছোট ছোট রুমে বসে পোশাক তৈরির কাজ করতে হয়।
২. গৃহ ভিত্তিক পোষাক শ্রমিকদের জন্য কোনো নীতিমালা না থাকায় অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।
৩. অনেকেরই কোনো লিখিত নিয়োগপত্র নেই বা কোনো চুক্তিও নেই।

৪. আমাদের নর্ধারিত কোনো কাজের সময় বা কর্মঘণ্টা নাই।
৫. অতিরিক্ত কাজ করলে তার জন্য নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক পাওয়া যায় না।
৬. সুনির্দিষ্ট কোনো বেতন কাঠমোও নাই। যত টুকু কাজ করা হয় তার উপর ভিত্তি করে মালিক মজুরি/পারিশ্রমিক দেয়। বেতন পাওয়ার কোনো নির্ধারিত দিন তারিখও থাকে না।
৭. বিভিন্ন ছুটি-ছাটা থেকে বঞ্চিত।
৮. কাজ ছেড়ে দিলে বা কাজ থেকে বিতাড়িত হলে ফ্যাক্টরী থেকে কোনো সুযোগ-সুবিধা পাই না। সরকারিভাবে একটি গাইডলাইন থাকলে সুযোগ-সুবিধাসমূহ নিশ্চিত হবে। মলিকগণও আমাদের প্রতি আরো আন্তরিক হবে সুযোগ-সুবিধাসমূহ দেয়ার ক্ষেত্রে।
৯. আমাদের জন্য একটি সুন্দর কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা গেলে আমাদের কাজের গতিও অনেক বৃদ্ধি পাবে।
১০. আমাদের অনেক বোনেরা কাজে আসা যাওয়ার পথে বখাটেদের কর্তৃক নির্যাতনের শিকার হয়। প্রশাসনসহ সবাই যদি সচেতন থাকে তাহলে আমরা নির্ভয়ে কাজে যাওয়া-আসা করতে পারবো।

উত্তর চট্টলা উপকূলীয় জলদাশ কল্যাণ ফেডারেশন

১. ২০শে মে থেকে ২৩শে জুলাই মাছ ধরা থেকে বিরত থাকার জন্য বন্ধ ঘোষণা আছে। যাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য বন্ধ ঘোষণা, তাদের ক্ষতি হচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে। এই বন্ধ ঘোষণা করার জন্য আবেদন করছি ১লা মে থেকে ৩রা জুলাই পর্যন্ত।
২. দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে আর্থিক সাহায্য ও ক্ষতি হয়ে যাওয়া সরঞ্জামাদি দেওয়া।
৩. ভূমিহীনদের পুনর্বাসন করা।
৪. সরকারি ভাবে স্বল্প সুদের উপর ঋন দিয়ে স্বাবলম্বী করা এবং দাদন থেকে ও মহাজনের থেকে মুক্ত করা।
৫. পণ্যবাহী জাহাজ মাছ ধরার স্থানগুলির মধ্যে লাঙল ফেলে, ৫-৭ মাইল উঠা-নামা করে মাছ ধরার জাল নষ্ট করে। নির্ধারিত ভাবে একজায়গায় থামলে ক্ষতির পরিমাণ কম হবে।
৬. প্রতিটি মাছ ধরা ঘাটে মাছ নিয়ে উঠা নামার সুযোগ স্থাপন করা, বরফ কল নির্মাণ, একটি বাজার সেট নিমার্ন করা।
৭. দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ সবা ও ঐ স্থানে অভীজ্ঞ ভাক্তার রেখে জীবনমান উন্নয়ন করা।
৮. শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান করা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৯. সংগঠনগুলিকে রাষ্ট্রের আওতায় আনা।

কমিউনিটি সেন্টার ও ডেকোরেটার্স

১. মজুরি বৃদ্ধি ও যৌক্তিকীকরণ (জাতীয় ও আন্তজাতিক শ্রমমান অনুসারে, কমিউনিটি সেন্টার শ্রমিকদের প্রতি ডিউটিতে মজুরি ৪০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮০০ টাকা এবং ডেকোরেটার্স শ্রমিকদের মজুরি ৫০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১০০০ টাকা করা উচিত।
২. বিশেষ দিনগুলিতে অতিরিক্ত মজুরি প্রদান।
৩. কমিউনিটি সেন্টার সমূহ ক্রোকারিজ ভাঙ্গার জন্য শ্রমিকদের জরিমানা করা একটি অঘোষিত নিয়ম জারি আছে। এই জরিমানা নিয়ম বাতিল করা।
৪. রমজান মাসে সরকারি সহযোগিতা ও দুই ঈদে বোনাস প্রদান।
৫. উৎসবের দিনে কাজ বন্ধ রাখা।
৬. কর্মস্থলে দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সবেতন ছুটি ও ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
৭. অকারণে ছাঁটাই বন্ধ করা।
৮. আই আর আই এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

চট্টগ্রাম হালকা মোটরযান চালক-শ্রমিক ইউনিয়ন

১. সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর ধারা ১১ (২) ও ধারা ১০৫ বাতিলের সুপারিশ।
২. সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর ধারা ৩৭ (২) বাস্তবায়নের সুপারিশ।
৩. সকল সেক্টরের চালক শ্রমিকদের নিয়োগ পত্র ও পরিচয় পত্র প্রদানে বাধ্যতামূলক কল্পে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ।
৪. গাড়ি রিকুইজিশনে ২০১৯ সালে মহামান্য হাইকোর্টের দেওয়া রায় বাস্তবায়নের সুপারিশ।
৫. শ্রম আইন ও মানবতা বিরোধী আউটসোর্সিং আইন বন্ধের সুপারিশ।
৬. প্রতিটি সেক্টরে চালক শ্রমিকদের সরকারি নিয়মে রেশনিং প্রথা চালুর সুপারিশ।
৭. শ্রম আইন- ২০০৬ এর প্রয়োজনীয় কিছু ধারা সংশোধনের সুপারিশ।
(ক)- শ্রম বান্ধব শ্রম আইন প্রবর্তনের সুপারিশ।
(খ)- ২৪ (১) খ অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠনে মালিক ও শ্রমিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক প্রতিনিধির মধ্যে শ্রমিকদের পছন্দের প্রতিনিধি ফেডারেশন বা লিগ্যাল এইড নেতাদের সদস্য নেওয়ার বিধান অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ।
(গ)- ২৭ (১) ক অনুযায়ী শ্রমিকদের সেচ্ছায় ইস্তফা দিতে ৬০ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিন কার্যকর আইন প্রণয়নের সুপারিশ।
(ঘ)- শ্রম আইনের ২৩ ও ২৪ ধারা স্পষ্ট করে শ্রমিকদের বহিষ্কার, বরখাস্ত, অপরাধ, শাস্তি ও ন্যায্য ক্ষতিপূরন ও পাওনাদি আদায়ে স্পষ্ট আইন প্রণয়নের সুপারিশ।

চট্টগ্রাম মহানগর নির্মাণ শ্রমিকদল

১. শ্রম আইনের আওতায় নির্মাণ শ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
২. নির্মাণ শ্রমিকদের ডেটাবেইজ তৈরি করে তাদের জন্য আইডি কার্ড দিতে হবে।

৩. নির্মাণ শ্রমিকদের গ্রুপ বিমা চালু করতে হবে।
৪. নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে শ্রমিক শেড নির্মাণ করতে হবে।
৫. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল থেকে সাহায্য প্রাপ্তির পথ সুগম করা। প্রতি মাস অন্তর অন্তর মিটিং করে আবেদনসমূহ সমাধান করা।
৬. কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত, আহত ও আজীবন পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আইএলও কনভেনশন ১২১ মোতাবেক এক জীবনের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণের বিধান শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোনো ভাবেই শ্রমিকদের ৮,০০,০০০/-(আট লক্ষ) টাকা ও ১২,০০,০০০/- (বারো লক্ষ) টাকার কম ক্ষতিপূরণ যাতে না দিতে পারে সে ব্যাপারে সরকারকে প্রজ্ঞাপন জারী করতে হবে।
৭. নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. নির্মাণ শ্রমিকদের রেশনিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।
৯. কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, শ্রম আইনের ১৩ ও ১৪ অধ্যায় বাদে বাকী অধ্যায়গুলি প্রয়োগের দায়িত্বে রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে জনবলের অভাবে নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারছে না। তাই জনবল বাড়াতে হবে।
১০. কর্মক্ষেত্রে নির্মাণ শ্রমিকদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
১১. শ্রম আইন সংশোধনী ২০০৬ এর ৩২৩ ধারা মোতাবেক জাতীয় শিল্প-স্বাস্থ্য কাউন্সিলে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
১২. শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর বিধি ৭৫ নির্মাণ কাজে নিরাপত্তার বিধান মেনে চলার কথা উল্লেখ করলেও, নির্মাণ শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করার বিষয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিবরণ নেই। এটার সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে।
১৩. শ্রম আইন ২০০৬ এর স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও কল্যাণ সম্পর্কিত অধ্যায়গুলির (অধ্যায় ৫-৮) মূলত বাতিলকৃত কারখানা আইন ১৯৬৫ এর অনুলিপি ফলে এই বিধানগুলি কারখানার জন্য উপযোগী হলেও নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ এর জন্য অনুযোগী। তাই উপযুক্ত আইন ও বিধিমালা প্রয়োগ করতে হবে।

বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন-বিএলএফ

১. ইপিজেড সহ নতুন নতুন শিল্পাঞ্চল ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য শ্রম আইন স্বীকৃত ও ILO convention 87-98 অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের আইনি প্রক্রিয়া সহজ করার সুপারিশ।
ক) অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের শ্রম আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদানের সুপারিশ।
খ) প্রতিষ্ঠান পুঞ্জের অজুহাতে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে বাধা দূর করে সহজ নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ।
গ) শীপ ইয়ার্ড, মৎস্য, শুটকি, লবণসহ নতুন নতুন শিল্পাঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে সহজ নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ।
২. শ্রমিকদের সুবিধার্থে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্ব প্রক্রিয়ায় সকল বিভাগীয় শহরে হাসপাতাল চালুর সুপারিশ এবং জেলা শহরগুলিতে সদর হাসপাতালে শ্রমিক সেবা বুথ চালুর সুপারিশ।
৩. শ্রম আইন ও মানবতা বিরোধী আউটসোর্সিং আইন বন্ধের সুপারিশ।
ক) রেমিট্যান্স যোদ্ধা প্রবাসী শ্রমিক প্রবাস জীবন শেষ করার পর দেশে দক্ষতা অনুযায়ী কাজে নিয়োগদানে অগ্রাধিকার প্রদানের সুপারিশ,
খ) প্রবাসে মৃত্যু বরণকারী রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের লাশ সরকারি খরচে স্বজনদের নিকট পৌঁছে দেওয়া ও দাফন কাফনের ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ।
গ) রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের জন্য চিকিৎসা সেবা ও রেশনিং প্রথা (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে) চালুর সুপারিশ।
৪. সরকারি কর্মচারীদের জন্য ৫ বৎসর অন্তর অন্তর পে-স্কেল ঘোষণা কার্যকর করার সুপারিশ এবং বিলম্বিত সময় বা অন্তবর্তী সময়ের জন্য ৫০% মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের সুপারিশ।
৫. প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের জন্য সরকারি নিয়মে রেশনিং প্রথা চালুর সুপারিশ। রাস্তায় নয়- শ্রমিকদের সম্মানে রেশন সপে সনদ প্রাপ্ত ডিলারদের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য প্রদানের সুপারিশ।
৬. পোশাক শিল্পে বার্ষিক ৯% ইনক্রিমেন্ট আদায় শ্রমজীবী মানুষের জন্য এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক। এরপরেও গার্মেন্টস শ্রমিকদের চাকরির নিশ্চয়তা, কথিত সুপারভাইজারদের শ্রমিক সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্তকরণ, বিধি মোতাবেক বেসিক মজুরি নির্ধারণ ও ঘোষিত নিম্নতম মজুরি প্রদানে সঠিক তদারকির সুপারিশ।
৭. সকল সেক্টরের শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র প্রদানে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ।
৮. সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর ধারা ১১ (২) ও ৪৭ বাতিলের সুপারিশ।
৯. জাতীয় নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব দলগুলির মধ্যে কমপক্ষে ১০ শতাংশ শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়ার আইন প্রণয়নের সুপারিশ।
১০. শ্রম আইন-২০০৬ এর প্রয়োজনীয় কিছু ধারা সংশোধনের সুপারিশ।
ক) শ্রমবান্ধব শ্রম আইন প্রবর্তনের সুপারিশ,
খ) শ্রমিক সংজ্ঞায় কর্মজীবী শ্রমিকদের অন্তর্ভুক্তে স্পষ্টকরণ, শ্রমিক নন এই অজুহাতে শ্রমিক হয়রানি বন্ধে শ্রমিকের সংজ্ঞায় শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সমুন্নত রাখার সুপারিশ,
গ) অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের অজুহাতে শ্রমিকদের শ্রম আইন ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়ার ধারা পরিবর্তনের সুপারিশ।
ঘ) ২৪ (১) ঘ অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠনে মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সমান সংখ্যক প্রতিনিধির মধ্যে শ্রমিকদের পছন্দের প্রতিনিধি ফেডারেশন বা লিগ্যাল এইড নেতাদের সদস্য নেওয়ার বিধান অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ,
ঙ) ২৭ (১) ক অনুযায়ী শ্রমিকদের স্বেচ্ছায় ইস্তফা দিতে ৬০ দিনের পরিবর্তে ২১ দিন কার্যকর আইন প্রণয়নের সুপারিশ,
চ) শ্রম আইন ২৭ (৩) ক বাতিলের সুপারিশ,
ছ) শ্রম আইনের ২৩ ও ২৪ ধারা স্পষ্ট করে শ্রমিকদের বহিষ্কার, বরখাস্ত, অপরাধ, শাস্তি ও ন্যায্য ক্ষতিপূরণ ও পাওনাদি আদায়ে

স্পষ্ট আইন প্রণয়নের সুপারিশ।

বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন

১. সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য নতুন পে-স্কেল চালু করা। বিগত ১০ বছরে পে-স্কেল প্রদান করা হয়নি, যদিও প্রতি ৫ বছর অন্তর পে-স্কেল প্রদান বিধান ছিল। সর্বনিম্ন বেতন ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা) করার প্রস্তাব।
২. টাইম স্কেল (৮ বছর, ১২ বছর, ১৫ বছর) পুনরায় চালু করা, যা বিগত সরকার বাতিল করেছিল।
৩. অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের পেনশনের হার বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
৪. অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে যাদের বয়স ৬৫ বছর অতিক্রান্ত, তাদের জন্য প্রতি মাসে পেনশনের পাশাপাশি ১০,০০০ টাকা ফ্লুট অ্যালাউন্স বরাদ্দ করা।
৫. ব্লক পোস্টে থাকা সরকারি চাকরিজীবীদের পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
৬. চট্টগ্রাম বন্দরের শ্রমিকদের জন্য একটি স্বতন্ত্র পে-স্কেল চালু করা।
৭. নতুন শিল্প কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
৮. সরকারি ও বেসরকারি চাকরিজীবীদের জন্য জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি বিবেচনা করে হাউস রেন্ট অ্যালাউন্স এবং মেডিকেল অ্যালাউন্স বাড়ানো।
৯. শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনে বিনামূল্যে কাউন্সেলিং সেবা এবং কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিশ্চিতে মানসম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।
১০. মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির কারণে নিম্ন আয়ের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ভর্তুকি প্রদান এবং রেশনিং ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন।

ট্রেড ইউনিয়ন প্লাটফর্ম ফর মাইগ্রান্ট ওয়ার্কার্স

১. নিরাপদ অভিবাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে অভিবাসনের প্রতিটি ধাপ ডিজিটালাইজ করে পরিপূর্ণ "ইলেক্ট্রনিক মাইগ্রেশন সিস্টেম" চালু করে মধ্যস্বত্বভোগীদের (এজেন্ট) কার্যক্রম সীমিত করা।
২. বিদেশে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দ্বিপাক্ষিক শ্রম চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করে বিদেশে শ্রমিকদের বেতন, কাজের সময় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সুনির্দিষ্ট করা।
৩. নিয়োগকর্তা কর্তৃক চুক্তি লঙ্ঘন হলে, দ্রুত অভিযোগ সমাধানের জন্য বিদেশি দূতাবাস "লেবার উইং" কার্যক্রম জোরদার কর।
৪. অভিবাসী কর্মীদের জন্য দেশে ফেরার পরে পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ এবং বেকারত্ব ভাতা নিশ্চিত করতে একটি "সামাজিক সুরক্ষা তহবিল" গঠন।
৫. অভিবাসী কর্মী প্রেরনের আড়ালে মানব পাচার প্রতিরোধে বিমান বন্দর ও সীমান্তে কঠোর নজরদারি ও প্রচারকারীদের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করা।
৬. একটি কেন্দ্রীয় অভিবাসী তথ্য সংরক্ষণাগার (মাইগ্রেশান ইনফরমেশন সিস্টেম) তৈরি যা অভিবাসীদের বহির্গমণ, আগমণ, কর্মস্থান এবং সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করবে।
৭. অভিবাসী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার নিশ্চিত করা।
৮. আইএলও কনভেনশন ১৮৯ ও ১৯০ অনুযায়ী গৃহকর্মীদের জন্য আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে কাজের সময়, ছুট্ লিখিতচুক্তি ও হয়রানীমুক্ত কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা।

হোম-বেইজড ওয়ার্কার্স রাইটস নেটওয়ার্ক

প্রস্তাবিত গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকদের নীতিমালা "**খসড়া গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০২৩**" চূড়ান্তকরণ ও সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করার দাবি।

১. **গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক (Home-based Workers)-এর সংজ্ঞা:** যারা অর্থের বিনিময়ে নিজ গৃহে বা নিয়োগকারীর দ্বারা প্রদত্ত স্থানে কাজ করে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এরা ব্যক্তি বা সংস্থাগুলির মধ্যস্থতাকারির মাধ্যমে সাব-চুক্তিবদ্ধ হয়। এই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কাঁচামাল ও উৎপাদণ ব্যয়ের বেশির ভাগ অংশ বহন করে।
২. **গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকের ধরন (Catagory of Home Base Worker):**

- স্বনিয়োজিত গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক (Self Employed Home Bases worker);
- চুক্তি ভিত্তিক গৃহভিত্তক শ্রমিক (Contractual Home Base worker);
- ফুরন ভিত্তিক শ্রমিক (Pice Rate Worker);

৩. **নিবন্ধন:** শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন: গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ, দায়বদ্ধতায় আনা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য গৃহ শ্রমিকের নিবন্ধন করতে হবে।
৪. **চুক্তিপত্র ও নিয়োগপত্র:** গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকের নিয়োগের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র ও নিয়োগপত্র থাকতে হবে।
৫. **কর্মঘণ্টা, ছুটি, বিশ্রাম:** শ্রমিকের কর্মঘণ্টা, ছুটি, বিশ্রাম ও অন্যান্য সুবিধাদি ভোগ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শ্রমমান ও দেশীয় আইন অনুসরণ করতে হবে। গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকের সম্মতিতে ওভার টাইম কাজ করানো যাবে।
৬. **শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন:** আধুনিক প্রযুক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্ক ও টেকসই উন্নয়নে গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে এবং দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করতে হবে।
৭. **চিকিৎসা:** অসুস্থ অবস্থায় গৃহ ভিত্তিক শ্রমিককে কাজে বাধ্য করা যাবে না। তার প্রয়োজনীয় মানসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ব্যয়ভার সরকার ও চুক্তিস্বাক্ষরকারীকে বহন করতে হবে।

৮. **গর্ভকালীন ও প্রসূতিকালীন সুবিধা:** গর্ভকালীন ও প্রসূতিকালীন সুবিধা (সন্তান-সম্ভব্য গৃহ ভিত্তিক শ্রমিককে কাজ থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। চুক্তিস্বাক্ষরকারীকে গর্ভবর্তী নারী গৃহ ভিত্তিক শ্রমিককে তার গর্ভকালীন ও প্রসূতিকালীন সময়ে মোট ১৬ (প্রসবের পূর্বে ৬ সপ্তাহ এবং প্রসবের পরে ১০ সপ্তাহ) সপ্তাহ সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা, ভারি কাজ থেকে বিরত রাখা এবং বিশ্রামের সুযোগ প্রদান করতে হবে।

৯. **কর্ম পরিবেশ ও ক্ষতিপূরণ সুবিধা:** গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। চুক্তিস্বাক্ষরকারীর কাজ চলাকালীন অবস্থায় কোনো গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হলে যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং ক্ষতির ধরন অনুযায়ী প্রচলিত আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১০. **নির্যাতনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা:** গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকদের প্রতি কোনো প্রকার শারীরিক, মানসিক, মৌখিক ও অশালীন আচরন - নির্যাতন করা যাবে না। নির্যাতন করা হলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. **ব্যবসায়িক ক্ষতির দায় দায়িত্ব:** গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক দ্বারা সরবরাহকারী বা চুক্তিস্বাক্ষরকারী যদি কোনো ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হন তবে গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক উপযুক্ত প্রমাণ সাপেক্ষে এই ক্ষতিপূরণ দিবে।

১২. **শ্রমিকের পাওনাদি পরিশোধ দায়-দায়িত্ব:** চুক্তি ভিত্তিক ও ফুরন ভিত্তিক শ্রমিকের কাজের পারিশ্রমিক বা মজুরি পন্য সরবরাহের নগদ অর্থ সমেত সাথে সাথে পরিশোধ করতে হবে। সরবরাহকারী বা চুক্তিস্বাক্ষরকারী যদি চুক্তি ভঙ্গ করে তাহলে গৃহ ভিত্তিক শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।

১৩. **সামাজিক সুরক্ষা:** গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকের জীবন-জীবিকা নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে নানামুখী রাষ্ট্রীয় সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু করতে হবে।

১৪. **সংগঠিত হওয়ার অধিকার:** আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর মৌলিক কনভেনশন ৮৭ ও ১৮ অনুযায়ী শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার ও দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিতকরণ আইন প্রণয়ন এবং কনভেনশন -১৭৭ (হোম ওয়ার্কার্স পলিসি) দ্রুত অনুসমর্থন পূর্বক গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকের কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে হবে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কনভেনশন- ১৯০ দ্রুত অনুসমর্থন করে তার ভিত্তিতে আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

১৫. **পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ:** গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকের জন্য সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন করে নিয়োগকারী /সরবরাহকারী/ চুক্তিস্বাক্ষরকারীর প্রণিত নীতিমালা মানছে কি না তা নিয়মিত পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১৬. **আর্থিক সক্ষমতা ও বিপণন:** গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকের দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে ও জামানতবিহীন ঋণ সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজারজাতকরণ ও বাজার ব্যবস্থা সংক্রান্ত মৌলিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। জাতীয় ও আন্ত:র্জাতিক পণ্য মেলায় গৃহ ভিত্তিক শ্রমিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

১৭. **নীতিমালা বাস্তবায়ন ও নির্দিষ্ট সময় পর পর্যালোচনা:** এই নীতিমালাটি রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের পর প্রতি ৫ বছর অন্তর বাস্তবতার নিরীখে পুনর্মূল্যায়ন ও উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন

- **কৃষি ও অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।**
- **বৈশ্বিক মানদন্ডের সমমান সম্পন্ন অন্তরভুক্তিমূলক ও বৈষম্যমুক্ত শ্রম আইন চাই।**
- **'কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা ২০১৭'** সংশোধন করে আইনে রূপান্তর করা এবং শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করা।

প্রস্তাবিত 'কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ আইন'

১. কৃষি ফার্ম শ্রমিকের সংজ্ঞা:

কৃষি ফার্ম শ্রমিক বলিতে মূলত বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার অধীনস্থ গবেষণা খামার/বীজ উৎপাদন খামার, বীজ প্রক্রিয়াজাত কেন্দ্র, নার্সারি (ফলদ ও বনজ), হর্টিকালচার সেন্টার/উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, ফল, সবজি, অন্যান্য ফসল তথা কৃষি পণ্য উৎপাদন খামার, রেশম বীজাগার, গবাদি পশু পালন খামার, মৎস্য খামার, দুগ্ধ খামারসমূহে নিয়োজিত শ্রমিককে বুঝাইবে।

শ্রমিক ২ (দুই) ধরনের, যথা: স্থায়ী বা নিয়মিত শ্রমিক ও অনিয়মিত শ্রমিক। স্থায়ী শ্রমিক বলতে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) অনুযায়ী স্থায়ী কাজে নিয়োজিত শ্রমিককে বুঝাইবে। অনিয়মিত শ্রমিক বলিতে অস্থায়ী/সাময়িক/মৌসুমি ধরনের সাময়িক কাজের জন্য নিয়োজিত শ্রমিককে বুঝাইবে।

ক) স্থায়ী কাজের ক্ষেত্রে স্থায়ী (নিয়মিত) শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হবে; নিয়মিত পদে কাজ করার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ দেয়া যাইবে না।

খ) যে কাজ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ এবং বছরের ১৮০ দিন চলিবে এবং পরবর্তী বছরেও চলিবে এই কাজ স্থায়ী কাজ বলে বিবেচিত হইবে।

গ) শ্রমিকগণের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি বাংলাদেশ শ্রম আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান ৩ এর (১, ২, ৩, ৪) অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

ঘ) শ্রমিকদের শ্রেণিবিভাগ এবং শিক্ষানবিশীকাল বাংলাদেশ শ্রম আইনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান ৪ অনুযায়ী পরিচালিত হইবে।

২। অনিয়মিত শ্রমিক (অস্থায়ী/সাময়িক/মৌসুমি) শ্রমিক নিয়োগের শর্তাবলি:

ক) বাংলাদেশের নাগরিক হইতে হইবে;

খ) নিয়োগের সময় একজন অনিয়মিত শ্রমিকের বয়স ১৮ হইতে ৪৫ বৎসরের মধ্যে হইতে হইবে;

গ) কৃষি কাজে শারীরিক ও মানসিকভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে;

ঘ) নিয়োগের সময় শ্রমিকের বয়সের প্রমাণ স্বরূপ জাতীয় পরিচয়পত্র দাখিল করিতে হইবে।

ঙ) পঞ্চম শ্রেণি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।
চ) পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান প্রধানের নেতৃত্বে গঠিত ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অনুমোদনের মাধ্যমে অনিয়মিত শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে;
ছ) কোনোভাবেই নিয়মিত পদে (স্থায়ী) কাজ করার জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে কৃষি ফার্ম শ্রমিক নিয়োগ দেয়া যাইবে না।

৩। নিয়মিতকরণ:

অনিয়মিত (অস্থায়ী/সাময়িক/মৌসুমি) শ্রমিককে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে নিয়মিত করা যাইবে:

ক) প্রতিষ্ঠানে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কমপক্ষে কর্মে ২ (দুই) বৎসর নিয়োজিত থাকিতে হইবে। বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত ছাড়া পঞ্জিকা বৎসরে ১২০ দিন কাজ করিলে নিরবিচ্ছিন্ন ১ (এক) বৎসর কাজ বুঝাইবে।
খ) নিয়োমিতকরণের ক্ষেত্রে অনিয়মিত (অস্থায়ী/সাময়িক/মৌসুমি) শ্রমিকদের জ্যেষ্ঠ্যতা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।
খ) নিয়মিতকরণের তারিখ হইতে শ্রমিকের নিয়োগ সময়কাল গণনা শুরু হইবে।
ঘ) বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক কোনো বিধি বা কোনো নীতিমালা প্রণয়ন করা যাইবে না।

৪। নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র: কোনো নিয়োগকর্তা নিয়োগপত্র প্রদান না করিয়া কোনো শ্রমিককে নিয়োগ করিতে পারিবে না, এবং নিয়োজিত প্রত্যেক শ্রমিককে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করিতে হইবে।

৫। নিয়োগ কালের অবসান: কোনো শ্রমিকের বয়স ৬২ বৎসর পূর্ণ হইলে নিয়োগ কালের অবসান হইবে।

৬। শ্রমিকের সংখ্যা নির্ধারণ: হেক্টর প্রতি শ্রমিকের হার ৭ (সাত) জন হইবে।

৭। নিয়োগ অবসানে আর্থিক সুবিধা: প্রতি পূর্ণ বৎসর কার্যকালের জন্য ৬০ দিন হারে মজুরি পাওয়ার অধিকারী হইবেন। উল্লেখ্য, কোনো নিয়মিত শ্রমিক স্বেচ্ছায় অবসরে গমন করিলে একই নিয়মে আর্থিক সুবিধা পাইবেন।

৮। মজুরি ও মজুরি প্রদান পদ্ধতি:

(ক) নিম্ন লিখিত হারে স্থায়ী (নিয়মিত) শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি প্রদান করা হইবে:

চাকরির কাল	টাকা
নিয়মিতকরণের তারিখ হতে ৫ বৎসর	১০০০
৫ তদূর্ধ্ব বৎসর থেকে ১০ বৎসর	১১০০
১০ তদূর্ধ্ব বৎসর থেকে ১৫ বৎসর	১২০০
১৫ বৎসর থেকে তনূর্ধ্ব বৎসর	১৩০০

(খ) অনিয়মিত শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৯৫০ (নয়শত পঞ্চাশ) টাকা প্রদান করা হইবে।
(গ) প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর কৃষি ফার্ম শ্রমিকদের মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি আন্তঃমন্ত্রণালয় স্ট্যান্ডিং কমিটি ও বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন আলোচনার মাধ্যমে পুনর্নির্ধারণ করবে।
(ঘ) নিয়মিত/অনিয়মিত (অস্থায়ী/সাময়িক/মৌসুমি) শ্রমিকদের মজুরি শ্রমিকের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে। কোনোক্রমেই নগদে মজুরি প্রদান করা যাইবে না।

৯। দৈনিক কাজের সময়কাল:

(ক) একজন শ্রমিকের দৈনিক কর্মঘণ্টা ৮ ঘণ্টা হইবে। অধিককাল কর্মের জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ১০৮ এর বিধান দ্বারা পরিচালিত হবে।
(খ) জোরপূর্বক কোনো শ্রমিককে দিয়ে অধিক সময় কাজ করানো যাইবে না।

১০। ছুটি: প্রত্যেক নিয়মিত শ্রমিক নিম্নবর্ণিত ছুটি পাইবেন

ক) নৈমিত্তিক ছুটি: প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরে ১০ (দশ) দিন।
খ) উৎসব ছুটি: প্রত্যেক পঞ্জিকা বৎসরে ১৭ (সতের) দিন।
গ) প্রসূতি ছুটি: একজন নিয়মিত এবং অনিয়মিত নারী শ্রমিক প্রসবকালীন সময়ে ০৬ (ছয়) মাস স্ববেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি পাইবেন।

এই সুবিধা কোনো নারী শ্রমিক কর্মকালীন সময়ে ০২ (দুই) বারের বেশি পাইবেন না।

ঘ) সাপ্তাহিক ছুটি: একজন শ্রমিক প্রতি সপ্তাহে ১ (এক) দিন সাপ্তাহিক ছুটি পাইবেন। তবে সকল শ্রমিককে একসাথে একই দিন ছুটি প্রধান করা যাইবেনা, কর্তৃপক্ষ কর্মসূচিতে উল্লিখিত মতে পালাক্রমে প্রতি শ্রমিককে সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করিবেন।

১১। উৎসব বোনাস: প্রত্যেক নিয়মিত শ্রমিক ৩০ দিনের মজুরির সমপরিমাণ অর্থ বছরে ২ (দুই) টি এবং প্রত্যেক অনিয়মিত শ্রমিক বছরে ১২০ দিন একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকা সাপেক্ষে বছরে ৩০ দিনের মজুরির সমপরিমাণ অর্থবছরে ০১টি করিয়া উৎসব বোনাস পাইবেন।

(খ) প্রত্যেক শ্রমিক ৩০ দিনের মজুরির অর্ধেক পরিমাণ নববর্ষ ভাতা পাইবেন।
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কর্মরত শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০% পাহাড়ি ভাতা প্রদান করা হইবে।

১২। চিকিৎসা ও আর্থিক সুবিধা: কৃষি খামারে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক আহত হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। শর্ত থাকে যে, কোনো শ্রমিক কার্যরত অবস্থায় আহত বা ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) অনুযায়ী উপযুক্ত চিকিৎসা ও আর্থিক সুবিধা পাইবেন।

১৩। বাধ্যতামূলক গ্রুপ বিমা চালুকরণ:

কৃষি ফার্ম শ্রমিকগণ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) অনুযায়ী বাধ্যতামূলক গ্রুপ বিমা সুবিধা পাইবেন।

১৪। কৃষি ফার্ম শ্রমিক ভবিষ্য তহবিল:

(ক) কৃষি ফার্ম শ্রমিক ভবিষ্য তহবিল নামে একটি তহবিল স্থাপিত হবে।

(খ) কৃষি ফার্ম শ্রমিক ভবিষ্য তহবিল পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর সংশ্লিষ্ট বিধান ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী ভবিষ্য তহবিল ট্রাস্ট্রি বোর্ড গঠন করা হইবে।

১৫। অসদাচরণ ও দণ্ড-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শাস্তি: নিম্নবর্ণিত কাজ অসদাচরণ বলে বিবেচিত হইবে:

ক) একাকী বা সংঘবদ্ধভাবে কোনো কর্মকর্তার আইনানুগ বা যুক্তি সংগত আদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে পালন না করা বা অমান্যতা করা;
খ) নিয়োগকারীর খামার সংক্রান্ত ব্যাপারে চৌর্য, প্রতারণা বা অসাধুতা;
গ) নিয়োগকারীর অধীনে নিজের বা অন্য কোনো শ্রমিক এর নিয়োগের ব্যাপারে ঘুষ বা অনৈতিক কোনো পারিতোষিক গ্রহণ/প্রদান,
ঘ) ছুটি ব্যতিরেকে অভ্যাসগত অনুপস্থিতি বা ছুটি ব্যতিরেকে ৭ (সাত) দিনের অধিক অনুপস্থিতি;
ঙ) অভ্যাসগত বিলম্বে উপস্থিতি;
চ) কৃষি খামারে প্রযোজ্য যে কোনো আইন যা নিয়ম বা বিধান ভঙ্গ করা;
ছ) কৃষি খামারে উচ্ছৃঙ্খলতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অগ্নি সংযোগ বা ভাংচুর;
জ) কর্তব্য কাজ না করার অভ্যাস বা কাজে অবহেলা;
ঝ) কৃষি খামার অফিসের সম্পদ/নথি পত্রের ক্ষতি করা, নষ্ট করা বা বিকৃত করা;
ঞ) রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজ করা।

১৬। শাস্তিদানের পদ্ধতি: শাস্তিদানের পদ্ধতি বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ (অদ্যাবধি সংশোধিত) এর সংশ্লিষ্ট বিধান ২৩, ২৪ ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ (অদ্যাবধি সংশোধিত) বিধি ২৯ অনুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

১৭। সাময়িক বরখাস্তকালীন প্রাপ্য: কর্ম বিরতিতে থাকাকালীন হলে দৈনিক মজুরির এক অর্ধেক প্রাপ্য হবেন।

১৮। আপীল: ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে আপীল করিতে হইবে।

মজুরি ভিত্তিক অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের কৃষি শ্রমিকদের আইনি স্বীকৃতি

(ক) বাংলাদেশের সংবিধান এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃত আইন অনুযায়ী কৃষি শ্রমিকদের আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
(খ) ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রিকরণের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/কাউন্সিলয়/মেয়র কর্তৃক কৃষি শ্রমিক হিসাবে প্রদানকৃত প্রত্যয়ন পরিচয়পত্র হিসাবে বিবেচিত হবে।

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা:

কৃষি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে

১. কৃষিতে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক আইএলও কনভেনশন ১৮৪ অনুসমর্থন করা এবং আইএলও সুপারিশমালা ১৯২ বাস্তবায়ন করা।
২. ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জামাদি ও কৃষিকর্ম উপকরণ বিনামুল্যে কৃষি শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা।
৩. উচু মাত্রার বিষাক্ত রাসায়নিক কীটনাশক আমদানি ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।
৪. কীটনাশকের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৫. নিয়োগকর্তারা নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করতে তাদের বাধ্যবাধকতা পূরণ করছে কি না এজন্য ত্রিপক্ষীয় তদারকি কমিটি গঠন করা।
৬. নিয়োগকর্তাদের আইএলও কনভেনশন ১৫৫ প্রতিপালন আইন প্রণয়ন করা।
৭. আইন ভঙ্গকারী নিয়োগকর্তাদের বিচার এবং জরিমানার করা।
৮. নিহত ও আহত তথা ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান তৈরি করা।

জলবায়ু ন্যায্যতা, ন্যায্য রূপান্তর ও সামাজিক নিরাপত্তা:

১ কৃষি শ্রমিকদের রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করা।
২. কৃষি শ্রমিকদের চিকিৎসা ভাতা এবং সন্তানদের শিক্ষা ভাতা চালু করা।
৩. মজুরি ভিত্তিক কৃষি শ্রমিকদের জন্য ১০০ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প চালু করা।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষি শ্রমিকদের জন্য তহবিল গঠন করা।
৫. কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি এবং ডিজিটালাইজেশনের বিষয় শ্রমিকদের প্রক্ষিণ দেওয়া এবং যুব ও কৃষি শ্রমিকদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ দেওয়া।

বৈশ্বিক মানদন্ডের সমমান সমম্পন্ন অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যমুক্ত শ্রম আইন

(ক) ২০১৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধীকার কমিশন কর্তৃক গৃহীত United Nations Declaration on the Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas এর বাস্তবায়ন করা।
(খ) বৈশ্বিক মানদন্ডের সমমান সমম্পন্ন শ্রম আইন তৈরি করা অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) ৫টি মৌলিক কনভেনশনসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ কনভেনশন ও মানবাধিকার সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা, OECD নির্দেশিকা, জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের সাথে সামজস্যপূর্ণ অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যমুক্ত শ্রম আইন তৈরি এবং এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

সড়ক পরিবহন মালিক-শ্রমিক সংগঠন

১. সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮ এর অসঙ্গতিপূর্ণ ধারাগুলি সংশোধনের জন্য মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সাথে সভা করে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আইন মন্ত্রী ও রেলমন্ত্রী মহোদয় যে সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছে তা অবিলম্বে পাশ করা।
২. ঢাকা বাহিরে টার্মিনাল নির্মাণ না করা পর্যন্ত দূরপাল্লার কোনো গাড়ীর কাউন্টার ঢাকা শহর থেকে না সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. তদন্ত ছাড়া ৩০২ এবং ১০৫ ধারায় মামলা রুজু করা যাবে না। স্পর্শকাতর দুর্ঘটনাগুলি তদন্তের জন্য বুয়েট, পুলিশ এবং মালিক-শ্রমিক নেতৃবৃন্দের তদন্ত কমিটি গঠন করা।

৪. পণ্য পরিবহনের ভাড়া টনপ্রতি কিলোমিটারের ভিত্তিতে নির্ধারণ ও স্কেলের অনিয়ম বন্ধ করে সারাদেশে এক্সেল লোডের মেশিন চালু করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫. চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে ডোপ টেষ্টের বিদ্যমান ফি কমিয়ে ৫০০ টাকা করা।
৬. সড়ক পরিবহন বিধিমালা-২০২২ এ নতুন করে আরোপিত মোটরযানের পরিসেবার বিভিন্ন ফি সংশোধন করা।
৭. ঢাকা শহরে 'বাস রুট রেশনালাইজেশন' এর নামে বিভিন্ন রুটের মালিকদের গাড়ী চলাচলে বাধা না দেওয়া এবং ঢাকা শহর ও পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চলাচলকারী সকল বাসের রুট পারমিট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৮. মহাসড়কের পাশে সকল জেলায় এবং হাইওয়েতে ট্রাকের শ্রমিকদের জন্য বিশ্রামগার ও সকল সুযোগ সুবিধাসহ ট্রাক টার্মিনাল দ্রুত নির্মাণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৯. সকল বাস টার্মিনাল ও ট্রাক টার্মিনালে আইন অনুযায়ী টার্মিনাল অথোরিটি গঠন করা।
১০. বিগত সকল সরকারের আমলে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ফুলবাড়িয়া স্টপওভার বাস টার্মিনাল নির্মানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১১. সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চালক, শ্রমিক এবং পথচারিদের সচেতন করার নিমিত্তে একদিনের পরিবর্তে ৩ (তিন) দিন সড়ক নিরাপত্তা দিবস ঘোষণা ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন

১. (ক) চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য ডোপ টেস্ট আবশ্যকীয় জেলা পর্যায়ে এবং ৯০০ (নয়শত) টাকার পরিবর্তে ৩০০ (তিনশত) টাকা করার ব্যবস্থা করতে হবে।
(খ) বিআরটিএ-তে জমাকৃত নবায়ন ও নতুন ড্রাইভিং লাইসেন্সগুলি দ্রুত সরবরাহ করতে হবে।
২. (ক) নিয়োগপত্র নিশ্চিত করার জন্য গাড়ীর কাগজপত্র চেক করার সময় নিয়োগপত্র চেক করতে হবে। নিয়োগপত্র না থাকলে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
(খ) ট্রাক বাস টার্মিনাল ব্যতীত রাস্তায় হতে যত্রতত্র জায়গা থেকে কর্পোরেশন, পৌর সভার সন্ত্রাসী কায়দায় সিটি টোল আদায় বন্ধ করতে হবে।
৩. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ সংশোধনের জন্য শ্রমিক ও মালিক নেতৃবৃন্দের সাথে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, আইন মন্ত্রী ও রেলপথ মন্ত্রীর সাথে বৈঠকান্তে প্রস্তাবিত সংশোধনী অবিলম্বে পাশ করতে হবে।
৪. দেশের বিভিন্ন স্থানে পণ্য পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের পরিচালনা ব্যয়/সার্ভিস চার্জ জেলার এক স্থানে সংগ্রহ করার সুযোগ দিতে হবে।
৫. পণ্য পরিবহনের ভাড়া টনপ্রতি কিলোমিটারের ভিত্তিতে নির্ধারণ এবং ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির কমিশন সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করতে হবে।
৬. সড়ক পরিবহনের উপদেষ্টা পরিষদ ও জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা নিয়মিত করতে হবে।
৭. আপনার ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়কের পাশে সকল সুযোগ সুবিধাসহ ট্রাক টার্মিনাল প্রতিষ্ঠার কাজ দ্রুত করতে হবে।
৮. সড়ক পরিবহন সেক্টরে রেজিস্ট্রিকৃত সড়ক পরিবহন শ্রমিক সংগঠন সমূহকে শ্রম আইন অনুযায়ী পরিচালনার জন্য বাধ্য করতে হবে।
৯. সড়ক নিরাপত্তা দিবস শুধু ২২ অক্টোবর নয়। ৩১/০৭/২০১০ তারিখ সড়ক দুর্ঘটনায় সচিব ছিদ্দিকুর রহমান ও সচিব রাজিয়া বেগম এর মৃত্যুর দিন অথবা ১১/০৭/২০১১ তারিখে চট্টগ্রামের মিরসরাই থেকে ফিরে আসার পথে ছাত্রদের বহনকারি ট্রাক উল্টে ৪৫ জন ছাত্র নিহত হওয়ার দিন অথবা বাংলাদেশের প্রথিতদশা বাক্তি তারেক মাসুদ ও মিশুক মনিরসহ ৫জন নিহত হওয়ার দিনকেও সড়ক নিরাপত্তা দিবস ঘোষণা করতে হবে।
১০. (ক) সকল ট্রাক ও বাস টার্মিনালে আইন অনুযায়ী টার্মিনাল অথরিটি গঠন করতে হবে।
(খ) ঢাকা শহরে ষ্ট্যান্ড বা টার্মিনাল ছাড়া নো পার্কিং মামলা দেয়া যাবে না।
১১. সকল সরকারের আমলে চুক্তি অনুযায়ী ফুলবাড়ীয় স্টপ ওভার বাস টার্মিনাল চুক্তি বাস্তবায়র করতে হবে।
১২. তদন্ত ছাড়া ৩০২ ধারায় মামলা দেয়া যাবে না। বুয়েট-পুলিশ মালিক শ্রমিক সমন্বয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করতেহবে।
১৩. গাজীপুর জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন রেজি নং ঢাকা-৫৬৭ এর সদস্য মোঃ নাইম ও ও খোকন এর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা ২৬/২৫৫ প্রত্যাহার।

ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন নারী চালক শ্রমিক ইউনিয়ন (প্রস্তাবিত)

- বিভিন্ন সেক্টরে কর্মরত নারী শ্রমিক/কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রদানের নিমিত্তে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন করা ।

জালালাবাদ গ্যাস ট্রান্সমিশন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম লিমিটেড (জেজিটিডিসিএল)

- ঠিকাদার ব্যতীত আউটসোর্সিং ও দৈনিক মজুরি ভিত্তিক কর্মচারীদের অত্র কোম্পানির স্ব স্ব পদগুলিতে দ্রুত আউটসোর্সিং ও দৈনিক মজুরি ভিত্তিক সকল কর্মচারীগণকে বহাল রেখে বয়স শিথিল করে চাকরি স্থায়ী করা।

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ এর আওতাধীন কর্মরত আউটসোর্সিং সকল কর্মচারীগণ

১. ইনক্রিমেন্ট: স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের ব্যবস্থা করা।
২. বেতন বৈষম্য দূরীকরণ: একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একই পদের স্থায়ী ও আউটসোর্সিং-এর মধ্যে বেতন বৈষম্য দূর করা।

৩. উৎসব ভাতা: বর্তমান নীতিমালা অনুযায়ী মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বছরের দুইটি ঈদ, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উৎসব এবং বাংলা নববর্ষ বৈশাখ উপলক্ষ্যে ভাতা প্রদান করা।
৪. অধিকাল ভাতা: "বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬"-এর নবম অধ্যায়ের "কর্মঘণ্টা ও ছুটি" এর ১০৮ নাম্বার ধারা অনুসারে অধিকাল কর্মের জন্য অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা।
৫. ছুটি: স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় মাতৃত্বকালীন ছুটি, বিনোদন ছুটি মঞ্জুর করা
৬. চাকরি হতে অব্যাহতি: বিনা কারণে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা যাবে না।

ঢাকা ওয়াসা আউটসোর্সিং এ নিয়োজিত কর্মচারীবৃন্দ

- ঢাকা ওয়াসায় আউটসোর্সিং বাতিল করে কর্মরত কর্মচারীদের স্ব স্ব পদে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা এবং বয়স শিথিল করে চাকরি স্থায়ী করা।

ডক জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল

১. বন্দর শ্রম শাখার অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের বুকিং পরিচালনা এবং মজুরি পরিশোধের জন্য মজুরি বোর্ড গঠন করা।
২. আহত, নিহত শ্রমিকদের জন্য বর্তমান ক্ষতিপূরণ আইন সংশোধন করে যুগোপযোগী করা।
৩. কাজের উপর নিরাপদ কর্মস্থলও দুর্ঘটনায় দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা এবং ঝুঁকি ভাতার প্রচলন করা।
৪. শ্রম আইনের ৪২ নং ধারার অধীনে সংশোধিত ১৮৫ (ক) ধারা বাতিল করা।
৫. বিভিন্ন সেক্টরে শ্রম আইনের আলোকে চুক্তিকৃত দাবিগুলি বাস্তবায়নের জন্য শ্রম আইনের সংশোধন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং চুক্তি বাস্তবায়ন না করলে শাস্তির ব্যবস্থা রাখা।
৬. বন্দরে কর্মরত ডক শ্রমিক, মার্চেন্ট শ্রমিক, স্টিভিডোরিং স্টাফদের মজুরি অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড বিষয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ প্রদান করা।
৭. চুক্তি মোতাবেক প্রতিটি বিভাগের স্টাফ নিয়োগ নিশ্চিত করা।
৮. বন্দরের কাজ দুর্ঘটনা হরহামেশাই ঘটে বিধায় কম খরচে শ্রমিকদের হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ প্রদান করা।
৯. শ্রম আইন পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে বাঁধা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম

১. বন্দর সম্পর্কিত শ্রম আইনের ধারা ১৮৫ (ক) বাতিল পূর্বক আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
২. বন্দরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দিতে হবে।
৩. বন্দরসহ সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং ও চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করতে হবে।
৪. বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি বোনাস, স্ব-বেতনে ছুটি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সহ সকল আইনানুগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
৫. ২৫/১০/২০১০ ইং সালের আন্তঃমন্ত্রণালয়ের অনুকূলে সমঝোতা স্মারক (MOL) চুক্তি মোতাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের বাই রোটেশন বুকিং এর ব্যবস্থা করা।

ডক বন্দর শ্রমিক কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ

টার্মিনাল-এন.সি.টি, সি.সি.টি ও পি.সি.টি চট্টগ্রাম বন্দর ল্যাসিং অ্যান ল্যাসিং শ্রমিকদের দাবিসমূহ

১. ল্যাসিং অ্যান ল্যাসিং শ্রমিককে বন্দরের অধীনে পরিচালিত করতে হবে। ল্যাসিং শ্রমিক আর্ন্তজাতিক ভাবে ১নং ক্যাটাগরীতে স্বীকৃতি প্রাপ্ত। তাই ল্যাসিং শ্রমিককে বন্দরের নিজস্ব পরিচালনায় রাখাতে হবে।
২. কর্মরত শ্রমিকদেরকে শ্রমশাখায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। MIU চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। যাচাই-বাছাইকৃত শ্রমিককে অগ্রধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ করতে হবে।
৩. গ্রারেন্টি ক্রেনওয়েজ হুকপ্রতি ৯ জন করে দিতে হবে, অফ, লিভ, কোম্পানির থাকবে।
৪. প্রতি ঢুকে ১ জন করে ল্যাসিং ইনচার্জ দিতে হবে।
৫. মোবাইল হারবার ক্রেনে ১০ করে দিতে হবে।
৬. ইউনিফর্ম/ শীতকালীন পোশাক / বর্ষাকালীন রেইন কোট/ সেপ্টি সু/ হেলমেট/ সেপ্টি গিয়ার দিতে হবে।
৭. ৮ ঘণ্টায় ৩৫,০০০/- টাকা বেতন দিতে হবে।
৮. বেতনের শতভাগ সমপরিমাণ দুটি বোনাস দিতে হবে।
৯. শ্রমিকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. শ্রমিক অব্যাহতি নিলে ১৫ দিন উর্ধে ১ মাসের মধ্যে শ্রম শাখার টাকা উত্তোলন করার ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. EL/BL/SL সহ বার্ষিক জাতীয় দিবসের ছুটি দিতে হবে।
১২. অসুস্থতা থেকে আসার পর চাকরিতে যোগদানের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।
১৩. মাস শেষে প্রেজেন্ট বোনাস দিতে হবে।
১৪. বছর শেষে ছুটি জমা থাকলে ছুটির টাকা দিতে হবে।
১৫. কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করলে (২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা দিতে হবে।
১৬. কর্মরত শ্রমিক মৃতু বরণ করলে তার দাফন কাফনের জন্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা দিতে হবে।
১৭. ওভার হাইট কেন্টইনার ও চেইন হুক ব্যবহার হলে প্রথম কন্টেইনারে ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ) টাকা দিতে হবে।
১৮. লাঞ্চ আওয়ারের (লংথ্রো) সময়ে কাজ চললে জনপ্রতি ৪০০/- (চারশত) টাকা দিতে হবে।

১৯. ঝুঁকি ভাতা দিতে হবে।
২০. শ্রমিকদেরকে ইন্সুরেন্স করে দিতে হবে।
২১. বন্দরের তদন্ত ছাড়া কোনো শ্রমিকের গেইট পাস ব্লক করতে পারবে না।
২২. এক হুক থেকে অন্য হুকে এক বারের বেশি শিপ্টিং করলে জন প্রতি ৩০০/- (তিনশত) টাকা দিতে হবে।
২৩. এক জাহাজ থেকে কাজ করে অন্য জাহাজে কাজ করালে দ্বিগুন হাজিরা দিতে হবে।

জি.সি.বি চট্টগ্রাম বন্দর ল্যাসিং অ্যান ল্যাসিং

১. ল্যাসিং অ্যান ল্যাসিং শ্রমিকদেরকে বন্দরের অধীনে পরিচলিত করতে হবে। বন্দরের শ্রমিক নেতারা বহিঃবিশ্ব ভ্রমন করে এসে বলেছিলো ল্যাসিং শ্রমিক ১নং ক্যাটাগরী হয়ে বন্দরের নিজস্থ পরিচালনায় থাকবে এবং কন্টেইনার বার্থে ল্যাসিং অ্যানল্যসিং কোনো ক্যাটাগরীর শ্রমিকের অস্তিত্ব নাই।
২. কর্মরত শ্রমিকদেরকে শ্রম শাখায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং MIU চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে। জি.সি.বি তে নাস্তার ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. ইউনিফর্ম / শীতকালীন পোশাক / বর্ষাকালীন রেইন কোট/ সেন্টি সু/ হেলমেট/ সেপ্টি গিয়ার দিতে হবে।
৪. প্রোডাকশনে প্রতি কন্টেইনারে ১৫০/- টাকা মজুরি দিতে হবে।
৫. মাসিক প্রোডাকশনে যাহা বেতন হয় তার সম পরিমাণ বোনাস দিতে হবে।
৬. শ্রমিকদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. শ্রমিক অব্যাহতি নিলে ১৫ দিন উর্ধ্বে ১ মাসের মধ্যে শ্রম শাখার টাকা উত্তোলন করার ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মৃত্যু বরণ করলে (২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা দিতে হবে।
৯. কর্মরত শ্রমিক মৃত্যু বরণ করলে তার দাফন কাফনের জন্য ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা দিতে হবে।
১০. ওভার হাইট কন্টেইনার ও চেইন হুক ব্যবহার হলে প্রথম কন্টেইনারে ৪৫০/- (চারশত পঞ্চাশ) টাকা এবং পরের কন্টেইনারে ৩০০/- টাকা করে দিতে হবে।
১১. লাঞ্চ আওয়ারের (লংথ্রো) সময়ে কাজ চললে জনপ্রতি ৪০০/- (চারশত) টাকা দিতে হবে।
১২. ঝুঁকি ভাতা দিতে হবে এবং শ্রমিকদেরকে ইন্সুরেন্স করে দিতে হবে।
১৩. বন্দরের তদন্ত ছাড়া কোনো শ্রমিকের গেইট পাস ব্লক করতে পারবে না।
১৪. কর্মরত অবস্থায় অসুস্থ অথবা এক্সিডেন্ট হলে দ্রুত চিকিৎসা ও চিকিৎসা চলাকালীন চিকিৎসা খরচ ও বেতন দিতে হবে।

বাংলাদেশ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালক কল্যাণ সমিতি

১. ৪৫৭৮টি ইউনিয়ন পরিষদের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে পরিচালিত চুক্তিপত্র দ্বারা আবদ্ধিত জবরদস্তিমূলক নিষিদ্ধ শ্রম (যা ১৯৭২ সালের ৩৪ (১) অনুযায়ী নিষিদ্ধ শ্রম নামে পরিচিত) বাতিল করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ২৪ নভেম্বর ২০১০খ্রি: তারিখের ০৫.১৬৬,০২২,০০,০০,০৪৪.১৯৮৮-১৩৬৫ (২৫০) নম্বর পরিপত্র মোতাবেক আমাদের রাজস্বখাতে সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
২. সরকারি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার পার্সোনাল নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ অনুসারে 'ডাটা এন্ট্রি অপারেটর' (The Computer Personnel Government organization requirement roles অনুযায়ী) পদে নিয়োগ করতে হবে।
৩. নিষিদ্ধ শ্রম অবস্থায় অনেকেই চেয়ারম্যান, মেম্বার দ্বারা বিতাড়িত হয়েছে, বর্তমান কর্মরতদের পাশাপাশি তাদের কে পুনর্বহাল করতে হবে।

মেঘনা পেট্রোলিয়াম এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন

১. শ্রমিক-কর্মচারীগণকে সুষ্ঠু চিকিৎসার নিমিত্তে ফ্রি মেডিক্যাল কার্ড প্রদান করা।
২. কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদে শ্রমিক প্রতিনিধি অর্ন্তভূক্ত করা।
৩. লভ্যাংশের ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ০৭% লভ্যাংশ উন্নীত করা।
৪. শ্রমিক নেতৃত্ব বিকশিত করার জন্য লেজুড়বৃত্তি নীতি বন্ধ করে জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত আসনে ন্যূনতম ১০% শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়নের ভিত্তিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।
৫. বেতন কাঠামোতে ১০% শিক্ষা ভাতা নির্ধারণ করা।
৬. ৯৯৯ ও ৩৩৩ এর মত শিল্প পুলিশ কর্তৃক আলাদা শ্রমিক সহায়তা নম্বর অন্তর্ভুক্ত/ নির্ধারণ করা।
৭. শ্রমিকরা নির্ভয়ে বিচার প্রার্থনা বা যে কোনো বিরোধ দ্রুত নিরসনের জন্য শ্রম অর্বিটর কমিশন গঠন করা।
৮. অফিসার/কর্মকর্তা নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মচারীদের অফিসার করার ক্ষেত্রে ১০% কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্য থেকে নেওয়া।
৯. কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের জঠিল রোগীদের উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাত্রায় সহজতর এবং দ্রুত করার নিমিত্তে বহির্গমন অনুমতি স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদন দান করা।
১০. কর্মস্থলে আহত শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ব্যয় স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবসরকালীন সময় পর্যন্ত অব্যাহত রাখা।
১১. শ্রমিকদের যে কোনো অভিযোগ তদন্ত বা বিচার শেষে নির্দোষ প্রমাণিত হলে, তদন্ত বা বিচারকালীন সময়ে তার শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে যে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা পুষিয়ে দেয়ার জন্য একটি ইনক্রিমেন্ট প্রদান করার প্রস্তাব করছি। উল্লেখ্য, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ২ মাসের জন্য সাসপেন্ড ও অর্ধেক বেতন দেয়ার বিধান প্রচলিত রাখার কারণে এমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
১২. ওভার টাইমের ট্যাক্স রেয়াত দেওয়া।

সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল (সিএমএইচ) ঢাকা আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ

১. আউটসোর্সিং কোম্পানি ঠিকাদার ২০১৮ সালের নীতিমালা পরিবর্তন করে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মচারীদের বয়স শিথিল করে চাকরি স্থায়ীকরণ বা জাতীয়করণ করা অথবা বিকল্পভাবে চাকরি স্থায়ীত্ব করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২. প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে বেতনের সাথে ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা এবং মাসের প্রথম ০৩ কর্ম দিবসের মধ্যে বেতন প্রদান করা।
৩. আমরা সিএমএইচ ঢাকায় সার্বক্ষনিক চিকিৎসা সেবা কার্যক্রমের সাথে নিয়োজিত অথচ আমরা অসুস্থ হলে অত্র প্রতিষ্ঠানে কোনো চিকিৎসা পাই না, যা অত্যান্ত বেদনাদায়ক। আমরা অসুস্থ হলে অত্র প্রতিষ্ঠানের যাতে চিকিৎসা সহ ঔষধ পত্তদি পেতে পারি তার বিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৪. বিমা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড এর ব্যবস্থা করা।
৫. সার্ভিস রুলের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান।
৬. বাৎসরিক ছুটি, নৈতিমিত্তিক ছুটি নিশ্চিতকরণ এবং মাতৃত্বকালীন ছুটি ০৬ মাস করা।
৭. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা সহ সকল উৎসব ভাতা প্রদান করা।
৮. শ্রমিক আইন অনুযায়ী ০৮ ঘণ্টার অনধিক কাজ না করানো।

বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর আউটসোর্সিং কর্মচারী, বাবুর্চি ও পরিচ্ছন্নতাকর্মীবৃন্দ

১. ঠিকাদারি প্রথা বাতিল ও ঠিকাদার মুক্ত চাকরি চাই।
২. চাকরির নিশ্চয়তা চাই এবং ৬২ বছর পর্যন্ত চাকরি চাই।
৩. অনৈতিক ভাবে চাকরিচ্যুত কর্মচারীদের চাকরিতে পুনর্বহাল করা।
৪. বেতন ১ থেকে ৫ তারিখের মধ্যে দেওয়া এবং রেশন ব্যবস্থা চালু করা।
৫. নৈমিত্তিক ছুটি, মেডিকেল ছুটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি ও অন্যান্য ছুটি প্রদান।
৬. নির্দিষ্ট ডিউটির সময় ঘণ্টা নির্ধারণ করা। পোষাকের ব্যবস্থা চালু করা।
৭. চাকরি শেষে পেনশন ব্যবস্থা চালু করা। ডিপার্টমেন্ট থেকে বদলীর ব্যবস্থা করা।
৮. বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট ও পে-স্কেলের আওতাভুক্ত করা এবং মহার্ঘ ভাতা প্রদান এবং ওভার টাইম এর ব্যবস্থা নির্ধারণ করা।
৯. তিনটি উৎসব ভাতা এবং অন্যান্য ভাতা প্রদান করা।
১০. আউটসোর্সিং নিয়োগ সর্বোপরি বন্ধ করা এবং বয়স শিথিল করে সবাইকে চাকরিতে স্থায়ী করা।

মেট্রোরেল প্রকল্প আউটসোর্সিং কর্মচারী

১. আউটসোর্সিং প্রথা বাতিল করে আউটসোর্সিংয়ে কর্মরত সকল কর্মচারীদের রাজস্বে স্থায়ী করতে হবে।
২. ২০১৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেলে ১-১৪ গ্রেডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি পেলেও ১৫-২০ গ্রেডের আউটসোর্সিং কর্মচারীরা বেতন বৈষম্যের শিকার, তাই এই বেতন বৈষম্য দূর করতে হবে।
৩. শ্রম আইন লংঘন করে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের নির্ধারিত কর্ম ঘণ্টার চেয়ে ৫-৬ ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। এমনকি ছুটির ক্ষেত্রে ও আমাদের বৈষম্যের শিকার হতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শুক্র-শনিবার ও সরকারি ছুটির দিনে আমাদের কাজ করতে হয়, বিনিময়ে আমরা কোনো ওভারটাইম পাই না, তাই আমরা এই বৈষম্যের অবসান চাই।
৪. আউটসোর্সিং কর্মচারীরা কোনো প্রকার ঈদ ও বৈশাখী ভাতা পাই না, তাই আমরা এই বৈষম্যের শিকার।
৫. আউটসোর্সিং কর্মচারীদের কোনো ছুটির বিধান নাই, যা শ্রম আইন লংঘন।
৬. আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি পাই না, যা আন্তর্জাতিক শ্রম আইনের লংঘন।
৭. আউটসোর্সিং কর্মচারীদের চাকরির কোনো নিরাপত্তা নেই।
৮. আউটসোর্সিং কর্মচারীদের বর্তমানে ষোল গ্রেড়ের (১৮৬১০), বিশ গ্রেডের (১৭৬১০) টাকা বেতন, যা চরম বৈষম্যের শিকার।

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিলুপ্ত বিনিয়োগ বোর্ড), আউটসোর্সিং কর্মচারীবৃন্দ

১. বর্তমান চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদান না করা।
২. মাসের শুরুতে বেতন পাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করা।
৩. অন্যান্য চাকরিজীবী দের ন্যায় সরকারি সুযোগ সুবিধা প্রদান করা।
৪. প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট প্রদান করা।
৫. মাসের শুরুতে বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং বেতন কম না দেওয়া।
৬. কোম্পানির মাধ্যমে বেতন না দিয়ে সরাসরি প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের রাজস্ব ও বিভিন্ন প্রকল্পের আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল কর্মচারীবৃন্দ

- পদবি ও বেতন গ্রেড অনুযায়ী আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগকৃত সকল কর্মরত জনবলসমূহের চাকরি রাজস্ব খাতে স্থায়ী/নিয়মিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ)

১. কাজের অধিকার, সুযোগ, নিশ্চয়তা, ও অন্তর্ভুক্তি

- শোভন কাজ, কাজের সমঅধিকার, সমসুযোগ অন্তর্ভুক্তি ও নিশ্চয়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় সংস্কার;
- Decent Work Country Program পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন;

- টেকনোলজির ব্যবহার করে শ্রমিকের চাকরি অবসানের বিষয়টি কঠোরভাবে তদারকি করা যে, শ্রম আইন মোতাবেক পদ্ধতি অবলম্বন করে চাকরি অবসান করা হয়েছে কিনা;
- অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসনের নিশ্চয়তা ও নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্য নিরসন;
- শিক্ষাধীনতার সুযোগ বৃদ্ধি (উদ্বুদ্ধকরণ, শ্রম আইন অধ্যায় ১৮ এর স্পষ্টকরণে বিধি প্রণয়ন);
- প্রতিবন্ধী শ্রমিকগণের সুরক্ষায় আইনে আরও বিধান সংযুক্ত করা (কর্মঘণ্টা, ছুটি, চাকরির অবসান, বিশ্রাম প্রভৃতি);
- অদক্ষ ব্যক্তিকে দক্ষ কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এর সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম গ্রহণ;
- OSH ব্যবস্থাপনায় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র উন্মোচন করা;
- ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির লক্ষ্যে AI ভিত্তিক প্রশিক্ষণ;

২. মজুরি ও ন্যায্য হিস্যা

- দেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল সেক্টরের জন্য নিম্নতম মজুরির মানদণ্ড নির্ধারণ ও জাতীয় নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ;
- স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন;
- শ্রমিকের প্রাপ্য মজুরি নিশ্চিতকল্পে শ্রম আইনের অধ্যায় ১০ এর লংঘন এবং শ্রম আদালতে অভিযোগ দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য শ্রম আইন সংশোধন ও পরিদর্শকের প্রশাসনিক জরিমানা আরোপের ক্ষমতা প্রদান;
- সকল সেক্টর ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রত্যেক জেলায় ডাইফ অফিস স্থাপন।

৩. নিরাপদ ও কর্ম পরিবেশ

- মালিক কর্তৃক প্রতিবছর কর্মক্ষেত্রের ঝুঁকিসমূহ নিরূপন করে মূল্যায়নের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ। আইনের এ বিধান লংঘনের শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা;
- স্বাস্থ্য বিমা স্কিম চালু ও কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত স্কিম (EIS) চালু;
- আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বিশেষায়িত শ্রমজীবী হাসপাতাল স্থাপন;
- আইনে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ ও শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ;
- সেইফটি কমিটির সদস্যগণের উপযোগী প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা;
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক পলিসি এবং প্রোফাইল হালনাগাদকরণ/সংশোধন করা;
- নিরাপদ কর্মপরিবেশ বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহের সমন্বয়হীনতা দূর করতে হবে;
- নিরাপদ কর্মপরিবেশ বাস্তবায়নের সহায়ক হিসাবে বায়ার কর্তৃক প্রডাক্টের রেট বাড়াতে হবে;
- OSH সংস্কৃতি সৃজনে উদ্বুদ্ধকরণ সভার আয়োজন, সচেতনামূলক উপাদন তৈরি ও প্রচার, স্কুল ও কলেজের কারিকুলামে OSH বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণ;
- শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে উৎসাহিত করা।

৪. সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ

- প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নির্বিশেষে সকল শিল্প ও খাতের জন্য ILO Standard অনুসারে সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা;
- দুস্থ, অসুস্থ ও অসহায় শ্রমিকদের সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় আনতে "DIFE টু সংশ্লিষ্ট দপ্তর" চ্যানেল তৈরি;
- সকল সেক্টর ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ৬৪ টি জেলায় ডাইফ অফিস স্থাপন;
- শ্রম আইনে ভবিষ্য তহবিল বাধ্যতামূলক করা যদি ৫০ জন শ্রমিক থাকে;
- সংশ্লিষ্ট আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়ন করে বৈষম্যহীনভাবে কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ;
- শ্রম আইনের সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিদর্শন ও কম্প্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে ডাইফকে ক্ষমতা প্রদান;
- সরকারি চাকরিজীবীদের মতন শ্রমিকদের পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে। যাতে চাকরির পরও তাদের সামাজিক নিরাপত্তা অটুট থাকে;
- দৈব বিপাক নিয়ন্ত্রণে আপদকালীন তহবীল গঠন করতে হবে।

৫. সংগঠনের অধিকার, অংশগ্রহণ, প্রতিনিধিত্ব ও যৌথ দরকষাকষি

- কোনো প্রতিষ্ঠানে সিবিএ গঠিত হবার পর তাদের সরকারিভাবে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- সিবিএ-এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, আচরণ ও আইনগত দিক দিয়ে যুক্তিসংগত বৈশিষ্ঠ্য প্রকাশকারীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে বিভিন্ন ক্যাটেগরীর পুরষ্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে;
- কারখানা পর্যায়ে মালিক, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক ও ট্রেড ইউনিয়নকে সম্পৃক্ত করে শ্রম অসন্তোষ ও অভিযোগ নিরসনের পন্থা উদ্ভাবন করা যেতে পারে।

৬. শিল্প অসন্তোষ ও বিরোধ নিষ্পত্তি, এবং ন্যায় বিচার

- শিল্পঘন জেলাসমূহে ডাইফের একের অধিক কার্যালয় স্থাপন করা;
- যারা ১২৪ক এবং বিধি ৩৫১ সংশোধনপূর্বক আরও সময়াবদ্ধ ও সুনির্দিষ্টকরণ এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের প্রতিপালনের ব্যর্থতায় শাস্তি বিধান সংশোধন;
- শিল্প অসন্তোষ নিরসনে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার মধ্যকার সমন্বয়কে কাঠামোবদ্ধ করা;
- মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য পরিদর্শকগণকে আইনানুগ ক্ষমতা প্রদান;
- শ্রম অধিকার বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ সচেতনামূলক ক্যাম্পিং এর আয়োজন।

৭. সমতা, বৈষম্যহীনতা ও বিশেষ জনগোষ্ঠী

- সেক্টরভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলকভাবে আনুপাতিক হারে নারী, পুরুষ, উপজাতী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীকে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে;
- নারী, পুরুষ, উপজাতী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর সমতা ও বৈষম্যহীনতার বিষয়ে মালিকদের ব্যবসা শুরুর পূর্বেই প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ;
- নারী, পুরুষ, উপজাতী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করা যেতে পারে।

৮. শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক, ও জবরদস্তিমূলক শ্রম

- জবরদস্তি শ্রম বন্ধে শ্রম আইন ও বিধির প্রয়োজনীয় সংশোধন সংবিধানের আলোকে করা;
- শ্রম হতে নিরসনকৃত শিশুর পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রহণ করা এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ টেকসই জবাবদিহীতামূলক করার জন্য শিশু শ্রম নিরসন বিষয়ক জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান কমিটির মাধ্যমে আবশ্যিকভাবে প্রকল্পের কার্যক্রম পরীবিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শ্রমে শিশু নিয়োগের শাস্তির পরিমাণ বাড়াতে শ্রম আইন/বিধির সংশোধন;
- শিশু শ্রম, কিশোর শ্রমিক, ও জবরদস্তিমূলক শ্রম বিষয়ক উদ্বুদ্ধকরণ সভা/ সচেতনামূলক ক্যাম্পিং এর আয়োজন;
- ডাইফ পরিদর্শনে প্রাপ্ত শ্রমে নিয়োজিত শিশুকে সরাসরি প্রকল্প অথবা সোশ্যাল সেইফটি নেটের আওতায় পুনর্বাসনের সরাসরি চ্যানেল তৈরি।

কাঠামোগত সুপারিশ:

১. আইন ও নীতি কাঠামো

➢ **শ্রমখাত ও শ্রম অধিকার সুসংহত করণে:**

- শ্রমনীতিসহ শ্রম সংক্রান্ত সকল নীতি ঢেলে সাজিয়ে প্রণয়;
- শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ও সামজিক মর্যাদা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করা যেকে পারে;
- সরকার কর্তৃক আইনের স্পষ্টিকরণের জন্য পৃথক ধারা সংযুক্ত করা যেন আইনের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা /অপব্যাখ্যা রোধ করা যায়;
- নারী শ্রমিকের কর্মস্থলে নিরাপদ যাতায়াতের জন্য মালিকের খরচে যানবাহনের ব্যবস্থা।

➢ **পৃথক পৃথক আইন প্রণয়ন:**

বাংলাদেশ শ্রম আইন নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি, কর্মঘণ্টা ও ছুটি, মজুরি, কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলি নিয়ে-

- পেশাগর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য আইন;
- ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন আইন;
- শ্রম পরিদর্শন আইন;
- শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল আইন;
- শ্রম এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট আইন;

এভাবে আলাদা আলাদা আইন করা।

২. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও গভর্নেন্স

- কাঠামো ও সকল সেক্টর ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য প্রতি জেলায় উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয় ও শ্রমঘন এলাকায় একাধিক অফিস স্থাপন এবং বিভাগে বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন;
- ডাইফের অর্গানোগ্রাম পরিবর্তন ও সংশোধন করা;
  - প্রধান কার্যালয়ের অর্গানোগ্রাম পরিবর্তন
  - মাঠ পর্যায়ের অর্গানোগ্রাম পরিবর্তন ও সংশোধন করা
- জনবল বৃদ্ধি/পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- কোর্ট ইন্সপেক্টর পদ সৃজন করা;
- প্রতি জেলায় শ্রম আদালত স্থাপন;
- শ্রমিকের মৌলিক অধিকার সুরক্ষা, কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, মালিককে কর্মক্ষেত্র কমপ্লায়েন্স উন্নয়নের মাধ্যমে শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, ইত্যাদির লক্ষ্যে শ্রম পরিদর্শকদের আইনানুগভাবে ক্ষমতায়ন করা;
- দেশের সকল সেক্টরের শ্রমিকের পূর্ণাঙ্গ ডেটোবেজ তৈরি ও ইউনিক আইডি সৃজন।

৩. প্রতিকার ও ন্যায় বিচার

- প্রতি জেলায় শ্রম আদালত স্থাপন;
- শিল্পঘন এলাকায় প্রয়োজনে আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি;
- মামলা অনুপাতে বিচারক নিয়োগ;

- আইনে শাস্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা (Dissuasive Panalty);
- শ্রম পরিদর্শকদের প্রশাসনিক জরিমানা করার আইনানুগ ক্ষমতা প্রদান;
- শ্রমিকের আইনগত পাওনাদি নিশ্চিত করতে শ্রম পরিদর্শকদের মামলা করার ক্ষমতা প্রদান (ধারা-১২৪ক ও ১৩২);
- কার্যকর, গ্রহণযোগ্য ও শ্রমবান্ধব বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (জুডিশিয়াল ও নন-জুডিশিয়াল)।

৪. শিল্প সম্পর্ক, যৌথ দর কষাকষি ও সামাজিক সংলাপ

- মালিকপক্ষ, ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন ও সুশীল সমাজের সাথে সামাজিক সংলাপের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্ককে এগিয়ে নেয়া যেতে পারে।
- সুষ্ঠু ও গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির সমন্বয়ে আইন, মজুরি ও
- শ্রম অসন্তোষ নিরসন করা যেতে পারে

৫. সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক কর্মসূচি

- শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করার জন্য কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যেতে পারে;
- শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে শক্তিশালী করা যেতে পারে;
- শ্রমিকদের কল্যাণমূলক কর্মসূচীর আওতা ও সুবিধা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

৬. পৃথক দপ্তরের জন্য পৃথক আইন

বাংলাদেশ শ্রম আইন - নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি, কর্মঘণ্টা ও ছুটি, মজুরি, কল্যাণ, সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলি নিয়ে

- পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য আইন;
- ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন আইন;
- শ্রম পরিদর্শন আইন;
- শ্রম আদালত ও শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল আইন;
- শ্রম এবং পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট আইন;

এভাবে আলাদা আলাদা আইন করা।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (টিইউসি), চট্টগ্রাম

'বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬' এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের সুপারিশ:

১. ১৭৫ নং ধারায় কোনো প্রতিষ্ঠানের পাহারা টহলদারি অথবা নিরাপত্তা স্টাফ, অগ্নি নির্বাপক স্টাফের সদস্যদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এদেরও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দেওয়া এবং ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার অধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

২. ধারা ১৭৮ এর উপধারা ২ দফা ৩ মতে অনানুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য পরিচয়পত্র দেওয়া বাধ্যতামূলক করা যাবে না। কাজেই ধারা ১৭৮ এর উপধারা ২ দফা ৩ এর শেষ ২টি লাইন বাদ দিয়ে ২০১৮ সালের সংশোধনের পূর্বের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে এবং এসব খাতে কর্মরত সকল শ্রমিকদের একটি ডাটাবেজ সরকার কর্তৃক তৈরি করে প্রত্যেক শ্রমিককে পরিচয় পত্র দিতে হবে।

৩. ১৮৩ (৬) কোনো প্রতিষ্ঠান পুঞ্জে ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের জন্য কমপক্ষে ৩০% সদস্য হওয়ার বাধ্যবাদকতা বাদ দিতে হবে এবং ১৭৯ (২) এ শেষাংশে ইউনিয়ন গঠনে জটিলতা সৃষ্টি করছে তাই অংশটুকু বাদ দেয়ার সুপারিশ করা হচ্ছে।

৪. ১৭৯ (২) (ক) উপধারার পরিবর্তে "প্রতি বৎসরের শুরুতে প্রত্যেক মালিক প্রত্যেক শ্রেণির নিয়োজিত শ্রমিকদের ৪০১টি তালিকা শ্রম অধিদপ্তর এবং কারখানা পরিদর্শন দপ্তরে জমা দিবেন" উদ্ধৃত অংশটি প্রতিস্থাপন করা দরকার।

৫. ১৮০ (১) (খ) ধারার প্রথম অংশ বাতিল করে সুস্থ ধারার ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন গড়ার স্বার্থে রাষ্ট্রায়াত্ব, ব্যক্তি মালিকানাধীন যে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা কারখানায় কমিটির মোট কর্মকর্তার অন্তত শতকড়া ২৫ ভাগ নির্বাচিত করিতে পারিবে যাহারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানপুঞ্জে কর্মরত নহেন। এমন ধারা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৬. ১৯৫ (জ) এই ধারা অনুসারে ধর্মঘট চলাকালে কোনো মালিক পূর্ব থেকে ঠিকাদার নিযুক্ত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ চালাইতে পারিবেন না। অর্থাৎ তাহারাও ধর্মঘটের আওতাধীন হইবে। এমন ধারা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৭. ১৯৫ (২) ও ১৯৬ (৪) ধারায় সরকার অসৎ শ্রম আইন বিষয়ক তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে, পদ্ধতি প্রণয়ন করিবেন সেই প্রণয়ন কমিটিতে শ্রমিক/মালিকের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার আইন বিধানে সংযুক্ত করিতে হইবে।

৮. ১৯৬ (২) (চ) বৃটিশ আমল, পাকিস্তান আমল থেকে 'অবস্থান করা' শ্রমিকদের দাবি আদায়ের পদ্ধতি। ন্যায় সংগত ৮ পাওনা আদায়ের জনা দাবি জানালে শ্রমিকদেরকে কাজ থেকে বেআইনিভাবে বের করে দেওয়া হয়, উপরোক্ত পরিস্থিতিতে বেতন আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচী একটি কার্যকর পদক্ষেপ। এইজন্য এই ধারা থেকে ঘেরাও শব্দটি প্রত্যাহার। করতে হবে।

৯. ২০২ (৫) ধারাটিতে উল্লেখ আছে সিবিএ নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন না থাকিলে আবেদনকারী ইউনিয়নকে যৌথ দর কষাকষি ঘোষণা করা হইবে যদি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মোট সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ উহার সদস্য হইয়া থাকে। এই আনুচ্ছেদ থেকে "যদি প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রমিকগণের মোট সংখ্যার অন্যূন এক তৃতীয়াংশ উহার সদস্য হইয়া থাকে" বাক্যটি বাদ দিতে হবে।

১০. ২০৫ ধারাটি শ্রম আইন থেকে প্রত্যাহার করা প্রয়োজন।

১১. ২০৮ এর (১) (২) ধারা বাতিল করতে হবে।

১২. ধারা ২ (১০) এ গ্র্যাচুইটি সংক্রান্ত বিষয়ে সংজ্ঞা দেওয়া হলেও প্রয়োগ কীভাবে করতে হইবে তা উল্লেখ নাই। ফলে এই ধারাটি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। গ্র্যাচুইটি যাতে শ্রমিকেরা প্রাপ্য হয় সেই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় আইনি ধারা যুক্ত করতে হবে।

১৩. ধারা ১৮৩ (৩) এর দফা 'থ' থেকে 'জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ (Recycling)' বাদ দেয়ার সুপারিশ করছি।

১৪. ৩ (ক) ধারা অনুসারে ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক সরবরাহের আইন বাতিল করতে হবে।

১৫. ৪ ও ৫ উপধারাকে একীভূত করে ৪নং ধারা সংশোধন করে সাময়িক ও অস্থায়ী ধরনের কাজের জন্য অস্থায়ীভাবে নিয়োগ এবং ৫নং শ্রেণি বাতিল করা প্রয়োজন।
১৬. ১২নং ধারায় (১) "মালিকের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত অন্য কোনো কারণে প্রয়োজন হইলে" এই বাক্যাংশটি বাদ দিতে হইবে তা না হলে এটার অপব্যবহার করে মালিক পক্ষ যখন তখন যে কোনো কারণে কারখানা বন্ধ করে দিতে পারেন।
১৭. ১৩নং ধারা অনুসারে মালিক পক্ষের প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার ক্ষমতা। এই আইনটি মালিক পক্ষ অপব্যবহার করছে। এই ধারাটি বাতিল করতে হবে।
১৮. ১৮ নং ধারা কতিপয় ক্ষেত্রে লে-অফ কৃত শ্রমিকগণ ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী ইহবেন না। ১৮ (১) (ক) ধারা "এবং যদি মালিক ৮ কি.মি. মধ্যে কারখানায় শ্রমিকের যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন বা যাতায়াত ভাতা দেন" এই শব্দগুলি শেষে যোগ করিতে হইবে।
১৯. ২৩ নং ধারার ৪ (ঘ) ও (ছ) বাদ দিতে হবে। অর্থাৎ যেকোনো শ্রমিক ডিসমিস হলে বর্তমান আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।
২০. ২৪ ধারার ৪ নং উপধারায় তদন্ত কাজে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সহায়তা করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত বা প্রতিষ্ঠানের বাইরে যে কোনো ট্রেড 'ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতা বা উকিল মনোনয়ন দিতে পারিবেনন'- কথাটি প্রতিস্থাপিত হওয়া দরকার।
২১. ২৬ ধারা বরখাস্ত ইত্যাদি ব্যতীত অন্যভাবে মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরির অবসান: এ ধারাটি পুরোপুরি বাতিল করিতে হইবে।
২২. ২৮ নং ধারার ৩নং উপধারায়.... তবে শর্ত থাকে যে এই উপধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন চা শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অবসর সুবিধা সহ অন্যান্য সুবিধাদি প্রযোজ্য হইবে" (সংশোধন ২০১৮) এই ধারাটি বাতিল করতে হইবে, এই ধারাটি প্রয়োগ করে চা শ্রমিকদের সাথে বৈষম্য করা হয়েছে।
২৩. ৩২ (১) ধারায় যোগ করতে হবে- "তবে চা শ্রমিকদের বাসস্থান হইতে উচ্ছেদ করা যাইবে না"। কারণ বংশানুক্রমে চা শ্রমিকেরা চা বাগানের অভ্যন্তরে বসবাস করে। বাহিরে যাওয়ার তাদের কোনো জায়গা নাই।
২৪. প্রসূতি ছুটির ক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি বৈষম্য দূর করে সমানভাবে ৬ মাস প্রসূতি ছুটি দেওয়ার লক্ষে ৪৬ (১) ধারা পরিবর্তন করতে হবে।
২৫. ৯৫ ধারা: চা বাগানে গৃহায়ন সুবিধা - এই ধারা অর্থাৎ গৃহায়ন সুবিধা বাস্তবায়ন করার জন্য বিধিমালা ৯৬ ধারা অনুযায়ী তফসিল ৫ এর ৭ (১)(ছ)(আ) তে যে সুযোগ সুবিধার কথা বলা হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। এমতাবস্থায় অন্তত পক্ষে বারান্দা সহ অন্তত ৬০ বর্গগজের ঘর, পৃথক শৌচাগার, প্রক্ষালন কক্ষ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ও গবাদি পশু রাখার ঘর বাচ্চাদের খেলাধূলার জন্য পৃথক জায়গা বরাদ্দ করে বিধিমালা সংশোধন করা ও শিক্ষা, চিকিৎসা ও শৌচাগার সহ বিধিমালায় বর্ণিত সকল সুবিধা ১০০% বাস্তবায়ন করার জন্য ব্যবস্থা থাকা দরকার।
২৬. ৯ম অধ্যায়ে ১১৫ ধারায় "তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই চা বাগানের অধীনে নিযুক্ত কোনো শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না" অনুচ্ছেদটি বাদ দিয়ে চা শ্রমিকদেরকেও অন্যান্য শ্রমিকদের মতো নৈমিত্তিক ছুটি পাওয়ার অধিকার দিতে হবে।
২৭. প্রতি ৩ বৎসর অন্তর দ্রব্যমূল্যে সাথে সংগতি রেখে ও সামাজকি নিরাপত্তামূলক সুযোগ সুবধিা বৃদ্ধি করে মজুরি বোর্ড নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করবে। তাই ধারা ১৩৯ (৬) পরিবর্তন করতে হইবে।
২৮. ধারা ২৩৩ (ঝ) তে উল্লেখিত "যিনি মালিক কিংবা অংশীদার কিংবা পরিচালনা পরিষদের সদস্য ব্যতীত পদ মর্যাদা নির্বিশেষে উক্ত কোম্পানিতে" এর পরিবর্তে "শুধুমাত্র শ্রমিক যিনি" যোগ করিতে হইবে।
২৯. ২৬৪ ধারার ১ উপধারায় বলা হয়েছে "বেসরকারি খাতের কোনো প্রতিষ্ঠান..... ভবিষ্য তহবিল গঠন করিতে পারিবে- এই "পারিবে" শব্দের পরিবর্তে "হইবে" শব্দ যোগ করা উচিৎ। সেই প্রতিস্থাপিত করিতে হইবে।
৩০. ২৬৪ (১০) ধারা বাদ দেওয়া উচিত।
৩১. বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালার ১০ম অধ্যায়ে ১১১ (৫) ধারায় "উৎসব বোনোসের পরিমাণ মূল মুজরির কম হতে পারবে না", এমন উল্লেখপূর্বক ধারা শ্রম আইনে যুক্ত করার জন্য সুপারিশ করছি।
৩২. ২০২২ সালে শ্রম বিধিমালা সংশোধনীর ৩৬১ (ক) বিধিতে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌন হয়রানীর প্রতিরোধে প্রতিষ্ঠানের ভিতর থেকে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা উচ্চ আদালতের নিদের্শনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মধ্যে কমপেক্ষে দুইজন প্রতিষ্ঠানের বাহিরের সদস্য রাখার প্রস্তাব করছি।
৩৩. তফশীল ৫ এ উল্লেখিত মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ ২ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী অক্ষমতার জন্য ২.৫ লক্ষ টাকার পরিবর্তে আইএলও কনভেনশন ১২১ এর সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে Loss of Year & suffering হিসাব পূর্বক ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের দাবি জানাচ্ছি।

ব্যয় ব্যবস্থাপনা-৩ শাখা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

PROPOSED LABOUR LAW AMENDMENT

1. Outsourcing workers through contractors against permanent post-difference in pay scale, Sec. 3 (A) of Bangladesh Srama Ain. For outsourcing workers separate wage scale is given which is much lesser than workers through contractors.
2. Outsourcing should be for new projects.
3. After 1" appeal before the Labour Appellate Tribunal there should be a second appeal like as Sec. 6-A of the Administrative Tribunal Act. before Appellate Division like Administrative Tribunal.
4. After the expiry of the term of the CBA, the concerned CBA should be allowed to function like CBA which leads to avoiding an election.

5. All elections of CBA/ Federation should be held under the guidance of the Labour Directorate.
6. Construction workers/agricultural worker should be brought under law like other workers.
7. Orders against the petition to Labour Court should be made appealable before Labour Appellate Tribunal Ref. "Section 217 should be amended to included" "orders after the order judgment.
8. Outsourced worker must be given equal wages like permanent worker and other facilities and amenities like permanent workers - Ref. Sec. 345 Bangladesh Srama Ain 2006 but discrimination has been created in violation of law by employing worker through contractor.
9. Outsource worker must be given P.F, uniform, WPPF Gratuity and pension like permanent worker, group insurance by the contractor. The Contractor must be a limited company and they must maintain all records of their workers. Labour law providers for security of the workers.

OXFAM

Recommendations for Domestic Workers:

1. Ratification of ILO Conventions C189 and C190 and Formalization of Domestic Workers in Labor Laws.
2. Strengthening Implementation of the Domestic Workers Protection and Welfare Policy (DWPWP) 2015.
3. Monitoring for Ensuring the Rights and Protection of Domestic Workers.
4. Mandating Appointment Letters for Domestic Workers.
5. Minimum Wage for Domestic Workers.
6. Take Action for Elimination of Violence Against Domestic Workers.
7. Take Action for Elimination of Child Labor.
8. Adolescent Domestic Workers.
9. Safe and Healthy Working Conditions.
10. Right to Organize Trade Unions.
11. Skills Development and Job Placement of Domestic Workers.
12. Outbound Migrant Domestic Workers.
13. Responsible Employers and Employees.
14. Social Protection and Other Facilities.

Recommendations for Home-based Garments Workers:

1. Formalize home-based garments workers in the Bangladesh labor laws.
2. A comprehensive and gender responsive policy should be framed for ensuring rights, protection, safety, and welfare of home-based garments workers aligning with international standards i.e. the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.
3. The Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) should increase its oversight covering inspections of both factory-based and home-based workers for ensuring their decent work.
4. Ensure social security benefits and legal protections for home-based garments workers.
5. Establish a monitoring cell under the Ministry of Labor and Employment in collaboration with the Ministry of Women and Children Affairs for ensuring decent work for home-based garments workers.
6. Minimum wage must be set and ensured for home-based garments workers in line with fair wages in the country.
7. Formal contracts or appointment letters should be made obligatory for employment of home-based garments workers. Such agreements should include their wages and entitlements, working hours, wage payment schedule, leave entitlements and other benefits.
8. Leave entitlements should be mandated for home-based garments workers i.e. paid weekly holidays, festival leave, and maternity leave.
9. Ensure right to organize and register trade unions for home-based garments workers.
10. Ensure equal wages, benefits, and entitlements for female and male workers.
11. Promote corporate responsibilities, human rights due diligence, transparency, and ethical sourcing in the RMG supply chains, for both national and international private sector stakeholders to be accountable for decent and gender responsive working conditions of home-based garments workers.
12. Promote pathways for home-based garments workers to secure contracts directly from factories, instead of contractors or middlemen, to enable avenues for increased transparency and ethical sourcing in the supply chains, decent and gender responsive working conditions, and better wages.
13. Actions must be taken for elimination of all forms of sexual, physical, and psychological violence against home-based garments workers.

14. Action must be taken to elimination child labor in home-based garment works. Household visits should be regularly conducted for monitoring of child labor by the Child Labor Monitoring Cell.
15. Establish community-based day care centers for children of home-based garment workers.
16. Expand safety net programs i.e. the Shramik Kalyan Foundation to include all workers, regardless of their employment setting.
17. Enable social protection for home-based garment workers through provisions for them i.e. Universal Pension Scheme, micro or social health insurance, access to financial services, etc.
18. Enable access to subsidized food items for home-based garment workers through the Trading Corporation of Bangladesh (TCB).
19. Take initiatives for skills development and job placement of home-based garment workers.
20. Skills assessments of home-based garments workers should be made available via multiple pathways i.e. training and Recognition of Prior Learning (RPL).

Recommendations for Tea Plantation Workers:

1. A comprehensive and gender-responsive Tea Plantation Workers' Well-being Strategy should be framed for tea plantation workers in collaboration with the plantation authorities, their employers' association, trade union and workers' associations, civil society organizations, including women's rights organizations.
2. Revise and harmonize the Bangladesh labor laws and Dastur laws and eliminate discriminatory provisions against tea workers.
3. Ensure a justified and fair wage structure for tea plantation workers, compatible with ILO decent work standards.
4. Ensure implementation of appointment letters, ID cards and service books for tea plantation workers.
5. Ensure meaningful participation of tea workers, especially women, in the formulation and review of labor laws and policies.
6. Promote business practices that uphold corporate responsibilities, human rights due diligence, decent and gender responsive working conditions, sustainability and transparency across the supply chains.
7. Ensure adequate representation of tea workers' union in the law and order protection committees in the respective Upazilas and Zilas.
8. Develop and execute specialized initiatives aimed at to advance women's leadership, and their active and meaningful participation in unions.
9. Bangladesh must ratify ILO Convention C190 (Violence and Harassment Convention, 2019).
10. Make employers legally accountable to ensure sufficient toilet and drinking water facilities, including separate toilets for females and males, in both the workers' workplaces and living space.
11. Ensure occupational health and safety of tea plantation workers, i.e. for those involved in spraying pesticides, health and safety for pregnant women workers, health safety prevention from contacting leeches and insects, etc.
12. Take multi-sectoral programming for workers, especially women and girls
13. Emphasize systematic information and knowledge generation on rights, working conditions and wages of tea workers.
14. Create appropriate authority, structure, and processes to deal with women workers issues in the workplace, including gender sensitive complaints and arbitration systems.
15. Formulate and implement protection policy and gender friendly care policy for women workers.
16. Activate anti-harassment policies and committees in the tea plantations, especially for female workers.
17. Enhance coverage of day care facilities in the tea plantations.
18. Ensure adequate and functional WASH, health and safety, and education services for workers, their families, and children.
19. Ensure accessible health facilities for tea plantation workers, including delivery rooms.
20. Investment in skills development programs to diversify the skills and livelihood options of tea plantation workers and their families i.e. eco-tourism and cooperative farming.
21. Establish legal rights to land entitlements by tea plantation workers.
22. Prioritize review and amendments of sections 26 and 32 of the Bangladesh labor law.
23. Establish at least one permanent Labor Court for Moulvibazar or Sylhet of Sylhet Division
24. Enable social protection for tea plantation workers through provisions for them i.e. the Universal Pension Scheme, micro or social health insurance, climate risk insurance (CRI). access to financial services, etc.

Recommendations for Fisherfolk

1. A comprehensive policy should be framed for ensuring rights, protection, and safety of fisherfolk communities, especially for marginalized, vulnerable and women fisherfolk
2. The labor law should formalize fisherfolk and they should be granted the right to organize and register trade unions.
3. Minimum wage must be set for fisherfolk in line with fair wages in the country.
4. Bangladesh should ratify ILO Convention C 188 (Work in Fishing Convention, 2007) which covers both traditional and industrial fishing.
5. Fisheries policies, practices, fisheries governance, and development in Bangladesh should be made compatible with the FAO Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication (SSF Guidelines)
6. Establish clear guidelines and adequate monitoring for ensuring equitable distribution of fisherfolk cards (Fisher IDs) and their subsequent associated subsidies or benefits to marginalized and vulnerable fisherfolk, including fisherfolk women.
7. Enable adequate safety nets for fisherfolk during fishing ban periods through equitable and enhanced amount of subsidies, expansion period of these subsidies as well as Vulnerable Group Feeding (VGF) programmes, along with creation of alternate livelihood options and access to financial services for fisherfolk during these periods.
8. Establish enhanced monitoring mechanisms in collaboration with local administration at the sub-district and union level to oversee the distribution of fishing licenses and subsidies to marginalized fisherfolk, including women.
9. Engagement should be enhanced between with fisherfolk communities and forest, land, and fisheries departments for equitable co-management of resources and decision-making
10. Legally recognize and uphold customary tenure of traditional artisanal fishing communities over fishing grounds.
11. Recognize and uphold women's tenure rights in fishing grounds and adjacent lands as part of fishing communities' customary tenure rights.
12. Enhance engagement between fisherfolk communities, including women fisherfolk, and local level disaster management committees and food security consultation forums.
13. Enable enhanced access to clear and accessible information for fisherfolk to learn about regulations, licensing, and eligibility for subsidies.
14. Ensure equal wages, compensations, benefits, and entitlements for both female and male fisherfolk.
15. Ensure workplace safety for fisherfolk in hazardous post-harvest sectors i.e. fish-drying yards and shrimp processing plants.
16. Ensure use and supply of personal protective equipment (PPEs) for fisherfolk.
17. Promote organic methods in dry fish processing to prevent exposure to insecticides, chemical and occupational hazards.
18. Ensure safety measures in deep sea fishing.
19. Introduce women-friendly fishing equipment and inputs.
20. Establish financial institute or bank dedicated for fisherfolk for enabling enhanced access to formal credit and financial services for fisherfolk.
21. Facilitate access to loans for cottage, micro, small and medium enterprises (CMSME) to fisherfolk for enabling sustainable livelihoods for them.
22. Create a favorable environment for financial support and incentives for wild-caught fisheries businesses and artisanal fishing units. 23. Enhance access to accessible information about weather forecasts to fisherfolk to support in their livelihoods and risks mitigations.
25. Enable social protection for fisherfolk through provisions for them i.e. climate risk insurance (CRI), the Universal Pension Scheme, micro or social health insurance, access to financial services, etc.
26. Increase coordination with Union Parishad and local administration to provide NID cards and birth certificates to all Manta fisherfolk, and enhance their access to social safety net programs of the government.

সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি

১. সড়ক পরিবহনে শৃঙ্খলা ফেরাতে সড়ক পরিবহন জাতীয় কমিশন গঠন করতে হবে।
২. সড়ক পরিবহন নীতিমালা ২০২২ সংস্কার করে একটি সময়োপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. যানজট নিরসনে "সিগন্যাল ফ্রী ট্রাফিক প্ল্যান চালু করতে হবে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালগুলি ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলায় স্থানান্তর করতে হবে ও প্রত্যেক জেলা উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়নে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাড়ি পার্কিং এর জন্য বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করতে হবে।
৪. মালিক-শ্রমিকের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় শ্রম অধিদপ্তরের প্রতিনিধি দিয়ে ও সব পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মাধ্যমে বৈধ ভোটার তালিকা প্রণয়ন করে পরিবহন মালিক সমিতি ও শ্রমিক ইউনিয়নগুলি গঠন করতে হবে।
৫. কল্যাণ ফান্ডের জন্য সংগৃহীত চাঁদার যথাযথ হিসাব, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. দেশে অপেক্ষাকৃত কমমূল্যের গাড়ির ব্যাটারি টায়ার ও ফিল্টার সহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ তৈরি করে পরিবহন রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কমাতে হবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে বিদেশি নির্ভরতা কমাতে হবে এবং আমদানিকৃত যন্ত্রাংশের শুল্ক কমাতে হবে।
৭. ট্রাফিক পুলিশের কাজ টার্মিনাল থেকে পরিচালিত হবে। তাহলে থাকবেনা ফিটনেস বিহীন গাড়ি, থাকবেনা লাইসেন্স বিহীন চালক।
৮. প্রত্যেকটি বাস টার্মিনালে মিনি হসপিটাল ব্যবস্থা করে শ্রমিক ও যাত্রীদের প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. প্রত্যেকটি বাস টার্মিনালে ড্রাইভার, সুপার ভাইজার ও হেলপারদের জন্য প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করতে হবে, ও ড্রাইভার এবং স্টাফদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করতে হবে।
১০. বিআরটির হয়রানি বন্ধ করে সহজ পদ্ধতিতে চালকের লাইসেন্স দিতে হবে। ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালগুলি ঢাকার পার্শ্ববর্তী জেলায় স্থানান্তর করতে হবে ও প্রত্যেক জেলা উপজেলা, পৌরসভা এবং ইউনিয়নে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাড়ি পার্কিং এর জন্য বাস ও ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ করতে হবে।
১১. কোনো প্রকার দুর্ঘটনার জন্য জনসাধারণকে আইন নিজ হাতে তুলে নেওয়া বন্ধ করতে হবে এবং মালিক শ্রমিকের সমন্বয়ে তদন্ত প্রতিবেদন করে বিচার করতে হবে।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

আইন বিষয়ক সংস্কার প্রস্তাব:

১. মজুরি পরবর্তী মাসের ০৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে কারখানা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শ্রমিককে পরিশোধপূর্বক এতদসংক্রান্ত তথ্য-প্রমাণাদি সংযুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট এলাকার শ্রম পরিদর্শক বরাবর লিখিত প্রতিবেদন দাখিল এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়েরের বিধান বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১২৩ ধারায় যুক্ত করা যেতে পারে।
২. বাংলাদেশ শ্রম আইনের ১ (৪) ধারায় যে সকল প্রতিষ্ঠানকে (অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, পরিবারের সদস্যগণের সাহায্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি) অব্যাহতি দেয়া হয়েছে- তা শ্রম আইন হতে বিলুপ্ত করা যেতে পারে।
৩. কারখানার পাশাপাশি সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিমা প্রতিষ্ঠান, নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দোকান, প্রভৃতির স্বতন্ত্র ইউনিটের জন্য মালিককে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং ফিস প্রদানের মাধ্যমে ডাইফের মহাপরিদর্শক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণ ও নবায়ন গ্রহণের বিধান শ্রম আইনে যুক্ত করা যেতে পারে।
৪. শ্রম আইনের ধারা ৩৩২ সংশোধন করে কর্মক্ষেত্রে "ব্যক্তির প্রতি আচরণ" এর বিধান প্রতিস্থাপন; এবং শ্রম বিধিমালার ৩৬১ক বিধিটি শ্রম আইনে যুক্ত করে উল্লিখিত যৌন হয়রানি প্রতিরোধে গঠিত কমিটিতে প্রতিষ্ঠানের বাইরের দু'জন সদস্যকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্তির বিধান সংযোজন।
৫. কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির শাস্তির বিধান সংযোজন (ধারা-৩০৯ক)। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির (মালিক, শ্রমিক, তদারকি সংস্থার কর্মচারী, ক্রেতা, দর্শনার্থী, এনজিও কর্মী) শাস্তি: ধারা-৩০৯ক- কোনো প্রতিষ্ঠানে কোনো নারী, পুরুষ, তদারকি সংস্থার কর্মচারী, এনজিও কর্মী- শালীনতা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থি যৌন হয়রানি, অসৌজন্যমূলক আচরণ, অশ্লীল বা অভদ্রজনোচিত আচরণের শিকার হলে-অপরাধি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে এবং পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন। তবে, শর্ত থাকে যে, উক্ত অপরাধ দণ্ডবিধি অথবা প্রচলিত অন্যান্য আইনানুযায়ী অপরাধ হিসেবে গণ্য হইলে অভিযোগকারী যথাযথ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।
৬. কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রম আইনের বিধি-বিধান লঙ্ঘনের দায়ে শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক শ্রম আদালতে অভিযোগ দায়ের করলে-সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক কর্তৃক "লঙ্ঘিত বিধি-বিধান সংশোধন করা হয়েছে"- মর্মে প্রত্যয়ন (Compliance Certificate) ইস্যু না করা পর্যন্ত শ্রম আদালত কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে না; বাংলাদেশ শ্রম আইনের ৩১০ ধারা সংশোধন করে বর্ণিত বিধান সংযোজন করা যেতে পারে। অথবা, বিকল্প হিসেবে- মামলার প্রথম শুনানিতে শ্রম আদালত দু'পক্ষকে শুনে কারখানা কর্তৃপক্ষকে লঙ্ঘিত বিধি-বিধান সংশোধনের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে বর্ণিত সময়সীমা পার হওয়ার অব্যবহিত পরে সংশ্লিষ্ট শ্রম পরিদর্শক কারখানাটি ফলো-আপ পরিদর্শন করে আদালত বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করলে উক্ত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তি করা হবে- এধরনের বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।
৭. শিশুশ্রম নিরসন, দোকান-প্রতিষ্ঠান খোলা-বন্ধের বিধান নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ও উৎপাদন ব্যবস্থায় বিপদজ্জনক হাজার্ড সনাক্ত করে তদানুযায়ী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত পরিদর্শক কর্তৃক 'স্পট ফাইন' এর বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।
৮. জরুরি ইস্যুতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য শ্রম আইনের ৩৫০ ধারা সংশোধন। ধারা ৩৫০: এই আইনের অধীন শ্রম আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গ্রহণযোগ্য বা বিচারযোগ্য কোনো মোকদ্দমা, অভিযোগ অথবা অন্য কোনো আইনগত কার্যধারা, জনস্বার্থে জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত, অন্য কোনো আদালত গ্রহণ করিতে বা বিচার করিতে পারিবে না।
৯. শ্রমিকের বিশ্রাম বা আহারের জন্য বিরতি- কর্মঘণ্টা হিসেবে বিবেচনাপূর্বক শ্রম আইনের ১০১ ধারা সংশোধন।
১০. শ্রমিকের বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এর বিধান শ্রম আইনে সংযোজন।
১১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৫ম অধ্যায়ে উচ্চ শব্দ বিষয়ক ধারা সংযোজন।

১২. অপরাধের মাত্রা (Gravity of offence) অনুযায়ী অপরাধের শ্রেণিকরণপূর্বক শ্রম আইনে নতুন তফসিল (Schedule) যুক্ত করে দণ্ডবিধি (Penal Code)'র ন্যায় অপরাধ, অপরাধের প্রকৃতি আর শাস্তির বিধান রেখে জরিমানা/কারাবাসের সিলিং নির্ধারণ করা যেতে পারে; অর্থাৎ নির্দিষ্ট অপরাধের জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান প্রণয়ন করা যেতে পারে। যেমন- ছোটখাটো লঙ্ঘণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন জরিমানা ৫,০০০/- হতে ১০,০০০/-; এর থেকে বড় লঙ্ঘণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শাস্তি- ৩ মাসের কারাবাস অথবা ১০,০০১/- হতে ২০,০০০/- জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড; জরিমানা অনাদায়ে আরও একমাসের কারাবাস। আরও বড় লঙ্ঘণের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন শাস্তি- ৬ মাসের কারাবাস অথবা ২০,০০১/- হতে ৫০,০০০/- জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড; জরিমানা অনাদায়ে আরও তিনমাসের কারাবাস...। অন্যথায় জেল/জরিমানা বাড়ানো হলেও তা শুধু আইনের বইয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে; কারণ জেল/জরিমানা প্রদান- একজন বিচারকের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (Discretionary Power)। তাই ড্রাফটিং ও সাবমিশনের মান বাড়ানো না গেলে, শ্রম আইন পরিবর্তন করে 'Gravity of offence' অনুযায়ী জরিমানা/কারাবাসের সিলিং নির্ধারণ না করতে পারলে জরিমানার অংক সংশোধন করে ' হাজার' এর পরিবর্তে 'এক লক্ষ' টাকা করলেও রেমিডি মিলবে- সেই দশ টাকা হতে পাঁচশত টাকা।

১৩. শ্রম আইনের ২১৬ (উপধারা-১২ ও ১৩) ধারায় মামলার রায় প্রদানের ক্ষেত্রে ৬০ দিন এবং ক্ষেত্রমতে আরও ৯০ দিন বর্ধিত করার বিধান রয়েছে। মামলার দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে মামলা নিষ্পত্তির উল্লিখিত সময়সীমা বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।

১৪. রেকর্ড-রেজিস্টারসহ সেইফটি কমিটির সদস্যদের শ্রম পরিদর্শনকালীন উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে শ্রম আইনে ধারা ৯০খ সংযোজন।

১৫. . শ্রম আইনের ১২৪ক ধারাতে সংশোধনী এনে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি [Alternative dispute resolution (ADR)] এর বিধান সংযোজন।

১৬. ধারা ২৮৯ক (ধারা ১২৪ক এর অধীনে আপোষ-মীমাংসার জন্য শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক প্রেরিত নোটিস অবজ্ঞা, উক্ত ধারার অধীন গৃহীত সিদ্ধান্ত পালনে ব্যর্থতার দণ্ড): ধারা ১২৪ক এর অধীনে আপোষ-মীমাংসার জন্য শ্রম পরিদর্শক কর্তৃক প্রেরিত নোটিস সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি অবজ্ঞা করিলে, উক্ত ধারার অধীন গৃহীত কোনো সিদ্ধান্ত পালনে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি ব্যর্থ হইলে, তিনি ১ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড, অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৭. পরিদর্শনকালে অনেকক্ষেত্রে শ্রম পরিদর্শককে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়তে হয়। শিশুশ্রম নিরসনে বিশেষ পরিদর্শন ও দোকান-প্রতিষ্ঠান খোলাবন্ধের তদারকিতে মালিকপক্ষের রোষানলের হাত থেকে রক্ষা পেতে ঝুঁকি বিবেচনায় আইন-শৃংখলা বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণের বিধান সংযোজন করা যেতে পারে।

১৮. শ্রম আইনে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার সংজ্ঞা হিসেবে ধারা ২ (১৯ক) সংযোজন।

১৯. শ্রম আইনের ধারা ২ (৬৫)-তে শ্রমিকের সংজ্ঞা সংশোধনী। কোনো প্রতিষ্ঠানে বা শিল্পে 'তদারকি কর্মকর্তা' ও 'প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনামূলক কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি', মালিক কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত এবং বিধি মোতাবেক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং অর্পিত সকল দায়িত্ব সম্পাদনে নিয়োজিত, ব্যতীত সবাই শ্রমিক।

২০. 'আইনের প্রাধান্য' বিষয়ক ধারা ২ক শ্রম আইনে সংযোজন। ধারা ২ক: আইনের প্রাধান্য আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধি ও আইনের অধীন প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।

২১. শ্রম আইনের ধারা-৩ক (ঠিকাদার সংস্থার রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স) সংশোধন। ঠিকাদার সংস্থার রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স (এবং অত্র ধারায় যেখানে যেখানে 'রেজিস্ট্রেশন' শব্দ রয়েছে; তার পরে 'এবং লাইসেন্স' শব্দদ্বয় যুক্ত হবে)। উপধারা-৫: শ্রমিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান উহার স্থায়ী জনবল কাঠামোর কোনো পদে ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে কোনো শ্রমিক বা কর্মী নিয়োগ করিতে পারিবেন না। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানের সমুদয় কাজ সম্পাদনের জন্য আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করা (সার্ভিস কন্ট্রাক্ট) যাবে না। সকল ক্ষেত্রেই নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হিসেবে গন্য হবে।

২২. প্রতিটি কারখানা-প্রতিষ্ঠানে 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার' স্থাপনে শ্রম আইনের ধারা ৯৪ (১) সংশোধনী। ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার/মাতৃ দুখ কর্ণার ও শিশু কক্ষ: ধারা ৯৪ (১)- সাধারণত: ১ থেকে ৩৯ জন নারী শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এরূপ প্রত্যেক কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে এক বা একাধিক ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার/মাতৃ দুগ্ধ কর্ণার; এবং ৪০ বা ততোধিক নারী শ্রমিক নিয়োজিত আছেন এরূপ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে তাহাদের ছয় বৎসরের কম বয়সী শিশু সন্তানগণের ব্যবহারের জন্য এক বা একাধিক উপযুক্ত কক্ষের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে।

২৩. শ্রম আইনের ধারা ১১৮ (জাতীয় দিবসে ছুটি ও উৎসব ছুটি) সংশোধনী। প্রত্যেক শ্রমিককে প্রতি পঞ্জিকা বৎসরে এগার দিনের মজুরিসহ উৎসব ছুটি, জাতীয় দিবসে ছুটি ব্যতীত, মঞ্জুর করিতে হইবে।

২৪. শ্রম পরিদর্শক/সহকারী মহাপরিদর্শক কর্তৃক দোকানের লাইসেন্স ইস্যুর বিধান প্রবর্তন।

২৫. শ্রম আইনের ধারা-৩৪৮ (NOSHTRI) সংশোধনী।

ধারা ৩৪৮-প্রশিক্ষণ ও গবেষণা: (১) সরকার, এই আইনের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা:

(ক) (i) 'সবার জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ' সৃষ্টির লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অধীন স্থাপিত আন্তর্জাতিক মানের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (NOSHTRI) এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। দেশের সকল কর্মক্ষেত্রে নিরাপদ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করিবে।

(ii) শ্রমিক নিয়োগকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক অথবা কোনো শ্রমিক সংগঠনের কর্মকর্তাকে (NOSHTRI) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহত হইলে উক্তরূপ প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করিতে তাহার প্রতিষ্ঠান বাধ্য থাকিবে।

(iii) এছাড়াও এই উদ্দেশ্যে কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক, শ্রমিক সংগঠন কর্তৃক নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে উক্তরূপ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করিতে পারিবে।

(খ) সরকার, শ্রমিকগণের ও মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়নের সকল পর্যায়ের সদস্যগণকে এই আইনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তরের অধীন স্থাপিত শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহত হইলে, শ্রমিকগণের ও মালিকগণের ট্রেড ইউনিয়নের যে কোনো পর্যায়ের সদস্য উক্তরূপ প্রশিক্ষণে

অংশগ্রহণ করিবেন।

(গ) উক্তরূপ প্রশিক্ষণের ব্যয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অনুপাতে ক্ষেত্রমতে সরকার অথবা মালিক বহন করিবেন।

(ঘ) উক্তরূপ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ব্যয়িত সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনে ব্যয়িত সময় বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সরকারের নিকট হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পন্থায় অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এই আইন, বিধি ও এতদ্দসংক্রান্ত বিষয়ের উপর, স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে, সরাসরি বা অনলাইনে যে ভাবেই হউক না কেন, প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে পারিবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, মালিকের অনুমতি ব্যতীত উক্তরূপ প্রশিক্ষণে কোনো ব্যক্তির অংশগ্রহণের জন্য ব্যয়িত সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনে ব্যয়িত সময় বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ট্রেড ইউনিয়ন বা ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন বা কোনো কনফেডারেশন তার ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যদের জন্য এই আইনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিতে পারিবে, এবং মালিকের অনুমতিক্রমে উক্তরূপ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) (ঘ) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

২৬. ডাইফ হতে ইস্যুকৃত সকল লাইসেন্স (আউটসোর্সিং লাইসেন্স ব্যতীত) এর মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর করার নিমিত্তে শ্রম বিধিমালার বিধি ৩৫৫ এর বিধান সংশোধনী।

আদালত বিষয়ক সংস্কার প্রস্তাব:

১. পলাতক আসামীকে আদালতে হাজির করার নিমিত্তে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জন্য বিজ্ঞ শ্রম আদালত বরাবর নির্দিষ্ট খাতে বাজেট বরাদ্দ।

২. শ্রম আদালত ও শ্রম আপিল ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণসহ শ্রম আদালতকে মহামান্য সুপ্রিমকোর্টের অধীনে সরাসরি বিচার বিভাগের আওতায় আনয়ন।

৩. মামলার শুনানিতে বাদীর হাজিরা নিশ্চিতকল্পে বাদী বরাবর সমন জারি ও তা যথাযথভাবে বিলিকরণের বিধান নিশ্চিতকরণ।

দপ্তর বিষয়ক সংস্কার প্রস্তাব:

১. ডাইফের লাইসেন্সকে কারখানা-প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন শুরুর পূর্বশর্ত করা তথা লাইসেন্সের গুরুত্ব বৃদ্ধিকরণ।

২. সংকটকালে শ্রমিকদের বকেয়া পাওনাদি দ্রুত পরিশোধের জন্য সরকারি তদারকিতে কারখানার ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের ০১ (এক) মাসের মজুরির সমপরিমাণ অর্থ আপদকালীন ফান্ডে জমা রাখার জন্য বিশেষ তহবিল/আপদকালীন ফান্ড গঠন করা যেতে পারে।

৩. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের জমি DIFE ও DOL এর মধ্যে সুষ্ঠুবন্টন নিশ্চিতকরণসহ ডাইফের (প্রধান কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়) জন্য নিজস্ব ভবন স্থাপন করা যেতে পারে।

৪. আইএলও কনভেশন ৮১ এবং ৮৭ ও ৯৮ অনুসারে DIFE'র জন্য শ্রম আইন, ২০০৬ এবং DOL'র জন্য আলাদা আইন- শিল্প সম্পর্ক আইন (ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন ও শিল্প বিরোধ নিস্পত্তির জন্য) প্রণয়ন করা যেতে পারে।

৫. ডাইফে বিশেষ 'এনফোর্সমেন্ট টিম' গঠন করা যেতে পারে।

৬. ডাইফে Labour Inspection Intelligence Unit গঠন করা যেতে পারে।

৭. সহকারী শ্রম পরিদর্শক, নমুনা সংগ্রহকারী, সহকারী আইন কর্মকর্তা ও কোর্ট ইন্সপেক্টর এর পদ সৃজন করা যেতে পারে।

৮. ডাইফের পরিদর্শকদের জন্য অফিসিয়াল কটি ও ওয়াকিটকি প্রচলন করা যেতে পারে।

৯. মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনে অফিস প্রধানের জন্য পরিবহন হিসেবে জিপ গাড়ি এবং পরিদর্শনের জন্য মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১০. ডাইফ পরিদর্শকগণের পদের মান উন্নয়ন। নিম্নোক্তরূপে ডাইফ পরিদর্শকগণের পদের মান উন্নয়ন করা অতীব জরুরি-

মহাপরিদর্শক পদ: গ্রেড-১

যুগ্মমহাপরিদর্শক পদ: গ্রেড-৪

উপমহাপরিদর্শক পদ: গ্রেড-৫

সহকারী মহাপরিদর্শক পদ: গ্রেড-৬

শ্রম পরিদর্শক পদ: গ্রেড-৯ এ উন্নীতকরণ; এবং সহকারী শ্রম পরিদর্শক, নমুনা সংগ্রহকারী, সহকারী শ্রম পরিদর্শক ও কোর্ট ইন্সপেক্টর পদ গ্রেড-১০ হিসেবে সৃজন করা প্রয়োজন।

১১. শ্রম পরিদর্শক পদ হতে সহকারী মহাপরিদর্শক পদে পদোন্নতির ফিডার পদের সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও অদূর ভবিষ্যতে পদোন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই; সুতরাং, পদোন্নতি নীতিমালার কার্যকর প্রয়োগ জরুরি।

১২. বৈষম্য দূরীকরণে DIFE-এ কর্মরত গ্রেড-১০ এর সকল পদের একটি বৈষম্যহীন একক ও অভিন্ন জ্যেষ্ঠতা তালিকা প্রণয়নপূর্বক 'সহকারী মহাপরিদর্শক' পদটি 'কালারলেস' হিসেবে সংশোধন করা অতীব জরুরি।

১৩. ডাইফের স্বাস্থ্য অধিশাখার অধীন পেশাগত স্বাস্থ্য ও ব্যাধি/ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলথ ইউনিট গঠন। ক. পেশাগত ব্যাধি চিহ্নিতকরণ, তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ;

খ. পেশাগত ব্যাধির সৃষ্টিকারী হেলথ হ্যাজার্ড চিহ্নিতকরণ;

গ. স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা;

ঘ. বিভিন্ন কারখানায়/ফ্যাক্টরী স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে নেটওয়ার্ক স্থাপন;

ঙ. শ্রমিকের পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা;

চ. পেশাগত ব্যাধি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির তালিকা প্রস্তুতকরণ;

ছ. পেশাগত স্বাস্থ্য ও ব্যাধি বিষয়ক গবেষণা;

জ. পেশাগত ইঞ্জুরীর তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেজ প্রস্তুতকরণ; এবং

ঝ. বাংলাদেশ শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালায় স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন/বিধি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৪. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের অর্থের মাধ্যমে শিশুশ্রম পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৫. ডাইফের পরিদর্শকদের জন্য স্থায়ী ভ্রমণ ভাতা প্রবর্তন করা যেতে পারে।
১৬. ডাইফের পরিদর্শকদের জন্য মাসিক ঝুঁকি ভাতা প্রবর্তন করা যেতে পারে।
১৭. দেশে এক ও অভিন্ন শ্রম আইন- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ চালু রাখা যেতে পারে।
১৮. প্রধান কার্যালয়ের অর্গানোগ্রাম পরিবর্তন: ১. প্রশাসন অধিশাখা, ২. সাধারণ অধিশাখা (শ্রম ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট শাখা এই অধিশাখায় রাখা), ৩. সেফটি অধিশাখা, ৪. স্বাস্থ্য অধিশাখা, ৫. ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লায়েন্স অধিশাখা, ৬. এনফোর্সমেন্ট অধিশাখা, ৭. লাইসেন্সিং অধিশাখা, ৮. আইন ও বিধি অধিশাখা, ৯. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অধিশাখা, ১০. পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অধিশাখা, ১১. অর্থ অধিশাখা, ইত্যাদি অধিশাখায় প্রধান কার্যালয়কে বিভক্ত করা। অধিশাখার দায়িত্বে থাকবেন যুগ্মমহাপরিদর্শক (গ্রেড ৪) এবং অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মকর্তাদের মধ্য হতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা। প্রধান কার্যালয়ে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (গ্রেড ৩) এর দপ্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করে যেমন- অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অর্থ ও পরিকল্পনা), অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (সাধারণ), অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা), অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (আইন ও আদালত), অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (নারী, শিশু ও আন্তর্জাতিক), ইত্যাদি দুইটি অধিশাখার বিপরীতে একটি অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (গ্রেড ৩) দপ্তর সৃজন করা এবং অধিদপ্তরের নিজস্ব কর্মকর্তাদের হতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা।
১৯. দেশের ৬৪ জেলায় অফিস, বিভাগীয়/আঞ্চলিক অফিস ও শ্রমঘন জেলাগুলিতে দপ্তরের একাধিক কার্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।
২০. ঢাকা বা তার পার্শ্ববর্তী জেলা (গাজীপুর/নারায়ণগঞ্জ), চট্টগ্রাম ও খুলনায় NOSHTRI এর আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা যায়।
২১. দেশের শ্রম খাতের ৭ কোটি ৩০ লক্ষ শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি ও অধিকার নিশ্চিতে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) সুরক্ষা নিশ্চিতে আইএলও কনভেনশন ১৫৫ ও ১৮৭ অনুস্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ অতীব জরুরি।
২২. NOSHTRI-তে একটি Legal Research Cell গঠন করা যেতে পারে।
২৩. "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর" এর পরিবর্তে "শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তর (Department of Labour Inspection)" নামকরণ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ গার্মেন্টিস শ্রমিক পরিষদ

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন হিসাবে সকল ক্ষেত্রে ০১ টি মাত্র শ্রম আইন হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা।
২. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ মোতাবেক সকল প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিশেষ করে গৃহ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, অটো রিকশা শ্রমিক, চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিকদের কে শ্রমিক অধিকারের স্বীকৃতি ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা ২০১৫ সংশোধন করা।
৩. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কে শ্রম বান্ধব শ্রম আইন হিসাবে সংশোধন করা।

- ধারা ২৩ এর (৪) এর (খ) ও (ছ) মোতাবেক কোনো শ্রমিক বা কর্মচারী বরখাস্ত হলে তাকে প্রতি পূর্ণ বছরের কাজের জন্য ১৫ দিনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা। অন্য কোনো কারণে বরখাস্ত হলে তাকে প্রতি পূর্ণ বছরের কাজের জন্য ১৫ দিনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
- ধারা ২৪ এর (১) এর (ঘ) মালিক ও শ্রমিকের সম সংখ্যক প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা, সেখানে শ্রমিক চাইলে তার পছন্দ অনুয়ায়ী বহিরাগত কাউকে কমিটির সদস্য মনোনীত করতে পারবেন।
- ধারা ২৭ চাকরি হইতে ইস্তফা ৩০ দিন এর সময় নির্ধারণ করা, ইস্তফাকৃত শ্রমিক ও কর্মচারী কে প্রতি পূর্ণ বছরের জন্য ৩০ দিনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
- ধারা ২৭ এর (৩-ক) বিলুপ্ত হইবে। এবং ৬০ দিনের মজুরি কর্তন বাতিল করে শুধু মাত্র চাকরি হইতে অবহাতি নিয়েছেন স্থাপিত হবে। ইস্তফাজনিত সকল সুবিধা প্রাপ্য হইবেন মর্মে পরিস্কার ভাষায় লিখতে হবে।
- সকল সেক্টরের শ্রমিক ও কমচারীদের জন্য সরকারি আধা-সরকারি স্বায়িত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় উৎসব ছুটি প্রদান করা।
- ধারা ৪৬ প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার এবং প্রদানের দায়িত্ব: ১৬ সপ্তাহের ছুটি বাতিল করিয়া ৬ মাস স্থাপিত করা।
- ধারা ৪৭। প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা পরিশোধ সংক্রান্ত পদ্ধতি।-প্রস্তাবিত (ঘ) দফায় উল্লেখিত "অনুপস্থিত থাকিবার" শব্দগুলোর স্থলে "প্রসূতিকালীন ছুটির" শব্দগুলো উল্লেখ করার এবং একইসাথে অত্র দফার শর্তাংশ বিলুপ্ত করারও সুপারিশ করছি।
- ধারা ২। সংজ্ঞাসমূহঃ ৬৫ এর উপধারা (৬৫) এ উল্লেখিত", তদারকি কর্মকর্তা" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।
- উৎসব ভাতা প্রতি বছর ঈদউল ফিতর ও ঈদুল আযাহা উপলক্ষে সকল সেক্টরে বাধ্যতামূলক শ্রমিক ও কর্মচারী কে মোট মজুরি মোতাবেক ২টি ঈদে ০২টি ভাতা প্রদান করা হবে। কোনো মালিক চাইলে বেশি দিতে পারবেন, তবে কম দেওয়া যাবে না।
- ধারা ১২৪ (ক) আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে মজুরিসহ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ: কোনো কারখানার মালিক শ্রমিকের পাওনাদি পরিশোধ না করিলে কলকারখানা মহাপরিদর্শক বা দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা শ্রম আইনের লংঘনের জন্য ৩০৭ ধারায় মামলা ফাইল, অর্থদণ্ড ও ৬ মাসের জেল প্রদানের জন্য লেবার কোর্টে মামলা করার ক্ষমতা প্রদান।
- শ্রম আইন লংঘনকারী বিশেষ করে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করার জন্য ৩০৭ ধারা কে ২০০৬ ন্যায় আনতে হবে। এবং জেল ও জরিমানা বলবৎ করতে হবে।
- বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড চালুর বিধান করা।
- কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ (৫ভাগ) ১০০ ভাগ পোশাক রপ্তানিকারক কারখানার শ্রমিকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা।
- সকল প্রাতিষ্ঠানিক কারখানা ও প্রতিষ্ঠান এ কর্মরত শ্রমিকদের গ্রাচুইটি ও পেনশন ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা।
- কারখানা স্থানান্তর বিষয়ে ৫ কিলোমিটার ও যে শ্রমিক উক্ত স্থানান্তর এলাকায় যাবে না, তাদের শ্রম আইনের ২০ ধারা মোতাবেক ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
- বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধি প্রতি বছর ২০ ভাগ করা।

- নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধি প্রতি তিন বছর পর পর করা।
- ১৮) বাৎসরিক ছুটির হিসাব ২৬ দিন দিয়ে করা।
- ১৯) রাত্রিকালীন নারী শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করালে অনুমতি ও নিজ দায়িত্বে বাড়ী ফেরার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান কে নিতে হবে।
- রাত্রিকালীন নারী শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করালে অনুমতি ও বাড়ী ফেরার দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান কে নিতে হবে।
- শিশু ও কিশোর শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা।
- শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড আবেদন সহজীকরণ করা।
- সেন্টাল ফান্ড শ্রমিক নিজে আবেদন করার সুযোগ রাখা।
- সকল ক্ষতিপূরণ মোট মজুরির ন্যায় হিসাব করার ব্যবস্থা রাখা।
- মজুরি বোর্ড গঠন ও সেক্টরের শ্রমিক প্রতিনিধি মনোনয়ন রাজনৈতিক ও মালিক হস্তক্ষেপ মুক্ত রাখা।
- শ্রম আদালতে নির্ধারিত সময়ে মামলা নিষ্পত্তি করা।
- শ্রম আদালতে ও মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে সকল সেক্টরের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- কারখানা ও শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিধানে সরকারি সকল পক্ষকে একত্রে কার কাজ করার বিধান ও নীতিমালা করা।
- নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানী বন্ধে মহামান্য হাই কোর্টেও রায় নির্দেশনা মোতাবেক শ্রম আইনে অর্ন্তভূক্ত করা।
- ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প সম্পর্ক বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজিকরণ ও ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন এর বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজিকরণ করা।
- ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর দেশি-বিদেশি অর্থ গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত পদ্ধতি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।
- অর্থ আনায়ন, গ্রহণ এবং অনুমোদন প্রক্রিয়া ও হিসাব বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করে শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত করা। উক্ত বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা।
- আইএলও কনভেনশন-১২১, ১৮৯, ১৯০ অনুস্বাক্ষর করা।
- জাতীয় নিম্নতম মজুরি কমিশন গঠন ও জাতীয় নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা।
- দেশের শিল্প এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে শিল্প পুলিশ বিলুপ্তি করে, মালিক-শ্রমিক-শ্রমিক প্রতিনিধি ও সরকার এর সমন্বয়ে শিল্প সম্পর্ক সেল তৈরি করা ও সামাজিক সংলাপ জোরদার করা।
- বিজিএমইএর কর্মচারী দ্বারা সিন্ডিকেট তৈরি করে শিল্পে অশান্তি, অসন্তোষ তৈরি করে বিজিএমইএ লেবার সেল ও ক্রাইসিস কমিটি পূর্ণ গঠন করা।
- বিজিএমইএ এর দায়িত্বে থাকা ডাটা বেস ডাইফ কে ফিরিয়ে দিতে হবে। এবং সকল কালো তালিকা বাতিল করতে হবে।
- আনসার, পুলিশ ও যৌথবাহিনী দ্বারা গুলিতে আহত ও নিহত শ্রমিকদের আইএলও কনভেনশন হিসাবে ক্ষতিপূরণ ও তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি প্রদান করা।
- যে সকল মালিকদের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতায় শ্রমিক মজুরি থেকে বঞ্চিত ও আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছে তাদের কে আইনের আওতায় আনা।
- কোনো কারণে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে শ্রমিকদের শ্রম আইন মোতাবেক সকল পাওনাদি মালিক ও সরকার ব্যবস্থা করবেন।
- সরকার প্রজ্ঞাপন দ্বারা একই ব্যক্তিকে একই সাথে এনজিও এবং ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠান প্রধান/ প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন

১. বাংলাদেশের শ্রম আইনকে সকল সেক্টরের জন্য ১টি শ্রম আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;
২. শ্রম আইন ২০০৬ বিধিমালা ২০১৫ সংশোধন একটি শ্রমবান্ধব আইন করা;
৩. শ্রমিক বিরোধী সকল কালো অধ্যায় সংশোধন ও বাতিল করা;
৪. ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন সহজিকরণ পদ্ধতি এবং ফেডারেশনের নির্বাচনী সহজিকরণসহ সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা;
৫. আইএলও কনভেনশন ১৯০ অনুস্বাক্ষর করা;
৬. সকল শ্রমিকদের জন্য একটি জাতীয় নুন্যতম মজুরি ঘোষণা এবং জাতীয় মজুরি বোর্ড গঠন করা;
৭. মাতৃত্বকালীন ছুটি সুবিধাসহ ০৬ মাস করা;
৮. জেলা-উপজেলায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন সহজিকরণ করা এবং শ্রমিকদের জেলা-উপজেলায় কাজে নিয়োজিত হওয়ায় সহজিকরণ পদ্ধতি করা;
৯. শ্রমিক স্বার্থ রক্ষার্থে সকল সংগঠনের সমন্বয়ে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা;
১০. শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরিতে উদ্যোগ গ্রহণ;
১১. বেআইনিভাবে কারখানা বন্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি হলে সাধারণ শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের নামে মামলা হয়, কিন্তু মালিকের নামে কোনো মামলা হয় না। সু-বিচারের লক্ষ্যে কারখানার মালিককেও মামলা প্রদানের মাধ্যমে আইনের আওতায় আনা;
১২. বাংলাদেশে বেকারত্বের হার বেশি হওয়ায় নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ

১. বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যূনতম জাতীয় মজুরি নির্ধারণের লক্ষ্যে জাতীয় মজুরি কমিশন গঠন করা।
২. শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের পরিবারের পুষ্টিহীনতা দূর করার লক্ষ্যে প্রত্যেক শ্রমিক পরিবারের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা।
৩. সকল কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অন্যথায় বেকার শ্রমিকদের বেকার ভাতার ব্যবস্থা করা।

৪. পরিবহন শ্রম সেক্টরে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নির্মূল করা।
৫. শ্রম অধিদপ্তরকে দুর্নীতি ও শ্রমিক হয়রানী মুক্ত করা।
৬. রাষ্ট্রের সকল নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
৭. শ্রমিকদের জন্য সরকারি হাসপাতালে প্যাথলজি টেস্টসহ সকল চিকিৎসা সম্পূর্ণ ফ্রি করা।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, চট্টগ্রাম জেলা

১. বন্দর সম্পর্কিত শ্রম আইনের ধারা ১৮৫ (ক) বাতিল পূর্বক আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
২. বন্দরে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দিতে হবে।
৩. বন্দরসহ সংশ্লিষ্ট কোনো প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং ও চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক নিয়োগ নিষিদ্ধ করতে হবে।
৪. বন্দর সংশ্লিষ্ট সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের পেনশন, গ্র্যাচুয়িটি বোনাস, স্ব-বেতনে ছুটি, দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সহ সকল আইনানুগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
৫. ২৫/১০/২০১০ ইং সালের আন্তঃ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে সমঝোতা স্মারক (MOU) চুক্তি মোতাবেক ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে শ্রমিক কর্মচারীদের বাই রোটেশন বুকিং এর ব্যবস্থা করা।

বিউটি পার্লার শ্রমিকদের সুপারিশমালা:

১. বিউটি পার্লার শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয় পত্র, উপস্থিতি কার্ড রেজিস্ট্রার নিশ্চিত করতে হবে, যা তাদের চাকরির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় এবং চাকরির নিরাপত্তার জন্য আবশ্যক।
২. শ্রমিকদের কাজের মান এবং পরিশ্রমের ভিত্তিতে একটি ন্যায্য মজুরি কাঠামো প্রবর্তন করা দরকার। বর্তমান মজুরি অত্যন্ত কম এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিউটি পার্লার শ্রমিকদের সক্রিয় প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে বিউটি পার্লার শ্রমিকদের এর জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করতে হবে।
৩. কর্মস্থলের অবস্থা, কর্মীর অধিকার, সুযোগ সুবিধা চিহ্নিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে সুস্পষ্ট ডাটাবেজ থাকা আবশ্যক।
৪. ছাঁটাই ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যমান ছাঁটাই প্রক্রিয়ার বিলুপ্তি।
৫. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে বিউটি পার্লার শ্রমিকদের তথ্য জাতীয় ডাটাবেজ থেকে যাচাই করতে হবে।
৬. স্বাস্থ্য সুরক্ষা: বিউটি পার্লারের শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করতে হবে, যাতে তারা অসুস্থ হলে চিকিৎসা সুবিধা পেতে পারেন। নারী শ্রমিকদের প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সকল ক্ষেত্রে মার্কেট শপগুলোতে কর্মীদের জন্য আলাদা ওয়াশরুমের ব্যবস্থা করতে হবে। পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে কর্মীর চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকতে হবে এছাড়া সরকারকে OSH ঘাটতি চিহ্নিতকরণে কর্মস্থলে পেশাগত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত একটি পূর্নাঙ্গ ম্যাপিং করতে হবে, যা OSH এর ক্ষেত্রে ঘাটতি নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী পরবর্তি পদক্ষেপ নির্ধারণে সহায়ক হবে। মালিকদের বাধ্যতামূলক PPE এর ব্যবস্থা করতে হয়ে।
৭. এরিয়া ভিত্তিক ডে- কেয়ার এর ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. পেনশন ব্যবস্থা: শ্রমিকদের ভবিষ্যতের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য একটি পেনশন বা সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা চালু করা উচিত সার্বজনীন পেনশন স্কিমে অন্তর্ভুক্তি সহজ করতে হবে।
৯. কর্মক্ষেত্রে মানসিক নিপিড়নসহ যেকোনো ধরনের হয়রানি থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
১০. আইনি সহায়তা: শ্রমিকদের জন্য আইনি সহায়তা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো জরুরি।
১১. ILO কনভেনশন ১৬১,১৮৩,১১০ সমূহ অনুসমর্থনের ব্যবস্থা করতে হবে। ILO কনভেনশন, বাংলাদেশ সংবিধান প্রণিত রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি, সার্বজনিন মানবধিকার ঘোষণা ও আন্তর্জাতিক শ্রমমান পর্যালোচনা করে এর সাথে শ্রম আইন ও বিধিমালার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
১২. বিউটি পার্লার কর্মীদের সুস্পষ্ট ডাটাবেজ তৈরি করতে হবে।
১৩. দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ: দক্ষতা উন্নয়নে নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মালিক এবং সরকারের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখতে হবে। বিউটি পার্লার শ্রমিকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন করতে হবে, যাতে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা তাদের পেশায় উন্নতি করতে পারে। প্রশিক্ষণ শেষে শ্রমিকদের সার্টিফিকেট প্রদান করে তাদের পেশাগত মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন

১. গণঅভ্যুত্থানে শহীদ শ্রমিকসহ সব হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে হবে এবং আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে। ২০২৩ মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে ৪ জন শ্রমিক হত্যার বিচার ও শ্রমিকদের নামে করা দমনমূলক সব মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে শ্রমিক আন্দোলনে ২ জন শ্রমিক হত্যার বিচার করতে হবে।
২. শ্রম আইন সংস্কার করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন করা। শ্রম আইন সংস্কারের ক্ষেত্রে আইএলও কনভেনশন, বাংলাদেশের সংবিধান, জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বীকৃত শ্রমিক অধিকার শ্রম আইনে পুরোপুরি নিশ্চিত হচ্ছে কিনা, তা দেখতে হবে। এসব আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও কনভেনশনের স্বীকৃত অধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক ধারা বাতিল করতে হবে। শ্রম আইন বাস্তবায়ন করার ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো মাথায় নিয়েই সুপারিশ প্রণয়ন করতে হবে। আবার শ্রম আইন সংস্কারের পাশাপাশি, তা বাস্তবায়নের জন্য কারখানা পরিদর্শক, শ্রম আদালতসহ যেসব প্রতিষ্ঠান আছে, তারও প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

৩. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় আনতে হবে।

৪. শ্রম আইনের ২৩, ২৬ ও ২৭ (৩) ধারার অপব্যবহার করে শ্রমিকদের কর্মচ্যুত ও ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের মতপ্রকাশের এবং সংগঠিত হওয়ার অধিকার সংকুচিত করা হয়েছে। এ ধরনের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল করতে হবে।

৫. শ্রম আইনে সকল শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার এবং নিজ পছন্দের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার থাকার কথা বলা হলেও শ্রম আইনের ১৭৯, ১৮০ ধারায় কৌশলে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তিকে নানা শর্তের বেড়াজালে প্রায় অসম্ভব করে তোলা হয়েছে।

ক) বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮ অনুসারে, কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করতে চাইলে, শ্রমিকদের শতকরা ২০ ভাগ শ্রমিককে ইউনিয়নের সদস্য হতে হবে। এ কঠিন শর্ত দিয়ে বাস্তবে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনকেই বাধাগ্রস্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে শতাংশের শর্ত তুলে দিতে হবে।

খ) ১৭৯ ধারায় বলা হয়েছে, একটি প্রতিষ্ঠানে তিনটির বেশি ইউনিয়ন থাকতে পারবে না। এবং ৩৫ জনের বেশি ইউনিয়ন কর্মকর্তা থাকতে পারবেন না। বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থিত আইএলও কনভেনশন ৮৭অনুযায়ী, একটি প্রতিষ্ঠানে কয়টি ইউনিয়ন থাকবে বা কতজন কর্মকর্তা হবেন, তা শ্রমিকরাই নির্ধারণ করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রমিকদের সে অধিকার খর্ব করা হয়েছে, ফলে এটি বাতিল করতে হবে।

গ) ১৮০ (খ) ধারা অনুযায়ী, ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকর্তা ও সদস্যকে ঐঐ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক হিসাবে নিয়েজিত বা কর্মরত থাকতে হবে। অর্থাৎ কারখানায় চাকরি করেনা, এরকম বাইরের আইন জানা, দক্ষ, শ্রমিক আন্দোলনে অভিজ্ঞ কাউকে শ্রমিকরা তাদের ইউনিয়নের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করতে পারবেন না। অথচ মালিকদের সমিতির ক্ষেত্রে এরূপ কোনো বিধি-নিষেধ নেই, যা বৈষম্যমূলক। এর মাধ্যমে নেতা নির্বাচন ও সংগঠন করার অধিকার খর্ব করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থিত আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ পরিপন্থী।

ঘ) শ্রম আইনে ২০৫ ধারায় যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নেই, সেখানে তা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী কমিটিকেই ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসাবে হাজির করা হয়েছে। অথচ মালিক-শ্রমিকের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত তথাকথিত অংশগ্রহণকারী কমিটি কখনোই ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হতে পারে না। শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হিসেবে অংশগ্রহণকারী কমিটি গঠনের ধারাটি বাতিল করতে হবে।

ঙ) ধারা ১৯৬ এর মাধ্যমে যখন তখন ট্রেড ইউনিয়ন বন্ধ করার সুযোগ রাখা হয়েছে। এ ধারা সংশোধন করতে হবে।

চ) ইপিজেডে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে।

৬. শ্রম আইনে জাতীয় নিম্নতম মজুরির বিধান যুক্ত করতে হবে এবং জাতীয় নিম্নতম মজুরি কমপক্ষে ২০,০০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। প্রকৃত শ্রমিক প্রতিনিধিদের যুক্ত করে জাতীয় নিম্নতম মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন করতে হবে। গার্মেন্টসে ন্যূনতম মজুরি ২৫,০০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

৭. আইএলও কনভেনশন ও হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী শ্রম আইনে ক্ষতিপূরণের ধারা সংশোধন করতে হবে। শ্রম আইনের ১৫১ ধারা অনুসারে, কোনো শ্রমিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় জখমে মৃত্যু বরণ করলে, তার পরিবার ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। কোনো শ্রমিক দুর্ঘটনায় স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গেলে, উক্ত শ্রমিক ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবে। এ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক পরিবারের প্রতি চরম উপহাসের সামিল। আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুযায়ী লস অব ইয়ার আর্নিং অথবা সমগ্র কর্মযোগ্য জীবনের আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণের বিধান এবং রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত কমিটির নিহত শ্রমিকের জন্য ২০ লক্ষ টাকা এবং দুটি অঙ্গ হারিয়েছেন এমন শ্রমিককে ১৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবার সুপারিশ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করতে হবে।

৮. সব সেক্টরে মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস (বেতনসহ) নির্ধারণ করতে হবে।

৯. শ্রম আইন অমান্য করার ক্ষেত্রে, মালিকের দণ্ড ও জরিমানার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

১০. শ্রম আইনে উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম আদালত স্থাপন করার কথা বলা হলেও, সারা দেশে মাত্র ১০টি শ্রম আদালত আছে। পর্যাপ্ত আদালত, বিচারক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী সংকটে বিচারে দীর্ঘসূত্রিতা ঘটে। শ্রম আদালতে মামলা দায়েরের মোট সর্বোচ্চ ৫ মাসের মধ্যে রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকলেও, বছরের পর বছর শ্রম আদালতে মামলা ঝুলে থাকে, যে কারণে শ্রমিক মামলা পরিচালনার সামর্থ্য ও আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এজন্য শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রয়োজনীয় বিচারক ও আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিতে হবে এবং শ্রমিকের স্বল্পসময়ে, হয়রানিমুক্ত বিচার পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে।

১১. ঠিকাদারি বা আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ বাতিল করতে হবে।

১২. ইপিজেড শ্রম আইন বাতিল করে ইপিজেড শ্রমিকদের বাংলাদেশ শ্রম আইনের আওতায় আনতে হবে। এক দেশে দুই আইন চলতে পারেনা।

১৩. ক) চা শ্রমিকরা বাংলাদেশ শ্রম আইনের আওতাধীন হলেও, তারা অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের মতো একই সুরক্ষা ভোগ করে না। অন্যান্য শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি থাকলেও চা-শ্রমিকদের নেই। অন্যান্য শিল্পে কর্মরত শ্রমিকরা যেখানে ১৮ দিন কাজ করে এক দিনের অর্জিত ছুটি পান, সেখানে চা-শ্রমিকরা পান ২২ দিন কাজ করে। চা শ্রমিকদের জন্য গ্র্যাচুইটি নিশ্চিত করতে শ্রম আইনের ২৮ ধারা সংশোধন, নৈমিত্তিক ছুটির বিধানে ১১৫ ধারা সংশোধন, মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি নিশ্চিতে ১১৭ ধারা সংশোধন, চা শ্রমিকদের বাসস্থান নিশ্চিতে উচ্ছেদ সংক্রান্ত ৩২ ধারা সংশোধন করতে হবে।

১৪. চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। বৈষম্যমূলক গেজেট-২০২১ বাতিল করতে হবে। চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। ২০ মে চা শ্রমিক দিবস হিসাবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে।

১৫. নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। নারী শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধে শ্রম আইনে পৃথক বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ২০০৯ সালে হাইকোর্টের এ সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

১৬. নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য মালিকদের বাধ্য করতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডিআইএফই), বিস্ফোরক অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি তদারকি প্রতিষ্ঠানের জনবল বাড়াতে হবে এবং এগুলোকে কঠোর জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে।
১৭. শ্রমিকদের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে মালিক ও পুলিশের হামলা-মামলা-নির্যাতন বন্ধ করতে হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ বিলুপ্ত করতে হবে।
১৮. শ্রম অধিদপ্তরের মাধ্যমে সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের তালিকা করে রেশন কার্ডের মাধ্যমে রেশনিং দেওয়ার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিতে হবে।
১৯. ক) রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল ধ্বংসের শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। বন্ধ ঘোষিত সকল রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল আধুনিকায়ন করে চালু করতে হবে। স্থায়ী ও বদলিসহ সকল শ্রমিকের বকেয়া বেতন-বোনাস অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে। খ) রেল, বন্দর, পানি, বিদ্যুৎ খাত বেসরকারিকরণ করা চলবে না। বিরাষ্ট্রীয়করণ, পিপিপি নীতি, লীজ প্রথা বাতিল করতে হবে।
২০. ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা-ভ্যান-মিশুক ইজিবাইকের ড্রাইভিং লাইসেন্স ও রুট পারমিট দিতে হবে এবং সড়কে চলাচলের নীতিমালা প্রকাশ করতে হবে। পুলিশি হয়রানি ও অন্যায়ভাবে জরিমানা আদায় বন্ধ করতে হবে।
২১. রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে প্রবাসী শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে।
২২. শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি, বোনাস, ছুটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, মুনাফার অংশ, কর্মস্থলে নিরাপত্তা, ক্ষতিপূরণ, মালিকের শ্রম আইন লঙ্ঘনে ন্যায্য ও দ্রুত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। সকল শ্রমিককে নিয়োগপত্র দিতে হবে। প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের সন্তানের জন্য মানসম্মত ডে কেয়ার সেন্টার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমঘন এলাকায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে মানসম্মত ডে কেয়ার সেন্টার স্থাপন করতে হবে। শ্রমিকদের হেলথ কার্ড দিতে হবে।
২৩. সরকারি খাস জমি বা রেলের ভূমিতে শ্রমজীবী মানুষের জন্য কম খরচে মানসম্মত আবাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।
২৪. শ্রমিক অঞ্চলে হাসপাতাল ও বিদ্যালয় নির্মাণ করতে হবে।
২৫. শ্রম আইনে টেক্সটাইল সেক্টরে উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় শহরের জন্য আলাদা আলাদা বেতন এই প্রথা বাতিল করতে হবে।

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

১. প্রত্যেক কারখানায় সেইফটি কমিটি কার্যকরী বাস্তবায়নে শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক-পরিদর্শনকালে শ্রমিক প্রতিনিধির উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে হবে।
২. সেক্টরওয়াইজ সেইফটি অফিসার ও কমপ্লাইন্স অফিসার আলাদাভাবে নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৩. শিক্ষা ব্যবস্থা- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ওএসএইচ এর উপরে সাবজেক্ট/টপিক বাধ্যতামূলক থাকতে হবে।
৪. ডাইফি রিপোর্টিং এন্ড ইনভেস্টিগেশন সিস্টেম পর্যলোচনা করে যুগোপযোগী করা। চেকলিস্ট রিভিউ করা এবং অংশীজনের সাথে শেয়ার করা।
৫. উচ্চঝুঁকিপূর্ণ খাতগুলো চিহ্নিত করে নিতীমালা প্রণয়ন করা।
৬. সমস্ত নীতিমালা প্রণয়ন/বাস্তবায়নে শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের অংশগ্রহন বাধ্যতামূলক করা। প্রতিনিধি মনোয়নে স্ব স্ব সেক্টরে যাদের প্রতিনিধিত্ব বেশি থাকবে তাদেরকে মনোনয়ন করা।
৭. জাতীয় পর্যায়ে সকল দুর্ঘটনায় আহত, মৃত, ক্ষতিগ্রস্থ্য শ্রমিকদের জাতীয় ডাটাবেইজ করা।
৮. দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতিপূরনের আইনের সংস্কার মিনিমাম ৫০ লক্ষ টাকা অথবা ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিককে দশ বছরের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
৯. ইআইএস প্রকল্প স্থায়ীকরণ।
১০. আইএলও কনভেনশন ১৫৫,১৮৭, ১২১, ১৯০ রেটিফিকেশনকরণ।
১১. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউশনে মোডিউল ডেভলপমেন্ট এ শ্রমিক প্রতিনিধির সাথে কনসালটেশন বাধ্যতামূলক করা।
১২. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি বাস্তবায়নে শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন।
১৩. অকুপেশনাল ডিজিজ এর তালিকা রিভিউ করা।
১৪. ট্যানারিগুলোতে কার্যকর হিউম্যান রিসোর্স বিভাগ চালু করা।
১৫. সিএসডিডিডি জার্মান সাপ্লাই চেইন এ্যাক্ট, ইউএন গাইডিং নির্দেশনা, এসডিজি লক্ষ মাত্রা নির্ধারণ, জিএসপি প্লাস সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পেক্ষাপটে বর্তমান অবস্থা এবং পরিবর্তী করণীয় নির্ধারণে শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে মনিটরিং কমিটি ও বাস্তবায়ন করা। আইএলও কনভেনশনে যাওয়ার সময় পেশাগত স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে স্টেকহোল্ডার এর সাথে কনসালটেশন করা।
১৬. ট্যানারিতে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এর জন্য উদ্ভাভিত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা।
১৭. কলকারখানার পরিদর্শন অধিদপ্তরগুলোকে আইনগত শক্তিশালি ক্ষমতা প্রদান।
১৮. কলকারখানার হটলাইন নাম্বার সকল শ্রমকিদের কাছে দৃর্শমান করা এবং জাননো। বেশি বেশি কনসালটেনশন মিটিং করা। এবং কার্যকর করণে জোনভিত্তিক গণশুনানি করা।
১৯. সরকারের দপ্তরের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য হেল্প ডেক্স চালু করা। লোকবল বাড়ানো।
২০. শ্রম আইনে দুর্ঘটনা শাস্তির বিধান বাড়ানো দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা।
২১. ট্যানারি শ্রমিকদের মিডলেভেল ম্যানেজারদের ক্যামিক্যাল এর বিষয়ে প্রশক্ষিণ দেয়া বাধ্যতামূলক করা।
২২. ট্যানারি শ্রমিকদের পিপিই পরিধান বাধ্যতামূলক করা।
২৩. প্রত্যেক শ্রমিক ও তাদের পরিবারদের স্বাস্থ্যসেবা যেকোনো হাসপাতালের সাথে সেবা নিশ্চিত করার চুক্তি বাস্তবায়ন করা।
২৪. শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জনের মাসিক পরিদর্শন নিশ্চিত করা।
২৫. শ্রমিকদের মানসিক সুরক্ষা দিতে সাইকোলজিক্যাল সেন্টার তৈরি করা।

২৬. শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী রোগের সেবা নিতে সরকারি হাসপাতালে বিশেষ সুবিধা রাখা/শ্রমিক হাসপাতাল স্থাপন করা।
২৭. ফ্যাক্টরির ভিতরে নারী শ্রমিকদের মাসিকের সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যাপকিন প্রদান ও সচেতনামূলক পরামর্শ প্রদান করা।
২৮. ডাইফির প্রতিবেদন মাসিকভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
২৯. ডাইফির ইনভেস্টেগেশনে যাওয়ার সময়ে শ্রমিক ইউনিয়ন, ফেডারেশন, ফ্যাক্টরী শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণ।
৩০. ওএসএইচ নিতিমালা প্রণয়নের সময়ে শ্রমিক অভিযোগ করলে কোনো ধরনের প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপ করলে তা বিচারের আতওয় নিয়ে আসা।
৩১. ট্যানারি শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণ এবং তাদেরকে বৈধ শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা। তাদের দায়িত্ব, সুবিধা ও ক্ষতিপূরণের লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।
৩২. জাতীয় ভিত্তিক পরিদর্শন ও সেবার মান উন্নয়নে ট্রাইপারটাইট মনিটরিং সেল গঠন করা।
৩৩. কর্মীকে নিয়োগদানের পূর্বে নিশ্চিত হতে হবে যে, সে বাংলাদেশের বৈধ নাগরিক। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করে দেখতে হবে।
৩৪. নারী কর্মীদের জন্যে মাতৃকালীন ছুটি ৬ মাস করা প্রয়োজন। ২ মাস প্রসব পূর্ব এবং ৪ মাস প্রসব পরবর্তী পূর্ণ বেতন ও সকল সুযোগ সুবিধাসহ। যদি তার সন্তানের জন্য অথবা তার নিজের শারীরিক কোনো ধরনের সমস্যা/জটিলতার কারণে ছুটির প্রয়োজন হয় তবে অর্ধেক বেতনে এই ছুটি নেওয়ার অধিকার থাকবে পরবর্তী ৬ মাস পর্যন্ত
৩৫. যদি স্বামী একই প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত থাকে তবে সে ১৫ দিনের পিতৃকালীন ছুটি পাবে, তবে শর্ত থাকবে সে তার স্ত্রীর সাথে থাকতে হবে। যদি সে, অন্য কোথাও চলে যায় তবে এই ছুটি তার জন্য প্রযোজ্য হবে না এবং বেতনও পাবে না।
৩৬. তার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্যে যেখানে অবস্থান করবেন সেই এলাকা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে অবহিত করতে হবে তার সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য।
৩৭. পরিবারের যে সকল সদস্য তার সাথে অবস্থান করবে তাদের জন্য রেশনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে চাল, আটা, ডাল, তেল, আলু, লবন ইত্যাদি।
৩৮. পারিবারিক বা শারীরিক সমস্যার কারণে যদি তাকে চাকরি হতে অব্যাহতি নিতে হয় এবং পরবর্তীতে তার সে সকল সমস্যা সমাধান হয় তবে তাকে পুনরায় চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে।

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন (বিইএফ)

১. টেকসই এন্টারপ্রাইজ, সহনশীলতা চর্চা, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃষ্টি করা;
২. দক্ষতা বৃদ্ধি করা, উৎপাদনশীলতা বাড়ানো ও ভবিষ্যতে ব্যবহার উপযোগী কর্মশক্তি গঠন;
৩. অটোমেশনের ব্যবহার, আধুনিক উদ্ভাবন ও অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিতকরণ কল্পে শ্রমিকদের সম্পৃক্তকরণ;
৪. সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিকের সুরক্ষা ও ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধকরণ;
৫. সামাজিক সংলাপ এবং যৌথ দরকষাকষির চর্চা পুনর্গঠন এবং ভালো চর্চা থেকে শিক্ষা লাভ;
৬. শ্রম আদালতের বাইরে বিরোধ নিষ্পত্তি;
৭. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্ধারণ করা;
৮. বাংলাদেশে শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠানকে (আইআরআই) শক্তিশালী করা।

গ্রিন বাংলা গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের

১. মজুরি, মজুরি কাঠামো ও বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধি:

- জীবনযাপন উপযোগী মজুরি (লিভিং ওয়েজ);
- মোট মজুরির ৭০% বেসিক হিসেবে নির্ধারণ;
- ধর্মীয় উৎসবে দুইটি বোনাস এবং পহেলা বৈশাখে বোনাস সহ বছরে মোট তিনটি উৎসব বোনাস সকল কারখানায় নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রতি দুই বছর পর পর মজুরি পুনর্নির্ধারণ;
- ১৫% বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধি ও বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধির সুনির্দিষ্ট মূলনীতি নির্ধারণ। যদি কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে জীবনযাত্রার ব্যয় উল্লেযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়, তবে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স প্রদানের বিধান থাকতে হবে।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ:

- শ্রমিকের সংজ্ঞা পরিবর্তন করে সুপারভাইজার, লাইন চিফ, এবং ফ্লোর ইনচার্জদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং তাদেরকে শ্রম আইনের অধীনে মজুরির আওতায় নিয়ে আসা।
- শিক্ষানবিশ পদ্ধতির বিলুপ্তি মজুরি ঘোষণা হতে শিক্ষানবিশ বাদ দেওয়া প্রয়োজন;
- শ্রম আইন সংশোধন: ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের (MWB) সদস্য নির্বাচন, মজুরি পুনর্নির্ধারণ সম্পর্কিত শ্রম আইনের (BLA) বিধান সমূহ সংশোধন করা প্রয়োজন। বিশেষত ন্যূনতম মজুরি বোর্ডের (MWB) স্বতন্ত্র সদস্য নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড নির্ধারণ করা আবশ্যক। মজুরি বোর্ডের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মজুরি বোর্ডের নিজস্ব গবেষণা বিভাগ প্রতিষ্ঠা
- মজুরি বাস্তবায়নে শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরের দায়বদ্ধতা: শ্রম পরিদর্শন অধিদপ্তরকে মজুরি বাস্তবায়নের বিষয়ে শ্রমিক ইউনিয়নকে নিয়মিতভাবে প্রতিবেদন দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ করা প্রয়োজন এবং এ লক্ষ্যে কৌশল নির্ধারণ আবশ্যক।

২. শ্রম আইন ও বিধিমালা:

প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ:

- শ্রমিক-বান্ধব শ্রম আইন প্রণয়ন, বিদ্যমান শ্রম আইন ও বিধিমালা সংস্কার/সংশোধন করে শ্রমিকদের অধিকার এবং স্বার্থ সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা ন্যায্য সুবিধা পান এবং কর্মক্ষেত্রে শোষণ থেকে রক্ষা পান;
- কালো আইন বিলুপ্তি;

- লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করা, শ্রম আইন ও বিধিমালাতে স্পষ্টভাবে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করতে হবে এবং লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য নিষিদ্ধ করতে হবে, যাতে নারী শ্রমিকরা নিরাপদে ও সমান অধিকারে কাজ করতে পারেন।
- বাংলাদেশ সংবিধান, সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (UDHR) এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কনভেনশনসহ মানবাধিকার সংক্রান্ত দায়বদ্ধতার (HRDD) কাঠামোর সাথে শ্রম আইন ও বিধিমালা সামঞ্জস্যপূর্ণ করা জরুরি।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ:

- একক শ্রম আইন প্রণয়ন: ইপিজেড (EPZ) এবং এসইজেড (SEZ) এলাকার শ্রমিকদেরও শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যাতে সকল শ্রমিক সমানভাবে শ্রম আইনের সুরক্ষা পান;
- বাংলাদেশ শ্রম আইনের ধারা ২৬ সংশোধন করে চাকরির নিরাপত্তা এবং শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কিত উদ্বেগ দূর করা প্রয়োজন;
- নারী শ্রমিকদের রাতের সময় কাজ করার বর্তমান বিধানের পরিবর্তন;
- মাতৃত্বকালীন সুবিধা ছয় মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা;
- প্রভিডেন্ট ফান্ড বাধ্যতামূলক করা;
- গ্রুপ বীমার জন্য কেন্দ্রীয় তহবিলের অর্থ ব্যবহার বন্ধের ব্যবস্থা করা;
- সেইফটি কমিটিতে শ্রমিক ও মালিক পক্ষের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা দুরীকরণ
- কোনো শ্রমিক Anti-union discrimination-এর শিকার হলে, ভিক্টিম যেন সরাসরি নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে তার বিধান করা

৩. চাকরির নিরাপত্তা:

প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ:

- সকল শ্রমিককে নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, উপস্থিতি কার্ড/রেজিস্টার এবং সার্ভিস বুক প্রদান নিশ্চিত করতে হবে, যা তাদের চাকরির আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির জন্য প্রয়োজনীয় এবং একইসাথে চাকরির নিরাপত্তার জন্য আবশ্যক।
- শ্রমিকদের ডেটাবেস শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের অবস্থা অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ট্র্যাক করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেস তৈরি করা প্রয়োজন।
- শ্রমিক ছাঁটাই প্রক্রিয়া পর্যালোচনা: শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, ন্যায্যতা এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যমান প্রক্রিয়ার পুনর্বিবেচনা।
- অটোমেশনজনিত চাকরি হারানো হতে সুরক্ষা প্রযুক্তির কারণে চাকরি হারানোর ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শ্রমিকদের পুনরায় প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি।
- দক্ষতা উন্নয়ন: গার্মেন্টস শিল্পের পরিবর্তিত চাহিদার সাথে শ্রমিকদের মানিয়ে নেওয়ার জন্য নতুন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ:

- নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলি লঙ্ঘনের জন্য বিদ্যমান শাস্তির বিধানসমূহ পর্যালোচনা এবং শাস্তি পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ।
- সরকারি উদ্যোগে একটি পূর্ণাঙ্গ ডেটাবেস তৈরি, যেখানে প্রতিটি শ্রমিকের জন্য একটি ইউনিক আইডি এবং রিয়েল-টাইম ডেটা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার সুবিধা থাকবে। এছাড়া, এই ডেটাবেস ব্যবহারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর যা এসওপি প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে গোপনীয়তা রক্ষা এবং ডেটা শেয়ারিং/বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- এমন একটি ব্যবস্থা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে কারখানাগুলো তাদের অটোমেশন/প্রযুক্তিগত পরিবর্তন পরিকল্পনা, এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং দক্ষতার চাহিদা আগে থেকেই প্রকাশ করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।
- RMG শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষায়িত ইন্সটিটিউট গড়ে তোলা এবং তাদের দক্ষতার স্যার্টিফিকেশন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

৪. সংগঠনের স্বাধীনতা (Freedom of Association) এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার:

প্রস্তবিত পদক্ষেপসমূহ:

- ট্রেড ইউনিয়ন (TU) গঠনের স্বাধীনতা।
- ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য ২০ শতাংশ শ্রমিকদের সমর্থনের বিধান বাতিল করে আইএলও সনদ অনুযায়ী গার্মেন্টস শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ প্রদান। যৌথ দরকষাকষি চুক্তি (CBA) এবং ধর্মঘট করার প্রক্রিয়া সহজ করা; CBA প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তুলতে হবে, যাতে শ্রমিকেরা সহজে তাদের অধিকার চর্চার সুযোগ পায়।
- নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কার্যক্রম আরো গতিশীল ও অন্তর্জাতিক সংহতি নিশ্চিত করতে বৈদেশিক অনুদান প্রাপ্তি বা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ অত্যাবশ্যক।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ:

- গঠন: শ্রমিকদের সংগঠনের স্বাধীনতা ও তাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অধিকার নিশ্চিত করতে আইনগত সুরক্ষা প্রদান করা। ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের ক্ষেত্রে সাধারণ সভা আয়োজনের বিধান পর্যালোচনা করা; এবং স্বাধীনভাবে ইউনিয়নের সংবিধান তৈরির বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- নিবন্ধন: ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে সহজ ও জটিলতা মুক্ত করা, যাতে শ্রমিকরা সহজে তাদের সংগঠন নিবন্ধন করতে পারে। আইন ও শ্রম বিধিতে উল্লেখ নেই এমন কিছু ইউনিয়ন নিবন্ধনের সময় জমা দিতে বলা যাবে না।
- অনলাইন ব্যবস্থার ত্রুটিপর্ণ প্রক্রিয়া সমাধান করা।
- ইউনিয়ন নিবন্ধনের ক্ষেত্রে আবেদন জমাদানের পর 'নথিজাতকরণ'-এর বিধান বাতিল করা।
- ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনের সাধারণ সভায় সরকারের শ্রম অধিদপ্তর প্রতিনিধির হস্তক্ষেপ বাতিল করা।

- বৈদেশিক অনুদান প্রাপ্তি বা গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ নিশ্চিত কল্পে বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১৬ এর পরিবর্তন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, শ্রম অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের এ সংক্রান্ত বিধি ও আইন সংস্কার করে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নসমূহের বৈদেশিক অনুদান প্রাপ্তি বা গ্রহণ প্রক্রিয়ার সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করা প্রয়োজন।

৫. পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (Occupational Safety and Health):

প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ

- OSH ঘাটতি চিহ্নিতকরণ কর্মস্থলে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত (OSH) একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যাপিং প্রয়োজন যা OSH-এর ক্ষেত্রে ঘাটতি নির্ণয় এবং সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণে সহায়ক হবে।
- সেইফটি অডিট ব্যবস্থা: বিদ্যমান সুরক্ষা নিয়মাবলি অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি শক্তিশালী সেইফটি অডিট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা
- কার্যকর সেইফটি কমিটি প্রতিটি কর্মস্থলে সেইফটি কমিটি গঠন ও তা কার্যকরি করা যা OSH সংক্রান্ত বিষয়াবলি পর্যবেক্ষণ এবং সমাধান করতে সক্ষম হবে
- আগুন, বয়লার, বৈদ্যুতিক এবং ভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অগ্নি নিরাপত্তা, বয়লার নিরাপত্তা এবং ভবন নিরাপত্তার মান উন্নত করা এবং এসবের উপর নজরদারি শক্তিশালী করা
- পেশাগত ব্যাধি: পেশাগত রোগগুলোর যথাযথ চিহ্নিতকরণ, সমাধান এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- স্বাস্থ্য: নারী শ্রমিকদের প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা, মাতৃত্বকালীন ছুটি এয়ং গর্ভাবস্থায় সহায়তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ:

- ডিজিটাল OSH পর্যবেক্ষণ ও রিপোর্টিং ব্যবস্থা OSH কার্যক্রমের নজরদারি এবং রিপোর্টিং-এর করার জন্য একটি ডিজিটাল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- OSH -সংক্রান্ত বিধান ও মানদণ্ডসমূহের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণে একটি মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা।
- OSH সংক্রান্ত আইন বিধান ও মানদণ্ড লঙ্ঘন করলে কার্যকর শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং শাস্তির ব্যবস্থাকে কঠোর করা।
- জেন্ডার-সংবেদনশীল OSH নীতি নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ নিরাপত্তা ও পেশাগত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে জেন্ডার-সংবেদনশীল OSH নীতি তৈরি করা।
- নিরাপদ কর্মস্থলের স্বীকৃতি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা: নিরাপদ কর্মস্থল নিশ্চিত করার জন্য কর্মক্ষেত্রে সেরা OSH অনুশীলনগুলোর পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা।
- OSH এর জন্য জরুরি প্রস্তুতি এবং সাড়া প্রদান ব্যবস্থা জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করার জন্য একটি Emergency preparedness and response ব্যবস্থা তৈরি করা।
- জাতীয় OSH কাউন্সিল কর্মস্থলের নিরাপত্তা মানের তদারকি ও বাস্তবায়নে জাতীয় OSH কাউন্সিলকে কার্যকর ও সক্রিয় করা।
- আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় ব্যবস্থা: OSH নীতির বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে কার্যকর সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা।

৬. কল্যাণ ও সামাজিক নিরাপত্তা:

প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ:

- শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও বাসস্থানের সুযোগ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা এবং সাশ্রয়ী মুল্যে বাসস্থানের সুবিধা প্রদান করা।
- রেশনিং ব্যবস্থা দেশে বিদ্যমান রেশন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে গার্মেন্টস শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা।
- ক্ষতিপূরণ: কর্মক্ষেত্রে আঘাত বা মৃত্যুর জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা, যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর মানদণ্ড (আইএলও কনভেনশন ১২১) অনুযায়ী হবে।
- কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা: শ্রম আইন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে কার্যকর স্বাস্থ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করা।
- স্তন্যদুগ্ধ প্রদানকারী নারী শ্রমিকের জন্য বিশেষায়িত দিবাযত্ন কক্ষ স্থাপন ও এর সুষ্ঠু পরিচালনার বিধান নিশ্চিত করা।
- শ্রমিকদের আর্থিক ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু ও সকল শ্রমিকের জন্য এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম (EIS) প্রবর্তন করা।
- বিমা গার্মেন্টস শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, গ্রুপ বিমা ও জীবন বিমার আওতায় নিয়ে আসা।
- পেনশন, অবসরের পর শ্রমিকদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালু করা।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ:

- বিদ্যমান শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে কার্যকরী করা এবং RMG শিল্প ঘন এলাকায় অধিক সংখ্যক শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা।
- কেন্দ্রীয় তহবিলের কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে হবে, যাতে তহবিলের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করা যায়।
- পিতৃকালীন ছুটির বিধান চালু করা।
- স্তন্যদুগ্ধ প্রদানকারী নারী শ্রমিকের জন্য বিশেষায়িত দিবাযত্ন কক্ষ স্থাপন ও এর সুষ্ঠু পরিচালনার বিধান মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করবে।
- কারখানার স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ডিসপেনসারি এবং ক্লিনিকগুলোকে আরও কার্যকরী এবং শ্রমিক বান্ধব করা যাতে তারা সহজে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা পেতে পারে।

৭. জেন্ডার ইস্যু:

প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ:

- আইএলও কনভেনশন সি-১৯০ এবং সি-১৮৩ অনুসমর্থন কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি এবং মাতৃত্বকল্যাণ সুরক্ষা সম্পর্কিত। ILO এর কনভেনশনসমূহ অনুসমর্থনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- GBV আইন প্রণয়ন কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা (GBV) মোকাবেলার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আইনি কাঠামো তৈরি করা।
- মজুরি বৈষম্য নিরসন: বিশেষত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টায়ারের কারখানায় নারী শ্রমিকদের মজুরি কম দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ করা এবং মজুরিতে সমতা নিশ্চিত করা।
- কারখানার ব্যবস্থাপনায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি এবং নারী শ্রমিকের ক্যারিয়ার অগ্রগতির স্পষ্ট পরিকল্পনা তৈরি।
- কারখানায় নেতৃত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকায় লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।
- প্রতিটি কারখানায় Anti-harassment committee প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যমান কমিটিগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা, যাতে সঠিকভাবে সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ করা যায়।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ:

- মাতৃত্বকালীন ছুটি মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাতে নারী শ্রমিকরা তাদের মাতৃত্বকালীন দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে পালন করতে পারেন।
- ডে-কেয়ার সুবিধা: প্রতিটি কর্মস্থলে যথাযথ সুবিধাসহ ডে-কেয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, যাহাতে নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদানের দিন থেকেই শিশু সন্তানকে ডে-কেয়ারে রেখে মা সহজেই তার সন্তানের যত্ন নিতে পারেন।
- কমিউনিটিভিত্তিক ডে-কেয়ার চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- স্বাস্থ্যকেন্দ্র/ক্লিনিকগুলোকে আরও কার্যকরী ও জেন্ডার সংবেদনশীল করা, কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা আরও উন্নত এবং জেন্ডার সংবেদনশীল করা।
- কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রমোশন এবং আপগ্রেডেশনের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতি তৈরি করা, যাতে তাদের ক্যারিয়ার উন্নতির সুযোগ নিশ্চিত হয়।
- প্রতিটি কারখানার জন্য জেন্ডার পলিসি তৈরি বাধ্যতামূলক করা।
- শ্রম আইনে anti-harassment committee এর বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ এবং শ্রম বিধিমালার সাথে হাইকোর্ট ভার্ডিক্টের অসামঞ্জস্যতা নিরসন।

৮. সহিংসতা ও যৌন হয়রানি:

প্রস্তবিত পদক্ষেপসমূহ:

- ট্রেড ইউনিয়ন বা অন্যান্য বৈধ কার্যক্রমে অংশণগ্রণের জন্য শ্রমিকদের কালো তালিকাভুক্তির প্রথা বন্ধ করা।
- প্রতিশোধের জন্য শ্রমিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা থেকে নিয়োগকর্তা বা কর্তৃপক্ষকে বিরত রাখা।
- জোরপূর্বক চাকরিচ্যুতি বন্ধ করা যথাযথ প্রক্রিয়া বা বৈধ কারণ ছাড়া জোরপূর্বক চাকরিচ্যুতি বন্ধ করা।
- প্রতিবাদ বা ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রমে জড়িত শ্রমিকদের ভয় দেখানোর জন্য স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সম্পৃক্ততা রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কর্মক্ষেত্রে মানসিক নিপীড়নসহ যেকোনো ধরনের হয়রানি থেকে শ্রমিকদের রক্ষা করার জন্য শক্তিশালী আইনগত সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করা।
- শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার এবং তাদের অধিকার পক্ষে কথা বলার স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য রাজনৈতিক চাপ ও হুমকি থেকে শ্রমিকদের সুরক্ষা প্রদান করা।
- শিল্প পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক শ্রমিক হয়রানি বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ:

- কারখানাগুলোর মধ্যে শ্রমিকদের তথ্য শেয়ারিং বন্ধ করা, যাতে তা তাদের ক্ষতির কারণ না হয়।
- শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কারখানা ও কমিউনিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় স্কিম বা প্রোগ্রাম চালু করা।
- প্রতিটি কারখানায় শ্রমিকদের মানসিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে পেশাদার কাউন্সেলর নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- শিল্প পুলিশের সংস্কার ও তাদেরকে শ্রমিক বান্ধব করা।

৯. প্রতিষ্ঠান, গভর্নেন্স ও ন্যায়বিচার

প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ

- শ্রম অধিদপ্তর (Dol)- এ ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সংস্কার, এবং অযৌক্তিক বিলম্বতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE) শ্রম আইনের সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্তিমূলক, স্বাধীন এবং পক্ষপাতিত্বমুক্ত হতে হবে। বিশেষ করে, পরিদর্শনে কর্মক্ষেত্রের ট্রেড ইউনিয়নকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।
- শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আদালতের সংখ্যা বাড়ানো, মামলার দীর্ঘসূত্রীতা কমানো এবং শ্রমিকদের ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা।
- শ্রমিক, নিয়োগকর্তা এবং সরকারের মধ্যে গঠনমূলক সংলাপ এবং কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তি সহজতর করতে RMG ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ কমিটি (TCC) এবং RMG সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ত্রিপক্ষীয় কমিটিসমূহের ভূমিকা শক্তিশালী করা।

প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ

- পরিদর্শন চেকলিস্ট হালনাগাদ সংশ্লিষ্ট পক্ষদের অন্তর্ভুক্ত করে DIFE-এর পরিদর্শন চেকলিস্ট আপডেট করা।
- ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন জমাদান পেপার-বেজড করা এবং অন-লাইন ট্র্যাকিং-এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। শ্রম অধিদপ্তরের কর্তৃত্ববাদী ভূমিকা এবং নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অন্যায় অনুশীলন কমানো।
- শ্রম আদালতের অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া আরও শ্রমিকবান্ধব করা। এবং নির্ধারিত কর্মঘণ্টা অনুযায়ী যেন আদালতের কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা।
- শ্রমঘন এলাকায় শ্রম আদালতের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

- সমঝোতা এবং সালিশ প্রক্রিয়া আরও সহজ ও কার্যকর করা।
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (ADR) প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিকদের দ্রুত ও কার্যকর বিরোধ নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা।

১০. মানবাধিকার Due Diligence (HRDD), MNE, ঘোষণা, OECD নির্দেশিকা, UNGP

প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ:

- নৈতিক এবং দায়িত্বশীল ব্যবসা ক্রেতা ও সরবরাহকারী উভয়কেই এমন ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে হবে, যা শ্রমিকদের অধিকার ও মর্যাদাকে সম্মান করে।
- একটি মনিটরিং সেল প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যা সরবরাহ শৃঙ্খলে আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতা নিশ্চিত করবে।
- সকল পক্ষকে ন্যায্য শ্রমিক অধিকার চর্চা বজায় রাখতে দায়িত্বশীল করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- একটি সুস্পষ্ট আচরণ বিধি (Code of Conduct) প্রয়োজন যা নিয়োগকর্তা ও শ্রমিকরা একে অপরের প্রতি সম্মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- একটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন যেখানে শ্রমিকদের অধিকার ও নিরাপত্তায় জয়েন্ট এমপ্লয়েরস লায়াবিলিটি নিশ্চিত করা যায়।

প্রস্তাবিত পরিবর্তন:

- Due Diligence (HRDD) সংক্রান্ত আইন ও নিতিমালা প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১১. জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ ডিউ ডিলিজেন্স এবং ন্যায্য রূপান্তর (Climate Change, Environmental Due Diligence, Just Transition) সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন:

প্রস্তাবিত পদক্ষেপসমূহ:

- সামাজিক নিরাপত্তা/ন্যায্য রূপান্তর তহবিল জলবায়ু পরিবর্তন বা শিল্প পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের সহায়তার জন্য তহবিল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ।
- শ্রমিকদের নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাওয়ানর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনরায় দক্ষতা (upskilling and reskilling) অর্জনে বিনিয়োগ করা।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং ন্যায্য রূপান্তরে শ্রমিকদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তনে কর্মহীন শ্রমিকদের জন্য বেকারত্ব ভাতা সুবিধা প্রদান।
- RMG খাতে কর্মসংস্থানের বৈচিত্রা আনায়ন এবং একই সাথে চাকরির নিশ্চয়তা, বিকল্প চাকরি ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রস্তাবিত পরিবর্তন:

- গার্মেন্টস শিল্পের জন্য ন্যায্য রূপান্তর কৌশল কাঠামো প্রণয়ন।
- গার্মেন্টস শিল্পে ন্যায্য রূপান্তরের বিষয়সমূহ মনিটরিং-এর জন্য মনিটরিং ইউনিট গঠন।
- নারী বান্ধব ন্যায্য রূপান্তর নিশ্চিতকরণ।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, খালিশপুর শিল্পাঞ্চল আঞ্চলিক শাখা

১. বি,জে,এম,সি নিয়ন্ত্রিত ২৬টি পাটকল বন্ধ, পুনরায় পাটকল চালু করার জন্য শ্রম সংস্কার কমিশন এর নিকট প্রস্তাব করছি।

২. বন্ধকৃত ২৬টি পাটকলের মধ্যে ৫টি পাটকল অর্থাৎ- খালিশপুর জুট মিলস, দৌলতপুর জুট মিলস, জাতীয় জুট মিলস, কর্নফুলী জুট মিলস্, ফোরাত কর্নফুলী কার্পেট মিলস্, ২০১৫ সালের মজুরি কমিশনের বকেয়া টাকা ২১টি মিলের শ্রমিকরা পেলেও উপরে উল্লেখিত ৫টি পাটকলের শ্রমিকদের মজুরি কমিশনের বকেয়া টাকা পরিশোধ করা হয় নাই।

৩. করোনা কালীন সাধারণ ছুটির টাকা ২১টি পাটকলের শ্রমিকদের পরিশোধ করা হয়েছে কিন্তু ৫টি পাটকলের শ্রমিকদের পরিশোধ করা হয় নাই। উক্ত ৫টি পাটকল শ্রমিকদের সাথে বৈষম্য করা হয়েছে।

৪. ২০২০ সালের ২রা জুলাই ২৬টি পাটকল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয় হয়, এর মধ্যে ২১টি মিলের শ্রমিকদের ৬০ দিনের নোটিস পে-টাকা পরিশোধ করা হয়েছে কিন্তু ৫টি পাটকলের শ্রমিক বন্ধের দিন কর্মে থাকার পরও টাকা পরিশোধ করা হয় নাই। শ্রমিকদের সাথে বৈষম্য করে উক্ত টাকা ৫টি পাটকলের শ্রমিকদের পরিশোধ করা হয় নাই। শ্রম সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। চাকরিহারা শ্রমিকদের মানবিক দিক বিবেচনা করে বৈষম্য দূর করে সকল বকেয়া পাওনা টাকা পাইবার জন্য সু-দৃষ্টি কামনা করছি।

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), খুলনা জেলা শাখা

১. শিল্পাঞ্চল খুলনায় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন এখানে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতেই বেশির ভাগ শ্রমিক কাজ করেন। তাদের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারকে সহজীকরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে Certificate নেয়ার নিয়ম বাতিল করতে হবে। সংস্কার কমিশন এই বিষয়ে প্রস্তাবনা থাকতে হবে।

২. অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা আইন এর মতো শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালো আইন প্রণয়ন করার সকল সুযোগ বন্ধ করার বিষয়ে সংস্কার কমিশন তাদের প্রস্তাবনা হাজির করবে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

৩. আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রকিদের ন্যায্য মজুরি, শোভন কর্মপরিবেশ ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনের সংস্কার বিষয়ে কমিশনের প্রস্তাবনা আমরা আশা করছি।

৪. কর্মক্ষেত্রে এবং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকায় দুর্ঘটনায় আহত শ্রকিদের ন্যায্য ক্ষতিপূরন এবং পঙ্গু ও নিহত শ্রমিকদের পরিবারকে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরন দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইনের সংস্কারের বিষয়ে কমিশন প্রস্তাব করবে বলে আমরা আশা করছি।

৫. স্বাধীনতার এত বছর পরও ন্যূনতম জাতীয় মজুরি নির্ধারিত না হওয়া আমাদের দেশের জন্য লজ্জার। আমরা জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার বিষয়ে এবং বাজার দর অনুযায়ী প্রতিবছর সেই মজুরি যৌক্তিকীকরণের বিষয়ে সংস্কার কমিশন প্রস্তাব করবে বলে আমরা আশা করি।

৬. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রিকশা এবং সারাদেশে ইজিবাইক ব্যাটারি চালিত তিন চাকার যানের উপর ইউনিয়ন করার অধিকার না থাকা দুঃখজনক। কারণ এই সেক্টরে সারাদেশে প্রায় ৫০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। সংস্কার কমিশন তাদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংরক্ষনের বিষয়ে প্রস্তাব করবে আশা করছি।
৭. খুলনার প্রাতিষ্ঠানিক খাত মৎস্য, বেসরকারি পাটকল ইত্যাদি সেক্টরের শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ এবং বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে সংস্কার কমিশন প্রস্তাব করবে বলে আমরা আশা রাখছি।
৮. আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী নারী ও পুরুষের সমকাজে সমমজুরি নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের বিষয়ে কমিশন প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবনা করবে বলে আমরা আশা করছি।
৯. আইএলও কনভেনশন সি-১৯০ অনুস্বক্ষর করা ব্যবস্থা করা।
১০. সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে আউটসোর্সিং বা অস্থায়ী ধরনের শ্রমিক নিয়োগ বাতিল করে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দিতে।

শ্রম সংস্কার প্রস্তাব

১. ধারা-১, উপধারা-৪, অনুচ্ছেদ (ঝ) এর সাথে ধারা-৩, উপধারা-৫ সাংঘর্ষিক বিধায় ধারা-৩ এর উপধারা-৫ অবলুপ্ত করা সমুচিত।
২. বাংলাদেশের সকল শ্রেণির শ্রমিকদের জন্য একটি শ্রম আইন প্রণয়ন করা।
৩. ধারা-২১৬, উপ-ধারা-১২ ও ১৩ সংশোধন করা প্রয়োজন। উল্লেখিত ধারায় মামলা নিস্পত্তির বিধান ৬০ দিন করে প্রয়োজনে ৯০ দিন বর্ধিত করা যাবে।
৪. ধারা-১০১ এ কর্মঘণ্টা সংশোধন করা প্রয়োজন।

রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ

১. নীতিমালা অনুযায়ী ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিবন্ধন, চালকদের লাইসেল ও রুট পারমিট প্রদান কর।
২. কারিগরি ত্রুটি সংশোধন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের আধুনিকায়ন করা। চালক-মেকানিক-মালিকসহ ৬০ লাখ ও তাদের উপর নির্ভরশীল ২.৫ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচল বন্ধ করা যাবে না।
৩. ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ও রিকশাসহ নিহত-আহত সকল শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৪. বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় বন্ধ করতে ইলেকট্রিক বা ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা।
৫. প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কে ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত, স্বল্প গতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য সার্ভিস রোড/বাই লেন নির্মাণ করে সড়কে বিশৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনা নিরসন করা। ঢাকাসহ সারাদেশে ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইক জব্দ বন্ধ কর। জব্দকৃত গাড়ি ও ব্যাটারি ফেরত দেওয়া।
৬. চালকসহ সংশ্লিষ্টদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সড়কের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা। সড়কে চাঁদাবাজি, হয়রানি, ব্যাটারি ছিনতাই বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ছিনতাই চক্রের হোতাদের গ্রেফতার কর, চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৭. সকল শ্রমিকের জন্য আর্মি রেটে রেশন, পেনশন ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ ট্যুরিজম এন্ড হোটেলস ওয়ার্কার্স এমপ্লয়িজ ফেডারেশন

১. "বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়" থেকে আলাদা করে পর্যটনের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় গঠন করা।
২. পর্যটন খাতের শ্রমিক-কর্মচারীদের শ্রম অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান শ্রম আইনের শিল্প তালিকায় পর্যটন শিল্পের সকল উপখাতসমূহ যুক্ত করা এবং পর্যটন খাতের প্রাতিষ্ঠানিক অংশে শ্রম আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক অংশে কর্মরত শ্রমিকদের ডাটাবেজ তৈরি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। পর্যটন কেন্দ্রীক জেলাসমূহে শ্রম আদালত, শ্রম পরিচালক ও শ্রম পরিদর্শকের দপ্তর চালু করা।
৩. মজুরি কাঠামো এবং বাজারমূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মজুরি পুণঃনির্ধারণের পদ্ধতি সুনির্দিষ্ট করা।
৪. পর্যটন খাতে নিয়োগের ক্ষেত্রে হোটেল- রেস্তোরা আইন-২০১৪ এর বাস্তবায়ন এবং বিদেশি বা স্বজনপ্রীতি নয় পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন বাংলাদেশিদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রধিকার দেওয়া।
৫. যেকোনো দুর্যোগে পর্যটন শিল্প ও শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের অবসরকালীন সময়ের নিরাপত্তায় ভবিষ্যত তহবিল গঠন করা।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ

১. ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রসঙ্গে: বাংলাদেশে আইএলও কনভেনশনের ৮৭ ও ৯৮ ধারা মোতাবেক অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ও চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা।
২. বিদ্যমান বেতন ভাতা প্রসঙ্গে: মানসম্মত জীবন যাপনের জন্য, ৬ সদস্যের একটি পরিবারের জন্য বর্তমান বাজার দর অনুপাতে বেতন ভাতা প্রদান করা।
৩. বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট, টিফিন ভাতা, যাতায়াত ভাতা প্রসঙ্গে: দ্রব্য মূল্যের উর্দ্ধগতিতে কর্মচারীগণকে মূল বেতনের ২০% বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। একই সাথে টিফিন ও যাতায়াত ভাতা বাড়িয়ে দেওয়া।
৪. সম কাজে সম বেতন, পদপদবি ও মর্যাদা: প্রশাসনিক সকল দপ্তরে এক ও অভিন্ন নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়নের প্রস্তাব।
৫. আউটসোর্সিং নিয়োগ প্রথা প্রসঙ্গে আউটসোর্সিং নিয়োগপ্রথা বাতিল পূর্বক শূন্যপদসমূহে রাজস্বখাতে সরাসরি নিয়োগের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ

১. ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বাজেটের পূর্ব পর্যন্ত ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগকৃত কর্মচারীদের বিনা অজুহাতে চাকরিচ্যুত করা না হয়।

২. যত দ্রুত সম্ভব আমাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।
৩. ভবিষ্যতে বিনা অপরাধে চাকরিচ্যুতির মতো অন্যায় যাতে আর না হয়, তা নিশ্চিত করা এবং চাকরি স্থায়ীকরণ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত নীতিমালা প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত রি-টেন্ডার হলেও পূর্বের নিয়োগকৃতদের পুনর্বহাল রাখতে হবে।
৪. ঠিকাদারকে কমিশন সুবিধা না প্রদান করে সরাসরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মচারী নিয়োগের বিধান চালু করতে হবে।
৫. আউটসোর্সিং প্রথা বাতিল করতে হবে।

বাংলাদেশ হকার সংগ্রাম পরিষদ

১. জরিপ পরিচালনা, নিবন্ধন ও পেশার স্বীকৃতি

- সারাদেশে সকল ধরনের হকার ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সঠিক তালিকা প্রণয়নে সরকারি উদ্যোগে জরিপ পরিচালনা করা। ভ্রাম্যমান ও মৌসুমি হকারদের আলাদা তালিকা প্রণয়ন করা। এই কাজের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিতকল্পে সিটি কর্পোরশনের নেতৃত্বে (স্থানীয় সাংসদের প্রতিনিধি, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, হকার প্রতিনিধি, পুলিশ প্রশাসন, আইএলও ও নগর গবেষকদের সমন্বয়ে) একটি কমিটি গঠন করে পুনর্বাসন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- তালিকাভুক্ত হকারদের পরিচয়পত্র কিংবা স্মার্ট কার্ড প্রদান করা।
- জাতীয় অর্থনীতিতে হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদানের পরিমাণ চিহ্নিত করা এবং তাদের পেশার স্বীকৃতিনহ প্রদান করা।

২. অপসারণ, পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান

- হকার বোর্ড গঠন: স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে হকার বোর্ড গঠন করে হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের পুনর্বাসনের নীতিমালা প্রণয়ন ও 'বাস্তবায়ন করা। নগর পরিকল্পনা হকারীর জন্য নগরের বিশেষ স্থান নির্ধারণ করা।
- ফুটপাতের অংশবিশেষ ব্যবহার। শহরের ফুটপাতের এক তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে হকারী অনুমতি প্রদান করা। তবে ফুটপাতে কোনো স্থায়ী পরিকাঠামো নির্মাণ করা যাবে না। সরকারি ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা, কুটনৈতিক ইত্যাদি এলাকায় হকারী করা যাবে না।
- বহুতল ভবন নির্মাণ করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা: শহরের বাণিজ্যিক এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণ করে নিবন্ধনকৃত হকার ও পথবিক্রেতা এবং ফুটপাত ব্যবসায়ীদের পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
- মালামাল সুরক্ষা: হকার কিংবা পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের মালামাল সুরক্ষা এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- হলিডে মার্কেট: সরকার ঘোষিত হলিডে মার্কেটে হকারী করা।
- সরকার ঘোষিত স্থানে হকারী: সরকার ও সিটি কর্পোরেশন বিভিন্ন সময়ে ঢাকা শহরের কয়েকটি স্থানে হকার পুনর্বাসনের ঘোষণা দিয়েছিল। ঘোষিত সেই সকল স্থানে হকারী করার অনুমতি প্রদান করা।
- ক্ষতিপূরণ: জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে কোনো স্থান থেকে হকার অপসারণ করা হলে ক্ষতিগ্রস্ত হকারদের ক্ষতিপূরণ কিংবা জীবন ধারণের বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. রাজস্ব আদায় ও সেবা প্রদান

- রাজস্ব আদায়: নিবন্ধনকৃত হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর রশীদের মাধ্যমে হকারদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে রাজস্ব আদায় করতে পারবে।
- নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ: রাজস্ব আদায়কৃত হকারদেরকে ফুটপাতে কিংবা নির্দিষ্ট স্থানে হকারী করার অনুমতি প্রদান।
- পুঁজি যোগানদান: নিবন্ধনকৃত হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের পুঁজি যোগানদান এবং লেনদেনে সরকার বাণিজ্যিক ব্যাংকে 'হকার ডেস্ক' চালুকরণ। যেখানে হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীরা সহজ শর্তে আর্থিক লেনদেন করতে পারেন।
- হকার পরিসেবা: হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের রাত্রিকালীন সময়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ, পানি ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা করা।
- রাষ্ট্রীয় পুঁজি গঠন: নিবন্ধনকৃত হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণে সরকার হকার সঞ্চয় প্রকল্প যথা ডাকঘর সঞ্চয় প্রকল্প চালু করবে। এই প্রকল্প পরিচালনায় হকার প্রতিনিধি নিশ্চিত করতে হবে।
- পেনশন/বিমা স্কিম: বৃদ্ধকালীন হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের আর্থিক সেবা প্রদানে সরকার পেনশন/বিমা স্কিম চালু করবে। এই স্কীমে নিবন্ধনকৃত হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট হারে অর্থ আদায় করবে এবং সরকারও এই খাতে সমপরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করবে। "সার্বজনীন পেনশন স্কিম" হকারদের অন্তর্ভুক্ত করা। হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদেরকে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন। এর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই স্কিম পরিচালনায় হকার প্রতিনিধি নিশ্চিত করতে হবে।
- সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী: সরকারি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কারণ হকাররা জাতীয় অর্থনীতির সেবক।
- নারী-কিশোর-কিশোরী কিংবা প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ স্থান নির্ধারণ এবং তাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- স্বাস্থ্যসেবা: হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়দের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে সরকারি হাসপাতালের 'স্বাস্থ্যসেবা কার্ড চালু করা।

৪. পরিবেশ সুরক্ষা

- হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীরা পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতিকর এমন কোনো কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না।
- পরিবেশের ক্ষতিকর এমন কোনো পণ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।

- প্রতিদিনের বর্জ্য-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে এবং দিনের শেষে তা নিজেদের উদ্যোগে অপসারণ ও পরিষ্কার করতে হবে।
- শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নিশ্চিতকল্পে ফুটপাত ঝাড়ু দেয়া এবং পানি দিয়ে নিয়মিত পরিষ্কার করা।

৫. হকারী ও নাগরিক সেবা

- জনজীবনের ক্ষতিকর এমন কোনো বাসী পচা কিংবা মেয়াদ উত্তীর্ণ ভেজাল খাদ্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে না।
- বাস, লঞ্চ, ষ্টীমার, ট্রেনসহ সকল গণপরিবহনে হকারী করার অনুমতি দিতে হবে। তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম মনিটরিং করা।
- ক্রেতা-ভোক্তা সাধারণকে ধোকা দিয়ে কিংবা হয়রানী করে কোনো পণ্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় কিংবা প্রচার করা যাবে না।
- ক্রেতা-ভোক্তাদের সঙ্গে কোনো প্রকার অশালীন ও হয়রানীমূলক আচরণ করা যাবে না।

৬. মনিটরিং ব্যবস্থা

- হকার ও পথবিক্রেতার কার্যক্রম মনিটরিং: হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা। এই কাজে স্থানীয় সাংসদের প্রতিনিধি, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, হকার প্রতিনিধি, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে ৫ সদস্যের একটি মনিটরিং টিম গঠন করা। এই কমিটি পথ বিক্রয় কার্যক্রম মনিটরিং করবে।
- পণ্য মূল্য ও মান নিয়ন্ত্রণ পথে বিক্রয়কৃত পণ্যের মূল্য ও মান নিয়ন্ত্রণে কার্যকর মনিটরিং ব্যবস্থা করা।

৭. অবৈধ চাঁদাবাজী, হয়রানী-নির্যাতন বন্ধ

- হকার, পথবিক্রেতা কিংবা ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে জোরপূর্বক চাঁদা আদায় করা বন্ধ করতে হবে।
- সরকারি অনুমতি ছাড়া কোনো হকার, পথবিক্রেতা কিংবা ফুটপাত ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ কিংবা হয়রানী করা যাবে না।
- উচ্ছেদের নামে হকারদের পণ্য সামগ্রী ধ্বংস কিংবা আটক রাখা যাবে না।

৮. সংগঠিত হওয়া ও সভা-সমাবেশ করা

- দেশের প্রচলিত আইন মেনে হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীরা তাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলার অধিকার ভোগ করবে। তবে কাউকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।
- হকার, পথবিক্রেতা ও ফুটপাত ব্যবসায়ীদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিতকল্পে সভা-সমাবেশ করার অধিকার থাকবে। তবে জনস্বার্থ বিঘ্ন হয় এমন কোনো কার্যক্রম করা যাবে না।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- সংগঠনের সদস্যদের কাছ থেকে সরকারি বিধি মোতাবেক রশীদের মাধ্যমে চাঁদা আদায় করা যাবে।
- সংগঠনের বার্ষিক আয়-ব্যয় হিসাব সরকারি অফিসে দাখিলপূর্বক অনুমোদন করাতে হবে।

চাকরিচ্যুত ও অধিকার বঞ্চিত গ্রামীণফোন শ্রমিক ঐক্য পরিষদ

১. গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সকল প্রকার অবৈধ চাকরিচ্যুতির আদেশ বাতিল করে, শ্রমিকদের অবিলম্বে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতিপূরণসহ চাকরিতে দ্রুত পুনর্বহাল করতে হবে।
২. ২০০৯-২০১২ সালের ৫% লভ্যাংশের বিলম্ব বিতরণের জরিমানাসহ সকল বকেয়া পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে। উক্ত বকেয়া পাওনা বিগত প্রায় ১৫ বছর যাবৎ গ্রামীণফোন ঝুলিয়ে রেখেছে।
৩. শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালানোর দায়ে জড়িত, গ্রামীণফোনের CEO, CMO সহ অদের সকল অনুসারী তথা অত্যাচারী ম্যানেজার এবং চাটুকার আওয়ামী স্বৈরাচারের দোসর ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে সঠিক তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

চট্টগ্রাম ওয়াসা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক কর্মচারী দল

১. রাষ্ট্রের সরকারি বা আধাসরকারি ও স্বায়াত্তশাসিত সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগ/আউটসোর্সিং নিয়োগ বাতিল করতে হবে।
২. ইতিমধ্যে যেসব শ্রমিক কর্মচারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আউটসোর্সিং নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে তাদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে স্থায়ী পদের বিপরীতে নিয়মিত করতে হবে।
৩. প্রতিষ্ঠানের জরুরি প্রয়োজনে অস্থায়ী নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে তবে শর্ত থাকবে নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র দিতে হবে এবং নিয়মিত/ স্থায়ী করার আইনকে সহজ ও কর্মচারীবান্ধব করতে হবে।
৪. একজন শ্রমিক বা কর্মচারী পি.এল.আর/ অবসরে যাওয়ার এক বছরের মধ্যে সব হিসাব সম্পূর্ণ করে আইনগত প্রাপ্যাদি পরিশোধ করতে হবে।
৫. প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন, মজুরি ও ভাতাদির বৈষম্য দূর করতে হবে।
৬. সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করতে গিয়ে কোনো শ্রমিক কর্মচারী মারা গেলে, অঙ্গহানি হলে বা দুর্ঘটনার স্বীকার হলে ক্ষতিপূরণ ও চিকিৎসা ভাতার আইন চালু করতে হবে।
৭. শ্রমিক কর্মচারীর স্থায়ীপদ সংকোচিত না করে সম্প্রসারিত করতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী নিয়োগকে প্রাধান্য দিতে হবে।
৮. বেসিক সংঘটনগুলো তাদের কর্তৃপক্ষের সাথে দাবি নিয়ে দর কষাকষি/ আলাপ আলোচনা কিংবা আন্দোলনে জাতীয় ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।
৯. দ্রব্যমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবছর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বেতন ও মজুরি বৃদ্ধির বৈষম্য দূর করতে হবে।

Work & Health Safety Assistance Center

১. শ্রম আইন ও সড়ক পরিবহণ আইন-২০১৮ এর সাংঘর্ষিক না হয় তা সংশোধন করে দুই আইনের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। তাছাড়া-

- সড়ক আইনে ওয়ারেন্ট ব্যতীত গ্রেফতারের ক্ষমতা ধারা ১১০, অজামিনযোগ্য ধারা ১০৫ বাতিল করে জামিনযোগ্য এবং সকল সড়ক পরিবহণ শ্রমিকেরদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- সড়ক পরিবহণ আইন ২০১৮ সংশোধন করে সড়ক নির্মাণ, ব্যবস্থাপনা, পরিচালনা ও ব্যবহারে যুক্ত সকল পক্ষকে জবাবদিহিতা ও শাস্তির আওতায় আনতে হবে।
- সড়ক ব্যবস্থাপনা আধুনিক না করে সড়ক শ্রমিকের ড্রাইভিং লাইসেন্সের পয়েন্ট কর্তন ও অতিরিক্ত জরিমানার বিধান বাতিল করতে হবে।
- আইনে ট্রাফিক সার্জেন্ট, হাইওয়ে পুলিশের নিপীড়নের সুযোগ বন্ধ করতে হবে।

২. ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ শ্রমাধিকারসমূহ আই.এল.ও'র নির্ধারিত শ্রমমানের আলোকে সকলের জন্য শ্রম অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। শ্রম আইনানুযায়ি শ্রমিকদের নিয়োগপত্র না প্রদান করিলে মালিক, কর্তৃপক্ষ বা পরিচালনাকারি প্রতিষ্ঠানকে শাস্তির বিধান করতে হবে। তাছাড়া-

- শ্রমিকদের নিম্নতম মুজুরি ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে। আইনানুযায়ি প্রত্যেক শ্রমিকের নিয়োগের সমস্ত শর্ত/চুক্তি উল্লেখ করে বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র প্রদান ও তা পর্যবেক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে। পুলিশ প্রশাসন/বিআরটিএ/সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষতে রাস্তায় গাড়ির কাগজপত্র, চালকের লাইসেন্স একই সাথে বাধ্যতামূলকভাবে শ্রমিকের নিয়োগপত্র যাচাই করতে হবে।
- শ্রমিকদের অবাদ ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা/গঠনের সুযোগ তৈরি করতে হবে। টার্মিনালে অপেশাদার/অশ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।
- শ্রমিকের অবসরের বয়সসীমা নির্ধারণ করে অবসরকালীণ ভাতা (এককালীন/মাসিক) নির্ধারণ করতে হবে।
- সড়কে প্রশাসন, পৌরসভা, রাজনৈতিক নেতাকর্মী, শ্রমিক কল্যাণ, জিপি, গাড়ি ভর্তি প্রভৃতির নামে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে। শ্রমিক নেতাদের সম্পদের বিবরণ প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। নামে/বেনামে নিজ পরিবারের সদস্যদের কারও নামে বাস/ট্রাকের মালিকানা থাকলে তাদের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্ব বন্ধে শ্রম আইনে শাস্তির বিধান করতে হবে।

৩. বি.আর.টি.এ এর দুর্নীতি-হয়রানি বন্ধ এবং লাইসেন্স প্রক্রিয়া মানসম্মত করতে হবে। সেক্ষেত্রে-

- অন রোড টেস্টিং এর মাধ্যমে চালককে ক্যাটাগরি ভিত্তিক লাইসেন্স দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার করে বিআরটিএ-এর সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- হয়রানি বন্ধে পেশাদার চালকদের লাইসেন্সের মেয়াদ ১০ বছর করতে হবে।
- পেশাদার লাইসেন্সে ডোপ টেস্ট হয়রানি বন্ধ ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্পট ডোপ টেস্ট পদ্ধতি চালু এবং প্রয়োজনে প্যাথোলাইজ করতে হবে।
- প্রতিটি টার্মিনালে হেলথ কেয়ার সেন্টার চালু অথবা প্রতি মাসে অন্তত একবার মেডিক্যাল ক্যাম্প করে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে।
- সড়ক দুর্ঘটনা তদন্তে স্বাধীন/স্বতন্ত্র এবং পেশাদারদের নিয়ে তদন্ত কমিটি পুনর্গঠিত করে রাস্তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- ক্যাটাগরি ভিত্তিক লাইসেন্স নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আন্তজেলা বাস/ট্রাক সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হওয়ার পর মামলায় লাইসেন্সের ক্যাটাগরিকে প্রধান্য বা আমলে নেয়া যাবে না। প্রাথমিক তদন্তের জন্য পুলিশ প্রশাসনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষতা বাড়াতে হবে।
- থ্রী হুইলার যানের জন্য সার্ভিস রোড চালু করতে হবে।

৪. কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার পর শ্রমিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া-

- দুর্ঘটনা পরবর্তী শ্রমিকের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কর্মরত অবস্থায় হার্ট এটাকে শ্রমিক মারা বা পঙ্গু হয়ে গেলে তাকেও দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সক্রান্ত তহবিল ট্রস্টিবোর্ড হতে সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- দুর্ঘটনা পরবর্তী পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সহজতর করার লক্ষ্যে সড়ক আইন ২০১৮ সংশোধন করে ৩০ দিনের পরিবর্তে আবেদনের সময়সীমা বাতিল এবং ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সময়সীমা ৩০ কার্য দিবস নিশ্চিত করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অবহেলা দৃশ্যমান হলে তাদের শাস্তির বিধান আইনে যুক্ত করতে হবে। দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু বা স্থায়িভাবে পঙ্গু হলে ক্ষতিপূরণ আজীবন আয়ের সমান/৫০ লক্ষ টাকা করতে হবে।
- শ্রমিক কল্যাণ তহবিল পরিচালনা প্রক্রিয়া সংশোধন করে গাড়ি চালক, কন্ডাক্টর/সুপারভাইজার, হেলপার, কাউন্টার মাস্টারসহ সকল শ্রমজীবীর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

খুলনা মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন

৫. শ্রমিকদের নিয়োগপত্রের ব্যবস্থা করা।
৬. দুর্ঘটনায় পতিত শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৭. শ্রমিকদের জন্য রেশন প্রথা চালু করা।
৮. ইদ বোনাস এর ব্যবস্থা করা।
৯. শিক্ষা ভাতা চালু করা।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

১. শ্রমদপ্তর ও শ্রম ক্রাইসিস কমিটিকে শক্তিশালী করা।
২. শ্রম আদালতের মামলার জট কমাতে হবে, মামলার সুনির্দিষ্ট সময় থাকতে হবে।
৩. মিনিমাম ওয়েজ কার্যকরী করা।
৪. প্রতিটি জেলায় শ্রমদপ্তর ও শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করা।
৫. শালিশের সুনির্দিষ্ট সময় থাকতে হবে।
৬. শ্রমিকদের স্থায়ী করা, বীমা, গ্রাচুইটি ফান্ড থাকতে হবে।

৭. বন্ধ পাটকল চালু করা। দীর্ঘদিনের বকেয়া পাওনাদি পরিশোধে আইন শক্তিশালী করা।
৮. রেজিস্ট্রেশন সহজ করা। প্রতিটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।
৯. শ্রম আদালত, মজুরি বোর্ড এ যোগ্য ও অভিজ্ঞ জনবল নিয়োগ দেওয়া।
১০. মালিকদের শাস্তির পরিমাণ বাড়াতে হবে।
১১. বাজারদর অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করা।
১২. শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে ক্যান্সার ও হার্টের রোগির সেবা দ্রুত নিষ্পত্তি করা।
১৩. শ্রম আইনের বিধান কাগজে থাকলেও বাস্তবায়ন করা দরকার।
১৪. অংশগ্রহণকারী কমিটি, শ্রম দপ্তর, শ্রম আদালত শক্তিশালী করা।
১৫. বর্তমান ১৯৩টি জুট মিলে শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ করা। ওভার টাইম, প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন, বীমা, গ্রাচুইটি থাকতে হবে। BJMC এর ২৬ টি জুট মিল চালু করা এবং ৫ টি জুট মিলের এরিয়া ও অন্যান্য সুবিধা দিতে আইন প্রণয়ন করা।
১৬. জুট প্রেস এন্ড বোলিং এর দুই শতাধিক জুট গোডাউন ও প্রেস চালুর আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
১৭. প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা।
১৮. শ্রমঘন এলাকায় শ্রমিক হাসপাতাল চালু করা।
১৯. সম-শিল্পে, সম-কাজে সম-মজুরি দেওয়া।
২০. শ্রমঘণ্টা ৮ ঘণ্টা নির্ধারণ করা।

কেন্দ্রীয় চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন

১. নিয়োগপত্র, চুক্তিপত্র প্রদান করা।
২. নারী ও পুরুষ শ্রমিক এর বেতন বৈষম্য দূরীকরণ করা।
৩. সর্বনিম্ন মজুরি বাড়িয়ে দেওয়া।
৪. ৮ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৬ ঘণ্টা কাজ করানো হলেও ওভার টাইম এর প্রাপ্য মজুরি দেওয়া হয় না। প্রাপ্য মজুরি পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৫. চিকিৎসা ভাতা, যাতায়াত ভাতা এর ব্যবস্থা করা।
৬. নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান করা।
৭. কাজের জায়গায় টয়লেটের পর্যাপ্ত ব্যবস্থার বিধান করা।
৮. প্রতিষ্ঠানে কর্মরত অবস্থায় শারীরিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান করা।
৯. দুই ঈদে বোনাস দেওয়া।
১০. সাপ্তাহিক ও বার্ষিক ছুটির বিধান চালু করা।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন

১. কর্মচারীদের প্রেষণ ভাতা প্রদান করা।
২. সংগঠন এর সক্রিয় এবং নিষ্ঠাবান কর্মী ব্যাতিত সংগঠন এর গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য ভোটের মনোনয়ন না পাওয়ার বিধান চালু করা।
৩. সকল সেক্টরে সক্রিয় কর্মীদের শ্রমঅধিদপ্তর এ রেজিস্ট্রেশন এর আওতায় নিয়ে আসা

উত্তর খুলনা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন

১. কর্মক্ষেত্রে নিরাপদে কাজ করতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে।
২. নির্মাণ শ্রমিকদের মজুরি প্রতিদিন ১০০০ টাকা অর্থাৎ মাসে ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে হবে।
৩. কর্মক্ষেত্রে আহত হলে সম্পূর্ণ চিকিৎসা মালিক বহন করবে এবং চিকিৎসা চলাকালীন তার স্ব-বেতন ছুটি বহাল রাখতে হবে। বিশেষ পরিস্থিতিতে মালিক অপারগ হলে রাষ্ট্র এর দায়িত্ব নিবে।
৪. কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক নিহত হলে তার আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
৫. নির্মাণ শ্রমিকদের রেশনসুবিধা ও পেনশনের আওতায় আনতে হবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ- বিলস (চট্টগ্রাম)

১. শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ:

- শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম সরবরাহ করা, যেমন হেলমেট, গাভস, সেফটি বুট, অক্সিজেন মাস্ক, ইত্যাদি।
- নিয়মিত নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ও জরুরি পরিস্থিতিতে সঠিক পদক্ষেপ সম্পর্কে শ্রমিকদের সচেতন করা।
- দুর্ঘটনার হার শূন্যে নামিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা।

২. শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র ও সার্ভিসবুক প্রদান:

- শ্রমিকদের যোগদানের সাথে সাথেই নিয়োগপত্র প্রদান করা, যাতে তাদের অধিকার ও দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকে।
- পরিচয়পত্র ও সার্ভিসবুক প্রদান করে তাদের কর্মজীবন রেকর্ড করা।

৩. পেশাগত রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান:

- শ্রমিকদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে যেসব পেশাগত রোগ (যেমন, শ্বাসকষ্ট, ত্বকের সমস্যা) হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেসব রোগের প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পেশাগত রোগের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যেমন উপযুক্ত মেডিকেল চেক-আপ, ট্রেনিং, কর্মভূলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৪. পেশাগত রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদান:

- শ্রমিকদের জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা, বিশেষ করে যেসব পেশাগত রোগ (যেমন, শ্বাসকষ্ট, ত্বকের সমস্যা) হওয়ার আশঙ্কা থাকে, সেসব রোগের প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
- পেশাগত রোগের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা, যেমন উপযুক্ত মেডিকেল চেক-আপ, ট্রেনিং, কর্মস্থলে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করা।

০৫. শ্রমিকদের জন্য ছুটি এবং মজুরি ব্যবস্থা:

- শ্রমিকদের সবেতন ছুটি প্রদান করা এবং নির্দিষ্ট ছুটির দিনগুলিতে তাদের বেতন নিশ্চিত করা।
- ঘোষিত নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করা এবং বর্তমান বাজার দর বিবেচনায় নতুন নিম্নতম মজুরি ঘোষণার লক্ষে দ্রুত নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন।

৬. সামাজিক নিরাপত্তা এবং শ্রমিক কল্যাণ:

- শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা (যেমন গ্র্যাচুইটি, পেনশন, কল্যাণ তহবিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বীমা) গঠন করা।
- শ্রমিকদের পরিবারের জন্য সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন সুবিধা ইত্যাদি।
- উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার এবং ব্যবসা কম হওয়ার কারণে চাকরি হারানো শ্রমিকদের বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা।

৭. প্রযুক্তির ব্যবহার ও আধুনিকীকরণ:

- জাহাজ ভাঙা শিল্পে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা, যেমন ভারী যন্ত্রপাতি এবং যান্ত্রিক উন্নয়ন, যা শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক।
- উন্নত ডিজাইন, প্রযুক্তি এবং উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে আরও দক্ষ ও নিরাপদ করা।

৮. শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি:

- শ্রমিকদের জন্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম চালু করা, যাতে তারা আধুনিক কাজের পরিবেশে দক্ষতা অর্জন করতে পারে।
- শ্রমিকদের সুরক্ষা, পরিবেশ এবং মানসম্পন্ন কাজের বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা।

চট্টগ্রাম বন্দরে কর্মরত আউটসোর্সিং কর্মচারী

১. বন্দরে শ্রম শাখায় যাচাই-বাছাইকৃত সকল শ্রমিক/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করে বন্দর পরিচয় পত্র এবং সকলকে শ্রম শাখায় অন্তর্ভুক্তি করা।
২. ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করে সকল শ্রমিক/ কর্মচারীকে বাই রোটেশন বুকিং এর ব্যবস্থা করা।
৩. MOU চুক্তি বাস্তবায়ন করা।
৪. কর্ম ক্ষেত্রে কোনো শ্রমিক/কর্মচারী মৃত্যু বরণ করলে ২০ লক্ষ টাকা প্রদান এবং অঙ্গহানি ঘটলে সরকারি/বেসরকারি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৫. জাতিসংঘের সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা, ILO ও বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী অনুযায়ী শ্রমিক /কর্মচারী সকল ধরনের মৌলিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৬. শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধনী ২০১ বাতিল করতে হবে।

জাতীয় গার্হস্থ্য নারী শ্রমিক ইউনিয়ন

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ সংশোধন পূর্বক গৃহকাজকে স্বীকৃতি দিয়ে গৃহশ্রমিকদের অধিকার, মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২. গৃহশ্রমিকরা যাতে সংগঠিত হয়ে তাদের অধিকার ও মর্যাদার লড়াই চালাতে পারে সে ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা।
৩. গৃহশ্রমিকদের মজুরি কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আলাদা নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করে মজুরি ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।
৪. গৃহশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার জন্য সরকারের 'সার্বজনীন পেনশন স্কিম' অন্তর্ভুক্ত এবং বৃদ্ধ গৃহশ্রমিকদের বয়স্ক ভাতা প্রদান।
৫. গৃহশ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিবন্ধন, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র প্রদান ।
৬. দেশের প্রচলিত আইন ও অনুসমর্থিত আইএলও কনভেনশন মোতাবেক শিশু গৃহশ্রমিকদের নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা।
৭. গৃহশ্রমিকদের উপর হত্যা, নির্যাতন ও যৌন হয়রানি বন্ধে দেশের প্রচলিত ফৌজদারি ও নারী-শিশু নির্যাতন আইন কার্যকর করা। নির্যাতিত গৃহশ্রমিকদেরকে বিনামূল্যে সরকারি আইনি সহায়তা প্রদান।
৮. কর্মরত গৃহশ্রমিকদেরকে ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুবিধাদি নিশ্চিত করা।
৯. কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার জন্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।

ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব)

১. সরকারি উদ্যোগে রাজধানী ঢাকা শহরে থানা ও ওয়ার্ড ভিত্তিক এবং সারাদেশে জেলা ও উপজেলা ভিত্তিক নির্মাণ কলোনি স্থাপন করে সুলভ মূল্যে দীর্ঘমেয়াদী লীজ প্রদানের মাধ্যমে নির্মাণ শ্রমিকদের বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে। কলোনিতে শ্রমিকদের ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য স্কুল এবং চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের বোর্ড সভা প্রতিমাসে একবার করতে হবে। তহবিল থেকে নির্মূল শ্রমিকদের জন্য ব্যাপক কল্যাণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে এবং সাহায্যের আবেদন ফরমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী কর্মকর্তার সুপারিশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করতে হবে।
৩. শ্রম আইনের আওতায় নির্মাণ শ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। রেশনিং ব্যবস্থা, দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহত বা আজীবন পঙ্গুত্ব বরণকারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শ্রম অধিকার কনভেনশন ১২১ মোতাবেক Loss of Earning Year (এক জীবনের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ) এর ভিত্তিতে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবে কোনোভাবেই যেন শ্রমিকদেরকে ১৫ লক্ষ টাকার কম ক্ষতিপূরণ যাতে না দিতে পারে সে। ব্যাপারে সরকারকে প্রজ্ঞাপন জারী করতে হবে।
৪. নির্মাণ শ্রমিকরা তাদের অধিকার বাস্তবায়নে যাতে সহজে আদালতের স্মরণাপন্ন হতে পারে সে লক্ষ্যে প্রত্যেক জেলা/উপজেলায় শ্রম আদালত স্থাপন করতে হবে এবং অধিকার ও পাওনাদির বিষয়ে ৪২ দিনের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করতে হবে।
৫. ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ এবং নির্মাণ শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট কর্তপক্ষের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. শ্রম আইন সংশোধনী ২০০৬ এর ৩২৩ ধারা মোতাবেক জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য কাউন্সিলে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন বাংলাদেশ (ইনসাব) এ প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৭. কর্মস্থলে নির্মাণ শ্রমিকরা যাতে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও সহিংসতার শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
৮. সরকারিভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করে শুধু সার্ভিস চার্জ নিয়ে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ দিয়ে বিদেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বর্তমানে বিদেশে কর্মরত শ্রমিকদের হয়রানি ও দুর্ভোগ বন্ধ করতে হবে।
৯. সরকারি উদ্যোগে বিভাগীয় শহরে থানা ভিত্তিক এবং জেলা ও উপজেলায় শ্রম ছাউনি নির্মাণ করতে হবে।
১০. নারী নির্মাণ শ্রমিকদের সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করতে হবে।
১১. নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য রেজিষ্টার খাতা রাখার বিধান সকল নির্মাণাধীন ভবনে বাস্তবায়ন করতে হবে।
১২. নির্মাণ শ্রমিকদের সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরি কার্যকর করতে হবে।

ঢাকা রাইড-শেয়ারিং ড্রাইভার্স ইউনিয়ন

১. বর্তমান রাইড-শেয়ারিং নীতিমালা সংশোধন করে রাইড-শেয়ারিং সেক্টর টিকিয়ে রাখার জন্য আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন।
২. সকল ধরনের বাহনের জন্য নির্ধারিত ক্যাটাগরি অনুযায়ী বেইজ ফেয়ার, যাত্রার মোট সময়, অতিক্রান্ত কিলোমিটার এবং সিটি, ইন্টারসিটি ও আন্তাজেলা ভ্রমণের ভাড়া নির্দিষ্ট কাঠামো অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. রাইড-শেয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সর্বোচ্চ ১০% কমিশন নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত কমিশন নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করতে পারবে না।
৪. চালকদের থেকে প্রতিদিনের ৭৯ টাকা প্ল্যাটফর্ম ফি এবং সিটি ও ইন্টারসিটি ট্রিপের জন্য যাত্রীদের কাছ থেকে যথাক্রমে ১০ ও ২৫ টাকা প্লাটফর্ম ও বুকিং ফি হিসাবে নেওয়া হয় যা সাময়িকভাবে নয় বরং স্থায়ীভাবে বাতিল করতে হবে।
৫. কোনো চালকের একাউন্ট বন্ধ করার পূর্বে, একাউন্ট বন্ধের সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে চালককে বাধ্যতামূলকভাবে নোটিস প্রদান করতে হবে। যতদিন চালক এবং রাইড-শেয়ারিংয়ে ব্যবহৃত বাহনটি কর্মহীনর্ম থাকবে, ততদিন চালক এবং বাহনের ক্ষতিপূরণ বাবদ দৈনিক চালকের জন্য ১,০০০/- টাকা এবং বাহনের জন্য ১,০০০/- টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
৬. রাইড চলাকালীন যাত্রী কর্তৃক অবৈধ সামগ্রী বা মাদকদ্রব্য বহন করার কারণে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে চালক এবং গাড়ি আটক হলে, চালক এবং গাড়ি মুক্ত করার সম্পূর্ণ দায়ভার যাত্রী এবং রাইড-শেয়ারিং কোম্পানিকে নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে, চালক কোনো দায় বহন করবে না। যাত্রী ও রাইড-শেয়ারিং কোম্পানি আইনগতভাবে দায়ী থাকবে। গ্রেফতারের ফলে চালক এবং রাইড-শেয়ারিংয়ে ব্যবহৃত বাহন যতদিন কর্মহীনর্ম থাকবে, ততদিনের জন্য চালক ও বাহনের দৈনিক ২,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।
৭. যাত্রী পিকআপের জন্য চালক সর্বোচ্চ ৩ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এই সময়সীমা পার হলে অতিরিক্ত প্রতিটি মিনিটের জন্য একটি নির্ধারিত চার্জ যাত্রীর ভাড়ায় যুক্ত হবে। যদি চালক নির্ধারিত সময়ের পর আর অপেক্ষা করতে না পারে, তবে চালক ট্রিপ ক্যান্সেল করার অধিকার রাখবেন এবং এই ক্ষেত্রে যাত্রীকে ক্যান্সেলেশন ফি প্রদান করতে হবে।
৮. রাইড শেয়ারিং সেক্টরের কার্যকরী পরিচালনা এবং ন্যায্য ভাড়া ও কমিশন নির্ধারণের জন্য একটি শক্তিশালী ও স্বচ্ছ "রেগুলেটরি কমিশন" গঠন করা অত্যন্ত জরুরি।

পাটকল রক্ষা আন্দোলন (যশোর-খুলনা)

১. রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করা।
২. ৫ মিলসহ সকল শ্রমিক এর বকেয়া পরিশোধ করতে হবে।
৩. বেসরকারি জুট মিলে কার্যত ট্রেড ইউনিয়ন নেই। ক্ষমতাসীন দলগুলোর প্রভাব কমিয়ে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার দিতে হবে।
৪. দৈনিক মজুরি সর্বোচ্চ ২৭০ টাকা। দৈনিক মজুরি বাড়াতে হবে।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

১. বন্ধ হওয়া খুলনার দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা পরিশোধসহ খুলনার নিউজপ্রিন্ট মিল, হার্ডবোর্ড মিল, টেক্সটাইল মিল, স্টিল মিল প্রভৃতি পুনরায় রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চালু করা।
২. শ্রমিকের জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি। সকল শ্রমিককে রেশনসুবিধা ও পেনশনের আওতায় আনতে হবে।
৩. সকল পেশার নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমকাজে সমমজুরি নিশ্চিত করতে হবে।

৪. কৃষিতে সয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার জন্য কম মূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ এবং সহজ শর্তে ঋণসুবিধা রাখা প্রয়োজন। উৎপাদিত পণ্য সরকার নির্ধারিত আড়ৎ বা সংরক্ষণাগারে রাখা ও সরকার নির্ধারিত মূল্যে খুচরা বাজারে বিক্রির বিধান জরুরি।
৫. পর্যটন শিল্পকে পরিবেশবান্ধব এবং পর্যটন শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করতে হবে।
৬. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে এবং বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থানসহ তাদের মজুরি, কর্মঘণ্টা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের তদারকি প্রয়োজন।
৭. রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় প্রবাসে শ্রমিক পাঠাতে হবে। ফিরে আসার পর শ্রমিকদের দক্ষতাকে দেশে কাজে লাগানোর উদ্যোগের ব্যবস্থা করা।
৮. অনতিবিলম্বে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নীতিমালা চূড়ান্ত করে গেজেট প্রকাশ পূরণ হবে বলে প্রত্যাশা করি।
৯. নির্মাণ শ্রমিকদের কর্মকালীন নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ কর্মক্ষেত্রে আহত হলে চিকিৎসার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার মালিক, মালিক অপারগ হলে রাষ্ট্র, চিকিৎসা চলাকালীন সবেতন ছুটি এবং কর্মক্ষেত্রে নিহত হলে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণের প্রত্যাশা করি।
১০. খুলনার ক্ষেতমজুর ও মৎস্য ঘেরে কাজ করা শ্রমিকরা সকল ধরনের শ্রম অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাদের অধিকার বাস্তবায়নের প্রস্তাব কমিশনের রিপোর্টে থাকবে আশা রাখছি।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী রেলওয়ে শ্রমিক ও কর্মচারী দল

১. সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের তথ্য ট্রেড ইউনিয়নের মতামত গ্রহণ করা এবং সকল স্তরে নিয়মিত দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক বা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যাবলি সমাধানের কার্যকর উদ্দ্যোগ নিয়ে প্রত্যাশিত শিল্প সম্পর্ক নিশ্চিত করা।
২. নিয়োগবিধি-২০২০ জরুরি ভিত্তিতে সংশোধনপূর্বক ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির অত্যাবশ্যকীয় কারিগরি শূন্য পদে পিএসসির পরিবর্তে নিজস্ব কমিটির মাধ্যমে অতি দ্রুত জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করা। ৪র্থ শ্রেণির পদে শিক্ষাগত যোগ্যতা দেশের অন্য প্রতিষ্ঠানের ন্যায় এসএসসির পরিবর্তে ৮ম শ্রেণি করা।
৩. অনুমোদিত নিয়োগবিধি মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ। ত্রুটিপূর্ণ নিয়োগবিধির কারণে কর্মচারীদের নিয়োগ পদোন্নতিতে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। নিয়োগবিধি সংশোধন না হওয়ায় কর্মচারীদের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছে। পদোন্নতির ক্ষেত্রে সম্প্রতি অনুশ্রিত এককেন্দ্রিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে পূর্বের ন্যায় দুই জোনে আলাদা কমিটির মাধ্যমে বিভাগীয় প্রধানদের মাধ্যমে পদোন্নতি দ্রুততর করা।
৪. রেলের জন্য আত্মঘাতী "আউট সোর্সিং" বন্ধ করে পূর্বের নিয়মে টিএলআর/অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ শ্রমশক্তির প্রবাহ জারি রাখার ব্যবস্থা নেয়া।

বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন (বিএলএফ), খুলনা শাখা

১. বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলগুলো পুনরায় চালু করা।
২. বকেয়া বেতন পরিশোধ করে শ্রমিকদের পুনরায় নিয়োগ প্রদান করা।
৩. নারী শ্রমিকদের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে খুলনা অঞ্চলকে বেকারমুক্ত করা।

বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন, খুলনা বিভাগ

১. নৌপরিবহন সেক্টর এ শ্রমিকদের জন্য প্রতিটি বন্দর, প্রতিটি নৌ পথ সন্ত্রাস, ডাকাতি, চাঁদাবাজি ইত্যাদি থেকে নিশ্চিত করা।
২. শ্রমিকদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড গঠন করা।
৩. মালিক কর্তৃক প্রতিটি শ্রমিককে পরিচয় পত্র ও নিয়োগপত্র প্রদান করা।
৪. কর্মস্থলে কোনো শ্রমিক মৃত্যু বরণ করলে, ক্ষতিপূরণ হিসাবে মালিক কর্তৃক দশ লক্ষ টাকা প্রদান করা।

বাংলাদেশ নৌ-যান শ্রমিক ফেডারেশন

১. ভৈরব নদীর নব্যতা রক্ষা করা, শৈলপুর থেকে নওয়াপাড়া পর্যন্ত ট্রেজিং ব্যবস্থা করা।
২. শিখেরহাট ফেরিঘাটের ফেরিপন্ট ড্রেজিং করে ভিতরে দিকে সরিয়ে নৌ-চলাচলের চ্যানেল ক্লিয়ার করতে হবে।
৩. খুলনা দিলদার ঘাট এবং সেনহাটী বাজারের মধ্যবর্তী মুরিং বয়া অপসারণ করিয়ে চ্যানেল ক্লিয়ার করতে হবে।
৪. লবন চরা ও জাবুসা উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া রেলওয়ে সেতুর পিলার রাত্রকালীন আলোক সজ্জা করা।
৫. রাত্রী কালীন নিরাপদ নৌ চলাচলের জন্য প্রতিটি মুরিং বয়ায় আলোর প্রতিপলনের জন্য রিকুট রিপ্লেটিভ টেপ পরিয়ে দেওয়া।
৬. রাত্রিকালীন নিরাপদ নৌচলাচলের জন্য প্রতিটি চ্যানেল বয়াগুলি যথানিয়মে লাইটিং ব্যবস্থা করা।
৭. জুলফিকার চ্যানেলে সর্বমোট ১৮টা বয়াছিল, বর্তমানে মাত্র ৫-৬ টা বয়া আছে, বাকি বয়গুলি নেই, তাহা পুনঃস্থাপন করা।
৮. হাড়বাড়িয়া থেকে ফেয়ারওয়ে পর্যন্ত নৌ নিরাপত্তা জোরদার করা।

অলিম্পিক সিমেন্ট লিমিটেড শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদ

১. ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুসারে ১০ তারিখের মধ্যে বেতন এবং ১৫ তারিখ এর মধ্যে ওভারটাইম পরিশোধ করতে হবে।
২. সকল শ্রমিকদের জন্য জানুয়ারি মাস থেকে ২০% ইনক্রিমেন্ট ও প্রভিডেন্ট ফান্ড চালু করতে হবে।
৩. ১০ তারিখ শুক্রবার হলে ৯ তারিখ সকল শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন দিতে হবে।
৪. সকল সরকারি ছুটিতে আট ঘণ্টা ডিউটি করিলে ১৬ ঘণ্টা ওভারটাইম দিতে হবে।
৫. সকল শ্রমিক-কর্মচারীদের ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যে কোম্পানির আইডি কার্ড, সার্ভিস বুক ও নিয়োগপত্র দিতে হবে।

৬. সকল শ্রমিকদের নাইট ডিউটি চলাকালীন সময় প্রতি শ্রমিকদের প্রতিদিন ৩০ টাকা করে নাইট অ্যালাউন্স দিতে হবে।
৭. সকল শ্রমিকদের আট ঘণ্টা ডিউটির পরে অতিরিক্ত ডিউটি করালে নাস্তার বিল বাবদ ৮০ টাকা করে নাইট অ্যালাউন্স দিতে হবে।
৮. বল মিলের সকল শ্রমিকদের ডাস্ট অ্যালাউন্স পুনরায় চালু করতে হবে।
৯. সকল শ্রমিকদের ডিউটি অনুসারে প্রতিদিন ৩০ টাকা করে ওয়াশিং অ্যালাউন্স দিতে হবে।
১০. কোনো শ্রমিককে আন্দোলন ইস্যুতে হয়রানি বা ছাঁটাই করা চলবে না।
১১. কোনো শ্রমিককে বিনা নোটিসে কোথাও বদলি করা যাবে না।
১২. কোনো শ্রমিককে অযথা হয়রানি করা চলবে না। ডিপার্টমেন্ট হেড কোনো শ্রমিককে তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা চলবে না। ডিপার্টমেন্ট হেড কোনো শ্রমিকের সাথে দূর্ব্যবহার করতে পারবে না।
১৩. শ্রমিকদের কোনো সমস্যা হলে গেটপাস দিতে হবে এবং ছুটি থেকে কাটা যাবে না।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, বরিশাল

১. শ্রম আইন ২০০৬ এর ২ (৬৫) ধারায় শ্রমিক এর সংজ্ঞা সংস্কারপূর্বক সকল শ্রমিকদের শ্রম আইনের আওতায় নিয়ে আসা।
২. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত বিশেষ করে ইমারত নির্মাণ শ্রমিক, দিনমজুর এবং বাসা বাড়িতে বা ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের শ্রমিক, মৎস্য শ্রমিকদেরও এর আওতায় নিয়ে আসা প্রয়োজন।
৩. শ্রম আইনের ৫ নং ধারা অনুসারে শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও ছবি সংবলিত পরিচয়পত্র দিয়ে শ্রমিক নিয়োগ এর বিধান বাস্তবায়ন করা।
৪. শ্রম আদালতে বা শ্রম অধিদপ্তরে কোনো অভিযোগ চলমান থাকলে, কোনো আদালত বা থানায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকের বিপক্ষে কোনো মামলা রজু করবে না বা করলেও শ্রম আদালত বা শ্রম দপ্তরের চলমান অভিযোগ শোনার সাথে সাথে যে কোনো ফৌজদারি মামলা খারিজ বা স্থগিত করা।
৫. শ্রম আইনের ১৮৭ ধারা অনুসারে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করা যাবে না, করলে শাস্তির বিধান থাকা।
৬. শ্রম আইনের ১৩২ ধারা অনুসারে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি বাস্তবায়ন করা এবং শ্রমিকদের লিগ্যাল এইড এর ব্যবস্থা করা।
৭. চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরন দ্রুততম সময়ের মধ্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করা এবং বৈষম্য দূরীকরণ করা। ক্ষতিপূরণ আইন ও কনভেনশন ১২১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।
৮. পাঁচ এর অধিক শ্রমিক কর্মচারী আছে এরূপ প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন এর অধিকার দেয়া বাধ্যতামূলক করা এবং গুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠান পক্ষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ আইনের বিধান রাখা এবং সবাইকে শ্রম আদালতের আওতায় নিয়ে আসা।
৯. ৩০৭ ও ৩০৮ ধারায় আর্থিক জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং ২য় বার একই অপরাধ করলে শাস্তির বিধান রাখা।
১০. শ্রম আইনের যে সকল ক্ষেত্রে অসংগতি রয়েছে সেগুলো দূর এবং প্রচলিত শ্রম আইন আইন যথাযথভাবে কার্যকর করা।
১১. কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নিরাপত্তা লংঘনকারীদের শাস্তির বিধান করা।

বৃহত্তর বরিশাল রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন

১. বৃহত্তর বরিশাল রিকশা-ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়নভূক্ত শ্রমিকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা।
২. সিটি করপোরেশন এর যানবাহন শাখা খুলে দেওয়া ও শ্রমিক ইউনিয়নের কর্তৃপক্ষের সুপারিশ বাধ্যতামূলক করা।
৩. চাকরির পরিধি ও সক্ষমতা অনুযায়ী কমপক্ষে ১৫০০০ মহাজনি লাইসেন্স প্রদান করা।
৪. সরকারি বিভিন্ন বরাদ্দ থেকে শ্রমিকদের সহায়তা প্রদান করা, যেমন: শীতবস্ত্র বিতরণ, চিকিৎসা সহায়তা ইত্যাদি।
৫. অহেতুক পুলিশি হয়রানি বন্ধ করা।

শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ

১. আট ঘণ্টা ডিউটি।
২. ২০২৪ সালের নিম্নতম মজুরি এরিয়া সহ বাস্তবায়ন।
৩. বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট শ্রম আইন অনুযায়ী দেওয়ার বিধান।
৪. বদলী শ্রমিকদের স্থায়ী করা ।
৫. অব্যাহতি শ্রমিকদের পাওনাদি শেষ কর্ম দিবসে বুঝাইয়া দেওয়া।
৬. অর্জিত ছুটি ১০ দিন রেখে বাকি দিনের টাকা পরিশোধ করা।
৭. শ্রমিকদের শ্রম অধিকার আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করা।

চা শ্রমিক

১. চা শ্রমিকদের জন্য স্থায়ী ভিটে জমির ব্যবস্থা করা হোক।
২. শ্রম আইনে বৈষম্য দূর করা হোক।
৩. রেশন: পূর্বে বছরের ৬ মাস আটা এবং ৬ মাস চাউল দেয়ার রেওয়াজ ছিল। বর্তমানে ১২ মাস আটা দেয়া হয়। এটা আইনের লঙ্ঘন। কারণ আইনে আছে কোনো সুযোগ সুবিধা ১ বার প্রদত্ত হলে তা আর প্রত্যাহার করা সুযোগ নেই।
৪. চা শ্রমিকদের বছরে ৬০ দিনের উৎসব বোনাস প্রদান করা হোক।
৫. প্রভিডেন্ট ফান্ড এর নিশ্চতা দেওয়ার দাবি।
৬. চিকিৎসা সুবিধা: কোনো বাগানে ৭০০ জন স্থায়ী শ্রমিক থাকলে এমবিবিএস চিকিৎসক থাকা আবশ্যক। এটা পালন করা দাবি জানাই।
৭. চুক্তি: ইউনিয়ন এবং মালিক পক্ষের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে চা শ্রমিকের সন্তানেরা শিক্ষিত হলে যোগ্যতা অনুসারে চাকরি দেয়া হবে। সেটা মানাতে হবে।

নৌযান শ্রমিক

১. ২০২২ সালে প্রকাশিত গ্যাজেট বাস্তবায়নের দাবি।
২. শ্রমিকদের ১১ দফা আন্দোলন সরকার মেনে নিয়েছিল কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয় নি। ১১ দফা দাবির একটি দাবির অর্ধেক মানা হয়েছে মাত্র।
৩. ২০২৪ সালের অক্টোবর মাসে গ্যাজেট প্রকাশের পর ৭০% সমস্যা সমাধান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মালিকদের সিন্ডিকেট কর্তৃক উচ্চ আদালতে রীট করে গ্যাজেট স্থগিত হয়ে যাওয়ায় আবারো পূর্ব অবস্থায় ফিরে গেছে।
৪. বিশ্ব ব্যাপী জাহাজে অবস্থানকালীন (On Board) অবস্থায় থাকা এবং খাওয়ানোর দায়িত্ব মালিকের থাকে। এটা অন্তর্জাতিকভাবে একটি স্বীকৃত পন্থা হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মালিকেরা তা পালন করে না। এ দাবি জানালে পরবর্তীতে সেটা মাসিক ১০০০।- টাকা খাদ্য ভাতা ধার্য করা হয়। অথচ শ্রমিকেরা টাকা চায়নি।

মৎস্যজীবী

১. ফিশিং ট্রলার মৎস্যজীবীদের জন্য ২০২২ সালে প্রকাশিত গ্যাজেট বাস্তবায়নের দাবি।
২. ২৩ মে থেকে ২২ জুলাই মৎস্য আহরণ বন্ধ থাকে। যা বাস্তব সম্মত নয়। এই সময়সীমা ১৫ দিন কমানো অথবা ১৫ দিন এগিয়ে আনলে ভালো হতো।
৩. জেলেরা মারা গেলে মাত্র ৫০ হাজার টাকা পায়। এটা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা হওয়া উচিত।
৪. মৎস্য আহরণ বন্ধের সময় যে চাউল প্রদান করা হয় তা খাওয়ার অযোগ্য। তাছাড়া চাউল যদি মৎস্যজীবী প্রতিনিধিদের মাধ্যমে বন্টন করা হয় ভালো হতো। কারণ কাউন্সিলরদের মাধ্যমে বন্টন করলে তাতে কিছু খরচ প্রদান করতে হয়। নাহলে চাউল পাওয়া যায় না। অনেক পরিবার সরাকারী তালিকাভুক্ত না হওয়ায় চাউল পায় না। সেক্ষেত্রে যারা পায় তাদেরকে কম দিয়ে যারা পায় না তাদেরকে কিছু দিয়ে ম্যানেজ করা হয়। তাছাড়া বন্ধের সময় শুধু চাউল দিলে লাভ নাই। আরও সুযোগ সুবিধা দেওয়া উচিত।
৫. মৎস্য আহরণ বন্ধের সময় বিকল্প কর্ম সংস্থান থাকা উচিত।
৬. সাগরে কতজন মাছ ধরতে যায় এবং কতজন ফিরে আসে তার একটা হিসাব থাকা দরকার। এইজন্য তদারকি ব্যবস্থা জোরদার হওয়া দরকার।
৭. দাদন প্রথা মৎস্যজীবীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে। এই প্রথা বাতিল করে সরকারি উদ্যোগে স্বল্প সুদে ঋন পাওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত।
৮. অনেক মৎস্যজীবী গৃহহীন। তাদেরকে আবাসনের ব্যবস্থা থাকা জরুরি।।
৯. প্রত্যেক ঘাটে একটি করে সাইক্লোন সেন্টার থাকা দরকার।
১০. মাছ ধরতে গেলে কোনো ধরনের সিগন্যাল পাওয়ার ব্যবস্থা নাই। সিগন্যালের ব্যবস্থা করা উচিত।
১১. জেলে পাড়ায় স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা করা উচিত।

স্বাস্থ্য

১. বেসরকারি স্বাস্থ্য সেক্টরে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করার উদ্যোগ নিতে হবে।
২. বেসরকারি স্বাস্থ্য সেক্টরে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠিত হতে হবে।
৩. বিভিন্ন সময় শ্রমিকদের আন্দোলনের মুখে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছে। কিন্তু বেশিরভাগ চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তিসমূহ বাস্তবায়িত হতে হবে।
৪. শ্রমআদালতে মামলা করতে গিয়ে দীর্ঘসূত্রতার কারণে শ্রমিকেরা হয়রানির শিকার বন্ধ করতে হবে।
৫. শ্রমিকদের জন্য ক্যান্টিন সুবিধা চাই।
৬. ডে কেয়ার সেন্টার।
৭. হয়রানিমুক্তভাবে মজুরিসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে।
৮. মহিলা শ্রমিকদের ড্রেস চেঞ্জ করার কোনো আলাদা রুম দরকার।
৯. প্রভিডেন্ট ফান্ড দিতে হবে।
১০. একটি বেসরকারি হাসপাতালে ক্যান্টিনে চাকরিরতরা মজুরি পায় ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকা। ২৩ জনের জন্য মাত্র ৩ টি রুমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটা প্রায় সকল বেসরকারি হাপাতালের চিত্র। তাদের সুযোগ সুবিধা বাড়াতে হবে।
১১. সবেতন ছুটি এবং উৎসব ছুটি দিতে হবে।
১২. আইন বাস্তবায়নে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের ভূমিকা ও মনিটরিং আরো জোরদার হওয়া উচিত।
১৩. নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানির বন্ধ করা।

শিপ ব্রেকিং

১. চাকরি স্থায়ীকরণ ও মজুরি বৃদ্ধি।
২. ইয়ার্ডে কোনো এ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা।
৩. শ্রমিকদেরকে যথাযথভাবে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রি দেয়া।
৪. একটা জাহাজ কাটা শেষ হলে অন্য আরেকটি জাহাজ আনা পর্যন্ত যে গ্যাপ পড়ে, সেই সময়ে শ্রমিকেরা কোনো মজুরির ব্যবস্থা করা।
৫. শ্রমিকদের কালার কোড সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়া ফলে ঝুঁকিপূর্ণ জায়গা সম্পর্কে শ্রমিকদের পরিষ্কার ধারনার হবে।
৬. পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানির, ক্যান্টিন, ডাইনিং রুমের ব্যবস্থা করা।

৭. ২০১৮ সালে ঘোষিত নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন করা।
৮. শ্রমিকদের উৎসব বোনাস দেয়া।
৯. সবেতন কোনো ছুটি, সশরীরে কাজ না করলেও মজুরির ব্যবস্থা করা।
১০. শ্রমিকদেরকে নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, সার্ভিসবুক দেয়া।
১১. কিছু কিছু ইয়ার্ড কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাছ থেকে ২টা মজুরি শীটে স্বাক্ষর নিয়ে থাকে। মজুরি দিতে বিলম্ব না করা।
১২. ইয়ার্ডে জরুরি/প্রাথমিক চিকিৎসা ব্যবস্থা, এমবিবিএস ডাক্তার, কোনো মেডিক্যাল রুমের ব্যবস্থা করা।
১৩. বিএসবিএ হসপিটালে জাহাজভাঙা শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
১৪. লাইসেন্স বিহীন ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করা।
১৫. শ্রমিকদেরকে প্রতিদিন ১২ ঘণ্টা করে ডিউটি করতে হয়। কিন্তু কোনো ওভারটাইম ভাতা পায় না। ওভারটাইম ভাতা দেওয়া।
১৬. পোশাক পরিবর্তনের জন্য কোনো রুমের ব্যবস্থা করা।
১৭. আগে ইয়ার্ড ভিত্তিক ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন হতো বিধায় বর্তমানে ১৩টা ইউনিয়ন আছে। কিন্তু বর্তমানে প্রতিষ্ঠান পুঞ্জ ভিত্তিক হওয়ায় এবং ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া ঢাকায় স্থানান্তরিত হওয়ায় ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। পূর্বের ইউনিয়ন গুলোও অনেকটা অকার্যকর হয়ে পড়েছে। বর্তমানে ৫টি গ্রিন শিপ ইয়ার্ডে অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে বটে কিন্তু শ্রমিক অধিকারের কোনো উন্নতি হয়নি। এক্ষেত্রে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া।
১৮. পেশাগত রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের ব্যাপারে কারও কাছে কোনো তথ্য নাই। তাদের জন্য চিকিৎসা খরচ এবং মজুরির ব্যবস্থা করা।
১৯. শ্রমিকদের গ্রুপ বিমা করা।
২০. শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার তথা সংগঠিত হওয়া এবং দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা।
২১. শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটা বিশেষায়িত ইনস্টিটিউট থাকা দরকার।
২২. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ শ্রমিকদের একটা সেন্ট্রাল ডাটাবেজ থাকা দরকার।
২৩. ইয়ার্ড বা প্রতিষ্ঠান স্থায়ী হলেও ইয়ার্ডে কর্মরত শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ী হয় না। তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ।

রিরোলিং মিল

১. মালিকের কারণে কারখানা বন্ধ থাকলেও শ্রমিকেরা কোনো মজুরি পায় না। কারখানা বন্ধের সময়ও মজুরি দেওয়া।
২. কোনো কারণ ছাড়া মৌখিক নির্দেশে বের করে দেয়া যাবে না।
৩. ক্ষতিপূরণ দেয়া।
৪. দৈনিক ৮ ঘণ্টার অতিরিক্ত আরো ৩/৪ ঘণ্টা কাজ করলেও তার জন্য কোনো ওভারটাইম ভাতা পাওয়া যায় না। ওভারটাইম ভাতা দেওয়া।
৫. দুর্ঘটনায় শ্রমিক আহত হলে মালিক পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা।
৬. মিথ্যা মামলার হুমকি বন্ধ করা।
৭. অতিরিক্ত তাপমাত্রায় কাজ করতে হয়। প্রতি ঘণ্টা কাজের পর ১৫ মিনিট করে বিরতি দেয়ার নিয়ম মানা।
৮. ক্যান্টিন বা ডাইনিং ফ্যাসিলিটি দেওয়া।
৯. গ্রুপ বিমা করা।
১০. দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু হলে বা পঙ্গু হলে শ্রম আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরন এবং চিকিৎসা দেওয়া।

বিউটি পার্লার

১. বিউটি পার্লার কর্মীদের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ৩ মাসের ট্রেনিং করানো হয়। ট্রেনিং শেষে দ্রুত সার্টিফিকেট এবং ভাতা দেওয়া।
২. স্ব-উদ্যোগে পার্লার দিতে চাইলে সরকারি অনুদান বা ঋন সুবিধা দেওয়া।
৩. এই সেক্টরে কর্মরতদের মাসিক বেতন ৪ হাজার থেকে ৯ হাজার টাকা মাত্র। তাই বেতন বাড়ানো উচিত।
৪. সবেতন ছুটি দেয়া।
৫. নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র দেয়া।
৬. এই সেক্টরে কাজ নেই মজুরি নেই পদ্ধতিতে বন্ধ করা।
৭. বাচ্চাদেরকে কর্মস্থলে নিতে দেয়া।
৮. উৎসব বোনাস দেওয়া
৯. সময়মত বেতন দেয়া।
১০. চাকরির নিশ্চয়তা দেওয়া। যে কোনো সময় ছাটাই বন্ধ করা।

নির্মাণ

১. নির্মাণ শ্রমিকদের সেন্ট্রাল ডাটাবেজ করে সরকারি কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে পরিচয়পত্র দেয়া দরকার। নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা দরকার।
২. কাজের নির্দিষ্ট রেট থাকা দরকার। কেউ নির্দিষ্ট রেটের কম রেটে কোনো কাজের চুক্তি হলে মালিক এবং ঠিকাদার উভয়ের জরিমানার ব্যবস্থা থাকা উচিত।
৩. এই সেক্টরের কোনো শ্রমিক আহত হলে মালিকের পক্ষ থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায় না। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকেও কোনো অনুদান দেয়া।

৪. দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত শ্রমিকেরা অনুদান পাওয়ার জন্য আবেদন জানালে ২/৩ বছর সময় লেগে যায়। দ্রুত অনুদানের ব্যবস্থা করা।
৫. অনুদানের জন্য দরখাস্তের নিয়ামলী এবং শর্ত আরো সহজ করা দরকার।
৬. বিদেশ যেতে ইচ্ছুক নির্মাণ শ্রমিকদের পাসপোর্ট এবং ভিসা প্রসেসিং সহজ করা উচিত।
৭. দুর্ঘটনা ঘটলে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশের পক্ষ থেকে গুরুত্ব দেয়া।
৮. একসময় নির্মাণ শ্রমিকদের গ্রুপ বীমার প্রচলন ছিল সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা গ্রুপ বিমা না করে একক বিমা প্রচলন করা দরকার। বিমা ছাড়া কোনো শ্রমিক যাতে উঁচু ভবনে কাজ করতে না পারে সেই ব্যবস্থা থাকা দরকার।
৯. কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা দরকার।
১০. সকল শ্রমিকদের পান করার জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা থাকা দরকার।
১১. নির্মাণ শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি মিস্ত্রীর দৈনিক ১৫০০ টাকা এবং হেল্পারের দৈনিক ১০০০ টাকা হওয়া দরকার।
১২. শ্রম ঘন এলাকায় প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মাণ শ্রমিকদের শেড থাকা দরকার। শেডে টয়লেট, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা এবং ইন্ডোর গেম (ক্যারাম, লুডু এবং দাবা) এর ব্যবস্থা থাকা দরকার।
১৩. দুর্ঘটনায় শ্রমিক নিহত হলে ক্ষতিপূরণ ৮ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ী পঙ্গু হলে ১২ লক্ষ টাকা হওয়া দরকার।
১৪. সেফটি বিষয়ে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

ইপিজেড

১. মালিক কর্তৃক নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র দেয়া হয় কিন্তু সার্ভিসবুক দেয়া হয় না। সার্ভিসবুকও দেয়া।
২. সবেতন ছুটি দেওয়া।
৩. ছুটি নেওয়ার ব্যবস্থা সহজ করা।
৪. চিকিৎসা করানোর জন্য বেপজা মেডিক্যালে যাওয়ার অনুমতি দেয়া।
৫. অর্জিত ছুটির টাকা কিছু প্রতিষ্ঠান নগদায়ন করে আবার কিছু প্রতিষ্ঠান নগদায়ন করে না।
৬. মাতৃত্বকালীন ছুটিও দেয়া।
৭. নারী শ্রমিকদের সন্তানদের লালন-পালনের জন্য কোনো ডে-কেয়ার সেন্টার করা।
৮. WWA কমিটির নির্বাচন হয় না। মালিকের পছন্দমত কয়েকজনকে দায়িত্ব দেয়া হয়।
৯. প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্য টাকা জমা নেয়া হয় না। প্রভিডেন্ট ফান্ড পরিচালনার জন্য কোনো ট্রাস্টিবোর্ড নেই।
১০. শ্রমিকেরা রিজাইন দিলে বা মালিক কর্তৃক জোরপূর্বক বের করে দিলে শ্রমিককে কোনো ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না।
১১. দুপুরে মালিক কর্তৃক সরবরাহকৃত খাবারের মান বাড়ানো।
১২. শ্রমিকদের জন্য কোনো ক্যান্টিন করা।
১৩. বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট সঠিকভাবে মানা।/মিনিমাম ইনক্রিমেন্ট সবাইকে দেয়া।
১৪. সুপারভাইজার থেকে উপরের পোস্টে নারী শ্রমিক নিয়োগ দেয়া।
১৫. সুপারভাইজার থেকে উপরের পোস্টে কর্মরত শ্রমিকদের অফিস স্টাফ নামকরণ করা হয়ে থাকে। এদেরকে কোনো ওভারটাইম ভাতা দেয়া। বন্ধের দিন কাজ করলে অতিরিক্ত মজুরি দেয়া। তাদের কোনো প্রেজেন্ট বোনাস দেয়া।
১৬. শ্রমিককে তাদের পছন্দ না হলে তাকে জোর পূর্বক বের করে দেয়া যাবে না। অঘোষিতভাবে তাকে কালো তালিকাভুক্ত বন্ধ করা।
১৭. কোনো কারণ ছাড়াই শুধুমাত্র মৌখিক নির্দেশে বা প্রতিষ্ঠানের সাউন্ড সিস্টেমে ঘোষণা দিয়ে শ্রমিকদের শাস্তি দেয়ার বিধান বন্ধ করা।
১৮. বৈষম্যমূলক নিয়োগ বন্ধ করা। (অপারেটর বা হেল্পার নিয়োগের সময় নারী শ্রমিকদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। আর অপারেটর বা হেল্পার এর উপরের পোস্টে নিয়োগের সময় পুরুষ শ্রমিক আগ্রাধিকা পায়।)
১৯. প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবহণ ব্যবস্থা সরবরাহ করা।
২০. মজুরি প্রদানের সময় সীমা নির্ধারণ।

শ্রম অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম

১. বর্তমান আইনে শুধু সিবিএ/ট্রেড ইউনিয়ন শ্রম দপ্তরে অভিযোগ করতে পারেন। সংশোধন করে আইনে আনতে হবে। ব্যক্তি যাতে চাকরি সংক্রান্ত বিষয়ে শ্রম দপ্তরে সরাসরি অভিযোগ করতে পারে।
২. বোনাস বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করা উচিত।
৩. ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন নিয়ে সুনির্দিষ্ট আইন বাস্তবায়ন।
৪. গঠনতন্ত্র, শ্রম আইন, শ্রম বিধি লঙ্ঘন করলে ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।
৫. নির্দিষ্ট সময়ে ইউনিয়ন নির্বাচন না হলে মেয়াদ শেষে আর দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। (কার্যকরী কমিটি ও সিবিএ) এই বিধান সংযোজন করতে হবে।
৬. ইউনিয়ন কন্ট্রোল করার ক্ষমতা শ্রম আইনে আনতে হবে।
৭. কর্মক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিক ছাড়া অন্য কাউকে ইউনিয়ন করার সুযোগ দেওয়া যাবে না।
৮. সকল মামলা শ্রম আদালতে হতে হবে। এখন অনেক মামলা সিভিল কোর্টে করা হয়।
৯. ধর্মঘট করা আইনে সহজতর করতে হবে।
১০. শ্রম আদালতের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন করে সক্রিয় ও সহজ করার ব্যবস্থা করতে হবে।
১১. শ্রম বিষয়ে হাইকোর্টে যেন মামলাগুলি সহজে আমলে না নেন, আইনে তার নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রাখতে হবে।
১২. চা বাগানের এক ইউনিয়ন/জাতীয় ভিত্তিক ইউনিয়ন দরকার নেই। আঞ্চলিক ইউনিয়ন করা যেতে পারে।

১৩. বন্দরের এক ইউনিয়ন তুলে দিয়ে একাধিক ইউনিয়ন করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

ডাইফি, চট্টগ্রাম

১. আউটসোর্সিং একটি বড় সমস্যা শিপ ইয়ার্ডসমূহে, সরকারি প্রতিষ্ঠান সহ অনেক জায়গায় আউটসোর্সিং প্রথা আছে। আউট সোর্সিং-এ মূলত শ্রমিকদের অনেক মৌলিক ও আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।
২. কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
৩. শ্রম আইন সংশোধন করে মালিক এবং শ্রমিকদের সংজ্ঞা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
৪. DIFE এর জনবল এবং ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে, যেন প্রয়োজনে পরিদর্শকেরা মালিককে সরাসরি পেনাল্টি করতে পারে।
৫. ঝুঁকিপূর্ণ কর্মক্ষেত্র নিয়ে মালিকদের, বিশেষজ্ঞ সহায়তা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করার DIFE কে ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।
৬. শ্রম আইনে দূর্বলতা দূর করতে হবে যাতে কোনো আইন আইন লঙ্ঘনকারী বের হতে না পারেন।
৭. DIEF কে ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষমতা দিলে ভালো হয়। মোবাইল কোর্টে বর্তমান শ্রম আইন অনুসারে প্রতিকার পাওয়া যাবে না।
৮. শ্রম আইনে মামলা করার প্রক্রিয়া সহজিকীকরণ করতে হবে। শ্রম আদালতে মামলা করলে পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি সহ অন্যান্য বিষয়ের খরচ দিতে হয়।
৯. প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া।
১০. ডিজি সাহেবের অর্ডার সর্ম্পকে স্পষ্টকরণ করা উচিত। অফিস অর্ডার বিশেষ অধিক্ষেত্র অনুসারে ভাগ করে নিতে হবে। অধিক্ষেত্রের বাহিরে কাউকে দায়িত্ব দিলে ক্ষমতা অর্পনের পত্র ইস্যু করা এই বিষয়ে আইনে অন্তর্ভুক্তকরণ।
১১. DIFE তে নিয়মিত পদোন্নোতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।
১২. শ্রমিকের পাওনা পরিশোধের আইন পরিবর্তন করতে হবে। (ব্যাখ্যা সহ) দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সময় কর্ম ঘণ্টা হিসাব করার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।
১৩. শ্রম আইনে দোকান, কারখানা শিল্পের সুনির্দিষ্ট সংস্থা ঠিক করতে হবে। বীমার টাকা পাওয়ার হিসাব নিয়ে সুনির্দিষ্ট আইন করতে হবে।
১৪. সংগঠন করার অধিকার ইপিজেডসমূহে DIFE কোনো ক্ষমতা নেই।
১৫. শ্রমিক অসন্তোষ দূর করার জন্য মালিকেরা শ্রমিকের বেতনের একটা অংশ সরকারি কোষাগার (শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়) এ শ্রমিকের সংখ্যানুপাতে জমা রাখবে।
১৬. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় যাতে শিশু শ্রম নিরষনের জন্য একটা পুনর্বাসন বাজেট দেওয়া।
১৭. ২৩ ও ২৪ ধারায় (২৩ (খ) ও (ছ) সহ শ্রমিক বরখাস্ত/অপসারণ করলে পাওনা কি পাবে, কীভাবে পাবেন তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
১৮. শ্রমিক প্রতিনিধি নির্ধারণের নিয়ম সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
১৯. মজুরি কাল সুনির্দিষ্ট করতে হবে। বাংলা বা ইংরেজি ঠিক করে দিতে হবে।
২০. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইস্যুগুলি দেওয়ার আগে সরকারি দপ্তরসমূহের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সম্পর্কে নির্ধারণ করতে হবে।
২১. ৬১, ৮৫ ধারা DIFE কে দিয়ে দায়িত্ব এড়ানো হয়।
২২. ভবন, অগ্নি পরিবেশ, বিদ্যুৎ সহ সকলকে আলাদা আলাদাভাবে দায়িত্ব দিতে হবে।
২৩. সিকিউরিটি সহ সকলের ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষমতা থাকা উচিত।
২৪. মালামাল ক্রয়ের ক্ষমতা সহ একটি কমিটি গঠন করা। (টাস্কফোর্স গঠন) শিশু শ্রম নিরসন পুনর্বাসন করতে ব্যবস্থা করতে হবে।
২৫. সাময়িক শ্রমিক ও অস্থায়ী শ্রমিকের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা।

শিল্প সর্ম্পক শিক্ষায়তন, চট্টগ্রাম

১. শিশু-শ্রমের শিশু দের উপবৃত্তি দেওয়া।
২. দপ্তর গুলোর সমন্বয় ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে কাউন্টার পার্ট হওয়া উচিত।
৩. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মালিক শ্রমিককে এক মঞ্চে আনার ব্যবস্থা।
৪. প্রবাসিরা যাতে তাদের আয়কে দেশে বিনিয়োগ করে আয় করতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত।
৫. প্রবাসিদের জন্য সরকারি সেবা সহজতর করতে হবে।

শ্রম অধিদপ্তর

১. DoI শ্রমিকের সরাসরি স্বাক্ষর ছাড়া ৫৫ (ক) জমা দেওয়া বন্ধ করতে হবে (ভুয়া স্বাক্ষর বন্ধ করতে হবে)।
২. শ্রমিকের ডাটা বেজ করতে হবে।
৩. ইউনিয়নের সদস্য তালিকা ঠিক করতে হবে।
৪. রেজিস্ট্রার ইউনিয়নের হালনাগাদ সদস্য রেজিষ্ট্রার DoI এ জমা দিতে
৫. ফেডারেশনের সদস্য ইউনিয়নগুলির তালিকা DoI এ জমা দিতে হবে।
৬. লেবার কোর্টে কার্যকরী কমিটির বিষয়ে মামলা চলবে না। এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনা করতে হবে।
৭. তিন বছর/৫ বছর পর পর DOL/DIFE কর্মকর্তা কর্মচারী বদলীর বিষয়ে নির্দেশনা। বদলীকৃত সরকারি কর্মকর্তাগণ ৫ বছরের মধ্যে পূর্বের কর্মক্ষেত্রে ফিরে না আসার আইন করা উচিত।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম।

১. কাজের ধরন অনুযায়ী পদ-পদবি সহ মজুরি নির্ধারণ।

২. জনবল বৃদ্ধি।
৩. ডাক্তারদের উচ্চতর ট্রেনিং, বদলীর সুযোগ দেওয়া, পেশনে বদলীর ব্যবস্থা করা।
৪. পরিচালক মেডিকেল পদ রেখে অর্গানোগ্রাম ঠিক করা।
৫. পদ-বিন্যাস ঠিক রাখা
৬. পদোন্নোতি নিয়মিত কর।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট মৌলভীবাজার

১. শ্রমিকদের খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে জীবনযাপনের জন্য মান-সম্পন্ন মজুরি নির্ধারণের মাপকাঠি প্রবর্তন সহ রেশন, আবাসন, হেলথ কার্ড, পেনশন, গ্র্যাচুইটি ও বেকার ভাতা চালু করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি। সর্বজনীন পেনশন স্কীমে শ্রমজীবীদের অংশগ্রহণ এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করার সুপারিশ করছি।
২. কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মস্থলে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত শ্রম আইনের বিধান আই.এল.ও কনভেশন ১২১এর আলোকে সংশোধন করা আবশ্যক। কর্মক্ষেত্রে ইনজুরিতে ক্ষতিপূরণ স্কিম, সকল শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্য বিমা ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।
৩. শ্রম আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ২০১৮ সালের আউটসোর্সিং নীতিমালা বাতিল করে, আউটসোর্সিং ও ঠিকাদারদের মাধ্যমে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ নিশ্চিত করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।
৪. চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা, নিয়োগপত্র প্রদান এবং চাকরির অবসান সুবিধাসহ অন্যান্য শ্রমিকদের মতো সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।
৫. চা বাগান, গৃহ কর্মী, হোটেল রেস্টুরেন্টে কর্মরত নারী শ্রমিকদের সুরক্ষায় পদক্ষেপ গ্রহণব প্রয়োজন। সকল শ্রমজীবী মায়ের সমহারে মাতৃত্বকালীন সুবিধা নিশ্চিত করা, নারীর বিকাশে কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও হয়রানিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে শ্রম আইনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
৬. ব্যাটারি চালিত রিকশার নীতিমালা প্রণয়ন, আধুনিকায়ন এবং রোড পারমিট, লাইসেন্স প্রদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা, মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা বিধান, পাদুকা শ্রমিক ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কাজের নিরাপত্তা প্রদানের সুপারিশ জানাচ্ছি। একইভাবে, পর্যটন শিল্পের দিকে বিশেষ মনযোগ প্রদানের সুপারিশ জানাচ্ছি।

অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি এবং রাষ্ট্রয়াত্ত সকল কর্মচারী

- রাষ্ট্রয়াত্ত সকল ব্যাংকের অস্থায়ী কর্মচারীদের বৈষম্য দূরীকরণ এবং ১১-২০তম কর্মচারীর পদ বিলুপ্ত না করে ব্যাংকের চাকরি বিধিমালা অনুযায়ী অস্থায়ী কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ বিষয়টি শ্রম সংস্কার নথিতে সুপারিশ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশন

১. দেশের সকল প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প ও কলকারখানা, রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চল ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করে, সকল শ্রমিকের জন্য ১টি অভিন্ন, সমন্বিত, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
২. বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ মোতাবেক সকল প্রাতিষ্ঠানিক, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিশেষ করে গৃহ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, অটো রিকশা শ্রমিক, বাইক চালক, গিগ শ্রমিক (রাইড শেয়ারিং, প্লাটফম, ই-কর্মাস), চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক, আউটসোর্সিং শ্রমিকদের কে শ্রমিক অধিকারের স্বীকৃতি ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ সংশোধন করা।
৩. বাংলাদেশের এনজিও, সিবিও এবং সিএসও কর্মীদের শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্তি প্রয়োজন।
৪. শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের নামে ২০১০ সাল থেকে সকল ষড়যন্ত্রমূলক ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।
৫. শ্রম আদালতে মামলা নিষ্পত্তি দ্রুত করার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে।
৬. ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প সম্পর্ক বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও রেজিষ্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজিকরণ।
৭. শ্রমজীবীদের জন্য একটি অভিন্ন মজুরি কাঠামো থাকতে হবে যা জাতীয় নিম্নতম মজুরি হিসাবে গন্য হবে। অতঃপর ভিন্ন ভিন্ন প্রতিটি সেক্টরের জন্য আলাদা আলাদা মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে। এই মজুরি কাঠামো কোনো ভাবেই জাতীয় নিম্নতম মজুরি হারের চেয়ে কম হবে না, বেশি হতে পারবে।
৮. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের সকল শ্রমিকদের কে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ডেটাবেস তৈরি করে তাদের কে ছবিসহ আইডি কার্ড দিতে হবে।
৯. শ্রমজীবীদের জন্য কমমূল্যে প্রয়োজনীয় নিত্যপন্য সামগ্রী রেশনিং পদ্ধতীতে প্রদান করতে হবে।
১০. বেকার শ্রমজীবী, অক্ষম শ্রমজীবী, বয়স্ক শ্রমজীবী এবং অবসরকৃত শ্রমজীবীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো/বলয় গড়ে তুলতে হবে।
১১. গ্রিন লিড সনদ প্রাপ্ত কারখানায় সহজ বা বাধ্যতামূলক ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
১২. দেশের শিল্প এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে শিল্প পুলিশ বিলুপ্তি করে, মালিক-শ্রমিক-শ্রমিক প্রতিনিধি ও সরকার এর সমন্বয়ে শিল্প সম্পর্ক সেল তৈরি করা ও সামাজিক সংলাপ জোরদার করা।
১৩. বিজিএমইএ-র কর্মচারী দ্বারা সিন্ডিকেট তৈরি করে শিল্পে অশান্তি, অসন্তোষ তৈরি করে বিজিএমইএ লেবার সেল ও ক্রাইসিস কমিটি পূর্ণ গঠন করা।
১৪. বিজিএমইএ এর দায়িত্বে থাকা ডাটা বেস ডাইফ কে ফিরিয়ে দিতে হবে এবং সকল কালো তালিকা বাতিল করতে হবে।

১৫. আনসার, পুলিশ ও যৌথ বাহিনী দ্বারা গুলিতে আহত ও নিহত শ্রমিকদের আইএলও কনভেনশন হিসাবে ক্ষতিপূরণ ও তদন্ত করে দোষীদের শাস্তি প্রদান করা।
১৬. যে সকল মালিকদের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতায় শ্রমিক মজুরি থেকে বঞ্চিত ও আন্দোলন করতে বাধ্য হয়েছে তাদের কে আইনের আওতায় আনা।
১৭. কোনো কারণে কারখানা বা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে শ্রমিকদের শ্রম আইন মোতাবেক সকল পাওনাদি মালিক ও সরকার ব্যবস্থা করবেন।
১৮. বাংলাদেশের সকল রেজিস্টার্ড শ্রমিক ফেডারেশন এর নেতৃবৃন্দদের সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রম আইনে সংশোধন করে, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা কর্যকর করা।
১৯. অটোমেশন/ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
২০. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ করা।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন

১. ১০ আগস্ট ২০২৩ সালে চা শ্রমিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতি ছাড়া নিম্নতম মজুরি বোর্ড কর্তৃক প্রণীত একতরফা গেজেট বাতিল করতে হবে। দৈনিক মূল মজুরি ৫০০টাকা নির্ধারণসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করতে নতুন গেজেট প্রকাশ করতে হবে।
২. শ্রম আইনের ৩২ ধারার সংশোধন করে চা শ্রমিকদের বাসস্থান নিশ্চিত করতে হবে। চা জনগোষ্ঠী দীর্ঘ প্রায় ১৭০ বছরের উপর যে ভূমিতে বসবাস করছেন তাতে এবং ২০২২ সালের আগস্টে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত 'চা শ্রমিকদের ভূমি অধিকার' নিশ্চিত করতে হবে।
৩. শ্রম আইনের ১১৫ধারা সংশোধন করে অন্যান্য শিল্পের ন্যায় চা শ্রমিকদের ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটির বিধান রাখতে হবে।
৪. শ্রম আইনের ১১৭ (খ) ধারা সংশোধন করে প্রতি ২২দিন নয়, অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের মতো চা শ্রমিকদের জন্য প্রতি ১৮দিনে ১দিন অর্জিত ছুটির ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৫. শ্রম আইনের ২৬ ধারায় স্থায়ী বা অস্থায়ী শ্রমিককে কোনো কারণ না দেখিয়েই চাকরিচ্যুত করার যে অগণতান্ত্রিক ক্ষমতা মালিকদের দেয়া হয়েছে, তা সংশোধন বা বাতিল করতে হবে এবং শ্রম আইনের ২৮ ধারা সংশোধন করে চা শ্রমিকদের জন্য গ্র্যাচুইটি নিশ্চিত করতে হবে।
৬. শ্রম আইনের ৯৯ ধারা অনুযায়ী চা শ্রমিকদের গ্রুপ বীমার সুযোগ দিতে হবে।
৭. শ্রম আইনে চা শ্রমিক নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬মাস করতে হবে।
৮. শ্রম আইনের ২৩,২৬ এবং ২৭ ধারার অপব্যবহার করে চা শ্রমিকসহ যেকোনো শ্রমিককে কর্মচ্যুত করা, ন্যায্য পাওনা ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ রয়েছে। এ ধারার সংশোধন প্রয়োজন।
৯. চা শ্রমিকদের শিক্ষার অধিকার বাস্তবায়ন করতে প্রতিটি চা বাগানে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করতে হবে। শিক্ষাবৃত্তি, বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. প্রতিটি বাগানে একজন এমবিবিএস ডাক্তার, প্রশিক্ষিত মিডওয়াইফ এবং অনন্ত একটি আধুনিক মেডিক্যাল সেন্টার স্থাপন করতে হবে।
১১. চা শ্রমিকদের ইতিহাস ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতিকে রক্ষার বন্দোবস্ত করতে হবে।
১২. ১৯২১ সালের ২০ মে সংঘটিত ঐতিহাসিক 'মুল্লুক চলো' আন্দোলনকে চা শ্রমিক দিবস হিসেবে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশ রেল শ্রমিক ইউনিয়ন

১. রেলওয়েকে বিরাষ্ট্রীয়করণের সকল চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে অন্যথায় পূর্বের ন্যায় কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
২. বৈষম্য মুক্ত ৯ম পে-স্কেল দ্রুত ঘোষণা করতে হবে।
৩. রেলের নিয়োগবিধি ২০২০ বাতিল করে পূর্বের নিয়োগবিধি ১৯৮৫ পূনর্বহাল করে সকল কর্মচারীদের প্রশিক্ষণে মাধ্যমে পদোন্নতির দ্রুত ব্যবস্থা করতে হবে এবং সকল ধরনের ব্লক পোস্ট প্রত্যাহার করতে হবে।
৪. নতুন বিভাগের নামে অযাচিত কর্মকর্তার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় শ্রমিক সংখ্যা কমানোর মাথাভারী প্রশাসন সৃষ্টি বন্ধ করতে হবে।
৫. প্রতিটি প্রকল্পের টেকসই উন্নয়ন ও আর্থিক অপচয় রোধে মনিটরিং সেল গঠন করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
৬. সকল ট্রেনে বিনা টিকেটে যাত্রি পরিবহন বন্ধ করতে হবে। জিআরপি, নিরাপত্তা, খাবার, গাড়ি স্টাফ কর্তৃক কাউন্টারে সামনে থেকে অথবা রানিং অবস্থায় বিনা টিকেটে যাত্রি আনা নেওয়া কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রন করতে হবে।
৭. রেলওয়ের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বুয়েটের সহযোগিতায় রেলওয়ে সফটওয়্যার প্রকল্প গ্রহণ করে টিকেট প্রদান করতে হবে।
৮. সৈয়দপুর এবং পাহাড়তলী কারখনার লোকবল নিয়োগ করে কোচ মেরামত কাজ সচল রাখতে হবে। পূর্বের ন্যায় খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। লোকাল পার্চেজের নামে অর্থ লোটপাট বন্ধ করতে হবে এবং অর্থ লুটপাটকারীদের তদন্ত স্বাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
৯. সকল ডিজেল কারখানা গুলো আধুনিকায়ন করে লোকোমেটিও মেরামত করতে হবে এবং রাজবাড়িতে নতুন কারখানা তৈরি দ্রুত করতে হবে এবং দক্ষিনাঞ্চলের জন্য রাজবাড়িতে বিভাগীয় দপ্তর করতে হবে।
১০. আউটসোর্সিং নীতিমালা বন্ধ করা, লেভেল ক্রসিং গেইটসহ সকল অস্থায়ী পদ স্থায়ী মঞ্জুরী করে টিএল আর কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ করতে হবে।
১১. রেশনিং প্রথা চালু করতে হবে এবং সকল প্রকারের ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

১২. সকল রেলওয়ে হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারিতে শূর্নপদে ডাক্তার, নার্স সহ অন্যান্য ষ্টাফ নিয়োগ নিশ্চিতকরণসহ স্বাস্থ্যসেবায় মানসম্পন্ন ঔষধ সরবরাহ করতে হবে এবং সকল প্রকার দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।
১৩. সকল রেলওয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করে শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে।
১৪. এলাকা ভিত্তিক বাসাভাড়া নির্ধারণ করে রেভিনিউ আয় বৃদ্ধি করতে হবে এবং সারা দেশে অবৈধ দখল বাসা উচ্ছেদ করে কর্মচারীদের মধ্যে বরাদ্দ দিতে হবে।
১৫. আখাউড়া হইতে সিলেট, জয়দেবপুর হইতে জামালপুর, ঢাকা হইতে লাকসাম কর্ড লাইন, ভাঙ্গা হইতে কুয়াকাটা এবং বগুড়া হইতে সিরাজগঞ্জ ডুয়েল গেজ ডাবল লাইন রেলপথ নির্মাণ করতে হবে।
১৬. নতুন রেলপথ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থায়ী পদ সৃষ্টি করে লোকবল নিয়োগ করতে হবে এবং ঠিকাদারের মাধ্যমে রেলপথ রক্ষনাবেক্ষনের নামে অর্থ লুটপাট বন্ধ করতে হবে।।
১৭. বাংলাদেশ রেলওয়েতে রেল দুর্ঘটনা সংগঠিত এলাকায় ট্রেন উদ্ধারের জন্য রিলিফ ট্রেনসহ যান্ত্রিক বিভাগের নিয়েজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য দুর্ঘটনা স্থলে কাজের সময়ে খাবারের ব্যবস্থা থাকলেও প্রকৌশল বিভাগের ওয়েম্যান ও মেটসহ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কোনো খাবারের ব্যবস্থা করা হয় না। যাহা বৈষম্যমূলক আচরন। জরুরি ভিত্তিতে একই নিয়ম সর্বক্ষেত্রে চালু করতে হবে।
১৮. শ্রম আইনানুযায়ী ৮ ঘণ্টার অতিরিক্ত ডিউটি করলে ওভারটাইম ভাতা দিতে হবে।
১৯. এটেনডেন্টদের ৭৫% মাইলেজ যোগ করে অবসরকালে পেনশন প্রদান করতে হবে এবং পাওয়ারকার ড্রাইভার, এসি অপারেটরসহ সকল রানিং কর্মচারীদের রানিং স্টাফ হিসাবে গন্য করে মাইলেজ প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র

১. অনতিবিলম্বে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫-কে গৃহশ্রমিকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জন সাপেক্ষে আইনে পরিণত করতে হবে।
২. গৃহশ্রমিকদের অপ্রাতিষ্ঠানিকতার ধরন সংকুচিত করে এনে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে শ্রম আইন প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে জেলা ভিত্তিক সরকারি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এই কাঠামো তৈরিতে কাজ করতে পারেন।
৩. গৃহশ্রমিকদের জন্য একটি স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান চুক্তি প্রণয়ন, যেখানে কর্মঘণ্টা, বেতন, ছুটি, খাওয়া, থাকার ব্যবস্থা, এবং অন্যান্য সুবিধা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকবে।
৪. গৃহশ্রমিকদের কাজের পরিবেশে শোষণ, বৈষম্য বা নিপীড়ন যেন না হয়, সেজন্য বিশেষ মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা উচিত। তাদের সম্মান এবং মর্যাদা বজায় রাখতে কর্মস্থলে সহানুভূতিশীল মনোভাব থাকতে হবে এবং সমস্ত শোষণমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা উচিত।
৫. গৃহশ্রমিকদের প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ের ছুটি প্রদান এবং দীর্ঘকালীন বিশ্রামের সুযোগ নিশ্চিত করা উচিত। তাদের জন্য বছরে কমপক্ষে একটি বার্ষিক ছুটি এবং সাপ্তাহিক বিশ্রামের অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
৬. গৃহশ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আনা উচিত, যার মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা, পেনশন সুবিধা এবং দুর্ঘটনা বিমা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। গৃহশ্রমিকরা যদি কোনো অসুস্থতায় আক্রান্ত হন বা দুর্ঘটনায় পড়েন, তবে তাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা উচিত।
৭. গৃহশ্রমিকদের প্রতি লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা বন্ধে পৃথক আইন প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
৮. গৃহশ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম চালু করা উচিত।
৯. গৃহশ্রমিকরা যদি কোনো ধরনের আইনি সমস্যায় পড়েন বা তাদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়, তাহলে তাদের জন্য আইনি সহায়তা বা পরামর্শ প্রদান করা উচিত। এক্ষেত্রে সরকারি হটলাইন (১০৯,৯৯৯) এর পাশাপাশি এলাকা ভিত্তিক বেসরকারি সংস্থাগুলোর আইনি ও অন্যান্য সহায়তার নাম্বার সরকারি উদ্যোগে প্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি গৃহশ্রমিকদের জন্য পৃথক ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং এই সকল সুবিধা সম্পর্কে তাদের সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
১০. ১গৃহশ্রমিক ও নিয়োগকর্তা উভয়ের জন্য প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রোগ্রাম চালু করা উচিত।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন

১. চা শ্রমিকদের গ্রাচুইটি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর 'শ্রমিকের অবসর গ্রহণ' শীর্ষক ধারা ২৮ সংশোধন করা।
২. চা শ্রমিকদের জন্য নৈমিত্তিক ছুটির বিধান করতে 'নৈমিত্তিক ছুটি' শীর্ষক শ্রম আইনের ধারা ১১৫ সংশোধন করা।
৩. চা শ্রমিকদের মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটির বিধান ন্যায়সঙ্গত করতে 'মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি'। শীর্ষক শ্রম আইনের ধারা ১১৭ সংশোধন করা।
৪. নারী চা শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা।
৫. চা শ্রমিকদের বাসস্থানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য 'বাসস্থান হইতে উচ্ছেন' শীর্ষক শ্রম আইনের ধারা ৩২ সংশোধন করা।
৬. শ্রম আইন সংশোধন বিষয়ক কমিটি ও জাতীয় পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদে বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বাচাশ্রই)-এর প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা।
৭. স্থায়ী ও অস্থায়ী শ্রমিকদের অধিকার ও সুবিধাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।
৮. চা শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও বিভ্রান্তিহীন হিসাব প্রদান নিশ্চিত করা।
৯. নিম্নতম মজুরি বোর্ডে চা শ্রমিকদের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করতে ২টি আসনসংখ্যা (০২ জন) বরাদ্ধ প্রয়োজন আছে।

১০. শ্রম আইন মোতাবেক সেইফটি কমিটির কার্যক্রম দৃশ্যমান করা এবং কমিটিতে ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত শ্রমিকপক্ষের সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা।
১১. মালিক কর্তৃক বাগান বন্ধ থাকলে শ্রমিকদের চিকিৎসাসহ অন্যান্য মানবিক প্রয়োজন মেটানোর নিশ্চয়তা বিধান করা।
১২. বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন (বাচাশ্রই) এবং বাংলাদেশীয় চা সংসদ (বিটিএ)-এর মধ্যে যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে সম্পাদিত সিবিএ চুক্তি বাস্তবায়ন এবং শ্রম অধিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক 'শ্রমিক সহায়ক' ভূমিকা পালন নিশ্চিত করা।
১৩. চা শ্রমিকদের স্থায়ী আবাসন, শিক্ষা ও বেকারত্ব দূরীকরণ এবং বৈচিত্রময় ভাষা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১৪. সরকার কর্তৃক প্রতিটি চা শ্রমিক পরিবারে (খানা অনুযায়ী) প্রতি মাসে চাল, আটা, ভোজ্য তেল, ডাল, চিনি প্রভৃতি "বিশেষ রেশন" বরাদ্ধ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
১৫. বাসগৃহ, সবজি চাষযোগ্য জমি, ধান্য জমি এসবের জন্য চা কোম্পানির নির্ধারিত ভাড়া কর্তন প্রথা যুগান্তকারী। চা শ্রমিকদের নগন্যতম ও ব্যবহার অনুপযোগী বাসগৃহের নামমাত্র মেরামত সাহায্য করে এযাবৎ ভাড়া কর্তন মজুরি হতে অব্যাহত রয়েছে। যা মোটেও সন্তোষজনক নয়। এটা বন্ধ করতে হবে।
১৬. চা বাগানের জমির জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন অতি আবশ্যক। এবং গঠিত ভূমি কমিশনে অবশ্যই চা শ্রমিক মনোনীত চা শ্রমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ বাঞ্ছনীয়।
১৭. চা শ্রমিকদের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে একটি সংরক্ষিত আসন বাঞ্ছনীয়। যেখানে চা শ্রমিক মনোনীত প্রতিনিধির অগ্রাধিকার প্রয়োজন আছে।

হরিজন ঐক্য পরিষদ, বিডিইআরএম, স্যানিটেশন ওয়ার্কার্স ফোরাম, নাগরিক উদ্যোগ

১. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কাজ এবং কাজের পরিবেশ ও মজুরি

- পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের একটি বেতন কাঠামোর মধ্যে আনা, নায্য মজুরি নিশ্চিত করা এবং ধাম আইনে অন্তর্ভুক্ত কর।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করে চাকরি স্থায়ী করা এবং বর্তমানে প্রচলিত নো-ওয়ার্ক নো-পে এই প্রথা বন্ধ করা।
- পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কেবলমাত্র মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া এবং ঐতিহ্যগত পেশাদারি পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মধ্য থেকে ৮০% নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে
- নারী স্যানিটেশন কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং সিটি করর্পোরেশন কিংবা পৌরসভা এলাকায় পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেটের ব্যবস্থা করা।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান চালু করা।
- হাত ছারা মনুষ্য বর্জ্য যা সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার নিষিদ্ধ করা, সেপটিক ট্যাংকে পড়ে মৃত্যুর পরিসংখান রাখা এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে যথপোযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান করা।
- পরিচ্ছন্নতা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত সরবরাহ করা।

২. সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য নিরসন

- পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের চায়ের দোকান, হোটেল, রেস্টুরেন্ট, সেলুন এবং মন্দিরে প্রবেশে বাধা দূর করা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ব্যবসা বাণিজ্যে, চাকরি ও কর্মসংস্থানে, বাসা ভাড়া, মৃতদেহ সৎকারে, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে বৈষম্য দূর করা।
- হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা গ্রহণে বৈষম্য দূর করা।

৩. আবাসন সমস্যা

- পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা এবং তাদের আবাসস্থল থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করা।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীর সন্তানদের যোগ্যতা থাকলে পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশনসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সম্মানজনক পদে চাকরি দেয়া এবং জন্ম পরিচয়ের কারণে মূল ধারার চাকরিতে প্রবেশের বাঁধা দূর করা এবং বিদেশে চাকরির সুযোগ তৈরি করা।

৪. সামাজিক সুরক্ষা:

- পরিচ্ছন্নতা কর্মীদেরকে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা।

বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ

১. ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।
২. বিদ্যমান বেতন ভাতার বৈষম্য দূর করা ও ৬ সদস্যের একটি পরিবারের জন্য বর্তমান বাজার দর অনুপাতে বেতন ভাতা প্রদানের সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।
৩. বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট মূল বেতনের ২০% নির্ধারণ ও টিফিন ভাতা, যাতায়াত ভাতা বাজার মূল্য অনুপাতে নির্ধারণের সুপারিশ করছি।
৪. সম কাজে সম বেতন, পদ-পদবি ও মর্যাদা নিশ্চিত করা।
৫. আউটসোর্সিং নিয়োগ প্রথা বাতিলপূর্বক শূন্যপদসমূহে রাজস্বখাতে সরাসরি নিয়োগের ন্যায়সঙ্গত সুপারিশ শ্রম কমিশনের নিকট একান্ত ভাবে কামনা করছি।

বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, মৌলভীবাজার জেলা শাখা

১. বাংলাদেশের সকল সিটি করপোরেশন, জেলা ও উপজেলায় পৌরসভার একটি বেতন কাঠামোর মধ্যে আনা, ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা ও শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।
২. পেনশন ভাতা, ভবিষ্যৎ তহবিল, সামাজিক মর্যদা ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
৩. পৌরসভা কর্তৃক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ বন্ধ করে চাকরি স্থায়ী করা ও বর্তমানে প্রচলিত নো-ওয়ার্ক নো-পে এই প্রথা বন্ধ করতে হবে।

৪. পৌরসভার একটি নির্ধারিত বেতন স্কেল করে প্রতি বছর মূল বেতনের ৫% ইক্রিমেন্ট আকারে যুক্ত করতে হবে।
৫. নারী পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও উপযুক্ত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির বিধান চালু করা।
৬. পরিচ্ছন্নতা কাজের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সামগ্রী পর্যাপ্ত এবং নিয়মিত সরবরাহ করা।
৭. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের সরকারি হাসপাতালে শতভাগ চিকিৎসা সেবা বিনা মূল্যে নিশ্চিত করা।
৮. পরিচ্ছন্নতা কর্মীর সন্তানদের যোগ্যতা থাকলে পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশন সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সম্মানজনক পদে চাকরি দেয়া এবং পরিচয়ের কারণে মূল ধারার চাকরিতে প্রবেশের বাধা দূর করা এবং বিদেশে চাকরির সুযোগ তৈরি করা।

মৌলভীবাজার মৎস্যজীবী ইউনিয়ন

১. জলমহাল ইজারা প্রথা বাতিল করে লাইসেন্স প্রথা চালু করে মৎস্যজীবীদের জন্য সারাবছর স্বাধীনভাবে মাছ ধরার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
২. মাছের প্রজননকালীন সময়ে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং এর মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা, বয়স্কভাতা এবং নগদ অর্থ প্রদান করতে হবে।
৩. মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

রংপুর জেলা হোটেল রেস্তরা শ্রমিক ইউনিয়ন

১. নিয়োগপত্র প্রদান করা।
২. দৈনিক শ্রম ০৮ (আট) ঘণ্টা করতে হবে।
৩. শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি সর্বনিম্ন ৩০০০০/- (ত্রিশ) হাজার টাকা করতে হবে।
৪. দৈনিক হার অনুযায়ী ওভারটাইম বেতন নিশ্চিত করতে হবে।
৫. সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে।
৬. শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
৭. বেতন সমপরিমাণ বোনাস প্রদান করতে হবে বছরে দুইটি (হিন্দু মুসলিম উভয় ক্ষেত্রে)।
৮. শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান প্রদান করতে হবে।
৯. শ্রমিকদের রেশন ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. শ্রমিক কল্যাণ তহবিল গঠন করে, অবসর কালীন ভাতা প্রদান করতে হবে।
১১. মহিলাদের বিশেষ স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করা ও মাতৃকালীন ছুটি প্রদান করতে হবে।
১২. যখন তখন শ্রমিক ছাটাই বন্ধ করতে হবে।
১৩. শ্রমিকদের মাঝে কোনোরকমের সরকারি সাহায্য পৌছায় না সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
১৪. আমরা সমস্ত শ্রমিকদের পক্ষ থেকে একটি শ্রমিক হাসপাতাল গঠন করার আহবান জানাচ্ছি।
১৫. আমরা যে ইউনিয়ন গঠন করেছি তা যেন আইনিভাবে মালিকদের উপর প্রয়োগ করতে পারি।

রানা প্লাজা অ্যাকসিডেন্ট ভিকটিমস্ রাইটস নেটওয়ার্ক

১. রানা-প্লাজা ভবন ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার বর্গকে যথাযথ আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতিসমূহ পূনর্মূল্যায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক একটি বিশেষ স্বতন্ত্র জাতীয় কমিটি গঠন এবং কমিটিতে ভিকটিম শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার বর্গের পক্ষ হতে যথাযথ সংখ্যক প্রতিনিধি রাখা। যে সকল শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গ এখনো কোনো প্রকার আর্থিক সাহায্য ও ক্ষতিপূরণ পায়নি, তাঁদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ।
২. দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তাহবিলে রানা প্লাজা শ্রমিকদের সহায়তা ও কল্যানের জন্য সংগ্রহিত সকল অর্থের স্বচ্ছ ও যথাযথ হিসাব প্রকাশ এবং সংগ্রহীত সকল অর্থ যথাযথ তালিকা মোতাবেক সকল ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার বর্গকে সম ভিত্তিতে প্রদানের জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ।
৩. রানা-প্লাজা ভবন ধ্বসে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার বর্গকে বিশেষ বিবেচনায় চলমান পাইলট ইমপ্লয়েমেন্ট ইনজুরী ইনস্যুরেন্স স্কিমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হোক।
৪. রপ্তানিমুখি গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল হতে রানা-প্লাজা ভবন ধ্বসে স্থায়ী ও অস্থায়ী পঙ্গুত্বের স্বীকার সকল বেকার শ্রমিক ও তাদের পরিবার বর্গকে আজীবন নির্ধারিত হারে জীবন ধারণের লক্ষ্যে মাসিক ভাতা প্রদান করা হোক।
৫. রানা-প্লাজা ভবন ধ্বসে স্থায়ী ও অস্থায়ী পঙ্গুত্বের স্বীকার সকল শ্রমিকের জন্য গঠিত ট্রাস্ট পূণর্গঠন এবং ট্রাস্টের পরিচালনা পর্ষদে ভিকটিম শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্তকরণসহ সকল স্থায়ী ও অস্থায়ী পঙ্গুত্বের স্বীকার সকল শ্রমিকের মানসম্পন্ন যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদান নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ।
৬. রানা-প্লাজা ভবন ধ্বসে নিহত, স্থায়ী ও অস্থায়ী পঙ্গুত্বের স্বীকার সকল শ্রমিকের অনাথ সন্তানদের শিক্ষা জীবন নিশ্চিতে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন হতে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক পরিবারের সন্তানদের জন্য বিশেষ মাসিক শিক্ষা সহায়তা স্কিম চালুর পদক্ষেপ গ্রহণ।
৭. রানা-প্লাজা ভবন ধ্বসে অস্থায়ী পঙ্গুত্বের স্বীকার সকল বেকার শ্রমিকদের জন্য টেকসই বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু করা, যাতে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিরা নতুন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেতে পারেন।
৮. সরকারের চলমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীতে তালিকা মোতাবেক রানা-প্লাজা ভবন ধ্বসে নিহত সকল শ্রমিক পরিবারের সদস্যকে চলমান স্কিমসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্তর্ভুক্তকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ও সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনির আওতায় আনার জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ।

৯. রানা-প্লাজা ভবন ধ্বসে নিহত সকল শ্রমিক পরিবারের সদস্যগণকে রাষ্ট্র কর্তৃক যথাযথ ন্যায় বিচার প্রদানের স্বার্থে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে রানা প্লাজা সম্পর্কিত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা।

ITUC-BC

১. পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান তৈরি:

- কর্মসংস্থান তৈরি জন্য নীতি প্রণয়ন।
- প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যক্রম উন্নত করা।
- আধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তি এবং অবকাঠামসহ দক্ষতার উন্নায়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উপস্থাপন করা।
- উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণসহ প্রাসঙ্গিক সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- জাস্ট ট্রানজিশন।

২. কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের অধিকার:

- ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য শ্রম আইন সংশোধন করতে হবে।
- গৃহকর্ম, কৃষি এবং প্লাটফর্ম সেক্টরসহ সমস্ত অনানুষ্ঠানিক খাতকে শ্রম আইনে অনর্ভুক্ত করা।
- কর্মক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ও ত্রিপক্ষীয় চুক্তি বাধতামূলক করা।
- পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিরাপত্তাসহ আইএলও কনভেনশন সি-১৫৫, সি-১৮৭ অনুস্বাক্ষরসহ 3R জানার অধিকার নিশ্চিত করা (জানার অধিকার, অংশগ্রহণের অধিকার, অনিরাপদ কাজকে না বলার অধিকার)
- জিসিএম উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিরাপদ, সুশৃঙ্খল অভিবাসন নিশ্চিত করতে হবে, এবং অভিবাসনের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নজরদারি বাড়াতে হবে।
- নিয়মিত কার্যকরী ও গুণগত মান পরিদর্শন এবং কার্যকরী নিরাপত্তা কমিটি নিশ্চিত করতে DIEF কে শক্তিশালী করুন।
- SEZ & EPZ এর জন্য সমান আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- আইএলও কনভেনশন ১৩৮ এবং ১৮২ এর সাথে সঙ্গতি রেখে যেকোনো ধরনের বিপদজনক কাজ থেকে শিশুশ্রমকে বাদ দিতে হবে।
- শিশুশ্রম নিরসন।
- টেকসই শ্রম অভিবাসন।
- যৌথ দর কষাকষির অধিকার।

৩. ন্যায্য মজুরি:

- স্থায়ীভাবে জাতীয় মজুরি-বোর্ড গঠন এবং প্রতি ২ বছর অন্তর সংশোধন করতে হবে।
- জাতীয় ন্যূনতম মজুরি।
- প্রাতিষ্ঠানিক ন্যূনতম মজুরি।

৪. কর্মক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা:

- বার্ধক্য ও বেকারত্ব সুবিধা এবং আয় নিরাপত্তা।
- সার্বজনীন বিমা এবং (গিগ বা প্ল্যাটফর্ম ওয়ার্কার্স) ক্ষতিপূরণ।
- মাতৃত্বকালীন, পিতৃত্বকালীন সুবিধা, পেনশন প্রকল্প, বীমা।
- আইএলও'র মানদণ্ড অনুসারে শোভন কাজ, সামাজিক সুরক্ষা ফ্লোর এবং আইএলও প্রস্তাবনা ২০২ এর বাস্তবায়নকরণ।
- প্লাটফর্ম ইকনোমিতে কর্মরত শ্রমিকদের সামাজিক সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে হবে।
- সি ১৮৩ অনুসমর্থন করতে হবে এবং সমানভাবে পিতৃত্ব সুবিধা প্রদান করতে হবে।

৫. সমতা ও অন্তর্ভুক্তি:

- সমান কাজে সমান মজুরি, সহিংসতামুক্ত কর্মক্ষেত্র, নারী ও প্রান্তিক ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা।
- সি-১৯০ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ রেখে এর মধ্যে যৌন হয়রানি সম্পর্কিত আইন অন্তর্ভুক্ত করা।
- কারখানায় নারী কর্মশক্তির অনুপাতে ইউনিয়নে নারী ও যুব নেতৃত্ব নিশ্চিত করা।
- সি-১৮৯ ও ৪ সি-১৯০ এর অনুসমর্থন করা।

মিলনপুর মাঝিপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ, রংপুর

১. প্রকৃত জেলেদের বিল, পুকুর, নদী লিজ দেওয়া।
২. বিনা মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
৩. প্রায় ৮ মাস মাছ ধরার সুযোগ থাকে না। এ সময়ে সরকারিভাবে ভাতা দেওয়া।
৪. জাল ও নৌকা নির্মাণের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান করা।
৫. বিল ডাকার সময় অপেশাজীবী জেলে সেজে সরকারি দলের প্রভাব খাটায়। প্রকৃত জেলে তাদের সাথে পেরে ওঠে না। এ সম্পর্কে নিয়ম তৈরি করা।

বাংলাদেশ অবিভাগীয় ডাক কর্মচারী পরিষদ

- জাতীয়করণ এর মাধ্যমে বেতন কাঠামোর আওতায় আনা।

সোনালী ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশন (সিবিএ)

১. রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকিং সেক্টরে ১৯৯৫ সালের সার্ভিস রুলস এর আলোকে ২০২৪ সালে প্রক্রিয়াধীন নতুন সার্ভিস রুলে কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা/ অর্গানোগ্রামে অন্তর্ভুক্তি করা।
২. অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা ও চর্চার সুযোগ তৈরা করা।
৩. আউটসোর্সিং কর্মচারী নিয়োগ প্রথা বাতিল করে শূন্য পদসমূহে সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা।

বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র (BNSK)

- Increased Information Campaign through local Govt.
- Start monitoring and licensing of Middle-man so that ones that betray or give false hopes can be taken action.
- Building more TTCs at migrant-prone areas.
- Check up on migrant workers through call by Embassy (COD) and Recruiting Agency.
- Increase of Embassy staff to allow 24/7 hotline and house visits for "no-service" and "help" calls.
- Post-arrival training at embassies and information awareness about embassy supports.
- Legal action against violating employer by Embassy and CSOs at COD.
- Provision of Life and Medical Insurance to migrant workers by Recruiting agency.
- Introducing psychosocial support for migrants during staying in CoD and after returning in CoO.

TV Camera journalist Association

- টেলিভিশনে কর্মরত ক্যামেরার পিছনে কলা কুশলিদের "চিত্র সাংবাদিক" পদবিতে অবহিত করা। আই, এস,ও কনভেনশন অনুযায়ী কর্ম ঘণ্টা (আট ঘণ্টা) নির্ধারণ করা।
- বেতন কাঠামো নির্ধারণসহ মজুরিবোর্ড গঠন করা।
- ঝুঁকিভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্রাচুইটি প্রদান করা।
- সরকারি ছুটি, সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে চাকরি থেকে অব্যাহতি প্রদান কালে ক্ষতিপূরণ হিসাবে চাকরির প্রতিবছরের জন্য একটি পূর্ণ বেসিক দিতে হবে।
- ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার পূর্ণ অধিকার ও রেজিষ্ট্রেশন সহজ করতে হবে।
- সকল টেলিভিশনকে সরকার ঘোষিত ওয়েজবোর্ডের অধীনে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

National Tea Company Limited

১. Grow leadership among the Tea Garden workers.
২. Make awareness to the Tea Garden workers.
৩. Building good relationships in between Management and the workers.
৪. Increase wages.
৫. Ensure medical and education facilities for the workers.
৬. Ensure safeguarding measures.
৭. Ensure WASH in all section of the Tea Garden.

অ্যাপ-বেইজড ট্রান্সপোর্ট ইউনিয়ন

১. রাইড শেয়ারিং চালকদের শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।
২. চালকদের শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।
৩. কোনো অভিযোগ প্রমাণ ব্যতীত একজন পেশাজীবী চালককে কর্মচ্যুত না করা।
৪. গোগন কমিশন ও উচ্চ কমিশনের বিপরীতে সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ কমিশন নির্ধারণ করা।
৫. ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রতি বছর পুনর্মূল্যায়িত করা।
৬. সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণে মাইক্রোবাস, সিডান কার ও মোটরসাইকেল এর ক্ষেত্রে সবনিম্ন ভাড়া যথাক্রমে-৫০০,৩০০ এবং ১৫০ টাকা নির্ধারণ করা।
৭. রাইড শেয়ারিং সার্ভিসের সাথে জড়িত এনলিস্টেডকৃত বাহনের ক্ষেত্রে (লাক্সারি বাহন বিবেচনার পরিবর্তে গণপরিবহন বিবেচনায় বার্ষিক অগ্রিম আয়কর (AIT) বন্ধ কর...
৮. মোবাইল ডিভাইস ব্যবহার সংক্ষিপ্তকরণে অ্যাপ পরিচালনায় বিডিং সিস্টেম বন্ধ করা।
৯. প্রতিটি রাইড শেষে যাত্রী ও চালক উভয়ের আদেই বেইস-ফেয়ার, কিলোমিটার, প্রতি মিনিট, মিনিমাম-ফেয়ার ও ওয়েটিং চার্জ অনুযায়ী ভাড়ার সঠিক হিসাব প্রদর্শন করা।
১০. সার্ভিস পরিচালনা কোম্পানি কর্তৃক চালক যাত্রী উভয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে ২৪/৭ হেল্প সেন্টার খোলা রাখা।
১১. চালক ও যাত্রী উভযের নাম, ছবি এবং সনাক্তকরণ তথ্য উপাত্ত অ্যাপে প্রদর্শন করা।
১২. দুর্ঘটনা কবলিত চালককে যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।
১৩. বিভিন্ন আবাসিক এলাকা, বাণিজ্যিক এলাকা, বিমানবন্দর, নৌবন্দর, স্থলবন্দর সহ স্বাশ্বাসেবা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন পাবলিক টয়লেট সমৃদ্ধ কার পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা।
১৪. কার-এর ক্ষেত্রে মালিক ও চালকদের পৃথক এনলিসমেন্টের সুযোগ রাখা।

১৫. পেশাজীবী চালক ও সকল নাগরিকের স্বার্থে সরকারিভাবে এ ধরনের একটি সার্ভিস অ্যাপ পরিচালনা করা।
১৬. চালকদের কর্মের নিশ্চয়তা, অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা এবং কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি সকল ঝুঁকি বিবেচনায় একটি পরিপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করা।

বিক্রয় বিপণন শ্রমিক কর্মচারী সংগ্রাম পরিষদ

১. শ্রম আইন বাস্তবায়ন করা।
২. আইএলও কনভেশন ৮৭ ও ৯৮ অনযায়ী অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান।
৩. অধিকার আদায়ে আন্দোলনরত শ্রমিকদের উপর চিরতরে দমন-পীড়ন, ছাটাই-নির্যাতন বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কার, মাইক্রো, এ্যাম্বুলেন্স চালক কল্যাণ উপ-কমিটি

১. সকল রেন্ট-এ কার এবং প্রাইভেট কার চালকদের চাকরির নিয়োগ পত্র চাই।
২. রেন্ট-এ কারের চালকদের ন্যূনতম মাসিক বেতন ৭,০০০/- (সাত হাজার) টাকা এবং প্রতি হাজারে কমিশন বাবদ ২৫০/- (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা সরকারি ভাবে নির্ধারণ করতে হবে।
৩. প্রতিদিন ৮ আট ঘণ্টা কাজের নিশ্চয়তা। ওভার টাইম এর জন্য দ্বিগুন মজুরি।
৪. প্রত্যেক চালক এবং হেল্পারের জন্য সামরিক রেটে পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা চাই।
৫. প্রাইভেট কারের চালকদের সরকারি বেসিক অনুযায়ী মাসিক বেতন নির্ধারণ করতে হবে।

Bangladesh GiG Worker Association-BGWA

১. দেশের সকল অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করে, সকল শ্রমিকের জন্য অভিন্ন, সমন্বিত, গণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা প্রণয়ন করা।
২. সকল কার-বাইক চালক, গিগ শ্রমিক (রাইড শেয়ারিং, প্লাটফম, ই-কর্মাস), শ্রমিকদের কে শ্রমিক অধিকারের স্বীকৃতি ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন'২০০৬ ও শ্রম বিধিমালা' ২০১৫ সংশোধন করা।
৩. গিগ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার প্রদান করা
৪. গিগ শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি কমিশন গঠন ও মজুরি ঘোষণা করা
৫. সকল গিগ শ্রমিকদের কে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ডেটাবেস তৈরি করে তাদের কে ছবিসহ আইডি কার্ড প্রদান করা।
৬. গিগ শ্রমিকদের জন্য কমমূল্যে প্রয়োজনীয় নিত্যপন্য সামগ্রী রেশনিং পদ্ধতীতে প্রদান করতে হব।।

ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, ট্যাক্সি কার, অটোটেম্পু, অটোরিক্সা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন

১. বিদ্যমান শ্রম আইন সংশোধন করা যাতে আই.এল.ও কনভেনশন এর পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে এবং প্রতিটি শ্রমজীবীর অধিকারের সুরক্ষা দেয়।
২. শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে সহযোগিতা প্রাপ্তির আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করা এবং আবেদনের ক্ষেত্রে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সকেই পরিচয় পত্র হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।
৩. সার্বজনীন পেনশন স্কিম নামে বিদ্যমান ডিপোজিট স্কিম সংস্কার করে গাড়ি চালকসহ সকল শ্রমজীবীকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে পেনশন স্কিম ও বিমা ব্যবস্থার আওতায় আনা।
৪. প্রাইভেট গাড়ি চালক, সিএনজি অটোরিক্সা চালক, রাইডার, সার্ভিস ডেলিভারি ওয়ার্কারদের পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য রেশন, বিনামূল্যে চিকিৎসা এবং সন্তানদের জন্য শিক্ষা সহায়তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৫. শুধুমাত্র পেশাদার লাইসেন্সে ডোপ টেস্টেও মত বৈষম্যমূলক ও অমর্যদাকর নিয়ম বাতিল করে র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং পদ্ধতিতে ডোপ টেস্ট চালু করা।
৬. সড়ক পরিবহন আইনে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারাসমূহ সংশোধন করে জরিমানা ব্যবসা ও দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করা।

বাংলাদেশ অটোরিকশা-হালকাযান পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন

১. 'সড়ক পরিবহন শ্রমিক নিয়োগপত্র আইন ১৯৮০, বিধি ১৯৮২' শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ধারাসমূহ সংশোধন করে যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে।
২. পরিবহনের ধরন অনুযায়ী জেলা ও বিভাগ বিভক্ত করে সড়কে পরিবহন চলাচলের রুট পারমিট দেওয়া।
৩. পেশাদার ও অপেশাদার সকল চালকদের জন্য ডোপ টেস্ট এবং পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা।
৪. স্বাধীন ও দলীয় প্রভাব মুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন চালু করা।
৫. ট্রেড ইউনিয়নের বাৎসরিক সাধারণ সভায় শ্রম দপ্তরের প্রতিনিধির উপস্থিতির বাধ্যবাধকতার সিদ্ধান্ত বাতিল করা।
৬. সড়ক পরিবহন সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে হালকাযানের শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধি রাখার বিধান চালু করা।
৭. সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা।
৮. পরিবহন শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে তাদের স্বাস্থ্যসেবা ও সন্তানদের লেখা পড়ার সুযোগ সৃষ্টি করা।
৯. জেলা বা নগরে হালকাযানের জন্য পার্কিং বা স্ট্যান্ড এর ব্যবস্থা করা।
১০. সামাজিক সুরক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে পরিবহন শ্রমিকদের জন্য 'পরিবহন শ্রমিক স্মার্ট কার্ড' এবং কর্মহীন ও বয়স্ক পরিবহন শ্রমিকদের বিশেষ ভাতার আওতায় আনতে হবে।

১১. পরিবহন শ্রমিকদের ন্যায্য মূল্যে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশ চা শ্রমিক ফেডারেশন

১. মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন করে যা শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণ করা।
২. পূর্ণাঙ্গ রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করা।
৩. প্রতিটি চা বাগানে আধুনিক ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সংবলিত পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।
৪. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।
৫. যুগোপযোগী আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চয়তা সহ অন্যান্য সুবিধা প্রদানের জন্য আইন সংশোধন করা।
৬. নারী চা শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ৬ মাস ছুটি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করা।
৭. বার্ষিক অর্জিত ছুটির ২২ দিনের পরিবর্তে ১৮ দিনের অর্জিত ছুটির বিধান রেখে আইন সংশোধন করা।
৮. কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ বা দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতার জন্য ক্ষতিপূরণ যুক্তিসঙ্গত হারে নির্ধারণ করে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।
৯. অস্থায়ী শ্রমিকদের সমমজুরি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং চাকরি স্থায়ীকরণে আইন প্রণয়ন করা।
১০. সমস্ত চা শ্রমিকদের সমান মজুরি প্রদানের বিধান চালু করা।
১১. চা শ্রমিকদের জন্য গ্রাচুইটি এবং মুনাফার ৫% বিতরণ সংক্রান্ত আইন কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় বিধান চালু করা।
১২. বিদ্যমান আইনের ১৮৩ ধারা সংশোধন করে প্রতিটি চা বাগানের স্বতন্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার নিশ্চিত করা ।
১৩. চা চাষের জন্য লিজকৃত ভূমিতে ইকোনমিক জোন, রাবার চাষ, মৎস্য চাষ, রিসোর্টসহ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য আইন প্রণয়ন করা।
১৪. ঐতিহাসিক "মুল্লুক চলো" আন্দোলনের শহীদদের সংগ্রামের স্মৃতিস্বরূপ ২০ শে মে 'চা শ্রমিক অধিকার দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি ও সবেতনে ছুটি প্রদানে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা।

ActionAid Bangladesh

১. Strengthen Policy and Legal Frameworks
২. Enhance Workers' Empowerment and Representation
৩. Improve Working Conditions and Safety Standards
৪. Promote Fair Wages and Social Protection
৫. Address Gender-Based Violence and Discrimination

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র

১. কর্মীকে নিয়োগদানের পূর্বে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করে দেখতে হবে।
২. নারী কর্মীদের জন্যে মাতৃকালীন ছুটি ৬ মাস করা প্রয়োজন। ২ মাস প্রসব পূর্ব এবং ৪ মাস প্রসব পরবর্তী পূর্ণ বেতন ও সকল সুযোগ সুবিধাসহ। যদি তার সন্তানের জন্য অথবা তার নিজের শারীরিক কোনো ধরনের সমস্যা/জটিলতার কারণে ছুটির প্রয়োজন হয় তবে অর্ধেক বেতনে এই ছুটি নেওয়ার অধিকার থাকবে পরবর্তী ৬ মাস পর্যন্ত।
৩. যদি স্বামী একই প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত থাকে তবে সে ১৫ দিনের পিতৃকালীন ছুটি পাবে, তবে শর্ত থাকবে সে তার স্ত্রীর সাথে থাকতে হবে। যদি সে, অন্য কোথাও চলে যায় তবে এই ছুটি তার জন্য প্রযোজ্য হবে না এবং বেতনও পাবে না।
৪. তার সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্যে যেখানে অবস্থান করবেন সেই এলাকা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে অবহিত করতে হবে তার সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানের জন্য।
৫. পরিবারের যে সকল সদস্য তার সাথে অবস্থান করবে তাদের জন্য রেশনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে চাল, আটা, ডাল, তেল, আলু, লবণ ইত্যাদি।
৬. পারিবারিক বা শারীরিক সমস্যার কারণে যদি তাকে চাকরি হতে অব্যাহতি নিতে হয় এবং পরবর্তীতে তার সে সকল সমস্যা সমাধান হয় তবে তাকে পুনরায় চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে।
৭. প্রত্যেক কারখানায় সেইফটি কমিটি কার্যকরী বাস্তবায়নে শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক —পরিদর্শনকালে শ্রমিক
৮. প্রতিনিধির উপস্থিতি বাধ্যতামূলক করতে হবে।
৯. সেক্টরওয়াইজ সেইফটি অফিসার ও কমপ্লাইন্স অফিসার আলাদাভাবে নিয়োগ বাধ্যতামূলক করতে হবে।
১০. শিক্ষা ব্যবস্থা— মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পযার্য়ে ওএসএইচ এর উপরে সাবজেক্ট/টপিক বাধ্যতামূলক থাকতে হবে।
১১. ডাইফি রিপোর্টিং এন্ড ইনভেস্টিগেশন সিস্টেম পর্যলোচনা করে যুগোপযোগী করা। চেকলিস্ট রিভিউ করা এবং অংশীজনের সাথে শেয়ার করা।
১২. উচ্চঝুঁকিপূর্ণ খাতগুলো চিহ্নিত করে নিতিমালা প্রণয়ন করা।
১৩. সমস্ত নিতীমালা প্রনয়ন/বাস্তবায়নে শ্রমিক প্রতিনিধিত্বের অংশ্রগহন বাধ্যতামূলক করা। প্রতিনিধি মনোয়নে স্ব স্ব সেক্টরে যাদের প্রতিনিধিত্ব বেশি থাকবে তাদেরকে মনোনয়ন করা।
১৪. জাতীয় পযার্য়ে সকল দুর্ঘটনায় আহত, মৃত্যু, ক্ষতিগ্রস্থ্য শ্রমিকদের জাতীয় ডাটাবেইজ করা।
১৫. দুর্ঘটনা জনিত ক্ষতিপূরনের আইনের সংস্কার মিনিমাম ৫০ লক্ষ টাকা অথবা ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিককে দশ বছরের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।
১৬. ইআইএস প্রকল্প স্থায়ীকরণ।
১৭. আইএলও কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭, ১২১, ১৯০ রেটিফিকেশনকরণ।

১৮. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউশনে মোডিউল ডেভলপমেন্ট এ শ্রমিক প্রতিনিধির সাথে কনসালটেশন বাধ্যতামূলক করা।
১৯. জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য সেইফটি বাস্তবায়নে শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করে কমিটি গঠন।
২০. অকুপেশনাল ডিজিজ এর তালিকা রিভিউ করা।
২১. ট্যানারিগুলোতে কার্যকর হিউম্যান রিসোর্স বিভাগ চালু করা।
২২. সিএসডিডিডি জামার্ন সাপ্লাই চেইন এ্যাক্ট, ইউএন গাইডিং নির্দেশনা, এসডিজি লক্ষ মাত্রা নিধার্রন, জিএসপি প্লাস সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পেক্ষাপটে বর্তমান অবস্থা এবং পরবর্তী করণীয় নিধার্রণে শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে মনিটরিং কমিটি ও বাস্তবায়ন করা।
২৩. আইএলও কনভেনশনে যাওয়ার সময় পেশাগত স্বাস্থ্য ও অধিকার বিষয়ে স্টেকহোল্ডার এর সাথে কনসালটেশন করা।
২৪. ট্যানারিতে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এর জন্য উদ্ভাভিত নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করা।
২৫. কলকারখানার পরিদর্শন অধিদপ্তরগুলোকে আইনগত শক্তিশালি ক্ষমতা প্রদান।
২৬. কলকারখানার হটলাইন নাম্বার সকল শ্রমকিদের কাছে দৃশ্যমান করা এবং বেশি বেশি কনসালটেনশন মিটিং করা এবং কার্যকর করণে জোনভিত্তিক গণশুনানি করা।
২৭. সরকারের দপ্তরের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য হেল্প ডেক্স চালু করা। লোকবল বাড়ানো।
২৮. শ্রম আইনে দুর্ঘটনা শাস্তির বিধান বাড়ানো দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা।
২৯. ট্যানারি শ্রমিকদের মিডলেভেল ম্যানেজারদের ক্যামিক্যাল এর বিষয়ে প্রশক্ষিণ দেয়া বাধ্যতামূলক করা।
৩০. ট্যানারি শ্রমিকদের পিপিই পরিধান বাধ্যতামূলক করা।
৩১. প্রত্যেক শ্রমিক ও তাদের পরিবারদের স্বাস্থ্যসেবা যেকোনো হাসপাতালের সাথে সেবা নিশ্চিত করার চুক্তি বাস্তবায়ন করা।
৩২. শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সিভিল সার্জনের মাসিক পরিদর্শন নিশ্চিত করা।
৩৩. শ্রমিকদের মানসিক সুরক্ষা দিতে সাইকোলজিক্যাল সেন্টার তৈরি করা।
৩৪. শ্রমিকদের দীর্ঘমেয়াদী রোগের সেবা নিতে সরকারি হাসপাতালে বিশেষ সুবিধা রাখা/শ্রমিক হাসপাতাল স্থাপন করা।
৩৫. ফ্যাক্টরির ভিতরে নারী শ্রমিকদের মাসিকের সময়ে বাধ্যতামূলকভাবে ন্যাপকিন প্রদান ও সচেতনামূলক পরামর্শ প্রদান করা।
৩৬. ডাইফের প্রতিবেদন মাসিকভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
৩৭. ডাইফের ইনভেস্টেগেশনে যাওয়ার সময়ে শ্রমিক ইউনিয়ন, ফেডারেশন, ফ্যাক্টরী শ্রমিক প্রতিনিধি অন্তর্ভূককরণ।
৩৮. ওএসএইচ নিতিমালা প্রণয়নের সময়ে শ্রমিক অভিযোগ করলে কোনো ধরনের প্রতিশোধমূলক কার্যকলাপ করলে তা বিচারের আতওয় নিয়ে আসা।
৩৯. ট্যানারি শ্রমিকদের চাকরি স্থায়ীকরণ এবং তাদেরকে বৈধ শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা। তাদের দায়িত্ব, সুবিধা ও ক্ষতিপূরণের লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া।
৪০. জাতীয় ভিত্তিক পরিদর্শন ও সেবার মান উন্নয়নে ট্রাইপারটাইট মনিটরিং সেল গঠন করা।

Bangladesh FSM Network and Water & Sanitation for the Urban Poor

পরিচ্ছন্নতা কর্মী

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন (২০০৬) অনুসারে সকলের জন্য নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করার যে প্রতিশ্রুতি তা মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত করা।
২. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্থায়ী নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।
৩. অস্থায়ী বন্দোবস্তে কর্মরত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের স্থায়ী করা অথবা অন্তত তাদের কিছু নিরাপত্তা কার্যক্রম বা কল্যাণ ফান্ডের আওতাভূক্ত করা।
৪. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে - বেতন বৃদ্ধি, আবাসন সুবিধা, চিকিৎসা সুবিধা ও স্বাস্থ্য বীমা, সুরক্ষা সরঞ্জাম, টীকা /ভ্যাক্সিন, খাদ্য/রেশন কুপন, বোনাস, শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড / আর্থিক সহায়তা প্রদান।
৫. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের নিজস্ব একটি সংগঠন গড়ে তুলতে সাহায্য করা যাতে তারা নিজেরাই তাদের সমস্যাগুলো তুলে ধরতে পারে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করতে পারে।
৬. এই সেক্টরে নারীরা সাধারণত সবচেয়ে নিম্ন বেতন এর কাজগুলোর (যেমন: রাস্তা ঝাড়–) সাথে যুক্ত থাকে, এই বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা এবং তাদেরকে পছন্দ বা প্রয়োজন অনুসারে কাজের ক্ষেত্র নির্বাচনের সুযোগ করে দেওয়া।
৭. এই সেক্টরে নারী কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা, এছাড়াও অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগের প্রেক্ষিতে যথাযথ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা থাকা।
৮. শ্রম মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়কে একত্রে কাজ করে কর্মীদের উন্নয়নে কাজ করতে হবে।
৯. স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নত করার লক্ষ্যে যখন বিনিয়োগ পরিকল্পনা করা হয় তখন হার্ডওয়ার (জমি, অবকাঠামো, অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি) এবং সফটওয়ার (মানব কেন্দ্রিক পন্থা বা উদ্যোগ, যেমন: সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও অন্যান্য কার্যক্রম যা পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জীবনের মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে) উভয় বিষয়কেই প্রাধান্য দেওয়া।
১০. নিরাপত্তা ও কল্যাণ তহবিল গঠনের মাধ্যমে তাদের বাসস্থানে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হবে।
১১. পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের অধীনে কর্মরত পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা যাতে তাদের নিজেদের কাজ অন্য কারও মাধ্যমে সম্পাদন করতে না পারেন, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য ওয়াশ

১. কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফি) ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)—এর যৌথ উদ্যোগে/ নেতৃর্ত্বে আরএমজি এবং নন—আরএমজি কলকারখানাসমূহের জন্য একটি জাতীয় ওয়াশ স্ট্যান্ডার্ড /নীতিমালা এবং এর বাস্তবায়ন নির্দেশিকা তৈরি করা। এ প্রক্রিয়ার সাথে যথাযথ স্টেকহোল্ডারদের জড়িত করা যেমন একর্ড অ্যালায়েন্স, বিজিএমইএ,

বিকেএমইএ, বিভিন্ন নীতিনির্ধারক, ট্রেড ইউনিয়ন, কারখানার মালিক, স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজ সহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডার।

২. কারখানাগুলোকে নিরাপদ স্যানিটেশন ও উন্নত সগপ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি ওয়াশ কমিটি স্থাপন করা, যাদের একটি ব্যয়যুক্ত কর্ম পরিকল্পনা ও বাৎসরিক বাজেট থাকবে।
৩. ডাইফি—এর কারখানা পরিদর্শন চেকলিস্ট —এ ওয়াশকে আরও প্রাধান্য দেওয়া, এছাড়াও কারখানার ধরন অনুযায়ী ভিন্ন ও সুনির্দিষ্ট চেকলিস্ট প্রয়োগের মাধ্যমে পরিদর্শনের কাজ সহজকর করা।
৪. ডাইফি তে পর্যাপ্ত লোকবল নিশ্চিতকরণ এবং ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান করা—যাতে ওয়াশ সংক্রান্ত নিয়মাবলি বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্য (যেমন পর্যাপ্ত টয়লেট না থাকা, টয়লেটের অসাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি) কল—কারখানাগুলোকে তাৎক্ষণিক জরিমানা/শাস্তি প্রদান সম্ভব হয়।
৫. কারখানাগুলোর যে কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল বা সিএসআর ফান্ড রয়েছে—তার সুষ্ঠ প্রয়োগ নিশ্চিত করা—এক্ষেত্রে স্ব স্ব কারখানার দায়িত্বে না রেখে তা কোনো নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষকে দেওয়া যেতে পারে।
৬. একর্ড অ্যালায়েন্স, ও বিজিএমইএ—এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করা, কারখানাগুলোতে তাদের প্রভাব ও গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়ে কারখানার মালিকদের তাদের কারখানা ও শ্রমিকদের কমিউনিটিতে ওয়াশ কেন্দ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তারা নিজেরাও এ ধরনের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে।
৭. জাতীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও কর্মদক্ষতার ওপর ওয়াশ এর প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম হাতে নেওয়া,এর ফলে প্রাপ্ত তথ্য নীতিমালা প্রণয়ন ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানারস (বিআইপি)

১. শ্রমিক আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;
২. ন্যায্য মজুরি ও কর্মঘণ্টা নির্ধারণ;
৩. শ্রমিক সংগঠন ও সমিতি গঠনের স্বাধীন;
৪. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;
৫. কর্মক্ষেত্রে হয়রানি ও নির্যাতন রোধ;
৬. নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা;
৭. বেকারত্ব কমানোর উদ্যোগ;
৮. শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল;
৯. নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন;
১০. সচেতনতা বৃদ্ধি;
১১. ন্যায্য মজুরি ও বেতন কাঠামো প্রণয়ন;
১২. শ্রমিকদের সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ;
১৩. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;
১৪. বিমা ও স্বাস্থ্যসেবা;
১৫. লিখিত চুক্তি বাধ্যতামূলক করা;
১৬. প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন;
১৭. শ্রমিকদের সংগঠন ও অধিকার সুরক্ষা;
১৮. নিয়মিত তদারকি ও আইন প্রয়োগ;
১৯. বেকারত্ব ও অনিশ্চয়তা দূর করা;
২০. সচেতনতা বৃদ্ধি ও হেল্পলাইন প্রতিষ্ঠা;
২১. আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের অভাব;
২২. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অন্তর্ভুক্তির অভাব;
২৩. ন্যূনতম মজুরি বাস্তবায়নে ব্যর্থতা;
২৪. কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অভাব;
২৫. নারী শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য;
২৬. আইন সংশোধনের ধীর গতি;
২৭. দুর্নীতি ও প্রশাসনিক জটিলতা;
২৮. নজরদারি ও তদারকি সংস্থার কার্যকারিতার অভাব;
২৯. প্রশিক্ষণ ও সচেতনতার অভাব;
৩০. শিল্প কারখানায় অগ্নি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
৩১. নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩২. নিরাপত্তা পরিদর্শন এবং নিয়মিত তদারকি;
৩৩. ভবনের মান নিয়ন্ত্রণ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
৩৪. কর্মপরিবেশ উন্নয়ন;
৩৫. আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩৬. শ্রমিকদের বিমা সুবিধা;
৩৭. আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার;
৩৮. শ্রমিক ইউনিয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধি;

৩৯. জরুরি উদ্ধার সেবা জোরদার;
৪০. সংগঠন গঠন ও সমিতি করার অধিকার
৪১. ন্যায্য মজুরি এবং কাজের ন্যূনতম মান;
৪২. নিরাপদ কর্মপরিবেশ;
৪৩. বাধ্যতামূলক শ্রমের নিষেধাজ্ঞা;
৪৪. শিশুশ্রম নিষিদ্ধকরণ;
৪৫. কর্মঘণ্টার সীমা;
৪৬. সমান কাজের জন্য সমান মজুরি;
৪৭. মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা;
৪৮. যৌন হয়রানি ও কর্মক্ষেত্রে হয়রানি রোধ;
৪৯. শ্রম আদালতের দীর্ঘসূত্রিতা;
৫০. গৃহকর্মীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। দরিদ্র এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে সরকারিভাবে ত্রাণ বিতরণ করা হলেও অনেক গৃহকর্মী তা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। গৃহকর্মীদের জন্য সরকারি ত্রাণ নিশ্চিত করতে হবে;
৫১. গৃহকর্মীর অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রধান অন্তরায় হলো এই পেশাটিই আনুষ্ঠানিভাবে স্বীকৃত নয়। 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি-২০১৫' বাস্তবায়ন এবং আইন প্রণয়ন করতে হবে;
৫২. অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত, শ্রমিক হিসেবে তাদের স্বীকৃতি এবং দক্ষ জনশক্তি হিসেবে তাদের সংগঠিত করতে আইএলও কনভেনশন-১৮৯ অনুসাক্ষর করা জরুরি;
৫৩. গৃহকর্মীদের প্রতি সকলের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। পাশাপাশি সরকারকেও নীতিমালা বাস্তবায়নসহ গৃহশ্রমিকদের সুরক্ষায় আইন প্রণয়ন এবং আইনি সুরক্ষার জন্য যথাযথ মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।

Alliance of Trade Unions

১. বিধি ২৬ (১-৪) সম্পূর্ণ বাতিল করা।
২. বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ এর বিধি ২৪৫ ও ২৪৬ এর শুরুতে 'বাংলাদেশে বিদ্যমান অন্য সকল আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই আইন অনুযায়ী' – বাক্যটি যুক্ত করা।
৩. কর্মস্থলে শ্রমিকের দায়িত্ব এবং কাজের বিবরণ প্রকাশ্যে টানিয়ে দেওয়ার একটি নতুন বিধি প্রণয়ন করা। কাজের ভার বা পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বা লিখিত কাজের বিবরণের বাইরে জারিকৃত নতুন কোনো কাজ বা দায়িত্ব যুক্ত করতে হলে তার জন্য শর্ত ও এর বিপরীতে শ্রমিকের প্রাপ্য সুবিধা বা পারিশ্রমিক সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রয়োজন।
৪. বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ এর ২৪২ এর উপধারা (১) সংশোধন।
৫. বিধি ২৩৪ এর (১)(খ) এর কোম্পানির মুনাফায় শ্রমিকের অংশ বন্টনের ক্ষেত্রে মুনাফার অংশ পরবর্তী বছরের 'অন্যূন ৯মাসের মধ্যে' এর স্থলে 'বছরের পহেলা তারিখের পহেলা মাসের মধ্যে প্রদান করিবে' বাক্যটি প্রতিস্থাপন করা। 'উক্ত সময়ের মধ্যে না দেওয়া হলে, উক্ত টাকার উপর বিধি ২৪০ (৩) এ উল্লেখিত হারে কোম্পানি কর্তৃক সুদ প্রদেয় হইবে' বাক্যটি যুক্ত করার প্রস্তাব করতেছি।

Vision Spring

১. Mandatory eye checking should be included in the OSH policy.
২. Creation of a common fund with donors, buyers, manufacturers, and workers (if deemed fit) to ensure the services are provided.

বাংলাদেশ এফএমসিজি এইচ আর সোসাইটি

১. ধারা-১৯ এ মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ, গ্র্যাচুইটি/সার্ভিস বেনিফিট বা গ্রুপ ইনসুরেন্সের চেয়ে অতিরিক্ত হবে কিনা স্পষ্ট করা।
২. যৌন হয়রানির বিষয়টি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং ধারা ২৩ (৪) এ অসদাচরনে সংযুক্ত করা প্রয়োজন।
৩. ধারা ২২ এ ডিসচার্জ করার বিধান থাকলেও সর্বোচ্চ কত দিন পর্যন্ত অসুস্থ থাকলে শ্রমিককে ডিসচার্জ করা যাবে তা স্পষ্ট করা।
৪. ধারা ২৩ এর উপধারা ৪ (খ ও ৪) এর অধীনে অসদাচরনের জন্য বরখাস্থ করা হইলে অথবা যেকোনো ভাবে বরখাস্থ হইলে তিনি গ্র্যাচুইটি পাবেন কিনা স্পষ্ট করা।
৫. তদন্ত কার্যক্রমে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি স্ব-শরীরে উপস্থিত থেকে তদন্ত কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করলেও চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান সে ক্ষেত্রে করনীয় কি তা স্পষ্ট করা।
৬. ধারা ৪৭ (১) মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে প্রথম ৮ সপ্তাহের পরিবর্তে ৬ সপ্তাহের নোটিস দিয়ে সন্তান প্রসবের পর ১০ (৮+২) সপ্তাহ ছুটি ভোগ করতে চায় সেই সুবিধা প্রদান করা।
৭. ধারা ৪৮ (২) সবেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি কাটানোর ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৮. ধারা ৮৯ (৭) এ দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসা ব্যয় বহনের পাশাপাশি মালিক ওই শ্রমিকের বেতন দেবে কিনা নাকি পঞ্চম তফসিল অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিবে তাই স্পষ্ট করা প্রয়োজন।
৯. ধারা ৯৯ (১) এ গ্রুপ বীমার ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারণ করা।
১০. ধারা ১১৫, ১১৬, ১১৭ তে অস্থায়ী এবং সাময়িক শ্রমিকগণ কীভাবে ছুটি ভোগ করবে, সে বিষয়ে স্পষ্ট করা প্রয়োজন।
১১. ধারা ২৬৪ তে পিএফফান্ড ট্রাস্টি হিসেবে মালিক ও শ্রমিকের প্রতিনিধি ক্রমান্বয়ে এক বছর করে দায়িত্ব পালন করার সুপারিশ করছি।

১২. শ্রম বিধি ১৮ ধারায় ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি চুক্তি ভিত্তিক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তত ২ বছর হতে পারে।
১৩. ধারা ৪ (৪, ৫) সাময়িক ও অস্থায়ী শ্রমিকের কাজের সর্বোচ্চ মেয়াদ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা।
১৪. বিধি-১১১ (৫) উৎসব ভাতা দেওয়ার হার হিসাবে 'মাসিক মূল মজুরির অধিক হইবে না' এমন বিধান আছে, যা সংশোধন হয়ে 'ন্যূনতম মাসিক মূল মজুরির কম হবে না' উল্লেখ থাকা উচিত।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (বিটিইউসি)

১. শ্রম মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় কাঠামো চালু করার সুপারিশ করছি। শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তর, প্রতিটি বিভাগী দফতরে প্রধানের পর মালিক ও শ্রমিক পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ, কাজে কর্মে গাফলতি, স্বার্থপরতা, ইত্যাদি বিষয়ের তদন্ত করতে ন্যায়পাল নিয়োগের সুপারিশ করছি।
২. একটি স্বতন্ত্র কর্মসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছি, যা বেকার ও শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে।
৩. শিল্প ও কলকারখানা, রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চল ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ সকল শ্রমজীবীদের আইনগত কাঠামোর মধ্যে রাখার সুপারিশ করছি। প্রাতিষ্ঠানিক, অপাতিষ্ঠানিক, স্ব—কর্মে নিয়োজীত শ্রমিকসহ গৃহ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, অটো রিকসা শ্রমিক, বাইক চালক, গিগ শ্রমিক (রাইড শেয়ারিং, প্লাটফম, ই—কর্মাস), চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক, আউট সোর্সসিং শ্রমিকদের কে শ্রমিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করার সুপারিশ করছি।
৪. শ্রমজীবীদের দেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক শ্রমমান অনুসারে মুক্ত ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন, সংগঠন, সমিতি বা এসোসিয়েশন করার অবাধ ব্যবস্থা থাকতে হবে, করতে দিতে হবে এবং সব বাধা দুর করতে হবে।
৫. সেক্টর বেইজড ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এর সমস্যা নিয়ে সরকার, মালিক ও সেক্টরের ফেডারেশন নিয়ে ত্রিমাসিক সামাজিক সংলাপ করার সুপারিশ করছি।
৬. দেশের সরকারি, আধা—সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এবং সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ০৬ মাস করতে হবে এবং কোনো বৈষম্য করা যাবে না এবং সন্তান জন্মদানের আগে ও পরে ৩০ দিন সমবেতনে পিতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করার সুপারিশ করছি।
৭. দেশের সকল সেক্টর, সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রসাশনিক কর্মে নিয়োজিত (পুলিশ, আনসার, থানা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য) এবং অন্যান্য শ্রমজীবী নারী/পুরুষদের ০৬ বছরের নিচের সন্তানদের জন্য ডে—কেয়ার সেন্টার বাধ্যগত ভাবে রাখার সুপারিশ করছি।
৮. শ্রম বিরোধ দ্রুত/৯০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তিতে শ্রম আদালতের পাশাপাশি বিকল্প শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আরবিটেশন সেল বা আরবিটেশন কমিশন গঠন করার সুপরিশ করছি। হঠাৎ করে দেখা দেয়া সৃষ্ঠ শ্রম অসন্তোশ নিরশনের জন্য শ্রমকি প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থায়ী ভাবে ভ্রাম্যমান আদালত এবং জরুরি ভাবে করনীয় নির্ধারণ করতে ত্রিপক্ষীয় একটি ক্রাইসি কমিটি গঠন করা। এছাড়াও শ্রম বিরোধ সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি জেলা, থানা শহরে ও ইউনিয়ন পরিষদে শ্রমজীবীদের সালিশ কেন্দ্র পলিসি প্রনয়নসহ চালু করার সুপারিশ করছি।
৯. ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর দেশি—বিদেশি সংগঠন, সংস্থা থেকে বা বিদেশি অনুদান গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত পদ্ধতি শ্রম আইনে বা অন্য কোনো ভাবে অন্তর্ভুক্ত বা ব্যবস্থা করার সুপারিশ করছি।
১০. আইএলও এর যে সব কনভেনশন এখনও অনুস্বাক্ষর করা হয় নেই তা স্বাক্ষর করার জন্য সুপারিশ করছি। ইউএনজিপি, ডিউডেলিজেন্স, ওইসিডি গাইড লাইন, আরও যে সব আন্তর্জাতিক পলিসি, এবং সপারিশ রয়েছে তা শ্রমনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা;
১১. বাংলাদেশের বর্তমান মজুরি বোর্ডকে মজুরি কমিশনে উন্নিত করতে সুপারিশ করছি। জাতীয় নিম্নতম মজুরি ঘোষণা বাধ্যগত করতে হবে যা জাতীয় মূল্যস্ফীতির সাথে প্রতি বছর সমন্বয় হবে। প্রতিটি সেক্টরে আলাদা আলাদা মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে। সেক্টরের মজুরি কাঠামো কোনো ভাবেই জাতীয় নিম্নতম মজুরি হারের চেয়ে কম হবে না, বেশি হতে পারবে।
১২. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যেমে দেশের সকল সেক্টরের শ্রমজীবীদের সেক্টর অনুসারে ডাটা বেইজ করতে হবে। উক্ত ডাটা বেইজ সেন্টার ডাটাবেইজের মাধ্যমে সংরক্ষন করতে। যে সব শ্রমজীবী এখনও ভ্রাম্যমান, বেকার এবং সেক্টরের আওতাধীন নয় তাদেরকেও ডাটাবেইজের আওতায় আনতে হবে।
১৩. প্রতিটি শ্রম সেক্টরে, জেলা শহরে, শ্রমঘন অঞ্চলে সকল শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরি, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ডে—কেয়ার সেন্টার, সন্তানদের জন্য স্কুল, কলেজ, ধর্মিয় উপশনালয়, খেলার মাঠ ও বিনোদন কেন্দ্র নিশ্চিত করার বিধান চালু করা।
১৪. পিছিয়ে পড়া শ্রমিক, কম মজুরির শ্রমিক, মৌসুমি শ্রমিক, শ্রমজীবীদের জন্য কমমুল্যে প্রয়োজনীয় নিত্য পন্য সামগ্রী রেশনিং পদ্ধতীতে প্রদান করা।
১৫. শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম আদালত, জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটি, ন্যূনতম মজুরি বোর্ডসহ শ্রম মন্ত্রণালয়ে যে সব কমিটি রয়েছে প্রতিটি কমিটিতে কনফেডারেশন এর প্রতিনিধিদেও সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা।
১৬. শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের নামে ২০১০ সাল থেকে সকল ষড়যন্ত্রমূলক ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। শ্রম অসন্তোষের ঘটনার মামলা দায়েরের মত কিছু ঘটিলে তা শ্রম আদালতে করার বিধান করার সুপারিশ করছি।
১৭. শিল্পসম্পর্ক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি শিল্প এলাকায় শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করতে হবে। উক্ত কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ভাবে ব্যাচ হিসাবে শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত করতে হবে।
১৮. শ্রম দপ্তরসমূহ থেকে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনসমূহের নিবন্ধনকৃত হওয়ার সাথে সাথে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনা বিষসয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থঅ করতে হবে।
১৯. পাঠ্যপুস্তাকে ৮ম শ্রেনী থেকে শ্রম অধিকার, মানবধিকার, শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নে মালিক শ্রমিকের দায়িত্ব কর্তাব্য সম্পর্কে একটি অধ্যায় যোগ করার সুপারিশ করছি।

২০. বয়স্ক, অক্ষম, অবসরকৃত, পূর্ণ বেকার, খণ্ডকালীন বেকার এবং মৌসুমি শ্রমজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ সাজামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর বলয়ে চালু করার জন্য সুপারিশ করছি। যে কোনো মহামারী দেখা দিলে সেই সময় কর্মরত সকল শ্রমজীবীদের জীবযাপনের ব্যায়ভার বহন করা বিদান চালু করা।
২১. শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয়ে কর্তৃক অধিকাহারে নারী কর্মজীবীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং উচ্চপদে নারী শ্রমজীবীদের পদন্নতিতে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার বিধান নিশ্চিৎ করার সুপারিশ করছি।
২২. দেশের শিল্প এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে শিল্প পুলিশ বিলুপ্তি করে, মালিক—শ্রমিক প্রতিনিধি ও সরকার এর সমন্বয়ে শিল্প সম্পর্ক সেল তৈরি করার সুপারিশ করছি।
২৩. অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষন বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি শাখা চালু করতে হবে এবং অভিবাসন প্রক্রিয়ার (দেশে ও দেশের বাহিরে) চেইনে যে সব সমস্যা রয়েছে তা শ্রম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। অভিবাসি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার শ্রম আইনে নিশ্চিত করতে হবে।
২৪. শ্রমস্থলে পর্যাপ্ত আলো—বাতাস, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য নিরাপত্তা সরঞ্জাম নিশ্চিত করা। ভারী যন্ত্রপাতি পরিচালনার প্রশিক্ষণ, সুরক্ষা পোশাক ও সরঞ্জাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা। রাসায়নিক, ধুলাবালি, শব্দদূষণ বা ভারী কাজের কারণে সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কর্মক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও হাসপাতাল সেবা সহজলভ্য করা। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অতিরিক্ত কাজ ও মানসিক চাপে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানোর জন্য উপযুক্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা। কোনো কারণে কর্মরত শ্রমিক মারা গেলে বা কাজ করতে অক্ষম হলে, পঙ্গু হলে উক্ত শ্রমিকের আমৃত্যু ক্ষতিপূরন হিসাবে আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুসারে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
২৫. বাংলাদেশের সকল শ্রমিক ফেডারেশন এর নেতৃবৃন্দদের সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রম আইন সংশোধন করে, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা কর্যকর করার সুপারিশ করছি।
২৬. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অটোমেশন/ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করবে এবং উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পলিসি প্রণয়ন করা। উক্ত ট্রানজিশনের ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে কর্মরত শ্রমিকদের অথবা তাদের পোষ্য সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক রিস্কেলিং এবং আপস্কেলিং এর আওতাধীন করবে। আধুনিক লেটেস্টে কারিকুলামে সর্বশেষ মেশিনারিজের উপর ভিত্তি করে ভোকেশনাল শিক্ষা কেন্দ্র/স্কুল চালু করতে হবে। অটোমেশন/ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সমস্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক ও কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক তহবিল গঠন করার সুপারিশ করছি।
২৭. জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কতৃর্ক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

দোকান/মার্কেট কর্মচারী

১. দোকান—কর্মচারীদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে ন্যূনতম মজুরি ২০০০০ টাকা করা।
২. সবার জন্য নিয়োগপত্র বাধ্যতামূলক করতে হবে। নিয়োগপত্রে কাজের ধরন, কাজের বিবরণ, কর্মঘণ্টা, বেতন—ভাতা, ছুটি, বেতন বৃদ্ধি, বেতন বৃদ্ধির প্রক্রিয়া, চাকরির স্থায়িত্ব, পেনশন সহ অন্যান্য সুযোগ—সুবিধার কথা উল্লেখ থাকতে হবে।
৩. সবার জন্য বাধ্যতামূলক পরিচয়পত্র ছবি সহ।
৪. কত বছর বয়স পর্যন্ত একজন কর্মচারী কাজ করবে, সেটা উল্লেখ থাকতে হবে।
৫. দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার পর বাকী কর্মঘণ্টা ওভার টাইম বলে বিবেচিত হবে।
৬. পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। কর্মচারীদের আর্থসামাজিক কল্যাণসাধন করতে হবে।
৭. প্রত্যেক নারী কর্মচারীদের ৬ মাস স্ব—বেতনে মাতৃত্বকালীন ছুটি ঘোষণা করতে হবে।
৮. সাপ্তাহিক ছুটি সহ অন্যান্য সকল সরকারি ছুটি দিতে হবে।
৯. নিয়ম মাফিক সকল কর্মচারীর পদোন্নতি দিতে হবে।
১০. কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা অনুযায়ী যখন তখন ছাটাই করা বন্ধ করতে হবে।
১১. কর্মক্ষেত্রে কোনো প্রকারের কোনো বৈষম্য থাকবে না। যে যার যোগ্যতা অনুযায়ী সব রকমের সুযোগ পাবে।
১২. সকল কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ দিতে হবে এবং সহযোগিতা করতে হবে। দোকান/ মার্কেটের কর্মচারীদের — মার্কেট ভিত্তিক টেড্র ইউনিয়ন হবে। ফুটপাত দোকান কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন হবে এলাকা ভিত্তিক।
১৩. কোনো প্রকারের কোনো শোষণ বা বাধ্যতামূলক শ্রম থাকবে না। জোর করে কাজ চাপিয়ে দেয়া যাবে না। নির্দিষ্ট কাজের বাইরে অন্য কোনো কাজ দেয়া যাবে না।
১৪. নারী কর্মচারীদের সুরক্ষা ও বিশেষ সুবিধা দিতে হবে। রাত্রিকালীন যাতাযাতের নিরাপদ ব্যবস্থা মালিক/কর্তৃপক্ষকেই করতে হবে। নারী কর্মচারীদের পিরিয়ড চলাকালীন সময়ে কর্মঘণ্টা কমাতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী ছুটি দিতে হবে।
১৫. কাজ করার সময় অথবা কাজে যাওয়া—আসার পথে বা মার্কেটে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে, সেই কর্মচারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
১৬. প্রত্যেক দোকান কর্মচারীদের জন্য পেনশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। চাকরির একটি নির্দিষ্ট বয়স এবং নির্দিষ্ট বছর পেনশন সুবিধা দিতে হবে। সবার জন্য মহার্ঘ ভাতা, ইনক্রিমেন্ট এবং রেশনিং ব্যবস্থার জোর দাবি।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র

১. স্বাস্থ্য সেবা সংস্কার

- প্যাথলজিকাল ল্যাব স্থাপন;
- শ্রমজীবী হাসপাতাল নির্মাণ;
- বিশেষায়িত পেশাগত ব্যাধি হাসপাতাল নির্মাণ;
- প্রশিক্ষণ সেবা কর্যক্রমের সংস্কার;

সকল আইআরআই

১. প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের যুগোপযোগী নামকরণ

- শিল্প সম্পর্ক কোর্স: চার সপ্তাহ মেয়াদী ও বাধ্যতামূলক আবাসিক ট্রেনিং কোর্স;
- **শ্রম আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স:** পাঁচ দিন মেয়াদী;

২. নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স চালুকরণ বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন

- কর্মক্ষেত্রে মালিক-শ্রমিক এর সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।
- শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা, বিশেষ করে ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের নতুন প্রযুক্তিগুলো নিয়ে দিন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজন ।
- টেকসই উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে Circular Economy বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- সেক্টর ভিত্তিক বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরের আন্তর্জাতিক মান নির্ধারণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- গার্মেন্টস খাতের কমপ্লায়েন্স ইস্যু নিয়ে প্রশিক্ষণ।
- শোভন কর্ম পরিবেশ নিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার নির্দেশনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
- শ্রমিকের ন্যায়ানুগ অধিকার ও সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ।
- শ্রমিকের শ্রম আইন বিষয়ক অধিকার এবং মানবাধিকার বিষয়ক এবং আই এল ও এর শ্রম মান নিয়ে প্রশিক্ষণ।
- পরিবেশ আইন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশিক্ষণ
- সবুজ কারখানা বা Green Factory এবং এগুলোর আন্তর্জাতিক মান নিয়ে প্রশিক্ষণ।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর উল্লিখিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৩. ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনাকরণ

ডিপ্লোমা ইন লেবার ম্যানেজমেন্ট; ডিপ্লোমা ইন ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট; ডিপ্লোমা ইন সোসাল কমপ্লায়েন্স; ডিপ্লোমা ইন এইচ আর এম; ডিপ্লোমা ইন প্রোডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট; এবং সময়ের চাহিদা ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার বিষয়টি এবং শ্রম বাজারের পরিবর্তন বিবেচনা করে বর্ণিত ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা প্রয়োজন।

৪. প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মডিউল ডেভেলপমেন্ট

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রশিক্ষণ মডিউলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবেঃ

International Trade & Finance, Development Economics, Circular Economy, Compliance and Audit, SDGs, Waste Management, Effluent treatment plant, Solar Energy, Political Economy, Public Finance, Finance in Industry, Technology in Trade and Finance, International labor standard, Globalization and business, etc.

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতাসহ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য খাতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

- দৈনিক প্রশিক্ষণ ভাতা ১০০০ টাকা;
- প্রশিক্ষণ সামগ্রী (ব্যাগ, রাইটিং প্যাড, কলম, নেম ব্যাজ ইত্যাদি বাবদ ২,০০০ টাকা;
- দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজনের নিমিত্ত দুই বার প্রশিক্ষণার্থীদের নাস্তা সরবরাহের লক্ষ্যে নাস্তা বাবদ ১০০ টাকা;
- প্রতি প্রশিক্ষণার্থী বাবদ প্রতিদিন ৭০০ টাকা মধ্যাহ্ন ভোজ বাবদ ব্যয় নির্ধারণ করা;
- চার সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের শিক্ষা সফরে শিক্ষা সফর (ভাড়া, আপ্যায়ন ও অন্যান্য
- প্রতি প্রশিক্ষণার্থী বাবদ ২০০০ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা;
- কোর্স পরিচালক, কোর্স সমন্বয়কারী ও সাপোর্ট স্টাফদের যৌক্তিক হারে সম্মানী নির্ধারণ প্রয়োজন।
- চার সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সে জ্ঞান ও শরীর চর্চা ভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় প্রতি কোর্সে ১০,০০০ টাকা ব্যয় নির্ধারণ।
- কোর্স পরিচালক, কোর্স সমন্বয়কারী ও সাপোর্ট স্টাফদের যৌক্তিক হারে সম্মানী নির্ধারণ প্রয়োজন।

৬. শ্রম অধিদপ্তরের আওতাধীন আই আর আই এর কর্মকর্তাগনের দক্ষতা বৃদ্ধি

- ট্রেনিং প্রোগ্রাম দক্ষতার সাথে পরিচালনার স্বার্থে শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনের কর্মরত কর্মকর্তাদের ফাউন্ডেশন ট্রেনিংসহ দেশ/বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে ।

৭. ট্রেনিং প্রোগ্রাম ও পদ্ধতিতে সংস্কার ও সংযোজন

- বিদ্যমান আইআরআইসমূহে চলমান ট্রেনিং পদ্ধতি আধুনিক ও যুগোপযোগী করা প্রয়োজন পাশাপাশি অনলাইন ভিত্তিক প্রশিক্ষণ আয়োজনে কারিগরি ও দক্ষতা বারাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮. আইআরআই এর জনবল কাঠামোয় সংস্কার

- শ্রম শক্তির চাহিদা অনুযায়ী ট্রেনিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইআরআইসমূহে জনবল কাঠামো বৃদ্ধি এবং পদমান আপগ্রেডেশন করা প্রয়োজন। বিদ্যমান জনবলে কাঠামোর সংস্কার করে জনবল বাড়াতে হবে।

৯. **আইআরআই এর অবকাঠামোগত সংস্কার, উন্নয়ন ও প্রতি বিভাগে আইআরআই স্থাপন**

আন্তর্জাতিক মানসম্মতভাবে আইআরআইকে তৈরি করতে চাইলে বিদ্যমান চারটি আইআরআই এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা এবং আরও প্রশাসনিক চারটি বিভাগে নতুন চারটি আইআরআই স্থাপন করা প্রয়োজন যার একটি রুপরেখা নিম্নরুপ:

- আধুনিক প্রশিক্ষণ ভবন;
- প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য আধুনিক ডরমেটরী;
- দেশি এবং বিদেশি অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকদের অবস্থানের জন্য আধুনিক গেষ্ট হাউজ;
- কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য আবাসন সুবিধা;
- বিনোদন/স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্থাপন;
- প্রাথমিক **চিকিৎসার লক্ষ্যে মেডিকেল সেন্টার স্থাপন।**

১০. **প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মরত সুবিধা বঞ্চিত শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান**

- ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকে মোকাবেলা করাসহ বাংলাদেশ নানাবিধ বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তাই সমাজের সকল স্তরের মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করলেই একটি উন্নত রাষ্ট্রের স্বপ্ন সফল হতে পারে। সেদিক বিবেচনায় নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ করে গড়ে তোলা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা।

১১. **বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি**

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ট্রেনিং ইন্সিটিউটসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ৩০ শতাংশ বিশেষ ভাতা পেয়ে থাকেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের ন্যায় শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহে এ ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

পপুলার ফার্মাসিটিউক্যাল লিঃ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (প্রস্তাবিত)

- পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন (প্রস্তাবিত) নামে একটি ইউনিয়ন বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এবং বিধিমালা, ২০১৫ ও সর্বশেষ সংশোধনী অনুসরণ করে রেজিস্ট্রেশন পাইবার জন্য আবেদন।

উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন

- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ১৯৫ ধারা মোতাবেক অসৎ শ্রম আচারণ ও অন্যায় ভাবে হয়রানীমূলক বদলি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আবেদন।

উত্তরা ব্যাংক মিটেড ওয়ার্কাস ইউনিয়ন

- শিল্প ও প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সদস্যরা ইচ্ছা পোষণ করলে ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির মোট কর্মকর্তা শতকরা ১০ ভাগ কে নির্বাচিত করতে পারবে যারা উক্ত প্রতিষ্ঠানে পূর্বে কর্মরত ছিলেন।

ড্রাইভারস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন

১. গাড়ি চালক অধিকার আইন:

- গাড়ি চালক তৈরির প্রক্রিয়া পরিবর্তন করা।
- বিআরটিসি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অথবা বি আর টি এ অনুমোদিত প্রাইভেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চালকদের সনদ প্রদানের মাধ্যমে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান নিশ্চিত করা।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা এবং প্রযোজনীয় স্বাস্থ্য পরিক্ষা সনদ যুক্ত করা।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র যুক্ত করা।
- লাইসেন্সবিহীন অভীজ্ঞ পেশাদার চালকদের সহজ শর্তে লাইসেন্স প্রদান করা।
- পেশাদার গাড়ী চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রাপ্তির বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর নির্ধারণ করা।
- নির্দিষ্ট শ্রেণির গাড়ি চালানোর জন্য সেই শ্রেণির গাড়ি দ্বারা যথাযথ পরীক্ষা শেষে সেই শ্রেণির ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান করা।
- বিআরটিএ-এর তত্ত্বাবধানে বর্তমান ডোপটেস্ট নীতিমালা পরিবর্তন করে স্ব স্ব কর্মস্থলে উপস্থিত ডোপটেস্ট এর ব্যবস্থা করা।
- সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ সংস্কার করে, জরিমানা ও শাস্তির বিধান ১৯৮৩-এর অধ্যাদেশ ও বিধান মোতাবেক বহাল রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কার করা।

২. গাড়ি ফিটনেসের আগে চালকের ফিটনেস:

- পেশাদার চালকদের জন্য রক্ষণাত্মক ড্রাইভিং-আপগ্রেডিং ও মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণের জন্য একটি ইথিক্যাল-মডার্ন একাডেমি স্থাপন করা।
- পেয়াদার চালকদের জন্য বিশ্বমানের ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করা।
- গাড়ির ফিটনেস পরীক্ষা করার আগে চালকদের মোটিভেশনাল ও রিফ্রেশার কমেন্ট্রি প্রশিক্ষণ করা।
- প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন করা এবং সনদ যুক্ত করা।
- অফিস কর্তৃপক্ষের স্ব স্ব কর্মস্থলের কাছ থেকে চালকের ভালো-মন্দ আচরণের উপর ভিত্তি করে ৫ থেকে ১০ রেটিংযুক্ত প্রত্যয়নপত্র প্রদান নিশ্চিত করা।

৩. গাড়ি চালক অধিকার প্রতিষ্ঠা:

- পেশাদার গাড়ি চালকদের অধিকার নিশ্চিত ও শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান।
- দৈনিক কর্মঘণ্টার সুনির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা।
- শ্রম আইন অনুযায়ী ৮ঘণ্টার কর্মদিবস নির্ধারণ করা।

- প্রতিদিন সর্বোচ্চ ১২ ঘণ্টার বেশি কাজ না করার বিধান নিশ্চিত করা।
- সাপ্তাহিক সর্বোচ্চ কর্মঘণ্টা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা।
- অতিরিক্ত কাজের ক্ষেত্রে প্রতি ঘণ্টার মজুরি নির্ধারিত দৈনিক হাজিরার হার অনুযায়ী দ্বিগুণ করা।
- যে কোনো সরকারি ছুটির দিনে কাজের মজুরি দ্বিগুণ করা।
- শ্রম আইন অনুযায়ী, পেশাদার গাড়ি চালককে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার ক্ষেত্রে নির্ধারিত বিধি-বিধান অনুসরণ করা
- গাড়িচালক নিয়োগ ও ছাঁটাইয়ের জন্য একটি রাষ্ট্র নির্ধারিত ফর্ম প্রণয়ন করা। এই ফর্ম সরকারি ওয়েবসাইটে সংরক্ষণ করা। নিয়োগ বা ছাঁটাইয়ের সময় ফর্মটি মালিক ও চালক উভয়কে বাধ্যতামূলকভাবে পূরণ করে রাষ্ট্রের নির্ধারিত ওয়েবসাইটে জমা দেওয়া এবং এই ফর্ম মালিক-চালক ও রাষ্ট্রের সংরক্ষণ করা।
- গাড়ী চালক নিয়োগের ক্ষেত্রে ১দিন, ৭দিন, ১৫দিন, ১মাম ও ৬মাস পর্যন্ত ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ ও ৬ মাস পরবর্তী মাসে গাড়ী চালককে স্থায়ী হিসাবে গন্য করা।
- প্রতিদিন যাত্রার আগে সেফটি টুলবক্স, মিটিং এর মাধ্যমে সচেতনতামূলক আচার-আচরণ প্রশিক্ষণ করা।
- সাপ্তাহিক ১ দিন কর্মবিরতি এবং বাৎসরিক উৎসবকালীন ছুটি আইনানুগভাবে নিশ্চিত করা।
- দীর্ঘসময় একটানা গাড়ি চালানোর পর ক্লান্তি থেকে বিরত রাখতে প্রতি ২ ঘণ্টা পর ছোট বিরতি (লাইটেস্ট ব্রেক) নিশ্চিত করা।
- পেশাদার চালকদের জন্য সর্বনিম্ন মজুরির পরিমাণ নির্ধারণ করা।
- পেশাদার চালকদের জন্য পিএফ, পেনশন, চিকিৎসা ও রেশনের ব্যবস্থা করা।
- পেশাদার চালকদের অবসরের বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৬৫ বছর নির্ধারণ করা। চাকরি শেষে শ্রম আইন অনুযায়ী প্রাপ্য সকল পাওনাদি বুঝিয়ে দেওয়া।

৪. চালকদের সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা:

- সমগ্র বাংলাদেশে চলার পথে কোনো দুর্ঘটনা বা হয়রানির শিকার হলে সরকারি নানা প্রসাশনিক সংস্থার দ্রুত হস্তক্ষেণ ও নিরাপত্তা বিধান করা।
- সড়ক দুর্ঘটনা কবলিত হলে কাছাকাছি প্রাইভেট হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থার বিধান করা।
- চালক-শ্রমিকদের জন্য নির্ধারিত সড়ক দুর্ঘটনায় আর্থিক তহবিল থেকে শ্রমিক বা তার অভিভাবককে দ্রুত ও সঠিক নিয়মে প্রাপ্য অর্থ প্রদান নিশ্চিত করা হবে।
- সড়ক দুর্ঘটনায় আর্থিক তহবিল থেকে সহায়তা দরখাস্ত করার সর্বোচ্চ সময় ১ মাসের স্থলে ৬মাস করা।
- চালকদের জরুরি প্রযোজনে একটি হটলাইন স্থাপন।
- চালকদের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের জন্য একটি ডেটা মনিটরিং সেল গঠন।
- সকল চালককে একটি নির্দিষ্ট ইউনিফর্মের আওতায় আনা ও একটি ডাটাবেস গঠন করা।
- বিদেশে কর্মরত চালকদের তথ্য ডাটাবেসে সংরক্ষণ।
- প্রতিবছর কর্মক্ষমতা হারানো চালকদের সংখ্যা ডাটাবেসে সংরক্ষণ করা।
- বর্তমানে কর্মক্ষম চালকদের সংখ্যা ডাটাবেসে সঠিকভাবে নথিভুক্ত করা।
- গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের সঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্সের ঘাটতির সংখ্যা ডাটাবেসে হিসাব করা।

৫. অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা:

- স্বাধীন কমিশনের মাধ্যমে চালকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- শ্রম আইন অনুযায়ী চালকদের তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া।
- সড়ক দুর্ঘটনা তহবিল এবং শ্রমকল্যাণ ফাউন্ডেশনের সুবিধা সময়ক্ষেপণ না করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে যথাযথ প্রাপ্য চালকদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।
- চালকশ্রমিকদের জন্য হেলথ কার্ড প্রদান করা।
- হাসপাতাল ভর্তি চিকিৎসা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান।
- স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক মৃত্যুতে আর্থিক তহবিল থেকে ১০ লাখ টাকা সহায়তা নিশ্চিত করা।

৬. নিরাপদ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি (সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা):

- মহাসড়কে নির্দিষ্ট দূরত্বে চালকদের জন্য বিশ্রামাগার নির্মাণ করা।
- সকল টার্মিনাল এবং অফিসিয়াল পার্কিং এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত ওয়াশরুম স্থাপন করা।
- টার্মিনাল এলাকায় পর্যাপ্ত বসার জায়গা ও বিশ্রামের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- টার্মিনাল গুলোয় নিরাপদ পানির ব্যবস্থা স্থাপন করা।
- সেফটি টুলবক্স মিটিংয়ের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।
- টার্মিনালগুলোতে প্রাথমিক স্বাস্থা সেবার জন্য চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা।
- স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রযোজনীয় ডাক্তার, নার্স ও ঔষধ রাখা।
- গাড়ী চালকের পার্কিং স্থলে প্রাথমিক চিকিৎসা সামগ্রী রাখা।

৭. ভাড়ার গাড়ির চালক শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ভাড়ার গাড়ির নীতিমালা প্রণয়ন:

- প্রাইভেট রেজিস্ট্রার্ড সাদা প্লেটের গাড়ীকে কমার্শিয়াল রেন্ট-এ-কার ব্যবসায় ও গাড়ী চালক কে বৈধতা প্রদান।
- সাদা প্লেটের ভাড়ার গাড়ির সংখ্যা সঠিকভাবে ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা।
- ভাড়ার গাড়িগুলোকে একটি নির্দিষ্ট ইউনিফর্মে নিয়ে আসা।
- সকল পেশাদার গাড়ি চালককে শ্রম আইন অনুযায়ী নিযোগ পত্র ও পরিচয় পত্র প্রদান করে একটি ইউনিফর্ম কাঠামোর আওতায় আনা।
- গাড়ী চালক শ্রমিকরা অধিকার প্রতিষ্ঠায় শ্রম আদালতের দারস্থ হয়ে মালিকের বিপরিতে মামলা করলে শ্রম আদালতে মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও হয়রানি বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা

সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট

১. কৃষি শ্রমিকদের সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষি শ্রমিকদের জন্য ১২০ দিনের কর্ম সৃজন প্রকল্প চালু করতে হবে।
২. কৃষি শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কর্ম দিবস সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
৩. কৃষি শ্রমিকদের মজুরি ৮০০ টাকা নির্ধারণ করতে হবে। পরিযায়ী কৃষি শ্রমিকদের জন্য সরকারি উদ্যোগে কাজের এলাকায় থাকার জন্য মানসম্মত নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪. নারী শ্রমিকের মজুরি ন্যূনতম বৈষম্য দূর করতে হবে। মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
৫. ৬০ বছর উর্ধ্ব কৃষি শ্রমিকদের বিনা কিস্তিতে (টাকা জমা ছাড়াই) সরকারি পেনশন দিতে হবে।
৬. কৃষি শ্রমিকদের জন্য রেজিস্ট্রেশন কার্ড, রেশন-স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। ভূমিহীন, খেতমজুর, বর্গাচাষীদের কৃষি কার্ড দিতে হবে।
৭. কীটনাশক-ছত্রাক নাশক, সারসহ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
৮. বন্যা খরা নদী ভাঙ্গনসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক-খেতমজুরদের আর্থিকসহ পুনর্বাসনের জন্য সহায়তা দিতে হবে।
৯. সরকারি খাস জমি সমবায়ের মাধ্যমে ভূমিহীন খেতমজুর তথা কৃষি শ্রমিকদের মধ্যে বিতরণ (হস্তান্তর অযোগ্য করে) করতে হবে।

জাতীয় কৃষক জোট

১. কৃষি ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান করতে হবে। স্থানীয় সরকার বা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সরকার নিবন্ধিত কৃষক ও কৃষিশ্রমিকদের পরিচয়পত্র প্রদান করবে।
২. সরকারকে রেজিস্ট্রিকৃত কৃষিশ্রমিকদের জীবিকার নিরাপত্তা প্রদানের জন্য বছরে কমপক্ষে ১২০ কর্মদিবস নিশ্চিত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. রেজিস্ট্রিকৃত কৃষিশ্রমিক ও তাদের পরিবার সদস্যদের জন্য স্বতন্ত্র সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করতে হবে এবং খরা, বন্যা, মঙ্গা ও খাদ্যাভাবের সময় বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে হবে।
৪. কৃষিশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি চলতি বাজার দর অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হবে। ন্যূনতম মজুরি আইনের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং কৃষিশ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত শ্রমপরিদর্শক নিয়োগ করতে হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
৫. কৃষিশ্রমিকদের সমিতি/সংগঠন করার অধিকারসহ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদান করতে হবে। ঋতু অনুসারে কৃষিকাজে শ্রম সময় নির্ধারণ, ওভারটাইম মজুরি, কাজের পরিবেশ, সমকাজে সমমজুরি, নারী কৃষিশ্রমিকদের বিশেষ সুবিধাসহ কৃষিশ্রমিকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ শ্রমআইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
৬. কৃষিশ্রমিকদের জন্য কল্যাণ তহবিল প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ কল্যাণ তহবিল থেকে নিবন্ধিত কৃষিশ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, অবসরকালীন ভাতা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের সহায়তা প্রদান করতে হবে।
৭. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ সকল গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে পরিকল্পনা, তদারকি ও বিলিবণ্টনে কৃষিশ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
৮. কৃষিশ্রমিকদের অভ্যন্তরীণ অভিবাসন সহায়তার জন্য একটি 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' দপ্তর স্থাপন করতে হবে। এ দপ্তরের কাজ হবে প্রতিটি উপজেলায় কখন কি পরিমাণ শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে এবং মজুরির গড় হার সেখানে কখন কত তার তথ্য সংগ্রহ এবং উপজেলা পর্যায়ে সেই তথ্য ছড়িয়ে দেয়া।
৯. কৃষিমজুর ও কৃষকদের জন্য উৎপাদনমুখী সমবায় চালু করতে হবে। কৃষক সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি পণ্য ও বীজ উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষি উপকরণ কৃষকের মাঝে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
১০. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে রেজিস্ট্রিকৃত প্রান্তিক কৃষকদের ভাতা প্রদান করতে হবে যাতে প্রান্তিক কৃষকরা ভূমিহীন কৃষকে পরিণত না হন।
১১. কৃষি খাতের সঙ্গে যুক্ত উৎপাদক গ্রামীণ নারীদেরকে কৃষক হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং কৃষক হিসেবে তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। নারী কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রদান করতে হবে।
১২. গ্রামীণ নারী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নিতে হবে
১৩. নারী কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদের উপযোগী নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
১৪. নারীর জন্য উপযোগী কৃষিযন্ত্র উদ্ভাবনের নিমিত্তে বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে উৎসাহিত করতে হবে। সাথে সাথে উদ্ভাবিত যন্ত্র মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে।
১৫. নারী কৃষিশ্রমিকদের প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করতে হবে; সরকারকে এজন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

আউটসোর্সিং কর্মচারীগণ

- আউটসোর্সিং কর্মীরা দীর্ঘদিন (মে ২০২৪ হতে অদ্যাবধি) বেতন পাচ্ছে না। আউটসোর্সিং কর্মীদের সঠিক সময়ে বেতন প্রদানের দাবি।

জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা

১. কাজের অধিকার, সুযোগ, নিশ্চয়তা, অন্তর্ভুক্তি ও নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ:

- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈষম্যহীন ও সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বান্ধব নিয়োগ নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করতে হবে।
- চাকরি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব করা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা প্রয়োজন।
- প্রতিবন্ধিতার ভিত্তিতে বৈষম্যসৃষ্টিকারী সকল নিয়োগ সংক্রান্ত বিধিবিধান বাতিল করা এবং সিআরপিডি'র আলোকে শ্রম আইন সংশোধন করা।
- ২০১৯ সালে প্রণীত প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক জাতীয় কর্ম পরিকল্পণায় উল্লেখিত কোটা বাস্তবায়ন করা। বিদ্যমান জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের জন্য ১% কোটা। আমাদের সুপারিশ শুধু শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নয়, সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ৫% কোঠা বরাদ্দ রাখা হোক।
- বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ১০% প্রতিবন্ধী কর্মী নিয়োগ দিলে উক্ত প্রতিষ্ঠান ৫% কর রেয়াদ পাবে। শর্তটি কঠিন হবার কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ নিয়োগ পাচ্ছে না। আমাদের সুপারিশ যত শতাংশ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে, তত শতাংশ কর রেয়াদের নিয়ম করা হোক।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ১৬ ধারার (ঞ) বলা আছে, কর্মজীবনে প্রতিবন্ধিতার শিকার ব্যক্তি কর্মে নিয়োজিত থাকিবার, অন্যথায় যথাযথ পুনবাসন বা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির অধিকার। এই বিধান যথাযথভাবে কারযকর করতে হবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ১৬ ধারার (ঢ) দফা অনুযায়ী শারীরিক, মানসিক ও কারিগরি সক্ষমতা অর্জন করিয়া সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে একীভূত হইবার লক্ষে সহায়ক সেবা ও পুনর্বাসন সুবিধা প্রাপ্তি।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ৩৫ ধারায় বলা হয়েছে, আপাতত বলবদ অন্যকোনো আইনে যাহা কিছু থাকুক না কেন, যোগ্যতা থাকা শর্তেও প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী, উপযোগী কোনো কর্মে নিযুক্ত হইতে কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বঞ্চিত বা তাহার প্রতি বৈষম্য করা বা তাহাকে বাধাগ্রস্থ করা যাবে না।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবীশ হিসেবে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা।

২. রিজনেবল একোমোডেশন

- নিয়োগ পরিক্ষায় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি সহ অন্যান্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের (যার জন্য প্রযোজ্য) জন্য শ্রুতিলেখক রাখার ব্যবস্থা রাখা। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে এতদ বিষয়ে নীতিমালা তৈরি করা।
- নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান প্রতিবন্ধী কর্মীদের প্রয়োজনীয় সহায়ক উপকরণ প্রদান করবে।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ এর ১৬ ধারার (ড) বলা আছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রসহ প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে রিজনেবল একোমোডেশন বা প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উপযোগী পরিবেশ ও ন্যায্য সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার থাকবে। এই আইনি বিধান কঠোরভাবে বাস্তবায়ন, মনিটরিং এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. প্রবেশগম্যতা:

- নিয়োগ পরিক্ষার কেন্দ্রগুলো সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রবেশগম্য স্থানে আয়োজন করা।
- কর্মস্থলের প্রবেশগম্যতা কঠোরভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন:

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত) ইআরসিপিএইচ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবান্ধব করার জন্য ভবন ও প্রশিক্ষণ কারিকলাম সংস্কার এর সুপারিশ করছি। পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় উক্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুপারিশ করছি।
- মৌখিক পরিক্ষায় বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ইশারা ভাষা দোভাষী রাখার ব্যবস্থা করা।
- বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী কর্মীদের জন্য কর্মস্থলে ইশারা ভাষার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫. সামাজিক সুরক্ষা ও নিরাপত্তা:

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেতন কাঠামোতে যাতায়াত ও বাসা ভাড়া নির্ধারণের জন্য কমপক্ষে অপ্রতিবন্ধী কর্মীর তুলনায় দ্বিগুন রাখার সুপারিশ করছি।
- সমান সুযোগ ও সমমানের কাজের জন্য সমান সম্মানীসহ সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টিতে অন্যদের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার রক্ষা করা এবং হয়রানি থেকে রক্ষা ও অন্যায়ের প্রতিকারসহ নিরাপদ ও ভালো কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।ণ

৬. ট্রেড ইউনিয়ন:

- অন্যদের মতো সমানভাবে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও যেন শ্রম ও কর্মীসংঘের অধিকার অনুশীলন করতে পারে, তা নিশ্চিত করা।
- প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন বা ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। প্রয়োজনে কোটা ব্যবস্থা প্রচলন করতে হবে। উল্লেখ্য, সিআরপিডি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন করার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

৭. আত্মকর্মসংস্থান:

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যেন সাধারণ প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক নির্দেশনা কর্মসূচি, কাজ অনুসন্ধানের সেবা এবং কারিগরি ও অব্যাহত প্রশিক্ষণে কার্যকরভাবে অংশ নিতে পারে, তা নিশ্চিত করা।
- আত্মনির্ভরশীল হওয়া, উদ্যোক্তা হওয়া, সমবায়মূলক কার্যক্রম গড়ে তোলা এবং নিজের ব্যবসা শুরুর ওপর উৎসাহ দেওয়া।
- উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনা সুদে এবং বিনা জামানতে ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

Bangladesh Business & Disability Network (BBDN)

1. The Bangladesh Labour Act 2006 (BLA) and the Rights and Protection of Persons with Disabilities Act 2013 (RPPD) have key conflicting areas that need alignment. Synchronizing these laws with other relevant policies is essential to ensuring comprehensive rights, protection, and workplace inclusion for workers with disabilities, promoting consistency in legal frameworks and enforcement mechanisms.

Defining Disability: Sub-Section (75) of Section 2 defines severe physical injury as one requiring a worker to be absent for more than 20 consecutive days. This definition creates a conflict with the Rights and Protection of Persons with Disabilities Act 2013 (RPPD) by using absence duration as a criterion for injury severity in workplace accidents.

Discharge: Section 22 of the BLA 2006 allows employers to discharge workers due to physical or mental disability, provided a registered physician verifies the condition and compensation is paid. However, this provision creates ambiguity and potential for exploitation, as there is no requirement for employers to reinstate workers. In contrast, the RPPD Act explicitly grants persons with disabilities the right to return to the workplace.

2. Revision of Schedules 1 and 3 of the BLA: Schedule 1 of the BLA, which lists injuries deemed to result in permanent disablement and the disability assessment tool has remained unchanged since its adoption during the British era. It no longer adequately addresses modern workplace realities of Bangladesh or provides a framework to assess specific physical and mental injuries that can severely impact workers' lives.

Schedule 3 of the BLA, which lists occupational diseases, is outdated and should be revised based on the ILO's internationally recognized list of occupational diseases (2010).

3. Strengthening the accident notification system: An effective system for reporting work-related accidents is crucial for worker protection. However, current legal provisions and practices lead to underreporting, particularly for permanent partial disabilities and commuting accidents. A pilot study has identified inconsistencies in accident reporting, likely due to the wording of Section 80 of the Bangladesh Labour Act (BLA). To improve reporting, the Government should amend this section to mandate factory owners to digitally notify the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) of all workplace and commuting accidents.

4. Rehabilitation and return to work: The Bangladesh Labour Act 2006 has significant gaps regarding the rehabilitation and return to work of workers who become disabled due to workplace injuries or occupational diseases. While employers are required to cover medical treatment costs, rehabilitation expenses and the cost of reasonable accommodation for reintegration into work are not included, conflicting with the Rights and Protection of Persons with Disabilities Act 2013. BBDN recommends under the Workers' Profit Participation Fund (WPPF) and the government regulated Worker Welfare Foundation Fund, a provision or allocation be made which can be utilized for rehabilitation services, workplace modifications and vocational training to support return to work strategies and processes.

5. Gender Issues: BLA does not contain any provision that protects workers from gender-based violence and harassment.

শিল্পাঞ্চল পুলিশ

শ্রম আইন-২০০৬ (সংশোধিত-২০১৮) শিল্প পুলিশ এর কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তকরণ:

১. উক্ত আইনের ২ ধারায় সংজ্ঞাসমূহে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশকে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

২. শ্রম আইন বাস্তবায়নে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ এর দায়িত্ব, কর্তব্য ও কর্মপরিধি সুনির্দিষ্ট করা।

৩. শ্রম বিরোধ নিরসনে উদ্ভূত যেকোনো অপরাধমূলক ঘটনার বিষয়ে ইন্ডাস্ট্রিয় শ্রম বিরোধ নিরসনে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternate Dispute Resolution) এর ব্যবস্থা রাখা এবং উক্ত ব্যবস্থায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের ভূমিকা নির্ধারণপূর্বক আইন সংশোধন প্রয়োজন।

৪. কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, শ্রমিক নিয়োগ, ছাঁটাই ইত্যাদি বিষয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশকে অবহিত করার বাধ্যবাধকতা সহ নিয়মিত পরিদর্শন ও ছাড়পত্র গ্রহণের বিধান আইনে সন্নিবেশিত করা।

৫. শ্রমিক সংগঠনের নিবন্ধন, কার্যক্রম পরিচালনা ও তার নবায়নে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ এর মতামত গ্রহণের বাধ্যবাধকতার বিধান রাখা।

৬. শ্রম আদালতে মামলা সংক্রান্তে ভুক্তভোগী/আদালতকে সহযোগিতা করার জন্য শ্রম আদালতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) পদমর্যাদার অফিসারকে কোর্ট ইন্সপেক্টর এবং এসআই পদমর্যাদার অফিসারকে জিআরও হিসাবে আদালতে সম্পৃক্ত করা।

৭. উক্ত আইনের ১২, ১৩, ১৬, ধারায় বিভিন্ন কারণের প্রেক্ষিতে মালিকপক্ষ কারখানা বন্ধ/লে-অফ করে থাকেন। বিষয়টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশকে পূর্ব হতেই অবগত করানোর বাধ্যবাধকতা দেখিয়ে আইনের সংশোধন করা যেতে পারে।

৮. উক্ত আইনের ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৬ ধারায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের বিষয় উল্লেখ আছে। শ্রমিক ছাঁটাইয়ের পূর্বে মালিকপক্ষকে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট শিল্প পুলিশকে অবগত করানোর বিষয়টি বাধ্যবাধকতায় আনা।

৯. বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর ধারা ৩৩ এ অভিযোগের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। উক্ত ধারা সংশোধন করে যেকোনো শ্রমিক ছাঁটাই সহ শিল্প ভিত্তিক যেকোনো অভিযোগের বিষয় বাংলাদেশ শিল্প পুলিশের ০১ জন ইন্সপেক্টরের নিম্নে নহে এমন পদমর্যাদার কর্মকর্তা দ্বারা অনুসন্ধানের সুযোগ রাখা এবং উক্ত অনুসন্ধান পরবর্তী বিজ্ঞ শ্রম আদালতে বিচারের আওতায় আনা।

১০. শ্রম আইনের অধ্যায়- ৫ এ স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা, অধ্যায়- ৬ এ নিরাপত্তা ব্যবস্থা, অধ্যায়-৭ এ স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিধানের কথা উল্লেখ আছে। উক্ত অধ্যায়সমূহে শিল্প পুলিশকে অন্তর্ভুক্ত করে আইনের সংশোধনী আনা।

১১. উক্ত আইনের অধ্যায়- ১৩ তে ট্রেড ইউনিয়ন ও শিল্প সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখ আছে। উক্ত অধ্যায়ের ধারাঃ ১৭৬/১৭৭/১৮২সমূহে ট্রেড ইউনিয়ন যেন শিল্প পুলিশের নিকট দায়বদ্ধ থাকে এ লক্ষ্যে সংশোধনী আনা যেতে পারে।

১২. শ্রম আইনের ১৪ অধ্যায়ের ২১০ ধারায় শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি, ২১১ ধারায় ধর্মঘট ও লক আউট এর কথা উল্লেখ আছে। শ্রম বিরোধ নিস্পত্তিতে সর্বোপরি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ এক ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে। বিষয়টি আইনে উল্লেখ থাকা অত্যন্ত জরুরি।

১৩. এ ছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ সংশোধনী ২০১৮ এ উল্লিখিত ১২৪ক ও ২১০ নিম্নলিখিতভাবে সংশোধন করা যেতে পারে-২ (৪৮)-ক অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ, পুলিশ সুপার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ অর্থ ১৮৬১ সনের পুলিশ আইনের অধীন নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি।

১৪. ১২৪ক, আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে মজুরিসহ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ। (১) কর্মরত থাকা বা অবসরে যাওয়া বা চাকরি অবসান বা বরখাস্তাধীন থাকা ইত্যাদিসহ চাকরির যে কোনো পর্যায়ে কোনো শ্রমিকের বা শ্রমিকদের মজুরিসহ আইনগত প্রাপ্য পাওনাদি আপোষ মীমাংসার মাধ্যমে পাওয়ার জন্য (মহাপরিদর্শক) বা (মহাপরিদর্শক কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট এলাকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ইউনিটের পুলিশ সুপার বরাবর আবেদন করা যাইবে।

১৫. (২) এইরূপ আবেদন পাওয়ার পর (মহাপরিদর্শক) বা (মহাপরিদর্শক) কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট এলাকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের পুলিশ সুপার বা পুলিশ সুপার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ ২০ দিনের মধ্যে উত্থাপিত দাবি নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট মালিক বা কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ-আলোচনা কিংবা আপোষ মীমাংসা বৈঠকের মাধ্যমে নিস্পত্তি করিবার কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

১৬. (৩) এ ধারার অধীনে উত্থাপিত দাবি নিস্পত্তির ক্ষেত্রে। মহাপরিদর্শক) বা (মহাপরিদর্শক) কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের পুলিশ সুপার বা পুলিশ সুপার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা উদ্যোগ গ্রহণ এবং আলাপ আলোচনা কিংবা আপোষ মীমাংসার বৈঠকে মধ্যস্থাতাকারীর ভূমিকা পালন করিবেন।

১৭. ২১০. শিল্প বিরোধ নিস্পত্তিঃ-

১৮. (৩) যদি পক্ষগণ উক্তরূপ আলোচনার পর আলোচিত বিষয়ের উপর কোনো নিস্পত্তিতে উপনীত হন, তাহা হলে একটি নিস্পত্তিনামা লিখিত হইবে এবং উহাতে পক্ষবয় দস্তখত করিবেন এবং উহার একটি কপি মালিক কর্তৃক সরকার, বা অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ইউনিটের পুলিশ সুপার এবং সালিসের নিকট প্রেরিত হইবে (৫) এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহাতে উল্লিখিত কোনো নির্দিষ্ট এলাকা অথবা কোনো নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বা শিল্পের জন্য অ্যাডিশনাল ইন্সপেক্টর জেনারেল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট এলাকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ইউনিটের পুলিশ সুপার বা পুলিশ সুপার কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় সংখ্যক সালিশ (Conciliator) নিযুক্ত করিবেন এবং উপ-ধারা (৪) এর অধীন সালিশীর (Conciliation) জন্য কোনো অনুরোধ এই উপ-ধারার অধীন সংশ্লিষ্ট এলাকা বা প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের জন্য নিযুক্ত সালিশ (Conciliator) গ্রহণ করিবেন।

১৯. (১৮) সংশ্লিষ্ট এলাকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের পুলিশ সুপার কোনো বিরোধ নিস্পত্তির স্বার্থে উপযুক্ত মনে করিলে যেকোনো সময় কোনো সালিশ (Arbitration) এর নিকট হইতে কোনো সালিশী কার্যক্রম (Arbitration) উঠাইয়া আনিয়া নিজেই উহা চালাইয়া যাইতে পারিবেন, অথবা অন্য কোনো সালিশ (Arbitration) এর নিকট উহা হস্তান্তর করিতে পারিবেন এবং এক্ষেত্রে এ ধারার অন্যান্য বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে মর্মে সংযোজনের পক্ষে মতামত প্রদান করা হলো।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) সংশোধন সংক্রান্তে "শিল্পাঞ্চল পুলিশ" কর্তৃক প্রস্তাবিত মতামত:

১. সংজ্ঞাসমূহ: (৬২ক) "শিল্পাঞ্চল পুলিশ" বলতে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স ঢাকা কর্তৃক বিতে ৩০ মার্চ, ২০১৫ তারিখ জারিকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আরও নং ৭০- আইন/২০১৮ এর মাধ্যমে গঠিত শিল্পাঞ্চল পুলিশ ইউনিটকে বুঝাইবে।

২. কাজ বন্ধ রাখা: কাজ বন্ধের তথ্য পূর্বেই শিল্পাঞ্চল পুলিশকে অবহিত করিবেন।

৩. প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা: প্রতিষ্ঠান বন্ধের তথ্য যথাশীঘ্র সম্ভব শিল্পাঞ্চল পুলিশকে অবহিত করিবে।

৪. ছাঁটাই: শ্রমিক ছাঁটাই এর তথ্য কারণসহ শিল্পাঞ্চল পুলিশকে পূর্বেই অবহিত করবেন।

৫. অসদাচরণ দণ্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শাস্তি: শ্রমিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের তথ্য কারণসহ শিল্পাঞ্চল পুলিশকে অবহিত করিবেন।

৬. বরখাস্থ ইত্যাদি ব্যতীত অন্যভাবে মালিক কর্তৃক শ্রমিকের চাকরির অবসান: শ্রমিক ছাঁটাই এর তথ্য কারণসহ ছাঁটাই এর পূর্বে শিল্পাঞ্চল পুলিশকে অবহিত করবেন।

৭. অভিযোগ পদ্ধতি: উপধারা (১) এর অধীনে কোনো শ্রমিক অভিযোগ দায়ের করিতে আর একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট শিল্পাঞ্চল পুলিশের পুলিশ সুপারকে প্রদান করিবেন। শ্রমিক বা মালিক যেকোনো পক্ষ উক্ত অভিযোগ নিস্পত্তির ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের মধ্যস্থতা বা সহযোগিতা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৮. বিস্ফোরক বা দাহ্য গ্যাস, ধুলা ইত্যাদি: উক্ত আইনের ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮ ও ৭৮ ক। ধারায় বর্ণিত নির্দেশনাবলি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ পালন না করিলে এবং এরই প্রেক্ষিতে কোনো জীবন ও সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হইলে তাহা ফৌজদারি আইনে আমলযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হইবে।

BANGLADESH FMCG HR SOCIETY

বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ - এর সংশোধনীর জন্য কিছু প্রস্তাবনা:

১. ধারা- ১৯: মৃত্যুজানিত এই ক্ষতিপূরণ, গ্র্যাচুইটি/সার্ভিস বেনিফিট বা গ্রুপ ইন্সুরেন্সের চেয়ে অতিরিক্ত হবে কিনা স্পস্ট করা দরকার।

২. কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার পরিচালক ব্যাতিত চাকরিজীবী সকল কর্মকর্তাদের শ্রম আইনের আওতায় আনা অথবা তাদের চাকরি পরিচালনা এবং সমাপ্তির ক্ষেত্রে শ্রম আইনের চেয়ে কম বেনিফিট দিয়ে কোনো ম্যানেজমেন্ট এমপ্লয়ীর চাকরি শর্তাবলি নির্ধারণ এবং চাকরি বিচ্ছেদ করা যাবে না মর্মে আইন প্রণয়ন।

৩. যৌন হয়রানির বিষয়টি শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং ধারা ২৩ (৪) এ অসদাচরন সংযুক্ত করা প্রয়োজন।তাছাড়া এ সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্তের জন্য কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়ার পর ধারা ২৪ (১) এর অধীনে মালিক-শ্রমিক সমন্বয়ে তদন্ত হবে নাকি যৌন হয়রানি সংক্রান্ত যে অভিযোগ কমিটি থাকবে সেই অভিযোগ কমিটি তদন্ত করবে তা ক্লিয়ার করা দরকার।

৪. ধারা – ২২: ধারা ২২ মতে ডিসচার্জ করার বিধান থাকলেও সর্বোচ্চ কত দিন পর্যন্ত অব্যাহত ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে অসুস্থ থাকলে শ্রমিককে ডিসচার্জ করা যাবে তা স্পষ্ট হওয়া দরকার।

৫. ধারা – ২৩ (৩): এখানে কোম্পানিতে বিদ্যমান গ্র্যাচুইটি থাকলে উপধারা ৪ (খ ও ছ) এর অধীনে অসদাচরনের জন্য বরখাস্থ করা হইলে অথবা যেকোনো ভাবে বরখাস্থ হইলে তিনি গ্র্যাচুইটি পাবেন কিনা স্পষ্ট করা দরকার।

৬. ধারা – ২৪ (ঘ): এখানে শ্রমিক তার পক্ষের প্রতিনিধি কত দিনের মধ্যে মনোনয়ন দিবেন বিষয়টি স্পষ্ট করা দরকার (যেহেতু তদন্ত কার্যক্রম ৬০ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে)। তদন্ত কার্যক্রমে শ্রমিক পক্ষের প্রতিনিধি স্ব-শরীরে উপস্থিত থেকে তদন্ত কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষর করলেও চুড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করতে অস্বীকৃতি জানান সে ক্ষেত্রে করনীয় কি তা স্পস্ট করা দরকার।

৭. ধারা – ৪৭ (১): এই ক্ষেত্রে কোনো মহিলা যদি সন্তান প্রসবের পর বেশি ছুটি কাটানোর উদ্দেশ্যে প্রথম ৮ সপ্তাহের পরিবর্তে ৬ সপ্তাহের নোটিস দিয়ে সন্তান প্রসবের পর ১০ (৮+২) সপ্তাহ ছুটি ভোগ করতে চায় সেই সুবিধা প্রদানের সুযোগ বিবেচনা করা যেতে পারে।

৮. ধারা – ৪৮ (২): এখানে প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ক্যালকুলেশন আইন এবং বিধির মধ্যে সাংঘর্ষিক রয়েছে। নতুন আইনে বিষয়টি ক্লিয়ার করে দেওয়া উচিৎ। সর্বশেষ বিধিতে সর্বশেষ মাসিক প্রাপ্ত মোট মজুরির কথা বলা হয়েছে। প্রাপ্ত মোট মজুরি কোনো মহিলার কর্মে অনুপস্থিতির কারণে কম হতে পারে (বিনা বেতনে ছুটিতে থাকতে পারে) সেক্ষেত্রে তাদের ক্যালকুলেশনের টাকা কম আসতে পারে।

৯. এখানে আইন ও বিধির মধ্যে সাংঘর্ষিক।

১০. যার জন্য নতুন আইনে সর্বশেষ প্রাপ্ত মোট মজুরির পরিবর্তে সর্বশেষ মাসের মোট মজুরি (গ্রস সেলারী) কে ২৬ দ্বারা ভাগ দিয়ে ১ দিনের গড় মজুরি নির্ধারণ করিতে হইবে। তাছাড়া প্রসূতি কল্যাণ সুবিধার প্রদান করলে এই ছুটির সময় তাদের মাসিক রেগুলার বেতন পাবে কি পাবেনা সেই বিষয়টি ক্লিয়ার করা দরকার।

১১. ধারা – ৮৯ (৭): ধারা ৮৯ (৭) এর পাশাপাশি উক্ত শ্রমিকের মাসিক বেতন চালু থাকবে, নাকি পঞ্চম তপসিলে উল্লেখিত ক্ষতিপূরণ প্রদান করলেই হবে তা স্পস্ট করা প্রয়োজন।

১২. ধারা – ৯৯ (১): গ্রুপ বীমার ন্যূনতম পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

১৩. ধারা – ১১৫, ১১৬, ১১৭: উক্ত ধারা গুলোতে যথাক্রমে নৈমিত্তিক, পীড়া এবং বাৎসরিক ছুটির কথা থাকলেও সাময়িক, অস্থায়ী ও মৌসুমি শ্রমিকগণ কি হারাহারিভাবে ছুটি পাইবেন তা স্পস্ট করা প্রয়োজন

১৪. ধারা – ১২৬: এখানে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিতির জন্য বিধি-১১৫ অনুযায়ী কর্তন মূল মজুরি থেকে করতে বলা হয়েছে। অর্থ্যাৎ কেউ যদি কোনো অনুমতি না নিয়ে কোনো যোগাযোগ না করে কিছুদিন অফিসে না আসেন তারপরও শুধু মূল বেতন কর্তন হবে অন্যান্য ভাতা পূর্ণ হারে পাবেন যা যৌক্তিক মনে হয়না। এখানে মোট বেতন কর্তন করা উচিৎ। অন্যদিকে কেউ যদি ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে অনুমতি নিয়ে বিনা বেতনে ছুটি নেন (দুরারোগ্য বা জরুরি প্রয়োজনে অতিরিক্ত ছুটি নেন) তবে তার কর্তন মোট বেতনের উপর হবে বলে সুস্পষ্ট বিধান থাকা উচিৎ।

১৫. ধারা – ১২৭: এখানে যে তদন্তের কথা বলা হয়েছে সেটা ধারা ২৪ এর অধীনে হবে কিনা। শ্রমিক-মালিক উভয় পক্ষের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে হবে কিনা তা বলা নেই। বিষয়টি স্পস্ট করা উচিৎ।

১৬. ধারা – ২৬৪: বাস্তব ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যাক্তি ট্রাস্টি বোর্ডেও চেয়ারম্যান সব কোম্পানিতে দেখা যায়না এবং সব কোম্পানিতে এই প্রতিনিধি দেওয়া অনেকটা দুরহ বিষয় তাই পিএফফান্ডে ট্রাস্টি হিসাবে মালিক এবং শ্রমিকের প্রতিনিধি ক্রমান্বয়ে ১বছর করে দ্বায়িত্ব পালন করার সুপারিশ করছি।

১৭. ঠিকাদারের মাধ্যমে কোনো শ্রমিক যদি ১৮০ দিনের বেশি নিয়োগ দেওয়া না যায় তাহলে বাস্তবিক ক্ষেত্রে ঠিকাদারের মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক নেওয়াটা দুরহ হয়ে যাবে। বিশেষ করে বিভিন্ন কোম্পানিতে সিকিউরিটি গার্ড, ক্লিনার, সেলস রিপ্রেসেনটেটিভ ঠিকাদারের মাধ্যমে নেওয়া হয়ে থাকে কিন্তু আইন অনুযায়ী এই পদগুলো ঠিকাদারের মাধ্যমে নেওয়া সম্ভব নয়। ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের বিষয়টি চুক্তি ভিত্তিক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ অন্তত ২ বছর হতে পারে।

১৮. ধারা – ৪ (৪,৫): সাময়িক এবং অস্থায়ী শ্রমিকের কাজের মেয়াদ সুস্পষ্টভাবে সর্বোচ্চ মেয়াদ কতদিন হতে পারবে তা থাকা উচিৎ।

১৯. তাছাড়া শ্রমিকের শ্রেনীবিভাগের মধ্যে চুক্তি ভিত্তিক কোনো শ্রমিক নেওয়ার বিষয় উল্লেখ নেই। বর্তমানে অনেক ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষ করে রিটেইল শপগুলোতে পার্টটাইম চাকরি করে থাকেন। আইনে এরকম চুক্তিভিত্তিক বা পার্টটাইমি কাজের সুযোগের বিষয়ে কিছু বলা না থাকায় এ ধরনের চকুরীর নিয়োগপত্র দিতে আইনগত অসুবিধায় পড়তে হয়। চুক্তিভিত্তিক এবং পার্টটাইম কাজের সুযোগের এবিষয়গুলো সুস্পস্ট হওয়া উচিৎ।

২০. যেকোনো আইন সাধারণত ন্যূনতম সুবিধার কথা উল্লেখ করে অন্যদিকে সর্বোচ্চ মালিক যা দিতে পারে কিন্তু উৎসব বোনাসের কথা বলা হয়েছে মাসিক মূল মজুরির অধিক হইবেনা যা সংশোধন হয়ে ন্যূনতম মসিক মূল মজুরির কম হবেনা উল্লেখ থাকা উচিৎ। আর তা না হলে এই আইনের ব্যাখ্যায় অনেকে মূল মজুরিরও কম বোনাস দেওয়ার সুযোগ খুঁজবে।

বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতি

১. কৃষি শ্রমিকদের জন্য সারা বছর কাজের নিশ্চয়তা, ন্যায্য মজুরি, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমকাজের সমমজুরি। দৈনিক মজুরি ১০০০/- টাকা দিতে হবে।

২. ষাটোর্ধ্ব সকল কৃষি শ্রমিকদের (নারী-পুরুষ) বেঁচে থাকার নিশ্চয়তার জন্য মাসিক ১০ হাজার টাকা বিনা জমায় পেনশন স্কিম চালু করতে হবে।

৩. কৃষি শ্রমিক সহ গ্রামীণ দরিদ্র মানুষদের জন্য স্থায়ী রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে ৫ টাকা কেজি দরে চাল-আটা-লবণ, ১৫ টাকা কেজি দরে চিনি-কেরোসিন, ৩০ টাকা কেজি দরে মসুরের ডাল-ভোজ্য তেল সহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কম মূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

৪. কৃষি শ্রমিক বা গ্রামীণ শ্রমজীবীদের কর্মক্ষম সন্ধানদের ভকেশনাল, আইটি সহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মের উপযুক্ত করে দেশে চাকরি অথবা সরকারি খরচে বিদেশে পাঠাতে হবে এবং তাদের প্রেরিত রেমিটেন্স থেকে মাসে মাসে খরচের টাকা কেটে রাখতে হবে। এজন্য রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগীয় শহরগুলো ও বড় বড় জেলা গুলোতে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও নিবন্ধন কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৫. দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষি শ্রমিকদের পূর্ণাঙ্গ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে।

৬. গ্রামীণ বরাদ্দে লুটপাট, অনিয়ম, স্বজন প্রীতি, দলীয়করণ, দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

৭. খাস জমি, খাসপুকুর ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে সমব্যয়ী মালিকানায় ও বিক্রয়ের অযোগ্য শর্তে বন্টন করতে হবে এবং যে সমস্ত খাস জমি বিগত সরকারগুলোর দলীয় লোকজন দখল করে রেখেছে তা মুক্ত করে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে বন্টন করতে হবে।

৮. ক্ষেতমজুর সন্তানদের ডিগ্রি/অনার্স পর্যন্ত বিনা মূল্যে লেখা পড়া নিশ্চিত করা এবং প্রতি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/কমিউনিটি ক্লিনিক/ স্বাস্থ্য সেবা ইউনিট চালু করে বিনা মূল্যে পর্যাপ্ত ঔষধ ও চিকিৎসা পত্র সরবরাহ করতে হবে। ইজারা প্রথা বাতিল করতে হবে এবং ক্ষেতমজুরদের মাছ ধরার অধিকার দিতে হবে।

সকল বাঁওড় জলমহালে ভুক্তভোগী ভূমিজ জেলে জনগোষ্ঠী

৮. বাঁওড় জলমহালসমূহের ইজারা পদ্ধতি পুরোপুরি বাতিল করে জেলেদের ন্যায়সংগত মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে সমাজভিত্তিক সমবায় মালিকানা নিশ্চিত করতে হবে। মৎস্যজীবীদের অনুকূলে ও জাতীয় স্বার্থে জলমহাল ব্যবস্থাপনা আইন সংশোধন করতে হবে। জাতীয় বাঁওড় উন্নয়ন বোর্ড, স্বতন্ত্র বাঁওড় জলমহাল নীতিমালা ও বাঁওড় জেলেদের প্রান্তিক শ্রমিক হিসাবে নিজস্ব সংগঠন ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দিতে হবে।

৯. বাঁওড় জলমহালে মাছ চাষে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের অর্থায়নে ও জেলেদের সাথে ন্যায্য উৎপাদনের অংশীদারিত্ব চুক্তি করতে হবে।

১০. বাঁওড় উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় প্রকৃত মৎস্যজীবীদের শুমারি করে তালিকাবদ্ধ ও মৎস্যজীবী কার্ড প্রদান করতে হবে। বাঁওড় জেলেদের রেশনের এর ব্যবস্থা করতে হবে।

১১. বাস্তুতন্ত্রের ক্ষতি না করে বাঁওড় জলাশয়ে মাছের প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। বাঁওড়ে মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মহীন জেলেদের কর্মসংস্থানের জন্য মৎস্য অভয়ারণ্য গড়ে তুলতে হবে।

কৃষিশ্রমিক অধিকার মঞ্চ

১. কৃষিশ্রমিকদেরকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে শ্রম আইনে অন্তর্ভুক্ত করা এবং কৃষিশ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার ও ন্যূনতম মজুরির বিধানসহ তাদের জন্য স্বতন্ত্র কৃষিশ্রমিক আইন প্রণয়ন করা।

২. প্রতি উপজেলায় কৃষিশ্রমিকের নিবন্ধন করে তাদেরকে পরিচয়পত্র প্রদান এবং তাদেরকে পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অর্ন্তভূক্ত করার ব্যবস্থা।

৩. নারী-পুরুষ কৃষিশ্রমিকের মজুরি বৈষম্য দূর করা।

৪. নারী কৃষিশ্রমিকের স্বাস্থ্য ও প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা দেয়া।

৫. কৃষিশ্রমিকদের সারাবছরের কাজ নিশ্চিত করতে তাদের কর্মহীন সময়ের জন্য ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ নিশ্চিত করা।

৬. কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় নিহত-আহত কৃষিশ্রমিককে বাংলাদেশ শ্রম আইন বর্ণিত ক্ষতিপূরণ বিধান অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৭. কর্মক্ষেত্রে কৃষিশ্রমিকের স্বাস্থ্য এবং তাদের সার, কীটনাশক ও অন্যান্য কৃষিজ উপকরণের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়া।

৮. প্রান্তিক কৃষক ও কৃষিশ্রমিকের জন্য রেশন ব্যবস্থা (চাল, ডাল, লবণ, সয়াবিন ও কেরোসিন) চালু করা।

৯. কৃষিতে শিশুশ্রম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা। যে সমস্ত পরিবার শিশুশ্রমের/ শিশুর আয়ের উপর নির্ভরশীল সে সমস্ত পরিবারের জন্য কাজ/ শিক্ষা ভাতা চালু করা।

১০. কৃষি বাঁচলে কৃষি শ্রমিক বাঁচবে- এই নীতিকে বিবেচনায় রেখে কৃষির উন্নয়নে ও উৎপাদক কৃষককে লোকসানের হাত থেকে বাঁচাতে প্রতিটি ইউনিয়নে শস্য গুদাম, মিনি হিমাগার, শস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া।

১১. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কৃষিশ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে এবং বিনাখরচে/স্বল্পখরচে কৃষিশ্রমিকদের বিদেশে গমন ও অভিবাসন নিশ্চিত করা।
১২. সারাদেশে স্থানীয় কৃষিসম্পদভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলা। স্বল্পমূল্যে গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা।
১৩. কৃষিশ্রমিকদের নেতৃত্বে যৌথ কৃষি খামার স্থাপনের জন্য ভূমির ব্যবস্থা করা, এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি অব্যবহৃত জমি এবং হস্তান্তর অযোগ্য শর্তে সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষিকাজের জন্য খাসজমি কৃষিশ্রমিকদেরকে বরাদ্দ দেয়া।

ফায়ার সার্ভিস

১. ফায়ার কোড মেনে ভবন নির্মাণ করা ও ভবনের অকুপেন্সি অনুযায়ী ব্যবহার করা।
২. শিল্প কারখানার বৈদ্যুতিক লাইনগুলোর পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে পুরাতন ফিটিংস পরিবর্তন করতে হবে।সকল যন্ত্রপাতি আর্থিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। সঠিক ও গুনগত মানের বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করা, কোনো প্রকার লুজ ওয়্যারিং না রাখা, ওয়্যারিং কনসিলড বা কনডুইট করা, ডাঙ্গা প্লাগ, সকেট, কাটাউট ইত্যাদি পরিবর্তন করা, অভিজ্ঞ ইলেকট্রিশিয়ান বা ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা ওয়্যারিং করানো, বৈদ্যুতিক চ্যানেলগুলো নিয়মিত পরিস্কার করা
৩. শিল্পকারখানায় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে ধুমপানে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানে ধুমপান সম্পূর্ণ নিষেধ করতে হবে অথবা ধুমপানের জন্য আলাদা কক্ষের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
৪. শিল্প কলকারখানায় রাসায়নিক এবং জ্বালানী পদার্থ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দক্ষ ও অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ দিতে হবে। এছাড়া রাসায়নিক এবং জ্বালানী পদার্থ স্টোরেজের ক্ষেত্রে যথাযথ নিয়ম মানতে হবে। সম্পূর্ণ আলাদা কক্ষে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় নিয়মানুসারে কেমিক্যাল সংরক্ষণ করতে হবে।
৫. প্রতিষ্ঠানের সকল স্থান আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ডকুম্যান্ট/কাগজপত্র একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে পুড়ে ফেলতে হবে। কারখানার মেঝে, সিঁড়ি ও সান সাইড সব সময় পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
৬. অগ্নি সচেতনতার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে অথবা প্রশিক্ষিত ফায়ারম্যান নিয়োগ করতে হবে। প্রতিষ্ঠানে যথোপযুক্ত অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র মজুদ রাখতে হবে, সেগুলো সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট প্রশিক্ষিত অভিজ্ঞ লোক রাখতে হবে। অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রগুলো সব সময় কার্যক্ষম রাখতে হবে, যাতে জরুরি অবস্থায় অকেজো না হয়। প্রতি বছর নিয়মিত ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগের অভিজ্ঞ অফিসার দ্বারা অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র পরীক্ষা করিয়ে আপ টু ডেট রাখতে হবে, যাতে আগুন লাগলে সেগুলো অগ্নি নির্বাপনের সময় যথার্থ ভূমিকা রাখতে পারে।
৭. ভবনে বা প্রতিষ্ঠানে বিএনবিসি ও ফায়ার কোড অনুযায়ী পানির রিজার্ভার সংরক্ষণ করতে হবে।
৮. শিল্পকারখানায় বয়লার দুর্ঘটনা থেকে অগ্নিকান্ডসহ প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে থাকে। তাই কারখানায় সঠিক মানের বয়লার ব্যবহার করা। বয়লার কক্ষে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা রাখা, বয়লার পরিচালনার জন্য দক্ষ অপারেটর (সার্টিফিকেটধারী) নিয়োগ দেয়া এবং নিয়মিত পরিদর্শন করা। বয়লার কারখানা ভবনের বাইরে স্থাপন করা।

বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা ২০১৫ এর ৫৪ ধারা সংশোধন:

১. ৫৪ ধারার ২ উপধারা সংশোধন করে "BNBC - 2020 Table 4.3.4 অনুযায়ী ২৩ মিটারের বেশি হইবে না" যুক্ত করা।
২. ৫৪ ধারার ৩ উপধারা সংশোধন করে BNBC – 2020 3.14.2 অনুযায়ী ৫০ থেকে ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করিলে দুইটি বা কোনো ভবনে ৫০১ থেকে ১০০০ জনের উপরে শ্রমিক কাজ করিলে অবশ্যই চারটি পৃথক সিঁড়ির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে, যুক্ত করা।
৩. ৫৪ ধারার ৭ উপধারার পরিবর্তে সকল ধরনের ভবনের সিঁড়ি বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০২০ এর Table 4.3.6, Table 4.3.7 অকুপেন্সি শ্রেণি অনুযায়ী হইবে।
৪. ৫৫ ধারার ১০ উপধারায় কারা প্রশিক্ষণ প্রদান করিবে তা উল্লেখ নেই। এ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মান বজায় রাখা, মান সম্মত প্রশিক্ষক, ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক এই প্রশিক্ষণটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক প্রদান উল্লেখ করা যেতে পারে। ৫৫ ধারার ১০ উপধারায় "প্রশিক্ষণটি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগ হইতে তিন বা ততোধিক দিনের প্রশিক্ষণ প্যাকেজ এর আওতায় গ্রহণ করিতে হইবে"। BNBC 2020 Part IV Appendix A.
৫. ৫৫ ধারার ১৬ উপধারার পরিবর্তে "ভবনের অকুপেন্সি, ফায়ার ফাইটিং, ভবনের উচ্চতা বিবেচনাপূর্বক বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০২০ অনুযায়ী জলাধারের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে" প্রতিস্থাপিত করা যাইতে পারে। বাকি অংশ ঠিক থাকিবে।

সংযোজনের প্রস্তাব:

১. ৫৪ ধারায় ভবন থেকে ভবনের দূরত্ব এমন হবে যে ভবনের চারপাশে ন্যূনতম ২৫ ফুট করে ফাঁকা থাকবে। যাতে করে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ভবনের নিকটে প্রবেশ করিতে পারে। এই ২৫ ফিট জায়গা কনক্রিট ফ্লোর ও বাধামুক্ত থাকিবে। যাহাতে দুর্যোগকালীন সময়ে ফায়ার সার্ভিস এর গাড়ি প্রবেশে কোনো বাধাপ্রাপ্ত না হয়।
২. ৫৪ ধারায় কোনো ভবনে ৩০ জনের অধিক শ্রমিক কাজ করিলে ভবনের বিভিন্ন স্থানে বহির্গমন পথ ও অগ্নিনির্বাপণ সরঞ্জামের সাইনেজ থাকিতে হইবে। এক্ষেত্রে অকুপেন্সি অনুযায়ী বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।
৩. ভবনের অকুপেন্সি অনুযায়ী বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড-২০২০ এর বিধানাবলি মোতাবেক ফায়ার ডিটেকশন ও প্রটেকশন সিস্টেম এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ক্ষুব্ধ নারী সমাজ

১. নারী-পুরুষের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করতে হবে।
২. অপ্রাতিষ্ঠানিক-প্রাতিষ্ঠানিক সকল নারী-পুরুষ শ্রমিককে আইনে স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।
৩. শ্রমজীবী-পেশাজীবী সকল নারীর জন্য ৬ মাস সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি চাই এবং প্রসূতি সুবিধায় গণনায় প্রতিমাসে সর্বমোট প্রাপ্তিকে হিসাবে নিতে হবে।

৪. কারখানা- কর্মস্থলে যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা ও অভিযোগ সেলের যথাযথ বাস্তবায়ন চাই।
৫. ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের শর্ত শিথিল করে মতপ্রকাশের অধিকার বাস্তবায়ন চাই।
৬. কারখানায় এবং কর্মস্থলে কার্যকর ডে-কেয়ার সুবিধা ও কমিউনিটিতে স্বল্পমূল্য ও ভর্তুকিতে খাবারের ক্যান্টিন, লন্ড্রি ও কাপড় ধৌতাগার স্থাপন করতে হবে।
৭. কৃষি ও মৎস্যজীবী শ্রমিক হিসেবে নারীকে স্বীকৃতি দিতে হবে।
৮. গৃহ-শ্রমিকের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন চাই।
৯. উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত যৌনজীবীদের উপর হয়রানি বন্ধ ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে আইন প্রণয়ন করতে হবে।
১০. প্রবাসী নারী শ্রমিকের নিরাপত্তার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
১১. শ্রম বাজারে অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

খালিশপুর জুটমিল কারখানা কমিটি

১. ২০১৫ সালের জুলাই থেকে ২০১৯ সালের ডিসম্বর পর্যন্ত মজুরি কমিশনের এরিয়ার টাকা।
২. করোনাকালের ২ মাসের মজুরির টাকা।
৩. ২০১৯ সালের ঈদুল আজহা উৎসব বোনাজের টাকা।
৪. ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৮টি উৎসব বোনাসের এরিয়ার টাকা।
৫. ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বৈশাখীর ভাতার টাকা।

চা শ্রমিক ইউনিয়ন, মৌলভীবাজার

১. যাদের চাকরি অস্থায়ী এবং ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি অপ্রতুল ভাতা (বেতন) পরিশোধ অব্যাহত আছে।সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে ইউনিয়নের কর্মচারীদের এ্যানলিষ্ট, বিশেষ নিয়োগ প্রদানের প্রস্তাব (দাবি) উপস্থাপন করছি।
২. চা শ্রমিক ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণের সুবিধার্থে চা শ্রমিকদের নিজস্ব সম্পত্তি শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত ২নং লেবার হাউজ এর ভূমিতে বরাদ্ধকৃত ছাত্রাবাস স্থগিত বহুতল ভবন নির্মানের প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তাব উপস্থাপন করছি।
৩. চা শ্রমিক সন্তান, ছাত্র/ছাত্রীদের সুলভ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা সু-নিশ্চিত করতে চা শ্রমিক নিয়ন্ত্রিত একটি কমার্সিয়াল ব্যাংক / ল্যান্ড ব্যাংক/ কো-অপারেটিভ ব্যাংক চালু করে হাজারেরও বেশি কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব (আলোচনা সাপেক্ষে) উপস্থাপন করছি।

চা-বাগান শিল্পাঞ্চলের শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী জনগণ

১. চা-বাগান শিল্পাঞ্চল এলাকাকে নিয়ে গঠিত চা-বাগান ভ্যালীকে কেন্দ্র করে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রম-কর্ম-পেশার নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বশীল চা-বাগান শিল্পাঞ্চল উপজেলা গঠন করতে হবে।
২. চা-বাগান শিল্পাঞ্চল এলাকায় বসবাসরত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৩. চা-বাগান শিল্পাঞ্চলের প্রতিটি ভ্যালীতে চা ভিত্তিক কৃষি শিল্প, শিক্ষাদানের জন্য আধুনিক কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
৪. চা-বাগান শিল্পাঞ্চলের মধ্যে পতিত জমি, ডোবা ও জলাশয় ইত্যাদিতে সমবায় ভিত্তিক কৃষি, গরু মোরগ, মাছ, হাঁস ও ছাগল চাষের জন্য কৃষি শিল্প ভিত্তিক যৌথ খামার গড়ে তুলতে হবে।
৫. চা-বাগান শিল্পাঞ্চলের শিশু-কিশোরদের জন্য আধুনিক কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে, যাতে বড় হয়ে বেড়ে উঠার সাথে সাথে কর্মমুখী কাজে যোগ দিতে পারে।
৬. চা-বাগান শিল্পাঞ্চলের প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য ছোট-ছোট যৌথ খামার গড়ে তুলতে উৎসাহদান ও আর্থিক সুবিধা, বিনা সুদে প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. চা-বাগান শিল্পাঞ্চলের প্রতিটি ভ্যালীতে একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়ে তুলে শিশু-সন্তান, বয়স্কদের সুচিকিৎসার জন্য ১০০ শয্যার হাসপাতাল গড়ে তুলতে হবে।
৮. চা-বাগান শিল্পাঞ্চলে বসবাসরত ও কর্মরত বিভিন্ন শ্রম-কর্ম-পেশার নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে পার্লামেন্টে উচ্চ কক্ষ গঠন করে আইন প্রণয়নে, নীতি-নির্ধারণে ও নীতি-বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।
৯. চা-বাগান শ্রমিক-কর্মচারী, ব্যবস্থাপক সহ কর্মকর্তাদের শুধু মজুরি বৃদ্ধি, বেতন বৃদ্ধি, ভাতা প্রদান, সুযোগ-সুবিধা প্রধান নয়। নীতি সঞ্চালকারী শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবীদের নীতি নির্ধারণে ও বাস্তবায়নে অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষে নির্বাচিত প্রতিনিধি চাই।

রংপুর জেলা ট্রাক কাভার্ডভ্যান ও ট্রাক্টর মালিক সমিতি

- রংপুর জেলায় কেন্দ্রীয় ট্রাকটার্মিনাল নির্মাণ

ট্যানারি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন

১. সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরি বাস্তবায়ন
- ২০২৪ সালের ২১শে নভেম্বর ঘোষিত ৫টি গ্রেডের নিম্নতম মজুরি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।
- মালিকপক্ষের গড়িমসি ও অনীহা বন্ধ করতে হবে।

২. আইনি বাধ্যবাধকতা অনুসারে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা
- শ্রম আইন, ২০০৬ অনুসারে শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থাগুলোর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. শিল্পের উন্নয়নে মালিকপক্ষের উদ্যোগ বৃদ্ধি
- চামড়া শিল্পের সমস্যা সমাধানে মালিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা জরুরি।
- শ্রমিকদের কল্যাণে মালিকপক্ষের অনীহা দূর করা এবং শিল্পের সার্বিক উন্নয়নে অবদান রাখা উচিত।

৪. শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
- গত ৩ বছরে শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি না হওয়ায়, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির পরিপ্রেক্ষিতে ন্যায্য বেতন কাঠামো পুনর্নির্ধারণ করা দরকার।
- শ্রমিকদের ন্যূনতম জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। www

৫. সরকারের হস্তক্ষেপ ও শ্রম সংস্কার কমিশনের ভূমিকা
- শ্রম সংস্কার কমিশনকে সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।
- শ্রম মন্ত্রণালয়কে মালিকদের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে, যেন তারা ন্যায্য মজুরি পরিশোধে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র

১. **কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স প্রদান সংক্রান্ত:** শ্রম আইনের ধারা ৩২৬ ও শ্রম বিধির ৩৫৪ অনুযায়ী যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানার লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করার পূর্বে বিশেষজ্ঞ কর্তৃক অনুমোদিত টেকসই ও নিরাপত্তামূলক স্থাপনা, স্থায়ী জনবল কাঠামো, নির্ধারিত ফরমে (ক্ষেত্রবিশেষ ফরম-৮ ও ৫) শ্রমিক-কর্মচারীদের তালিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়ে এবং তা সংরক্ষনের ব্যবস্থা করে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে। তাছাড়া শ্রম বিধিমালার ১৫ (৫) বিধিতে উল্লেখিত স্থায়ী জনবল কাঠামোর পদে ঠিকাদার/আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ "আইন করে" বন্ধ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আইন ও বিধি লংঘনকারী মালিক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

২. **বন্ধ কারখানা চালু এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের পাওনা আদায় সংক্রান্ত:** সরকার দ্রুত অধ্যাদেশ/আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্রায়ত্ব কিংবা ব্যক্তি মালিকানাধীন বন্ধ কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু করার জন্য শ্রম আইনের ধারা ২ (৪৯) এ বর্নিত সংশ্লিষ্ঠ মিলের মালিক/কর্তৃপক্ষ ৬০ দিনের মধ্যে শ্রমিকের চূড়ান্ত পাওনা পরিশোধে ব্যর্থ হলে পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে শ্রমিকের পাওনা আদায় ও চালুর স্বার্থে ঐ সব মিল অধিগ্রহণ করে আগ্রহী দেশি/বিদেশি উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়ে প্রকাশ্য দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে আগ্রহীদের কাছে ঐ সকল বন্ধ মিল বিক্রি/হস্তান্তরের মাধ্যমে শ্রমিকদের পাওনা আদায় এবং কর্মক্ষম সংশ্লিষ্ট মিলের শ্রমিকসহ এলাকার ৪০% বেকারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করে ঐসব বন্ধ মিল চালুর ব্যবস্থা করা।

৩. **শ্রমিক-কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি সংক্রান্ত:** (ক) শ্রম আইনের উল্লেখিত ধারা লংঘনকারী মালিক পক্ষ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ঠ কর্মকর্তাকে আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মচারী আইনানুগ ছুটি, কোনো প্রকার শর্ত ছাড়া সার্ভিস বেনিফিট ও গ্র্যাচুইটি কোম্পানির নীট মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) লভ্যাংশের টাকা, ৮০:১০৪১০ হারে উৎসব বোনাসসহ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে এবং লংঘনকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আইনের আওতায় আনতে হবে।

(গ) শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা এবং কল্যাণমূলক ব্যবস্থা যুগপোযোগী করতে হবে।

(ঘ) কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা স্থায়ী অক্ষম হলে ঐ সকল শ্রমিককে আইএলও কনভেনশন ১২১-এর সাথে সংগতি রেখে আইন সংশোধন ক্রমে আজীবন আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে এবং ক্ষেত্রবিশেষ সংশ্লিষ্ট শ্রমিককে পুনর্বাসন করতে হবে।

(ঙ) নারী শ্রমিক কর্মচারীদের কর্ম ও নিয়োগের সমতা, মাতৃত্বকালীন সুরক্ষা ও ৬ মাসের স্ববেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি নিশ্চিত এবং কর্মস্থলসহ সবক্ষেত্রে নিপীড়ন ও হয়রানী প্রতিরোধে আইএলও কনভেনশন- ১৮৯ ও ১৯০ অনুস্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. **শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরি সংক্রান্ত:**

(ক) বিদ্যমান "নিম্নতম মজুরি (নির্ধারণ) অডিন্যান্স, ১৯৬৯" (১৯৬৯ সনের ১৩নং অভিন্যান্স) যুগপোযোগীভাবে সংশোধন করে সারাদেশের শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী শ্রমিকদের জন্য জাতীয় স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন ও নিম্নতম মজুরি ঘোষণার ব্যবস্থা করা।

(খ) দেশের বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম চারজনের একটি পরিবার চলার মত বাজার দরের সাথে সংগতি রেখে প্রতি ২ বছর পর পর নিম্নতম মজুরি ঘোষণার ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) প্রত্যেক শিল্প সেক্টরে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রাপ্ত মোট মজুরি/বেতনের ৬০% (উচ্চতাংশ) মূল মজুরি নির্ধারণ এবং বাৎসরিক ১৫% হারে বেতন বৃদ্ধি/ইনক্রিমেন্ট প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) নিম্নমত মজুরি প্রদান লংঘনকারী মালিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) রেশন প্রথা চালু করে সস্তা ও বাঁধা মূল্যে চাল, ডাল, তেল, আটা ও শিশু খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ, অবল ভিত্তিক শ্রমিক কলোনি স্থাপন করে সুলভ মূল্যে আবাসন এবং স্কুল ও হাসপাতাল স্থাপন করে বিনামূল্যে শিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **দেশের সকল শ্রমিকদের জন্য অভিন্ন একটি শ্রম আইন সংশোধন এবং কার্যকর করা সম্পর্কিত:**

(ক) সারাদেশের শ্রমিকদের জন্য এক নীতি, বন্দর শ্রমিকদের জন্য আরেক নীতি, তাছাড়া ইপিজেড এলাকার শ্রমিকদের জন্য আরেক নীতি বা আইন। বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৯ ও ২৭ অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য সুযোগের সমতা ও

আইনের দৃষ্টিতে সমতা নিশ্চিত করে "সারাদেশের শ্রমিকদের জন্য একটি অভিন্ন শ্রম আইন চালু করে সকল বৈষম্য দূর করতে হবে।

(খ) বিদ্যমান শ্রম আইনে বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪, ১৯, ২৭ ও ৩৮সহ অন্যান্য অনুচ্ছেদের সাথে যে সকল ধারা অসংগতি রয়েছে তা' বাতিল ও সংশোধন পূর্বক আই, এল, ও কনভেনশন ও মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র, ১৯৪৮ এর ১, ৩, ৭, ২০, ২৩, ২৪ ও ২৫নং ঘোষণার সাথে সংগতি রেখে, শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষন করে শ্রম আইন যুগপোযগীভাবে সংশোধন করতে হবে।

(গ) কৃষি, গৃহ, শিক্ষা, হাসপাতাল-ক্লিনিক, এনজিওসহ যে সকল প্রতিষ্ঠানে মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক কর্মচারী নিয়োগ করা হয় এমন সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে শ্রম আইনের আওতায় নিয়ে আনার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

৬. **শ্রম আইন বাস্তবায়ন ও আইন আদালত সংক্রান্ত:**

(ক) শ্রম আইন ও তা প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিনিধিকে শ্রম আদালতের সদস্য ও বিচারক নিয়োগ এবং দীর্ঘসূত্রিতা রোধ করে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য আইনে বর্ণিত সময়ের মধ্যে রায় প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(খ) আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অর্থাৎ শ্রম অধিদপ্তর ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ যে কেউ শ্রম আইন ও শ্রমবিধি লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে উক্ত লঙ্ঘন ও ঘটনা সম্পর্কে অভিহিত থাকবেন এমন শ্রমিক নেতৃবৃন্দ বা বিশেষজ্ঞ বা প্রতনিধি আইন লঙ্ঘনকারীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা করার ক্ষমতা দিয়ে আইন সংশোধন করা।

(গ) শ্রম আইনে যে দণ্ড বিদ্যমান রয়েছে তা খুবই অপ্রতুল, তাই শ্রম আইনে যা আছে তাকে ন্যূনতম দণ্ড হিসেবে ধরে দণ্ড আরও বৃদ্ধি ও কার্যকর করা আবশ্যক।

৭. **ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও দর কষাকষি সম্পর্কিত:**

(ক) ট্রেড ইউনিয়নে দলীয় লেজুর বৃত্তি এবং রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন হওয়া বন্ধ, শ্রমিকদের নিজস্ব রাজনীতি করার সুযোগ প্রদান, বাধাহীনভাবে ট্রেড ইউনিয়ন করার নিশ্চয়তা, কার্যকরী পরিষদের নির্বাচনে শ্রম দপ্তরসহ অন্য কাহারো হস্তক্ষেপ বন্ধ, শ্রম আইনের সংশ্লিষ্ঠ ধারা সংশোধন করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও রেজিষ্ট্রেশন প্রদান নিশ্চিত করার জন্য সহজতর করা এবং শ্রমিকদের পছন্দমত নেতা নির্বাচন এবং শ্রম আইনের ধারা ১৮৩ (৭) অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানপুঞ্জের ন্যায় অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও একই অধিকার প্রদান, বন্দরসহ অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই অধিকার নিশ্চিত করে আইন সংশোধন করার সুপারিশ করছি।

(খ) ইউনিয়নের কার্যকরি পরিষদের নির্বাচনে উচ্চ আদালতে নজিরকে কেন্দ্র করে প্রত্যেকটি ইউনিয়নের নির্বাচনের সকল বাধা নিরসন, গণতান্ত্রিকভাবে ট্রেড ইউনিয়ন পরিচালনার স্বার্থে, কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়া কার্যকরি কমিটির নির্বাচন এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত কল্পে প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়ন, যৌথ দরকষাকষি প্রতনিধি (সিবিএ) এবং শ্রমিকের অধিকার সংরক্ষন করে আইন সংশোধন করা আবশ্যক।

৮. **সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের অধিকার ও উক্ত সেক্টরের শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত:**

(ক) প্রস্তাবিত অত্যাবশকিয় পরিসেবা আইন বাতিল, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮-এ শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ধারা সমূহ সংশোধন, সড়ক দুর্ঘটনার জন্য গাড়ি চালক, সহকারি ও মালিকদের সর্বোচ্চ শাস্তি ও জামিন অযোগ্য ধারা বাতিল এবং যুক্তি সংগত কারণে জরিমানা ও শাস্তির মেয়াদ কমানো এবং পার্কিং স্পট নির্ধারণ না করা পর্যন্ত নো-পার্কিং মামলা দেয়ার বিধান স্থগিত করে উল্লেখিত আইন সংশোধন করা;

(খ) ড্রাইভিং স্কুল চালু এবং সহজ শর্তে ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান নিশ্চিত করে সড়ক পরিবহনের শৃঙ্খলা আনার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৯. **নো ম্যানস ল্যান্ড-এ সংঘটিত ঘটনা সংক্রান্ত:** বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমারের যাত্রী/পণ্য পরিবহনে অনেকগুলি স্থল বন্দর রয়েছে। উভয় দেশের বন্দরে 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এর যাত্রী ও পণ্য পরিবহনকালে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে নিহত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নেই। সুপারিশ স্ব স্ব দেশের জন্য যাত্রী যানবাহনের দায়িত্ব নিজ নিজ দেশকে নিতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ মর্মে আইনের সন্নিবেশন ও পারস্পরিক চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। জাতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে স্ব স্ব দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. **চতুর্থ শিল্প বিপ্লব এবং আধুনিকায়ন ও নতুন প্রযুক্তি সংযোজন সংক্রান্ত:** শ্রমিকদের আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ করতে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত ইনস্টিটিউশন গড়ে তুলতে হবে। প্রয়োজনে কর্মঘণ্টা কমিয়ে সকল শ্রমিকের কাজ ও মজুরি নিশ্চয়তার বিধান করতে হবে।

১১. **সমঅধিকার:** সর্বক্ষেত্রে সমকাজে সমমজুরি ও পদোন্নতি নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন করতে হবে।

জাতীয় কারিগর ও শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন

১. শ্রমিকের সংজ্ঞা অধিকতর বিস্তৃত করা, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে মজুরি ভিত্তিক নিয়োজিত সকল ধরনের শ্রমিকদের জন্য একক ও সর্বজনীন শ্রম আইন প্রণয়ন করা।

২. বাংলাদেশের সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ, আইএলও কনভেনশনের আলোকে শ্রমিক অধিকার, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করা।

৩. বাংলাদেশ কর্তৃক অনুসমর্থিত আইএলও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর আলোকে সকল শ্রমিকদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত হওয়া ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার নিশ্চিত করা।

৪. শ্রমিক সংগঠন কোনো রাজনৈতিক দলের অংগসংগঠন বা রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্তি না থাকা। একইভাবে শ্রমিক সংগঠন কোনো বিদেশি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিওদের সাথে মুক্ত থেকে স্বাধীন গণতান্ত্রিক চর্চা করা।

৫. আমদানি ও রপ্তানিমুখী শিল্পের ক্ষেত্রে OECD গাইডলাইন অনুসরণ করে বৈশ্বিক সরবরাহচেইন-এ যৌথ দায়দায়িত্ব বাধ্যতামূলক নিশ্চিত করা। শিল্পের উৎপাদন ও উন্নয়নে উন্নত শিল্প সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পর্ষদ গঠন করা।

৬. কারখানা বেআইনি লেঅফ, বন্ধ, ধর্মঘট, কর্মবিরতি, ছাটাই নির্যাতন, বেতন-ভাতা পরিশোধ না করা ফৌজদারি হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। জাতীয় মজুরি কমিশন গঠনসহ মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড ঠিক করা। ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ ফৌজদারি আদালতে মামলা দায়েরের অধিকার নিশ্চিত করা।
৭. শ্রম আদালতে দায়েরকৃত মামলা ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি এবং ঘোষিত রায়ে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ উচ্চতর আদালত দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করা।
৮. শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন এবং দেশে বিদেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।
৯. শ্রম পরিদর্শকের কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য শ্রম অধিদপ্তরে একটি ত্রিপক্ষীয় মনিটরিং কমিটি গঠন করা।
১০. ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নির্বাচন পক্রিয়ায় রেজিস্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স দপ্তরের কর্মকর্তার উপস্থিতি বাধ্যতামূলক রহিত করা। তবে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ভোটার তালিকা রেজিস্ট্রার অব ট্রেডইউনিয়ন্স কর্তৃক অনুসমর্থন করা। নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ ৩ বছরের অধিক না করা। কোনো ট্রেড ইউনিয়নে একই পদে একই ব্যক্তি একাদারে দুবারের বেশি নির্বাচিত না হওয়ার বিধান শ্রম আইনে যুক্ত করা।
১১. শ্রমিক শ্রেণির আন্তর্জাতিক সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শ্রমিক সংগঠন বিদেশি কিংবা আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলার অধিকার সুরক্ষা করা।
১২. অর্থনীতির খাত হিসেবে কৃষি, শিল্প, প্রবাসী আয় (রেমিটেন্স), আমদানি-রপ্তানি খাত, সরকারি পরিষেবা খাত, সেবা খাত (কেয়ারিং) যোগাযোগ খাত, নির্মান মৎস্য ও গবাদি পশু খাত, কুটির শিল্প (আর্টিজান) খাত, পরিবেশ ও বুইকোনমি ইত্যাদি খাতকে অর্থনীতির চালিকা খাত হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। এই সকল খাতে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারী ও কর্মীবৃন্দকে তাদের আইনানুগ দাবিদাওয়া আদায়ে সংগঠিত হওয়া অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
১৩. আইএলও কনভেনশন ১৭৭ অনুযায়ী গৃহ ভিত্তিক শ্রমিক (হোম ওয়ার্কার্স) ১৮৯ দ্রুত অনুসরণ করে গৃহশ্রমিক সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা। একই সাথে প্রবাসী শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা।
১৪. চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের অভিঘাতকে চিন্তায় নিয়ে শ্রমিকদেরকে দক্ষ শ্রমশক্তিতে রূপান্তরে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদ নিশ্চিত করা। এ সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করতে হবে।
১৫. শিশু শ্রম নিষিদ্ধকরণ কঠোরভাবে মেনে চলা। শোষণ-নির্যাতন ও বৈষম্যমূলক সমাজ বিনির্মানে লিঙ্গভিত্তিক সমতা তৈরিতে আইন প্রণয়ন করা।

নগরের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মজুরি বিষয়ক গবেষণা

১. পরিচয়পত্র এবং চাকরির চুক্তি প্রদান সুরক্ষামূলক সরঞ্জামের ব্যবস্থা যথাযথ জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে বেতন বৃদ্ধি নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী বাসস্থান সরবরাহ।
২. নাগরিক সমাজ সংস্থার জন্য সুপারিশ কর্মীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি শ্রম অধিকার এবং সুরক্ষা নিয়ে প্রচারণা চালানো আইনি সহায়তা এবং সহায়তার সুবিধা প্রদান কমিউনিটি ভিত্তিক সমর্থন কর্মসূচি প্রচার।
৩. উদ্বিগ্ন নাগরিকদের জন্য সুপারিশ - স্যানিটেশন কর্মীদের প্রতি সম্মান এবং মর্যাদা প্রচার কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে বাধা করা, কর্মী অধিকার প্রচারণার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা, স্থানীয় উদ্যোগে অবদান রাখা
৪. সিটিকর্পোরেশন থেকে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে মানসম্মত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী যেমন, হ্যান্ড গ্লাভস, গাম ফ্রুট, রেইনকোট/ছাতা এবং মাস্ক সরবরাহ করা।
৫. সিটিকর্পোরেশনের উদ্যোগে দলিত কলোনিগুলোর কাছাকাছি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা যাতে খুব সহজে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে।
৬. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য স্বাস্থ্য বিমা চালু করা যাতে পেশাগত কারণে অঙ্গহানী বা মৃত্যু বরণ করলে পরিবার ক্ষতিপূরণ পেতে পারে।
৭. আউটসোর্সিং ও চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের চাকরি স্থায়ী করতে হবে।
৮. সনাতন পদ্ধতিতে বর্জ্যে অপসারণ নিষিদ্ধ করে কর্মক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য আধুনিক উপকরণ সরবরাহ করা।
৯. 'দলিত নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।
১০. গৃহবর্জ্য অপসারণের সনাতন পদ্ধতির বিলুপ্তি সাধনে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১১. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।
১২. দলিত নারীদের নিরাপত্তা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
১৩. বাংলাদেশে দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদেও স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনা করে বিদ্যমান সমস্যা উত্তরণে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ।

আউটসোর্সিং কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ

১. অনতিবিলম্বে আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০১৮ নামের কালো আইন বাতিল করে সংবিধানের প্রতি সম্মান জানিয়ে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আউটসোর্সিং, দৈনিক মজুরি ভিত্তিক ও প্রকল্প ভিত্তিক কর্মরত দক্ষ জনবলদেরকে বয়স শিথিল করে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে চাকরি স্থায়ীকরণ/জাতীয়করণের দাবি জানাচ্ছি।
২. উপরের দাবিটি বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০১৮ এর ৩ (৮) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ঠিকাদার ব্যাতীত সরাসরি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।
৩. ঈদ, বৈশাখী ভাতাসহ সকল বোনাস প্রদান করতে হবে, ৬ মাস অন্তর অন্তর ইনক্রিমেন্ট এর ব্যবস্থা করতে হবে, অতি সম্প্রতি বিনা কারণে যাদেরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে তাদেরকে চাকরিতে বহাল করতে হবে এবং সমস্ত বকেয়া বেতন পরিশোধ করতে হবে।

৪. সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সকল দপ্তর অধিদপ্তরে নিয়োজিত আউটসোর্সিং/দৈনিক মুজুরি ভিত্তিক এবং প্রকল্পে কর্মরত সকলকে
৫. স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে বয়স শিথিল করে জাতীয়করণ করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

১. নির্বাচন কমিশন সচিবালয় KPI ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এবং আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় সেবা গ্রহণ নীতিমালা – ২০১৮ এর ৩ অনুচ্ছেদের ৩ ও ৪ এর প্রেক্ষিতে জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার্থে আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের আউটসোর্সিং জনবলকে সরাসরি প্রকল্পের জনবল কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য PSC কমিটির মতামত গ্রহণপূর্বক জরুরিভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধন করা যেতে পারে। ডিপিপি সংশোধন করতে "উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্তির পর অত্যাবশ্যকীয় পদ রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর" এর পরিপত্র অনুযায়ী প্রকল্পের জনবলকে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তর/আত্মীকরণ করা যেতে পারে; (সংযুক্তি-১৮)।
২. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অধীনে পৃথক জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অধিদপ্তর গঠন করে প্রকল্পের বিদ্যমান জনবলকে রাজস্বখাতে স্থানান্তর/আত্মীকরণ করা যেতে পারে এবং
৩. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে যে সকল পদ শূন্য রয়েছে সে সকল পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্পের জনবলকে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় অগ্রাধিকার প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
৪. নাগরিকদের স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান একটি চলমান কার্যক্রম। সুতরাং এ বিষয়টি প্রকল্পের আওতাধীন না রেখে NIDW কে আরো শক্তিশালী করে ওই উইং-এর অধীনে এর সব কার্যক্রম ন্যস্ত করা যেতে পারে। অথবা NID কার্যক্রমের জন্য একটি আলাদা অধিদপ্তর গঠণ করা যেতে পারে এবং প্রকল্পের বর্তমান দক্ষ জনবলকে সেখানে স্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে।
৫. ছবিসহ লেমিনেটেড কার্ড প্রদানের সময় তথ্য সংগ্রহে সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। সম্ভবত তাড়াহুড়োর জন্য গৃহীত তথা যাচাই-বাছাই করা হয়নি। ঐ সমস্ত কার্ড অনুসরণ করে স্মার্ট কার্ড তৈরি করতে গিয়ে স্মার্ট কার্ডেও প্রচুর ভুল তথ্য এসে গেছে। ভবিষ্যতে নতুন কার্ডের এবং সংশোধনের জন্য পেশকৃত কার্ডে তথ্য লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। এ জন্য লিপিবদ্ধ তথ্য তথ্যপ্রদানকারিদের নিকট থেকে যাচাই করে নেয়া যেতে পারে।
৬. কার্ড বিতরণে দীর্ঘসূত্রিতা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমানে উপজেলা/থানা অফিসগুলোতে কার্ড বিতরণের হার কম। বলা হয়েছে জনবলের অভাবের কারণে দৈনিক ৫০/৬০টার বেশি কার্ড বিতরণ করা যায় না। প্রত্যেক উপজেলা/থানা অফিস তাদের বিতরণযোগ্য কার্ডগুলো বিতরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে এবং অন্তত ঐ সময়ের জন্য শুধুমাত্র ঐ কাজ সম্পাদনের জন্য তাদের কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত জনবল অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যাদের নিকট কার্ড বিতরণ করা হবে তাদেরকে নির্দিষ্ট সময় জানিয়ে দেয়া যেতে পারে, যেন তারা বারবার এসে ফিরে না যায়।
৭. সাইবার নিরাপত্তা NID সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ সিস্টেম ICT কার্যক্রমের ওপর সার্বক্ষণিকভাবে নির্ভরশীল। ১১ কোটি জনগণের তথ্য ধারণ করা একটি সার্ভারের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যাপার। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে DRS এ যদিও ব্যাক-আপ হিসাবে তথ্যগুলো রয়েছে তথাপি বর্তমানে চলমান সার্ভারটিতে ত্রুটি দেখা দিলে তাতক্ষনিক সমস্যার সৃষ্টি হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সাবধানতার জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে একাধিক সার্ভার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। একই সাথে কোনো অসাধু উপায়ে যাতে জনগণের গোপন তথ্য ফাঁস না হয় এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুরক্ষা গ্রহণ করতে হবে।
৮. স্মার্ট কার্ড সংশোধনের সময় অনেক দলিল/কাগজপত্র পেশ করতে বলা হয়, যা অনেকের ক্ষেত্রে প্রাসংগিক নয়। যেমন স্বল্পশিক্ষিত, স্কুলে পড়েননি, এসএসসি পাশ করেননি বা অনেক বৃদ্ধ যাদের লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি তাদের কাছে এসএসসি সার্টিফিকেট চাওয়া হয়। তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের কাছে কাবিননামা চাওয়া হয়। এ সব তাদের পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব হয় না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া যেতে পারে।
৯. মাঠ পর্যায়ের অফিসগুলোতে সেবাগ্রহিতাদের হয়রানি করা মোটেই অভিপ্রেত নয়। এ বিষয়ে উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তাকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অফিসগুলো পরিদর্শন করতে হবে। প্রকল্প কর্মকর্তাদের পরিদর্শনের সংখ্যা বাড়াতে হবে।
১০. স্মার্ট কার্ড বিদেশ থেকে আমদানি না করে মানসম্পন্ন কার্ড দেশীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা প্রস্তুত করা যায় কি-না তা যাচাই করে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। একাধিক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে নমুনা সংগ্রহ করে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে কার্ডের মান যাচাই করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
১১. কিছু রোহিঙ্গা শরণার্থী এনআইডি কার্ড পেয়ে গিয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেগুলো চিহ্নিত করে সে সব কার্ড বাতিল করা যেতে পারে এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
১২. IT বিনিয়োগ প্রকল্পে এবং একইসাথে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প মেয়াদ পর্যন্ত যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ জনবলের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের ফলে প্রযুক্তিগত বিশেষজ্ঞদের নিকট থেকে সবসময় নির্দেশনা ও সেবা পাওয়া অত্যন্ত দরকার। এ বিষয়টির প্রতি নজর রাখা যেতে পারে।
১৩. জনগণ যাতে নির্ভয়ে তাদের অভিযোগ পেশ করতে পারেন সে জন্য উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসসমূহে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা যেতে পারে। উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা নিয়মিত সে বাক্স থেকে প্রাপ্ত অভিযোগগুলো পরীক্ষা করে দেখবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কেন্দ্রীয়/প্রকল্প অফিসেও এ ধরনের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।
১৪. জাতীয় পরিচিতি সেবা হতে অর্জিত রাজস্ব আয়ের একটি অংশ এনআইডি সেবা কার্যক্রমের উন্নয়নে কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
১৫. যোগাযোগ প্রকৌশল এ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। প্রচার ও জনগণের নিকট থেকে ফিডব্যাক পাওয়ার জন্য এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। নাগরিক ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে এনআইডি সার্ভিসের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। তাই প্রকল্প শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও যোগাযোগ প্রকৌশলকে শক্তিশালী করা NIDW এর জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এ বিষয়ে স্থায়ী একটি শাখা গঠণ করে

সেখানে বিশেষজ্ঞ জনবল নিয়োগ দেয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। অথবা একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর বিশেষজ্ঞ কনসালটিং ফার্ম নিয়োগের মাধ্যমেও কাজটি করানো যেতে পারে।

১৬. বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসগুলোতে আরো জনবল দরকার। তাই সে অফিসগুলোর জন্য জনবল নিয়োগ করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বাড়ানো দরকার। এ জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অর্গানোগ্রাম পরিবর্তণ করা যেতে পারে।

১৭. ঘন ঘন প্রকল্প পরিচালক বদলি না করে একজন প্রকল্প পরিচালকের মাধ্যমে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৮. বাংলাদেশে BCC কর্তৃক ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (NEA) বাস চালু করা হয়েছে। কিন্তু সেটা এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। BCC এবং NIDW এর বাইরে অন্য সকল ব্যবহারকারীদেরও NEA বাস কার্যকরী অন্যতম একটি পূর্বশর্ত। NEA এর সাথে তাদের ডাটাবেজ শেয়ার করার বিষয়ে সবাই একমত হয়ে বাংলাদেশের NID ব্যবহারকারীদের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় উন্নত করা যেতে পারে।

জাতীয় কারিগর ও শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন

১. গ্রামীণফোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সকল প্রকার অবৈধ চাকরি চ্যুতির আদেশ বাতিল করে শ্রমিকদের অবিলম্বে আর্থিক ও সামাজিক ক্ষতিপূরণ সহ চাকরিতে পুনর্বহাল করতে হবে।

২. ২০০৯-২০১২ সালের ৫% লভ্যাংশের বিলম্ব বিতরনের প্যানাল্টি সহ সকল বকেয়া অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে।

৩. শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালানোর দায়ে জড়িত, গ্রমীণফোনের CEO, CMO সহ তাদের সকল অনুসারী অত্যাচারী ম্যানেজার এবং চাটুকার আওয়ামী স্বৈরাচারের দোসর ইউনিয়ন নেতাদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

পরিচ্ছন্নতা কর্মী

১. পরিচয়পত্র এবং চাকরির চুক্তি প্রদান।

২. যথাযথ জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে বেতন বৃদ্ধি করা।

৩. নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী বাসস্থান সরবরাহ নিশ্চিত করা।

৪. কর্মীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। শ্রম অধিকার এবং সুরক্ষা নিয়ে প্রচারণা চালানো আইনি সহায়তা এবং সহায়তার সুবিধা প্রদান

৫. কমিউনিটি ভিত্তিক সমর্থন কর্মসূচি প্রচার

৬. সিটিকর্পেরেশন থেকে নিয়মিত ও যথেষ্ট পরিমাণে মানসম্মত স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী যেমন, হ্যান্ড গ্লাভস, গাম বুট, রেইনকোট/ছাতা এবং মাস্ক সরবরাহ করা।

৭. সিটিকর্পোরেশনের উদ্যোগে দলিত কলোনিগুলোর কাছাকাছি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলা যাতে খুব সহজে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিতে পারে।

৮. পরিছন্নতাকর্মীদের স্বাস্থ্য বিমা চালু করা যাতে পেশাগত কারণে অঙ্গহানী বা মৃত্যু বরণ করলে পরিবার ক্ষতিপূরণ পেতে পারে।

৯. আউটসোর্সিং ও চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের চাকরি স্থায়ী করতে হবে।

১০. সনাতন পদ্ধতিতে বর্জ্য অপসারণ নিষিদ্ধ করে কর্মক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য আধুনিক উপকরণ সরবরাহ করা।

১১. দলিত নারী পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালার পূর্ণ বাস্তবায়ন করা।

১২. গৃহবর্জ্য অপসারণের সনাতন পদ্ধতির বিলুপ্তি সাধনে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের পাশাপাশি দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিকল্প কর্মসংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৩. পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের বেতন ভাতাসহ অন্যান্য সুবিধাদি বৃদ্ধি করা।

১৪. দলিত নারীদের নিরাপত্তা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১৫. বাংলাদেশে দলিত পরিচ্ছন্নতাকর্মীদেও স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণা পরিচালনা করে বিদ্যমান সমস্যা উত্তরণে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৬. স্যানিটেশন কর্মীদের প্রতি সম্মান এবং মর্যাদা প্রদর্শন কারা।

১৭. প্রচার কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিরাপত্তা প্রহরী

- বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক নিরাপত্তা প্রহরীদের বিগত স্বৈরশাসক এর প্রণয়নকৃত বৈষম্যমূলক নীতিমালা বাতিল করে নিরাপত্তা প্রহরীদের ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রদান না করে বয়স শিথিল রেখে চাকরি স্থায়ী করণের দাবি জানাচ্ছি।

কর্মজীবী নারী [KARMOJIBI NARI(KN)]

১. কৃষক ও কৃষিশ্রমিকের উন্নয়ন ও অধিকার নিশ্চিত করতে 'কৃষিশ্রম আইন' নামে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হবে অথবা বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬-এর আওতার আলাদা অধ্যায় সংযুক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে। যা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে।

২. কাজের ধরন, সময় ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে সার্বক্ষণিক কৃষিশ্রমিক, খণ্ডকালীন কৃষিশ্রমিক, ঋতুভিত্তিক বা অস্থানীয় কৃষিশ্রমিককে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

৩. কৃষিশ্রমিকের তালিকা প্রণয়ন, নিবন্ধীকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান।

৪. একজন কৃষি শ্রমিকের অবসর-বিশ্রামসহ স্বাভাবিক কাজের সময় নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে মজুরিসহ অতিরিক্ত কাজের সময় নির্ধারণ।
৫. নারী-কৃষিশ্রমিকের কর্মরত অবস্থায় সন্তানকে মাতৃদুগ্ধ পান করানোর সুযোগ থাকতে হবে।
৬. নারী ও কিশোর শ্রমিকদের রাতে কাজে নিয়োগ বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে।
৭. প্রত্যেক কৃষি শ্রমিক একাধারে ছয়দিন একই নিয়োগকর্তার নিয়োগাধীন থাকার পর একদিন স্ব-মজুরি ছুটির বিষয়টির অন্তর্ভুক্তিসহ বিধান প্রণয়ন করতে হবে।
৮. বাৎসরিকভাবে নিয়োগকৃত কৃষিশ্রমিকের কর্মঘণ্টা ও অবসর সুবিধা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের মতো করতে হবে।
৯. কৃষি শ্রমিকদের গণনার জন্য একটি জাতীয় শ্রমিক ডাটাবেস তৈরি করতে হবে।
১০. কৃষিপণ্যের ও ফসলের নায্যমূল্য নিশ্চিত করার জন্য বাজার ব্যবস্থা সুসংহত করতে হবে।
১১. সকল কৃষিশ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার এবং স্বাধীনভাবে ট্রেড ইউনিয়নে যোগদানের অধিকার দেয়া।
১২. সরকারকে কৃষিশ্রমিকের অভ্যন্তরীণ অভিবাসন সহায়তার জন্য 'উপজেলা এমপ-য়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' কার্যালয় স্থাপন করা। এ দপ্তর প্রত্যেক উপজেলায় কখন কোথায় কতজনের জন্য কাজ আছে এবং সেখানে মজুরির গড় হার কখন কত সে তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার করবে। উপজেলা প্রশাসন এ তথ্য স্থানীয় সরকার বা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে কৃষিশ্রমিকের কাছে পৌঁছাবে।
১৩. মৌসুমে স্থানান্তরিত শ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ বিষয়গুলিতেও কৃষক ও শ্রমিকের জন্য বিধিবিধান হতে হবে।
১৪. ক্ষতিপূরণের আদায়ের মামলা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে এবং সর্বোচ্চ উপজেলা পর্যায়ে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা। এ বিষয়ে সরকার প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন করবে।
১৫. কৃষি শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য মজুরি বোর্ড ঘোষণা করা এবং তাদেরও সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায় নিয়ে আসার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।
১৬. কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মজুরি পরিশোধের বিধান করতে হবে। চুক্তিকৃত শ্রমিকের ক্ষেত্রে চুক্তিকৃত সময়, বাৎসরিক নিয়োগ ইত্যাদি বিবেচনায় আনতে হবে। বিলম্বে মজুরি পরিশোধের ক্ষেত্রে জরিমানার বিধান করতে হবে।
১৭. বেগার খাটানো, আগাম শ্রম বিক্রি নিষিদ্ধ করে আইন করতে হবে।
১৮. সরকার প্রদত্ত ছকে প্রত্যেক কৃষি শ্রমিককে পরিশোধিত মজুরির লিখিত বিবরণ দেয়ার বিধান করতে হবে।
১৯. পেশাগত ঝুঁকি থেকে সৃষ্ট ক্ষতির জন্য সরকার নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ আইন কার্যকর করতে হবে।
২০. দুর্ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসার সম্পূর্ণ খরচ এবং পূর্ণ মজুরি মালিকপক্ষ বহন করবে তা নিশ্চিত করতে হবে
২১. কৃষিশ্রমিকদের জন্য কমপক্ষে ১০০ কর্মদিবস নিশ্চিত না করা।
২২. সরকারি ও সমবায় ভিত্তিক ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সামর্থ অনুযায়ী ঋণ পাওয়ার সুযোগ নিশ্চিতকরণ।
২৩. খাসজমি, চর ও উপকূলের জমি ইত্যাদিসহ সাধারণ সম্পত্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদে কৃষিশ্রমিকদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিতকরণ।
২৪. কৃষকশ্রমিকের সমবায়ের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন, বিপণন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কৃষি উপকরণ কৃষকশ্রমিকের সমবায়ের মাধ্যমে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।
২৫. সমকাজ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। কোনগুলো সমকাজ তা নির্দিষ্ট করতে হবে। সমমজুরি নিশ্চিত করা না হলে আইনে শাস্তির বিধান রাখতে হবে।
২৬. নারী পুরুষে সমকাজে সম মজুরি নিশ্চিত করে আইন করতে হবে।
২৭. সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে কৃষকদের মধ্যে শিশু শ্রমের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)

১. শ্রম অসন্তোষ, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬- এ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সংযোজন করতে হবে, শ্রম আদালতসমূহে "আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০" কার্যকরীকরণ এবং আদালতে ভার্চুয়াল শুনানি এর আয়োজন করা।
২. নিরাপদ ও স্বাস্থ্য সম্মত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা।
৩. ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত আইন ও বিধিমালা সংশোধন।
৪. সকল শ্রমিকদের জন্য এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম কার্যকরীকরণ।
৫. শিল্প খাত অনুযায়ী স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ও কল্যাণ সম্পর্কিত শ্রম আইনের সংস্করণ।
৬. দুর্যোগকালীন সময়ে শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা। শ্রমিকদের জন্য এ সময় যাতায়াতের সুবিধা নিশ্চিত করা, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা প্রদান, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দেওয়া।
৭. শ্রমিকদের নিরাপত্তার আওতায় আনা।
৮. পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি চালু করা চাকরি ও স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
৯. শ্রমিকদের শিশু সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ নিশ্চিত কল্পে কারখানা ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ থাকা।
১০. প্রসূতি কল্যাণ অধিকার প্রদানের বিধান এর সময়সীমার পরিমাণ ১৬ সপ্তাহ থেকে বৃদ্ধি করে সর্বমোট চব্বিশ সপ্তাহ অথবা ছয় মাসের প্রসূতিকালীন অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
১১. কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও নিরসনে "অভিযোগ কমিটি" গঠন ও অভিযোগ কমিটির কাজ সম্পর্কিত নীতিমালা থাকতে হবে এবং বিদ্যমান শ্রম আইনে এ সংক্রান্ত বিধান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
১২. নারী শ্রমিককে দিয়ে দক্ষকালীন ডিউটি করাতে হলে শ্রম আইনের ধারা ১০৯ ও শ্রম বিধিমালার বিধি-১০৩ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (যেমন- তাদের আসা-যাওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠান থেকে যানবাহন সুবিধা প্রদান) এবং এ বিষয়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মনিটরিং জোরদার করতে হবে।
১৩. নারী শ্রমিকদের কর্মস্থলে ধরে রাখতে হলে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র যথাযথভাবে কার্যকর করা আবশ্যক।
১৪. নারী শ্রমিকদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে স্থানীয় জনসাধারণের জন্য জনসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

১৫. সকল সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য একটি জাতীয় নুন্যতম মজুরি নির্ধারণ করা প্রয়োজন এবং প্রতিটি সেক্টরের জন্য আলাদা মজুরি কাঠামো থাকতে হবে।
১৬. মজুরি নির্ধারণের সময় বিদ্যমান শ্রাম আইনের ধারা ১৪১ (সুপারিশ প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়) অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণের সময় জীবন যাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন, যুক্তি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ, দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ- সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রসাঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করার সুস্পষ্ট বিধান করা।
১৭. চাকরি থেকে ইস্তফা প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের জন্য ৩০ দিনের লিখিত নোটিস প্রদানের বিধান রেখে বিদ্যমান শ্রম আইন সংশোধন করা আবশ্যক এবং চাকরির মেয়াদ যাই হোক না কেন শ্রমিকের চাকরি অবসানজনিত সকল প্রকার আইনানুগ পাওনাদি পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
১৮. শ্রমিকদের নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র ও সার্ভিস বই প্রদানের প্রক্রিয়া তদারকিকরণ।
১৯. স্থায়ী প্রকৃতির কাজের জন্য ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগ করা যাবে না।
২০. শ্রমিকদের কথিত কালোতালিকা সংক্রান্ত অভিযোগ তদন্ত করা
২১. শ্রমিকদের চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শিল্প খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বিষয়ে শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে সরকার, শ্রমিক সংগঠন ও মালিক সংগঠনের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।
২২. শ্রমিকদের কর্ম ও কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্বেগ নিরসন ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিতকল্পে শিল্প ভিত্তিক জাস্ট ট্রানজিশন পরিকল্পনাগুলিকে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা এবং জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা।
২৩. আত্মনির্ভর দলের সদস্যরা সমাজ এবং কর্মক্ষেত্রে (স্বেচ্ছাসেবক এবং অনানুষ্ঠানিক সলের সদস্য হিসেবে) সাধারণ শ্রমিকদের জন্য সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করে। এই আত্মনির্ভর দলের সদস্যদের স্বীকৃতি দেওয়া, যাতে করে শ্রমিকদের সেবা গ্রহণ ও প্রদান সহজসাধ্য হয় এবং শ্রমিক ও সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে।
২৪. আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের, বিশেষ করে গৃহ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, অটোরিকশা চালক এবং চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়ার অধিকার স্বীকৃতি দিতে শ্রম আইন ও শ্রম বিধিমালা সংশোধন করতে হবে। শ্রমিক সংগঠন এর নিবন্ধন প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে।
২৫. সকল ধরনের শিশু শ্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। শিশুশ্রম নির্মূলের জন্য নিযোগকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
২৬. চা বাগান শ্রমিকদের উপর জবরদস্তিমূলক বা বাধ্যতামূলক শ্রমের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা।
২৭. চা বাগান শ্রমিকদের গ্র্যাচুইটি সুবিধা নিশ্চিত করতে,আবাসন নিশ্চিত করতে শ্রম আইন, ২০০৬- এর ২৮ ও ৩২ নং ধারা সংশোধন করতে হবে।
২৮. চা বাগান শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যসেবা, নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

সোনারগাঁও হোটেল শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়ন

১. এমপ্লয়িজ সার্ভিস রেগুলেশন Term No. 12 In (chapter X11 (section-12; Employees' Benefit Programmed) অনুযায়ী বিদ্যমান চিকিৎসা সুবিধাগুলি চলতে থাকবে এবং সর্বোচ্চ চার্জযোগ্য চিকিৎসা ব্যয়ভার কোনো সীমা ছাড়াই প্রতিষ্ঠান বহন করিবে।
২. সকল নিয়মিত কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য চার্টে দেখানো গ্রেড অনুযায়ী বেসিক বৃদ্ধি করতে হবে এবং বেতন স্কেল সংশোধন করতে হবে (বিধান অনুযায়ী বাড়ি ভাড়া ও অন্যান্য ভাতা অব্যাহত রাখতে হবে)। বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধির হার বেস বেসিকের পরিবর্তে বিদ্যমান বেসিকের ১০% করতে হবে।
৩. মূল বেতন (বেসিক) মোট মাসিক বেতনের ৫৫% প্রদান সহ কাঠামো অনুযায়ী বেতন ভাতা প্রদান করতে হবে।
৪. প্রতিটি উৎসব ভাতা মাসিক মোট বেতনের দ্বিগুন প্রদান করতে হবে।
৫. সকল কর্মচারীদের জন্য নিজস্ব ধর্মীয় অনুশীলনগুলি (হজ্জ, তীর্থস্থান) পালন করার জন্য এক মাসের মোট বেতনের সমপরিমাণ সহ ৪৫ (পয়তাল্লিশ) দিনের ছুটি মঞ্জুর করতে হবে।
৬. পুরুষ শ্রমিক ও কর্মচারীদের পত্নীর সন্তান জন্মের পর পূর্ণ বেতন সহ ০৪ (চার) সপ্তাহের পিতৃত্বকালীন ছুটি দিতে হবে।
৭. সকল শ্রমিক ও কর্মচারীর অবসরকালীন সমস্ত সুযোগ সুবিধার পাশাপাশি মৃত্যু কালীন সুবিধা বাবদ আরো ১৫,০০০০০ (পনের লক্ষ) টাকা প্রদান করতে হবে।মৃত দেহ সৎকার খরচ বাবদ বিদ্যমান নগদ ৭০০০০ (সত্তর হাজার) টাকার পরিবর্তে ১৫,০০০০ (একলক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা দিতে হবে এবং যা কিনা মৃত্যু সুবিধা এবং অবসর সুবিধা এর বাহিরে এক কালীন হিসাবে গন্য হবে। একজন কর্মচারীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ মৃত কর্মচারীর পরিবারের একজন সদস্যকে স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।
৮. মাতৃত্বকালীন ছুটির পরে যোগদানের সময় মহিলা কর্মীর শিশুর জন্য আয়া সহ পূর্নাঙ্গ ডে-কেয়ার এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৯. যদি শ্রমিক কর্মচারীর ছেলে মেয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনার সুযোগ পায়, তাদের জন্য আর্থিক অনুদান ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা ব্যবস্থা করতে হবে।

ঢাকা মহানগর সিএনজি অটোরিক্সা চালক ঐক্য পরিষদ

- যাত্রি সেবা নিশ্চিত ও সিএনজি অটোরিক্সা চালক হয়রানি বন্ধ, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ চালক স্বার্থ বিরোধী ধারাসমূহ বাতিল করতে হবে।

পঞ্চগড় জেলা ট্রাক, ট্যাংকলড়ী ও কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতি

১. প্রতি জেলায় নির্ধারিত শিল্পে ০১ (এক) এর অধিক মালিক সমিতি বা শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন না দেওয়া।
২. নির্বাহী কমিটির মেয়াদ ০৩ (তিন) বৎসরের স্থলে ০৫ (পাঁচ) বৎসর করা।

পঞ্চগড় জেলা ট্রাক (মিনি ট্রাকসহ) ট্রাক্টর, ট্যাংকলরি ও কাভার্ড ভ্যান শ্রমিক ইউনিয়ন

১. নির্বাহী কমিটির মেয়াদ ০৩ (তিন) বৎসসের স্থলে ০৫ (পাঁচ) বৎসর করা।
২. প্রত্যেক জেলায় নির্ধারিত শিল্পে একাধিক শ্রমিক ইউনিয়ন থাকায় নতুন কোনো রেজিষ্টেশন না দেওয়া।
৩. প্রত্যেক জেলায় যেই টার্মিনাল আছে তা প্রয়োজন অনুযায়ী সম্প্রসারন করা এবং যে সমস্ত জেলায় টার্মিনাল নেই সে সমস্ত জেলায় নতুন করে টার্মিনাল স্থাপন করা।
৪. শ্রমিক কল্যাণ চালু করা।

পঞ্চগড় জেলা বাস, মিনিবাস, কোচ মালিক সমিতি

১. নির্বাহী কমিটির মেয়াদ ০৩ (তিন) বৎসরের স্থলে ০৫ (পাঁচ) বৎসর করা ।
২. প্রতি জেলায় নির্ধারিত শিল্পে ০১ (এক) এর অধিক মালিক সমিতি বা শ্রমিক ইউনিয়ন রেজিষ্ট্রেশন দেওয়া।

আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, দিনাজপুর

১. মাঠ পর্যায়ে নতুন অফিস প্রতিষ্ঠা ও জনবল বৃদ্ধি।
২. মাঠ পর্যায়ে শ্রম অধিদপ্তরের দপ্তরগুলোর নিজস্ব অফিস ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা।
৩. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদান।
৪. যথাসময়ে পদোন্নতি প্রদান করা।
৫. শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
৬. কলকারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা।
৭. শ্রম আইন ও বিধি সংস্কার করা।
৮. শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম এর আওতায় নিয়ে আসা।

Ethical Trading Initiative (ETI) Bangladesh
Human Rights Due Diligence (HRDD)

- Align local labour laws with international frameworks such as the UNGPs, ILO Recommendations and Conventions, and external regulatory requirements, such as the EU CSDDD.
- Provide greater clarity on different laws in the Bangladesh Labour Act and ensure they apply to all categories of workers.
- Extend the Bangladesh Labour Act to include workers in Export Processing Zones (EPZs), ensuring equal protection under national standards for all workers, specifically regarding the right to Freedom of Association and Collective Bargaining.
- Equip and train social partners, including trade unions and employer associations, on worker voice, agency and representation issues to help engage the parties in both separate and joint training and skills initiatives to help capacity-build industrial relations.
- Allocate sufficient resources and build capacity for the Department of Inspection for Factories and Establishments (DIFE) to enhance the application and monitoring of labour laws and provide adequate oversight for the approximately four million RMG workers.
- Implement transparent processes for law enforcement to reduce worker demonstrations and protests, thereby fostering a stable industrial environment.
- Ensure regulatory and institutional reforms address current shortcomings in regulation and enforcement of employment, occupational safety and health, equality and discrimination, and personal injury legislation, and utilise various 'tools and techniques' to engage key stakeholders/rights holders and improve communication, messaging, culture and behaviours at all levels.
- Conduct risk assessments for modern slavery and child labour across all worksites, including subcontracted and home-based settings, as part of routine labour inspections.

Freedom of Association, collective bargaining and social dialogue

- Harmonise legal frameworks to ensure that laws governing EPZ and non-EPZ factories are aligned, particularly concerning the right to freedom of association.
- Enforce strict prohibitions against anti-union practices by employers, such as union busting, intimidation, harassment, or unfair dismissal of union members.
- Simplify union registration by making the union registration process more accessible and transparent by adopting thresholds based on ILO and UN recommendations.

- Invest in training and support the establishment of local, regional and national forums to embed collective bargaining mechanisms, build mature, rigorous and sustainable industrial relations through structured and independent channels, supporting the development of independent unions and joint trade union-employer fora to enable the progression of social dialogue.
- Facilitate collective bargaining by establishing 'open channels' for collective bargaining, ensuring that trade unions can negotiate on behalf of workers for better wages, terms and conditions and other benefits.
- For non-unionized factories ensure participation committee members are elected by workers, rather than appointed by employers, and support necessary training for both elected worker representatives and management on the importance of social dialogue and industrial relations.

Wages and just share

- Recommend a predictable wage review process (a tripartite process) that moves beyond the current fiveyear cycle, with worker and trade union involvement in the process to ensure fair adjustments. The minimum wage levels should be adjusted regularly to ensure they align with the cost of living, considering essential factors such as food, housing, sanitation, clothing, and commuting.
- Standardise the minimum wage system across all sectors, eliminating discrepancies between sectors such as textiles, plastics, and other industries, and ensuring that all workers are covered under the same national minimum wage policy.
- Sufficient notice periods and a clear timeline should be provided to manufacturers and companies buying from Bangladesh to plan for any changes in wage costs. Ensure that clear communication is established with workers about their legal entitlements and the requirement of timely wage payment.
- Establish and enforce a minimum wage requirement for working minors, and increase penalties for wage violations and non-payment of overtime.
- Establish a system of public reporting on the workers protection fund, which will improve clarity on how workers can access this fund and transparency on how the fund is being dispersed.
- Support the introduction of a comprehensive social security system, including an expanded employment injury insurance scheme to protect workers in cases of death, disability, or prolonged illness.

Safe and healthy workplace

- Strengthen and ensure the sustainability of the RSC programme, expanding its coverage to the entire garment industry, ensuring that all factories meet minimum health and safety standards.
- Ensure that worker safety and responsibilities extend beyond the factory floor, including ensuring safe transportation to and from work.
- Support the establishment of trade union Health and Safety Representatives and Safety Committees, and ensure that Safety Representatives are provided a clear set of legal rights and functions.

Industrial dispute, resolution, and justice

- Strengthen the RSC by supporting its expansion to cover non-OSH grievances, enabling workers to report a broader range of issues.
- Adopt best practices from organisations with independent grievance mechanisms to enhance the accessibility and efficiency of state-based mechanisms, in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).
- Provide training and raise awareness among workers and managers about available grievance mechanisms and how to use them. This can be achieved through collaborations with NGOs and other relevant stakeholders.
- Implement a comprehensive system for receiving and managing grievances related to Freedom of Association, Collective Bargaining, OSH, Gender Based Violence and Harassment (GBVH), modern slavery and child labour, from grassroots to national levels.

Equal opportunity and inclusion

- Ratify the ILO's Violence and Harassment Convention 2019 (No 190) and enact comprehensive laws to address workplace gender-based violence (GBV), with clear processes and victim-centred approaches to ensure the protection of workers and a safe working environment.

- Include clear and extended definition of GBVH aligned with ILO C190, what constitutes sexual harassment, and the difference between sexual and non-sexual harassment.
- Include clear guidance on what a sexual harassment prevention and remediation policy should include and how to form a functional Complaint Committee. .
- Define the roles and engagement of Trade Unions in the Complaint Committee to make the committees stronger and functional.
- Define the scope of work and authorities of Complaint Committees and outline the difference between a Complaint Committee and a Grievance Committee, in terms of who oversees what and how, to reduce confusion.
- Outline a step-by-step process on remediation systems that includes multiple reporting channels, case recording, fair investigation process, confidentiality advice, strengthening protection of complainant/survivors (physical, mental health support, safety and job protection), possible repercussions on inaction, how to ensure justice and possible actions against perpetrators.
- A clear reporting mechanism from the factory to the authorities is required.
- Provide clear guidelines on preventive measures and awareness sessions for the employees.
- Conducting a national movement to break the stigma on sexual harassment at work, and the protection, prevention and remediation process by MOLE in coordination with MOWCA and other relevant ministries.

Child labour

- Enforce existing laws on child labour, including age verification and legal work hours for workers under 18-years, and implement stricter penalties for suppliers found using children who are under the legal work age or employing adolescents in hazardous work.
- Strengthen labour inspectors' ability to address child labour by increasing capacity, resources and training.
- Legally establish a compulsory education age to align with the minimum age of work of 14 years.
- Support education initiatives such as free, flexible schooling options or evening classes and vocational training for children transition out of labour.

Climate change mitigation and adaptation

- Build worker capacity to engage with management in climate change mitigation efforts and transition to greener practices in the industry, such as through the green social dialogue.
- Include clauses on climate change adaptation and mitigation in labour laws, focusing on mechanisms to ensure standard floor temperatures, access to cooling water, drinking water, and other environmental parameters that ensure worker safety and wellbeing.

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাস্টাররোল/অনিয়মিত কর্মচারী

১. দৈনিক ৮০০/- (আটশত টাকা মাত্র) হারে বেতন বৃদ্ধিকরণ;
২. ২ (দুইটি) ইদ বোনাস প্রদান;
৩. নববর্ষ ভাতা প্রদান;
৪. ৩০ দিনের হাজিরা প্রদান;
৫. জাদুঘর ও প্রত্ন স্থলে কর্মরত রাজস্বখাতভূক্ত কর্মচারীদের ন্যায় সকলকে সপ্তাহে দেড় দিনের ছুটি প্রদান;
৬. দৈনিক ৮০০/- (আটশত টাকা মাত্র) হারে বেতন বৃদ্ধিকরণ;
৭. বছরে ২০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি প্রদান;
৮. প্রতি মাসের ০৫ (পাঁচ) তারিখের মধ্যে বেতন পরিশোধকরণ;
৯. কোনো কর্মচারীর মেডিক্যাল ছুটির প্রয়োজন স্বাপেক্ষে তাকে মেডিক্যাল ছুটি প্রদান;
১০. সকলকে নিজ বাড়ির নিকটবর্তী জাদুঘর/প্রত্নস্থলে নিয়োজিত রাখা।
১১. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাস্টাররোল/অনিয়মিত শ্রমিকরা সর্বসাকুল্যে টাকা- ১৩,০০০/-(তেরো হাজার টাকা) মাত্র বেতন ছাড়া সরকারি কোনো সুযোগ সুবিধা পায় না। এমনতাবস্থায় আমাদের এতোগুলো মাস্টাররোল/দৈনিক শ্রমিকদের মানবিক দিক বিবেচনার জন্য অনুরোধ করা হলো।

বাংলাদেশ ব্যাংকস এমপ্লয়িজ ফেডারেশন

১. যে সকল ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে কর্মচারী নিয়োগ করা আছে অবিলম্বে সেসকল ক্ষেত্রে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা।
২. নিয়োগকৃত সকল অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ করা।
৩. আউট সোর্সিং/ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিয়োগ প্রথা বাতিল।

৪. সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শ্রম আইন অনুযায়ী অভিন্ন সার্ভিস রুল প্রণয়ন করা।
৫. সুপার নিউমেরারী পদ বিলুপ্ত করে উক্ত পদে আত্মীকরণকৃত/ নিয়োগকৃত কর্মচারীদের নিয়মিত পদ প্রদান।
৬. সকল ব্যাংকের একই নীতিমালার আলোকে স্থায়ী কর্মচারীদের পদোন্নতি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান।
৭. সকল ব্যাংকের একই পদে কর্মরত অস্থায়ী কর্মচারীদের সমহারে বেতন ভাতা অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান।
৮. শুক্র/শনি/ বন্ধের দিন কর্মে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে দৈনিক উপযুক্ত ভাতা প্রদান।
৯. শাখা/ এরিয়ার অফিস/বিভাগীয় কার্যালয়/ প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত অস্থায়ী কর্মচারীদের কাজের সময় এবং ধরন এক হওয়ায় তাদের বেতনভাতা প্রদানে বৈষম্য দূরীকরণ।
১০. দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতির কারণে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ৫% এর পরিবর্তে ১০% করা।
১১. সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত/প্রতিষ্ঠানের ইউনিয়ন এর মত বেসরকারি/লিমিটেড কোম্পানিতে অবস্থিত ইউনিয়নসমূহে ১০% কোটা ব্যবস্থা শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যবস্থা করা।
১২. দৈনিক ২৫০ টাকা হারে মাসিক (২৫০×২২)= ৫৫০০ টাকা সকল প্রতিষ্ঠানে যাতায়াত ভাড়া প্রদান করা।
১৩. কর্মচারীদের সন্তানদের মাসিক ৫০০০ টাকা শিক্ষা ভাতা সকল প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা।
১৪. জটিল এবং ব্যয়বহুল চিকিৎসায় কর্মচারীদেরকে প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান প্রদান করা।
১৫. অস্থায়ী/আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে কর্মরত মহিলা কর্মীদেরকে মাতৃকালীন ছুটি পূর্ণ বেতনে ৬ মাস করা।
১৬. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে ইউনিয়নের সিবিএ কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের প্রতিনিধি নিয়োগ করা।
১৭. শ্রম আইনে যেসব কালাকানুন শ্রমিক কর্মচারীদের পরিপন্থি তাহা প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করা।
১৮. অতীত পতিত সরকারের পরিচলানা পর্ষদ কর্তৃক তৈরি করা প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) বাতিল করে তা যুগোপযোগী করে সরকারি গেজেট আকারে জনবল কাঠামো (অর্গানোগ্রাম) তৈরি করতে হবে।
১৯. প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ক্ষেত্রে কর্মচারীদের ২৫% পোষ্য কোটা নির্ধারণ করে নিয়োগ ব্যবস্থা করা।
২০. ব্যাংকিং খাতের জন্য স্বতন্ত্র পে-স্কেল প্রবর্তন করা।

বাংলাদেশীয় চা সংসদ

১. স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক বাসস্থানের ব্যবস্থা ও ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা:

- চা বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে চা বাগান এলাকায় সরকারি উদ্যোগে চা শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত আধুনিক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- সরকার ও চা বাগান কর্তৃপক্ষ আলোচনা করে বাগান সংলগ্ন এলাকাসমূহে সরকারি খাস জমিতে চা শ্রমিক পরিবার প্রতি স্থায়ীভাবে জমি বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।
- বর্তমান বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী চা শ্রমিকের চাকরি অবসানের পর আজীবন চা বাগানে বসবাসের ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

২. শ্রমিক সন্তানদের শিক্ষালাভের সুযোগ নিশ্চিত করা:

- মালিকদের উদ্যোগে বাগানে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ (এমপিও ভুক্ত) করা যেতে পারে।
- চা শ্রমিক সন্তানদের কর্মসংস্থানের উপযোগী কারিগরি শিক্ষা প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক ভ্যালি বা বাগান পর্যায়ে টেকনিক্যাল ও ভোকেশানাল স্কুল চালু করা যেতে পারে।

৩. কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি:

- চা বাগানের শুন্য পদ পূরণের সময় চা শ্রমিকের সন্তানদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়।
- লিজ দলিলের শর্ত অনুযায়ী চা বাগানের জমি একটি অখণ্ড সত্তা। তাই চা বাগানের জমি কাউকে সাব-লিজ বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করতে দেয়া যায় না।
- চা বাগানে সুদহীন ঋণ প্রদানের কোনো সুযোগ নেই।
- সরকারি অর্থায়নে চা শ্রমিক নিয়ন্ত্রিত একটি কমার্সিয়াল ব্যাংক/ল্যান্ড ব্যাংক/কোওপারেটিভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৪. চা শ্রমিকের মানসম্মত চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন ও বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা অনুযায়ী চা শ্রমিকের জন্য আজীবন চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা।
- সরকার কর্তৃক প্রতিটি ভ্যালিতে মাতৃত্বকালীন চিকিৎসা সুবিধাসহ কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- চা বাগান এলাকায় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আধুনিক ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা সেবা সম্বলিত শ্রমজীবী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

৫. বাগানে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করা:

- সরকার কর্তৃক প্রতিটি চা বাগানে মাঠ, চা কারখানা ও লেবার লাইনে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সম্মত শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা, পানি ও শৌচাগারের সুবিধা সহ প্লাকিং শেড নির্মাণ, পাকা রাস্তা, উন্নত ড্রেইনেজ ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

৬. বৈষম্য নিরসন:

- চা বাগানে (ক) উৎসব ছুটি ১৪ দিন যা শ্রম আইনে ১১ দিন এবং (খ) চা বাগানে পীড়িত ছুটি ২০ দিন যা শ্রম আইনে ১৪ দিন অর্থাৎ চা বাগানে সরকারি ছুটি থেকে মোট ৯ দিন অতিরিক্ত ছুটি প্রদান করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় বর্তমান শ্রম আইন বহাল রাখা যেতে পারে।
- রেশনিংয়ের ক্ষেত্রে পুরুষ যদি বেকার থাকে, সে ক্ষেত্রে তাকে নির্ভরশীল বিবেচনা করা।
- চা বাগানের ম্যানেজার বাংলো রক্ষণাবেক্ষণ (Maintenance) এর জন্য শ্রমিক প্রয়োজন। বাবুদের বাসাবাড়িতে চা শ্রমিক বা তাদের পরিবারের কাজ করার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তা বন্ধ করা।

বগুড়া পাদুকা শ্রমিক ইউনিয়ন, বগুড়া

১. দেশীয় পাদুকা শিল্প রক্ষা করা, বিদেশি নিম্নমানের পাদুকা আমদানি নিষিদ্ধ করা।

২. দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা, পাদুকা শিল্পের শ্রমিকদের রেশন দেওয়া।
৩. পাদুকা শিল্প কারখানার শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও আইডি কার্ড প্রদান করা।
৪. মোড়ে মোড়ে ও অফিস-আদালত চত্বরে পাদুকা শ্রমিকদের কাজের নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ করা।
৫. সকল হাসপাতালে পাদুকা শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।
৬. পাদুকা শ্রমিকদের আবাসনের জন্য সরকারি খাস জমি বরাদ্দ করা।
৭. পাদুকা শ্রমিকদের উপর সকল ধরনের হয়রানী ও নির্যাতন বন্ধ করা।

রিকসা,ব্যটারি রিকসা-ইজিবাইক,ভ্যান সংগ্রাম পরিষদ বগুড়া এর দাবি সমূহ:

১. সংগ্রাম পরিষদের সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য "থ্রী-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা-২০২৪" চুড়ান্ত করে দ্রুত গেজেট প্রকাশ করা।
২. নীতিমালা অনুযায়ী ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিবন্ধন, চালকদের লাইসেন্স ও রুট পারমিট প্রদান করা।
৩. কারিগরি ত্রুটি সংশোধন করে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের আধুনিকায়ন করা।
৪. চালক-মেকানিক-মালিকসহ ৬০ লাখ ও তাদের উপর নির্ভরশীল ২.৫ কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় ব্যাটারিচালিত যানবাহন চলাচল বন্ধ করা যাবে না।
৫. ছাত্র-শ্রমিক-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে ব্যাটারিচালিত ইজিবাইক ও রিকশাসহ নিহত-আহত সকল শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৬. বিদ্যুৎ চুরি ও অপচয় বন্ধ করতে ইলেকট্রিক বা ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য চার্জিং স্টেশন স্থাপন করা।
৭. প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কে ইজিবাইক, রিকশাসহ ব্যাটারিচালিত, স্বল্পগতির ও লোকাল যানবাহনের জন্য সার্ভিস রোড/বই লেন নির্মাণ করে সড়কে বিশৃঙ্খলা ও দুর্ঘটনা নিরসন করা।
৮. সারাদেশে ব্যাটারি রিকশা ও ইজিবাইক জব্দ বন্ধ কর। জব্দকৃত গাড়ি ও ব্যাটারি ফেরত দাও।
৯. সংশ্লিষ্টদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সড়কের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।
১০. সড়কে চাঁদাবাজি, হয়রানি, ব্যাটারি ছিনতাই বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ ও ছিনতাই চক্রের হোতাদের গ্রেফতার করা, চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
১১. সকল শ্রমিকের জন্য আর্মি রেটে রেশন, পেনশন ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।

রং, বোর্ড, কাঠ শিল্প শ্রমিক ফ্রন্ট, বগুড়া

১. রং, বোর্ড, কাঠশিল্পে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ২০ হাজার টাকা নির্ধারণ করা।
২. দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করা।
৩. শ্রমিকদের নিয়মিত রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা।
৪. রং, বোর্ড, কাঠশিল্প শ্রমিকদের নিয়োগপত্র ও আইডি কার্ড প্রদান করা।
৫. চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিকদের বাজার দরের সাথে সংগতিপূর্ণ চুক্তিমূল্য নির্ধারণ করা।
৬. শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মক্ষেত্র ও সপ্তাহে দুইদিন স্ব-বেতন ছুটি নিশ্চিত করা।
৭. সকল হাসপাতালে রং, বোর্ড কাঠশিল্প শ্রমিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা।
৮. শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ ও দুটি উৎসব ভাতা প্রদান করা।
৯. শ্রমিকদের কথায় কথায় ছাঁটাই, সকল ধরনের হয়রানী ও নির্যাতন বন্ধ করা।

ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র, (টি ইউ সি), বগুড়া জেলা
রেল শ্রমিকদের দাবি সমূহঃ

১. জয়পুরহাট থেকে বগুড়া এবং বগুড়া থেকে যমুনা সেতু সরাসরি ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন স্থাপন করতে হবে।
২. এ ক্লাস ও স্পেশাল ক্লাস লেভেল ক্রসিং সেটে কোনোক্রমেই আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে গেম্যান দেওয়া যাবে না।
৩. রেলে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে রেলের কাজ চালানো বন্ধ করতে হবে, খালিপদে নিয়োগ দিতে হবে।
৪. চলন্ত ট্রেনে কর্মরত সকল কর্মচারীকে মাইলেজ দিতে হবে এবং যাদের পূর্ব থেকে মাইলেজ আছে তাহা বন্ধ করা চলবে না।
৫. রেল একটি সার্বক্ষনিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান শিফট কর্মরত সকল কর্মচারীকে শিফটিং এলাউন্স দিতে হবে।
৬. ঝুঁকিপূর্ণকাজের জন্য ঝুঁকিভাতা দিতে হবে।
৭. রেলের কারখানাগুলিকে আধুনিকায়ন করতে হবে সকল যন্ত্র উৎপাদন ও ইঞ্জিন ও বগি মেরামতের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
৮. অতি সত্বর পূর্ণদ্দমে মালবাহী ট্রেন চালুর জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যাক ইঞ্জিন ও বগির ব্যবস্থা নিতে হবে।
৯. মেলাইনে সকল সেকশনে একই রকম আধুনিক সিগনালিং ব্যবস্থা সি বি এস সিস্টেম আনতে হবে এবং সকল বন্ধ ষ্টেশন চালু করতে হবে।

বাংলাদেশ গণপূর্ত কর্মচারী ইউনিয়ন (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের অন্তর্ভুক্ত), **পানি উন্নয়ন বোর্ড বগুড়ার**

১. স্থায়ী পে কমিশন গঠন এবং ৫০% মহার্ঘ ভাতা প্রদান।
২. ওয়ার্কচার্জ কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ।
৩. ভাউচার ভিত্তিক দৈনিক ভিত্তিক কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ।
৪. পদোন্নতির ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়া। (উচ্চমান সহকারী হতে প্রধান সহকারী, হিসাব সহকারী হতে উচ্চমান হিসাব সহকারী এবং অফিস সহকারী হতে উচ্চমান সহকারী, অফিস সহায়ক হতে অফিস সহকারী এবং অফিস সহায়কদের ন্যায় নিরাপত্তা প্রহরীদের পদোন্নতির ব্যবস্থাকরণ।)
৫. প্রতি বছর মূল বেতনের ১০% হারে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থাকরণ।

৬. পূর্ণাঙ্গ সেট-আপ বাস্তায়ন করুন।
৭. পূর্বের ন্যায় টাইমস্কেল ও সিলেকশন গ্রেড চালুকরণ।
৮. নিয়মিত / ওয়ার্কচার্স কর্মচারীদের ন্যয় দৈনিকভিত্তিক / ভাউচার কর্মচারীদের উৎসব ভাতা প্রদান।
৯. ১০০% গ্রাচুইটি প্রদান।
১০. সেট আপ পদের বিপরীতে আউটসোর্সিং কর্মচারীদের নিয়োগ করা যাবে না।
১১. ইলেকট্রিশিয়ানদের ঝুঁকি ভাতা প্রদান।
১২. ২০১৫ সালের পে স্কেল গ্রেড ছিল ২০টি যাহা ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীর সাথে বৈষম্য। গ্রেড ২০ টির পরিবর্তে ১০ টি করার দাবি জানাচ্ছি।
১৩. কাজ নেই মজুরি নেই ভিত্তিতে নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

বগুড়া জেলা জাতীয়তাবাদী হোটেল শ্রমিক ইউনিয়ন

১. নিম্নতম বেতন মাসিক ২৫,০০০/- টাকা করতে হবে।
২. ০৮ ঘণ্টা কর্মদিবস বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩. মালিক কর্তৃক আইডি কার্ড প্রদান করতে হবে।
৪. সার্ভিস বুক প্রদান করতে হবে।
৫. নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি কমপক্ষে ০৪ মাস করতে হবে।
৬. শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি প্রদান করতে হবে।
৭. চিকিৎসা ভাতা প্রদান করতে হবে।
৮. শ্রমিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

বগুড়া জেলা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র হকার্স ইউনিয়ন

১. বগুড়া জেলা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র হকার্স ইউনিয়নের এর নিজস্ব কোনো কার্যালয় দরকার।
২. আসবাবপত্র প্রদান।
৩. আয়ের কোনো উৎস তৈরি করা।
৪. সদস্যদের মধ্যে অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে আর্থিক সহযোগিতার জন্য ফান্ড দেওয়া।
৫. সরকারিভাবে অনুদানের কোনো ব্যবস্থা করা।
৬. সামাজিকভাবে ও মানবিকভাবে মর্যাদা দেওয়া।

পল্লি দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ) কর্মচারীদের সমস্যাগুলো নিম্নরূপ

১. চুক্তি ভিত্তিক দৈনিক ভিত্তিক সহ সকল অস্থায়ী কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ী করতে হবে।
২. দীর্ঘ ১২ থেকে ১৩ বছর যাবত পদোন্নতি বঞ্চিতদের পদোন্নতি দ্রুত দিতে হবে।
৩. টিএ বিল এবং মোবাইল বিল বৃদ্ধি করতে হবে।
৪. বিগত ১৬ বছরে আওয়ামী লীগ স্বৈরাচারী শাসকের দোসরদের বিভিন্ন অনিয়ম দুর্নীতির বিচার করতে হবে।
৫. সকল হয়রানি মূলক বদলি বন্ধ করতে হবে।
৬. প্রধান কার্যালয় থেকে আওয়ামী লীগপন্থীদের বের করতে হবে।

NESCO (NORTHERN ELECTRICITY SUPPLY COMPANY PLC)
(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

নর্দান ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই কোম্পানি পিএলসি এর আওতাধীন সকল দপ্তরের আউটসোর্সিং/এল ই এম হিসাবে কর্মরত কর্মচারীদের দাবিদাওয়া সমূহঃ

১. আউটসোর্সিং/এল ই এম কর্মচারীদের বেতন শুরু থেকেই ১৬১৩০/- থেকে সর্বোচ্চ ১৭৬৩০/- টাকা যাহা কোনো দিনও বৃদ্ধি পায়না। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা।
২. উক্ত কর্মচারীগণ ইনক্রিমেন্ট, উৎসব বোনাস, ওভার টাইম, শিফটিং চার্জ, শিক্ষা ভাতা, ঝুঁকি ভাতা, চিকিৎসা ভাতা দেওয়া।
৩. একই পদে কর্মরত কর্মচারীগণ ৫০/৬০ হাজার টাকা বেতন এবং সমস্ত সুবিধাদি পেয়ে থাকেন। দ্রব্যমূল্যের বাজার দর অনুযায়ী বেতন নির্ধারণ করা।
৪. এই সকল আউটসোর্সিং/এল ই এম এর ভেতরে বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণ অতি দ্রুত সমাধান করা প্রয়োজন।
৫. উক্ত কর্মচারীদের চাকরি স্থায়ীকরণ না করিয়া বর্তমান আউট সোর্সিং/এল ই এম হিসাবে নিয়োগ দিয়া চূড়ান্তভাবে অসম্মান করা হয়েছে। এই বৈষম্যের কারণে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মচারীদের মাঝে অসন্তুষ এবং ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। যাহার কারণে চলমান কার্যক্রম স্থবির হয়ে যেতে পারে।
৬. পোষ্য নিয়োগ চালু করতে হবে। চাকরিরত অবস্থায় কেউ মৃত্যু বরণ করলে যোগ্যতা অনুযায়ী পোষ্য কোঠা চালু করিতে হইবে। যাহা পূর্বে বি.পি.ডি.বি.তে চালু ছিল।
৭. কর্মচারীর নিয়োগ চালু করতে হবে। শূন্য পদ থাকলে পদের বিপরীতে কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের জন্য জরুরি ভিত্তিতে শূন্য পদের বিপরীতে কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে ।
৮. ঝুঁকি ভাতা প্রদান।
৯. সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর গ্রাচুইটি সমান হতে হবে যাহা ৩.৫% অনুযায়ী হতে হবে।

Medecins Sans Frontieres

Medical Services Recommendations

1. Establishment of an Occupational Health Department in secondary government healthcare facilities in urban areas where Informal Industries are predominant.
2. Tetanus Vaccination Campaign.
3. Mobile Occupational Health Clinics.
4. First Aid Training and Kit Distribution.
5. Nutritional Programs in Informal Factories for Adolescents and Children.
6. Referral pathways for factory workers to access Sexual and Gender based Violence Services.

Policy Implementation Recommendations

1. Worker Safety Protocols.
2. Creation of a Safety Committee.
3. Implementation of the MoLE program on financial assistance to reduce child labor.
4. Capacity Building Programs for Factory Workers

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (বিটিইউসি) শ্রমজীবীদের পক্ষে শ্রম সংস্কার কমিশনের নিকট ২৭ দফা প্রস্তাবনা

সুপারিশ-১: শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়:

- শ্রম মন্ত্রণালয়ের সকল পর্যায়ে ত্রিপক্ষীয় কাঠামো চালু করার সুপারিশ করছি। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী এবং প্রধান সচিব এর পরই মালিক পক্ষ ও শ্রমিক পক্ষ থেকে একজন করে যুগ্মসচিব করা প্রয়োজন মনে করি(বর্মমানে শ্রম আদলতে এবং মজুরি বোর্ডে মালিক ও শ্রমিক পক্ষ থেকে প্রতিনিধি রাখা হয়েছে)। অনুরূপ ভাবে শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তর, প্রতিটি বিভাগী দফতরে প্রধানের পর মালিক ও শ্রমিক পক্ষ থেকে একজন করে প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি।
- শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় মজুরি, শ্রম অধিকার, মালিকদের সংক্ষমতা, মনিটরিং সেল গঠনসহ শ্রম অসন্তোশ, কলকারখানা বন্ধ হওয়ার কারণ খুজে বাহির করার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করছি।
- শ্রম মন্ত্রণালয়ের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ, কাজে কর্মে গাফলতি, স্বার্থপরতা, ইত্যাদিও বিষয়ের উপর আমরা ন্যায়পাল নিয়োগের সুপারিশ করছি।

সুপারিশ-২: কর্মসংস্থান অধিদপ্তর গঠন:

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রম শক্তিকে আধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা অত্যন্তজরুরি। এ লক্ষ্যে, একটি স্বতন্ত্র কর্মসংস্থান অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করছি, যা বেকার ও শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জন্য দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। এই অধিদপ্তরটি:

- শ্রমজীবী ও বেকারদের জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করবে।
- প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে।
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের উপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের কাঠামো তৈরি করবে।

সুপারিশ-৩: শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা, শ্রম নীতিঃ

- শিল্প ও কলকারখানা, রপ্তানি প্রক্রিয়া অঞ্চল ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলসহ সকল শ্রমজীবীদের আইনগত কাঠামোর মধ্যে রাখার সুপারিশ করছি।
- বর্তমানে সরকার স্বীকৃত ৪৬টি শ্রম সেক্টর রয়েছে। এই সব সেক্টরের বাহিরে নতুন নতুন শ্রম সেক্টর সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের প্রায় ৭.৩ কোটি শ্রমজীবীদের জন্য আগামী ২০ বছরের পরিকল্পনা করে অভিন্ন ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইন, শ্রম বিধিমালা এবং শ্রম নীতি প্রণয়ন করার সুপারিশ করছি।
- প্রাতিষ্ঠানিক, অপাতিষ্ঠানিক, স্ব-কর্মে নিয়োজীত শ্রমিকসহ গৃহ শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক, অটো রিকসা শ্রমিক, বাইক চালক, গিগ শ্রমিক (রাইড শেয়ারিং,প্লাটফম, ই-কর্মাস), চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিক, আউট সোর্সসিং শ্রমিকদের কে শ্রমিক অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ-৪: ট্রেড ইউনিয়নঃ

- শ্রমজীবীদের দেশের সংবিধান, আর্ন্তজাতিক শ্রমমান অনুসারে মুক্ত ভাবে ট্রেড ইউনিয়ন, সংগঠন, সমিতি বা এসোসিয়েশন করার অবাধ ব্যবস্থা থাকতে হবে, করতে দিতে হবে এবং সব বাধা দুর করতে হবে।
- সেক্টরীয়াল ফেডারেশনগুলোকে সেক্টরের কাজের মধ্যে সিমাবদ্ধ রাখার স্যাপারিশ করছি।
- জাতীয় ফেডারেশনগুলোকে কম পক্ষে ৫টি সেক্টরের প্রতিনিত্বি করার যোগ্যতা থাকার বিধান করার সুপারিশ করছি।
- জাতীয় ফেডারেশনগুলোকে বাধ্যগত কনফেডারেশনের আওতায় আনার পদ্ধতী করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ-৫: সামাজিক সংলাপ

- সেক্টর বেইজ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নিয়ে সেক্টরের সমস্যা নিয়ে সরকার, মালিক ও সেক্টরের ফেডারেশন নিয়ে ত্রিমাসিক সামাজিক সংলাপ করার সুপারিশ করছি।
- শ্রমজীবীদের জাতীয় সমস্যা নিয় সরকার মালিক ও জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন নিয়ে অনুরূপ ভাবে সাামজিক সংলাপ করার সুপারিশ করছি।
- অনুরূপ ভাবে দেশের বৃহৎ বা সেক্টরের বৃহৎ গ্রæপ কোম্পানিদের সাথে সামাজিক সংলাপ করার বিধান এর সুপারিশ করছি।
- সংশ্লিষ্ট সেক্টরের সকল সহযোগীদের সাথে সামাজিক সংলাপ করার বিধান করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ ৬:

- **প্রসূতি কল্যাণ ছুটি ও সুবিধা:** দেশের সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এবং সকল কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ০৬ মাস করতে হবে এবং কোনো বৈষম্য করা যাবে না। স্ব নিয়োজীত শ্রমিক এবং যে সব নারী শ্রমজীবী শ্রম আইনের আওতাধীন এখনও নয় সেই সব শ্রমজীবীদের জন্য রাষ্ট্র মাতৃ কল্যাণ ছুটি ও ছুটির সুবিধা নিশ্চিত করবেন। এই সুবিধা বিবেচনায় নেয়ার সময় গ্রামগঞ্জের নারী শ্রমজীবীদের গুরুত্ব দিতে হবে।
- **পিতৃত্বকালীন ছুটি ও সুবিধাঃ** দেশের সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত এবং সকল কলকারনা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত নারী শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের স্ত্রীদের মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকা অবস্থায় এবং তাদের স্ত্রীদের সন্তান জন্মদানের আগে ও পরে ৩০ দিন সমবেতনে পিতৃত্বকালীন ছুটি প্রদান করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ-৭: ডে কেয়ার সেন্টারঃ

- দেশের সকল সেক্টর, সরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রসাশনিক কর্মে নিয়োজিত (পুলিশ, আনসার, থানা, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য) এবং অন্যান্য শ্রমজীবী নারী/পুরুষদের ০৬ বছরের নিচের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার বাধ্যগত ভাবে রাখার সুপারিশ করছি।
- ভবিষ্যতে কলকারখানা, প্রতিষ্ঠান নিবন্ধনের সময় ডে কেয়ার সেন্টার নিশ্চিত করতে নিবন্ধনে শর্ত আরোপ করতে হবে। এছাড়াও শ্রমজীবী নারীদের জন্য ইউনিয়ন, থানা, জেলাসহ শ্রমঘন এলাকায় কমিনিউটি বেইজ ডে কেয়ার সেন্টার চালু করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ৮: শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তিঃ

- শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তিতে শ্রম আদালতের পাশাপাশি বিকল্প শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আরবিটেশন সেল বা আরবিটেশন কমিশন গঠন করার সুপরিশ করছি।
- মামলা নিষ্পত্তি দ্রæত/৯০ দিনের মধ্যে করার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করছি।
- মামলার গুরুত্ব, সংখ্যা এবং বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করার সুপারিশ করছি।
- হঠাৎ করে দেখা দেয়া সৃষ্ঠ শ্রম অসন্তোশ নিরশনের জন্য শ্রমকি প্রতিনিধিদের নিয়ে স্থায়ী ভাবে ভ্রাম্যমান আদালত এবং জরুরি ভাবে করনীয় নির্ধারণ করতে ত্রিপক্ষীয় একটি ক্রাইসি কমিটি গঠনের সুপারিশ করছি।
- এছাড়াও শ্রম বিরোধ সালিশের মাধ্যমে নিষ্পত্তির জন্য প্রতিটি জেলা, থানা শহরে ও ইউনিয়ন পরিষদে শ্রমজীবীদের সালিশ কেন্দ্র পলিসি প্রণয়নসহ চালু করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ৯: ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের জন্য বৈদেশিক তহবিলঃ

ট্রেড ইউনিয়ন গুলোর দেশি-বিদেশি সংগঠন, সংস্থা থেকে বা বিদেশি অনুদান গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত পদ্ধতি শ্রম আইনে বা অন্য কোনো ভাবে অর্ন্তভ, ক্ত বা ব্যবস্থা করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ১০: আইএলও কনভেনশ ও অন্যান্য আর্ন্তজাতিক নীতিসমূহ অনুসমর্থনঃ

- আইএলও এর যে সব কনভেনশন এখনও অনুস্বাক্ষর করা হয় নেই তা স্বাক্ষর করার জন্য সুপারিশ করছি।
- ইউএনজিপি, ডিউডেলিজেন্স, ওইসিডি গাইড লাইন, আরও যে সব আর্ন্তজাতিক পলিসি, এবং সপারিশ রয়েছে তা শ্রমনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা;

সুপারিশ - ১১: মজুরি ও মজুরি বোর্ড

- বাংলাদেশের বর্তমান মজুরি বোর্ডকে মজুরি কমিশনে উন্নœিত করতে সুপারিশ করছি।
- জাতীয় নিম্নতম মজুরি ঘোষণা বাধ্যগত করতে হবে যা জাতীয় মূল্যইস্ফীর সাশে পতি বছর সমন্বয় হবে।
- প্রতিটি সেক্টরে আলাদা আলাদা মজুরি কাঠামো ঘোষণা করতে হবে। সেক্টরের মজুরি কাঠামো কোনো ভাবেই জাতীয় নি¤œতম মজুরি হারের চেয়ে কম হবে না, বেশি হতে পারবে।
- স্ব পেশায় নিয়োজীত শ্রমজবীবীদের উৎপাদিত পন্য, সেবার মজুরি নির্ধারণ করার নীতি প্রণয়নের সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ১২: শ্রমিকদের ডাটা বেইজ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যেমে দেশের সকল সেক্টরের শ্রমজীবীদের সেক্টর অনুসারে ডাটা বেইজ করতে হবে। উক্ত ডাটা বেইজ সেন্টার ডাটাইজের মাধ্যমে সংরক্ষন করার সুপারিশ করছি।
- যে সব শ্রমজীবী এখনও ভ্রাম্যমান, বেকার এবং সেক্টরের আওতাধীন নয় তাদেরকেও ডাটাবেইজের আওতায় আনতে হবে।
- কোনো প্রতিষ্ঠান বা কারখানা নিজস্ব ভাবে ডাটা বেইজ করলেও উক্ত ডাটার নিরাপত্তার জন্য শ্রম মন্ত্রণালয় কর্তৃক পলিলিসি করতে হবে।
- বিজিএমইএ বিকেএমইএসহ ব্যবসায়ী সমিতিসমূহ কোনো ভাবেই সংঘবন্ধ ভাবে ডাটা সংরক্ষন করতে পারবে না বা করতে দেয়া যাবে না এবং বর্তমানে তাদের কাছে রক্ষিত শ্রমজীবীদের ডাটা/তথ্য শ্রমিকের অনুমতি ছাড়া কোনো ভাবেই প্রকাশ করা যাবে, তা বন্ধ করতে হবে এবং তা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিতে হবে।

সুপারিশ - ১৩: বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, উপসনালয় ও যাতায়াত

- প্রতিটি শ্রম সেক্টরে, জেলা শহরে, শ্রমঘন অঞ্চলে শ্রমজীবীদের জন্য স্থায়ী ভাবে কলোনি/বাসস্থান করার সুপারিশ করছি।
- আধুনিক পরিক্ষাগরসহ হাসপাতাল, চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করার সুপারিশ করছি।
- উপসনালয় (সকল পেশার জন্য) করার সুপারিশ করছি।
- প্রি-প্রাইমারি স্কুল, কলেজ ও প্রয়োজনীয় ও সেক্টরবেইজ ভকেশনাল প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করার সুপারিশ করছি।
- শ্রমঘন এলাকায় শ্রমজীবীদের যাতায়াতের জন্য সরকারি বা বেসরকারি উদ্দেগ্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করার সুপারিশ করছি।
- নতুন কলকারখানা/ প্রতিষ্ঠান তৈরি হলে সেখানে সকল শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য ডরমেটরি, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, কমিউনিটি ডে-কেয়ার সেন্টার, সন্তানদের জন্য স্কুল, কলেজ, ধর্মিয় উপশনালয়, খেলার মাঠ ও বিনোদন কেন্দ্র নিশ্চিত করার বিধান চালু করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ১৪: রেশনিং ব্যবস্থা

পিছিয়ে পড়া শ্রমিক, কম মজুরির শ্রমিক, মৌসুমি শ্রমিক, শ্রমজীবীদের জন্য কমমুল্যে প্রয়োজনীয় নিত্য পন্য সামগ্রী রেশনিং পদ্ধতীতে প্রদান করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ১৫: কনফেডারেশনের প্রতিনিধিত্ব

শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শ্রম আদালত, জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটি, ন্যূনতম মজুরি বোর্ডসহ শ্রম মন্ত্রণালয়ে যে সব কমিটি রয়েছে প্রতিটি কমিটিতে কনফেডারেশন এর প্রতিনিধিদেও সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ১৬: শ্রমিক ও শ্রমিকনেতাদের নামে ফৌজদারি মামলা

শ্রমিক ও শ্রমিক নেতাদের নামে ২০১০ সাল থেকে সকল ষড়যন্ত্রমূলক ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। শ্রম অসন্তোষের ঘটনার মামলা দায়েরের মত কিছু ঘটিলে তা শ্রম আদালতে করার বিধান করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ১৭:শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ

- শিল্পসম্পর্ক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি শিল্প এলাকায় শিল্প সম্পর্ক উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করতে হবে। উক্ত কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ভাবে ব্যাচ হিসাবে শিল্প সম্পর্ক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত করতে হবে।
- শ্রম দপ্তরসমূহ থেকে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সশূহের নিবন্ধনকৃত হওয়ার সাথে সাথে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন পরিচলনা বিষসয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থঅ করতে হবে।

সুপারিশ - ১৮: বাধ্যগত শ্রম অধিকার শিক্ষা

পাঠ্যপুস্তাকে ৮ম শ্রেনী থেকে শ্রম অধিকার, মানবধিকার, শিল্প সম্পর্ক উন্নয়নে মালিক শ্রমিকের দায়িত্ব কর্তাব্য সম্পর্কে একটি অধ্যায় যোগ করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ১৯: সামাজিক নিরাপত্তা

বয়স্ক, অক্ষম, অবসরকৃত, পূর্ণ বেকার, খণ্ডকালীন বেকার এবং মৌসুমি শ্রমজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ সাজামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর বলয়ে চালু করার জন্য সুারিশ করছি। যে কোনো মহামারী দেখা দিলে সেই সময় কর্মরত সকল শ্রমজীবীদের জীবন যাপনের ব্যয়ভার বহন করা বিদান চালু করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ২০: নারী শ্রমজীবীদের জন্য উন্নয়ন

শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয়ে কর্তৃক অধিকাহারে নারী কর্মজীবীদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং উচ্চপদে নারী শ্রমজীবীদের পদন্নতিতে প্রয়োজনীয় সুযোগ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার বিধান নিশ্চিৎ করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ২১: শিল্প পুলিশ

দেশের শিল্প এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে শিল্প পুলিশ বিলুপ্তি করে, মালিক-শ্রমিক প্রতিনিধি ও সরকার এর সমন্বয়ে শিল্প সম্পর্ক সেল তৈরি করার সুপারিশ করছি।

সুপরিশ - ২২: অভিবাসী শ্রমজীবীদের অধিকার

- অভিবাসী শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষন বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি শাখা চালু করতে হবে বা রাখতে হবে।
- অভিবাসন প্রক্রিয়ার (দেশে ও দেশের বাহিরে) চেইনে যে সব সমস্যা রয়েছে তা শ্রম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমাধান করার উদ্দ্যেগ নিতে হবে।
- বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোতে অভিবাসি শ্রমিকদের অধিকার, সমস্যা দেখাশুনার জন্য একজন করে লেবার এটাচি শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধিনে থাকতে হবে।
- অভিবাসি শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার শ্রম আইনে নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশ- ২৩: পেশাগত স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, রোগ বালাই

- নিরাপদ কর্মপরিবেশ: শ্রমস্থলে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য নিরাপত্তা সরঞ্জাম নিশ্চিত করা।
- দুর্ঘটনা প্রতিরোধ: ভারী যন্ত্রপাতি পরিচালনার প্রশিক্ষণ, সুরক্ষা পোশাক ও সরঞ্জাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।
- পেশাগত রোগ প্রতিরোধ: রাসায়নিক, ধুলাবালি, শব্দদূষণ বা ভারী কাজের কারণে সৃষ্ট রোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- চিকিৎসা সুবিধা: কর্মক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও হাসপাতাল সেবা সহজলভ্য করা।
- কর্মঘণ্টা ও বিশ্রাম: দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অতিরিক্ত কাজ ও মানসিক চাপে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি কমানোর জন্য উপযুক্ত নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।
- OSH প্রশিক্ষণ: শ্রমিক ও মালিকদের OSH বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া, যাতে তারা ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হন এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন।

সুপারিশ - ২৪: কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরন

কোনো কারণে কর্ম সময়ে কর্মরত শ্রমিক মারা গেলে বা কাজ করতে অক্ষম হলে, পঙ্গু হলে উক্ত শ্রমিকের আমিত্যু ক্ষতিপূরন হিসাবে আইএলও কনভেনশন ১২১ অনুসারে ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ২৫: ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এর কর্মকর্তাদের সামাজিক সুরক্ষা

বাংলাদেশের সকল শ্রমিক ফেডারেশন এর নেতৃবৃন্দদের সামাজিক সুরক্ষা ও কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে শ্রম আইনে সংশোধন করে, কল্যাণমূলক ব্যবস্থা কর্যকর করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ২৬: অটোমেশন/ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় অটোমেশন/ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করবে।
- উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পলিসি প্রণয়ন করা।
- উক্ত ট্রানজিশনের ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণে কর্মরত শ্রমিকদের অথবা তাদের পোষ্য সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক রিস্কেলিং এবং আপস্কেলিং এর আওতাধীন করবে।

- আধুনিক লেটেস্টে কারিকুলামে সর্বশেষ মেশিনারিজের উপর ভিত্তি করে ভোকেশনাল শিক্ষা কেন্দ্র/স্কুল চালু করতে হবে।
- উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রমিক-কর্মচারী বিশেষ করে নারীশ্রমিক এবং বয়স্ক শ্রমিকদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
- অটোমেশন/ চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট সমস্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক ও কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক তহবিল গঠন করার সুপারিশ করছি।

সুপারিশ - ২৭: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠন করবে।
- উক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পলিসি প্রণয়ন করবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি থেকে শিল্প-কারখানা, বাসস্থান, কমিউনিটি, খাল, নদী, কৃষিজমি, মাটি, পানি এবং শ্রমিকের (বিশেষ করে শিশু, নারী এবং বয়স্ক) স্বাস্থ্য রক্ষায় আইন প্রণয়ন করবে।
- শ্রমজীবীদের আভ্যন্তরীন অভিবাসন (ইন্টারনাল মাইগ্রেশন) কমিয়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ শ্রমিক ও কর্মচারীদের ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে বিশেষ অর্থনৈতিক তহবিল গঠন করবে।
- তৈরি পোশাক শিল্প খাতের উৎপাদনের ফলে পরিবেশ (মাটি, পানি ও বায়ু) দূষনের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রেতা প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষতিপূরন আদায়ের জন্য আইন প্রণয়ন করা ও অর্থ আদায়ে দায়িত্বশীল মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব অপর্ণ করার সুপারিশ করছি।

গৃহ শ্রমিকদের বিষয়ে বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র এর সুপারিশ

অবিলম্বে আইএলও সি-১৮৯ এবং সি-১৯০ অনুমোদন করুন

১. বাংলাদেশের শ্রম আইনে গৃহকর্মীদের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির পক্ষে ওকালতি করা
২. গৃহকর্মী এবং অভিবাসী উভয় গৃহকর্মীর জন্য আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করা

গৃহকর্মীদের জন্য আইনি কাঠামো কার্যকর করা

১. বাংলাদেশ শ্রম আইনে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১৫ অন্তর্ভুক্ত করা
২. শ্রমিক এবং নিয়োগকর্তাদের মধ্যে বাধ্যতামূলক কর্মসংস্থান চুক্তি বাস্তবায়ন করা

পর্যবেক্ষণ এবং অভিযোগ প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা

১. কাজের পরিবেশ সঠিক রাখার জন্য পারিবারিক পর্যায়ে শ্রম পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রচলন করা
২. নির্যাতনের সন্মুখীর গৃহকর্মীদের জন্য হটলাইন এবং আইনি সহায়তা কেন্দ্র স্থাপন করা

অভিবাসী গৃহকর্মীদের উন্নত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা

১. বিদেশে নির্যাতনের শিকার কর্মীদের জন্য দুতাবাসের সুরক্ষা ব্যবস্থা জোড়দার করা এবং সেইফ-হাউস এর নিয়মিত মনিটরিং বৃদ্ধি করা
২. শ্রমিকদের শোষণকারী অসাধু নিয়োগ সংস্থাগুলিকে নিষিদ্ধ করা

জনসচেতনতা এবং ডিজিটাল সমাধান

১. কর্মীদের অধিকার এবং আইনি সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য গণসচেতনতামূলক প্রচারণা শুরু করা
২. নিয়োগকর্তাদের এবং সরকারি সংস্থার সাথে কর্মীদের সংযোগ স্থাপনের জন্য মোবাইল অ্যাপ তৈরি এবং ডাটাবেইস তৈরি করা

ট্রেড ইউনিয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রচার করা

১. গৃহকর্মীদের আনুষ্ঠানিক কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের অনুমতি প্রদান
২. স্বাস্থ্য বীমা, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং পেনশন প্রকল্পে অবিগম্যতা নিশ্চিত করা

সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

১. পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ক নতুন আইন ওশ এক্ট প্রণয়ন:

- বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ক বিধি বিধান গুলো অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে যুক্ত শ্রমিকদের জন্য প্রয়োগ করা যায় না।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক নতুন নতুন অনেক শ্রম ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে যেখানে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় আনতে হলে শুধুমাত্র শ্রম আইন যথেষ্ঠ নয়।
- এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হবে দেশের সকল প্রকার শ্রম কে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় বিভিন্ন গ্রেডে ভাগ করা।
- প্রতিটি গ্রেড অনুযায়ী কাজের ঝুঁকি পরিমাপ পদ্ধতি ঠিক করা।
- ঝুঁকি নিরসনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া।
- বর্তমানে বৈশ্বিক জলবায়ুর প্রভাবে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা।
- ওশ এক্ট বাস্তবায়নের জন্য একটি শক্তিশালী কর্তৃপক্ষ গঠন করা।

২. সেক্টর ভিত্তিক সেইফটি গাইড লাইন:

- দেশের বর্তমানে মজুরি বোর্ডের অধীনে ৪৩ টি সেক্টর ঘোষণা করা আছে এই সেক্টরগুলোর প্রতিটির জন্য আলাদা আলাদা সেইফটি গাইড লাইন প্রস্তত করা এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ যথা: কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) থেকে অনুমোদিত হতে হবে।
- মজুরি বোর্ডের বাহিরেও নতুন আরও যে সকল সেক্টর আছে তাদের জন্য আলাদা আলাদ সেইফটি গাইড লাইন তৈরি করা।

- এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সেক্টরের মালিক অ্যাসোসিয়েশনকে বাধ্য করা তাদের অর্ন্তভূক্ত সকল প্রতিষ্ঠানে তাদেন নিজ নিজ সেইফটি গাইড লাইন অনুসরণ করছে কিনা তা মনিটরিং করতে।
- যে সকল সেক্টরে মালিকদের অ্যাসোসিয়েশন নেই সেখানে শ্রমিকদের স্বস্থ্যা নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করে এমন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সহায়তার মাধ্যমে মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করা।

৩. প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক ওশ পলিসি-

- প্রতিটি কারখানা বা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ওশ পলিসি তৈরি করা এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষ যথা: কল-কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (ডাইফ) থেকে অনুমোদিত হতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানে ওশ পলিসি বাস্তবায়নের জন্য একজন ডেডিকেট কর্মকর্তা বা ওশ কর্মকর্তা নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা।
- ওশ পলিসি কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে তা প্রতিবছর যথাযথ কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করা ।

৪. শ্রম আইন ৩৫১ ধারা অনুসারে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতার বাস্তবায়ন:

- শ্রম আইনের ৩৫১ ধারা অনুসারে বিধি প্রণয়নের যে ক্ষমতা আছে সেটাকে পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে আলাদা বিধি তৈরি করা।
- বর্তমানে গিগ ও আউটসোর্সিং এর সাথে যুক্ত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ক আলাদা বিধি বা তফসিল তৈরি করা।
- শ্রম বিধিমালার ৬৮ বিধি তে উল্লেখিত বিপজ্জনক কাজ এর তালিকা হালনাগাত করা।
- পেশাগত ব্যাধির তালিকা সংশোধন করে বর্তমান উপযোগী করা।

৪. পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ক আইএলও কনভেনশন ১৫৫ ও ১৮৭ অনুসমর্থন:

- বর্তমানে আইএলও ১০ টি মৌলিক কনভেনশনের মধ্যে ৮ টি কনভেনশন বাংলাদেশ অনুসমর্থন করেছে কিন্তু পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ক আইএলও কনভেনশণ ১৫৫ ও ১৮৭ অনুসমর্থিত হয়নি তাই অবিলম্বে এই দুটি কনভেনশণ অনুসমর্থন করা প্রয়োজন।
- এই কনভেনশণের আলোকে প্রচলিত আইন কাঠামো প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
- এই কনভেনশণ অনুসমর্থনের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে দেশের বাহিরে কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়টি তুলে ধরতে হবে।
- কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা মান উন্নয়নে পরিদর্শন ব্যবস্থা যুগোপযোগী করা
- শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনের কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ও বিতরণ করা
- শ্রম সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় সকল কাঠামোকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা এবং সকল অংশীজনদের মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান করা।

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

১. শ্রম আইনের আওতা সম্প্রসারণ এবং সঠিক বাস্তবায়ন: বিদ্যমান শ্রম আইনে "শ্রমিক" সংজ্ঞা দেশের তিন-চতুর্থাংশ শ্রমিককে আইনের সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই শ্রম আইনে "শ্রমিক" সংজ্ঞা কে এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন গৃহকর্মী, ব্যক্তি মালিকানার হালকা যানবাহন চালক, পর্যটন কর্মী, রাইড শেয়ার ও সার্ভিস ডেলিভারি কর্মী, ফিলেন্সিং এবং ই-কর্মার্স কর্মী ইত্যাদি প্রতিটি শ্রমিকের অধিকারের সুরক্ষা শ্রম আইন নিশ্চিত করতে পারে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী ১৩, ২৬, ২৭ (৩ক), ১৭৯ ও ১৮০ ধারা সংশোধন করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করা। শ্রম আইন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আইন প্রয়োগের ব্যর্থতায় জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করা। শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করতে হবে। আই.এল.ও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ এর আলোকে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও যৌথ দরকষাকষির চর্চাকে বাধাগ্রস্থকারি ধারাসমূহ বিলুপ্ত করতে হবে। শ্রম আদালতগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করিতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২. ক) ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি ও বাস্তবায়ন: প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক সকল খাতের জন্য আইন করে মালিকানা নির্বিশেষে ন্যূনতম জাতীয় মজুরি নির্ধারণ এবং তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ড সুনির্দিষ্ট করা এবং বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রতিবছর মজুরি সমন্বয়ের সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

খ) শ্রমিকদের খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে- রেশন, আবাসন, হেলথ কার্ড, পেনশন, গ্রাচ্যুইটি ও বেকার ভাতা চালুকরার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি যা শ্রমিকদের জন্য একটি সমন্বিত সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে। সর্বজনীন পেনশন স্কীমে শ্রমজীবীদের অংশগ্রহণ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে যুক্ত করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

৩. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা: কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কর্মস্থলে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত শ্রম আইনের বিধান আই.এল.ও কনভেনশন ১২১ এর আলোকে সংশোধন করা আবশ্যক। কর্মস্থলে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট এলাকায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং কর্মক্ষেত্রে ইনজুরিতে ক্ষতিপূরণ স্কিম, সকল শ্রমিকের জন্য স্বাস্থ্য বিমা ব্যবস্থা চালু করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

৪. পাটকল, চিনিকলসহ বন্ধ সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কল-কারখানা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পুনরায় চালু করা এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপনের সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

৫. ক) শ্রম আইনের বিধান অনুসারে স্থায়ী ধরনের কাজে অস্থায়ী শ্রমিক নিয়োগ করা যায়না। তাই, শ্রম আইনের সাথে সাংঘর্ষিক ২০১৮ সালের আউটসোর্সিং নীতিমালা বাতিল করে, আউটসোর্সিং ও ঠিকাদারের মাধ্যমে নিযুক্ত শ্রমিকদের স্থায়ী নিয়োগ নিশ্চিত করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

খ) চুক্তি ভিত্তিক বা ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগকৃত শ্রমিকদের সমপদের স্থায়ী শ্রমিকদের চেয়ে কম সুবিধা প্রদান করার বিষয়ে নিষেধ করা হলেও শ্রম আইনে অতিরিক্ত সময়ের কাজের মজুরি কিংবা চাকরির অবসান সুবিধার বিষয়ে চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিকদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। তাই, চুক্তি ভিত্তিক শ্রমিকদের কাজের নিরাপত্তা, নিয়োগপত্র প্রদান এবং চাকরির অবসান সুবিধাসহ অন্যান্য শ্রমিকদের মতো সমান সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

৬. শ্রমিক ইউনিয়নের অধিকার: স্থিতিশিল ও ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক বিকাশে শ্রমিকদের স্বাধীন ভাবে ও সমক্ষমতায় দরকষাকষির সক্ষমতা নিশ্চিত করা জরুরি। ফলে, স্বাধীনভাবে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন ও কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করতে দুর্নীতি , হুমকি, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ সকল বাধা দুর করে আই.এল.ও কনভেনশন ৮৭ ও ৯৮ অনুসারে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পরিবেশ সৃষ্টি করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

৭. নারী শ্রমিকদের অধিকার: দেশে মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। কিন্তু শ্রমক্ষেত্রে এবং নীতি নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ আনুপাতিক হারে কম। নারীর মাতৃত্ব কোনো ব্যক্তিগত দায় নয় বরং সামাজিক দায়িত্ব। তাই, সকল শ্রমজীবী মায়ের জন্য ছয়মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি ও সুবিধা নিশ্চিত করার উপায় নির্ধারণ করা জরুরি। নারীর জন্য নিরাপদ ও হয়রানিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে শ্রম আইনে সুনির্দিষ্ট প্রবিধান যুক্ত করা প্রয়োজন।

৮. প্রবাসী শ্রমিকদের সুরক্ষা: বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রধান উৎস প্রবাসী শ্রমিকের পাঠানো রেমিটেন্স। অথচ, বাংলাদেশের শ্রমিকদের প্রবাসগমন ব্যয় অনেক বেশি। আবার প্রবাসে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা কিংবা দেশে তাদের মর্যদা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতে রাষ্ট্রের উদ্যোগ অনুপস্থিত। আমরা মনেকরি, প্রতিটি নাগরিকের জন্য মর্যদাকর কাজের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্বের অংশ হিসাবে প্রবাস গমন ইচ্ছুক প্রত্যেক শ্রমিকের রাষ্ট্রীয় খরচে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, অভিবাসন ব্যয় কমানো, অভিবাসন ব্যয় বহনে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা, প্রবাসে শ্রমিকের এবং প্রবাসী শ্রমিকের পরিবারের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা জরুরি। পাশাপাশি বিদেশ প্রত্যাগত শ্রমিকদের দক্ষতা অনুসারে কর্মসংস্থান, প্রবাসী শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার এবং মধ্যস্বত্তভোগীদের দৌরাত্ম বন্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

৯. ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব: শ্রমজীবী মানুষ সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের প্রতিটি পর্যায়ে শ্রমিকদের মতামত প্রদানের সুযোগ ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

১০. অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের সুরক্ষা: তাঁত, বাঁশ তালাই,পাদুকা, জড়ি-টুইস্টিং, মটর মেকানিক, ব্যক্তি মালিকানাধীন হালকা যানবাহন চালক, পর্যটন কর্মীসহ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে যা করা প্রয়োজনক) পাদুকা শিল্পের শ্রমিকদের কাজের মজুরি নির্ধারণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে পদক্ষেপ ও আইডি কার্ড প্রদান করা, পাদুকা শ্রমিকদের কাজের নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ করা, সকল হাসপাতালে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা, আবাসনের জন্য সরকারি খাস জমি বরাদ্দ করা, সকল ধরনের হয়রানী ও নির্যাতন বন্ধ এবং দেশীয় পাদুকা শিল্প রক্ষায় বিদেশি নিম্ন পাদুকা আমদানি নিষিদ্ধ করা।

খ) বাঁশ তালাই একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যগত শিল্প। প্লাষ্টিক পণ্যের সহজলভ্যতা তাদের কর্মক্ষেত্রকে সংকুচিত করেছিল। পরিবেশ বান্ধব পণ্যের ব্যবহারের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠায় প্রাকৃতিক তন্তু ভিত্তিক পণ্যের চাহিদা বাড়লেও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে অদক্ষতার কারণে বাঁশ তালাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হচ্ছে। প্রাচীন ও ঐতিহ্যগত শিল্প শ্রমিকদের সুরক্ষায় প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন এবং তাদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে রেশনিং, আবাসনে খাস জমি বরাদ্দ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা দরকার।

গ) জড়ি ও টুইস্টিং শ্রমিকদের পেশাগত রোগের বিশেষত নাক, কান, গলা ও বক্ষব্যাধির নিয়মিত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার নিয়োগ দেয়া। জড়ি ও টুইস্টিং শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় প্রাণহানী বা অঙ্গহানীতে ক্ষতিগ্রস্থদের আজীবন আয়ের মানদন্ডে ক্ষতিপূরণ প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। নিত্যপণ্যের বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে মজুরি নির্ধারণ, উৎসব বোনাস প্রদানসহ শ্রম আইনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঘ) ব্যক্তি মালিকানাধীন হালকা যানবাহন চালকদের শ্রম আইনের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে তাদের জন্য নিয়োগপত্র-পরিচয়পত্র প্রদান, চাকরি অবসানের সুবিধা, পরিবহণ শ্রমিক কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে আবেদনসহ শ্রম অধিকার প্রশ্নে ড্রাইভিং লাইসেন্স কে পরিচয় পত্র হতে বিবেচনা করতে হবে।

ঙ) সারাদেশে পর্যটনের ১২টি উপখাতে প্রায় ৪০ লক্ষ কর্মী কাজ করলেও হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ২টি উপখাত ব্যতীত অন্য খাতের শ্রমিকদের শ্রম আইনে স্বীকৃতি নেই। পর্যটন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হওয়া স্বত্তে¡ও বেসামরিক বিমান চলাচলের সাথে যুক্ত থাকায় পর্যটন খাত প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পাচ্ছেনা। ফলে পর্যটন শিল্পের বিকাশ এবং পর্যটন কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে স্বতন্ত্র পর্যটন মন্ত্রণালয় গঠন এবং পর্যটনের প্রতিটি উপখাতের কর্মীদের শ্রম আইনের আওতায় নিম্নতম মজুরিসহ সকল শ্রম অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করছি।

চ) রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান করতে না পারায় দরিদ্র বেকার জনগোষ্টির একটি বড় অংশ জীবন ধারণের জন্য রিকশা চালানোর মত অমানবিক ও কষ্টকর পেশায় নিয়োজিত। তাদের এই প্রায় ৬০ লক্ষাধিক শ্রমিক যার উপর প্রায় আড়াই কোটি মানুষ নির্ভরশীল সেই ব্যটারীচালিত রিকশা, ইজিবাইক চালকদের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে নিবন্ধন ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার মাধ্যমে চাঁদাবাজী ও নিপিড়ন থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা জরুরি।

ছ) নিরাপত্তা সামগ্রীর অপ্রতুলতা, সরবরাহ ও ব্যবহারে অনিহা এবং নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারে অদক্ষতা কাঠ ও নির্মাণ শিল্পে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় জীবন বা অঙ্গহানীর মাত্রা আশঙ্কাজনক। নিয়মিত কাজের অভাব, নি¤œমজুরির কারণে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নগর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ খূমিকা পালনকারি নির্মাণ শ্রমিকদের বর্তমান দিন কাটাতে হয় অর্ধাহার আর অপুষ্টিতে, ভবিষ্যৎ কাটাতে হয় অনিশ্চয়তায়। নির্মাণ শ্রমিকদের খাদ্য নিরাপত্তায় রেশনিং, 'নির্মাণ ও কাঠ' শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য 'নিম্নতম মজুরি বোর্ড' কর্তৃক নির্ধারিত মজুরি হার কার্যকর করা, জাতীয়ভাবে রেজিষ্ট্রেশনের ব্যবস্থা করে প্রত্যেক শ্রমিককে নির্মাণ শ্রমিক আইডি কার্ড প্রদান, রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নির্দিষ্ট বয়সের পর পেনশনের ব্যবস্থা, চিকিৎসা কার্ড দিয়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা নিরাপত্তার আওতায় আনতে হবে। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থশ্রমিকদের আজীবন আয়ের মানদন্ডে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান এবং উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

জ) মটর ওয়ার্কসপ মেকানিকরা সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। অথচ তাদের নিরাপত্তাহীন বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত হয়। নেই কর্মঘন্টা, নেই শ্রমিক হিসাবে পরিচয়, নেই ছুটি কিংবা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় ক্ষতিপূরণ। তাই মেকানিকদের জন্য পরিবর্তিত প্রযুক্তির সাথে পরিচিতকরণের প্রশিক্ষণ, সরকারি খাস জমিতে জেলায় জেলায় মেকানিক পল্লি গড়ে তোলা, মেকানিকদের সাধারণ কর্মঘণ্টা ৮ ঘণ্টা, নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, হেলথ কার্ড, রেশন এবং কর্মক্ষেত্রে দুর্গটনায় ক্ষতিগ্রস্থহলে আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ প্রদান, স্বস্থ্য সম্মত কর্মপরিবেশ এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠন প্রক্রিয়া সহজ করার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

ঝ) রি-রোলিং মিল নামে মিল হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শ্রম খাতের কোনো চর্চা রি-রোলিং সেক্টরে নেই। মজুরির জন্য এসে জীবনহানী আর পঙ্গুত্ব নিত্যসঙ্গি। এটা এমন একটি শিল্প যেখানে খাতা-কলমে আইনভুক্ত প্রতিষ্ঠান হলেও নেই শ্রম আইনের কোনো বাস্তবায়ন ,নেই কোনো জবাবদিহিতা। স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হওয়া স্বত্তে¡ও শুধু শ্রমিকের দায়িত্ব অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে তথাকথিত ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের কৌশল ব্যবহার করা হয়। রি-রোলিং শ্রমিকরা তাদের সুরক্ষায় নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, সার্ভিস বুক, পে ি◌অপ প্রদানসহ শ্রম আইন বাস্তবায়ন এবং এক্ষেত্রে ব্যর্থতায় কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং স্থায়ী কাজে ঠিকাদারের মাধ্যমে শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ বন্ধ, শ্রমিকের পাওনা পরিশোধে প্রয়োজনে মালিকের ব্যাক্তিগত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার

সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

১১. গার্মেন্টস, টেক্সটাইল, রি-রোলিং, ফার্মাসিউটিক্যালস, বেসরকারি পাটকলসহ সকল প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় শ্রমিক স্বার্থ বিরোধি সকল অপকৌশল বন্ধ, শ্রমিকদের চাকরি অবসানে প্রাপ্য সুবিধা কমিয়ে চুক্তি করার সুযোগ বন্ধ ও শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধে অনিয়মে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনা, কারখানা পরিচালনায় ট্রেড ইউনিয়নের অংশগ্রহণের সুযোগ রাখার সুপারিশ প্রত্যাশা করছি।

বিজিএমইএ এর প্রস্তাবনা

(১) মালিকদের ট্রেড ইউনিয়ন ভীতি দূর করতে কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়

বিজিএমইএ সুস্থ ধারার ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে বিশ্বাসী। কারখানাতে সমস্যা থাকতেই পারে। সেজন্য কাজ বন্ধ রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত করে রাস্তা অবরোধ করা সংস্কৃতি থেকে শ্রমিক কর্মচারীকে বেরিয়ে আসতে হবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে বিজিএমইএ মনে করে।

- ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে কারখানার সকল শ্রমিকদের অবস্থা ভাজন হতে হবে।
- তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যাতে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি হয়।
- বর্তমানে গঠিত রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন সমূহকে কার্যকর ও অর্থবহ করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা।
- বর্তমানে রেজিস্টার ট্রেড ইউনিয়ন সমূহকে কার্যকর ও অর্থবহ করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া অবলম্বন করা
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করা এবং দেশে বিদ্যমান শিল্প সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।
- প্রতিটি ট্রেড ইউনিয়নে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন প্রতিনিধি থাকবে। যারা প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থ বিবেচনা করবে।
- ইউনিয়ন গঠনে শ্রমিকের সমর্থন শতকরা হার যাতে ২০% এর চেয়ে কম কমানো না হয়। কারণ সমর্থন কমানো হলে শ্রমিকদের একটা বড় অংশ ইউনিয়নের বাইরে থেকে যায়। ফলে ইউনিয়ন বনাম নন-ইউনিয়নের শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিবে এবং অসন্তোষ বৃদ্ধি পাবে।

(২) শ্রমিক ফেডারেশনসমূহের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ

- প্রতিটি ফেডারেশনকে যার জবাবদিহিতার মধ্যে আনা।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় যে, একই ব্যক্তি ফেডারেশনের জন্মলগ্ন থেকে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পদে বিদ্যমান। এ প্রথা থেকে বেরিয়ে এসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধি নির্ধারণ করতে হবে। যারা শিল্প সেক্টর ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থের সম্পর্ক কে জ্ঞাত থাকবে।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব তৈরি করা এবং দেশে বিদ্যমান শ্রম আইন ও শিল্প সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।
- লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, একজন ফেডারেশন সভাপতি বা সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক জন্ম লগ্ন থেকে একই পদে বহাল রয়েছে। এই পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে এসে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে। যারা প্রতিষ্ঠান ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থ বিবেচনা করবে।
- একটি প্রতিষ্ঠানের শিল্প সম্পর্ক বিষয়ে বা যেকোনো ধরনের অসন্তোষ নিরসনে একটি মাত্র ফেডারেশন প্রতিনিধিত্ব করবে।

(৩) ইউনিফাইড কোড অফ কন্ডাক্ট

- পোশাক শিল্পে বিভিন্ন বায়ার কাজের অর্ডার দিয়ে থাকে। প্রতিটি বায়ার আলাদা আলাদা কোড অফ কন্ডাক্ট ফলো করে। এতে করে একজন মালিক যদি ১৫/২০ টা বায়ারের কাজ করে তাহলে তাকে ১৫/২০ টা কোড ফলো করতে হয় এবং সে মোতাবেক অডিটের সম্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন অর্থের অপচয় অন্যদিকে সময়ের অপচয়। প্রতিষ্ঠানকে প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনো অডিটরের অডিটের সম্মুখীন হতে হচ্ছে।
- বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য "একটি ইউনিফাইড কোড অফ কন্ডাক্ট" তৈরি করা যাতে সকল বায়ার এটি ফলো করবে এবং যেকোনো একজন অডিটর অডিট করলে অন্যান্য অডিটরগণ দ্বিতীয়বার আর অডিট না করে কাজের অর্ডার দিবে।

(৪) বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি

- বিজিএমইএ ১৯৯৮ সাল থেকে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতি পরিচালনা করে আসছে। যদিও এই পদ্ধতির ভালো ফলের পাশাপাশি মন্দ দিকও রয়েছে। তথাপি শ্রমিকদের পাওনা ও অন্যান্য অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি ফোরাম রয়েছে, যাতে শ্রমিক কর্মচারীগণ উপকৃত হন।
- আদালতের বাইরে শ্রমিকদের আর্থিক খরচ না করে কীভাবে তাদের অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা যায় তার জন্য "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি" আইনে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- "বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি" - এর জন্য একটি স্বতন্ত্র বডি থাকতে পারে। যারা নিষ্পত্তিতে অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য সম্মানী ভাতার ব্যবস্থা করা।
- যে সকল শ্রমিক প্রতিনিধি শ্রমিকদের পক্ষে অভিযোগ দাখিল করবে তারা যেন শ্রমিকদের নিকট থেকে কোনো অর্থ গ্রহণ না করে সে বিষয়টি লক্ষ্য রেখে শ্রমিক প্রতিনিধিদের জন্য অন্যভাবে সম্মানির ব্যবস্থা করা।

(৫) পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন শ্রম আইন পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন

- শ্রম আইন বাস্তবায়ন করা মালিকপক্ষের যেমন দায়িত্ব তেমন শ্রমিকেরও দায়িত্ব রয়েছে। তবে আইনের কোনো ধারার বিষয়ে কোনো পক্ষে পক্ষের আপত্তি থাকলে তা সরকারের নিকট থেকে মতামত নেয়া বা প্রয়োজনে আইনে উক্ত ধারা সংশোধনের পদক্ষেপ নেয়া।
- লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোনো শ্রমিক অসদাচরণের দায়ে মালিক আইনের বিধান মোতাবেক (শ্রম আইনের ২৩ (৪) ধারা) কারণ দর্শানো নোটিস জারি করলে শ্রমিক তা গ্রহণ না করে অন্যান্য শ্রমিকদের সহযোগিতায় কারখানার কাজ বন্ধ, ভাংচুর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে মালিকপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে।
- অবৈধ ধর্মঘটের কারণে কারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রম আইনের ১৩ (১) ধারা মোতাবে কারখানা বন্ধ করলে শ্রমিকগণ উচ্ছৃংখল বা ভাঙচুর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রাস্তা অবরোধ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হয়ে মালিক পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে।
- শ্রম আইনের ১২৪ক ধারার বিধান মোতাবেক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরে সভা আহ্বান করা হলে শ্রমিকগণ অফিস অবরোধ করে চাপ সৃষ্টি করে আইনের চেয়ে অধিকতর সুবিধা আদায় করছে। উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে মালিক সর্বশ্রান্ত হচ্ছে, বিনিয়োগ তথা কর্মসংস্থান বন্ধ হচ্ছে, নতুন উদ্যোক্তা আসতে ভয় পাচ্ছে।

(৬) শ্রমিক ও শ্রমিকবৃন্দের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বিষয়ক

কারখানাতে বেতন ভাতা সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও যদি শ্রমিক বা শ্রমিক নেতৃবৃন্দের ইন্দনে কারখানাতে কাজ বন্ধ, অগ্নি-সংযোগ, ভাংচুর, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লুটতরাজ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের কারণে কারখানা কর্তৃপক্ষ মামলা দায়ের করলে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ প্রয়োগ করে থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রস্তাবনাঃ

- সরকারের ত্রিপক্ষীয় কমিটি থাকবে, যেখানে এ সকল মামলা সমূহ প্রয়োজনীয় তদন্ত সাপেক্ষে কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ঘটনার সত্যতা থাকলে মামলা চলবে ও সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে এবং সত্যতা পাওয়া না গেলে মালিকপক্ষ নিজ দায়িত্বে প্রত্যাহার করবে।

(৭) কাজ বন্ধ করে শ্রম ও আইন বহির্ভূত দাবি উত্থাপন

শ্রমিকগণ উৎপাদন কাজ বন্ধ করে শ্রম আইনের বাইরে অযৌক্তিক দাবি উত্থাপন করে। যেমন-

- কোনো প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ হঠাৎ কাজ বন্ধ করে বসে থাকে। একপর্যায়ে বলে আমাদের দাবি আছে। কি দাবি- জিএম, পিএম, আইই, এডমিন, এইচআর চাইনা। হাজিরা বোনাস, টিফিন বিল, লাঞ্চ বিল বাড়াতে হবে। ইত্যাদি দাবি না মানা পর্যন্ত কাজ বন্ধ করে রাখে।
- শ্রমিকগণ নিজেরা কারখানা ছুটি ঘোষণা করে সাইরেন বাজিয়ে কারখানা ছেড়ে চলে যায়।
- এক্ষেত্রে মালিক অসহায় হয়ে পড়ে। দাবি না মানলে মালিককে কারখানাতে আটক করে রাখে। এমনকি মালিককে মারধর করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এক্ষেত্রে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

(৮) শ্রমিকদের অভিযোগ দায়ের করার ক্ষেত্রে শ্রমিক নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

- শ্রমিক ফেডারেশনের কতিপয় নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের অভিযোগ একই সময়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, বিজিএমইএতে অভিযোগ দায়েরের পাশাপাশি আরএসসি, এসিটি, ডব্লিউআরসি এবং বায়ারদের নিকট মেইল করে। এতে কারখানার মালিক বিভিন্ন দিক থেকে চাপে পড়ে। ক্ষেত্রবিশেষে কাজের অর্ডার বাতিল হয়। এতে করে একদিকে যেমন কারখানা বন্ধ হয় অন্যদিকে শ্রমিক বেকার হয়।
- শ্রমিকের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করার পরও শ্রমিক নেতার মনোপুত না হলে মালিক কে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক নেতাগণ এহেন কাজ করে থাকে। তাকে আলাদাভাবে সন্তুষ্ট করা না হলে সমস্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।
- যেকোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর বা বিজিএমইতে সভার আয়োজন করা হলে ৪০/৫০টি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ বা কর্মী সভায় উপস্থিত হয়। উপস্থিত শ্রমিক নেতাকে সভায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দেয়া হলে সেই নেতা শ্রমিকদের ইন্ধন দিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করে।
- অনেক ক্ষেত্রে নিষ্পত্তির জন্য আলোচনায় বসলে ৪০০/৫০০ শ্রমিক বাইরে অবস্থান করে। এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত শ্রমিকের মনঃপুত না হলে সকলকে অবরোধ করে রাখে। পরবর্তীতে তাদের চাপে নতি স্বীকার করতে হয়।
- এ অবস্থার অবসান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় মালিকপক্ষকে প্রতিষ্ঠান চালু রাখা দুরূহ হয় পড়বে। নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে না। এমনকি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে অনীহা প্রকাশ করবে। এতে সমাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে।

(৯) কারখানাতে গঠিত সমন্বয়ক

- ৫ আগস্টের পর কতিপয় কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে সমন্বয়ক সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত সমন্বয়কদের নির্দেশ মতে সকল শ্রমিক পরিচালিত হচ্ছে।
- সমন্বয়কগণ নিজেরা সিদ্ধান্ত নিয়ে মালিকপক্ষের উপর সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছে। যখন ইচ্ছা কাজ করছে, যখন ইচ্ছা বের হয়ে যাচ্ছে।

- তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলে কারখানার কাজ বন্ধ এবং শ্রম অসন্তোষ সৃষ্টি করছে।
- তাদের কারণে অসদাচরণের অভিযোগ কাউকে কারণ-দর্শানো নোটিস জারি করা যাচ্ছে না।
- কোনো শ্রমিককে নিয়ম মোতাবেক টার্মিনেশন করা হলে তাদের ফেরৎ নেয়ার জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা হচ্ছে।

ইউনিভার্সাল পেনশন স্কিম সম্পর্কিত বাংলাদেশ লেবার ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ এর সুপারিশ

১. শ্রমিকদের তথ্য সংক্রান্ত একটা ডাটাবেইস তৈরি করতে হবে, যেখানে তাদের নিজস্ব ইউনিক আইডি / নাম্বার থাকবে যার সাথে পেনশন অ্যাকাউন্টের সমন্বয় থাকবে। চাকরির নিরাপত্তা এবং ন্যায্য বেতন নিশ্চিত করতে হবে, যার মাধ্যমে এই পেনশন স্কিম পরিচালনায় কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয়।
২. নুন্যতম ১০ বছর একাধারে প্রিমিয়াম প্রদান করা শ্রমিকের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, তাই নুন্যতম সময়ের সময়কাল কমাতে হবে।
৩. শ্রমিক যে স্কিমে সংযুক্ত হবে, সেই স্কিমের প্রিমিয়াম প্রদানের টাকায় সরকার, মালিক এবং শ্রমিক সকলের অংশগ্রহণ থাকতে হবে।
৪. শ্রমিকদের জন্যে প্রিমিয়ামের টাকার পরিমাণ বেশি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের টাকার পরিমাণ কমাতে হবে।
৫. স্কিমে নমিনির বিষয়টা বর্তমানে যেভাবে আছে তা আরও সুস্পষ্ট করতে হবে, নমিনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সহজীকরণ ও শ্রমিকের মৃত্যুতে স্কিম থেকে প্রাপ্ত টাকা নিয়ে পরিবারের সদস্যবৃন্দের মধ্যে যেন বিরোধ তৈরি না হয় সেক্ষেত্রে নিমিনির শর্তাবলি আরও পরিস্কার ও সুস্পষ্ট করতে হবে।
৬. এই স্কিম কে বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করতে জাতীয়ভাবে (সংবাদপত্র, মিডিয়া ও গণমাধ্যমে) প্রচারণা ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।
৭. শ্রমিকদের আস্থা এবং বিশ্বাস অর্জনে পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিতে হবে ও মাঠ পর্যায়ে প্রচারণা করতে হবে।
৮. শ্রমিকদের জন্যে পেনশন পাবার বয়স ৬০ বছর পরিবর্তন করে এটা কমানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
৯. সরকারি সকল সামাজিক নিরাপত্তা স্কিম এর সাথে এই পেনশন স্কিমের সমন্বয় করা যেগে পারে।
১০. অন্যান্য দেশ থেকে তাদের পেনশন ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা/ভাল ও দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ/ নীতিগুলো যা আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সেইসকল ধারণার প্রতিফলন পেনশন স্কিমে আনতে হবে।

শ্রম অধিদপ্তর

১. বাংলাদেশ শ্রম আইন, বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন, শ্রম বিধিমালাসহ শ্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন, বিধি সংশোধন, বিধিমালা প্রণয়ন এবং আইন ও বিধি'তে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তরসমূহের মধ্যে কাজের ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে জনবলের সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
২. শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের উল্লিখিত কার্যক্রমের স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদান।

- শ্রম ও কর্মস্থান মন্ত্রণালয় সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত অধিশাখা স্থাপন করা;
- শ্রম অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয় ও এর অধীনস্থ বিভাগীয় ও আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরসমূহের সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত শাখা স্থাপন করা;
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন, কেন্দ্রীয় তহবিল, চা বাগান ভবিষ্য তহবিল, ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল, রপ্তানিমুখী শিল্পে পিছিয়ে পড়া কর্মহীন ও দুস্থ শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রদত্ত তহবিল ইত্যাদিকে নিয়ে 'শ্রম ব্যাংক প্রতিষ্ঠা' করা।
- বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং বিভাগীয় ও আঞ্চলিক সুবিধাভোগী বাছাই কমিটি গঠনের মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যক্রমকে ত্বরান্বিতকরণ;
- শিল্প পরিসংখ্যান আইন ১৯৪২ ও বিধিমালা ১৯৬২ সংশোধন করে আধুনিক করার মাধ্যমে অদক্ষ, আধা দক্ষ ও দক্ষ শ্রমিকের ডাটাবেইজ প্রণয়ন এবং শ্রমিক পরিচয় নম্বর (এলআইডিএন) সম্বলিত 'শ্রমিক প্রচলন' করার মাধ্যমে শ্রমিকের রেশনিং, স্বল্পমূল্যে পন্যসামগ্রী বিতরণসহ নানাবিধ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর আওতায় আনয়ন;

৩. শ্রম অসন্তোষ নিরসনের পাশাপাশি প্রতিরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ।
৪. শ্রম প্রশাসনকে যুগোপযোগী ও শক্তিশালীকরণে বিসিএস (শ্রম) ক্যাডার সৃজন।
৫. নতুন অফিস প্রতিষ্ঠাকরণ ও সাংগঠনিক কাঠামো সংস্কার।
৬. দপ্তরসমূহের মধ্যে কাজের ভারসাম্য আনয়নের মাধ্যমে জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতের দাবি।
৭. বিভিন্ন আইনকে যুগোপযোগী করার প্রস্তাব।
৮. শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রদানের প্রস্তাব।
৯. শ্রমিকদের স্থায়ী ডেটাবেজ তৈরির প্রস্তাব।

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সমূহ

১. নতুন অফিস প্রতিষ্ঠাকরণ ও সাংগঠনিক সংস্কার।
২. দাপ্তরিক/ প্রশাসনিক সংস্কার।
৩. অবকাঠামোগত সংস্কার।
৪. শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের নাম ও ৬ষ্ঠ গ্রেডের পদের পদবির নাম পরিবর্তন।
৫. প্রশিক্ষণ সেবা কর্যক্রমের সংস্কার।
৬. বিনোদন সেবা কর্যক্রমের সংস্কার।
৭. যানবাহন সুবিধা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ।

৮. পেশাগত সংস্কার।

Industrial Relations Institute (IRI)

১. প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামের যুগোপযোগী নামকরণ।
২. বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন।
৩. প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও মডিউল ডেভেলপমেন্ট।
৪. প্রশিক্ষণ ভাতা অনলাইন পেমেন্ট প্রদান।
৫. প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতাসহ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত অন্যান্য খাতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
৬. বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা।
৭. প্রশিক্ষণ কোর্সটি সকলের জন্য উন্মুক্তকরণ ও চাকর বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্তকরণ।
৮. আধুনিক অডিও ভিজ্যুয়াল স্টুডিও ও সম্প্রচার ব্যবস্থা স্থাপনা।
৯. ট্রেনিং পোগ্রাম ও পদ্ধতিতে সংস্কার ও সংযোজন।
১০. আইআরআই এর জনবল কাঠামোয় সংস্কার।
১১. পদ বিন্যাস সংস্কার।
১২. আইআরআই এর অবকাঠামোগত সংস্কার, উন্নয়ন ও প্রতি বিভাগে আইআরআই স্থাপন।
১৩. মহিলা ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য (প্রতিবন্ধী সুবিধাসহ) পৃথক আধুনিক হোস্টেল ভবন নির্মাণ।
১৪. বর্তমান প্রশিক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত সমস্যাসংকুল পরিবেশে এর দ্রুত সংস্কার।
১৫. লজিস্টিক সাপোর্ট।
১৬. প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেক্টরে কর্মরত সুবিধা বঞ্চিত শ্রমিকদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।
১৭. বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি।
১৮. প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে বিদ্যমান আইনে প্রয়োজনীয় সংস্কার
১৯. আইআরআইকে মামলা দায়েরের ক্ষমতা প্রদান
২০. প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন।

Comprehensive Recommendations for Inclusive Labour Law Reform – Bangladesh Institute of Labour Studies

Applicability of Labour Law:

- It is recommended to expand the applicability of BLA not creating any exception, especially in case of for informal workers. BLA is the core legislation that regulates the labour issues in Bangladesh. This should be universally applicable for all the workers without discrimination.

Definition of workers:

- BLA provided definition of worker is narrow considering the international standard and also discriminatory in case of securing the rights of the worker. Therefore, the definition of workers should be expanded. Moreover, inclusion of administrative, supervisory and managerial staff is required in order to provide universal protection.
- With expanding the current definition of worker, other definition like self-employed worker, platform worker etc., should be added in the BLA for securing their rights under BLA.

Appointment Letter & ID Card:

- It is mandatory for every employer to provide appointment letter and identity card for all workers employed under him. However, this is not in practice in informal section. Specific amendment should be made to follow this provision for all workers.
- A system can be introduced nationally to preserve worker's information. This database could preserve basic information of the workers along with the employment history. Anyone who is eligible to enter into labour force can be registered here which will provide a unique identification number for each worker. This unique identification number can be used for the purpose of claiming insurance, compensation, benefit and forming association.

Elimination of Child Labour:

- BLA prohibits child labour but the age limit provided in the Act is not of international standard. Amendment required for the specified age to reach global standard.
- The fine stated in Act is only 5 thousand Taka for employing a child. Therefore, it is recommended to increase the fine to 25 thousand from 5 thousand Taka as a penalty of employing child/adolescent worker.
- Although BLA prohibits child labour but in reality, children are employed in work and employing child is a common practice in informal sector. Therefore, expanding the BLA coverage at the same time stronger inspection is fundamental eliminate child labour.

Prohibition of forced Labour:

- BLA does not provide specific definition for forced or compulsory labour, thus, to abolish force or compulsory labour legislative acknowledgement is necessary, therefore, definition of forced or compulsory labour should be included.
- Moreover, provision should also be included that on one can be employed in any work against his/her will and no person shall engage any worker in forced or compulsory labour.
- No person shall assist in the employment or use of any other person in forced or compulsory labour.
- Scope of systematic forced labour needs to be removed. Compelling to perform extra hours of duty against the global standard should be removed.

Termination:

- It is recommended that Section 26 should be repealed from BLA, as section 26 allows employers to terminate any permanent or temporary workers without any reason and it is against the natural justice. It also creates opportunity to employer to misuse this provision.
- It is also recommended to repeal the section 27(3A) as it has adversely affected workers. This provision is unjust and unfair to workers.

Wage Protection:

- National Minimum Wage for all worker need to be declared for covering all worker employed in the country under umbrella of minimum wage protection.
- Wage shall be paid within prescribed time. However, in case of failing to pay due wage in time, interest can be added for each day of delay.
- If workers are not paid within time, they should have the right to stop working and such stoppage of work cannot consider as illegal strike.
- Employer should be criminally liable if wage is not paid for more than two months.
- A system of wage insurance should be added for the insolvency of the employer so that the worker's right to get timely wage remains protected.

Maternity Leave and Benefit:

- For eradication discrimination between female public servant and other female worker, it is recommended to increase the maternity leave from 112 days (16 weeks) to 180 days as given to the female public servant with 90 days granted before and 90 days after the delivery of the child.
- Moreover, provision for paternity leave should be included.

Trade Union Formation:

- Currently administrative, supervisory and managerial staff cannot join or form trade union of workers as they are excluded from the definition of worker. For the purpose of forming TU, these workers should be able to form separate association for securing their rights in the workplace.
- In order to register TU total number of worker employed in an establishment is required but procuring this information from the management is not easy. There provision should be added in BLA that if any worker of an establishment requests a certification from the management authority regarding the number of workers employed in that establishment, the said information must be provided within 10 (ten) working days.
- It mandatory to provide personal information of the TU members for registration which exposes themselves to retaliation. Therefore, provision should be added that no personal information of the trade union members submitted to the Registrar under Section 178 shall be disclosed to any third party, including the employer.
- The tenure of the officers of a trade union in an establishment be extended to 3 years from 2 years, and since the section does not currently address federations or groups of establishments, it is further recommended to include that in the case of a federation of establishments, the tenure of the officers shall not exceed 3 (three) years.
- It is recommended that the number of officers, as prescribed by rules, shall be a minimum of 5 (five) and a maximum of 75 (seventy-five).
- It is currently stated that no trade union of workers shall be entitled to registration under this Chapter unless it has at least 20% of the total number of workers employed in the establishment where it is formed. However, it is recommended that this requirement be amended to a minimum number of 20 workers—instead of 20% of the total workers.
- Moreover, currently more than 3 TU can be registered in an establishment. This provision should be repealed.

- Speedy online system of registration is necessary, the existing procedure of online registration needs correction. Provision for physically submission of documents should be repealed.

Collective Bargaining:

- It is recommended to add new provision that If any federation or confederation representing workers at the national or any other level in a particular sector requests one or more organisations representing employers in that sector to enter into collective bargaining, or if an organisation representing employers in a sector requests a federation or confederation representing workers at the national or any other level to enter into collective bargaining, the party receiving such a request shall be obliged to participate in the collective bargaining process.
- That The parties to collective bargaining may independently decide on the matters for discussion. The scope of collective bargaining may be extended to cover any issue related to the working environment of the enterprise, conditions of employment, and the relationship between workers, employers, and the establishment.

PC Committee:

- It is recommended that the responsibility of implementing the specific recommendations of the Participation Committee within the prescribed timeframe shall lie solely with the employer, and trade unions should be excluded from this responsibility.

Strike and Lock-out:

- It is recommended that if an establishment is newly set up, or is foreign-owned, or established with foreign collaboration, then strike or lock-out shall be prohibited for a period of 2 (two) years from the commencement of production, instead of the current provision of 3 (three) years.

Occupational safety and health:

- It is recommended that in Section 85(3), where it prohibits the engagement of any person in the area of danger until satisfied that the danger has been removed — this provision should be amended to also include that the use of the concerned area of danger of the establishment shall be prohibited until the Inspector is satisfied that the danger has been eliminated.
- Every employee or worker should have the right to refuse to work if it is apprehended to him that there is chance of accident.

Safety committee:

- It is recommended to add that The Safety Committee shall inform the employer or their representatives about identified risks, accidents, hazardous incidents, and occupational diseases.
- Along the establishment, safety committee should also be formed in enterprises as well.

Social Security:

- Currently, the formation of a provident fund for the benefit of workers in private sector establishments is not mandatory. It is recommended that this provision be amended to make the formation of such a fund mandatory.
- In terms of social security of the workers, there no provision regarding unemployment benefit and health insurance of the worker. It is recommended to add provision on unemployment benefit and health insurance for giving more protection at contingencies.

Labour Court:

- It is recommended that before initiating the trial process of a case, a mandatory period for pre-trial discussion should be introduced to facilitate quicker dispute resolution. Drawing from the practices of Family Courts—such as pre-hearing conferences and the opportunity to settle within 30 days—a similar Alternative Dispute Resolution (ADR) mechanism should be introduced for labour disputes as well.
- If the judge is satisfied that any matter can be proved through submitted documentary evidence, they may follow a summary trial procedure and exempt the requirement for oral testimony by witnesses.
- Additionally, under the present law, there is no provision for an appeal to the Labour Appellate Tribunal against an "interim order" of the Labour Court. As a result, if any party wishes to challenge such an order, they are compelled to approach the High Court Division, which causes unnecessary delay and imposes an additional burden on both the parties and the judicial system. Therefore, a provision for appeal against interim orders should also be considered.

Gaps in the Bangladesh Labour Law regarding care at work for all workers – Bangladesh Institute of Labour Studies

A. Engaging Policymakers

- Targeted Policy Briefing and Advocacy Campaigns:
- Develop clear, evidence-based policy briefs that demonstrate the socio-economic value of care work and its contribution to the economy. These should outline the gaps in the BLA and how the proposed amendments align with international labour standards and can drive economic growth and gender equality.
- Organize meetings with key policymakers, such as ministers from the Ministry of Labour and Employment, Ministry of Women and Children Affairs, and Ministry of Social Welfare, as well as members of the Labour Reform Commission. Present data from studies and global best practices to make the case for why amendments are necessary for addressing gender inequality, improving worker conditions, and formalizing care work.
- Engage with the political parties and their relevant committees to ensure cross-party support. This can be achieved through direct engagement and advocacy, highlighting the political benefits of advancing gender equality and improving workers' rights.
- Establish a National Care Work Coalition:
- Form a coalition of key stakeholders, including labour unions, women's rights organizations, civil society groups, and academic institutions, to push for the legal reforms.
- This coalition can organize rallies, write petitions, host webinars, and engage in media campaigns to build public awareness of the need for changes to the BLA and generate public pressure on lawmakers.
- Utilize the International Labour Organization (ILO) Support:
- Work closely with the ILO to leverage their international expertise and credibility. The ILO's technical assistance can help provide evidence for policy advocacy and strengthen the case for ratifying conventions like C156, C183, and C189.
- Invite ILO experts to provide workshops or seminars with policymakers and stakeholders in Bangladesh to demonstrate the benefits of aligning national law with international standards.
-

B. Engaging Stakeholders

- Inclusive Consultation Process:
- Host stakeholder consultations to gather input from care workers, employers, trade unions, and civil society organizations. These consultations should ensure that all voices, especially those of care workers from the informal sector, are heard. These consultations will provide the groundwork for gaining broad support for the proposed amendments.
- Ensure the participation of women's organizations, which play a critical role in advocating for the rights of female care workers who are disproportionately affected by the current gaps in the BLA.
- Partnership with Trade Unions:
- Strengthen alliances with trade unions, particularly those representing informal workers (e.g., domestic workers' unions), to lobby for legal reforms and improved working conditions.
- Organize training and advocacy campaigns that build capacity within trade unions to understand and advocate for the inclusion of care work in the BLA.
- Collaboration with Employers' Associations:
- While employers may be resistant to changes, it is important to engage employers' associations in dialogue early on. Provide them with a clear understanding of the long-term economic benefits of improving the working conditions for care workers, including enhanced worker productivity and reduced turnover.
- Encourage private sector companies to adopt the proposed amendments voluntarily, which will help set an example for others and create a more inclusive workforce.

C. Raising Public Awareness

- Public Campaigns and Media Outreach:
- Launch national media campaigns to raise awareness about the importance of care work, the challenges faced by care workers, and the need for legal reforms. Use radio, television, social media, and newspapers to reach a broad audience.

- Create storytelling platforms where care workers can share their personal experiences, highlighting the importance of care work and the impact of legal recognition and protection.
- Engage Academia and Research Institutions:
- Collaborate with universities and think tanks to publish research that supports the inclusion of care work in the BLA. This research can provide compelling evidence of the benefits of better protection for care workers, including better mental health outcomes, greater workforce participation, and reduced poverty.

সংযুক্তি ৪.৩: শ্রমিক, মালিক, পেশাজীবী, শ্রম ও মানবাধিকার সংগঠন ও শ্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভার অংশগ্রহণকারীর তালিকা

শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মত বিনিময় সভা
তারিখ: ২৬ নভেম্বর ২০২৪; স্থান: সম্মেলন কক্ষ, আহসানিয়া মিশন

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
অ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
চৌধুরী আশিকুল আলম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ আনোয়ার হোসেন	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
আহসান হাবিব বুলবুল	সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
মাহবুবুল আলম	টি ইউ সি
আব্দুল কাদের হাওলাদার	সভাপতি, বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোট
মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক জোট
মাহবুবুর রহমান মজনু	আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
আমিরুল হক আমিন	জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন
সাইফুজ্জামান বাদশা	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ
শাহ মোঃ আবু জাফর	সভাপতি, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
নুরুল আমিন	সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক জোট
শামীম আরা	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন
পুলক রঞ্জন ধর	বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস
মোঃ আব্দুল গফুর	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
নূর মোহাম্মদ আকন্দ	বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস
বাদল খান	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোট ও সভাপতি, ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেশন কাউন্সিল ফর ওয়ার্কারস এডুকেশন
মোস্তাফিজ আহমেদ	সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আওরঙ্গজেব আকন্দ	সহকারী অধ্যাপক, মাওলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন

শ্রমিক নিরাপত্তা ফোরাম সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মত বিনিময় সভা
তারিখ: ২৭ নভেম্বর ২০২৪ স্থান: সম্মেলন কক্ষ, বিলস

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রেজানুর রহমান	কর্মসূচী প্রধান, নিজেরা করি
রাজীব আহমেদ	সমন্বয়ক, কর্মজীবী নারী
সিফাত-ই-নূর খানম	অ্যাসোসিয়েট লিগ্যাল স্পেশালিস্ট, ব্লাস্ট
হাসিনা খানম	লিগাল অফিসার, এস আর এস
মোঃ তোয়েবুর রহমান	প্রোগ্রাম, স্পেশালিস্ট, ব্লাস্ট
মিতু খাতুন	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বাংলাদেশ লেবার ফাউন্ডেশন
খাদিজা আক্তার	অর্থ সম্পাদক, আওয়াজ ফাউন্ডেশন
রওশন আরা	নারী পক্ষ
ডাঃ মনজুর কাদির আহমেদ	গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
আবু আহমেদ ফয়জুল কবির (ফরিদ)	আইন ও সালিশ কেন্দ্র
নাজমা ইয়াসমিন	পরিচালক, বিলস

মোস্তাফিজ আহমেদ	সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আওরঙ্গজেব আকন্দ	সহকারী অধ্যাপক, মাওলানা ভাষানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন

শ্রম সংস্কার কমিশনের সাথে বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদের মতবিনিময় সভা
তারিখ: ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪, **স্থান:** সম্প্রীতি সভাকক্ষ, শ্রম ভবন, ঢাকা

নাম	**পদবি ও সংগঠন/প্রতিষ্ঠান**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আক্তার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কামরান তানভিরুর রহমান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	প্রধান নির্বাহী, নাগরিক উদ্যোগ
গগণ লাল	সহ-সভাপতি বা: দ: ব: ঢাকা
বাইজু লাল	উপদেষ্টা, হরিজন সেবক সমিতি
কৃষ্ণ লাল	সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ (ঢাকা)
লেবু বাসফোর,	সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ (গাজীপুর)
বাইজু লাল, উপদেষ্টা	বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ (ঢাকা)
গজন লাল,	সহসভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ (ঢাকা)
ধীরেশ চন্দ্র দাস,	সভাপতি, কর্মচারী ইউনিয়ন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ঢাকা)
মদনমোহন দাস,	দপ্তর সম্পাদক, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ (ঢাকা)
জীবন বাসফোর,	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, গাজীপুর মহানগর কমিটি (গাজীপুর)
গগণ লাল,	ভিপি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, ঢাকা মহানগর কমিটি (ঢাকা)
কামলাল বাসফোর,	সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটি
মিঠুন বাসফোর	সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, আড়াইহাজার থানা কমিটি (নারায়ণগঞ্জ)
পঙ্কজ বাসফোর	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, যুব ঐক্য পরিষদ, (নরসিংদী)
আকাশ বাসফোর	সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ, ছাত্র ঐক্য পরিষদ (ব্রাহ্মণবাড়িয়া)
প্রিয়াঙ্কা	হরিজন ঐক্য পরিষদ (মাগুরা)
রানী	বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ (ঢাকা)
পি. ইসা	বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ (ঢাকা)
মিনা	বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ (ঢাকা)
উষা রানী	বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ (ঢাকা)
মোছাঃ লতা ইসলাম	পটুয়াখালী জেলা
ইছা রাউত	বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ (ঢাকা জেলা)
বিমল ডোম	সাধারণ সম্পাদক, হরিজন ঐক্য পরিষদ ঢাকা মহানগর (ঢাকা জেলা)
বিজয় চন্দ্র দাস	সভাপতি, ওয়ারী সমাজ কল্যাণ যুব সংগঠন, ঢাকা
মহেশ লাল	যুগ্ম সচিব ঢাকা মহানগর কমিটি (ঢাকা)
রিপন দাস	সদস্য, হরিজন ঐক্য পরিষদ, ঢাকা জেলা
সুজন বাসফোর	মধুপুর, টাংগাইল
রনজিত চন্দ্রদাস	পরিছন্নতা কর্মী, শ্রম ভবন
রুবেল বাসফোর	শাহ আলী থানা কমিটি, হরিজন ঐক্য পরিষদ
সঞ্জীব কুমার বাসফোর	শাহ আলী থানা কমিটি, হরিজন ঐক্য পরিষদ
রনজিত কুমার	শাহ আলী থানা কমিটি, মিরপুর, ঢাকা হরিজন ঐক্য পরিষদ
মোঃ খোকন	শ্রম ভবন, পরিছন্নতা কর্মী
স্মৃতি বাসফোর	গাজীপুর মহানগর, হরিজন ঐক্য পরিষদ
প্রিয়াংকা	

শ্রম সংস্কার কমিশনের সাথে সিনিয়র ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা
তারিখ: ৮ ডিসেম্বর, ২০২৪, **স্থান:** 3 এফ কার্যালয়

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
জনাব কামরান টি. রহমান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
অ্যাডভোকেট এ কে এম নাসিম,	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
নজরুল ইসলাম খান	বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ
আনোয়ার হোসাইন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মেসবাহ উদ্দীন আহমেদ	সভাপতি, বাংলাদেশের জাতীয় শ্রমিক জোট
শাহ মোঃ আবু জাফর	সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
চৌধুরী আশিকুল আলম	সম্মানিত সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আব্দুল কাদের হাওলাদার	সভাপতি, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন

শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
তারিখ: ১০ ডিসেম্বর, ২০২৪, **স্থান:** শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
চৌধুরী আশিকুল আলম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ডাঃ সৈয়দা নুরুন নাহার ইসলাম	সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, তেজগাঁও
ডাঃ মোঃ খায়রুল ইসলাম	মেডিকেল অফিসার, তেজগাঁও
ডাঃ রিফাত বিন রহমান	মেডিকেল অফিসার, গাজীপুর
ডাঃ মুহাম্মদ মেহেদী হাসান	মেডিকেল অফিসার চাঁদপুর
ডাঃ তামান্না নাসরিন	মেডিকেল অফিসার
ডাঃ ফারহানা ভুঁইয়া	মেডিকেল অফিসার
ডাঃ ফেরদৌস আক্তার	সিনিয়র মেডিকেল অফিসার
আসমা আখতার	সহকারী পরিচালক
মুহম্মদ নাসির উদ্দিন	পরিচালক
শামীমা সুলতানা বারী	পরিচালক
মোঃ সিরাজুর রহমান	পরিচালক
আফিফা বেগম	পরিচালক
তানজিনা আক্তার মুক্তা	মেডিকেল অফিসার
রোখসানা চৌধুরী	উপ পরিচালক
ডাঃ গাজী ফারজানা	মেডিকেল অফিসার
ডাঃ রিফাত মেহজাবিন	সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, নারায়নগঞ্জ
মোঃ শফিকুর রহমান	সহকারি পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
শতাব্দি বিনতে চৌধুরী	সদস্য, টেকনিকেল টিম, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোহাম্মদ মাসুকুর রহমান সিকদার	যুগ্ম সচিব
নাজমা বেগম	সহকারী পরিচালক
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
ফাতেমা আক্তার	অফিস সহকারী
তারেক	শ্রম কল্যাণ সংগঠক
রেবেকা	শ্রম কল্যাণ সংগঠক
মোঃ মিঠু মিয়া	নিরাপত্তা প্রহরী
তাহমিনা	অফিস সহকারী, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, তেজগাঁও
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন

শ্রম অধিদপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
তারিখ: ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪, **স্থান:** শ্রম ভবন

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
চৌধুরী আশিকুল আলম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ফাহমিদা আখতার	অতি. সচিব ও মহাপরিচালক
কামরান টি রহমান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ গিয়াস উদ্দিন	পরিচালক, বিভাগীঢ শ্রম দপ্তর, চট্টগ্রাম
এস এস এনামুল হক	পরিচালক, ভিাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা
আফিফা বেগম	পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা
মোঃ হাফেজ আহম্মদ মজুমদার	উপপরিচালক, বিভাগয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা
মোঃ নাহিদুল ইসলাম	উপপরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, শ্রীমঙ্গল
মোঃ আলমগীর কুমকুম	উপপরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, নারায়নগঞ্জ
সালাহউদ্দিন মাহমুদ	উপপরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা
মাসুদা সুলতানা	উপপরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ফরিদপুর
মোঃ খোরশেদ আলম	উপপরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ময়মনসিংহ
মোঃ মনিরুজ্জামান	উপপরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুমিল্লা
মোঃ আলমগীর হোসাইন	সহ. পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা
ডাঃ তামান্না নাসরিন	সিনিয়র মেডিকেল অফিসার, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা
মোঃ মিজানুর রহমান	পরিচালক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
মোঃ মাহবুব আলম	সহকারী পরিচালক
মোঃ শফিকুর রহমান	সহ. পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর,
মোহাব্বদ হোসাইন	উপ পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
কামরুন নাহার	সহকারী সচিব
মোঃ ফিরোজুর রহমান	সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা
ইসলাম মাহমুদ	সহকারী পরিচালক, সহকারী পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
মোঃ শহীদুজ্জামান	উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বগুড়া
আসমা আখতার	সহকারী পরিচালক, বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা
মিতসু শাওলিন	ডিডি, প্রধান কার্যালয়
মুহাম্মদ রকিবুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর, ঢাকা
মিনু আফরোজ	ডিডি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা
মোঃ শফিকুল ইসলাম	ডিডি, রাজশাহী
শাহ সুলতান আশরাফুল আহমেদ	শ্রম কর্মকর্তা, শ্রম অধিদপ্তর, ঢাকা
মোঃ আবু তাশরীফ মাহমুদ	পরিচালক
মোর্শেদা আক্তার	যুগ্ম সচীব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	যুগ্ম সচীব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী, শ্রম সংস্কার কমিশন
শামীমা সুলতানা বারী	পরিচালক, প্রধান কার্যালয়, শ্রম অধিদপ্তর
মোঃ জহিরুল হোসেন	উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, কুষ্টিয়া
মোঃ ওসমান গণি	উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, বরিশাল
মোঃ মনিরুল আলম	পরিচালক, বিবাগীয় শ্রম দপ্তর, খুলনা
মোঃ আবুল বাসার	উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, দিনাজপুর
তুষার কান্তি রায়	উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, রংপুর
অধীর চন্দ্র বালা	উপ-পরিচালক, আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট

শ্রমিক অধিকার, নারী অধিকার ও মানবাধিকার সংগঠন এর সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
তারিখ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আক্তার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
অনন্য রায়হান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কোহিনূর মাহমুদ	পরিচালক, বিলস
নাজমা ইফাসমীন	পরিচালক, বিলস
এ কে এম আশরাফ উদ্দিন	ED, BLF
আরিফুল ইসলাম আদীব	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আদিবা আফরোজ	গবেষক
আলম হোসেন	পরিচালক, ওশি
সীমা দত্ত	সভাপতি, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্র
আমেনা আক্তার	বিপ্লবী নারী ফোরাম
শেখ মজিবুল হক	পরিচালক, বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
তৃষিয়া নাশতারান	প্রেসিডেন্ট, অগ্নি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
মোঃ আল মামুন	গ্রন্থগারিক
ফেরদৌসি আক্তার	সাধারণ সম্পাদক, নাগরিক নারী ঐক্য
তাকিয়া চৌধুরী	সহকারী কর্মকর্তা, বিলস
সায়দুজ্জামান মিটু	সিনিয়র কর্মকর্তা, বিলস
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	সলিডারিটি সেন্টার
সজিব দে	সিনিয়র কর্মকর্তা, বিলস
ফাহমিনা মিশু কাশেম	জেএসজে, শিক্ষা ও গবেষণা স্কলার
রেবেকা নীলা	নারী সংহতি
শামজিদা আক্তার	আইনজীবী, ব্লাস্ট
তায়্যেবুর রহমান	প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, ব্লাস্ট
এম. কামাল আকন্দা	কোস্ট ফাউন্ডেশন
লুনা নূর	সম্পাদক, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি
মাহমুদা বেগম	নির্বাহী পরিচালক, সবুজের অভিযান ফাউন্ডেশন
সীমাদাস শিমু	পরিচালক
সানজিদা সুলতানা	অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক, কর্মজীবী নারী
রওশন আরা	পরিচালক, নারীপক্ষ
মোস্তাফিজ আহমেদ	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
রাজেকুজামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
চৌধুরী আশিকুল আলম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ আলমগীর হোসেন	শ্রম পরিদর্শক
মোঃ মাহফুজুর রহমান ভুঁইয়া	যুগ্ম মহাপরিচালক, নসট্রি
আয়শা ইয়াসমীন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন
শতাব্দি চৌধুরী	টেকনিক্যাল কমিটি সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা মুন	সহযোগী
রুখশানা আফরোজ আশা	সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

গার্মেন্টস শ্রমিক সংগঠনের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২৩/১২/২০২৪

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
চৌধুরী আশিকুল আলম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
জেড, এম, কামরুল আলম	ভিপি, আইবসি
মোশরেফা মিশু	সভাপতি
শামীম ইমাম	কার্যকরী সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন
মাহমুদ হোসেন	সভাপতি, বিপ্লবী গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি ও নৌ পরিবহন শ্রমিক ফোরাম
কাজী মো. রুহুল আমিন	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্ট ও সোয়েটার শ্রমিক টিইউসি

লাভলী ইয়াসমীন	সভাপতি, রেডিমেড গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
মরিয়ম আক্তার	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
অঞ্জন দাস	সহ সভাপ্রধান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
মিজানুর রহিম চৌধুরী	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
রাজু আহমেদ	সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস টেক্সটাইল শ্রমিক ফেডারেশন
মোঃ সাইফুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক, বিপ্লবী শ্রমিক সংহতি কেন্দ্রীয় কমিটি
মোঃ সুমন	সহ সাধারণ সম্পাদক, বিপ্লবী শ্রমিক সংহতি
কামরুন নাহার	জি এস
মিনু মিয়া	রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন
সৈয়দা মুনতাহা আহাম্মদ	সাধারণ সম্পাদক, সেন্ট্রাল উইমেন্স কমিটি - বিজিআইডাব্লিউএফ
মোঃ কবির হোসেন	যুগ্ম সম্পাদক, এনজিডাব্লিউএফ
মোঃ সোহেল শিকদার	সহ সভাপতি, রাষ্ট্র সংস্কার শ্রমিক আন্দোলন
আদিবা আফরোজ	গবেষক
আতাউর রামেন	সাংবাদিক
আব্দুর রহমান	সভাপতি, বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ
সোহেল রানা	সম্পদ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ
সালমা আক্তার শিল্পি	সহ সভাপতি(BJSF), সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় গার্মেন্টস দ:শ্র:ক.
শেখ শাহনাজ	জাতীয় শ্রমিক জোট, বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর আহ্বায়ক
এফ.এম.আবু সাঈদ	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
মোহাম্মদ বজলুর রহমান বাবলু	সদস্য, BSSF-B-4, ES-BSGSF-B-2088
আসাদুজ্জামান চৌধুরী	সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জাতীয় নিট ডাইং গার্মেন্টস শ্রমিক কর্ম ফেডা:
মোঃ হারুন অর রশিদ	সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক আন্দোলন
তানভীর আহম্মেদ	Case Handler & Shelter AWAJ Foundation
আবুল হোসাইন	সভাপতি, TGWF
মোঃ আব্বাস উদ্দিন	সাধারণ সম্পাদক, DGWF
আরিফুল ইসলাম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ ইলিয়াস	সাধারণ সম্পাদক, GBGWF
মোঃ জে এম রাজু	প্রচার সম্পাদক
রাণী মনি	সাধারণ সম্পাদক, MGSF
খাদিজা আক্তার	G.S
মোঃ শফিকুল ইসলাম	সভাপতি, NGWWF
নাহিদুল ইসলাম নয়ন	সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশন
বাহারানে সুলতান	সভাপতি, জাগো বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
সুলতানা বেগম	সভাপতি, GBGWF
এড. মাহবুবুর রহমান ইসমাইল	সভাপতি, বাংলাদেশ টেক্সটাইল গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন
মোঃ মাছুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, শ্রম সংস্কার কমিশন (attached)
মন্টু ঘোষ	সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
এ.এন.এম.সাইফ উদ্দীন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
খালেকুজ্জামান লিপন	সহ সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট
আহসান হাবীব বুলবুল	সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট
তাসলিমা আখতার	সদস্য শ্রম কমিশন, সভা প্রধান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
আসিফ	এনএসআই
সম্রাট	এনএসআই
মিজানুর রহমান	ডিজিএফআই
নূর জাহান আমিনা	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এসোসিয়েট
মোঃ মামুনুর রশিদ	ইলেকট্রিশিয়ান
মোঃ আরিফুল	ইলেকট্রিশিয়ান
আপন চৌধুরী	সাংবাদিক
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন	লিফট ম্যান

শ্রম সংস্কার কমিশনের সাথে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের মতবিনিময় সভা
তারিখ: ২৪/১২/২০২৪, স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা

নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম
চৌধুরী আশিকুল আলম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ফারুক আহমেদ	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ মোজাম্মেল হক	যুগ্মসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ	প্রকল্প পরিচালক, অতি. সচিব, ডাইফ
আরিফ আহমেদ খান	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, ডাইফ
মোঃ বুলবুল আহমেদ	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, ডাইফ
রাজর্সী চন্দ্র ঘোষ	উপমহাপরিদর্শক, নারায়ণগঞ্জ, ডাইফ
মোঃ মোর্তজা মোশেদ	উপমহাপরিদর্শক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ডাইফ
মোঃ আরিফুল ইসলাম	ডিআইজি, ডাইফ, যশোর
মোঃ মাসুদ রানা	উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, বগুড়া
মোঃ আল-আমিন	উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, রংপুর
তপন বিকাশ	উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, সিলেট
এইচ. এম. শাহাদাত	উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, গোপালগঞ্জ
প্রকৌ: আহমেদ শরীফ	ডিআইজি, ডাইফ, ফেনি
সৈয়দ নাজমুল রাশেদ	ডিআইজি, ডাইফ, কুমিল্লা
ফরহাদ ওহাব	ডিআইজি, ডাইফ, কুষ্টিয়া
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, রাজশাহী
আশিকুর রহমান	উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, নওগা
মোক্তার হোসেন নিয়াজী	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), বরিশাল
মোঃ আমিরুল ইসলাম	এলআইজি, ডাইফ, গাজিপুর
মোঃ মনিরুজ্জামান	এলআইজি, ডাইফ, ঢাকা
মোঃ ওহীদুর রহমান	এলআইজি, ডাইফ, ঢাকা
মোঃ কোরবান আলী	গ্রন্থাগারিক, ডাইফ, ঢাকা
মেহরাব হোসাইন	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), ঢাকা
মোঃ নাজমুল ইসলাম	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ, ঢাকা
আল আমিন	সহকারী মহাপরিদর্শক, ডাইফ, ঢাকা
মো. আব্দুল হাজ্জাত সোহাগ	এআইজি, ডাইফ, ঢাকা
শেখ নুরুজ্জামান	এলআইজি, ডাইফ, ঢাকা
মোঃ ইকবাল হোসাইন খান	সহকারি মহাপরিদর্শক, ডাইফ, ঢাকা
মোঃ ফুরকান আহসান	পিআরও, ডাইফ, ঢাকা
মোঃ সামিল মন্ডল	এআইজি, ডাইফ, বগুড়া
আয়শা ইস্যসমীন	রিসার্চ এসোসিয়েট, শ্রম সংস্কার কমিশন
এম এম মাসুদ অর রশিদ	উপ মহাপরিদর্শক, ডাইফ
মোঃ আফিদ-উল-হাসান	ডিআইজি, ডাইফ
শাহ মোফাখখারুল ইসলাম	ডিআইজি, ডাইফ, কক্সবাজার
ইফফাত আরা	এল আই, ডাইফ, ঢাকা
খালিদ আহমেদ জাহাঙ্গির	এআইজি, ডাইফ, ঢাকা
আরিফুল ইসলাম ভুঁইয়া	এল আই (জি), ডাইফ, ঢাকা
মোঃ মুনছুর বিল্লাল	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ডাইফ, ঢাকা
মোঃ ইউনুছ আলী	উপ মহাপরিদর্শক, ডাইফ, জামালপুর
মনোয়ার হোসেন	পরিসংখ্যান ও গবেষণা, ডাইফ, ঢাকা
রিয়াজুল	পুলিশ
রিজভী আহমেদ	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), ডাইফ
মো: কামরুল ইসলাম	শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য), ডাইফ
টিপু সুলতান	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), ডাইফ
ফজলে শামীম এহসান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ এন এম সাইফ উদ্দিন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তালিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন

ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ মতিউর রহমান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, ডাইফ
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ মাহফুজুর রহমান ভুঁইয়া	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, NOSHTRI, ডাইফ
সাজ্জাদ নাইম	এপিএস, এডভাইজার
ফরিদ আহমেদ	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, ডাইফ
মোছাঃ জুলিয়া জেসমিন	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, ডাইফ
মোঃ হাসিবুজ্জামান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, ডাইফ
শেখ আসাদুজ্জামান	যুগ্ম মহাপরিদর্শক, ডাইফ
সাবিহা মুক্তা	ডিআইজি, ডাইফ, ঢাকা
জোবেদা খাতুন	উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, মুন্সিগঞ্জ
শিউলি আক্তার	ডিআইজি (সেইফটি), ডাইফ, ঢাকা
মোঃ মোজাম্মেল হোসেন	উপ মহাপরিদর্শক, ডাইফ, মানিকগঞ্জ
মোঃ আতিকুর রহমান	উপ মহাপরিদর্শক, ডাইফ, নরসিংদী
সৌমেন বড়ুয়া	উপ মহাপরিদর্শক, ডাইফ, ফরিদপুর
আব্দুল মুমিন	উপ মহাপরিদর্শক, ডাইফ, সিরাজগঞ্জ
এ.কে.এম. মনিরুল হক	উপ মহাপরিদর্শক (প্রশাসন), ডাইফ, ঢাকা
এস এম জিসান	উপ মহাপরিদর্শক (মানব সম্পদ উন্নয়ন), ডাইফ, ঢাকা
মোঃ মোতালেব মিয়া	সহকারি মহাপরিদর্শক, ডাইফ, গাজিপুর
আবুল খায়ের মোঃ টিপু সুলতান	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), ডাইফ, ঢাকা
জাহাঙ্গীর আলম	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), ডাইফ, ঢাকা
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ, ঢাকা
মহর আলী	উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, টাঙ্গাইল
আব্দুল্লাহ আল মামুন	শ্রম পরিদর্শক, ডাইফ, ময়মনসিংহ
মোঃ জালাল খান	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ), ডাইফ, গাজীপুর
মোঃ ইউসুফ আলী	শ্রম পরিদর্শক (সাঃ), ডাইফ
মোঃ তাইমুম ইসলাম	সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি), ডাইফ, ঢাকা
মোছাঃ জর্জিনা আক্তার স্মৃতি	সহকারী মহাপরিদর্শক (স্বাস্থ্য), ডাইফ, ঢাকা
তাহমিনা হক	সহকারী মহাপরিদর্শক (সেফটি), ডাইফ, ঢাকা
টিপু সুলতান	শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), ডাইফ, চট্টগ্রাম
মাহমুদুল হাসান	শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), ডাইফ, ঢাকা
মোঃ আলমগীর হোসাইন	শ্রম পরিদর্শক (সেইফটি), ডাইফ, ঢাকা
মোঃ ফয়জুর রহমান	শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য), ডাইফ, সিরাজগঞ্জ
হেভেন চাকমা	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ), ডাইফ, ঢাকা
ফারহানা নাসরিন	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, শ্রম সংস্কার কমিশন
শিবশংকর দে	অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ শফিকুর রহমান	সহকারী পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর

আউটসোর্সিং শ্রমিকদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
তারিখ: ২৪/১২/২০২৪ **স্থান:** শ্রম ভবন, ঢাকা

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ	কমশিন প্রদান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শাকিল আখতার চৌধুরি	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আক্তার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
বরুন সেন	অফিস সহায়ক, সমবায় অধিদপ্তর
মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বেপারি	পি ও ওএস, ঢাকা ওয়াসা
মহব্বত হোসেন খান	পি ও ওএস, ঢাকা ওয়াসা
মোঃ তরিকুল ইসলাম	অফিস সহকারি, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মোঃ আমজাদ হোসেন জাবেদ	অফিস সহকারি
মোস্তাক আহমেদ	অফিস সহায়ক
আহমদ উল্লা রাশেদ	অফিস সহায়ক

মাজহারুল	নিরাপত্তা কর্মী
মোঃ সোহেল	নিরাপত্তা কর্মী
রাজু আহমেদ	সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
মোঃ ফেরদৌস	অফিস সুপারভাইজার, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ
মোঃ ইকবাল হোসেন বাবু	ইলেক্ট্রিশিয়ান, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি
মোঃ আসাদুল ইসলাম	দপ্তরি কাম প্রহরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
কাওসার আহমদ	দপ্তরি কাম প্রহরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
সুলতান মাহমুদ সুমন	দপ্তরি কাম প্রহরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
স্বপন কান্ত বাড়ই	দপ্তরি কাম প্রহরী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
আদনান মাহমুদ	টেবিল বয়, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
আবু বক্কর সিদ্দিকী	দপ্তরি, পেট্রোবাংলা
মুকুল চন্দ্র দেব নাথ	স্বাস্থ্যকর্মী, স্বাস্থ্য বিভাগ, নারায়নগঞ্জ
মোঃ শিশির	ওয়ার্ড বয়
মোঃ রফিকুল ইসলাম	এটেন্ডেন্ট
সজল কুমার দত্ত	পরিচ্ছন্নতাকর্মী
রাজু আহমেদ	ডেইলি বেসিস কর্মচারী
সাইফুল ইসলাম	ডাটা এনালিস্ট
মোঃ ওয়াকিবুর রহমান	সহযোগী প্রযোজক
মোঃ ফিরোজ আলম শাহীন	ক্লাস এটেন্ডেন্ট, জাতীয় গণমাধ্যম ইন্সটিটিউট
মোঃ জুয়েল খান	গাড়ী চালক
মোঃ আমিনুর রহমান	মার্কেটিং ফ্যাসিলিটেটর
মোঃ আব্দুল কাশেম	অফিস সহকারি
মোঃ খলিল হোসেন	জাতীয় বার্ন ইউনিট
মোঃ শাহাদত হোসেন	পানি উন্নয়ন বোর্ড
মোঃ রেজাউল করিম	দপ্তরি, জিটিসিএল
মোঃ তাজুল ইসলাম	বি আই ডব্লিউ টি এ
কামাল হোসেন চুন্নু	সুপারভাইজার
কাজী জামিল	সুপারভাইজার, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন
গোবিন্দ কুমার	লাইভ স্টক ফিল্ড এসিস্ট্যান্ট
মোঃ হাসানুজ্জামান	সহকারি, প্রাণীসম্পদ
মোঃ হেদায়েত হোসেন	অফিস সহায়ক, উপজেলা নির্বাহী অফিস
শ্রী রতন কুমার সাহা	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
রামায়ন চন্দ্র	বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
মোঃ আব্দুল্লাহ	কম্পিউটার ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
আদিবা আফরোজ	গবেষক
জহিরুল ইসলাম	এটেন্ডেন্ট, পেট্রোবাংলা
আল ইমরান মুন্না	ওয়ার্ড বয়
কে এম আসাদুর ইসলাম	টেকনিশিয়ান
মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক	ইলেক্ট্রিশিয়ান
মোঃ আজিজ উদ্দিন	অফিস সহায়ক, সিএমএম কোর্ট, সিলেট
প্রদীপ জোয়ার্দার	নিরাপত্তা প্রহরী, রাজউক
মোঃ রিয়াজ উদ্দিন	পরিচ্ছন্নতাকর্মী, রাজউক
উত্তম কুমার চন্দ্র	অফিস সহায়ক, ডাক বিভাগ
মোঃ সজিব হোসেন	গাড়ী চালক, ডাক বিভাগ
মোঃ মেহেদি হাসান	নৌকা চালক, বন অধিদপ্তর
জয় সরকার	নিরাপত্তাকর্মী
মামুন	পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পিন্টু মিয়া	নিরাপত্তা প্রহরী
শিল্পী	পরিচ্ছন্নতাকর্মী
সাহিদা	পরিচ্ছন্নতাকর্মী
মোঃ শরিফুল ইসলাম	গাড়ী চালক
মোঃ ফিরোজ আহমেদ	মেইন্টেন্যান্স লাইনম্যান
মোঃ রেদোয়ান হাওলাদার	মেইন্টেন্যান্স লাইনম্যান
জয়নাল আবেদিন	হোস্টেল এটেন্ডেন্ট

মোঃ বাবুল বেপারি	ওয়ার্ডবয়
সমুজ মল্লিক	পাম্প ইনচার্জ
ওমর ফারুক	ল্যাব এটেন্ডেন্ট
হাবিব সোহেল	ওয়ার্ডবয়
মাসুদ	কুক
মোঃ মিলন মিয়া	ওয়ার্ডবয়
মোঃ শামিম উসমান	ওয়ার্ডবয়
মোঃ শাহজালাল খন্দকার	ওয়ার্ডবয়

শ্রম সংস্কার কমিশনের সাথে নির্মাণ শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা
তারিখ: ২৩/১২/২৪ **স্থান:** বিলস, সেমিনার হল, চট্টগ্রাম

নাম	**পদবি**
মো: হাসিবুর রহমান বিপ্লব	বিজেএসডি
মিঠু চৌধুরী	বিজেএসডি
মো: পারভেজ	বিজেএসডি
মো: মাসুদ খাঁন	বিএফটিইউসি
মো: শাহাদাৎ খাঁন	বিএফটিইউসি
হরি দাস	জেএসএল
মো: দেলোয়ার	টিইউসি
আব্দুল হালিম	টিইউসি
মো: মহিন উদ্দিন	টিইউসি
মো: সোহেল	বিএফটিইউসি
মো: আনোয়ার	বিএফটিইউসি
সেতার মাহমুদ	বিএফটিইউসি
মো: মানিক মিয়া	টিইউসি
মো: নাছের	টিইউসি
জাবেদ আলম	জেএসএল

চট্টগ্রামস্থ শ্রম সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মত বিনিময় সভা
স্থান: চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস তারিখ: ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪

নাম	**পদবি**
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ গিয়াস উদ্দিন	পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
রুমানা আক্তার	উপ পরিচালক
মোহাম্মদ আব্দুস সাব্বির ভুঁইয়া	সহকারী পরিচালক
মোঃ মোশেদুল আলম	সহকারী পরিচালক
ডাঃ সানজিদা শারমিন	মেডিকেল অফিসার
শাহনাজ বেগম	সহকারী পরিচালক
মোঃ নাসির উদ্দিন	চীফ পারসোনাল অফিসার
রাজীব চৌধুরী	সহ. টার্মিনাল ম্যানেজার, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোঃ শফিকুর রহমান	সহ. পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
ডাঃ ইমরুল হাসান	মেডিকেল অফিসার, শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম
নঈমুর আজিজ	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ডাইফ, চট্টগ্রাম
বিশ্বজিৎ শর্মা	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
মোঃ রাজিবুল হাসান	শ্রম কল্যাণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ চা বোর্ড
সুমন শিকদার	উপপরিচালক (পরিকল্পনা), বাংলাদেশ চা বোর্ড
মোঃ মাসুদ মোর্শেদ খান	কাউন্সেলর কাম ইন্সপেক্টর, চট্টগ্রাম ইপিজেড
মোঃ ইমানুজ্জামান খান	অতি. নির্বাহী পরিচালক

শিপন চৌধুরী	উপমহাপরিদর্শক, ডাইফ, চট্টগ্রাম
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন

চট্টগ্রামস্থ স্কপ ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মত বিনিময় সভা
স্থান: চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস তারিখ: ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ	কমশিন প্রদান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ এন এম সাইফুদ্দিন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সৈয়দ কুদরত-ই-খোদা তোতন	বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
এস এম লুৎফুর রহমান	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
মোঃ আবু তালেব চৌধুরি	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
মোঃ নুরুল আবসার	বি এম এস এফ
মোঃ নওশেদ জামাল	মেঘনা পেট্রোলিয়াম এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
মোঃ মনিরুল ইসলাম	বি এম এস এফ
ননী গোপাল দাশ	মৎস্যজীবী
সমীরণ দাশ	মৎস্যজীবী
আরিফুল হক	নির্মাণ টিইউসি
মোঃ আফাজ হোসেন	ফার্নিচার, টিইউসি
অপূর্ব নাথ	টিইউএফ, চট্টগ্রাম
মিজানুর রহিম চৌধুরি	বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
মোঃ সোহাগ	বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
মোঃ ইদ্রিস আলী	বিটিইউসি
মোঃ মনির হোসেন	ইজি বাইক সংগ্রাম পরিষদ, চট্টগ্রাম
মোঃ মাসুদ	ইজি বাইক সংগ্রাম পরিষদ, চট্টগ্রাম
মোঃ আব্দুর রহিম	টিইউসি
হাজেরা বেগম তানিয়া	বিজেএসডি
লুৎফুর নাহার সোনিয়া	জাতীয় শ্রমিক লীগ
মোঃ হাসিবুর রহমান	বিজেএসডি
কে এম শহিদুল্লাহ	বিএফটিইউসি
ইফতেখার কামাল খান	টিইউসি
আনোয়ারুল আজীম সবুজ	জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
তছলিম হোসেন সেলিম	জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, ডক
মোঃ ইব্রাহীম খোকন	জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, বন্দর
মোঃ হারুন	ডক শ্রমিক দল
শ ম জামাল উদ্দিন	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
গাজী আইয়ুব আলী	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, বিদুৎ
এমআর মনজু	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল, রেলওয়ে
নুরুল্লাহ বাহার	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
মোঃ মছিউদ্দৌলা	টিইউসি, চট্টগ্রাম
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ এন এম নাজিম উদ্দিন	বিলস
সাকিল আখতার চৌধুরি	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ শাহনেওয়াজ চৌধুরি	বিজেএসডি
সাইফুল আহমেদ বাদল	
সামসুল ইসলাম আরজু	বিএল এফ
গুলজার বেগম	বিএলএফ
রাজন আহমদ	বি এস এফ
মোঃ সোহাগ হোসেন	বি এস এফ

আবু আহমেদ	বি এল এফ
মোঃ হানিফ	টি ইউ সি, হোটেল
আল কাদেরী জয়	ব্যাটারি রিকশা ইজি বাইক সংগ্রাম পরিষদ
ফয়েজ আহমেদ	সি ডি এ চট্টগ্রাম কর্মচারী দল
মোঃ আসাদ ইসলাম	সি ডি এ
মোঃ শফিকুর রহমান	শ্রম অধিদপ্তর
মোঃ দেলোয়ার হোসেন	সি ডি এ
মহিন উদ্দিন	এস এল এফ
মোঃ মামুনুর রশিদ	চট্টগ্রাম ওয়াসা
এস কে হাবিব শান	সলিডারিটি সেন্টার
সাইফুল	গার্মেন্টস সংহতি
শামিম	বি এস আর এফ, চট্টগ্রাম
রয়াল মার্মা	গার্মেন্টস সংহতি
বিজয়	গণ সংহতি
মাসুম	গণ সংহতি
জয়নাল	গার্মেন্টস
মো আতাউল করিম বাবুল	বি জে এস ডি
প্রদিপ দাশ	টি ইউ সি, চা বাগান
চন্দন কুমার দাশ	বি জে এস এফ
মো জাহেদ উদ্দিন	বি জে এস এফ
হাফেজুল ইসলাম	ইউ বি এল (লিবার)

চট্টগ্রামস্থ মানবাধিকার ও শ্রম অধিকার সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মত বিনিময় সভা
স্থান: চট্টগ্রাম সার্কিট হাউস তারিখ: ২৭ ডিসেম্বর ২০২৪

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ	কমশিন প্রদান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ এন এম সাইফুদ্দিন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরি	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: জাহেদ উদ্দিন	বিজেএসএফ
আবু আহমেদ মিয়াহ	বিএলএফ
ওমর ফারুক	বিএলএফ
সৈয়দ আহমেদ বাদল	জেএসসি
জাহিদুল ইসলাম	ইপসা
সামসুল ইসলাম আরজু	বিএলএফ
মিজানুর রহিম চৌধুরী	বাংলাদেশ গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি
নিলু	
ফারজানা আক্তার সুমি	মমতা
শান্তা সোহেলী ময়না	অক্সফাম ইন বাংলাদেশ
রিফাত মঞ্জুর রনি	সিএনআরএস
তাহেরা বেগম	নৌকাবাসি, চাঁদপুর
জেসমিন আক্তার	নৌকাবাসি, চাঁদপুর
জাকিয়া সুলতানা	গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম, ঢাকা মিরপুর
মর্জিনা সুলতানা	গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম, ঢাকা মোহাম্মদপুর
সুচিত্রা মিত্র	সংশপ্তক, ইডব্লিউসিএসএ
মাহমুদা বেগম	সংশপ্তক
মো: রফিকুল ইসলাম	সংশপ্তক
তারেক আজিজ	অক্সফাম
মেহজাবিন আহমেদ	হেড অফ জেন্ডার, অক্সফাম

লিটন চৌধুরী	চীফ এক্সিকিউটিভ, সংশপ্তক
মো: আল শাহ	ওয়াইপিএসএ
প্রফেসর এ বি এম আবু নোমান	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
ইফতেখার কামাল খান	টিইউসি
অপূর্ব নাথ	টিইউএফ
আয়েশা ইয়াসমিন	রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট
সানজিদা আক্তার	
জুলিয়া পারভীন	সহযোগী অধ্যাপক, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়
আরিমা সুলতানা	মেম্বার নারী সংহতি
নুরুন নেছা মুন্নি	নারী সংহতি, চট্টগ্রাম জেলা
সপন তালুকদার	সিনিয়র পরিচালক, মমতা
জেসমিন সুলতানা পরি	প্রধান নির্বাহী, ইলমা, সমাজ উন্নয়ন ও মানবাধিকার সংগঠন
নুরজাহান খান	নির্বাহী প্রধান, লিরো
মো: শফিকুর রহমান	সহকারী পরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর
মোহাম্মদ সেলিম	অ্যাডভোকেট
রবিদাশ	
বিশ্ব দাশ	
তৃষ্ণা	
রুকি দাশ	
হোসনে আরা বেগম	
জাহিদুল আলম আল জাহিদ	ন্যায়ের আলো পরিবহন শ্রমিক প্রতিনিধি
অ্যাড. আল হুরাইন তাজ মিহির	ব্লাস্ট, চট্টগ্রাম
মো:আবদুর রহিম	টিইউসি
মো: কাদের নেওয়াজ	
প্রবাশ চন্দ্র লালা	অ্যাডভোকেট, জজ কোর্ট এ্যান্ড লেবার কোর্ট, চট্টগ্রাম
মো:মসিউদ্দৌউলাহ,	টিইউসি, চট্টগ্রাম এবং লেবার কোর্ট, চট্টগ্রাম
ড. মো: শাহীন চৌধুরী	প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অব ল, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
খন্দকার এস এইচ শান	প্রোগ্রাম অফিসার, সলিডারিটি সেন্টার
মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	সলিডারিটি সেন্টার
এ এম উদ্দিন	বিলস
তাসলিমা আক্তার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ফজলুল কবির মিন্টু	বিলস

বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর সদস্যদের সাথে শ্রম সংস্কার কমশিনের সভা

স্থান: সার্কিট হাউস সম্মেলন কক্ষ, চট্টগ্রাম **তারিখ:** ২৮/১২/২০২৪

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ডঃ মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসাইন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ.কে.এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ফারুক আহমেদ	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ এন এম সাইফুদ্দিন	সদস্য, বিএএমএলএ
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আমজাদ হোসাইন	চৌধুরী শীপ রিসাইক্লেয়িং প্রতিনিধি
কামাল উদ্দিন আহমেদ	অ্যাডভাইজর, বিএসবিআরএ
মো: সিদ্দিক	সেক্রেটারি, বিএসবিআরএ
এ.এম.মাহবুব চৌধুরী	চট্টগ্রাম মেট্রোপলপটন চেম্বার অফ কমার্স, ভাইস প্রেসিডেন্ট
নাজমুল ইসলাম	অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বিএসবিআরএ
মো: আবু সায়েম	অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি চট্টগ্রাম চেম্বার অফ কমার্স
মো: সাজ্জাদ উদ্দিন	ভাইস প্রেসিডেন্ট বিসিবিআরএইচ দোকান মালিক সমিতি, অফেলিয়া
মোঃ শফিকুর রহমান	এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডি ও এল
খন্দকার শাফিন হাবিব শান	প্রোগ্রাম অফিসার রিসার্চ কমিশন

মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম	প্রোগ্রাম অফিসার সলিডারিটি সেন্টার
এ.এইচ.এম লতিফ উদ্দিন চৌধুরী	সি. ই. ও, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন হাসপাতাল
গোলাম শাহাদাত বিটু	সি.ই.ও, এমজিসি
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট এল আর সি

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের নারী শ্রমিক অধিকার কর্মীদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
তারিখ: ২৯/১২/২০২৪ **স্থান:** শ্রম ভবন, ঢাকা

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
শেফালি	ডিডব্লিউ, ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স নেশন্যাল ফোরাম, বিডি
সুমা আক্তার	ডিডব্লিউ, ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স নেশন্যাল ফোরাম, বিডি
কুহিনূর আক্তার	ডিডব্লিউ, বিএনএসকে
শাহিনুর বেগম	ডিডব্লিউ, বিএনএসকে
রহিমা খাতুন	ডিডব্লিউ, বিএনএসকে
সালমা	ডিডব্লিউ, ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স জোনাল কমিটি, মিরপুর
মাহফুজা বেগম	ডিডব্লিউ, ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স নেশন্যাল ফোরাম, বিডি
অনুপমা বৈদ্য	অ্যাডভোকেসি অফিসার, ডিএসকে
আফরিন আক্তার	প্রজেক্ট ম্যানেজার, ডিএসকে
ফারহানা আক্তার	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, অক্সফাম
ড. রুবি সিমু	পিআরও, অক্সফাম
জাহানাজ আক্তার স্বপ্না	ডিডব্লিউ, ডমেস্টিক ওয়ার্কার্স নেশন্যাল ফোরাম, বিডি
শেখ রুমানা	জিএস, বিওএমএসএ
আবুল হোসাইন	কো-অর্ডিনেটর, ডিডব্লিওআরএন
খাদিজা আক্তার	জেনারেল সেক্রেটারি, এসএএসএফ, এএফ
তারেক আজিজ	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, অক্সফাম
ঐন্দ্রিলা চক্রবর্তী	ওপারেশান ম্যানাজার, ও.এম রেড ওরেঞ্জ
খাদিজা আক্তার অন্তরা	পিও, অক্সফাম
এনামুল করিম আবির	ভিওএল.সিওএমএমএস, অক্সফাম
শরিফুল ইসলাম	এইচআইসিএআর, অক্সফাম
মাহমুদা বেগম	ইডি, এসওএফ
লাইলা জাসমিন বানু	পিএম, ইইউ
সানজিদা সুলতানা	এ ই ডি, কেএন
মো: আাশফিক খন্দকার	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, ফেয়ারওয়ার্ক ফাউন্ডেশন
আব্দুর রহমান	অফিস সহায়ক, ডিওএল
ইমাম হাসান	অফিস স্টাফ, ডিআইএফই
মাহফুজুল হক	সদস্য, এলআরসি
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, এলআরসি
নুরনবী ইসলাম	অফিস স্টাফ, ডিওএল
তৌহিদুল	ভিডিও, রেডওরেঞ্জ
মো: কামরুল	ভিডিও, রেডওরেঞ্জ
তরিকুল ইসলাম	এডমিন, ইইউ
মেহজাবিন আহমেদ	প্রধান জেন্ডার স্যোশাল ইনক্লুশান, অক্সফাম
খান আসাদুজ্জামান মাসুম	বিওয়াইইউ
বিভাস কুমার মন্ডল	জব প্লেসমেন্ট অফিসার, কেএন
মামুনুর রশিদ	ইলেকট্রিশিয়ান, ডিওএল
নাজমুল ইসলাম	ইডি, আরইএডিআই
এ.এম.এম. মনিরুজ্জামান	ডিরেক্টর প্রোগ্রাম এন্ড এডভাইজার, সহায়
ফারহানা আফরিন তিথি	প্রজেক্ট ম্যানেজার, কেএন
ইসরাত জাহান সিদ্দিকি	পিও-ডব্লিওআরজিই, অ্যাকশান এইড বাংলাদেশ
মো: মাসুম বিল্লাহ	ল অফিসার, ডিআইএফই শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: আব্দুর রহমান	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, আশার আলো স্যোসাইটি (এএএস)
তাইয়েবা ইসলাম	অফিস সহকারি, অফিস এসি বাংলাদেশ লেবার কমিশন
সুমাইয়া ইসলাম	নির্বাহী পরিচালক, বিএনএসকে

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	যুগ্মসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
রেশমা খাতুন	প্রজেক্ট অফিসার, বিএলএফ
মো: তাইজুল ইসলাম	পিসি, সিএএমপিই
জপন কুমার দাস	ডেপুটি ডিরেক্টর, সিএএমপিই
মোসা: রুমা	কর্মী, আরএমজি (হোম বেইজড)
পারুল	কর্মী, আরএমজি (হোম বেইজড)
রাণী খাতুন	কর্মী, আরএমজি (হোম বেইজড)
নুরজাহান	কর্মী, আরএমজি (হোম বেইজড)
রুনা	কর্মী, আরএমজি (হোম বেইজড)
শাহীন আক্তার ডলি	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, নারী মৈত্রী
শাহজাদী বেগম	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, অক্সফাম
নুরজাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, এলআরসি
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এ্যাসোসিয়েট, এলআরসি
মো: রোহান	কর্মী, আরএমজি (হোম বেইজড)
সুলতানা পারভীন	কর্মী, আরএমজি (হোম বেইজড)
আসাদুল্লাহ আল গালিফ	কর্মী, আরএমজি (হোম বেইজড)
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সানজিদা কণা	টেকনিক্যাল টিম সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
লতা	ক্লিনার, ডিওএল
প্রিয়াংকা	ক্লিনার, ডিওএল
টিপু	ড্রাইভার, বিলস
রবিউল	ড্রাইভার
কণক	ড্রাইভার
আনিস	ড্রাইভার
রুবেল হোসাইন	সিকিওরিটি, ডিওএল
মো: মুতালিব	সিএনজি ড্রাইভার, ডিওএল
হাবিবুর রহমান হাবিব	সিএনজি ড্রাইভার, ডিওএল
মুতাহুরুল ইসলাম	সিএনজি ড্রাইভার, ডিওএল
মেহেদী ইমাম	ম্যানেজিং ডিরেক্টর, আদর্শ বাংলাদেশ লিমিটেড

শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
তারিখ: ৩০/১২/২০২৪ **স্থান:** শ্রম ভবন, ঢাকা

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ	কমশিন প্রদান, শ্রম সংস্কার কমিশন
শ্রাবণী নাহার	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ইন্ডাস্ট্রিঅল
তাপস বড়ুয়া	প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইটিআই বাংলাদেশ
আরিফা আস আলম	প্রোগ্রাম এডভাইজর, এফইএস
আবিল বিন আমিন	ইটিআই কান্ট্রি ম্যানেজার
মো: শাহিনুর রহমান	কনসালটেন্ট মন্ডিয়াল এফএনভি
এ.কে.এম আশরাফ উদ্দিন	ইডি,বিএলএফ
মো: বাবলুর রহমান	কান্ট্রি ম্যানেজার, ফেয়ার অয়ার
রাইসুল ইসলাম খান	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ইন্ডাস্ট্রিঅল
মুস্তাফিজ আহমেদ	সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

শিল্প সম্পর্ক (যৌথ দরকষাকষি ও সামাজিক সংলাপ) কমিটির মতবিনিময় সভা
তারিখ: ৩০/১২/২০২৪
স্থান: শ্রম ভবন, ১৯৬, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণি, বিজয় নগর, ঢাকা ১০০০।

নাম	পদবি
কামরুন টি রহমান	সদস্য, এলআরসি
এ.এন.এম সাইফুদ্দিন	সদস্য, এলআরসি
মো: আবুল হোসাইন	জয়েন্ট সেক্রেটারি বিজিএমইএ
মিনু আফরুজ	ডিওএল

মো: সারোয়ার হোসাইন সামসি	জয়েন্ট সেক্রেটারি জেএসজে/ডব্লিউআরসি
মো: আরিফুর রহমান	বিএফটিইউসি এনসিসিডব্লিওই
মার-এ-নুল ইসলাম শাওন	এসিস্ট্যান্ট জয়েন্ট সেক্রেটারি (কমপ্লাইনস এন্ড লেবার) বিকেএমইএ
মোশাররফ হোসাইন	এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ডিপার্টমেন্ট অব লেবার
সালাহউদ্দিন মাহমুদ	ডিডি
মিতসু শাওলিন	ডিডি
কে এম মাহমুদুল ইসলাম	এসআর, লেবার, বিজিএমইএ, এস কে
মো: সায়িদ	এস আর এ/এস, ফায়ার এন্ড সেইফটি বিএএমজিএ
মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	এএসজি, বিইএফ
জোহা রহমান	বিইএফ হেড অফ ট্রেইনিং
রুবিনা আক্তার রুবি	উইমেন কমিটি সভাপতি
হেনা আক্তার	পারলাইটেল
ফারজানা শারমিন	বিকেএমইএ, জয়েন্ট সেক্রেটারি (কমপ্লায়েন্স ইডিট)
আফিফা বেগম	ডিরেক্টর
মো: রফিকুল ইসলাম	এডিশনাল সেক্রেটারি বিএএমইএ
এস.এম.এনামুল হক	ডিরেক্টর
মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম	প্রোগ্রাম অফিসার
মো: অহিদুর রহমান	এলটিজি ডিআইএফই
ইনিজনিয়ার এম এম মামুন-ওর-রশিদ	ডিআইজি
সৌমিত্র কুমার দাস	এসএলএফ অব সেক.
মোহাম্মদ সায়িদ ইসলাম	এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বিইউপি
তানজিলা আফরিন	এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বিইউপি
আহসান হাবীব বুলবুল	সদস্য এলআরসি, টেকনিক্যাল কমিটি আইআর
ফাহমিনা মিসু কাশেম	এ্যাডুকেশন এন্ড রিসার্চ

শ্রম আইন সংস্কার কমিটির সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা **তারিখ:** ০২/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: সবুর হোসাইন	এডিশনাল সেক্রেটারি
নিহাদ কবির	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম আদিব	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মোহাম্মদ হোসেন সরকার	যুগ্মসচিব
মোহাম্মদ মাসুকুর রহমান সিকদার	যুগ্মসচিব
এস.এম. এনামুল হক	পরিচালক
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম	যুব সম্পাদক, শ্রমিক দল
মো: মাহফুজুর রহমান ভুইয়া	যুগ্ম মহাপরিচালক
মো: মাসুম বিল্লাহ	ল অফিসার, ডিআইএফই
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাইফুল্লাহ আল মামুন	সদস্য অতিরিক্ত ডিআইজি আইপি
ফারুক আহমেদ	সদস্য
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন শ্রম আইন সংশোধন কমিটি
খাদিজা খন্দকার	সিনিয়র প্রোগাম অফিসার
মো: সাইফুল হক	আইপিএইচকিউ
মো: শরীফ হোসেন	চীফ কমপ্লায়েন্স অফিসার
মো: রফিকুল ইসলাম	অতি: সচিব বিজিএমইএ
হাবিবুর রহমান	সহকারী মহাসচিব শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
নূরজাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ, সেক্রেটারি, এলআরসি
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এসোসিয়েট, এলআরসি
আতিকুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন

শ্রম সংস্কার কমিশনের টেনিক্যাল কমিটি মতবিনিময় সভা (পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক টেনিক্যাল কমিটি)
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা **তারিখ:** ০৫/০১/২০২৫

নাম	পদবি
আনোয়ার হোসেন	প্রেসিডেন্ট বিজেএসডি
আবু নাইম মো শহিদুল্লাহ	এডভাইসর এফবিসিসিআই সেইফটি কাউন্সিল
আবুল কালাম আজাদ	
ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান	চেয়ারম্যান অকিউপ্যাশনাল সেইফটি বোর্ড অফ বাংলাদেশ
মিশা মেহজাবিন	এলইবি কান্ট্রি ডিরেক্টর, ভিশনস্প্রিং
আলম হোসাইন	ডিরেক্টর
ডা: এ.কে.এম, রেজাউল হক	
ফারজানা শারমিন	বিকেএমইএ জয়েন্ট সেক্রেটারি কমপ্লায়েন্স সেল
মার-আ-নূল ইসলাম সভিন	শহর যুগ্ম সচিব কমপ্লায়েন্স ও শ্রম
মো: মাহফুজুর রহমান ভূইয়া	যুগ্ম মহাসচিব এনওএসএইচটিআরআই, ডিআইএফই
সেকেন্দার আলী মিনা	নির্বাহী পরিচালক
রুবাইয়া রুবি	সহকারী ব্যবস্থাপক এসএমই ফাউন্ডেশন
মশিউর খন্দকার	প্রধান নির্বাহী অধ্যাপক
ডা. এম.এইচ.ফারুকী	অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান পেশা ও পরিবেশ স্বাস্থ্য বিভাগ, বি.ইউ.এইচ.এস
মো: ইলিয়াস মাহমুদ	উপপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর
মো: আনোয়ার হোসেন	সহকারী পরিচালক ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
তাপস বড়ুয়া	প্রোগ্রাম ম্যানেজার ইথিক্যাল ট্রাডিং ইনিশিয়েটিভ
মো: তৌহিদুল ইসলাম	কনসাল্টেন্ট ও প্রধান অকুপেশনাল থেরাপি বিভাগ সিআরপি
মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান	প্রধান বয়লার পরিদর্শক
মো: শফিকুল ইসলাম	সি: উপসচিব বিজিএমইএ
ফাহিম আবরার	এ্যাসোসিয়েট এডভাইজর
ওলে জাসটিসার	সেক্টর কাউন্সিলর, ওএসএইচ
ফিরোজ আলম	হেড অফ জিওটিএএন জিআইজেড বাংলাদেশ
হাসনাত আলমগীর	প্রফেসর ওএসএইচ এসবিইউ
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: রফিকুল ইসলাম	অতি: সচিব (শ্রম) বিজিএমইএ
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
অধ্যাপক আদিল মুহাম্মদ খান	প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্লানার্স (বিআইপি)
এ.কে.এম মাছুম উল আলম	বিইউএইচএস
ড. মুহাম্মদ হায়াতুন নাফি	নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি
সৈয়দ জারিফ উদ্দিন আহমেদ	ইকোটপিয়া কনসালটেন্সি এন্ড সলিউশন
খন্দকার এ.সালাম	টিম মেম্বার বিলস
মো: ওমর ফারুক	এএলডিই
নাজমা নাওদ	এসজিএসএফ

হকার্স সংগ্রাম পরিষদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা **তারিখ:** ০৫/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আনোয়ার হুসাইন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আবুল হোসাইন	সভাপতি
ইমাম হোসেন ভূইয়া	সভাপতি
আ: মান্নান	সহ সভাপতি
আরিফ চৌধুরী	সভাপতি

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	সভাপতি
মো: গোলাম সারোয়ার	সা: সম্পাদক
মোসা: সাথী	বিএএনকে
খোকন মজুমদার	হকার্স ফেডারেশন
মো: নজরুল ইসলাম	সভাপতি রোডএন্স হকার্স
মো: কফিল উদ্দিন	ছিন্নমূল হকার্স সমিতি
মো: হারুন	হকার্স সংগ্রাম সাধারণ
মো: নজরুল	হকার্স সংগ্রাম সদস্য
মো: আবুল মিয়ামির	সদস্য
মিজানুর রহমান সিকদার	সভাপতি বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও শিল্প শ্রমিক ঐক্য পরিষদ
মো: শফিউল আলম	বিজেএসএসএফ
মেহেরুন্নেছা নয়ন	বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
ছায়েরা আক্তার বিউটি	
মামুন	সদস্য ভ্রাম্যমান হকার্স
কামাল আহমেদ	প্রচার সম্পাদক ভ্রাম্যমান হকার্স
মোসা: আজিজা সুলতানা	এ.বি শ্রমিক পার্টি
ফয়েজ হোসেন	সভাপতি বাংলাদেশ হকার্স ফেডারেশন
মো: আবুল কালাম জুয়েল	সম্পাদক ছিন্নমূল হকার্স সমিতি
ইউসুফ আলী বাবরু	সাংবাদিক
রফিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ হকার্স সংগ্রাম পরিষদ
মো: ফারুক ভূইয়া	বঙ্গবন্ধু এভিনিউ সংগ্রাম পরিষদ
আ: রহিম	বাংলাদেশ হকার্স সংগ্রাম পরিষদ
মৌসুমি সাহা	বাংলাদেশ নারী শ্রমিক কেন্দ্র
আয়শা ইয়াসমীন	রিসার্চ এসোসিয়েট, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি

শ্রম সংস্কার কমিশন ও আইএসসি প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা

তারিখ: ০৬ জানুয়ারি, ২০২৫, স্থান: সভাকক্ষ (এনএসডিএ)

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	কমিশন প্রদান, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ.এন.এম.সাইফ উদ্দীন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
আ: বারিক খান	মহাসচিব বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন অ্যান্ড সিইও জুট সেক্টর ইন্ডাস্ট্রিজ আইএসসি
তাসলিমা আক্তার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন, সভাপ্রধান গার্মেন্ট শ্রমিক সংহতি
মহিউদ্দিন খান খোকন	ডিরেক্টর টিএন্ডএইচ আইএসসি ডিরেক্টর হোটেল দি কক্স টুডে
মো. আব্দুস সামাদ	সদস্য, এনএসডিএ
মো. জোহর আলী	সদস্য, এনএসডিএ
মোহাম্মাদ মাহফুজুর রহমান	পরিচালক,এনএসডিএ
মো. আসসাদিক জামান	Ps to Ec, NSDA(এনএসডিএ)
অনন্য রায়হান	চেয়ারপার্সন, আর্ট সোশ্যাল
মো. আবদুর রাজ্জাক	চেয়ারম্যান, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং , আইএসসি
নয়ন চন্দ্র শীল সহকারী	পরিচালক,এনএসডিএ
ইঞ্জিনিয়ার মো. আসাদুজ্জামান	চিফ অপারেটিং অফিসার, সিআইএসসি
মো. কামরুল হাসান	সহকারী পরিচালক, এনএসডিএ
মো. আনোয়ারুল হক	সিইও, ফার্নিচার সেক্টর আইএসসি
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এসোসিয়েট, লেবার রিফর্ম কমিশন
মো. মাসুম বিল্লাহ	ল অফিসার (ডিআইএফই, এবং এলআরসি)
নারায়ণ চন্দ্র দে	সিইও প্লাস্টিকস আইএসসি
মো. শহীদুর রাহমান,	সদস্য এগ্রফুড আইএসসি
মোহাম্মদ মোশাররফ হোসাইন	সিইও, এগ্রফুড আইএসসি
জাহেদি হাসান চৌধুরী	সিইও সিরামিক আইএসসি
মির্জা নুরুল শেখ শোভন	চেয়ারম্যান আইএসআইএসসি
রাশেদ মায়মুনাল ইসলাম	পরিচালক, বিসিএমইএ

বিরেন্দ্রনাথ অধিকারি	সিইও, আইসিটি আইএসসি
শাফকাত হায়দার	চেয়ারম্যান, আইসিটি আইএসসি
মো. শফিকুর রহমান...	চেয়ারম্যান এগ্রফুড আইএসসি
মায়নুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, সিরামিক, আইএসসি

রাইড শেয়ারিং ও পরিবহন শ্রমিকের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা **তারিখ:** ০৬/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	প্রধান , শ্রম সংস্কার কমিমন
ড.মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: সেলিম	প্রধান সমন্বয়কারী ডব্লিউএইচএসএসি
শেখ মেরাজ	সমন্বয়কারী ডব্লিউএইচএসএসি
মো: সেলিম রেজা	শ্রমিক সমন্বয়কারী ঢাকা
মিজানুর রহমান	শ্রমিক সমন্বয়কারী চট্টগ্রাম
আশিক	শ্রমিক সমন্বয়কারী জয়পুরহাট
মো:নুর আলম	শ্রমিক সমন্বয়কারী
মো: খোরশেদ আলম	শ্রমিক সমন্বয়কারী
মো: রুহুল আমিন	শ্রমিক সমন্বয়কারী
মো:রাজেস আলম	শ্রমিক সমন্বয়কারী
মো:হালিম তালুকদার	শ্রমিক সমন্বয়কারী
মো: লুৎফর রহমান	শ্রমিক সমন্বয়কারী
নোমান হোসেন	শ্রমিক সমন্বয়কারী
মো: শরীফ গাজী	শ্রমিক সমন্বয়কারী
আব্দুর রহিম রাকিব	শ্রমিক সমন্বয়কারী
মো: জলিল	শ্রমিক সমন্বয়কারী

নারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা **তারিখ:** ০৬/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	প্রধান , শ্রম সংস্কার কমিমন
আনোয়ার হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ এন এম সাইফ উদ্দিন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোস্তাফিজ আহমেদ	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আরিফুল ইসলাম আদিব	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
নাছরিন আক্তার দিনা	বিজেএসডি
নার্গিস জাহান	পি এস আই,
সৈয়দা আজিজুন্নাহার	বিএলএফ
ফেরদৌসি বেগম	প্রেসিডেন্ট, পিএসআই, এনসিসি, বাংলাদেশ
মৌসুমী নিশাত শিমুল	সাধারণ সম্পাদক, নারী কমিটি
ইয়াসমিন আক্তার	ইউএনআই-বিএলসি, পাবলিসিটি, সেক্রেটারি
সায়েরা খাতুন	বিটিইউসি
সেলিনা চৌধুরী	বিএসএসএফ
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
শাহিদা পারভিন	সাধারণ সম্পাদক, নারী কমিটি, বিটিইউসি
শামীম আরা	সভাপতি, বিজেএসএফ
মমতাজ বেগম	বিজেএসডি
জীথাসমিন আক্তার	বিজেএসজে
নাজমা ইয়াসমিন	পরিচালক, বিলস
মাথি রেজওয়ানা	চেয়ার, এনসিসিডব্লিউই
ফাতেমা আক্তার	জেনারেল সেক্রেটারি, আইটিইউসি-বিসি
হুসনেআরা বিউটি	বিজেএসএফ, মেম্বার, এনসিসিডব্লিউই

ফাহমিনা মিশু কাশেম	জেএসজে
হামিদা খাতুন	এনসিসিডব্লিউই
সাবরিনা শারমিন সেবা	অফিসার, বিলস
রাজু আহমেদ	সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
তৃষিয়া নাশতারান	প্রেসিডেন্ট, অগ্নি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন

খুলানস্থ স্কপ ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: সার্কিট হাউস, খুলনা তারিখ: ০৭/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মুজিবুর রহমান	যুগ্ম আহবায়ক
মোঃ মনিরুল আলম	পরিচালক, শ্রম অদিদপ্তর, খুলনা
খালিদ হোসেন	সভাপতি, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশ
দেলোয়ার হোসেন দিলু	সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন, খুলনা
এইচ এম	সভাপতি, টিইউসি
খান গোলাম রসুল	সহকারী পরিচালক, শ্রম দপ্তর
আজিজুর রহমান	শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
খান ইসমাইল হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, জেলা শ্রমিক দল
উজ্জল কুমার সাহা	সভাপতি, জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
মোঃ জালাল উদ্দিন হাওলাদার	
মোঃ আং বারিক	
মোঃ বাহাউল ইসলাম বাহার	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক সংঘ
মুজিবুর রহমান নজরুল	টি ইউ সি, খুলনা
মোঃ আরিফ হোসেন	মঃ পাশা শ্রমিক ইউনিয়ন
হাসান মুন্সি	লঞ্চ সেবা এসোসিয়েশন
মোঃ ইউসুফ	সভাপতি, বাংলাদেশ লাইটারেজ শ্রমিক ইউনিয়ন
মোঃ শমশের আলম	সাংগঠনিক সম্পাদক, পাটকল শ্রমিক দল
মোঃ শামীম	সদস্য
আব্দুর রাজ্জাক	যুগ্ম আহবায়ক, আঞ্চলিক শ্রমিক দল
শামস	ছাত্র, জে আই জে
মোঃ সেলিম	প্রকাশনা সম্পাদক, ডুমুরি উপজেলা, শ্রমিক দল
আল আমিন শেখ	ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন
মোঃ অলিয়ার	শ্রমিক নেতা, ইষ্টার্ণ জুট মিল
মোঃ জাকির হোসেন	শ্রমিক নেতা
মোঃ বাদল	ছমিল ইউনিয়ন
মোঃ শহিদুল ইসলাম গিয়াস	আহবায়ক, প্লাটিনাম জুট মিল
সাইফুল ইসলাম বাবুল	যুগ্ম আহবায়ক, প্লাটিনাম জুট মিল
মোঃ দেলোয়ার হোসেন	সভাপতি, ব্যাংক ফেডারেশন
মোঃ সোহেল হাওলাদার	সম্পাদক, রেলওয়ে শ্রমিক দল
আবু দাউদ দীন মোহাম্মদ	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী পাট শ্রমিক দল
শফিকুল ইসলাম	সদস্য সচিব, শ্রমিকদল খুলনা মহানগর
শেখ সিদ্দিকুর রহমান	শ্রমিক ইউনিয়ন
কাজী শহিদুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক, খুলনা শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
আব্দুল করিম	সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
কোহিনূর আক্তার	কোষাধ্যক্ষ, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
ফারহানা ইয়াসমিন	উৎপাদন শ্রমিক
মোঃ বাবুল আখতার	
মোঃ রবিউল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক, শ্রমিক অদিকার পরিষদ
মোঃ রহুল আমিন	সভাপতি, শ্রমিক অধিকার পরিষদ

গাজী আফজাল হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, টি ইউ সি
মোছাঃ ডলি	সভাপতি, বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন
মোস্তাফিজ আহমেদ	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
মোঃ শফিকুলল ইসলাম	সহকারী পরিচালক
মাহবুব আলম	সহকারি পরিচালক
অসীম কুমার বিশ্বাস	সহকারী পরিচালক
এস এম শাহজান	এআইজি, ডাইফ
মোঃ শাহিনুর রহমান	এ আই জি, ডাইফ
শেখ মহিদুর রহমান	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
মোঃ শাওন খান	সমাজ কল্যাণ সম্পাদক
মোঃ জাহিদ	ডেকোরেটর্স শ্রমিক ইউনিয়ন
মোঃ সুজন ইসলাম	সভাপতি
মাহফুজুর রহমান	সহ-সভাপতি, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন, খুলনা

খুলানস্থ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: সার্কিট হাউস, খুলনা তারিখ: ০৮/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
নুরুল হাই মো. আনাস	বিপিএএ এডমিনিস্ট্রেটর, খুলনা চেম্বার অব কমার্স
রাশিদা চৌধুরী	সোনালী ডোর ইন্ডাস্ট্রিজ
ফারজানা নার্গিস	আরশি ইন্টেরিয়র
মো: ইসমাইল হোসেন	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, রুপসা বাস মালিক সমিতি
মাহমুদুর রহমান	নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন
দেবাশীষ ভট্টাচার্য	সহকারী সচিব, বাংলাদেশ জুট এসোসিয়েশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
একেএম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শামিমা সুলতানা শায়লা	ডিভিশনাল হেড, বিডব্লিউসিসিআই, খুলনা বিভাগ
মোঃ মোসাদ্দেক হানিফ	প্রো লাইফ ফার্নিচার, প্রসিডেন্ট, খুলনা ফার্নিচার কেনভাস, এএসএসসি
মোঃ কামরুজ্জামান	রিজিওনাল ম্যানেজার, ইউসেপ বাংলাদেশ
নাসরিন আক্তার	টিম লিডার, ডিসেন্ট এমপ্লয়মেন্ট, ইউসেপ বাংলাদেশ, খুলনা
স: মোল্লা হারুন অর রশিদ	সহসভাপতি, বাংলাদেশ প্রাইভেট হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক এসোসিয়েশন, খুলনা
মো. মাসুম বিল্লা	ল অফিসার, ডিআইএফই, সংযুক্ত শ্রম সংস্কার কমিশন
মদিনা মনোয়ারা	নুরি ফ্যাশেন এন্ড বিউটি কেয়ার এন্ড ট্রেনিং সেন্টার
শেখ মহিদুর রহমান	লেবার ইন্সপেক্টর, ডিআইএফই, খুলনা
মোঃ বায়েজিদ সরদার	বায়েজিদ মটরস
তাজ উল ইসলাম	ডিরেক্টর, খুলনা আইস এন্ড কোল্ড স্টোরেজ
মোঃ আসাদুজ্জামান সোহেল	প্রোপ্রাইটার, ইলেকট্র সলিউশন
মোঃ মহিউদ্দিন	সাধারণ সম্পাদক, রুপসা মালিক সমিতি
এম নাজমুল আলম ডেভিড	পরিবর্তন, খুলনা নির্বাহী পরিচালক
মোঃ সাইদুর রহমান সোহেল	জিএম, দি গ্লান্ড প্লাসিড
কাজী শরিফুল ইসলাম	এম/এস গাজী জুট ইন্টারন্যাশনাল, র জুট এক্সপোর্টার
মোঃ রোকনুজ্জামান	তথ্য সহকারী, আঞ্চলিক তথ্য অফিসার খুলনা
মোঃ ইমরানুল হক,	পিআইডি, খুলনা ফটোগ্রাফার
মোঃ এহসানুল হক	শ্রম পরিদর্শক, (স্বাস্থ্য), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
আবদুল কুদ্দুস	সভাপতি, বাংলাদেশ ইন্ডাস্টিজ মালিক সমিতি
মোঃ মাহবুব আলম	এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, ডিওএল
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এসোসিয়েট, এলআরসি

খুলানস্থ মানবাধিকার কর্মীদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: খুলনা সার্কিট হাউজ মিলনায়তন কক্ষ, খুলনা তারিখ: ০৮/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: খালিদ হোসেন	নির্বাহী পরিচালক রূপায়ন
রাজীব আহমেদ	সমন্বয়ক কর্মজীবী নারী
শেখ রুবেল আহমেদ	প্রকল্প কর্মকর্তা কর্মজীবী নারী
হিবৃদ্ধ মতিন	নির্বাহী পরিচালক রূপসা অর্গানাইজেশন
জাকিয়া পারভীন	সিনিয়র পরিচালক প্রোগাম অফিসার সলিডারিটি সেন্টার
ফারজানা আক্তার মিতু	বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস টাস্ট (ব্লাস্ট) প্যারালিগ্যাল
রেশমা খাতুন	বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিস টাস্ট (ব্লাস্ট) প্যারালিগ্যাল
মো: হাফেজ	মৎস্যজীবী
আনোয়ার বেগম	
লিপিকা মণ্ডল	মৎস্যজীবী
ইস্রাফিল বয়াতী	জেলে
মো:ওলিয়ার শেখ	জেলে
আল মতবুব	ইউথ লিডার
তুহিন আলবার্ট দাস	প্রজেক্ট অফিসার কেএমএসএস ইডব্লিওসিএসএ
মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	অক্সফাম
হেনা আক্তার নারী	মৎস্যজীবী
শান্তা সোহেলী ময়না	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, অক্সফাম
মোহাম্মদ এহসানুল হক	শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য)
রিফাত মঞ্জুর রনি	প্রকল্প কর্মকর্তা, সিএনআরএস, চাঁদপুর
মো: মাসুম বিল্লাহ	ল অফিসার, ডিআইএফই
মো:পারুল বেগম	প্রেসিডেন্ট, সন্ধ্যা সিবি ও জাগো নারী
শিউলী	কর্মজীবী নারী
হোসনে আরা	
মো: মুন্নাফ শেখ	শ্রমজীবী
মোস্তাফিজ আহমেদ	এসোসিয়েট প্রফেসর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
নুরুল হাই মো: আনাস	এডিসি, খুলনা

বরিশালস্থ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: বরিশাল সার্কিট হাউস, বরিশাল তারিখ: ০৯/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোস্তাফিজ আহমেদ	এসোসিয়েট প্রফেসর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
এ কে এম নাসিম	সদস্য, লেবার কমিশন
আনোয়ার হোসাইন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম আদিব	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কৃষ্ণ চন্দ্র সাহা	সি: ম্যানেজার এস.ই.পি গ্রুপ
মো: আসিফ হক নেওয়াজ	উপ.ব্যবস্থাপক লুসিকান্ত হাকং এডিসি (জি)
মোহাম্মদ ওয়াহিদুল হক ভূইয়া	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
মোহাম্মদ মনির হোসেন	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
হুমায়ুন কবির	আনন্দ ফুড প্রোডাক্টস
প্রকৌ: মো:আনোয়ার হোসেন	সাধারণ সম্পাদক বরিশাল পটুয়াখালী বাস চালক সমিতি
আবদুস সালাম মিয়া	আহবায়ক বরিশাল মৎস্য আড়ৎদার এসোসিয়েশন
কামাল	সদস্য সচিব
মোল্লা মাইনউদ্দিন	

নাজমুন নাহার রীহা	প্রপ্রাইটার রিনা কটন ও বিসমিল্লাহ পলিমার এন্ড প্যাকেজিং
সালেহীন সানি	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ফ্রীল্যান্সার ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি, বরিশাল
সাবেকুন নাহার	এলআই ডিআইএফই, বরিশাল
মো: আলাউদ্দিন জি এমএস শাহী	খানসেনস গ্রুপ এফএম
মোস্তাফিজুর	সি:ম্যানেজার সোনারগাঁও টেক্সটাইল লিমিটেড
মো: মিজানুর রহমান	ম্যানেজার সুরভী গ্রুপ অব কোম্পানি
গকুল মজুমদার	এইচআরএম অমৃত ফুডস, বরিশাল
ইসমত ফারহানা	বরিশাল উইমেন চেম্বার ফারহান ব্লক এন্ড বুটিক্স
তাসলিমা আক্তার	শিমুল শিল্পীর ছোঁয়া, চকবাজার, বরিশাল
আইরিশ আক্তার আইরিশ	ইগগ্যাদারিং প্রোপাইটর কাটপট্রি বরিশাল
মো: নাসির উদ্দিন	প্রোপ্রাইটর সূর্যমুখী পলিমার
রেবেকা সুলতানা	বিডব্লিওসিসিডি মুন্নি'স ড্রীম সিইও
মোসা:আফসানা হক তুলি	ডিরেক্টর বরিশাল উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
শারমিন তিন্নি	রৌগার ঝাপি সিইও
স্নিগ্ধা আফরোজ	সদস্য বিডব্লিওসিসি
রাহিমা আক্তার	সদস্য, বরিশাল উইমেন চেম্বার
সারবিন ফেরদৌসী জিনাত	সদস্য, বরিশাল উইমেন চেম্বার
প্লাবনী ইয়াসমিন	স্বদেশ মৌল্ডস সিইও
বিলকিস আহমেদ লিলি	সভাপতি
নবীন কে হাওলাদার	উপমহাপরিদর্শক, ডিআইএফই, বরিশাল
মো:ওসমান গণি	উপপরিচালক, ডল, বরিশাল
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এসোসিয়েট এলআরসি
জাহিদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)

বরিশালস্থ মানবাধিকার সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: বরিশাল সার্কিট হাউস, বরিশাল তারিখ: ০৯/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আনোয়ার হোসাইন	সভাপতি শ্রমিক দল
আরিফুল ইসলাম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মনীষা চক্রবর্তী	সংগঠক সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
সুপ্রিয় দত্ত	এরিয়া সমন্বয়কারী
আবু আল রায়হান	আইনজীবী
এ্যাড.এ.কে.আজাদ	সভাপতি, টিইসি বরিশাল
মো:আজিজুর রহমান (আজিজ)	এইচআরডি অধিকার
অ্যাড.সাহিদা তালুকদার	কো-অর্ডিনেটর ব্লাস্ট-বরিশাল
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এসোসিয়েট এলআরসি

বরিশালস্থ স্কপ ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: বরিশাল সার্কিট হাউস, বরিশাল তারিখ: ০৯/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম ষংস্কার কমিশন
আনোয়ার হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: কবির খান	ইজিবাইক, সভাপতি
আব্দুল হালিম	সভাপতি, পদ্মা ক্লোরীং লিঃ
মো: শাহিন খান	সাধারণ সম্পাদক, পদ্মা ব্লোয়ীং লিঃ

মো: রানা ইসলাম	অপসোনীন
জাহাঙ্গীর আইয়ুব দুলাল	সভাপতি, রিকশা-ভ্যান চালক শ্রমিক সংঘ
মো: জাহাঙ্গীর হোসেন	সহ-সভাপতি, অপসোনীন
মো: রাজ্জাক হায়দার	সদস্য, শ্রমিক দল
মো: মাহবুব	সদস্য, শ্রমিক দল
মো: আজগর হোসেন	M.L.L.S. জনতা ব্যাংক
সৈয়দ মহি উদ্দিন	সাধারণ সম্পাদক, সিবিএ
জোছনা বেগম	সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল জেলা
লিপিকা মজুমদার	নারী শ্রমিক সহ-সভাপতি
ফিরোজ আলামিন	শ্রমিক দল
তুষার সেন	ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
মো. আবুল বাসার	সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল জেলা কর্মচারী ইউনিয়ন
মৃদুল দত্ত	সভাপতি, বরিশাল মহানগর দোকান কর্মচারী ইউনিয়ন
বিজামণ্ডল	উজিরপুর উপজেলা জেলে শ্রমিক ইউনিয়ন
নরেন্দ্রলাল বাড়ৈ	উজিরপুর উপজেলা জেলে শ্রমিক ইউনিয়ন
মো. শাহআলম ফকির	বরিশাল সড়ক পরিবহন শ্রমিক
মো. কামাল চৌধুরী	সভাপতি, বরিশাল সড়ক পরিবহন শ্রমিক
জাফর আহম্মেদ	বৈষম্যবিরোধী ছাত্র, বরিশাল
মোঃ আব্দুল হাই খান	বিআরটিসি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
মোঃ আবুল কালাম	বরিশাল জেলা বাস মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়ন
মোঃ মাইদুর রহমান	পরিবহন শ্রমিক গিলবাট অশোক
সৈয়দ হাসান আলী	জে এস পি জি সি বি এস কে ইউ
ইব্রাহীম হামিদ মাসুম	সভাপতি, ঘাট শ্রমিক ইউনিয়ন, বরিশাল জেলা ও মহানগর
মোঃ ফারুক হোসেন	এস আই
মোঃ মনিরুল	ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
মোঃ আলী হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, বরিশাল শ্রমিক ইউনিয়ন
মো: মহসিন আহমেদ	সহ-সভাপতি, বরিশাল শিক্ষা বোর্ড
মোঃ বেল্লাল হাওলাদার	বরিশাল জেলা নির্মাণ শ্রমিক

বিউটি পার্লার শ্রমিকদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

স্থান: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজ **তারিখ:** ১১/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম আদিব	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
নিহাদ কবির	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কুহিনূর মাহমুদ	বিলস
তাসলিমা আক্তার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকিয়া বেগম	প্রেসিডেন্ট
রুমা আক্তার	জেনারেল সেক্রেটারি
ইয়াসমিন আক্তার	প্রেসিডেন্ট
পারভীন নকরেক	জয়েন্ট সেক্রেটারি
সানতনু নকরেক	সেক্রেটারি
ববিতা রিথিল	
লিজা সাংমা	
কুহেলি কাথেসিনা আজিম	
কানিজ ফাতেমা	সেক্রেটারি
আদিবা রহমান	মেম্বার
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এসোসিয়েট, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূরজাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের সাথে শ্রম কমিশনের মতবিনিময় সভা

স্থান: বিলস অফিস তারিখ: ১২/০১/২০২৫

নাম	পদবি
খাদিজা রহমান	প্রেসিডেন্ট ডিজেএসপিএনসিএসইউ
মজিবুর রহমান	
ওসমান আলী	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন
মো: শফিকুল ইসলাম	নেত্রকোণা জেলা ঢাকা শ্রমিক ই:
এস এম মাসুদ রানা	সাধারণ সম্পাদক নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিবহন শ্রমিক ইউ
মো: সেলিম	সভাপতি নারায়ণগঞ্জ শ্র.ই.
মো: ইদ্রিস আলী	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন
হাফেজ আহামেদ	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন

অনুল্লেখিত খাতসমূহের প্রতিনিধিদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১৩/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
আহসান হাবিব বুলবুল	সাধারণ সম্পাদক ট্যাক্সি কার চালক শ্রমিক ইউনিয়ন
আব্দুর রাজ্জাক	সহ-সভাপতি সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
বিমল চন্দ্র সাহা	আইন সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
সাইফুজ্জামান বুলবুল	উপদেষ্টা, বগুড়া পাদুকা শ্রমিক ইউনিয়ন
আলিমুজ্জামান আলিম	যুগ্ম আহবায়ক
মো:শরীফ আহমেদ	যুগ্ম আহবায়ক
মো: মহিউদ্দিন আহমদ রিমেল	যুগ্ম আহবায়ক
মোহাম্মদ রাহাত আহমেদ	সভাপতি গাজীপুর মহানগর অঞ্চল- ৫ নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন
কিবরিয়া হোসেন	উপদেষ্টা কুলি শ্রমিক ইউনিয়ন চাতাল শ্রমিক ইউনিয়ন ইজি বাইক চালক ইউনিয়ন
রুখশানা আফরোজ আশা	সংগঠক গৃহ শ্রমিক সংগঠন, ঢাকা
সৌমিত্র কুমার দাশ	সভাপতি সাভার আশুলিয়া ধামরাই শিল্পাঞ্চল কমিটি গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট
সেলিম মাহমুদ	সাধারণ সম্পাদক কেন্দ্রীয় কমিটি গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট
জামাল	রি রোলিং শ্রমিক ফ্রন্ট, সভাপতি
না:হেল এসএম	কাদির সাংগঠনিক সম্পাদক রি রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট
মো: সোহেল রানা	স্টিল এন্ড রি রোলিং মিল
উত্তম চন্দ্র দাস	স্টিল এন্ড রি রোলিং মিল
মো: ফারুক হোসেন	সাংগঠনিক সম্পাদক ঢাকা নগর শ্রমিক ফ্রন্ট
আল আমীন (শ্রাবণ)	সভাপতি গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট গাজীপুর
মো: আবুল কালাম আজাদ	
মো: আনোয়ারুল ইসলাম	ঢাকা জেলা ট্যাক্সি,, অটোরিকশা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন
মো: রুবেল মিয়া	সাংগঠনিক সম্পাদক
আলমগীর হোসেন	সহ-সভাপতি
তাইয়েবা	সভাপতি
সাইফুল ইসলাম	
কোহিনূর আক্তার	সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
আবু নাইম খান বিপ্লব	সাধারণ সম্পাদক রি-রোলিং স্টিল মিলস শ্রমিক ফ্রন্ট
জনার্দন দত্ত নান্টু	উপদেষ্টা রিকশা ব্যাটারি, রিকশা, ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ
নব কুমার কর্মকার	উপদেষ্টা তাতঁ শ্রমিক জড়ি ও টুইস্টিং মিল ও বাঁশ তালাই বেত শ্রমিক
ইমাম হোসেন খোকন	মটর মেকানিক
খালেকুজ্জামান লিপন	রিকশা, ব্যাটারি, রিকশা, ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ
মোহাম্মদ সাইদ ইসলাম	সহকারী অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, বিইউপি
তানজিলা আফরিন	সহকারী অধ্যাপক, উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ বিইউপি
শতাব্দী চৌধুরী	টেকনিক্যাল টিম (এলআরসি)
সোহাগ	সদস্য ফার্মা জব সংস্কার আন্দোলন
শহিদুল ইসলাম শহিদ	ফার্মা জব সংস্কার আন্দোলন , সদস্য সচিব

এহসান আহমেদ	ফার্মা জব সংস্কার আন্দোলন , সদস্য সচিব
মো: জহিরুল ইসলাম	যুগ্ম আহবায়ক, ফার্মা জব সংস্কার আন্দোলন

সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটির সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা **তারিখ:** ১৩/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান
আরিফুল ইসলাম আদীব	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আব্দুর রহমান	যুগ্ম আহবায়ক সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
সোহেল রানা সম্পদ	সদস্য সচিব সড়ক পরিবহন
মোশারফ হোসেন	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক জোট
মো: সবুজ শিকদার	যুগ্ম আহবায়ক সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
নেওয়াজ খান বাপ্পি	ছাত্র প্রতিনিধি সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
মো: রুবেল হোসাইন	শ্রমিক প্রতিনিধি, সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
মো: আমির হোসেন	শ্রমিক প্রতিনিধি, সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
মো: আনোয়ার	শ্রমিক প্রতিনিধি, সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
আবু সালেক সেন্টু	শ্রমিক প্রতিনিধি, সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
সৈয়দ মাহবুবুর রহমান	যুব প্রতিনিধি, সড়ক পরিবহন সংস্কার জাতীয় কমিটি
মো: ইসমাইল	শ্রমিক
মো: নুর আলম	সদস্য
মো: ফারুক হাসান	সদস্য
মো: নুরুল আবদার পারভেছ	ঢাকা মহানগর শ্রমিক ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক
মো: জাহাঙ্গীর ভুঁইয়া	সদস্য
মাও. মুহী. ওমর ফারুক	যুগ্ম সদস্য সচিব
মো: আরিফুল ইসলাম	যুগ্ম সদস্য সচিব
মো: রিদয়	সদস্য এবি শ্রমিক
মোসা: আজিজা সুলতানা	যুগ্ম সদস্য সচিব, এ বি শ্রমিক
বাচ্চু ভুইয়া	শ্রমজীবী সমিতি সম্মেলন, এসএসপি, সমাজ

OSHE ফাউন্ডেশসনের সাথে শ্রম সয়স্কার কমিশনের মতবিনিময় সভঅ

স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২১/০১/ ০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কামরান টি রহমান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ফারুক আহমেদ	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
একেএম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রেহানা আক্তার রোমা	সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক এশিয়া
আবুল কালাম আজাদ	টিডব্লিউইউ প্রেসিডেন্ট
মাহমুদুল হাসান খান	বিএলএফ
গৌসাল আজমী খান	সিইও, অমনিফোরাস ইনকর্পোরেশন
আব্দুল মালেক	জি এস, টিডব্লিউইউ
খন্দকার শাফীন হাবিব খান	প্রোগ্রাম অফিসার, সলিডারিটি সেন্টার
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
রেজোয়ানুল হক আজম	প্রোগ্রাম অফিসার, সলিডারিটি সেন্টার
মোঃ শাহীনুর রহমান	কনসালটেন্ট, মনডিয়াল এফএনভি
ফিরোজ আলম	কো-অর্ডিনেটর, এলডিএফ
শতাব্দি চৌধুরী	টেকনিক্যাল কমিটি সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ মেহেদী ইসলাম	প্রোগ্রাম অফিসার, সলিডারিটি সেন্টার

মোস্তাফিজ আহমেদ	সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
মোঃ সাইফুল আলম	জিআইজেড
মোঃ আব্দুল্লাহ ইউসুফ খান	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, সলিডারিডাড নেটওয়ার্ক সেন্টার
মোঃ তাহেরুল ইসলাম	ডব্লিইই, প্রোগ্রাম
মুনির উদ্দিন শামীম	সি. প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইটিআই
আদিবা আফরোজ	গবেষক, শ্রম সংস্কার কমিশন
তামিম আহমেদ	এসআরএ, সিপিডি
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী, শ্রম সংস্কার কমিশন

রানা প্লাজা ভিকটিমদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রদান, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: সামিউল ইসলাম	সিএমও ওসি
শীলা বেগম	রানা প্লাজা ভিকটিম
জেসমিন আক্তার	রানা প্লাজা ভিকটিম
বুলবুলি	ওএক্সপি
পারুল	
মো: অহিদুল ইসলাম	রানা প্লাজা
মনোয়ারা জানাত (অহিদুল পিতা)	ভিকটিম সন্তান
মাওয়া (অহিদুল পিতা)	ভিকটিম সন্তান
আরাফাত (মা) পারুল	
জিহাদ (মা) জেসমিন	
মনির	
শাহাদাত হোসেন সোহান	
জান্নাতুল মাওয়া	

দপ্তরি কাম প্রহরীদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা **তারিখ:** ১৪/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান
মো: ইকবাল হোসেন	আউটসোর্সিং
মো: সফিকুল ইসলাম	দপ্তরি কাম প্রহরী
মো: সেলিম পারভেজ	দপ্তরি কাম প্রহরী
মো: ইউনুছ আলী	দপ্তরি কাম প্রহরী
মো: জসিম উদ্দিন মিয়া	দপ্তরি কাম প্রহরী
মো: আসিক মিয়া	দপ্তরি কাম প্রহরী
মো: ইউসুফ আলী	দপ্তরি কাম প্রহরী
সাধন কান্ড বাড়ই	দপ্তরি কাম প্রহরী
মো: কামরান ইসলাম	দপ্তরি কাম প্রহরী
মো: সেলিম খান	দপ্তরি কাম প্রহরী
জীবন রায়	দপ্তরি কাম প্রহরী
কাওসার আলম	দপ্তরি কাম প্রহরী
এফ এম সালাহউদ্দিন	দপ্তরি কাম প্রহরী
মো: ফরাজ শরীপ	দপ্তরি কাম প্রহরী
সুলতান মাহমুদ	দপ্তরি কাম প্রহরী
মো: মহসিন রেজা	দপ্তরি কাম প্রহরী
সাইফুল ইসলাম	দপ্তরি কাম প্রহরী
মো: খোরশেদ আলম	দপ্তরি কাম প্রহরী
শামসুল আলম	দপ্তরি কাম প্রহরী
লোকমান হোসেন	দপ্তরি কাম প্রহরী
খালেকুজ্জামান শিপন	সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: ইমন হোসেন	এমএলএসএস
আজিজুর রহমান	অফিস সহকারী
মো: রিপন ১	অফিস সহকারী
মো: রিপন ২	অফিস সহকারী

লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১৪/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
আরিফুল ইসলাম আদিব	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শারমিন সুলতানা	অ্যাডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট শ্রম আদালতের নিয়মিত আইনজীবী
মো: মহসিন মজুমদার	অ্যাডভোকেট জেনারেল সেক্রেটারি লেবার কোর্ট বার এসোসিয়েশন
মো: সেলিম আহমান খান	আইনজীবী
মো: মহিউদ্দিন হাওলাদার	আইনজীবী
রাবেয়া আফরোজ	আইনজীবী
মোস্তাফিজ আহমেদ	এসোসিয়েট প্রফেসর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এসোসিয়েট, এলআরসি

বিভিন্ন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১৪/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
কুতুবউদ্দিন আহমেদ	জেনারেল সেক্রেটারি বিডব্লিউএফ
আনোয়ার হোসাইন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সৈয়দ কুদরত-ই-খোদা	বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
এ এ এম ফয়েজ হোসেন	সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
মো:ইলিয়াস	সাধারণ সম্পাদক এনডব্লিওইউসি
মো: শামীম খান	সভাপতি জাতীয় তৃণমূল শ্রমিক ফেডারেশন
মোসা: সুমাইয়া ইসলাম	সা:সম্পাদক বাংলাদেশ গার্মেন্টস এন্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন
মানস নন্দী	সভাপতি বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
আবু ইউসুফ মোল্লা	সভাপতি বাংলাদেশ লেবার কংগ্রেস
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী	সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ সংযুক্ত শ্রমিক ফেডারেশন
মো:তোফাজ্জল হোসেন বাচ্চু	সভাপতি বিএসএসএফ
মোস্তাফিজ আহমেদ	এসোসিয়েট প্রফেসর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
মোহাম্মদ খোরশেদ আলম	ইউথ সেকশন বিজেএসডি
মো: নজরুল ইসলাম	বিজিএসবি সেক্রেটারি রাজস্ব
রাণী খান	সভাপতি এসএসএফ
মাও. মুহী ওমর ফারুক	সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রমিক অধিকার পরিষদ
সোহেল রানা সম্পদ	সাধারণ সম্পাদ শ্রমিক অধিকার পরিষদ
নূরুন নাহার তুবা	সহ:সভাপতি বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
রাজু আহমেদ	সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
মরিয়ম আক্তার	সাধারণ সম্পাদক,বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
লাবলী ইয়াসমিন	সাধারণ সম্পাদক জেবিজেএসএফ
সুলতানা বেগম	সভাপতি এনডব্লিওইউসি
নাহীদুল হাসান নয়ন	সাধারণ সম্পাদক
মো: ইব্রাহিম খলিল	সাধারণ সম্পাদক
আবদুল্লাহ আল কাদের	সাধারণ সম্পাদক
সৈয়দ শাহ আজিজ	সাংগঠনিক সম্পাদক
আবুল হোসাইন	জি.এস এনএফটিআইডব্লিও
মাসুদ রেজা	সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন
আব্দুর রহমান	সভাপতি শ্রমিক অধিকার পরিষদ

সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১৫/০১/২০২৫

নাম	পদবি
তপন দত্ত	সদস্য সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
নোমানুজ্জামান আজাদ	মহাসচিব
মো: বদরুল আলম সবুজ	অতি: মহাসচিব বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
মো: অহিদুর রহমান	অতি: মহাসচিব বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
মো:মোক্তার হোসেন	বাংলাদেশ চতুর্থ শ্রেণি সহকারী সমিতি সাধারণ সম্পাদক
মো: আবদুল ওয়াদুদ	কার্যকরী সভাপতি বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় অফিস-শ্রম আদালত
মো: ইউসুফ আলী	সহ:সভাপতি সরকারি সমন্বয় পরিষদ
মো:আলী মিয়া	বাংলাদেশ গণপূর্ত কর্মচারী ইউনিয়ন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মো:মোসলেহ উদ্দিন	উত্তরা ব্যাংক শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি
আবদুর রহিম	সদস্য বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
মো: মিজানুর রহমান	প্রধান সহকারী
মো: জসিম উদ্দিন	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রা:
মো: আবু কায়সার আজাদ	সিইও
মো: আবুল কালাম আজাদ	সাধারণ সম্পাদক রেলভবন, ঢাকা
মো: সাইফুল ইসলাম	রেলপথ মন্ত্রণালয়
মো: শিপন মিয়া	ডিএমসিএইচ
মো: মামুন মোল্লা	ডিএমসিএইচ
মো: মাহফুজুর রহমান	বাংলাদেশ রেলওয়ে
মো:জুলহাস কিবরিয়া	বাংলাদেশ রেলওয়ে
সৈয়দ আজগর আলী	সভাপতি রেলওয়ে
মো:রোকনুজ্জামান	অতিরিক্ত মহাসচিব বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
মো: ফারুক	সহকারী প্রচার ও দপ্তর গণপূর্ত
লিপি আক্তার	মৎস্য অধিদপ্তর ও মৎস্যভবন ঢাকা যুগ্ম মহাসচিব
ফাহমিদা আক্তার ইলা	সভাপতি বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী মহিলা পরিষদ
মো: জিল্লুর রহমান খান	যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
সৈয়দ সারোয়ার হোসেন	সভাপতি, বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ
মো: লুৎফুল মামুন	প্রধান সহকারী বিভাগীয় শ্রম দপ্তর ঢাকা, শ্রম অধিদপ্তর
মো:ছায়েদুর রহমান	প্রধান সহকারী শ্রম অধিদপ্তর

রাজশাহীর মানবাধিকার/আদিবাসী সংগঠনসমূহের কর্মীদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: নসট্রি, রাজশাহী তারিখ: ১৮/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শাকিল আখতার চৌধুরি	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সামিনা বেগম	কো-অর্ডিনেটর, ব্লাস্ট
কে. রায়	মহিলা পরিষদ
আফজাল হোসেন	
রাশেদ রিপন	পরিবর্তন
রাজ কুমার	আসুস

সাইফুল ইসলাম	বি ইউ পি রাজশাহী
নাজমুন নাহার	লাইট হাউস, রাজশাহী
হাসিবুর রহমান	পরিচালক
জান্নাতুল মৌরি	শিক্ষার্থী
মোঃ আওরঙ্গজেব কাকন	এডভোকেট
মোঃ মোমিনুল ইসলাম	আইনজীবী
মোঃ মাসুদুল্লাহ	সিডার, রাজশাহী
জাহিদুর রহমান	বাঁধন প্রতিবন্ধী সংস্থা
মারুফ ইসলাম পূর্ণিমা	দিনের আলো হিজড়া সংঘ
এস এম আহসান উল্লাহ সরকার	এ সি ডি রাজশাহী
মোঃ রেজাউল ইসলাম	এডভোকেট, ব্লাস্ট
মোঃ শাহীনুল হক মুন	এডভোকেট, ব্লাস্ট
জান্নাতুল ফেরদৌস	এডভোকেট, জজ কোর্ট, রাজশাহী
শাহনাজ পারভীন	নির্বাহী পরিচালক, লফস, রাজশাহী
টুম্পা পল	প্রোগ্রাম এসিট্যান্ট, লফস, রাজশাহী
লোটাস চিসিম	সিনিয়র ম্যানেজার, ওয়ার্ল্ড ভিশন
মাহমুদা বেগম (গুয়েনকা)	ডিরেক্টর, থানাপার এস ডি এস
মোঃ রফিকুল ইসলাম	সভাপতি, রেলওয়ে শ্রমিক দল
ড. আফরোজা আখতার	গবেষক, শ্রম সংস্কার কমিশন
মাহফুজুর রহমান ভুঁইয়া	যুগ্ম মহাপরিচালক, নসট্রি
মোঃ মাহবুব হোসেন	সহকারী পরিচালক, শাপলা
লরেন্স মন্ডল	সিনিওর পিও, ওয়ার্ল্ড ভিশন

রাজশাহীর স্কপ ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিদিদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: নসট্রি, রাজশাহী তারিখ: ১৮/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শাকিল আখতার চৌধুরি	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ রফিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
মোঃ রুকনুজ্জামান আলম	শ্রমিকদল, রাজশাহী জেলা
মোঃ রায়হান আহমেদ রাসেল	রাজশাহী শ্রমিক দর
মোৎ আহসান হাবিব চৌধুরি	ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন
কাজী হিরণ আলী	বিটিইউএফ
মোঃ জুয়েল রানা	বিটিইউএফ
ভি ই ক্যাস্ট্রো সাগর	বিটিইউএফ
নাদিম সিনা	বিটিইউএফ
মোঃ আব্দুর রউফ	রাজশাহী জেরা শ্রমিক দল, রেলওয়ে
মোঃ কাদের আহমেদ	বাংলাদেশ ট্রেন ই.
মোঃ রফিকুল ইসলাম	রিক্সা ভ্যান চালক ইউনিয়ন
মোঃ শাহাদত	শ্রমিক সম্পাদক
মোঃ রফিকুল ইসলাম	দোকান কর্মচারী
মোঃ আমান উল্লাহ	বি আর ইএল
মনিরুল ইসলাম	বি আর ইএল

মোঃ আমিনুল ইসলাম	বিএলএফ
সি এম আসাদুল্লাহ-হির-গালিব	বি এল এফ
আব্দুল মালেক	শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
মো শফিকুল ইসলাম	বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
মো নুরুল ইসলাম	রিক্সা ভ্যান শ্রমিক
বেনজামিন কুন্ডু	উপপরিচালক
মোঃ মাহবুব হোসেন	শাপলা, রাজশাহী
মোঃ সাইদুর রহমান	পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন
মোঃ আসলাম হোসেন	পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন
মোঃ ফিরোজ এ আলম	বাংলাদেম শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
মোঃ রফিকুল ইসলাম তোতা	রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়ন
মোঃ রোকুনুজ্জামান মালিক	শ্রমিক দল রাজশাহী
মোঃ কামরুজ্জামান (কাজল)	শ্রমিক দল
নবকুমার কর্মকার	সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
মোঃ মিঠুন আলী	শ্রমিক দল পুঠিয়া
মোঃ মাসুদ রানা	বোচিক
মোঃ মাসুদ রানা	শ্রমিক দল বোয়ালিয়া
মোঃ আব্দুস সামাদ	শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
মোঃ হাসিবুর রহমান	রাজশাহী ইমারত শ্রমিক ইউনিয়ন
মোঃ আবুল কালাম আজাদ	হোটেল ও রেস্টুরেন্ট শ্রমিক ইউনিয়ন
মোঃ ময়েন উদ্দিন	শ্রমিক দল রাজশাহী
মোঃ আব্দুল বারেক	শ্রমিক দল রাজশাহী
মোঃ রফিক উদ্দিন	শ্রমিক দল রাজশাহী
মোঃ রফিকুল ইসলাম	শ্রমিক দল রাজশাহী
মোঃ আব্দুল হাসিব চৌধুরি	ট্রাক চালক
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা
আলফাজ হোসেন	এস এস এফ
কালিপদ সরকার	সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
ড. আফরোজা আখতার	গবেষক, শ্রম সংস্কার কমিশন
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন

রাজশাহীর বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: নসট্রি, রাজশাহী তারিখ: ১৯/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শাকিল আখতার চৌধুরি	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ এন এম সাইফ উদ্দীন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. আফরোজা আখতার	গবেষক, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ সেলিম রেজা	সভাপতি, বেকারি মালিক সমিতি
মোঃ সাদরুল ইসলাম	পরিচালক, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স
মোঃ সাজ্জাদ আলী	পরিচালক, সফুরা সিল্ক মিলস
সুভাষ কুন্ডু	জেনারেল ম্যানেজার, যমুনা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগ্রো গ্রুপ
মোঃ ইউসুফ আলী	রাজশাহী স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং মালিক সমিতি

মোঃ বাবু	রাজশাহী স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং মালিক সমিতি
মোঃ খায়রুল ইসলাম	রাজশাহী স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং মালিক সমিতি
মোঃ মোখলেসুর রহমান	
মোঃ আশরাফুল ইসলাম	
মোঃ শামসুজ্জোহা	প্রধান হিসাব কর্মকর্তা, নবাব গ্রুপ
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
মোঃ জসিম উদ্দিন	সহকারি ম্যানেজার, নাবিল গ্রুপ
মোঃ সোহেল রানা	সহকারি ম্যানেজার, নাবিল গ্রুপ
মোঃ মাহফুজুর রহমান ভুঁইয়া	যুগ্ম মহাপরিচালক, নসট্রি
মোঃ দীন আমিন সরকার	উপ মহাপরিচালক, নসট্রি
রিয়াজ আহমেদ খান	সভাপতি, রেস্তোরা মালিক সমিতি
মোঃ আব্দুল্লাহ আল ইয়াসিন	সহ: সচিব, আরসিসিআই
মাসুদুর রহমান রিংকু	সভাপতি, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ
মোঃ শাখাওয়াত হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, রাজশাহী মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী সমিতি
মোঃ ফেরদৌস চৌধুরি মিলন	সহ সভাপতি, রাজশাহী মোবাইল ফোন ব্যবসায়ী সমিতি
মোঃ নাজিরুল ইসলাম	মিস্ট্রি জুয়েলার্স প্রোইটারি
মোঃ সাদ্দাম হোসেন	অফিস সচিব, বাজুস, রাজশাহী
মোঃ আশরাফুল ইসলাম	বাজুস
মোঃ মোখলেসুর রহমান	বাজুস
মোঃ মকবুল হোসেন	সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন

রংপুরস্থ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন এর সদস্যদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের সভা
স্থান: সম্মেলন কক্ষ, সার্কিট হাউস, রংপুর তারিখ: ২০/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন পধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আনোয়ার হোসাইন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: রবিউল আলম শিকদার	অপারেশন ম্যানেজার
মো:জিয়াউর রহমান	সহ. ব্যবস্থাপক, মানব সম্পদ
মো:আশিকুর হোসেন আশিক	সাধারণ সম্পাদক রংপুর জেলা ট্রাক মালিক সমিতি
আলহাজ আনিসুর রহমান রাজু	নবাবগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতি রংপুর
ইমরান	এক্সিকিউটিভ ব্লিং লেদার
কাসমেরি আক্তার	লিফ রিপোর্ট অফিসার বিএটিবি
মো:সোহাগ হোসাইন	সিনিয়র অফিসার এইচআরডিএ
মো:সায়দুর রহমান	কোষাধ্যক্ষ রংপুর মটর মালিক সমিতি
মো:মাইশিদ ফারহান (জিহান)	যুগ্ম সম্পাদক রংপুর জেলা মটর মালিক সমিতি
মো:আ:লতিফ সরকার	সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক শ্রম সংঘ রংপুর
এম.এ.জুবায়ের	সভাপতি রংপুর জেলা ট্রাক মালিক সমিতি
মো:কাশফুল আউলিয়া	রংপুর জেলা রেস্তরাঁ মালিক সমিতি
মো:ইব্রাহীম হক ব্যাপারি	সাংগঠনিক সম্পাদক রেস্তরাঁ মালিক সমিতি
মো:আসলাম হোসেন	সহ সভাপতি সা:সমিতি
মো:হুমায়ুন খালিদ	এক্সিকিউটিভ এইচআর কাজী ফার্মস রংপুর
মো: মমিনুর রহমান	সি:সহ:ব্যবস্থাপক
অধ্যাপক ডা: সৈয়দ মামুনুর রহমান	সভাপতি, বাংলাদেশ প্রাইভেট হসপিটাল, ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক ওনার্স এসোসিয়েশন
মো:রফিকুল ইসলাম	সহকারী পুলিশ সুপার পুলিশ সুপারের কার্যালয়
গৌতম কুমার হাওলাদার	হেড অব এডমিনিস্ট্রেশন শ্যামলী সিটি গ্রুপ
এস আজিজুল হক	সা: সম্পাদক জেলা ইট ভাটা মালিক সমিতি, রংপুর
মেজর (অব:) মো: আব্দুল খালেক	জিএম এডমিন আরএফএল জিএম এডমিন

মো: হোসেন আলি	ম্যানেজার এডমিন কমপ্লায়েন্স আরএফএল
মো:সিবলি সাদিক পাপন	ম্যানেজার এইচআর এডমিন
মো: এনামুল হক	সহ-সভাপতি ইট ভাটা মালিক সমিতি
মো:রমজান আলী	ফিল্ড অর্গানাইজার এসআরএস
ঠাকুর পিয়ুস মোহন রায়	শ্রম পরিদর্শক স্বাস্থ্য ডিআইএফই, রংপুর
লক্ষেশর রায়	লেবার ইনস্পেকটর হেলথ ডিআইএফই
মো:আবু হানিফা	সহকারী ব্যবস্থাপক ইস্পাহানি এগ্রো লিঃ
মো:রকিবুল হাসান	সম্প্রসারন কর্মকর্তা বিসিক জেলা কার্যালয়, রংপুর
মো:মফিজুর রহমান	এজিএই অপারেটর জেলা তথ্য অফিস রংপুর
মো: সোহান আলম	ডিআইএফই
মো: আফজাল হোসেন	সভাপতি ব্যাটারি চালিত রিক্সা মালিক সমিতি রংপুর
নুর ইসলাম	সহ সভাপতি ব্যাটারি চালিত রিক্সা মালিক সমিতি রংপুর
তুষার ক্রান্তি রায়	উপপরিচালক আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর রংপুর
মোহাম্মদ এম এইচ মনিরুজ্জামান	সহকারী মহাপরিদর্শক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর রংপুর
আফজাল হোসেন	শ্রম পরিদর্শক (সা:)
মো:সিরাজুল ইসলাম	অফিস সহায়ক
মো:জুলফিকার আলী	শ্রম পরিদর্শক (সা:) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর রংপুর
সৈয়দ সাইফুল্লাহ	শ্রম পরিদর্শক (সা:) ডাইফ, রংপুর

রংপুরস্থ স্কপ ও অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের সাথে শ্রম সংস্কার কমশিনের মতবনিময় সভা
স্থান: সম্মেলন কক্ষ, সার্কিট হাউস, রংপুর **তারিখ:** ২০/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
আনোয়ার হোসাইন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: রফিকুল ইসলাম সহকারী পুলিশ সুপার	এএসপি
সাজেদুল ইসলাম দুলাল	সদস্য সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট শ্রমিক ফ্রন্ট
মোসা: আমিনা বেগম	গৃহকর্মী
হীরামণি	হোটেল শ্রমিক
মো: আলী	ড্রাইভার
শ্রী রণজিৎ সুত্রধর	জেলে শ্রমিক
লাবলু	ইজিবাইক শ্রমিক ফেডারেশন সভাপতি
কৃষিবিদ বিমল খালজে	সভাপতি জাতীয় আদিবাসী পরিষদ রংপুর
মামুন তুরি	সাংগঠনিক সম্পাদক
আব্দুল মালেক	সেলুন শ্রমিক
রাধা রাণী রায়	কর্মজীবী চারী দিনাজপুর
জাবিদ হোসেন স্বপন	সমন্বয়ক কর্মজীবী নারী, রংপুর অঞ্চল
মৌসুমি ফেরদৌসী	সাধারণ সম্পাদক কর্মজীবী নারী দিনাজপুর
হাবিব আহাম্মেদ	সাধারণ সম্পাদক জাতীয় নির্মাণ শ্রমিক জোট বাংলাদেশ
আরিফুল ইসলাম আরিফ	সভাপতি বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ, রংপুর জেলা
মো: মইনুল ইসলাম	আহবায়ক শ্রমিক অধিকার পরিষদ রংপুর মহানগর
মো: রহমতুল্লাহ	বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ
দিলরুবা রহমান	সমন্বয়কারী ব্লাস্ট, রংপুর ইউনিট
মো: রফিকুল ইসলাম	রিজিওনাল ম্যানেজার ইউসেপ রংপুর ইউনিট
মো: আলহাজ জসিম উদ্দিন	পানি উন্নয়ন বোর্ড, শ্রমিক দল রংপুর জেলা
মেজবাহুন নাহার	সমন্বয়কারী লিগ্যাল এইড এন্ড নারী অধিকার আরডিআরএস বাংলাদেশ
এ এ এম মুনীর চৌধুরী	আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী প্রধান নির্বাহী মানবাধিকার ও পরিবেশ আন্দোলন, বাংলাদেশ
মোহাম্মদ এমএইচ মনিরুজ্জামান	সহকারী মহাপরিচালক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধি
মো: আ: খালেক	যুগ্ম আহবায়ক শ্রমিকদল, রংপুর বিভাগ
মমিনুল ইসলাম	যুগ্ম আহবায়ক শ্রমিক দল, রংপুর বিভাগ
তুষার কান্তি রায়	উপপরিচালক আঞ্চলিক শ্রমদপ্তর, রংপুর
এ.কে.এস জহুরুল ইসলাম	২০ মে: ও: সিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রংপুর

সিরাজ উদ্দিন আহাম্মেদ (ডাবলু)	মটর সাইকেল মেকানিকাল ওয়ার্কার
কিবরিয়া হোসেন	উপদেষ্টা কুলি মজুর শ্রমিক ইউনিয়ন
মো: রাসেল রানা	উপজেলা ব্যবস্থাপক ব্রাক, রংপুর
রাধাকান্ত	
মো: ইসমাইল হোসেন	সভাপতি রংপুর বিভিপিও
মো: শাহজাহান মজুমদার	রংপুর জেলা শ্রমিক দলের কমিটি সদস্্য রংপুর সাবেক কার্যকরী সভাপতি
কাজী জাহিদ হোসেন	লুসিড রংপুর জেলা শ্রমিক দলের আহবায়ক কমিটির সদস্য
মো: রফিকুল ইসলাম রফিক	বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদ যুগ্ম সদস্য সচিব মহানগর
সমসের আলী	হোটেল শ্রমিক
মো: মনির হোসেন	ইজিবাইক স: পো: দিনাজপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক
আফজাল হোসেন	শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ) ডিআইএফই, রংপুর
আব্দুল হামিদ বাবু	সদস্য
ঠাকুর পীয়ুষ মোনে রায়	শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) ডিআইএফই, রংপুর
রনজিৎ রবি দাস	বুট মেকার
সুজিলা লাকড়া	কৃষি শ্রমিক
সরলা কুজুর	কৃষি শ্রমিক
জাহাঙ্গীর আলম	সাধারণ সম্পাদক রিক্সা শ্রমিক ফ্রন্ট
মো: মশিউর রহমান	অফিসার আরডিআরএস বাংলাদেশ
মো: হাফিজুর রহমান খাঁন	এপিএই অপারেটর জেলা তথ্য অফিস রংপুর
মো: মোস্তফা	হোটেল শ্রমিক
অধ্যাপক মো: তৌফিক আলী	অধ্যাপনা/সাংবাদিকতা
মো: ছাদিকুল ইসলাম সাদিক	সি: যুগ্ম আহবায়ক রংপুর জেলা শ্রমিক
মো: আ: লতিফ সরকার	সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক শ্রম
লঙ্কেশ্বর রায়	শ্রম পরিদর্শক, স্বাস্থ্য, ডিআইএফই

হালকা যানবাহন সংগঠনের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা **তারিখ: ২০/০১/২০২৫**

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আক্তার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
অনন্য রায়হান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম আদিব	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: গোলাম ফারুক	সাধারণ সম্পাদক
মুহা: শাহ আলম	সভাপতি, ঢাকা মহানগর
মো: শাহাদাত হোসেন	
সিরাজুল ইসলাম	
ইব্রাহিম	
মো: মনির	
মো: সাইফুল ইসলাম (রাজন)	সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা মহানগর
মো: মহাজেম	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা মহানগর
মো: মোজাম্মেল হক বাবু	কার্যকরি সদস্য, বাংলাদেশ অটোরিকশা, হাল্কা যান ফেডারেশন
মিজানুর রহমান চৌধুরী	সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
আদিবা আফরোজ	গবেষক
মো: সোহরাব হোসেন	সাংগঠনিক সম্পাদক
মো: আবুল কালাম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: আনোয়ারুল ইসলাম	কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, টেক্সি-কার, অটো-টেম্পু, অটোরিকশা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন
মো: হাবিবুর রহমান হাবিব	সহ-সাধারণ সম্পাদক
বীরেশ চন্দ্র দাশ	কার্যকরী সভাপতি
আলমগীর হোসেন	সহ-সভাপতি, ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, টেক্সি-কার, অটো-টেম্পু, অটোরিকশা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন
মো: রফিকুল ইসলাম রফিক	সহ-সভাপতি, ঢাকা জেলা ট্যাক্সি, টেক্সি-কার, অটো-টেম্পু, অটোরিকশা চালক শ্রমিক ইউনিয়ন

আবুল হোসাইন	BALTWF

গিগ এবং অ্যাপ বেজড্ ওয়ার্কারদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২০/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আক্তার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
অনন্য রায়হান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
নাহিদুল ইসলাম নয়ন	উপদেষ্টা, বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন
আল-মামুন	সভাপতি, বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন
মো: ফিরোজ আলম	উপদেষ্টা, বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন
দেবোজ্যোতি সাহা ধ্রুব	সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন
ফারজানা আক্তার মনি	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন
আব্দুল আহাদ শাজিদ	যুব উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন
মো: ছাব্বির হোসেন জয়	বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন
মো: জাহাঙ্গীর সরদার	বাংলাদেশ গিগ ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন
আদিবা আফরোজ	গবেষক
সানোয়ার সানি	ATU, Chief E. Media
নাসির	ATU
জুয়েল রানা	ATU
এস এম কামরুল হাসান	আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিষয়ক সম্পাদক, ATU
মো: ফরিদুজ্জামান (রনি)	শিক্ষা সম্পাদক
আব্দুল্লাহ আল মারুফ	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক
বেলাল আহমেদ	সভাপতি, অ্যাপ বেইজড ট্রান্স: ই:
আখি কার্যকরী সভাপতি	সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশন
মো: মাছুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, DIFE
নূর জাহান	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি

DWRN ও BNSK এর সাথে শ্রম সংস্কার কমশিনের সভা
স্থান: শ্রম ভবন, বিজয়নগর, ঢাকা তারিখ: ২০/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
আবুল হোসাইন	উপদেষ্টা এনডিডব্লিওডব্লিওইউ
মুর্শিদা আখতার	সাধারণ সম্পাদক
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
হাওয়ানুর বেগম	
শাহানুর বেগম	
মরজিনা	
হাসিনা বানু পলি	এডভোকেট সুপ্রিম কোর্ট
আমেনা	
সেতারা বেগম	
মাহিনুর কাজী	
রেনু আরা	যুগ্ম সম্পাদক
নাহার আক্তার	সদস্য
মিনারা মমতাজ বেগম	সভাপতি
জাহান আরা হক	কার্যকরী সভাপতি
জোবায়দা পারভিন	উপদেষ্টা
মো: শফিকুর রহমান	সহকারী পরিচালক শ্রম অধিদপ্তর
আতাউর রহমান	সাংবাদিক, বাসস

আমেরিকান টিমের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২১/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রদান, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ এন এফ সাইফুদ্দিন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মইন চৌধুরী	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার
ভাওলা ওয়ান	পুমা ম্যানেজার স্যোশাল সাস্টেইনএবিলিটি
স্টেলা হ্যাপি মন্ডল	কমপ্লায়েন্স অফিসার
তায়ুব	
তানভীর আলম	সিনিয়র ম্যানেজার
মো: মুস্তাফিজুর রহমান	ম্যানেজার স্যোশাল সাসটেইনেবিলিটি
মুস্তাফিজ আহমেদ	এসোসিয়েট প্রফেসর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
ডা. হাসান আসরাফ	এসোসিয়েট প্রফেসর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
আদিবা আফরোজ	রিসার্চার এলআরসি/ বিডি গার্মেন্টস ওয়ার্কার্স সলিডারিটি
হান্নান লারসন	এসোসিয়েট ফেয়ার লেবার এসোসিয়েশন
চৈমি আজমি	ম্যানেজার ফেয়ার লেবার এসোসিয়েশন
টিফ্ফানি রবার্স	ডিরেক্টর ফেয়ার লেবার এসোসিয়েশন
কেট মিলার	ম্যানেজার কেএমডি ব্রান্ডস
মো: ইসমাইল মুরাদ	ম্যানেজার কলম্বিয়া স্পোর্টস অয়ার কম্পানি
বুসরা বিনতে বাতেন	সিআর ম্যানেজার
শেলি হান	ফেয়ার লেবার এসোসিয়েশন
জেসিকা নারসো	রিজিওনাল ডিরেক্টর ইউএফ কর্পোরেশন
নাট হরম্যান	সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন

ETI, RISE এর সাথে শ্রম কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট লেবার স্টাডিজ অফিস তারিখ: ৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫

নাম	পদবি
আবিল বিল আমিন	ইটিআই, কান্ট্রি ম্যানেজার
নাজমা ইয়াসমিন	ডিরেক্টর, বিলস
সুকন্যা আহমেদ	কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর, রাইজ
কোহিনুর মাহমুদ	ডিরেক্টর, বিলস
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ ইউসুফ আল মামুন	বিলস
সজীব দে	বিলস

Practical Action এর সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা

নাম	পদবি
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আক্তার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শাকিল আক্তার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আখি	আফওয়া জোট
সুমাইয়া ইসলাম	
তাহমিদ হোসেন	টেকনিক্যাল স্পেশালিষ্ট
খাইরুল মামুন পিন্টু	এশিয়া ফ্লোরওয়েজ অ্যালাইড বাংলাদেশ
আরিফুর রহমান	AFWA
মো: ফরিদুজ্জামান	প্রোগ্রাম ম্যানেজার
কাজী মো: রুহুল আমিন	আহ্বায়ক, এশিয়া ফ্লোরওয়েজ অ্যালাইড বাংলাদেশ
ইশরাত শবনম	কান্ট্রি ডিরেক্টর, প্র্যাকটিকাল অ্যাকশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন

গার্মেন্টস সংগঠনের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন

নাম	পদবি
লাভলী ইয়াসমিন	আহবায়ক জি.এস.পি
রাফী খান	সদস্য সচিব জি.এস.পি
মোরশেদ আলম	সহ সদস্য সচিব
মরিয়ম আক্তার	সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
নাহিদুল হাসান নয়ন	সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশন
মো. রফিক সভাপতি	বিজেএসএফ
মো. সাগর আহমেদ বাদশা	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এম.জেএস.এফ
আঁখি সম্মিলিত	শ্রমিক ফেডারেশন
আবুল কাসেম (দুলাল)	কার্যকরী সভাপতি বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন
মো. নুরুল ইসলাম	বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন
মো. আনোয়ার হোসেন	বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন
মো. শাওন হাওলাদার	বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন

সোনালী ব্যাংক কর্মচারীদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২২/০১/২০২৫

নাম	পদবি
মোঃ জাকির হোসেন	সোনালী ব্যাংক
মোঃ মিরাজ জলিল আহমেদ	সোনালী ব্যাংক
মোঃ আল আমিন শেখ বাবুল	সোনালী ব্যাংক
জাহাঙ্গীর আলম	সোনালী ব্যাংক
মুহাম্মদ সৈয়দ হোসেন	সোনালী ব্যাংক
মোঃ আমির হোসেন পাটোয়ারী	সোনালী ব্যাংক
একরম হাবিবুর রহমান	সোনালী ব্যাংক
মোঃ মোরছালীন	ক্রিড়া সম্পাদক
এস আহমেদ	সোনালী ব্যাংক, CBA-সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ ওয়াজকুরুনী শিকদার	CBA সহ-সাধারণ সম্পাদক
মোঃ শাহে আলম সহ-সভাপতি	CBA কেন্দ্রীয় কমিটি
নাছরিন আক্তার ডিনা	সহ-সম্পাদক, BJSD মহিলা কমিটি
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কামরান টি রহমান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২২/০১/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কামরান টি. রহমান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ শাহিনুর রহমান	কনসালটেন্ট, মনডিয়াল এফ এন ভি
নীরান আর	প্রোগ্রাম ম্যানেজার, আইএলও
মোঃ সাইদুল ইসলাম	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, আইএলও
মরিয়ম	অ্যাকশন এইড
মনির উদ্দিন শামিম	সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার
চায়ানিচ থামপারিপাত্রা	টেকনিক্যাল, আইএলও

ওলে জাস্টিনসন	সেক্টর কাউন্সিলর
ফাহিম আবরার	এসোসিয়েট এডভাইজার
বাবুল আজাদ	ডেপুট চিফ অব পার্টি
শতাব্দি চৌধুরী	টেকনিক্যাল কমিটি মেম্বার, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন
কোহিনূর মাহমুদ	ডিরেক্টর, বিলস
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
আদিবা আফরোজ	টেকনিক্যাল কমিটি মেম্বার, শ্রম সংস্কার কমিশন
বুদ্ধি এ.	রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর
জাকিয়া খানম	প্রোগ্রাম অফিসার
সিলভিয়া পপ	প্রজেক্ট ম্যানেজার, জিআইজেড
শেখ মাহমুদুর আহসান	এডভাইজর, জার্মান এম্বাসি
মাহমুদা সুলতানা	প্রোগ্রাম ডিরেক্টর
তারেক আজিজ	ওপ্রাগ্রাম কো-অর্ডিনেটর
মনোয়ার হোসেন	ব্রাক, সিনিয়র ম্যানেজার, এসজিএমসি
জেরেফ জব্বার	ডিরেক্টর
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
ফারুক আহমেদ	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
সাজ্জাদ কামাল	প্রজেক্ট ম্যানেজার
সাইফুজ্জামান মেহরাব	লেবার স্পেশালিস্ট

শ্রম অভিবাসন বিষয়ে ILO ও WARBE এর সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা

স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২১/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্‌দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
শরিফুল ইসলাম হাসান	এসোসিয়েট ডিরেক্টর, ব্রাক মাইগ্রেশন অন ইয়থ
এস এম এফ পাশা	ডিরেক্টর, আইটিইউসি-এশিয়া প্যাসিফিক
শালিক আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
জেসমিন সিদ্দিকী	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আসিফ আইয়ুব	যুগ্ম সচিব, বিইএফ
আসিফ মুনির	মাইগ্রেশন এনালিস্ট
মাজহারুল ইসলাম	ন্যাশনাল প্রো. অফিসার, আইএলও
শাহরীন মুনির	এনপিও, আইএমও
সৈয়দ মাহবুব এলাহি	চেয়ারম্যান
চায়না রহমান	জি এস, এফ জি ডব্লিউ
ইমাম হাসান	অফিস স্টাফ, ডাইফ
আব্দুর রহমান	অফিস সহায়ক, শ্রম অধিদপ্তর
মামুন	শ্রম অধিদপ্তর
রাজিব হাসান	কমিউনিকেসন কো-অর্ডিনেটর, ফ্যিল্ম ফর পিস
মোঃ সোহরাওয়ার্দি হোসেন	ডিরেক্টর, ওয়ারবি
মুন্নি আক্তার	
রেহনুমা সালাম খান	প্রজেক্ট ম্যানেজার
মুর্শিদা আক্তার	G S, NDWWW
নাসরিন আক্তার দিনা	জি এস, বিলস
মোঃ নজরুল ইসলাম	এস ইউ এইচ এ
আনিসুর রহমান খান	এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, আইএমএ রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ফারহানা নিলা	সাংবাদিক, সারা বাংলা
জারিন তাসনিম	প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, কর্মজীবী নারি
সানজানা শবনম	প্রোগ্রাম এসোসিয়েট, এশিয়া ফাউন্ডেশন
সিমান্ত দত্ত	ডিপিসি, বিএনএসকে

তমশ্রি দাশ	পিসি, বিএনএসকে
মনি	মাইগ্রেন্ট শ্রমিক
শাহনাজ	মাইগ্রেন্ট শ্রমিক
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এসোসিয়েট, লেবার রিফর্ম কমিশন
নূর জাহান আমিনা মনি	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, লেবার রিফর্ম কমিশন

গণমাধ্যমকর্মীদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২২/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
মোতাহার হোসেন	সাধারণ সম্পাদক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সা. সমিতি
মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহি	সভাপতি ঢাবি সাংবাদিক সমিতি
ইকরামুল কবীর	ব্রডকাস্ট ব্যর্সালিস্ট ইনডিলশনডেন্ট টিভি, ইয়াং ব্রডকাস্ট ব্যর্সালিস্ট ইউনিটি
হাসিব বিল্লাহ	প্রতিবেদক এখন টিভি
মো: ফারুক হোসেন তানভীর	সভাপতি টিভি ক্যামেরা জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন (টিসিএ)
আসাদুজ্জামান চৌধুরী	এটিএন মিডিয়া কমিউনিকেশন লিমিটেড
আলী ইমাম সুমন	সহ-সভাপতি / জেলা সাব-এডিটরস কাউন্সিল
জাওহার ইকবাল খান	সাধারণ সম্পাদক ঢাকা সাব-এডিটর কাউন্সিল ডিএসইসি
আকবর হোসেন	জার্নালিস্ট
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রফিক মুহাম্মদ	বিশেষ সংবাদদাতা দৈনিক ইনকিলাব
আতাউর রহমান	সাধারণ সম্পাদক লেবর রাইটস ফোরাম
মিলটন আনোয়ার	পরিকল্পনা সম্পাদক ৭১ টিভি নির্বাহী
দিদারুল আলম	যুগ্ম সম্পাদক ডিইউজে
নুজহাত আফরীন	ভাইস প্রেসিডেন্ট এবিসি
লিজা চৌধুরী	সিনিয়র প্রেজেন্টার জি+বি ভাইস প্রেসিডেন্ট এবিসি
মুনিরা মুন্নি	সিনিয়র রিপোর্টার দি ফিনানশিয়াল এক্সপ্রেস
মুস্তাফিজ আহমেদ	এসোসিয়েট প্রফেসর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আহাদুর রহমান চন্দন	সাংবাদিক
মো: ফোরকান আহসান	পিআরও ডিআইএফই
মো: শামসুল হুদা	সিনিয়র ক্যামেরা পার্সন একাত্তর +টিসিএ
রিয়াজ মাহমুদ মিঠু	ডিআইএফই হেডকোয়াটার
মো: হালিম সায়েম	বিলস
আয়শা ইয়াসমিন	রিসার্চ এসোসিয়েট, এলআরসি
নূরজাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, এলআরসি

সিলেটস্থ বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সদস্যদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: সার্কিট হাউস, সিলেট, তারিখ: ২৬/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
মোঃ আব্দুস সামাদ	এসসিসিআই ভাইস প্রেসিডেন্ট
মোঃ জহির হোসেন	ডিরেক্টর মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স
সানজিদা খানম	ডিরেক্টর এইচ.সি.লিমিটেড
জাহাঙ্গীর হক	ডিরেক্টর অব ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স
ডাঃ তানভীর উজ জামান	ডেপুটি ডিরেক্টর মাউন্ট অ্যাডোরা হসপিটাল, সিলেট
হাজী আব্দুল আহাদ	ভি.পি.সিলেট ব্রিকস ওনার সো.
মোঃ ওহিদ মিয়া	চেয়ারম্যান উত্তরা বিক্স ফিল্ড
মোঃ কায়েছ আহমদ	এম/এস হার্ড শিপ ব্রিকস
শামীম আহমদ	এম/এস সোনালী এন্টারপ্রাইজ ডিরেক্টর
মোঃ রিয়াজ উদ্দীন	স্টার ব্রিকস ফিল্ড

হিমাংশু মিত্র	সিইও তৃণমূল নারী উদ্যোক্তা সোসাইটি সদস্য
লাকী আহমেদ	বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন ও সাংবাদিক
আহসান আহমদ খান	মেসার্স দেশ বিমান এন্ড কোং
মোঃ ইমরান হোসেন	এক্সিকিউটিভ অফিসার দি সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
তসলিব উদ্দীন	ব্যবস্থাপক ফুলকলি ফুড প্রোডাক্টস
নুরুল ইসলাম সুমন	বিসিক মালিক সমিতি সিলেট
মোঃ আরিফুর রহমান	পরিচালক তালিম পল্ট্রি এন্ড এগ্রো সদস্য (নাসিব) সিলেট জেলা
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
এ. এন. এম. সাইফুদ্দীন	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ নূরুল আলম	সেক্রেটারী বাংলাদেশ সুইটস মেনুফ্যাক্চারিং এসোসিয়েশন
মোঃ আবুল বাশার	সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট
অধীরচন্দ্র বালা	উপপরিচালক,আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর, সিলেট
মো:কাউছার আলগীর	শ্রম পরিদর্শক (স্বাস্থ্য) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন

সিলেটস্থ স্কপ ও অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: সম্মেলন কক্ষ, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, সিলেট, তারিখ: ২৬/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ. এন. এম. সাইফ উদ্দিন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো:মোরশম আলী	আহবায়ক জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
আবু জাফর	সভাপতি সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
প্রণব জ্যোতি পাল	সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
মাইকেল কুমার শর্মা	জালালাবাদ গ্যাস আউটসোর্সিং কর্মচারী সভাপতি
মনি চন্দ্র সিংহ	সহ-সভাপতি, জালালাবাদ গ্যাস আউটসোর্সিং কর্মচারী
আতিকুর রহমান	আউটসোর্সিং কর্মচারী
মো:উসমান আলী	সাধারণ সম্পাদক সিলেট গ্যাস ফিল্ড কর্মচারী ইউনিয়ন
প্রদীপ কুমার শর্মা	সা:সভাপতি, সিলেট গ্যাস ফিল্ড কর্মচারী ইউনিয়ন
মো:শফিকুল ইসলাম বাচ্চু	সাধারণ সম্পাদক জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
আবুল বাশার বাদশা	সিনিয়র সহসভাপতি কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা শ্রমিক দল
মো:জুমায়েল ইসলাম জুয়েল	ট্রাক শ্রমিক সহ-সভাপতি
শাহজাহান আহমদ	সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রমিক দল, সভাপতি ২০৯৭ উপপরিষদ
সেলিম আহমদ	সাধারণ সম্পাদক বিয়ানীবাজার, শ্রমিক দল
রাজু গোয়ালা	সভাপতি সিলেট ভ্যালি
নুরুল আহমদ লোচন	বাজাইক
মো:মহসিন রেজা	এফ এন্ড এ/ও আরডব্লিওডিও-সিলেট
মো:নিজাম উদ্দিন	সাংগঠনিক সম্পাদক
শফিকুল ইসলাম	ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা শ্রমিক
মো:মুজিবুর রহমান	ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা শ্রমিক
মো:এরশাদ মিয়া	ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা শ্রমিক
মো:জুয়েল আহমদ	কোম্পানিগঞ্জ উপজেলা শ্রমিকদল
সবুজতাঁতী	
মামুক মিয়া	সাবেক সহ-সভাপতি জেলা শ্রমিকদল
মো: সাইফুল ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক জৈন্তাপুর
মো:মুক্তি	দক্ষিণ সুরমা সহসভাপতি জাতীয় শ্রমিক দল
ময়নুল ইসলাম (অপু)	সাংগঠনিক সম্পাদক সদর উপজেলা জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
আব্দুল লতিফ	যুগ্ম সম্পাদক শাহজালাল ফার্টিলাইজার শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন এবং সহসম্পাদক বাংলাদেশ কেমিক্যাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
মো:ফখরুল ইসলাম	সা:স:কর্মচারী শ্রমিক ইউনিয়ন সিসিক, পরিদর্শক লাইসেন্স
লক্ষীকান্ত সিংহ	নির্বাহী পরিচালক একডো, সিলেট

মদরিছ আলী	গোয়াইন ঘাট মো:আবুল বাশার সহকারী পরিচালক আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর সিলেট
অধীর চন্দ্র পাল	উপপরিচালক
তারেক আজিজ	প্রোগ্রাম সমন্বয়ক অক্সফাম
শাহাজাদী বেগম	প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর অক্সফাম
গীতা রানী মুন্ডা	চা শ্রমিক
কল্পনা রানী নায়েক	চা শ্রমিক
লাকী আহমেদ	বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন অন্তর্ভুক্ত, সদস্য সিলেট
সোহেল বিশ্বাচা	সাধারণ সম্পাদক লাক্কতুরা ডানচার্থেও কমিটি
শ্রী দেবু বাউরী	সিলেট ভ্যালী সম্পাদক
এ. এইচ. এম. জাফর চৌধুরী	এ্যাডভোকেট বিএফটিসি
আলমগীর	মহ:সাধারণ সম্পাদক বিটিইএসএ
লক্ষীচরন বাকতি	
মনীষা ওয়াহিদ	কেন্দ্রীয় সংগঠক চা.শ্রমিকের ১০দফা বাস্তবায়ন সংগ্রাম কমিটি
প্রবীর চন্দ্র দে	বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক জোট
আব্দুহ হালাম	গোয়াইন ঘাট উপজেলা শ্রমিক দল সাধারণ সম্পাদক
আ: জলিল	শ্রমিক
মো: আমির হুসেন	শ্রমিক
মো: দেলওয়ার মোসাহিদ	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
মো: রমজান আশিক	পাথর শ্রমিক সহ-সভাপতি
মো: রফিক শেখ	ব্যাটারি রিকশা সভাপতি
মো: সাইফুল ইসলাম	শ্রমিক ফ্রন্ট সহসভাপতি
হারুনুর রশিদ	ব্যাটারি শ্রমিক
মফিজুল ইসলাম	জালালাবাদ সিবিএ শ্রমিক
জাহিদুল ইসলাম রশিদ	প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর
দিপালী গোয়ালা	ইউপি মেম্বার ৬নং টুকেরবাজার
পারভীন বেগম	মহিলা শ্রমিক দল
মিন্টু দাস	দলদলি চা বাগান সভাপতি
জিতেন সবর	মালনীছড়া চা বাগান পঞ্চায়েতী সভাপতি
নুরুল ইসলাম	সদস্য সচিব, জেলা শ্রমিক দল
ছায়াদুল ইসলাম	বাংলাদেশ লেবার ফেডারেশন
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
মনজুর রহমান	সংগ্রাম পরিষদ, সিলেট মহানগর
জামিল আহমেদ রাজু	সভাপতি, সিলেট মহানগর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
ফারুক আহমদ	আঞ্চলিক পরিচালক, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
ফখরুল ইসলাম খান	সভাপতি, সিলেট জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন
পরিতোষ ধর পাপ্পু	শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক, বিএলএফ
আশরাফ হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আউটসোর্সিং জালালাবাদ গ্যাস
মোঃ কামরুল হাসান	অর্থ সম্পাদক, জালালাবাদ গ্যাস

চা শ্রমিক ইউনিয়ন ও অন্যান্য চা শ্রমিক সংগঠনের সাথে মতবিনিময় সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: সার্কিট হাউস, মৌলভীবাজার তারিখ: ২৭/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
মো: পাকারিয়া আহমদ	সভাপতি বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ এসোসিয়েশন
মো: আমিনুর রহমান	সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ এসোসিয়েশন
শেখ কাউছার মিয়া	সহ: সভাপতি বাংলাদেশ টি এস্টেট এসোসিয়েশন
শ্রীমাত বাউরী	বিসিএসইউ সহ-সভাপতি
খাইরুন আক্তার	সভাপতি চা কন্যা নারী সংগঠন
নৃপেন পাল	এজিএস বিসিএসইউ
রামজান কেয়া	মেম্বার, বিসিএসইউ
কমলচন্দ্র বেনার্জি	সাংগঠনিক সম্পাদক বা.চা.শ্র.ই
রতনকুমার পাল	জুডি বা.চা.শ্র.ই
পরেশ কালিজী	আহ. সম্পাদক বয়.শ্রই

বিজয়পুজক	বা.শ্র.ই
মো: তরিকুজ্জামান	উপপরিচালক
সজন ইকরী	বাচাশ্রই
সঞ্জু গোস্বামী	সম্পাদক লংলা ভ্যালী
ধনা. বাউরী	ভ্যালী সভাপতি মনুদলই ভ্যালী বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
নির্মল দাশ	পাইনকা ভ্যালী সম্পাদক মনুদলাই
পুষ্প কুমার কানু	উপদেষ্টা বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
সীতারাম বান	সদস্য বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
রনজিৎ গোয়ালা	সদস্য বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
প্রেমানন্দ রাজধর	সভাপতি তারাপাশা চা বাগান
সুর্য্য কুর্ব্য	সভাপতি ইন্দানগর চা বাগান
স্বপন রাজধর মুন্না	গাজীপুর চা বাগান চা শ্রমিক
সিউধনী কুর্মী	উপদেষ্টা বা.চা.শ্র.ই
রেখা বারুতী	সহ. সাধারণ সম্পাদক বা.চা.শ্র.ই
জেসমিন আক্তার	সহ-সভাপতি বিসিএসইউ
সন্তকি রায়	
কাজল রায়	
আবু জাফর	সভাপতি সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট সিলেট জেলা
মো: খনজর আলী	
কর্ণ তাতী	সা: সম্পাদক বালিলিরা ভ্যালী বা.চা.শ্র.ই
শ্রী পরাগ বারই	বীর মুক্তিযোদ্ধা উপদেষ্টা বা.চা.শ্র.ই
মো: শহিদুল ইসলাম	লাংলা ভ্যালি সভাপতি
পল্লব রঞ্জন বোনার্জী	প্রশাসনিক কর্মচারী বা.চা.শ্র.ই
সজল কান্তি চাউরী	ইউ.পি.সদস্য পূর্বজুড়ী ইউনিয়ন
নির্মল কানু	সমাজ সেবক
দুলাল হাজরা	বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন অফিস কর্মী
স্বাধীন চাষা	পঞ্চাত
মো: ইব্রাহিম মিয়া	প্রচার সমাজসেবা ও ক্রীড়া সম্পাদক
স্বপ্না কানু	হিসাব রক্ষক বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
উজ্জল কুমার দাশ	সংগঠক বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
প্রিয়াংকা কালিন্দী	সংগঠক, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন
জনক লাল দেশোয়ার জনী	বৈষম্য বিরোধী চা জনগোষ্ঠী সমন্বয়ক
প্রভাষ নায়েক	ব্রেকিং দ্য সাইলেন্স
মহাদেব কৈরী	সাতগাঁও
ফরহাদ আহমেদ	বিটিএস
কিবজিৎ নন্দী	দপ্তর সম্পাদক, মৌলভীবাজার মৎস্যজীবী ইউনিয়ন মৌল-৫২১
শাওন	সাধারণ সম্পাদক
রতন বাসকর	সাংগঠনিক সম্পাদক
সাগর বাসকর	যুগ্ম সম্পাদক
কিরন বৈদ্য	মৌলভীবাজার চা বাগান
দিলার দাস	রাজনগর চা বাগান
যুবরাজ ঝরা	থামু বাগান
মুক্তা রানী দেব	পিসি, প্রচেষ্টা
রবীন্দ্র ত্রিপুরা আলী	পিসি, প্রচেষ্টা
নকী খান	প্রচেষ্টা
মগনু মিত্রা	শ্রমিক
অনিরোদ্ধা বাড়াইক	লসাবক ভ্যালী কর্মচারী পরিষদ সম্পাদক
বিজুত	সাবেক সভাপতি
সরফরাজ সাজু	ছাত্র যুবক
প্রদীপ পাল	প্রধান শিক্ষক পাত্রখোলা চা বাগান প্রা.বি.
তোয়ী দত্ত পাল	শ্রমিক
অজিত রায়	সিলেট মালনী ছড়া চা বাগান চা শ্রমিক
পরিসন সিং বাড়াইক	প্রধান নির্বাহী মৌলভীবাজার চা জনগোষ্ঠী আদিবাসী ফ্রন্ট
আইয়ুব আলী	

মো: সাজল আহমেদ	সাধারণ সম্পাদক মৌলভীবাজার জেলা মেকানিক ই:উ:
শ্রী স্বপন দেব	সহ সম্পাদক জেলা অটো মোবাইল
মো: আবেদ জামান	এডভোকেট
মো: সুলতান ফারুক ফরাজী	প্রচার সম্পাদক মো:বা:জেলা মেকানিক ইউনিয়ন
পারভেজ খান	ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর হোপ ইউসেইড বিটিএস
রাজিব সুত্রধর	স্টুডেন্ট
পঙ্কজ এ. কুন্ড	ভাইস প্রেসিডেন্ট বিসিএসইউ
সুমন কুমার তান্তি	বিসিএসইউ
সুবাস দাস	বিসিএসইউ
সুমন রায় চৌধুরী	বিসিএসইউ
সুমন খোকা	রত্না চা বাগান
মো: আ: রব	সভাপতি মেকানিক
সৈয়দ সোহেল আহমদ	সাধারণ সম্পাদক
বসত তারতি	বিসিএসইউ
শাহজাদী বেগম	প্রোগ্রাম কোর্ডিনেটর, অক্সফাম
শিউলি কৈরি	কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর, বিটিএস
সুবর্না গোস্বামী	প্রজেক্ট অফিসার বিটিএস
সন্ধ্যা রায়	চা শ্রমিক
তারেক আজিজ	প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর
মধুমাল বাক্তী	চা শ্রমিক
রাধিকা গোয়ালা	চা শ্রমিক
সুজাতা বিশ্বাস	চা শ্রমিক
তপন বিকাশ তরঞ্জী	উপমহাপরিদর্শক, ডিআইএফই
পপি রানী দে	সহকারী মহাপরিদর্শক, ডিআইএফই মৌলভীবাজার
সন্ধ্যা রানী ভৌমিক	চা শ্রমিক
পীতা রানী কানু	আহবায়ক, বা:চা বা:ফো সাধারণ সম্পাদক মহা সংগ্রহ কমিটি
মাহমুদুর রহমান রাসেল	শিক্ষা, গবেষণা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, বিটিইএসএ
কংকন জ্যোতু ভট্টাচার্য	সহ-সভাপতি বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ এসোসিয়েশন
সুরনজিৎ দাশ	ট্রেজারার, বাংলাদেশ টি এস্টেট স্টাফ এসোসিয়েশন
বিপ্লব মাদ্রাজী	রহনা চা শ্রমিক সভাপতি
মো: ইসরাইল হোসেন	জেলা প্রশাসক
এ.এন.এম সাইফুদ্দিন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কামরুন টি রহমান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
পংকজ ভট্টাচার্য	সাংগঠনিক সম্পাদক
আবুল হোসেন	ছাত্র সংগঠন

মৌলভীবাজারস্থ বিইএফ ও বিভিন্ন মালিক সংগঠনের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: সার্কিট হাউস মৌলভীবাজার তারিখ: ২৭/০১/২০২৫

নাম	**পদবি**
পপি রানী দে	সহকারী মহাপরিদর্শক
মো: রফিকুল ইসলাম	ডিজিএম (এনটিসি)
মো: আবুল কালাম প্রামাণিক	ডিজিএম ডানকান ব্রিফার্স (বিডি) লিমিটেড
মো: সেলিম রেজা	উপ. মহাব্যবস্থাপক জেরিন চা বাগান এমএম ইস্পাহানি লিমিটেড
সৈয়দ মহিউদ্দিন	জেনারেল ম্যানেজার এম.আহমদ টি এন্ড ল্যান্ডস কোঃ লিঃ
মো: জহিরুল ইসলাম	সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার
মো: রফিকুল ইসলাম	সেমিনার ব্যবস্থাপক
এম এ জামাল সোহেল	ডিরেক্টর ম্যাকসন ব্রাদার্স বিডি লিমিটেড
এম হাসান	ডিরেক্টর কালিকান্দি টি.এফ ম্যাকসন ব্রাদার্স
এম এ মালিক হুমায়ুন	ম্যানেজিং ডিরেক্টর ম্যাকসন ব্রাদার্স বিডি লিমিটেড
ড. কাজী মোজাফর আহাম্মদ	মহাসচিব বাংলাদেশ চা সংসদ

মো: মুস্তাফিজুর রহমান	ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডানকান ব্রাদার্স বাংলাদেশ লিমিটেড
মো: জাকির হোসেন	জেনারেল ম্যানেজার ডানকান বাদার্স বিডি লিমিটেড
মো: শামীম হুদা	জেনারেল ম্যানেজার
জি এম শিবলী	জি এম
এইচ কে মজুমদার	সার্কেল চেয়ারম্যান
শান্তনু চাকমা	ম্যানেজার সাগরনাল টি স্টেইট জুরি, মৌলভীবাজার
কে.এস.এম ইমরান	ম্যানেজিং শ্রী বাসী টি.ই
শেখ কামাল মাহমুদ	ডিজিএম, টি ইস্টেইট আকিজ ব্রাদার্স গ্রুপ
শহিদুল ইসলাম খান	শিললোহা টি ইস্টেইট
মো: মুমিনুল হক	সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মধুপুর টি ইস্টেট
মো: মাসুম বিল্লাহ	ল অফিসার ডিআইএফই
তাহসিন এ চৌধুরী	সেন্ট্রাল কমিটি মেম্বার বিসিএস
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন

আদিবাসী প্রতিনিধিদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: চট্টগ্রাম প্রেসক্লাব তারিখ: ০২/০২/২০২৫

নাম	**পদবি**
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আকরাম হোসেন	শ্রমিক ফ্রন্ট
আল কাদেরী জয়	বাসদ
উম্মে হাবিবা শ্রাবণী	বাসদ
সিরাজ উদ্দিন	বাসদ
সমর চাকমা	শ্রমিক ফোরাম
মমতাজ মিয়া	রাঙামাটি জেলা শ্রমিক দল
মোঃ মুজিবুল হক	কক্সবাজার বাসদ
শরৎ জ্যোতি চন্দ্র	বি আই পি এফ
এ এন এম সাইফ উদ্দিন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
দিয়া আসাম	পৌর শ্রমিক সম্পাদিকা
ভৈসাচিং	মল্লাশটি
সন্তোষ চাকমা	পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম
জগৎ চাকমা	পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম
সুজন চাকমা	পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম
জন্তনা সুখী	রাঙামাটি জেলা শ্রমিক দল
বাবু মার্মা	শ্রমিক দল রাঙামাটি
নয়ন	রাঙামাটি জেলা শ্রমিক দল
মোঃ সেলিম উদ্দিন	শ্রমিক দল বান্দরবন
নূর মোহাম্মদ	বান্দরবন শ্রমিক দল
জিয়াউর রহমান	বান্দরবন শ্রমিক দল
মোঃ সুমন	বান্দরবন শ্রমিক দল
মোঃ আজিজ	বান্দরবন শ্রমিক দল
সুশান্ত চাকমা	রাঙামাটি
ত্রিজ্যোতি চাকমা	পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম
পাপেল চাকমা	পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম
রিকের চাকমা	পাহাড়ি শ্রমিক কল্যাণ ফোরাম
কেসিং সং মার্মা	রাঙামাটি
ইনটোনা চাকমা	খাগড়াছড়ি
আহমেদ জসিম	রিকশা শ্রমিক
ইতুমনি তালুকদার	আদিবাসী ফোরাম
অনুপম খিয়াং	খিয়াং আদিবাসী সংগঠন
নবাশাহী চাকমা	রাঙামাটি ট্যুর অপারেটর এসোসিয়েশন

গতি কৃষ্ণ	আদিবাসী ফোরাম, রাঙামাটি
ধনঞ্জয় তনচংগ্যা	আদিবাসী ফোরাম, রাঙামাটি
প্রণব চাকমা	জাতীয়তাবাদী
লামিউ মার্মা	পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ
সুপ্রিয় তনচংগ্যা	পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ
রুমেস চাকমা	পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ
অমৃত চাকমা	আদিবাসী সদস্য
পাহাড়ি ভট্টাচার্য	বিলস, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ০৬/০২/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
আবুল কালাম আজাদ	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, টিইউসি
মোঃ মছিউদদৌলা	আইন ও দরকষাকষি সম্পাদক, টিইউসি
মাহবুবুল আলম	সহ-সভাপতি, টিইউসি
কাজী মোঃ রুহুল আমিন	ফাইন্যান্স সেক্রেটারী, বিটিইউসি
সেকান্দার হায়াত	বিটিইউসি
সাহিদা পারভিন শিখা	বিটিইউসি
সিরাজুল ইসলাম	টিইউসি

ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ০৯/০২/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: ছিবগাত উল্লাহ	অতিরিক্ত আইজিপি
মো: ইসরাইল হাওলাদার	ডিআইজি (ইনটেল) ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ
মোহা: আসরাফুজ্জামান	ডিআইজি (প্রসাশন)
সাইফুল্লাহ আল মামুন	অতিরিক্ত ডিআইজি আইপি
হাসিবুল আলম	এডি. ডিআইজি আইপি হেডকোয়ার্টার
মো:সাইফুল হক	অতি: ডিআইজি
মাহমুদুল হাসান	অতিরিক্ত পুলিশ সুপার
ফারুক আহাম্মদ	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য শ্রম সংস্কার কমিশন
মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা ডিআইএফই
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন
মুস্তাফিজ আহমেদ	এসোসিয়েট প্রফেসর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
নূর জাহান আমিনা	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন

আইএলও টেকনিক্যাল টিমের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১১/০২/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কামরান টি. রহমান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাদ জিলানী	চিফ টেকনিক্যাল এডভাইজর আইএলও
চৌধুরী আলবাব কাদির	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, আইএলও
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রোমান ইসতিয়াক রাফিন	প্রজেক্ট অফিসার আইএলও

অনন্য রায়হান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ মাজহারুল ইসলাম	মাইগ্রেশন টেকনিক্যাল টিম সদস্য
ফারজানা রেজা	এনপিও সোশাল প্রটেকশন
মোঃ সাতিল মঞ্জুর	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, ওএসএইচ
মোঃ জামিল আনসার	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, আইএলও
মোঃ অভি হোসেন	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, কান্ট্রি অফিস
সৈয়দা মুনিরা সুলতানা	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
মারুফ কামাল	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
মোঃ বাইদুল ইসলাম	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার
নাদা এ.	লেবার কমিউনিকেসন্স স্পেশালিস্ট
নিরান রঞ্জন	প্রোগ্রাম ম্যানেজার
আর জনসন	টেকনিক্যার স্পেশালিস্ট
শাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
লাউনা	জিইএসআই স্পেশালিস্ট
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা
মোস্তাফিজ আহমেদ	সহযোগী অধ্যাপক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন

বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র (বিটিইউসি) এর সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা **তারিখ:** ১৩/০২/২০২৫

নাম	**পদবি**
কুতুব উদ্দিন আহমেদ	সভাপতি, বিটিইউসি
মোশারফ হোসেন	নির্বাহী সভাপতি
বাবুল আখতার	সাধারণ সম্পাদক, বিটিইউসি
রকিবুল ইসলাম সুজন	সভাপতি, BOISSF
অলক চৌধুরী	সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও শিল্প শ্রমিক ঐক্য পরিষদ
নুসরাত জাহান সোহানা	সদস্য, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও শিল্প শ্রমিক ঐক্য পরিষদ
আখিঁ	কার্যকরী সভাপতি, সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশন
পারভীন আক্তার	সহ-সভাপতি, SSF
মোঃ মিজানুর রহমান	সহ-সভাপতি, SSF
মো: শহিদুল ইসলাম	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক
জাহাঙ্গীর সরদার	সাংস্কৃতিক সম্পাদক, SSF
মোঃ আব্দুল আউয়াল	সহ-সভাপতি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক জোট
মোস্তাফিজুর রহমান	সহ-সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ফেডারেশন
মোঃ আ: রহিম	ত্রাণ ও দুর্যোগ সম্পাদক, বাংলাদেশ নির্মাণ শ্রমিক ফেডারেশন
মোছা: ফাতেমা ফারিন	সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি জাতীয় তৃণমূল শ্রমিক ফেডারেশন
শেখ মোসলেম	সাংগঠনিক, জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশন
মনমোহন বিশ্বাস	জাতীয় শ্রমিক ফোরাম
নুরজাহান আখিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন
নুরজাহান তুবা	সহ-সভাপতি, BNLF
জাহাঙ্গীর হোসেন	সহ সম্পাদক, BGSSF
মো: শাজাহান মিয়া	BGSSF
আব্দুল্লাহ আল বছির	সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কারিগরী
এস. এম. মনিরুজ্জামান	শিল্প ও শ্রম সম্পাদক, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক জোট ফেডারেশন
মো: শাহ আলম	ন্যাশনাল ওয়াকার্স ফেডারেশন
মো: শাহাজাহান সরকার	বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
শহিদুল হাসান (নয়ন)	সাধারণ সম্পাদক
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মো: শফিকুল ইসলাম	সভাপতি, বাংলাদেশ গার্মেন্টস ও শিল্প শ্রমিক ঐক্য পরিষদ
আমির আলী হাওলাদার	সহ-সভাপতি, শ্রমিক মজলি
এএএম ফয়েজ হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
মিজানুর রহমান সিকদার	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, BGIWUC
মো: শামীম খান	সভাপতি, জাতীয় তৃণমূল শ্রমিক ফেডারেশন

আইএলও টেকনিক্যাল টিমের (সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ) সাথে শ্রম সংস্কার কমিশন
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১৮/০২/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান
ফারুক আহমেদ	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মেহেদী ইমাম	টেকনিক্যাল টিম সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ফারজানা রেজা	এনপিও, আইএলও, সোশ্যাল প্রোটেকশন
তানজিলাত তাসনোভা	এসপিও, আইএলও
নোওশীন শাহ	এনপিই,
সাদ গিলানি	সিটিএ-ইআইএস
মনিকা অচি	সিনিয়র সোশ্যাল প্রটেকশন স্পেশালিস্ট আইএলও,ডিডব্লিউটি/ কো, দিল্লি
মো: মাসুম বিল্লাহ	ল অফিসার, ডিআইএফই
নুর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি

কৃষি শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১৯/০২/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
শাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আনোয়ার হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আরিফুল ইসলাম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আব্দুর রহমান	বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন
বজলুর রশিদ ফিরোজ	সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট
মনজুর আলম মিঠু	সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট
অজিত দাস	বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন
রাজু তাহমিদ	বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর ও কৃষক সংগঠন
শাহীন মঞ্জুর	সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট
মোঃ এনামুল	জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
শহিদুল ইসলাম বাবুল	সাধারণ সম্পাদক
অধ্যক্ষ আশেক-ই-এলাহী	সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় কৃষক জোট
জুলফিকার আলী	সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
আদিবা আফরোজ	গবেষক, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজিব আহমেদ	কো-অর্ডিনেটর, কর্মজীবী নারি
আব্দুল আলিম	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষক মজুর সংহতি
সৈয়দ জারিফ উদ্দিন আহমেদ	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
এম এম খলিল	ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার
ড. হাসান আশরাফ	সহযোগী অধ্যাপক, জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যায়
নাজমা ইয়াসমিন	ডিরেক্টর, বিলস
আনোয়ার হোসেন রেজা	বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সংগঠন
আবিদ হোসেন	বাংলাদেশ কৃষক সংগঠন
এস এম এ সরকার	বাংলাদেশ কৃষক সংগঠন
নাসরিন সুলতানা	ন্যাশনাল অফিসার, আইইউএফএআইবি
গোলাম ছরোয়ার	সাধারণ সম্পাদক

তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাজ্জাদ হোসেন	আন্তর্জাতিক কৃষক বিষয়ক সম্পাদক, জাতীয় কৃষক জোট
আব্দুস শেখ	বাংলাদেশ কৃষক ও মজুর সমিতি
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের প্রতিনিধিবৃন্দদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২০/০২/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আনোয়ার হোসাইন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন ও সভাপতি, বিজেএসডি
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কোহিনূর মাহমুদ	উইমেন এ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারী, বিজেএসডি
মোঃ রফিকুল ইসলাম	ফাইন্যান্স সেক্রেটারী, বিজেএসডি
মোঃ আসাদুজ্জামান বাবুল	ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারী, বিজেএসডি
মোঃ খোরশেদ আলম	যুব সেক্রেটারী
নাসরি আক্তার দিনা	জেনারেল সেক্রেটারী, উইমেন এ্যাফেয়ার্স
হামিদা খাতুন	সহকারী সম্পাদক, উইমেন এ্যাফেয়ার্স
মোৎ কামরুজ্জামান	সদস্য সচিব, শ্রমিক দল
মোঃ শমসের আলম	সাংগঠনিক সম্পাদক, পাট শ্রমিক দল কেন্দ্রীয় কমিটি
মোঃ আতাউর রহমান	সহ সভাপতি, নওয়াপাড়া
সৈয়দ গিয়াস উদ্দিন	সোনালি ব্যাংক, সিবিএ
মোঃ বদরুল আলম সবুজ	সদস্য সচিব, শ্রমিক দল, ঢাকা
মঞ্জুরুল ইসলাম মজু	প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক
মোঃ আনোয়ার	সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ জাকির হোসেন	সাংগঠনিক সম্পাদক
মোঃ মেহেদী আলী খান	সহ সভাপতি, শ্রমিক দল
মোঃ জাহাঙ্গির আলম	সহ সাধারণ সম্পাদক, শ্রমিক দল
মোঃ মোস্তাফিজুল করিম মজুমদার	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, শ্রমিক দল
মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সহসভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন	সহ অর্থ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল
মোঃ ইউনুস	
মোঃ বশির আহমেদ	অফিস সহায়ক
মোঃ ইসমাঈল	অফিস সহায়ক
মোঃ জিয়াউর রহমান	সে. ইনচার্জ, শে.বা.ন. গণ পরি. সাধারণ সম্পাদক
মোঃ নুরুল আলম	অফিস সহায়ক, গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রধান প্রোকৌশলী দপ্তর
মোঃ ফারুক	শ্রমিক দল নেতা, মহানগর দক্ষিণ
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন

প্রতিবন্ধী সংগঠনসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২০/০২/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ	কমিশন প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন

আনোয়ার হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
আলম দেওয়ান	এন ই ডি ডব্লিউ পি সি
অরূপ রতন চৌধুরী	প্রোগ্রাম ম্যানেজার বিবিডিএন
বশির আল হোসেন	পি এম, এনজিডিও
মোঃ আব্দুল হাই মন্ডল	জাতীয় তৃণমূল প্রতিবন্ধী সংস্থা
শাহজাদী জাহান খানম	শিক্ষক, কল্যাণী ইনক্লুসিভ স্কুল বিপিএফ
ফারজানা আক্তার	ব্লাস্ট প্যারালিগাল
নূর নাহার আলম	এসিট্যান্ট এ কো-অর্ডিনেটর
উজ্জল মাহমুদ	পি সি, ডব্লিউডিডিএফ
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মেহেদী ইমাম	গবেষক, শ্রম সংস্কার কমিশন
সুবর্ণা দাশ	ক্যাপাসিটি বিল্ডিং কো-অর্ডিনেটর, ব্লাস্ট
দিপা মালাকার	সিনিয়র অফিসার, ব্লাস্ট
মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
নাজমা ইয়াসমিন	ডিরেক্টর, বিলস
মোঃ আব্দুল ওহাব	এ্যাকটিং প্রেসিডেন্ট, জে এস জে
ফাহমিনা মিশু	জে এস জে
আয়শা ইয়াসমিন	গবেষণা সহযোগী, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন

অর্থনীতিবীদদের সাথে শ্রম সংস্কার কমশিনের সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২৬-০২-২৫

নাম	পদবি
রিজওয়ানুল ইসলাম	প্রাক্তন বিশেষ উপদেষ্টা, আইএলও
আভি হোসাইন	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, আইএলও
সুদিপ্ত রায়	রিসার্চ এসোসিয়েট, এসএএনইএম (SANEM)
ড. হাসান আ'শরাফ	এসোসিয়েট প্রফেসর - জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
ফারুক আহমেদ	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সৈয়দ সুলতান আহমদ	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মাহফুজুল হক	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
অনন্যা রায়হান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোস্তাফিজ আহমদে	এসোসিয়েট প্রফেসর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
এম, এম, আকাশ	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
জাকির হোসনে	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাইশা জামান	রিসার্চ কমিনিউকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল এসোসিয়েট, আইসোশ্যাল
আয়শা ইয়াসমীন	রিসার্চ এসোসিয়েট, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাদিক মাহমুদ	রিসার্চ কমিনিউকেশন অ্যান্ড সোশ্যাল এসোসিয়েট, আইসোশ্যাল

আনু মুহম্মদের সাথে শ্রম সংস্কার কমশিনের মতবনিময় সভা
স্থান: বিলস, ঢাকা তারিখ: ০৬/০৩/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
আনু মুহাম্মদ	সর্বজন কথা
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোশাহিদা সুলতানা	শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তাসলিমা আকতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কোহিনূর মাহমুদ	পরিচালক, বিলস

অনন্য রায়হান	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
নাজমা ইয়াসমিন	পরিচালক, বিলস

ডাক্তারদের সাথে শ্রম সংস্কার কমশিনের মতবনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১০/০৩/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
ড. মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন	নির্বাহী পরিচালক, সিআরপি
এম. শাহারিয়ার রনি	ট্রাস্ট কো-অর্ডিনেটর
ডা. মনজুর কাদির আহমেদ	নির্বাহী পরিচালক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র
ডা. সৈয়দা নুরুন নাহার ইসলাম	সিনিয়র মেডিকেল অফিসার
ডা. তামান্না নাসরিন	সিনিয়র মেডিকেল অফিসার
ডা. নভোনীলা দাস	সিনিয়র মেডিকেল অফিসার
ডা. মো. খায়রুল ইসলাম	মেডিকেল অফিসার
উদিসা ইসলাম	গবেষক
সৈয়দ জারিফ উদ্দিন আহমেদ	রিসার্চ এসোসিয়েট, শ্রম সংস্কার কমিশন
খন্দকার এ সালাম	ওস টেকনিকেল কমিটি মেম্বার
ডা. বিশ্বজিত রায়	এসিট্যান্ট ইনসপেক্টর জেনারেল (স্বাস্থ্য), ডাইফ-হেড অফিস
এ কে এম মাসুম উল আলম	ওস টেকনিকেল কমিটি মেম্বার
রিপন চৌধুরী	ইডি/ওস
ডা. মো: ফুয়াদুল ইসলাম	সহকারী পরিচালক
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, এল.আর.সি
মো: সুমন হাওলাদার	ডি. এ.
শাওন শেখ	আই টি সহযোগী
আব্দুর রহমান	অফিস সহকারি
নূরনবি ইসলাম	অফিস সহকারি
মামুন	শ্রম অধিদপ্তর

এমএফএস এর সাথে শ্রম সংস্কার কমশিনের মতবনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১০/০৩/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম মাসুমুল আলম	ওস টেকনিক্যাল টিম, শ্রম সংস্কার কমিশন
খন্দকার এ. সালাম	ওস টেকনিক্যাল টিম, শ্রম সংস্কার কমিশন
ডাঃ মোঃ হায়াতুন্নবি	ওস টেকনিক্যাল টিম, শ্রম সংস্কার কমিশন
ডাঃ গায়েত্রি	মেডিকেল একটিভিটি ম্যানেজার
মাহমুদ ইমরান তালুকদার	অকুপেশনাল হেলথ অফিসার
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
সৈয়দ জারিফ উদ্দিন আহমেদ	ওস টেকনিক্যাল টিম, শ্রম সংস্কার কমিশন
মনিরুল কবির	সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, বিলস
এ. ক্রিসডোনা	এইচ এম, এম এস এফ
ক্রিসতাবেল আকিওস	মেডিকেল টিম লিডার
নূর জাহান আমিনা মুন	এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন এর সাথে শ্রম সংস্কার কমশিনের মতবনিময় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১০/০৩/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
সাকিল আখতার চৌধুরী	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
কাজী আবুল	সাধারণ সম্পাদক
মোঃ রফিকুল ইসলাম	সভাপতি
ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ	সভাপতি, কৃষি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
আবু মোহাম্মদ	সাধারণ সম্পাদক, উত্তরা ব্যাংক শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন

হোসেন আহমেদ	সাধারণ সম্পাদক, রূপালি ব্যাংক কর্মচারী সংঘ
মোঃ রাশেদুল আমিন	কার্যকরী সদস্য, উত্তরা ব্যাংক শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
মোঃ ইলিয়াস খাঁন	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, জনতা ব্যাংক পিএলসি
মোঃ আলমগীর হোসেন খাঁন	যুব সভাপতি, জনতা ব্যাংক
শ্রী বিসু লাল	সভাপতি, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
মোঃ আবু ইউসুফ	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
মোঃ আব্দুররব মিয়া	কার্যকর সভাপতি, রূপালি ব্যাংক কর্মচারী সংঘ
মোঃ শফিক উদ্দিন	সভাপতি, বিডিবিএল
মোঃ মহসিন ভূইঞা	সাংগঠনিক সম্পাদক, বিডিবিএল
কাজী নাসির উদ্দিন	সাধারণ সম্পাদক, কর্মসংস্থান ব্যাংক
আসমা আক্তার	মহিলা সম্পাদিকা, কর্মসংস্থান ব্যাংক
মোঃ বদরুল ইসলাম	সহ-সাধারণ সম্পাদক, কর্মসংস্থান ব্যাংক কর্মচারী ইউনিয়ন
আনিসুর রহমান	দপ্তর সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক
মোঃ মাহবুবুর রহমান গাজী	দপ্তর সম্পাদক, বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয়তাবাদী কর্মচারী সমিতি
মোঃ আলী আজগর	সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমিতি
মোঃ আক্তার হোসেন খান	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয়তাবাদী কর্মচারী সমিতি
মোঃ জাহাঙ্গির হোসেন খান	সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয়তাবাদী কর্মচারী সমিতি
মোঃ নূরুল হক সরদার (নিরু)	সভাপতি, রূপালি ব্যাংক কর্মচারী সংঘ
মোঃ সিরাজুল ইসলাম	সহ-সভাপতি, কৃষি ব্যাংক
মোঃ হাবিবুর রহমান	সহ-সভাপতি, অগ্রণী ব্যাংক
শামীম হোসেন	সাধারণ সম্পাদক
মোঃ মোসলেহ উদ্দিন	ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন
মোঃ আরিফ হোসেন খান	উত্তরা ব্যাংক কর্মচারী কল্যাণ সমিতি
মোঃ সিরাজ হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, কৃষি ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন
মোঃ ইয়াসিন	সাবেক সভাপতি, জনতা ব্যাংক জাতীয়তাবাদী কর্মচারী ইউনিয়ন

বেপজা এর সাথে শ্রম সংস্কার কমশিনের মতবনিমিয় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ২৫/০৩/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
এ কে এম নাসিম	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তপন দত্ত	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
মোঃ খোরশিদ আলম	নির্বাহী পরিচালক, বেপজা
মোঃ তানভীর হোসেন	নির্বাহী পরিচালক, বেপজা
মোঃ ফজলুল হক মজুমদার	অতি. নির্বাহী পরিচালক, বেপজা
এ এস এম আনোয়ার পারভেজ	ইডি(পিআর – এলসি) বেপজা
মনোজ কুমার ধর	এইডি(ইএস), বেপজা
মোঃ মাসুম বিল্লাহ	আইন কর্মকর্তা, ডাইফ
মোঃ তারেক হোসেন	ডিরেক্টর, বেপজা
কাজল আসগর	ডিরেক্টর (ইএস), বেপজা
মোঃ তানজীব রহমান	ডিডি (ইএস), বেপজা
আহসান কবির	ডিডি (ইএস), বেপজা

স্কপ ও এন সি সি ডব্লিউ ই এর প্রদিনিধিদের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিনিময় সভা
স্থান: বিলস অফিস **তারিখ:** ২৫/০৩/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান আহমদ	কমিশন প্রধান
তপন দত্ত	সদস্য,শ্রম সংস্কার কমিশন সভাপতি, টি. ইউ. সি
শাহ মো. আবু জাফর	সভাপতি, বিএলএফ
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন ও সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
চৌধুরী আশিকুল আলম	সভাপতি বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন সংঘ

তাসলিমা আখতার	সদস্য, শ্রম কমিশন সভাপ্রধান, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি
রিপন চৌধুরী	মহাসচিব,বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস
আবদুল কাদের	সভাপতি,
মো. তোফাজ্জল হোসেন	সভাপতি, বি.এস.এস.এফ
পুলক রঞ্জন ধর	সম্পাদক, বাংলাদেশ ফ্রি ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, বি.এফ.টি.ইউ.সি
আবুল কালাম আজাদ	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, টি.ইউ.সি.
শামীম আরা	সভাপতি, বি.জে.এস.এফ
সামছুল আলম	কেন্দ্রীয় সদস্য, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
মাহবুবুল আলম	সহসভাপতি, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
কোহিনুর মাহমুদ	ডিরেক্টর, বিলস
আহসান হাবিব বুলবুল	সাধারণ সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট
জাকির হোসেন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন
সৈয়দ জারিফ উদ্দিন আহমেদ	Ecotopia consultancy and solution, ED
চৌধুরী বোরহান উদ্দিন	বিলস
মেহেদী ইমাম	বিলস
আওরঙগজেব	সহকারি অধ্যাপক, মা. ভা. বি. প্র. বি.
রেজাওনুল হক....	বিলস
আশিস কে. আর্চাজি	বিলস
নুর জাহান আমিনা মুন	এক্রিকিউটিভ সেক্রেটারি, শ্রম সংস্কার কমিশন
মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ	সভাপতি জাতীয় শ্রমিক জোট
গনি মিয়া	বিলস
সাথী	বিলস
হালিম ফকির সায়েম	বিলস

বিভিন্ন জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সাথে শ্রম সংস্কার কমিশনের মতবিবিময়
স্থান: বিলস অফিস তারিখ: ২৭/০৩/২০২৫

নাম	পদবি
জেড. এম. কামরুল আলম	সভাপতি
আবুল হোসাইন	সভাপতি, জাতীয় কারিগর ও শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন
আবু ইউসুফ মোল্লা	সভাপতি, বাংলাদেশ লেবার সংগ্রাম
এম এম ফয়েজ হোসেন	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন
শহীদুল ইসলাম সবুজ	সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম
সুমাইয়া ইসলাম	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন
মোঃ ইলিয়াস	সাধারণ সম্পাদক, ন্যাশনাল ওয়ার্কার্স ইউনিটি সেন্টার
নাহিদুল হাসান নয়ন	সাধারণ সম্পাদক, সম্মিলিত শ্রমিক ফেডারেশন
মরিয়ম আক্তার	সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার ফেডারেশন
মন্টু ঘোষ	সভাপতি, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
সাদেকুর রহমান শামীম	সাধারণ সম্পাদক, গার্মেন্টস শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র
রাজেকুজ্জামান রতন	সদস্য, শ্রম সংস্কার কমিশন ও সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মাস্টাররোল দৈনিক শ্রমিকদের সাথে শ্রম সংস্কার কমশিনের মতবনিমিয় সভা
স্থান: শ্রম ভবন, ঢাকা তারিখ: ১৩/০৪/২০২৫

নাম	পদবি
সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহম্মদ	প্রধান, শ্রম সংস্কার কমিশন
আবু বকর শেখ	মাস্টাররোল দৈনিক শ্রমিক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সুমন সরকার	মাস্টাররোল দৈনিক শ্রমিক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
শাহিন শেখ	মাস্টাররোল দৈনিক শ্রমিক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সুলতান আহমেদ	মাস্টাররোল দৈনিক শ্রমিক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
আতিক ফকির	মাস্টাররোল দৈনিক শ্রমিক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
হাছান আলী	মাস্টাররোল দৈনিক শ্রমিক, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর